বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড]   বৈশাখ, ১৩১২ সন।   [১ম সংখ্যা।

কাল—কত কাল?

বর্ষারম্ভ-চিন্তা।

"Ere the foundations of the world were laid,
Thou wert; ...."
Gay

অনন্তপ্রকার ফুলের হাসি এবং অসংখ্যবিধ ফলের স্বাদুমধুর রসবৈভব লইয়া এই তরুলতাময় উদ্ভিদ-জগৎ কত কাল? কত কাল অবধি জলে মৎস্য, স্থলে মৃগ-মহিষ ও ব্যাঘ্র-ভল্লুক, এবং জল ও স্থলের অনতিদূরবর্ত্তি উপরিতলে অসংখ্যমূর্ত্তি বিহঙ্গরাজী? এ প্রশ্ন কঠিন। কঠিন হইলেও এ প্রশ্ন লইয়া মনুষ্য পরিশ্রম করিয়াছে; এবং ডারউয়িন প্রভৃতি মনীষি-পুরুষের চিন্তাসূত্র হস্তে ধারণ করিয়া, সত্যে পঁহুছিতে বত্ন পাইয়াছে।

এই জল-স্থলময়ী পৃথিবীই বা কতকাল অবধি অগণন গিরি-সাগর ও গ্রাম-নগরের দুর্ব্বহ বোঝা দিবারাত্রি বুকে বহিয়া, সূর্য্যকে শূন্যবক্ষে প্রদক্ষিণ করিতেছে;—সূর্য্য কত কাল অবধি আলোকদান করিয়া পৃথ্বীসদৃশ গ্রহসমূহকে আলোকিত রাখিয়াছে; এবং ঐ নীলস্নিগ্ধনভস্তল-শোভিনী, নক্ষত্রমালাই বা, কত কাল অবধি, শ্বেত-পীত-হরিৎ-পাটল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণে বিলসিত হইয়া, এই অনন্ত জগতের শোভা ও সম্পদ বাড়াইয়াছে? মনুষ্য এ সকল প্রশ্নেরও সন্নিহিত হইয়াছে,—মানুষী শক্তি পরিগ্রহ করিতে পারুক আর না

পারুক, মনুষ্যের বুদ্ধি,—মনুষ্যের হৃদয়, এ সকল প্রশ্নের আলোচনায়, অতি গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছে।

কিন্তু, জগতের সুন্দর ও কুৎসিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পদার্থের আশ্রয়রূপী কাল—কত কাল? কোন্ কালে কালের আরম্ভ হইয়াছে? কোন্ কাল অবধি কাল, আপনাতে আপনি অবস্থিত রহিয়া, এই বিশ্ববিবর্ত্তের নিদান হইয়াছে? এ প্রশ্ন সহজ নহে। মনুষ্যের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির কথা দূরে থাকুক, কল্পনাও এ প্রশ্নের কাছে পঁহুচিতে পারে না,—কাছে যাইবার উদ্যম করিতে সাহস পায় না। যদি কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে চাও, তাহা হইলে একবার কল্পনার পক্ষে উড্ডীন হইয়া কালের অতীত কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হও; এবং গঙ্গার প্রবাহ যেমন হিমাদ্রির প্রস্থস্থিত হরজটানির্ঝর হইতে ধারায় বহিয়াছে, এই নিত্যবহমান কালের স্রোতও সেইরূপ কোন্ নির্ঝর হইতে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বগ্রহে প্রবৃত্ত হও।

তুমি আজি এই শুভাগত নব বৎসরের প্রথম দিবসে, এইমাত্র-অতীত একবৎসরকালকে যেমন বুদ্ধির বিষয় করিয়া, একটি পিণ্ডীভূত বস্তুর মত চিন্তা করিতে পারিতেছ, সেইরূপ এক শত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অথবা এক কোটি বৎসরকেও কল্পনার আয়ত্ত করিয়া, একটি অখণ্ড বস্তুজ্ঞানে চিন্তা করিতে পার। এক কোটি একটু দূরের কথা। বেশী দূরের নহে, তথাপি দূরবর্ত্তী কাল। মনে কর, তুমি এক লক্ষ বৎসর পার হইয়া কালে সেই অতীত-সীমারেখায় যাইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। তখন তুমি কি দেখিতেছ? দেখিতেছ, শ্যামলাম্বু গভীর-সরোবরে নীলপদ্মের মত, এই পৃথিবী শ্যামল-নভঃসাগরে 'ভাসমান' রহিয়াছে; এবং পূর্ণবিকসিত পদ্মের দলে দলে যেমন শৈবাল-সম্পাতে সেই এক অপূর্ব্ব শ্যাম-শোভা বিকশিত হয়, পৃথিবীরও স্থানে স্থানে, সেইরূপ শৈবাল-সদৃশ আবরণে, কেমন এক সুন্দর-মনোহর শ্যামকান্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

তখন ইতিহাসের আরম্ভ হয় নাই,—বাল্মীকি তাঁহার বীণায় গভীরে-মধুরে ঝঙ্কার দিয়া রামজানকীর মধুর নাম, ব্যাস তাঁহার বড় সাধের কৃষ্ণকাহিনী, এবং বৈদিক ঋষিরাও তাঁহাদিগের প্রাণারাধ্য ব্রহ্মতত্ত্ব ও সামসংগীত গাইতে আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু পৃথিবী তখন পশুপক্ষীর আবির্ভাবে শব্দময়ী হইয়াছে। চাতক মেঘের নিকট জল-কণার প্রার্থনায় কাঁদিতে শিখিয়াছে। বিরহ-ভীতি-বিহ্বলা চক্রবাকী, নক্ষত্রমালিনী যামিনীর সমাগম দর্শনে, প্রাণ-সহচর চক্রবাকের জন্য করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমুদ্র তখন, সময়ে সময়ে, বিকট-ভৈরব জল-জন্তুর পুচ্ছতাড়ন ও ভীষণ-নিঃস্বননে, এবং গহন-কানন ক্ষুৎপিপাসাকাতর সিংহ প্রভৃতির গম্ভীর-ভয়ঙ্কর গড়-গড়-গর্জ্জনে নিনাদিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হা মনুষ্য! তুমি তখন কোথায়? তুমি আজি কুশরূপে জাপের রুধির-পানের জন্য

লালায়িত, অথবা জাপরূপে জগজ্জয়ি-কীর্ত্তি লাভের জন্য ব্যাকুলিত। তুমি আজি রাজনীতির নামে ঋষিতাপসের তুষার-মণ্ডিত গিরি-নিবাসে বিজয়ভেরী বাজাইতেছ, অথবা রস-মধুরা প্রেমিকতার নামে রমণীর উচ্চতম অধিকারকে পিশাচের ভোজ্য করিয়া তুলিতেছ। তুমি তখন কোথায় ?

যদি একলক্ষ বৎসরের ব্যবধিরেখায় দণ্ডায়মান হইলেই মন এইরূপ অবসন্ন হয়, তাহা হইলে, কল্পনার সাহায্যে, এক কোটি,—এক সহস্রকোটি,—এক লক্ষকোটি,—এক অর্ব্বুদকোটি বৎসরের ব্যবধিরেখায় পঁহুচিলে, কি দেখি ? দেখি সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, বোধ হয় ঝিকিমিকি নক্ষত্রও তখন নাই। তখন আছেন কে ? সেই চিন্তাতীত-কালেও যিনি কালকে ব্যাপিয়া,—কালের প্রাণদেব-রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ ছিলেন,—এখনও তিনিই আছেন, এবং অনন্তকাল পরেও তিনিই থাকিবেন। আজি কালসমুদ্রের এই নূতন বুদ্বুদে ভাসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

নববর্ষ।

(আবাহন।)

(১)

এস, নববর্ষ, এস,—এসহে আবার।
এলে কতবার, গেলে কত বার,—
সংখ্যা কি গো আছে তার ?—
যাতায়াত,—এই গতি,—নিয়তি তোমার।
প্রতপ্ত-কাঞ্চন-রেণু-রঞ্জিত ও প্রাচী-তনু,
প্রবালের সিংহাসন পাতিয়াছে তায়,
ঊষা অরুণিত নব নীরদ-মালায় ;
নব রবি নব রাগে খুলিয়াছে দ্বার ;—
এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।

(২)

এস, নববর্ষ, এস,—এসহে আবার।
এস, আর যাও, ক্ষণ না দাঁড়াও,
ধার'না কাহারো ধার ;—
কারো পানে ফিরে নাহি চাও একবার।—
বিমল প্রশান্ত ভাতি পোহা'ল বাসন্তী রাতি,
নিঃশেষিল বসন্তের অন্তিম-নিঃশ্বাস,
নিদাঘ-পরশে তপ্ত মলয় বাতাস।
ঝিল্লিকা ঝিঁঝিটে ঘন দিতেছে ঝঙ্কার ;
এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।

(৩)

এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার !
মঙ্গল আরতি, করিছে প্রকৃতি,
বন্দনা গাইছে আর ;
করযোড়ে কোটি নরে করে নমস্কার।
নবীন-নীরদদল, সৌদামিনী ঝলমল,
কল্লোলে করকা কত তূর্ণভি হিয়ায়,
আনন্দ-অশনি-নাদে দিগন্ত কাঁপায়।
পথ চেয়ে, থাকে নিয়ে,—সান্ধ্য-উপহার ;
এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।

(৪)

এস, নববর্ষ, এস,—এসহে আবার।
আশার শ্মশানে, অনন্ত বিতানে
গাঁথিয়া আশার হার,
নূতন মুকুলে ফুলে,—শোভার আধার,
ধরণী দাঁড়াল' পরি নব অলঙ্কার।
পুরাতনে বিস্মরণ উধাও ধাইছে মন,
নব-অঙ্গরাগে দীপ্ত পুরাতন রবি,—
নূতন জ্যোৎস্নায় শশী অভিনব ছবি।
প্রাণে প্রাণে উৎসাহের নূতন জোয়ার;
এস, নববর্ষ, তবে, এসহে আবার।

(৫)

এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।
র'তে কোন দেশ, কে পে'ত উদ্দেশ?
বৃথা কর অহঙ্কার;
আমি সে করিনু তব জীবন-সঞ্চার।—
কালের বিমান ধরি, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি,
মহাকাল অঙ্গ হ'তে কণা খসাইয়া,
সৃজিনু তোমারে আমি 'বর্ষ' নাম দিয়া।
আমি না থাকিলে কোথা অস্তিত্ব তোমার?
এস, নববর্ষ, তুমি সৃজন আমার।

(৬)

এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।
তব আগমনে নূতন জীবনে,
দেখিয়াছি বার বার,
মৃতে পায় প্রাণ, আঁখি মেলে এক বার।
শ্যামল উবর-মাটী; কোরকে মোড়ক আঁটি,
পরিমলময়ী লুপ্তসুষমা অতুল,—
মুকুল, পরশে তব, ফুটে হয় ফুল!
ঝরে পড়ে ফুল, ফল পরিণাম তার;—
এস, নববর্ষ, এস—এসহে আবার।

(৭)

এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।
অগস্ত্য হইয়া, গণ্ডূষে পূরিয়া
শুষে লও পারাপার;
ভর সিন্ধু, বারিবিন্দু বর্ষণে তোমার।
নন্দন-কানন শত রসাতল-কুক্ষি গত;
পাতালের পঙ্ক হ'তে অলকা তু'লেছ,
তুমি ঘুরে ঘুরে এসে হিমাদ্রি গড়েছ।
কে জানে, কবে কি ভাগ্যে লিখে রাখ কার?
এস, নববর্ষ, এস,—এসহে আবার।
এস, নববর্ষ' এস,—এসহে আবার।

(৮)

অফুরন্ত পথ, বেগে চালো রথ,
নেমির পেষণে তার,—
ভগ্ন মনোরথ যত হ'ক চুরমার।
উঠুক সে চূর্ণ হ'তে, পথে পথে শতে শতে,
হতাশ পরাণে জেগে নব মনোরথ,
গা'ক তব যশোগীতি আগুলিয়া পথ।
শুভ হেতু আগমন, হউক তোমার;—
এস, নববর্ষ, তবে, এসহে আবার।

(৯)

এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার,
তেজে উজলিয়া, তুলেছ ধরিয়া
কত 'জাপে' কতবার।
করিয়াছ গর্ব্বচূর্ণ কত রুশিয়ার!
কুম্ভকর্ণ দশাননে, কত শত দুর্য্যোধনে,
তোমার ও-খরস্রোত বয়ে লয়ে যায়,
কত বোনাপার্টি কত সীজারে ডুবায়!
দেখাও নূতন সৃষ্টি কি আছে গো আর
এস, নববর্ষ, তবে, এসহে আবার।

(১০)

এস, নববর্ষ, এস,—এস হে আবার।
শোণিত সঞ্চারে,　　গড়িয়া আঁধারে,
চাঁদ কোলে দাও মা'র;
প্রস্ফুট চন্দ্রমা যত কবলে তোমার।
শিশুর শৈশব-রঙ্গ, কৈশোরে কর গো ভঙ্গ,
যৌবন-বাসন্ত-শ্রীতে কিশোরে সাজাও
জরায়, সে কান্তি পুন কেড়ে নিয়ে যাও
হাসি সনে অশ্রু,　　হুলু সহ হাহাকার,
নিত্যপথ-পরিচয় করে গো তোমার।

(১১)

এস, নববর্ষ, এস,—এসহে আবার।
সাবিত্রী, সে সীতা,　　সে নল-দয়িতা,—
পুণ্যজ্যোতি অমরার
আনো ধরা মাঝে ঢালো জোছনা আবার।
পার যদি আনো তবে শ্রীরাম ফিরা'য়ে ভবে,
যুধিষ্ঠিরে সশরীরে ভূস্বর্গে পাঠাও;
পার যদি ভীমার্জ্জুনে আবার দেখাও।
কর ব্যাস বাল্মীকিতে জীবন সঞ্চার;—
এস, নববর্ষ, তবে এসহে আবার।

(১২)

এস, নববর্ষ, এস,—এসহে আবার।
সত্যের চরণে,　　শিখাও কেমনে,
দিতে হয় উপহার,
প্রাণ, মন, হিয়া ছিঁড়ে,—জান যদি আর,
কও কোন্ মন্ত্র বলে,　দয়ায় পাষাণ গলে,
প্রীতির প্রবাহ কি সে বহে গো উজান,
শিখাও কেমনে দেয় স্বার্থে বলিদান।
বহাও মরুর বক্ষে জাহ্নবীর ধার;—
এস, নববর্ষ, তবে, এসহে আবার।

শ্রী——সু

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

আমরা এতদূরে আসিয়া, সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের মৌলিক একত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি একবার একত্র সংগৃহীত করিয়া দেখা আবশ্যক। বৌদ্ধদর্শন, হিন্দুদর্শনেরই একটি অংশ এবং তাহা হইতেই সংগৃহীত, এ কথা আমরা এই মৌলিক ঐক্য প্রদর্শন দ্বারাই, একরূপ বলিয়াছি। তবে যে, শঙ্করাচার্য্য, বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ ও নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানবাদের প্রতিকূলে যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ,—শঙ্করাচার্য্য যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ের অবস্থাটি পর্য্যালোচনা করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশগুলি কালান্তরে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকসমূহ, তাঁহার উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে কেবল শূন্যবাদ ও কেবল বিজ্ঞানবাদ স্থাপন করিয়া, তাহাই বুদ্ধদেবের নামে চালাইতেছিল। শঙ্করের প্রতিকূল তর্কযুক্তগুলি, সেই পরবর্ত্তি-বিকৃত মতবাদকে লক্ষ্য করিয়াই সাংখ্যমত সম্বন্ধেও আমাদের তাহাই ধারণা। নতুবা,

তাঁহার নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে,যখন বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনেরও প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ বিরোধ নাই, তখন তিনি সে বিষয়ের প্রতিকূলে তর্কাস্ত্র গ্রহণ করিবেন কেন? আমাদের যাহা অভিমত, তাহা আমরা এতদিন দেখাইলাম। উপনিষদ্ই ভারতীয় দার্শনিক মত সকলের মূল ভিত্তি। সেই মূল প্রস্রবণ হইতেই, প্রকাণ্ড তিনটি ধারা নির্গত হইয়া, তিন বিশাল স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছে। মূলতঃ অনৈক্য হইবে কেন? যিনি যে অংশ লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সে অংশেই জোর দিয়া, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই সকল বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিবার জন্যই, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্নতা লক্ষিত হয়, এই মাত্র।

বুদ্ধের যাহা "শূন্যবাদ", তাহাই বেদান্তের "নির্গুণ-ব্রহ্ম" এবং তাহাই সাংখ্যের "প্রকৃতিবিনির্ম্মুক্তপুরুষ" বা "বিবেক-জ্ঞান"। সকলের মতেই, জাগতিক-জ্ঞান মাত্রই সম্বন্ধ-জ্ঞান। সকলের মতেই এই সম্বন্ধজ্ঞানময় জগৎ কেবলমাত্র প্রাতীতিক বা Phenomenal; ইহার অপর অংশ সকলের মতেই পারমার্থিক বা প্রকৃতসত্য। এই Phenomenal অংশের পরিহারের পদ্ধতি তিন দর্শনেই সমান। অবিদ্যানাশ সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য। এ সকল কথা আমরা এতদিন দেখিয়া আসিয়াছি। মাধ্যমিকদর্শন বলেন, কোন পদার্থেরই স্বাধীন-সত্ত্বা নাই, সমস্ত পদার্থই অন্য পদার্থের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে নিয়ত অবস্থিত। গুণ ও গুণী, উভয়েরই পৃথক্ স্বাধীন-সত্ত্বা নাই। কার্য্য ও কারণ, এ উভয়েরও পৃথক্ স্বাধীন সত্ত্বা নাই। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বর্ণ ও গুরুত্ব প্রভৃতি বাদ দিয়া বৃক্ষের পৃথক্ সত্ত্বা নাই; এ গুলি ছাড়িয়া, বৃক্ষের চিন্তা করা যায় না; এইগুলিই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। বৃক্ষত্ব না থাকিলে, বৃক্ষের সত্ত্বা লোপ পায়। আবার বৃক্ষ, কতকগুলি পূর্ব্ব-গত কারণ-সঙ্ঘের কার্য্য (Effect) মাত্র। সেই কারণ-পরম্পরা পরিত্যাগ কর, তোমার বৃক্ষজ্ঞানও উড়িয়া যাইবে। আবার বৃক্ষের বর্ণ, দৈর্ঘ্য, রূপ, রসাদিগুণ-নিবহ,—আলোক, জল, বায়ু প্রভৃতি কারণগুলির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বৃক্ষের গুণের সত্ত্বা, উহার কারণ-পরম্পরার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আবার আলোকাদি দৃশ্য-পদার্থ-নিচয়, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান Perception ছাড়িয়া দিলে থাকে না। তোমার ঐন্দ্রিয়িক দর্শন-শক্তি আছে বলিয়া, বৃক্ষের বর্ণ বুঝিতে পারিতেছ। এইরূপে, কোন জাগতিক বস্তুরই স্বাধীন সম্বন্ধ-বর্জ্জিত সত্ত্বা নাই। এইরূপ আবার সমবেত বিজ্ঞান-সমষ্টি ভিন্ন—সংস্কার-রাশি ভিন্ন—আত্মারও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। স্বাধীন সত্ত্বা নাই বলিয়া সকলই এক শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত। সকলেরই Conditional সত্ত্বা, কাহারই Absolute সত্ত্বা নাই। এই সম্বন্ধজ্ঞানই বস্তু-বোধের হেতুভূত। সম্বন্ধ-জ্ঞান বিলুপ্ত কর,—বিশ্ব বিলুপ্ত হইবে। আমাদের নিজের অস্তিত্বও অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এইরূপে যখন সমস্ত

বস্তুর বা বিশ্বের শূন্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আর কোন বিষয়ের জন্য বাসনা জন্মে না; তখন আর এই দুঃখ-বহুল বৈষয়িক ভোগসুখের প্রত্যাশায় লালায়িত হইতে হইবে না। এই সম্বন্ধ বা ভ্রম-জ্ঞানটির স্বরূপ ও মর্ম্ম উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া বুদ্ধের উদ্দেশ্য। নতুবা, আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃত-পক্ষে আত্মার উচ্ছেদ করা তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম নহে। এ তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত-ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বুদ্ধ যে ভাবে এই ভ্রমজ্ঞানের বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। এ অংশে তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালীদ্বারা, অতি সহজে হৃদয়ে ভ্রমজ্ঞান বা শূন্যতার উপলব্ধি হয়; সাংখ্য ও বেদান্তের প্রণালী, বৌদ্ধ-প্রণালী অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী হইয়াছিল না। ভ্রমজ্ঞানের ধারণা দূরীভূত হইলে, এক মহা-শূন্য—সম্বন্ধ-বর্জ্জিত অবস্থা আসিয়া পড়িবে। তাহাই শূন্যতা-প্রাপ্তি —তাহাই বৈদান্তিক ব্রহ্ম-লাভ,তাহাই সাংখ্যীয় বিবেক-জ্ঞান-লাভ। সাংখ্যের—"নাস্মিনমে নাহমিত্যপরিশেষং কেবল মুৎপদ্যতে জ্ঞানং," এবং বেদান্তের "নেতি-নেতি জ্ঞান" এবং বুদ্ধের উপদিষ্ট "মহাশূন্যতা"—এগুলি একই তত্ত্ব নহে কি? সর্ব্ববিধ জাগতিক ভোগবিকারময় সম্বন্ধ-বর্জ্জিত অবস্থাই এই শূন্যতার অপর নাম। যাঁহারা 'তথাগত'-পদবীতে আরূঢ় হইতে পারেন, বিশ্ব যে কেবল পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত, এই ধারণা যাঁহার অন্তরে দৃঢ়-মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশ্বের স্বাধীনসত্ত্বা যাঁহারা চিন্তা দ্বারা উড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন,—তাঁহাদের এই বর্ত্তমান জীবনেই "শূন্যতা" জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মার নিত্যতা স্বীকারে যে গৌতমবুদ্ধের অসম্মতি ছিল, এ কথা ভ্রম-বিজৃম্ভিত। এই শূন্যতাই তাঁহার সেই নিত্য-সত্ত্বা। ইহার শূন্যতা সংজ্ঞা দিয়া, তিনি পাণ্ডিত্য ও মহাজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছেন। জাগতিক বিষয়-সমূহের খণ্ড খণ্ড এক একটা পৃথক্ সত্ত্বা আছে; এই যে মানবজাতির একটা প্রকাণ্ড অপ-সংস্কার চিরকাল আছে, সেই ভ্রম দূঢ়রূপে প্রকটিত করিয়া দিতে হইলে, 'শূন্যতা' সংজ্ঞাই অধিক সঙ্গত। জগতের ও নিজের যে স্বাধীন সত্ত্বা নাই,—জগৎ ও আত্মা যে পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে চির-সূত্রিত, ইহা চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইলে, জগৎ ও আত্মার স্বাধীনসত্ত্বা যে শূন্য বা একান্ত মিথ্যা, ইহাই ত বৈজ্ঞানিক কথা। লোকে যাহাকে সুখদুঃখাদি বিবিধ-পরিণামি-অনুভূতিময় 'আত্মা' বলিয়া থাকে, সে আত্মা যে কেবল কএকটিমাত্র-বৎসর-পরিমিত কালেই আবদ্ধ নহে,—এ আত্মা যে চির-ঘূর্ণায়মান,—এ আত্মা যে কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—এই আবর্ত্ত বুঝাইতে হইলে,—আত্মার স্থিরতা বা ব্যক্তিনিষ্ঠত্বরূপ স্বাধীন-সত্ত্বার মিথ্যাত্ব বুঝাইতে হইলে,—এই মহা-শূন্যবাদই ত প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। এই গম্ভীর সর্ব্ব-শূন্যতার উপলব্ধিই ত মনুষ্যের পরম-পুরুষার্থ। এই শূন্যতা বা ব্রহ্মপদবীলাভই ত মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাকে

ভাব পদার্থও বলা যায় না, কেন না, ভাব-পদার্থ মাত্রই গুণাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট ও বি-নাশী, এবং ভাবপদার্থ মাত্রই সগুণ, সাবয়ব ও পরিণামী। ইহাকে অভাব-পদার্থও বলা যায় না; কেন না, অভাব-পদার্থও নিত্য হইতে পারে না। ভাবের ন্যায় অভাব ও অনিত্য পদার্থ মাত্র। ইহাকে সৎও বলা যায় না; কেন না, সম্বন্ধ-জ্ঞান বা অবিদ্যার ভ্রম চলিয়া গেলে যে অবস্থা আইসে, তাঁহাকে "থাকা" বা "না থাকা" কিছুই বলা যায় না। ইহা অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা। আর এক কথা, আমাদের অভাব-জ্ঞানের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে একটা বস্তুর বা সম্বন্ধের জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে। আবার ভাব ও অভাব, এই শব্দদ্বয় পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। কাজেই এই শূন্যাবস্থাকে অভাবও বলা যায় না। "ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা" (রত্নকূট সূত্র)। "যা চ শূন্যতা, অপ্রমেয়তা সা" (প্রজ্ঞাপারমিতা)। এ পদার্থকে বাক্য-মন দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এই শূন্যতা ও বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্ম-বাদ একই কথা। য-দ্বারা কোন সগুণ বা সাবয়ব পদার্থ ব্যঞ্জিত হয় না, তাহাই নির্গুণ, নিরাকার চৈতন্য পদার্থ। বুদ্ধের শূন্যতা দ্বারাও কোন জাতি-গুণাত্মক সাবয়ব পদার্থ ব্যঞ্জিত হয় না। ইহাতেও, নির্গুণ-ব্রহ্মের ন্যায়, কোন দেশ-কাল-বদ্ধ ক্রিয়াও প্রকাশ পায় না। এই জন্যই ইহা কেবল 'অভাব' নহে। আমরা অভাব বলিতে যাহা বুঝি, ইহা সেরূপ কোন Negative বস্তু নহে। "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে।" অতএব বৌদ্ধকে যে লোকে নাস্তিক বলে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইনি যখন শূন্যতা-লাভের জন্য এত উপদেশ দিয়াছেন, এবং শূন্যতালাভের জন্য সমাধি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন (প্রজ্ঞা-পারমিতা নামক গ্রন্থ দেখ), তখন এই শূন্যতালাভ ও ব্রহ্মলাভ প্রায় একই কথা দাঁড়াইতেছে। জগতের স্বাধীনসত্ত্বা লোপ করিতে গিয়া, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের সম্বন্ধাত্মকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া, বুদ্ধ যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একরূপ সর্ব্বাভাবাত্মক প্রতীয়মান হওয়ায়, লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে। আত্মার যদি তিনি পৃথক্, স্বা-ধীন সত্ত্বা ঘোষিত করিতে যান, তবে ত জগতের সকলই যে, সম্বন্ধজ্ঞানেই সত্ত্বা-বিশিষ্ট তাহা বুঝাইতে পারেন না। আত্মার স্বাধীন সত্ত্বা ঘোষণা করিলেই লোকে আত্মার জন্য, সুখদুঃখ বাসনা কামনাদি ভোগের সেবা করিবে, এই জন্য আত্মাকেও তিনি ধারা-বাহিক জ্ঞান-সমষ্টি-মাত্ররূপে ধারণা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, এইরূপ করাতে বুদ্ধ-দেবের প্রকাণ্ড অন্তস্তল-দর্শিতার ও কার্য্য-কারণ-সূত্রাভিজ্ঞতারই বি-শেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষার চারি যুগ।

পুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন অতি গুরুতর। সমাজের এক অঙ্গ পুরুষ, আর এক অঙ্গ স্ত্রী। একের অভাবে অন্য বাঁচে না,—তিলার্দ্ধকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। সমাজ-শরীর, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, শ্লথগ্রন্থি, অসার বস্তুর মত, ঢলিয়া পড়ে। যেমন একের অভাবে অন্যের অবস্থান সম্ভবে না, তেমন আবার একের অবিকাশ বা অপূর্ণ-বিকাশেও অন্যের উপযুক্তরূপ বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি লাভ ঘটে না। যে সমাজে পুরুষ শিক্ষিত, স্ত্রীলোক অশিক্ষিত,—পুরুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান-মার্জ্জিত ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক গারোপর্ব্বতের ধাঙ্গরী বা কিষ্কিন্ধ্যার বনচারিণী বানরী,—একার্দ্ধে জ্ঞানের আলোক, অপরার্দ্ধে অজ্ঞতার অন্ধকার; সে সমাজের পরিণাম কি, কাহাকেও তাহা বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

মানবীয় শক্তির বিকাশ ও উন্নতি চিরদিনই শিক্ষা সাপেক্ষ। বিনা শিক্ষায়, পুরুষ যেমন পুরুষরূপে ফুটিতে পারে না, স্ত্রীলোকও তেমন, বিনা শিক্ষায়, পুরুষার্থ-সাধিনী প্রকৃতিরূপে বিকশিত হইবার পথ প্রাপ্ত হয় না। এই হেতুই, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে, সকল কালেই, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

পুরুষ ও স্ত্রীর শিক্ষা, বিকাশ ও উন্নতি সর্ব্বাংশেই অন্যোন্য-প্রতীক্ষ। আমাদিগের গুরুরও গুরুস্থানীয় কোন প্রসিদ্ধনামা মনীষী কহিয়াছেন,—"ঠাকুরাণীর গর্ভেই ঠাকুরের উৎপত্তি হয়, দাসীর গর্ভে ঠাকুরের উদ্ভব কখনও সম্ভবপর নহে।" কথাটি বস্তুতঃ অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

রাবণের অন্তঃপুর, রূপসীর রূপের চমকে অহোরাত্র উল্লসিত ছিল। রাবণ, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বকুল হইতে রূপের জ্যোৎস্না বাছিয়া বাছিয়া আনিয়া, চাঁদনীর মালা গাঁথিয়া, পাপগ্রহ শনির ন্যায়, আপন কণ্ঠদেশে দোলায়িত রাখিয়াছিল। কিন্তু মেঘনাদের মত পুত্র-প্রসব, এক মন্দোদরী ভিন্ন, অন্য কোন রূপসীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

রাণী কৈকেয়ী, স্বরূপ ও সুরুচির প্রসাদে, রাজা দশরথের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ছিলেন। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইল। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ-সম্ভূত পায়সান্নও কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা, এই তিন প্রধানা মহিষীই ভাগ করিয়া ভোজন করিলেন;—কিন্তু তথাপি, কৌশল্যা ভিন্ন, রামের গর্ভধারিণী আর কেহই হইতে পারিলেন না।—সপত্নীর প্রতিও চিরস্নেহবতী ও আশীর্ব্বাদপরায়ণা, পর-দুঃখ-কাতরা, দয়াধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি, সাধ্বী কৌশল্যাই, রাম হেন জগদ্দুর্ল্লভ পুত্রের জন্মদায়িনী জননীরূপে জগতের নিকট পূজা পাইলেন।

যে রমণী রাজরাণী হইয়াও, পরার্থিনী প্রীতি ও প্রাণের সহানুভূতিতে, কাঙ্গালের কাঙ্গালিনী; এবং পথের কাঙ্গালিনী হইয়াও, হৃদয়ের মহিমায়, রাজরাজেশ্বরের জননী; যিনি বনবাসিনী, বিপন্না ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পর-মুখ-প্রেক্ষিণী হইয়াও, পরের পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ, আপনার প্রাণ-ধন পুত্র-রত্নকে, স্বয়মিচ্ছুরূপে ও অম্লানবদনে রাক্ষসের করাল কবলে উৎসর্গ করিয়া দিতে প্রস্তুত; যদি দয়াধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বাহু-বলের অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় আশ্রয় ভীম এবং নানা গুণালঙ্কৃত একদেহবদ্ধ মূর্ত্তিমান্ নরনারায়ণরূপী অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ মহিলাই তাঁহাদিগের উপযুক্ত জনয়িত্রী।

পৃথিবীর কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু একটি মন্দোদরী, কৌশল্যা বা কুন্তী, কত যুগযুগান্তব্যাপি কঠোরসাধনা,—দুশ্চর তপস্যা বা সৎশিক্ষার ফল, কেহ যদি তাহা ধারাবাহিকরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবার পথ পাইতেন, তাহা হইলে, নিশ্চিতই তিনি বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিতেন এবং শত জিহ্বায় সৎশিক্ষার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতেন।

কাব্যে কীর্ত্তিত, প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের পুরাতন প্রসঙ্গোক্ত পুরাতন নাম পরিত্যাগ করিয়া, যদি আধুনিক ঐতিহাসিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে,—ইহা শুধু কাব্যের কল্পনা নহে,—ইতিহাসের নিত্যপ্রতিপাদ্য প্রামাণিক কথা।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন অদ্বিতীয় বীরধর্ম্মী কর্ম্মবীর। নেপোলিয়ন জগদ্‌বিখ্যাত। কিন্তু যে আলোক-বর্ত্তিকা হইতে তদীয় প্রতিভার প্রবোহ উদ্ভূত এবং যাঁহার সঞ্জীবন-স্নেহ-পীযূষ-প্রক্ষেপে উহার ক্রমিক প্রস্ফুরণ হইয়াছিল, সেই জননীরূপিণী দুঃখিনী ভদ্রমহিলার প্রতি কাহারও চক্ষু আকৃষ্ট হয় নাই। অন্যের চক্ষু আকৃষ্ট না হইয়া থাকিলেও, নেপোলিয়ন চিরজীবনই সেই মহিমময়ী মাতৃদেবীর মধুর মূর্ত্তিখানি স্মৃতিপটে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বারংবার জননীকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে ও ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিয়াছেন,—"বিদ্যা, বুদ্ধি ও শিক্ষা, দীক্ষার যে কিছু সম্পদ্ নেপোলিয়ন পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই আমার স্নেহময়ী চরিত্রবতী ও সুশিক্ষিতা জননী লেটিটিয়ার প্রসাদাৎ।"*

নেপোলিয়ন, তদীয় বাল্যজীবনের "কা-

* "Napoleon, in particular, ever regarded his mother with the most profound respect and affection. He repeatedly declared that the family were entirely indebted to her for that plysical intellectual, and moral

হিনী বর্ণন উপলক্ষে আর এক স্থানে বলিয়াছেন।—

"আমরা পিতৃহীন হইলাম। মা কএকটি শিশু লইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।—না আছে কোন সহায়, না আছে কোন অবলম্ব বা আশ্রয়! মা সংসারের সমস্ত ভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার, স্ত্রীলোক হইলেও, এই গুরুভার বহনের উপযুক্ত শক্তি ছিল। তিনি সমস্ত ব্যাপারেই এতদূর শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন, এতদূর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সহিত সকল দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন যে, তাদৃক্ অনুষ্ঠান কোন স্ত্রীলোক হইতেই প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষতঃ, তাঁহার তখনকার সেই বয়সে, উহা অন্যত্র নিতান্তই অসম্ভব। তিনি প্রতিনিয়ত যেরূপ সতর্কতার সহিত আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তাহার তুলনা নাই। কোন নীচ ভাব বা অনুদার আসক্তি, ক্ষণকালও আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিত না। তিনি কোন অবস্থায়ই ঐরূপ কোন ভাবকে প্রশ্রয় পাইতে দিতেন না। তিনি উহার আভাস পাওয়া মাত্রই উহার মূল উৎপাটন করিয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন। যাহার সহিত মহত্ত্ব বা উচ্চ উদারতার সম্পর্ক নাই, তিনি এমন কোন বিষয়কেই আমাদিগের শিশু-বুদ্ধিতে ঠাঁই লইতে দিতেন না। অসত্য ব্যবহার ও অনৃত বাক্যপ্রয়োগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক গভীর ঘৃণা ছিল। শিশুদিগের প্রকৃতিতে তিনি অতি সামান্য বিষয়েও অবাধ্যতার ভাব সহ্য করিতে পারিতেন না। কোনরূপ অভাব, অপচয় বা আয়াসে, তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না। তিনি নীরবে সমস্ত সহিয়া লইতেন, নির্ভয়ে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে পুরুষোচিত ওজস্বিতা রমণী-জন-সুলভ মাধুরী ও মৃদুতার সহিত যেন সোনায় সোহাগায় মিলিয়া মিশিয়া ছিল। অহো! কি মহনীয়-প্রকৃতি মহিলা! তাঁহার মত জন জগতে আর কোথাও পাইব কি?" *

---

† "Left without guide, without support, says Napoleon, "my mother was obliged to take the direction of affairs upon herself. But the task was not above her strength. She managed every thing with a prudence which could neither have been expected from her sex nor from her age. Ah, what a woman! where shall we look for her equal? She watched over us with a solicitude unexampled. Every low sentiment, every ungenerous affection, was descouraged and discarded. She suffered nothing but that which was grand and elevated to take root in our youthful understandings. She abhorrd falsehood, and would not

traning, which prepared them to ascend the lofty summits of power to which they finally attained."

Abbott's Life of Napoleon.

নেপোলিয়নের মুখে এই সকল উক্তি শুনিয়াই পৃথিবী, গ্রাম্য অন্ধকারের আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া, লেটিটিয়াকে দেখিয়াছে। পৃথিবীর লোকে যখন লেটিটিয়াকে প্রথম দেখিতে পাইল, নেপোলিয়ন তখন সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্। নেপোলিয়ন পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেণ্টক্লাউডের (St. Cloud) বাগান বাটীতে জননী লেটিটিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সকলেই তখন নেপোলিয়নের প্রতি সম্রাট্-উচিত সম্মান প্রদর্শনার্থ কর-চুম্বন দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিত। নেপোলিয়ন, এই সাক্ষাৎকারের সময়, একটু আবদারের ভাবে, মায়ের দিকেও কর-চুম্বন লাভের প্রত্যাশায় কর প্রসারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জননী তাঁহার এই অনুচিত আবদারে সেই অবস্থায় ও সেই বয়সেও প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"না বাছা, ওটি হইতেছে না। তোমারই কর্ত্তব্য,—যাঁহার প্রসাদে তুমি পৃথিবী ও আলোর মুখ দেখিয়াছ, তুমিই সসম্ভ্রমে তাঁহার কর চুম্বন কর।" এই বলিয়া নিজের হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। পুত্রও নতজানু হইয়া জননীর কর চুম্বন করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিলেন। পৃথিবী এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে শতবার নমস্কার করিয়াছে, ও আনন্দ-গদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়াছে,—"হাঁ—ঈদৃশ রমণী রত্নই নেপোলিয়নের ন্যায় পুত্র অঙ্কে ধারণ করিবার যোগ্য পাত্রী বটে।"

আমেরিকার একটি বালক একদিন নদীতটে খেলা করিতে করিতে দেখিতে পাইল,—অদূরে একটা ক্ষুদ্র কচ্ছপ রোদের তাপে পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছে। বালক, দেখিবা মাত্রই লগুড় করে লইয়া দ্রুতগতি উহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল; এবং উহাকে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত লগুড় উত্তোলন করিল। কিন্তু মারিতে পারিল না। কি ভাবিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল; এবং হাতের লগুড় মাটীতে ফেলিয়া দিয়া, শিশু-জীবনের অদ্বিতীয় সুহৃৎ, সহায় ও সম্বল জননীর নিকটে দৌড়াইয়া আসিল। মায়ের কাছে আসিয়া বলিল,—"মা, আমি একটা ক্ষুদ্র কচ্ছপকে একই আঘাতে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত লগুড় উঠাইয়াছিলাম, কিন্তু মারিতে পারিলাম না। কে যেন আমার বুকের ভিতর হইতে কহিয়া উঠিল,—'আহা—হা—ওকি কর?—ওকে মারিও না। একি হইল, মা? কে আমাকে এমন করিয়া নিষেধ করিল?"

মা অমনি শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি যেমন সুশিক্ষিতা তেমনই ঈশ্বরপরায়ণা দেব-প্রকৃতিক রমণী। মা

---

tolerate the slightest act of disobedience. None of our faults were overlooked. Losses, privations, fatigue, had no effect upon her. She endured all, braved all. She had the energy of a man, combined with the gentleness and delicacy of a woman." Abbott's Life of Napoleon.

শিশুকে কোলে লইয়া, স্নেহার্দ্রহৃদয় ও অশ্রুপূর্ণনয়নে বারংবার তাহার কচি মুখখানি চুম্বন করিলেন, এবং বলিলেন,—"বাছা, আমি প্রতিদিন জানু পাত করিয়া যাঁহাকে ডাকি, উর্দ্ধনেত্রে তাকাইয়া যাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি, পৃথিবীতে মানুষ, পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গ, যাহা কিছু দেখিতে পাও, তৎসমস্তই, সেই ঈশ্বরের সন্তান। তুমি যেমন আমার প্রাণাধিক ধন। উহারাও তেমনই ঈশ্বরের প্রাণপ্রিয় স্নেহের বস্তু। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদিগের প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া থাকেন। তুমি আজি তাঁহার একটি জীবকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলে। তাই তিনি তোমার বুকের ভিতর হইতে তোমাকে প্রাণীহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি সকলকেই প্রতিনিয়ত, মন্দ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত, এই রূপে উপদেশ করিয়া থাকেন। যে সেই উপদেশ মানিয়া চলে, তিনি তাহাকে মায়ের মত কোলে আবরিয়া রাখেন। বাবা, তুমি চিরজীবন ঐ উপদেশ মানিয়া চলিও, দেখিবে তোমার কোন আপদ, বিপদ বা অমঙ্গল ঘটিবে না।" মায়ের উক্তিতে শিশুর প্রাণে যে ভক্তির অঙ্কুর স্ফুরিত হইল, শিশুর চক্ষে যে একটা নূতন জগৎ ফুটিয়া উঠিল,—জীবনে আর কখনও তাহা বিলুপ্ত বা অন্তর্হিত হইল না। ইহারই পরিপক্ক পরিণাম,—আমেরিকার পৃথ্বীবিশ্রুত ধর্ম্মবীর প্রাতঃস্মরণীয় থিওডোর পার্কার। জননী অমন না হইলে কি, এমন পুত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ কখনও সম্ভবপর হইত?

শচী জননী, গৌরাঙ্গ পুত্র। বঙ্গে, ইহার অন্যথাভাব কল্পনায় চিন্তা করিতে গেলেও বুদ্ধি স্বভাবের বৈপরীত্য-দর্শনে শিহরিয়া উঠে, কল্পনা জড়সড় ও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। বিলাস-বিলোলা কুবের-কান্তা, ইচ্ছা করিলে, রাজপথস্থিত ধূলিকণাকে স্বর্ণরেণু ও শিশিরবিন্দুকেও হীরকচূর্ণে পরিণত করিতে পারেন; মোহিনী তাঁহার মনোমোহন নয়ন-হিল্লোলে জিতেন্দ্রিয়, যোগীশ্বর শঙ্করকেও, প্রাকৃত জনের মত, পলকে পাগল বানাইয়া তুলিতে পারেন এবং রাজরাজেশ্বরীর ভ্রূভঙ্গিতে একসঙ্গে লক্ষ অসি উত্তোলিত, হিমাদ্রি অবনমিত ও সাগরের প্রলয়-কল্লোলও প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর কোন রাজরাজেশ্বরী, সমুদ্রমন্থনের কোন মোহিনী বা অলকাবিলাসিনী কোন কুবের-মহিষীরই সাধ্য নাই যে, নিমাইর মত পুত্রধনে অলঙ্কৃত হইতে পারেন। বস্তুতঃ পুত্র যেখানে নিমাই, মাও সেখানে, স্নেহ মমতা ও দয়ামায়ার প্রতিকৃতি পবিত্রহৃদয়া শচী। দুঃখিনী শচী যেখানে মা, পুত্রও সেইখানেই প্রেম ও ভক্তিরসে ঢলঢল সোনার পুতুল নিমাই।

এই সকল উচ্চশ্রেণীস্থ মহাপুরুষদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ লোকের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলেও, দেখা যাইবে যে, সুশিক্ষিত ও সদ্‌গুণান্বিত পিতা মাতার সন্তানই, সচরাচর উচ্চগুণে বিভূষিত হইয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া-

থাকে। এই হেতুই বলি, পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও সুশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন ব্যক্তিগত, তেমন সমাজ ও জাতিগত সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় ও উন্নতিই সুশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে, বোধ হয়, সভ্যজগতের কোথাও এক্ষণ আর মতদ্বৈধ বা বিবাদ নাই। কিন্তু শিক্ষাগত পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ বিস্তর। নারীজাতির শিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয়, শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কুশিক্ষাও আবার তেমনই ভয়াবহ। নারীজাতির অশিক্ষা বা কুশিক্ষাজনিত বিষময় ফল যখন যে দেশে ফলিয়াছে, তখনই সে দেশের অধঃপাত ও সে জাতির অধোগতি ঘটিয়াছে; এবং এই বিষময় ফলের মারাত্মক স্বাদ-গ্রহণ করিয়া, অনেক সময়, মানুষ নারী-জাতির শিক্ষা বিষয়েই, হতশ্রদ্ধ, বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, ইহার ভূরিভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

সাধারণতঃ লেখা পড়া শিক্ষাকেই লোকে শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লয়। কিন্তু এই সংস্কার নিতান্তই ভ্রমাত্মক। শিক্ষার অন্য দশটা পথ বা উপায়ের মধ্যে লেখা পড়াও একটা উপায় বা পথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। লেখা পড়া, শিক্ষার অন্যতর সাধন বা করণ মাত্র, নিষ্পাদ্য কর্ম্ম,—শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। রন্ধনের অন্যতর উপকরণ, ইন্ধনকে অন্ন বলিয়া বুঝিয়া লওয়াও বুদ্ধির যে বিড়ম্বনা, লেখা পড়াকে শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লওয়াও সেই বিড়ম্বনা। ভারতে প্রচলিত আজি কালিকার স্ত্রীশিক্ষার মূলে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের আধিপত্যই বিশেষভাবে প্রবল। বস্তুতঃ, লেখা পড়ার নাম শিক্ষা নহে;—যাহা দ্বারা শরীর, মনোবৃত্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির উপযুক্ত উন্মেষ হয়, তাহারই নাম শিক্ষা। উপযুক্তরূপ শরীর চালনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ-সংসর্গে বাস, সদুপদেশ শ্রবণ, সদৃষ্টান্ত দর্শন ও সদ্ বিষয়ের আলোচনা, শিক্ষারূপ মহা-সাধনার, এই সমস্তই প্রধান সাধন বা অঙ্গ। এই মহাসাধনায় পূর্ণাবয়বে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অল্পাধিক মাত্রায় এই সমস্ত অঙ্গেরই অনুসরণ কর্ত্তব্য।

ভারতের আর্য্যজাতি চিরদিনই শিক্ষার অনুরাগী এবং জ্ঞানতৃষ্ণায় প্রকৃত ভক্তিমান্ সাধকের প্রাণে আকুল ছিলেন। প্রাচীন আর্য্যজাতি, যেমন পুত্রের শিক্ষার জন্য বাল-ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কন্যার শিক্ষা বিষয়েও তেমনই সমুদার প্রাণে উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা, পুরুষের ন্যায়, স্ত্রীশিক্ষারও সর্ব্বান্তঃকরণে আদর করিতেন। এই হেতুই, ভারতীয় পুরাতন ব্যবস্থায় কন্যাও "পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" ইত্যাদি বচন সাদরে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতে অতি প্রাচীন সময় হইতে স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী চিরদিন একবিধ রহে নাই। স্থূলভাবে উহাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে

পারে। আমরা, এই প্রবন্ধে চারি যুগে প্রবহমানা চারি শ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রথমতঃ ঋষিযুগের প্রবর্ত্তিত স্ত্রীশিক্ষার কথাই বলিতেছি।

ভারতে প্রাচীন সময়ে যেরূপ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, স্ত্রীলোকদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা দান করা হইত, বোধ হয়, স্ত্রী-শিক্ষা ব্যাপারে তাদৃক্ মনোযোগবিধান ভারতে আর কখনও হয় নাই। কিন্তু, সেই ঋষিযুগে কি প্রণালীতে এই শিক্ষাকার্য্যের পরিচালনা হইত, তাহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঠিক্ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তখন স্ত্রীশিক্ষা বা (Female Education) সম্পর্কে কোন বার্ষিক রিপোর্ট বা মাসিক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। দেশে, কি প্রণালীর কতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল, কোন্ বিদ্যালয়ে কত ছাত্রী অধ্যয়ন করিত, কোন্ বৎসর, কোন্ পরীক্ষায়, কত সংখ্যক ছাত্রী উত্তীর্ণা হইত এবং সমগ্র নারীজাতির মোট সমষ্টি গণনায় উহার কত দশমিক ভগ্নাংশ শিক্ষা লাভ করিত, আধুনিক যুগের এই সকল অবান্তর আড়ম্বর প্রদর্শনে, সে সময়ে, কাহারও প্রবৃত্তি হইত না; অথবা এই সকলের তেরিজ বারিজ বা হিসাব রাখিবার নিমিত্তও কেহ তখন মাথা ঘামান আবশ্যক মনে করিতেন না। সুতরাং, তখনকার স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে এই শ্রেণীর কোন দলিল প্রমাণ উপস্থিত করা অসাধ্য। কিন্তু পুরাতন কাব্য ও পুরাণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যে এক একটা পূর্ণবিকশিত নারীচরিত্রের পুণ্যময় পবিত্র জ্যোতি, প্রস্ফুট চান্দ্রমসী জ্যোৎস্নার ন্যায়, বিলসিত রহিয়া, এখনও পৃথিবীর প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে, তৎসমস্তই যে তদানীন্তন স্ত্রী-শিক্ষার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হইবার যোগ্য; এবং ঐ সকল নারী চরিতই যে প্রাচীন সময়ে প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষার প্রকার, পরিমাণ ও প্রণালী সংক্রান্ত অকাট্য প্রমাণ বা জ্বলন্ত নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। বিনা শিক্ষায়, অমন নারীচরিত্রের বিকাশ সর্ব্বতোভাবেই অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। ইহা ছাড়া আরও কথা আছে। মৈত্রেয়ী ও গার্গী বৈবাহিক জীবনে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হইয়া, সংসারসুখ ও সন্তান-লালসা, চিরজীবনের তরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপে গৃহস্থ ব্রহ্মচারিণী হইয়া, পতিসহ বেদবেদান্তের আলোচনায় দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেন। শাস্ত্রে ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, অবশ্যই এই বাধার ব্যবস্থা তখনও এদেশে প্রণীত বা প্রচলিত হয় নাই।

স্মৃতি ও শ্রুতির যুগে, ভারতে লিপি-ব্যবসায়ের আদর ছিল না। থাকিলেও, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে লিপিকার্য্য প্রচলিত হয় নাই। লিখন ও পঠনের সহিত শিক্ষা কার্য্যের সম্পর্ক রাখা, তদানীন্তন সামাজি-

কেরা আবশ্যক মনে করিতেন না। গুরুমুখে শুনিয়া স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখাই তখনকার শিক্ষার সর্ব্বত্র প্রচলিত রীতি ছিল। এই হেতুই তখনকার বিদ্যার নাম স্মৃতি ও শ্রুতি। বলা বাহুল্য যে, তখন পুরুষের মত স্ত্রীলোকেরাও মুখে মুখে শুনিয়া শুনিয়াই শিক্ষা লাভ করিতেন।

কালক্রমে, অক্ষর-অঙ্কন বা লিপিকার্য্য সমাজে ব্যাপকরূপে প্রচলিত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণ লেখনী ধারণ আবশ্যক বোধ করিলে, পুরাতন বেদবেদান্ত,—শ্রুতি ও স্মৃতি ক্রমে লিপিবদ্ধ পুঁথিতে পরিণতি পাইল। ধীরে ধীরে কাব্য ও পুরাণাদিও রচিত ও লিখিত হইল। পুঁথি লিখিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, মৌখিক উপদেশের পরিবর্ত্তে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতিও ক্রমশঃ সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, লেখা পড়া, শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ বা মুখ্য উপায়রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, সুশিক্ষার প্রয়োজনে, লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। অতীত ঋষি ও জ্ঞানগুরু আচার্য্যদিগের উপাদেয় উপদেশমালা, পবিত্র ভাবনিচয় ও সুচিন্তাপ্রসূত দুর্ল্লভ রত্ননিবহ স্মৃতির অচিরস্থায়ী অরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে ক্ষরিত হইয়া, কালিকলমের প্রসাদে অনশ্বর অক্ষরপদ লাভ করিয়া পুঁথির পৃষ্ঠায় চিত্রিত হইয়া রহিল।

স্মৃতি ও শ্রুতির যুগে ভারতে কি প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তখন অতি উচ্চকল্পের শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইতেন, ইহাতে আর কোন সংশয়ের স্থল দৃষ্ট হইতেছে না। কারণ, সেই সময়েই ভারতক্ষেত্রে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মত রমণীরত্নের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ঋষিযুগের শিক্ষায় শিক্ষার উপকরণ বা বহিরাবরণ লইয়া আড়ম্বর ছিল না। তখনকার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য ছিল চরিত্র গঠন, পশুবৃত্তিকে ভাঙ্গিয়া পিটিয়া উহার উপরে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানযোগে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন। সুতরাং সে কালের স্ত্রী-শিক্ষায়ও তদনুরূপ ফলই ফলিয়াছিল।

লেখা পড়া শিক্ষাকার্য্যের অন্যতর প্রধান সাধনরূপে পরিগণিত হইলে, ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই যুগেই কলা বিদ্যা অর্থাৎ চিত্র, সীবন, ও নৃত্যগীতাদি স্ত্রী-শিক্ষার অঙ্গ হইয়া পড়ে; এবং শিক্ষাপ্রণালীর বহিরাবরণ অনেকটা মার্জ্জিত ও বিবিধ নয়ন-মনো-বিনোদন নূতন উপকরণ-সংযোগে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিরাটনন্দিনী উত্তরা বৃহন্নলার কাছে, নৃত্যগীত শিক্ষা করিতেন, মহাভারতোক্ত এই কথাই এই অবস্থার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ঋষিযুগের সেই সাত্ত্বিক শিক্ষার অঙ্গে, কালধর্ম্মে, এই সকল অলঙ্কার যোজিত হইয়া থাকিলেও, ভারতীয় শিক্ষাকার্য্যের মূল সূত্রটি অর্থাৎ চারিত্রিক বিকাশ ও অধ্যাত্ম উন্নতির ভাব তখনও সর্ব্বতোভাবে অব্যাহত ও

অক্ষুণ্ণ ছিল। কারণ, এই যুগেও ভারতবক্ষে বহু উন্নত হৃদয়া ও চরিত্রবতী মহিলার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সম্ভবতঃ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অনুসূয়া ও অরুন্ধতি প্রভৃতির মত জগতের আদর্শরূপিণী রমণী, ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্পৃক্ত এই দ্বিতীয় যুগেরই আভরণ।

কাব্য ও নাটকে সমাজের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন কাব্য ও নাটকের সাক্ষ্যে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন সময়ে, এ দেশে স্ত্রীলোকেরা রীতিমত লেখা পড়ার অনুশীলন করিতেন। ভবভূতি ও কালিদাস প্রভৃতি কবিদিগের রচিত কাব্য নাটক হইতে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। ভবভূতিকৃত উত্তরচরিত নাটকে দৃষ্ট হয়,—ঋষিবালিকা আত্রেয়ী, বাল্মীকির আশ্রম হইতে দাক্ষিণাভিমুখে অগস্ত্যের আশ্রমে যাইতেছিলেন। পথে বনদেবী বাসন্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। বনদেবী আত্রেয়ীকে কথাপ্রসঙ্গে বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে আত্রেয়ী বলিলেন যে, তিনি বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করিয়া, বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত অগস্ত্যের আশ্রমে চলিয়াছেন।* ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, স্ত্রীলোকেরা তখন রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন; এবং স্ত্রীলোকের পাঠ্য তালিকা হইতে বেদাদিও বর্জ্জিত ছিল না। কালিদাসের কুমারসম্ভবে আছে,—হিমাদ্রিশিখরবিলাসিনী অপ্সরাগণ, দ্রব-ধাতু-রসে অক্ষর যোজনা করিয়া ভূর্জ্জপত্রে প্রণয়পত্র রচনা করিতেন।† অভিজ্ঞান শকুন্তলায় দেখা যায়,—দুষ্মন্তের অদর্শনে বিরহক্লিষ্টা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে সম্ভাষণ করিয়া পদ্মদলে পত্র লিখিয়াছিলেন।

সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না থাকিলে, ভবভূতি ও কালিদাসের ন্যায় মহাকবির রচিত কাব্য ও নাটকে এরূপ বিষয়ের সমাবেশ কখনও সম্ভবপর হইত না। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই স্ত্রীশিক্ষা কোন্ সময়ের?—কবি, রাজা রামচন্দ্র ও দুষ্মন্ত প্রভৃতি নৃপতিনিবহের রাজত্ব কালীন সামাজিক রীতির অনুসরণেই ইহা লিখিয়াছেন,—না, তাঁহাদিগের আপনাদিগের সমসাময়িক সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই উক্তির অব-

* "বাসন্তী।—কাং পুনরত্র ভবতী মবগচ্ছামি।

তাপসী।—আত্রেয্যস্মি।

বাসন্তী।—আর্য্যে আত্রেয়ি কুতঃ পুনরিহাগম্যতে কিম্প্রয়োজনো বা দণ্ডকারণ্যপ্রচারঃ।

আত্রেয়ী।—অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকি পার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥"

† "ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র
ভূর্জ্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণা—
মনঙ্গলেখ ক্রিয়য়োপযোগম্॥

কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ ৭ম শ্লোক।

তারণা করিয়াছেন?—ইহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভবভূতি প্রভৃতির নাটকে সূত্রধার প্রভৃতির মুখে এইরূপ উক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়,—"চলুন এখন আমরা রাজা রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী হইয়া তদ্বৎ ব্যবহার দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করি।" এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যে, কবি, নাটক-রচনায়, রামচন্দ্র প্রভৃতির যুগে যে সামাজিক রীতি প্রচলিত ছিল, তাহারই অনুসরণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই উক্তির প্রতিকূল কোনরূপ আনুমানিক হেতুবাদে রাজা রামচন্দ্র ও দুষ্মন্তের সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা থ কা সম্পর্কে কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইলেও, ভবভূতি ও কালিদাসের সময়ে যে উহা খুবই প্রচলিত ছিল, তৎসম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতি ও কালিদাসের সময় অবশ্যই ভারতের সেই অতি পুরাতন ঋষিযুগ নহে। তাহা না হইলেও উহা যে হিন্দুযুগ, সুতরাং প্রাচীন সময়ের সহিত সম্পৃক্ত, তাহাতে আর কিছুমাত্র কথা নাই। এই সময়ে, স্ত্রীলোকেরা রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন; এবং হিন্দু রমণীকুলে,—ভারতের সারস্বত-কুঞ্জে মৈত্রেয়ী ও গার্গী না থাকিলেও, লীলাবতীর প্রতিভা স্ফুরিত হইতে পারিত ও রাজ-অন্তঃপুরে সীতা সাবিত্রীর দেখা না পাওয়া গেলেও, পদ্মিনীর মত স্বর্গসরোজিনীর বিকাশ সর্ব্বথা সম্ভবপর ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঃ——স্থ

হিন্দু জ্যোতিষ।

হোরাস্কন্ধ বা ফলিত-জ্যোতিষ।

হোরেত্যহোরাত্র বিকল্পমেকে বাঞ্ছন্তি পূর্ব্ব-
পরবর্ণ লোপাৎ।
কর্ম্মার্জ্জিতং পূর্ব্বভবে সদাদি যত্তস্য পংক্তিং
সমভিব্যনক্তি॥

কেহ বলেন,—'অহোরাত্র' বৃহজ্জাতক শব্দের পূর্ব্ব ও পরবর্ণ লোপ করিয়া 'হোরা' এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এই হোরাশাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্মের ফল নিরূপিত হয়।

সারাবলীতেও হোরা শব্দের উক্ত রূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। যথা—

আদ্যন্তবর্ণ লোপাৎ হোরাশাস্ত্রং ভবত্যহোরাত্রাৎ তৎপ্রতি বদ্ধাঃ সর্ব্বে গ্রহভগণা শ্চিন্ত্যতে যস্মাৎ।

গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে গ্রহ ভগণাদি গণনা করিয়া, হোরাশাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্মের ফল গণনা করা হইয়া থাকে। এইরূপে অদৃষ্ট গণনার প্রধান অবলম্বন এক দিকে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—এই সাতটি গ্রহের সঙ্গে চন্দ্রপাত-দ্বয় রাহু ও কেতু এবং অপর দিকে তদধিষ্ঠিত মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন—এই বারটি রাশি। গ্রহদিগের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র শুভ গ্রহ; রবি, মঙ্গল ও শনি পাপ গ্রহ; চন্দ্র শুক্লাষ্টমী হইতে কৃষ্ণা সপ্তমী পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে সময়ে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের অন্যূন অর্দ্ধাংশ দৃষ্টিগোচর হয় সেই সময়ে শুভ-গ্রহ; এবং অন্য সময়ে পাপ-গ্রহ। বুধ নিজে শুভ-গ্রহ; কিন্তু পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে পাপ-গ্রহ হয়। রাহু ও কেতু দুইটিই পাপ-ভাক্। সাধারণ ভাবে শুভগ্রহ সকল ভাল ফল, এবং পাপ-গ্রহ সকল মন্দ ফল প্রদান করে। কিন্তু, শুভ-গ্রহ যেমন মন্দ স্থানে কি মন্দভাবে থাকিলে মন্দ ফলের সূচক, তেমন পাপ-গ্রহও ভাল স্থানে কি ভাল ভাবে থাকিলে, শুভ ফলের সূচক হইয়া থাকে। পরাশর সংহিতাতে এতদ্ভিন্ন ধূম, চাপ ও পরিধিনামক আরও তিনটি অপ্রকাশ গ্রহের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, কে কোন্ রাশির অধিপতি, কাহার কিরূপ মূর্ত্তি, কে কোন্ জাতি, কে কোন্ গুণের অধিপতি, কে কোন্ রসের অধিপতি, কাহার কিরূপ বর্ণ ইত্যাদি সবিস্তার বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে আছে,—উহার আকার ত্রিকোণ, যুবা পুরুষ, উদার প্রকৃতি, পিত্ত প্রধান, ক্ষত্রিয় জাতি, অতীব চঞ্চল, কৃশোদর, রক্তগৌর বর্ণ, তমোগুণী, ক্রোধনস্বভাব, ক্রূর-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রতাপশালী, দক্ষিণ দিকের অধিপতি ইত্যাদি। রাশি সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। যেমন মেষ—মঙ্গলের গৃহ, রবির উচ্চ, শনির নীচ. পুরুষ, চর, অগ্নিরাশি, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, রক্তবর্ণ, উষ্ণ স্বভাব, পিত্ত-প্রধান প্রকৃতি, অতিশয় শব্দকারী, পর্ব্বতচারী, উগ্র, দিবসে বলবান্, পূর্ব্বদিকের অধিপতি, অল্প সন্তান, রুক্ষ বপু, ক্ষত্রিয়জাতি ইত্যাদি।

প্রতিদিন নভোমণ্ডল পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে এক এক বার আবর্ত্তিত হয়। বার রাশি যুক্ত সৌর কক্ষাও সেই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টাতে এক এক বার আবর্ত্তিত হয় বলিয়া, এক এক রাশি গড়ে ২ ঘণ্টা কাল ক্ষিতিজ বৃত্তের উপরে (On the horizon) অবস্থান করে। যে সময়ে যে রাশি পূর্ব্ব দিকে ক্ষিতিজ বৃত্তে থাকে, সেই সময়ে উক্ত রাশিকে লগ্ন (Ascendent) বলা যায়। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়, যে রাশি লগ্ন হয়, তাহা সতর্কতার সহিত গণনা করা আবশ্যক। ত্রিশ অংশাত্মক রাশিকে ক্রমে দুই ভাগ, তিন ভাগ, সাত ভাগ, নয় ভাগ, বার ভাগ, ত্রিশ ভাগ ইত্যাদিরূপে ভাগ করিয়া,উহার কোন্ ভাগ জন্ম সময়ে ক্ষিতিজ বৃত্তে ছিল, তাহা স্থির করিতে হয়। লগ্ন ও

উপরি উক্ত ভাগসকলের অধিপতি নির্ণয় করিয়া জাতক সম্বন্ধে শুভাশুভ ফল গণনা করা যায়। লগ্ন সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া তৎপরে উহার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে দ্বাদশ স্থান পর্য্যন্ত গণনা করিবে; অর্থাৎ প্রত্যেকের সীমা নির্দ্দেশ করিবে। জাতকের জন্ম লগ্ন হইতে দ্বাদশরাশি-গৃহে যে সমস্ত শুভাশুভ ফল কল্পনা করা যায়, তাহাকে ভাবোথ ফল কহে। যে ব্যক্তি এই ভাবোত্থফলের সম্যক্ বিচারে সমর্থ, তাহাকে ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলা যায়। উক্ত দ্বাদশ রাশি-গৃহকে ক্রমে লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তনু, ধন, সহজ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, জায়া, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় ভাব বলা যায়। উহার তনুভাবে সামর্থ্য ও শারীরিক সুস্থতা; ধন-ভাবে ধন-রত্নাদি ও কুটুম্ব; সহোদরভাবে ভ্রাতা, পরাক্রম ও সৌজন্য; বন্ধুভাবে সুহৃৎ, সুখ ও গৃহাদি; সুতভাবে পুত্র, বুদ্ধি, মন্ত্রণা ও বিদ্যা; শত্রুভাবে শত্রু, ব্রণ ও ক্ষতাদি; জায়াভাবে বিবাহ, পত্নী ও পথ; মৃত্যুভাবে দোষ, আয়ু ও মৃত্যু; ধর্ম্মভাবে গুরু, তপস্যা, ভাগ্য ও চিত্ত; কর্ম্মভাবে সম্মান, প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও কর্ম্ম; আয়ভাবে প্রাপ্তি ও আয়; এবং ব্যয়ভাবে অমাত্য ও ব্যয়। এই সকল বিষয়ে তন্বাদি ভাবগত রাশি, তাহার অধিপতি গ্রহ, তাহাতে যে যে গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকে, তাহা ভালরূপ বিচার করিয়া ফল বলিতে হয়। জন্ম সময়ে যে নক্ষত্রে চন্দ্র থাকে তাহা হইতে জাতকের জীবনের কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ গ্রহের আধিপত্য অর্থাৎ দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা তাহা স্থির করিয়া উক্ত সকল ফল কোন্ সময়ে কার্য্যকরী হইবে তাহা বলিতে হয়।

জন্ম সময় বিশুদ্ধরূপে জানিয়া যেমন জাতকের লগ্নস্থানাদি গণনা করিয়া শুভাশুভ ফলের নির্দ্দেশ করা যায়, তেমন কেহ কেহ, কাহারও করতল এবং কপালের রেখাদি পরীক্ষা করিয়া, তাহার জন্মলগ্নাদি সকল বলিয়া থাকেন। ঘোটকাদির দন্ত, বৃক্ষাদির গ্রন্থি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া যদি সূক্ষ্মরূপে উহাদিগের বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়, তবে মনুষ্যের হস্ত পদাদির রেখা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের বয়স স্থির করা অসম্ভব বোধ হয় না। বয়স সূক্ষ্মরূপে স্থির হইলেই জন্ম সময় জানা যায়। সুতরাং তখন লগ্ন ও গ্রহের অবস্থান নির্দ্ধারণ করা সাধারণ গণনা দ্বারাই হইতে পারে। যে শাস্ত্রদ্বারা হস্ত, পদ, কপাল প্রভৃতির রেখা পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যজীবনের শুভাশুভ ফল বলা যায়, তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র বলে। উহাও জ্যোতিষের অন্তর্গত।

মিশ্র স্কন্ধ।

গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে পঞ্জিকা গণনা করিয়া তদনুসারে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, যাত্রা প্রভৃতির শুভদিন ও শুভক্ষণ স্থির করা এবং প্রশ্নবিষয়ক শুভাশুভ ফল গণনা করা এই শাখার অন্তর্গত। পঞ্জিকাতে পূর্ব্বে পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ বার, তিথি,

নক্ষত্র, করণ ও যোগ উল্লেখ করা হইত, এজন্য উহাকে পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা বলা যায়। শ্রীরামপুরে পঞ্জিকা ছাপা আরম্ভ হওয়ার পরে, এইক্ষণ পঞ্জিকাতে জ্যোতিষের বচন, শুভদিনের নির্ঘণ্ট, দৈনিক গ্রহস্ফুট প্রভৃতি জ্যোতিষিক বিষয় সকল ব্যতীত ডাক ঘরের সংবাদ, রেলের সংবাদ, ষ্টিমারের সংবাদ, রেজেষ্টরী করার খরচ, মোকদ্দমার খরচ, দলিলে কত ষ্টাম্প দিতে হয় ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ পঞ্জিকাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্জিকার মূল পাঁচটি বিষয় বার, তিথি, নক্ষত্র, কারণ ও যোগ। ইহার মধ্যে, বার গণনা করার প্রণালী এইঃ—এক অহোরাত্রে ২৪ হোরা বা ঘণ্টা। গ্রহগণ মধ্যে শনিই পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে অবস্থিত। শনি হইতে আরম্ভ করিয়া দূরত্ব অনুসারে গ্রহ দিগকে বসাইলে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র এরূপ হয়। ইহাদিগের প্রত্যেক গ্রহকে পর পর হোরার অধিপতি মনে করিলে, কোন দিন শনি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম, অষ্টম, পঞ্চদশ ও দ্বাবিংশ হোরার অধিপতি শনি; দ্বিতীয় নবম, ষোড়শ ও ত্রয়বিংশ হোরার অধিপতি বৃহস্পতি; তৃতীয়, দশম, সপ্তদশ ও চতুর্ব্বিংশ হোরার অধিপতি মঙ্গল; চতুর্থ, একাদশ, অষ্টাদশ ও পঞ্চবিংশ হোরার অধিপতি রবি ইত্যাদি। পঞ্চবিংশ হোরাই পরদিনের প্রথম হোরা; সুতরাং কোন দিন প্রথম হোরার অধিপতি শনি হইলে, তৎপর দিন প্রথম হোরার অধিপতি শনি হইতে চতুর্থ গ্রহ রবি, তৎপর দিন প্রথম হোরার অধিপতি রবি হইতে চতুর্থ গ্রহ চন্দ্র, তৎপর দিন চন্দ্র হইতে চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল; তৎপর দিন মঙ্গমঙ্গলের চতুর্থ বুধ, তৎপর দিন বুধের চতুর্থ বৃহস্পতি, তৎপর দিন বৃহস্পতির চতুর্থ শুক্র এবং তৎপর দিন শুক্রের চতুর্থ পুনঃ শনি। সুতরাং যে দিন প্রথম হোরার অধিপতি যে গ্রহ, তাহাকে সেই গ্রহের বার বলিলে, বার গণনার ক্রম শনি, রবি, চন্দ্র বা সোম, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র হইয়া থাকে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, পৃথিবী হইতে গ্রহদিগের আপেক্ষিক দূরতা অবলম্বন করিয়াই বারের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল।

নক্ষত্র কেবল চন্দ্রস্ফুট হইতে গণনা করিতে হয়। সৌর-কক্ষা যে অশ্বিন্যাদি ২৭টি নক্ষত্রে বিভক্ত করা হইয়াছে, উহার যে নক্ষত্রভাগে চন্দ্র যতক্ষণ অবস্থান করে, তাহাকে সেই নক্ষত্র বলা যায়।

তিথি, যোগ ও করণ এই তিনটি অঙ্গই রাশিচক্রে সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থান হইতে গণনা করা হয়। চন্দ্রস্ফুট হইতে সূর্য্যস্ফুটের যে অন্তর অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র হইতে সূর্য্যের যে দূরতা, তাহার প্রত্যেক ১২ অংশকে এক এক তিথি বলা যায়। তিথিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক এক ভাগকে করণ বলে। চন্দ্রস্ফুট ও সূর্য্যস্ফুট একত্র যোগ করিয়া ৩৬০ অংশের অধিক হইলে, ৩৬০ অংশ ত্যাগ করিয়া সমষ্টির প্রত্যেক ১৩ অংশ ২০ কলাকে এক এক যোগ

বলা যায়। সমস্তে মোট, ভিন্ন ভিন্ন ৩০তিথি ২৭ যোগ এবং ১১ করণ।

এই পাঁচটী অঙ্গ নিয়াই শুভাশুভ দিন ও ক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। ইহার কোন্‌টি শুভ ও কোন্‌টি অশুভ এবং কার্য্যবিশেষের জন্য কোন্‌টি প্রশস্ত ও কোন্‌টি অপ্রশস্ত, ইহাই বিচার করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন মলমাস এবং বৃহস্পতি ও শুক্রের বাল্য, বৃদ্ধ ও অস্ত বিচার দ্বারা কালাকাল স্থির করিতে হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র সূর্য্যের সন্নিকৃষ্ট হইলে আর তাহাদিগকে দেখা যায় না, ইহাকেই অস্ত বলে। তাহার পূর্ব্বে কিছুকাল বৃদ্ধ এবং পুনরুদয়ের পরে কিছুকাল বালক বলা যায়। আজ কাল এজন্য আর দৈবজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। কারণ এ সকল বিষয় বিচার করিয়া পঞ্জিকাতেই সকল পরিষ্কার লেখা থাকে। তবে কি না, গণনার ফল দৃক্‌প্রত্যয় সিদ্ধ হয় কি না তাহার বিচার কেহই করেন না। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা লিখিলেন,—১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রের মহাস্ত ; কিন্তু আমি ১৮ই জ্যৈষ্ঠও শুক্রকে স্বচক্ষে দেখিলাম। লিখিত বিষয় ঠিক হইল কি না কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

আজকাল পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য চতুর্দ্দিকেই কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে, মহারাজা জয়সিংহ তিনটি মানমন্দির প্রস্তুত করাইয়া, পঞ্জিকা সংস্কারের চেষ্টা করেন এবং এখনও জয়পুর হইতে জয়বিনোদ সারণীর সাহায্যে একখান দৃক্‌-প্রত্যয়-সিদ্ধ পঞ্জিকা বাহির হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং এখনও চন্দ্রদেব শাস্ত্রী ও বিনায়ক শাস্ত্রী প্রমুখ তাঁহার ছাত্রগণ একপ্রকার সংস্কৃত পঞ্জিকা প্রচার করিতেছেন। সংস্কৃত কালেজের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহোদয় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে গিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করেন ; এবং দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়াই পঞ্জিকা গণনা করা যে শাস্ত্রের অভিপ্রায়, তাহার বহুল প্রমাণ সহ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্‌যোগে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত নামক একখানা দৃক্‌প্রত্যয়-সিদ্ধ পঞ্জিকা প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে বাহির করিতেছেন। উড়িষ্যাতে অনেকদিন যাবৎ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মহাপাত্র স্বকৃত সিদ্ধান্তদর্পণানুসারে গণিত একখানা দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা প্রতিবৎসর প্রচারিত করিতেছেন এবং তদনুসারে উড়িষ্যাপ্রদেশে সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঢাকা হইতেও দুই বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতিরত্ন-দ্বারা গণিত দৃক্‌সিদ্ধ বঙ্গ পঞ্জিকা নামক একখানা পঞ্জিকা ত্রিপুরাধিপতির সাহায্যে প্রকাশিত হইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে পঞ্চাঙ্গ-পরিষৎ নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথা

হইতে তিন জন প্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া দ্বারকাপীঠাধীশ শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য উক্ত সভার সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে, গত ২০শে নবেম্বর তারিখে সংস্কৃত কালেজ গৃহে এক সভা হয়। ডাক্তর সার্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই সভাতে বঙ্গদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হওয়ার জন্য কতিপয় ডেলিগেট নিযুক্ত হন।*

পঞ্জিকা সংস্কার যে আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু,বিষয়টি অতীব গুরুতর। আজকাল ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকাতে একাদশীর উপবাসের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দিনে দেখা যায়। ইহাতে বিধবাদিগের মনে যে কত কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা সহজ অনুমেয়। এমন কি কেহ কেহ দুই দিনই উপবাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

আবার সন্ধিপূজার সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকার ভিন্ন ভিন্ন মত। ইহাতে বাস্তবিক ভক্তিমান হিন্দুদিগের মনের ভাব কিরূপ হইয়া থাকে,তাহা হিন্দুমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

পঞ্জিকা সংস্কার করা আবশ্যক, ইহা স্থির হইলেও সংস্কারের প্রণালী সম্বন্ধে বহু গণ্ডগোল। যদি সায়ন মতে সংস্কার করা হয়, তবে ৯ই চৈত্র হইবে ১লা বৈশাখ। সুতরাং আরম্ভকালে বৎসর হইতে ২২ দিন পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে গ্রেসরিয়ান্ মত প্রবর্ত্তিত করার সময় ১১ দিন ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা রাজার আদেশ অনুসারে হইয়াছিল, এবং তাহাতেও অনেক গোল বাঁধিয়াছিল। আমাদের পক্ষে উক্তরূপ রাজাজ্ঞা অসম্ভব। তবে কি না, একমাস হইতে ২২ দিন ছাড়িয়া না দিয়া, প্রত্যেক মাস প্রায় দুই দিন করিয়া কমাইলে বোধ হয় বেশী গোল হয় না। এ বিষয়ে দেশীয় পণ্ডিতগণ এবং দেবমন্দিরের মোহান্তগণ যত্ন না করিলে, কিছু হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। যখন আন্দোলন উপস্থিত

* বঙ্গদেশ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হরিনাথ বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ,শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি, শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম,এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এবং এই প্রবন্ধ লেখক উক্ত বোম্বাই সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় পঞ্জাব, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী, নাগপুর, উজ্জয়িনী, বরোদা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে অন্যূন দুই শত পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। বরোদার মহারাজ গুইকুমারও সভাতে আসিয়াছিলেন। দৃগ্‌গণিত ঐক্য করা যে আবশ্যক, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন।

হইয়াছে, তখন যাহা সত্য, তাহা এক দিন না এক দিন অবশ্যই পরিগৃহীত হইবে।

প্রশ্ন গণনা, অদৃষ্ট গণনারই অনুরূপ। যে সময়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, ঠিক্ জাতকের কোষ্ঠীগণনার ন্যায়, সেই সময়ের লগ্ন স্থির করিয়া তনু, ধন প্রভৃতি দ্বাদশটি ভাবগৃহ স্থির করিতে হয়। পরে সেই সকল ভাবের রাশি তদবস্থিত গ্রহ, তাহাদিগের অবস্থা দৃষ্টি প্রভৃতি, সবিশেষ বিচার করিয়া শুভাশুভ ফল বলিতে হয়। লোক যেরূপ অদৃষ্ট জানিবার জন্য ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ জানিবার জন্যও ঠিক্ সেইরূপ। সুতরাং প্রশ্ন গণনা কেবল গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ না করিয়া, অন্যান্য বহু প্রণালীর আবিষ্কার করা হইয়াছে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় যে যে শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তাহার বর্ণ গণনা করিয়া শুভাশুভ ফল নির্দ্ধারণ করা যায়। যে শাস্ত্র দ্বারা প্রশ্নের বর্ণগুলি গণনা করিয়া ফল বলা হয়, তাহাকে কেরলী বলে। পাশা নিক্ষেপ করিয়া তাহার চিহ্ণ গণনা পূর্ব্বক শুভাশুভ ফল নির্দ্ধারণ করার যে প্রণালী তাহাকে পাশা কেরলী, বা রমল পাঞ্জি বলা যায়। বর্ণমালার সকল অক্ষরগুলিকে অ, ই, উ, এ, ও এই পাঁচটি স্বরের অন্তর্গত করিয়া, প্রশ্নের শুভাশুভ ফল বিচার করার প্রণালীকে বর্ণস্বরোদয় শাস্ত্র বলে। উক্ত পঞ্চ স্বরের সহিত শ্যেন, পেঁচক কাক, কুক্কুট ও ময়ূর এই পাঁচটি পক্ষী নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া, গণনাপ্রণালীকে পঞ্চপক্ষী বলে। কেবল কাকের শব্দ শুনিয়া শুভাশুভ ফল নির্দ্দেশ করাকে কাকচরিত্র বলা যায়। কেহ কেহ প্রশ্নকর্ত্তাকে ফুলের বা ফলের নাম করিতে বলেন এবং সেই ফুল বা ফলের নাম হইতে শুভাশুভ ফলের বিচার করিয়া বলিয়া দেন। কোন কোন গণৎকার একটি চক্র অঙ্কন করেন। তাহার কোন কোষ্ঠাতে প্রশ্নকর্ত্তাকে হাত দিতে বলেন এবং যে কোষ্ঠাতে হাত দেওয়া হয়, তাহা হইতে শুভাশুভ ফল বলিয়া দেন। উক্তরূপে আরও নানা প্রকারে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের ফলাফল বলিতে দেখা যায়। ইহার প্রত্যেক প্রণালীতেই দৈবজ্ঞ বিশুদ্ধ বেশে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুজাতি সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু, সকল বিষয়েই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে চাহেন। হিন্দুগণ মনে করেন, এ সকল প্রণালী তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানার জন্য বিভিন্ন উপায় মাত্র।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, উক্তরূপ প্রশ্ন গণনা এবং অদৃষ্টগণনার ফল ঠিক মিলে কি না? ছোটকাল হইতে এ বিষয়ে আমরা বহু আশ্চর্য্যজনক ঘটনার কথা শুনিয়া আসিতেছি। কোন দৈবজ্ঞ আগরতলার মহারাজের কোষ্ঠী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহারাজের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে। মহারাজ উক্ত দৈবজ্ঞকে সেই সময় পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। ফরাসীদেশীয় কোন রাণী তাহার স্বামীর নাম গোপন

করিয়া, তাঁহার কোষ্ঠী এক দৈবজ্ঞকে দেখান। দৈবজ্ঞ বলেন, এ ব্যক্তি শীঘ্র মল্ল যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করিবে। রাণী ইহা অসম্ভব মনে করিয়া হাস্য করিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ তাইকোব্রাহি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন রাজা ফিন্লণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জার্ম্মেণী ধ্বংস করিবে এবং ১৬৩২ সনে তাহার মৃত্যু হইবে। বাস্তবিক গাষ্টেভস্ আদল্ফস্ ফিন্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া জার্ম্মেণী ধ্বংস করেন এবং ১৬৩২ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংলণ্ডে গ্রীণউইচ-মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রথম রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাত্মা ফ্লেমষ্টীডের নিকট কোন প্রাচীনা মহিলা আসিয়া বলেন, তাহার কিছু আবশ্যকীয় জিনিস হারাইয়াছে, এবং তাহা কিরূপে পাওয়া যাইবে গণিয়া বলার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তিনি পারিবেন না বলিলে, উক্ত মহিলা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলেন। তখন রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ তাঁহার যষ্টি দ্বারা মহিলার বাড়ীর এক নক্সা করিয়া, তাহার কোন স্থানে যষ্টির অগ্রভাগ রাখিয়া বলিলেন, উক্ত স্থানে মৃত্তিকার নীচে জিনিস প্রোথিত রহিয়াছে। মহিলা বাস্তবিক সেই স্থান খনন করিয়া জিনিস পাইয়াছিলেন। ইত্যাদি বহু ঘটনা শ্রবণ করিলেও উক্ত রূপ গণনার ফল যে সর্ব্বদা ফলিতেছে না, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তথাপি কিন্তু, আমরা উক্ত রূপ গণনার জন্য আগ্রহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমরা যখন কোন কঠিন সমস্যাতে পড়িয়া নিতান্ত ব্যাকুল হই, তখন যদি কেহ কোন দৈব উপায়ে উহার সমাধান করিয়া ভবিষ্যতে কিরূপে চলিলে আমাদের মঙ্গল হইবে তাহার উপদেশ প্রদান করেন, তবে কি আমরা বাস্তবিক কথঞ্চিৎ উপশম অনুভব করি না? সুতরাং তজ্জন্য আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। এজন্যই রোমনগরের দৈবজ্ঞগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"Though often banished by the senate and Emperors under pain of death and other wise persecuted, they continued to hold their ground."

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা হোরা শাস্ত্র সত্য কি অলীক, ইহার কিছুই নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। অদৃষ্ট গণনা করা বিষয়টি অতি কঠিন। গণিত জ্যোতিষে সবিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিয়া গ্রহস্ফুট ও ভাবস্ফুট বিশুদ্ধরূপে গণনা করিতে হইবে; পরে প্রত্যেক ভাবে তাহার স্বামী [illegible] এবং অন্যান্য গ্রহের কিরূপ ক্রিয়া হইতেছে ও দৃষ্টি আছে, তাহা সূক্ষ্মরূপে গণনা করিবে, এবং প্রত্যেক গ্রহের বলাবল বিচার করিয়া ফল বলিতে হইবে। সেই ফলও দেশ কাল এবং পাত্রভেদে বিভিন্ন হইবে।

দেশ-কালাদি ভেদেন কুলজাত্যনুসারতঃ।
নিমিত্ত দিবসা চাপি হ্রাস বৃদ্ধি ফলংবদেৎ॥
মারিভয়ে মহাযুদ্ধে ত্রিদোৎপাতে সুদারুণে।
তদা মৃত্যুর্ণসন্দেহো যদি রিষ্ট দশানৃণাং॥

এই দেশ কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দেশ করার কারণ বোধ হয় পুরুষকার। হিন্দু-শাস্ত্র মতে সকল কার্য্যের প্রতিই দুইটি কারণ, অদৃষ্ট ও পুরুষকার। হোরা শাস্ত্রের গণনা দ্বারা অদৃষ্ট ঠিক ভাবে গণিত হইলেও পুরুষকার দ্বারা ফল অন্যরূপ হইতে পারে। সুতরাং পুরুষকার দ্বারা যে পরিমাণ ফলের তারতম্য হইতে পারে, তাহা দৈবেজ্ঞের অনুমান করিয়া বলিতে হইবে।

পুরুষকার ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কোষ্ঠীর ফল যে সর্ব্বদা মিলিবে না, তাহা শাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন। বৃহৎ পারাশরীয় হোরাতে আছে ;—

আয়ুশ্চ লোক যত্রাচ শাস্ত্রেহস্মিংস্তৎপ্রয়োজনং
নিশ্চেতুং তন্ন শক্লোতি বশিষ্ঠো বা বৃহস্পতিঃ।
কিং পুনর্ম্মনুজাস্তত্র বিশেষাত্তু কলৌযুগে॥

মহাভারতেও আছে ;—

শাকুনংশপথশ্চৈব জ্যোতিষঞ্চ চিকিৎসিতং
কলৌ চত্বারি রাজেন্দ্র ভবন্তি নভবন্তি চ।

সুতরাং কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করিয়া, সকল বিষয়েই সকলের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

শ্রীরাজকুমার সেন এম্. এ।

অভিশাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অমরনাথ বহির্বাটিতে চলিয়া গেলেন। লীলা বৌকে লইয়া আবার সাজাইতে বসিলেন। একখানি অল্প আর্দ্র গামছা দ্বারা মুখ খানি বেস করিয়া পুছিয়া দিলেন। কবরী বন্ধন পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া ছিল, এইক্ষণে একটি টিপ্ পরাইয়া দিলেন। যে কয়খানি অলঙ্কার উন্মোচিত ছিল, একে একে সকলগুলি পরাইয়া দিয়া, পরে উৎকৃষ্ট বেনারসী সাটি খানি পরাইয়া দিলেন। কুমুদ, দাসীকে ডাকিলেন ; ইত্যবসরে অমরনাথ পুনরায় আসিয়া বলিলেন,—"কি গো তোমাদের সাজান হ'ল ?"

লীলাবতী বলিলেন,—"হয়েচে,—এইবার নিয়ে যাও।"

লীলা তাহার বৌ-দিদিকে মৃদুস্বরে বলিয়া দিলেন,—"কোন দিকে চেয়োনা,—মুখটি নিচু করে বোসো। নাম জিজ্ঞাসা করলে আস্তে আস্তে বোলো। যদি টাকা দিতে আসে, তাহ'লে হাতে ক'রে নিয়ে প্রণাম কোরো।"

অমর ক'নেবৌকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন, আর একজনের জলখাবার প্রস্তুত করিতে বলিয়া গেলেন।

বৈঠকখানার পূর্ব্বধারের ঘর দুইটি সত্ত্য-

নের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; তথায় শচীকান্ত বাবু বা অপর কেহ বড় যান না। সত্যেন সেই প্রকোষ্ঠে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বসিয়া থাকেন। এই কক্ষে নবাগত বন্ধু অবিনাশ চন্দ্র, বিনোদলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসিয়া বিবাহের কথায় কালক্ষেপ করিতে-ছেন, অমরনাথ বৌকে সঙ্গে করিয়া আসিতে আসিতে সহাস্য বদনে বলিলেন,—"বিনোদ-বাবু এই নিন্, বৌ দিদিকে এনেছি।"

বিনোদ। অমরবাবু বলেন কি, আমি নোবো? দাদা তা হলে এখনি মার্‌বে।

"না সে ভয় নেই, দাদা হয়ত তেমন লোক পে'লে বৌদিদিকে বিলিয়ে দিতে পারেন!" অমর সত্যেনের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলি-লেন। সত্যেনও ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম বুঝিলেন কেবল অমর নাথ।

অমরের কথা শুনিয়া বিনোদবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"বটে, এমন কথা; কি দুঃখে বি-লিয়ে দেবে দাদা? আর দাওই যদি ত লোকের অভাব হবে না।

অবিনাশ বাবু।—বলি, ও বিনোদবাবু! আপনার বৌদিদি যে দাঁড়িয়ে র'ইলেন, বস্‌তে বলুন্।

সত্যেন।—বলত ভাই অবিনাশ, এটা কি রকম এটিকেট্? একটা লোক বিশেষ লেডী, দাঁড়িয়ে রইল, আর আমরা ব'সে গল্প কচ্চি।

বিনোদলাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া "ব'স ত বউ দিদি"—বলিয়া হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া বসাইলেন, এবং সত্যেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখো দাদা, যেন মনে মনে রাগ করো না।" তৎপর অবিনাশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অবিনাশ বাবু! দাদা আমার যে বৌ দিদিকে বিলিয়ে দি-বেন, তা একদিনের দেখাতেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে।"

অবিনাশ।—আমি তা অনেকই বুঝেছি; বিনোদ বাবু, বৌ দিদির কথা বলচেন কি, দুদিন পরে দাদাকে খুঁজে পাব কি তাই ভা-বচি। যাহো'ক বসানটা যে ঠিক হলো না।

সত্যেন।—বটে, অবিনাশ তবে নাকি কথা কইতে জান না?

বিনোদলাল।—"হঁা হঁা ভুল হয়েছে"—ব-লিয়া ক'নে বৌকে সত্যেনের পার্শ্বে বসাইতে গেলেন। সত্যেন্ "আমিই বস্‌চি"—বলিয়া উঠিয়া নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

অমর।—অবিনাশ বাবু কেমন বৌ হয়েছে বলুন।

অবিনাশ বাবু।—বৌ দিব্বি হয়েছে, যে লজ্জা, মুখ খানি ভালকরে দেখ্‌তেই পেলাম না।

সত্যেন্ নিজ হস্তে বধূর মাথার অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মুখটা একটু তুলে বস!"

অবিনাশ বাবু পকেট হইতে কএকটি রজতমুদ্রা বাহির করিয়া বলিলেন,—"নাও ত!" সত্যেন্ বলিলেন,—"ও আবার কি?" অবিনাশ বলিলেন "ও কিছু নয়।" সত্যেন্ আর কিছু বলিলেন না। বালিকা ধীরে হস্ত

পাতিয়া গ্রহণ করি... : এবং শিক্ষা মত অবনত মস্তকে প্রণাম করিল।

অবিনাশ।—নামটি কি শুনতে পাই না?

সত্যেন্।—পাবে কেন? তুমি জিজ্ঞাসা কর না।

অবিনাশ।...তে লজ্জা,—আমার কথার উত্তর দেবে কি?

বধূ পীর ...র মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল।

সত্যেন।—না আমিই বলছি, নামটি হচ্চে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী। কেমন নাম?

অবিনাশ বাবু।—যেমন মূর্ত্তি তেমনই নাম।

বিনোদলাল।—আচ্ছা দাদা, নামটা যদি হ'তো—পটলি, তা হলে কি হোত?

সত্যেন।—তা হলে অগ্রে নামটি পরিবর্ত্তন করিয়ে তার পর বিয়ে করতেম্। যা হোক্, এখন মহাশয়ের বৌ দেখা হলো কি? অনুমতি হয় ত বাড়ীর ভিতর যাক্, আর ঘাড় হেঁট করে কতক্ষণ থাকবে?

বিনোদ।—আমরা খেয়ে ফেলব না, দাদা আর ত দেখ্তে দেবে না?

অবিনাশ বাবু।—না বিনোদ বাবু, সত্যেনের প্রাণে ব্যথা লাগবে, নিয়ে যাক্।

কুমুদ বাহিরে ছিল অমর ডাকিয়া বলিলেন,—"কুমুদ বৌকে আস্তে আস্তে নিয়ে যাও।" দাসী হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

বিনোদলাল তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"দাদা, বৌদিদিকে একবার কোলে করলে না?"

সত্যেন।—সেটা হবে এখন।

বিনোদ।—হাঁ সে ত হবেই, আমরা ত আর দেখতে পাব না।

অবিনাশ বাবু।—হাঁ হে ফুলশয্যা কবে?

সত্যেন। ক'াল।

* * * * *

কথা কহিতে কহিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। অবিনাশ বাবুকে জলযোগ করান হইলে পর, তিনি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া বাটী গমন করিলেন।

ফুলশয্যার পূর্ব্বে, নববধূর সহিত একত্র রাত্রিবাসের প্রথা না থাকাতে, সত্যেন পূর্ব্ববৎ অদ্য একাকী শয়ন করিলেন। আর লীলা অদ্য নূতন বৌদিদিকে লইয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফুলশয্যা।

আজি সত্যেনের ফুলশয্যা। দাম্পত্য-জীবন-প্রবেশের সুবর্ণদ্বার, হিন্দু পরিণয়ের ফুলশয্যা যামিনী। যাহাকে লইয়া জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যাহার অভাবে সংসারের সৃজন অসম্ভব, পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধারের মূল যে, আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহায়রূপিণী সেই ধর্ম্মপত্নীর সহিত প্রথম আলাপ, প্রথম সম্ভাষণ,—প্রথম পরিচয়ের সময় ফুলশয্যা যামিনী।

সন্ধ্যা অতীত হইল, সমবেত রমণীমণ্ডলী আজি বর ক'নেকে লইয়া আমোদ করিবার

জন্য, সত্যেনের শয়নগৃহে ক'নেকে লইয়া বসিয়া আছেন। অদ্য মধ্যাহ্ণে সমারোহের সহিত পাক-স্পর্শ হইয়া গিয়াছে, রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবগণের প্রীতিভোজ আছে। বাটীর ভিতরের বারংবার ডাকাডাকিতে সত্যেন একবার অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন এক ঘর স্ত্রীলোক! কনে বৌ তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। সত্যেনকে দেখিয়াই একজন ঠাকুরমা সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিলেন,—"বলি ও বর, আজ এত পায়া ভারি কেন? তোমার কি এখন ওবাড়ীতে থাকিলে চলে? এস এই খানে বসো।" আর একজন পার্শ্ব হইতে বলিলেন—"কি ঠানদিদি হিংসে হচ্চে নাকি, তুমিও যে বর বল্‌চ।"

"না ভাই এখন কি ছুঁড়িদের ছেড়ে বুড়িদের আদর হবে?"

আর একজন কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সত্যেন্দ্রনাথ একটু ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন,—"আমার এখন কি করতে হবে বলুন ত?"

এক বৃদ্ধা বামা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"এই, গিন্নির কাছে শুতে হবে, না বল্লেও বাঁচি না!" অমনি দুই তিন জন সমবয়স্কা একত্র ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"মর, মর অরুচি, মাগি বুড়ো হয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েগেছে।"

"না, দেখ না আজ ফুলশয্যা কি কর্‌তে হবে উঁকে বলে দাও, শালা যেন ঘোঁড়ায় জিন দিয়ে এসেচেন! নাও এখন গিন্নিকে কোলে কর দেখি।"

সত্যেন্দ্রনাথ হাতদ্বয় উত্তোলিত করিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আর কোলে করে না।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—অমন টুকটুকে গিন্নিকে কোলে করবে না, তবে না হয় আমি বসি আমায় কোলে কর।" গৃহ মধ্যে একটা হাস্যরোল উঠিল।

এই ভাবে কথোপকথন চলিতে লাগিল। সকল কথা পাঠক পাঠিকাকে শুনাইবার আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কিছুক্ষণের পর, সত্যেন গৃহস্থ রমণীগণের বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহির্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"আজ আর বাসর ঘর থেকে বেরুতে নাই।" সত্যেন সে কথা শুনিলেন না।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবৃন্দের ভোজনাদি সমাপ্ত হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। সত্যেন্দ্রনাথ এইবার শয়ন করিবার মানসে নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এখন অন্তঃপুরে আর সে অবিশ্রান্ত কলরব নাই, প্রায় সকলেই নিদ্রিতা; কেবল দুই চারি জন প্রাচীনা ও সত্যেন্দ্রনাথের খুড়িমাতা এখনও বিনিদ্র আছেন। সত্যেন্দ্রনাথের আগমন মাত্র গৃহস্থিত একটি যুবতী ও ক'নেবউয়ের সহিত যে দাসী আসিয়াছিল, তাহারা গৃহান্তরে গমন করিল।

সত্যেন্দ্রনাথ দেখিলেন, আজি তাঁহার শয়নগৃহ বড়ই মনোরমরূপে সজ্জিত। বিবিধ জাতীয় সুগন্ধি পুষ্প ও আতর গোলা-

পের সহিত বিলাতী এসেন্সের সুমিষ্ট প্রাণ-মনোহারী সৌরভ মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব গন্ধে গৃহ আমোদিত। দুগ্ধফেন-নিভ শয্যার একপার্শ্বে তাঁহার শ্বশুরপ্রদত্ত কোঁচান ঢাকাই ধুতি, এক ডিবা পান, কএক ছড়া ফুলের মালা ও রাশীকৃত কুসুম। আর শয্যার উপর বিকচ-নলিনী তুল্য আর একটি অপূর্ব্ব কামিনীকুসুম। প্রকৃতি দেবীর নিজ হস্ত গঠিত কানন কুসুমগুলি বুঝি এ ফুলের নিকট ম্লানতর দেখাইতেছে। নিদ্রিতা বালার অনিন্দ্য সুন্দর অনুপম মুখমণ্ডলে দীপালোক পতিত হইয়া, মরি মরি কি সুন্দরই না দেখাইতেছে! বুঝি পৃথিবী, এ রত্নের উপযুক্ত স্থান নহে। হায়! এ স্বর্গীয় কুসুমের আঘ্রাণ কি এ হতভাগ্যকে বিভোর করিতে পারিবে? হয় ত বা সুশীতল-সমীরণ-স্পর্শে সরোজিনী সম, আমার সংস্পর্শে এই বালিকাও ম্লান হইয়া শুকাইয়া যাইবে। সত্যেন সুখ-সুপ্ত নব পরিণীতা সুন্দরী পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আর চ'খের জল রাখিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে একখানি কাষ্ঠাসনে আসিয়া বসিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে এই শুভদিনে কতই অশুভ কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল সত্যেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। দেওয়ালস্থিত ঘড়িতে টুং করিয়া একটি শব্দ হইল, তখন ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন একটা বাজিয়াছে। সত্যেনের চমক ভাঙ্গিল। এখন পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন আর সে ভাব নাই; বালিকা শয্যার একপার্শ্বে জড়সড় ভাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া শুইয়া আছে। চতুর্দ্দিকেই নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সত্যেন্দ্রনাথ উঠিয়া একবার বাতায়ন সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া সাসির ভিতর দিয়া, প্রকৃতির অন্ধকারের দিকে চাহিলেন, অন্ধকারের পরিবর্ত্তে নিজ কক্ষের আর একটি আলোকময় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে করিলেন, আমার হৃদয় যাহাতেই পরিপূর্ণ থাকুক, আজিকার শুভ রজনীতে পত্নীর সহিত কথা কহা উচিত।

সত্যেন্দ্রনাথ ধীরে শয্যাগ্রহণ করিলেন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন না, পুষ্প মাল্য স্পর্শ করিলেন না, তাম্বুল মুখে দিলেন না, ধীরে ধীরে স্ত্রীর পাশে শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরকোমলস্বরে ডাকিলেন,—"হিরণ্ময়ী!

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর দিলেন না। সত্যেন ভাবিলেন হয় ত হিরণ্ময়ী নিদ্রিতা, না—তাহা নহে। অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে মনে, হইল, হিরণ্ময়ী নিদ্রিতা নহে। সত্যেন পুনরায় ডাকিলেন,—"হিরণ্ময়ী!"

এইবার ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিল, —"কি।"

সত্যেন অল্পক্ষণ পরে বলিলেন,—"তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে?"

পুনরায় সেই ভাবে উত্তর হইল,—"না।"

হিরণ্ময়ী স্বামীর প্রশ্নের উত্তর, দুইটি কথায় সারিয়া দিল। সত্যেন এইবার কি

প্রশ্ন করিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কিয়ৎকালপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হিরণ্ময়ী তোমার ভাই কয়টি ?"

হিরণ্ময়ী বলিল,—"দুইটি।"

"তোমার বড়দাদার এখনও বিয়ে হয়নি, নয় ?"

"না।"

"কবে হবে ?"

"বোধ হয় এই ফাল্গুন মাসে।"

সতেন্দ্রনাথ এইবার হিরণ্ময়ীর হাতখানি লইয়া নিজ হস্তে রাখিয়া বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী আমার দিকে ফের।"

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর দিল না, বা পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিল না দেখিয়া, সত্যেন পুনরায় বলিলেন,—"আমার দিকে ফিরবে না—লজ্জা কি !"

হিরণ্ময়ী এবারও পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্রনাথ আর অনুরোধ না করিয়া অন্যকথা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া সত্যেন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী এখন ঘুমুবে কি ? সে বলিল,—"ঘুমুব"।

সত্যেন এইবার অনেক অনুরোধে পার্শ্ব-ফিরাইলেন। কিন্তু অদ্য মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিতে পারিলেন না। রাত্রি জাগরণে অসুখ হইবার আশঙ্কায় আর কথা-বার্ত্তা না কহিয়া পত্নীকে নিদ্রা যাইতে বলিলেন। হিরণ্ময়ীর কখন নিদ্রা আসিয়াছিল বলিতে পারি না। কিন্তু সত্যেনের নিদ্রা আসিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।

যখন সত্যেন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে। অরুণ কিরণ বাতায়নের সাসির মধ্যদিয়া প্রবেশ করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—শ্বেতপদ্মে কৃষ্ণ-ভ্রমরের ন্যায়, হিরণ্ময়ীর কৌমুদিপ্রতিমবর্ণ ক্ষুদ্র ললাটে, গাঢ়-কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তল-জাল বড় শোভা পাইতেছে। সত্যেন দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া-গেলেন, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে মুদিত-নয়না পত্নীর অধরে একটি চুম্বন করিলেন। হিরণ্ময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি মাথা মুখ চাপাদিল।

সত্যেন দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে গেলেন। ঠাকুরমা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"বলি, সমস্ত রাত্‌টাই কি জাগ্‌তে হয় ?"

নবম পরিচ্ছেদ।

আবার প্রাণ কাঁদিল।

সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল। যতদিন নববধূ বাটীতে থাকে, ততদিনই বিবাহ-বাটী থাকে। বধূ চলিয়া গেলে যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। হিরণ্ময়ী পাঁচ দিবসের জন্য স্বামীগৃহে বাস করিয়া বিবিধ বহু-মূল্য আভরণে ভূষিতা হইয়া, পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। বধূ চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়গণও স্ব স্ব গৃহে বিদায় হইলেন।

নহবৎ থামিল, আনন্দ কোলাহল ধুমধামের আপাততঃ অবসান হইল। বিনোদ বাবু অনেক দিন বাটী হইতে আসিয়াছেন, সত্যেনও অমরের আর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, বাটী চলিয়া গেলেন। সপ্তাহাধিক কাল অবিশ্রান্ত দিন-যামিনীব্যাপি আনন্দ উৎসবের পর, এক্ষণে রায় পরিবার যেন এক শূন্য ভাব ধারণ করিল। এই কয়দিনের পরিচয়ে সত্যেন্দ্র নাথ হিরণ্ময়ীর অভাবে আকুল হইলেন। তাঁহার সেই বিমল মুখ খানি দেখিবার জন্য,সত্যেনের হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। ভাবিলেন, হিরণ্ময়ীর সরল, সলজ্জ বাক্যহীন প্রেম কত মধুর, বুঝি ইহার সহিত মালতীর ভালবাসার তুলনা হয় না। ক্ষুদ্র যূথিকার সহিত মনোলোভা চম্পকের যে প্রভেদ, বুঝি হিরণ্ময়ীর সহিত মালতীরও সেই প্রভেদ; সে প্রভেদ অনুভব করা যায়, কিন্তু বুঝান যায় না।

সত্যেন্দ্র নাথ! সত্যই হিরণ্ময়ী দুর্লভ রমণী রত্ন। কিন্তু, তোমার এ মনোভাব রূপজ মোহ ও স্বভাবজ ভালবাসার সংমিশ্রণ মাত্র। এই ভাব কয়দিন তোমার হৃদয়ে থাকিবে?

কোন্ তৃষিত যুবক প্রথম দর্শন ও সম্ভাষণে, কোন্ সুন্দরী যুবতীকে না এই চক্ষে দেখিয়া থাকেন? নবজীবনে প্রবেশ করিয়া নব-বিবাহিত যুবক মনে মনে কত আশা, কত সুখময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করে। সে সকল কি মদিরাময়! কিন্তু হায়, মানব কল্পনায় স্বর্গসৃষ্টি করিলেও, তাহার কয়টি সফল হয়? মনোমত পত্নীলাভে সত্যেনের কৈশোর কল্পিত কল্পনাগুলির বিকাশের পথ প্রসর হইল।

অমরনাথ সত্যেনের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলেন।

হিরণ্ময়ীর বাপের বাড়ী যাইবার প্রায় দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার মনে আর অধিক ব্যাকুলতা নাই। অবশ্য হিরণ্ময়ীকে যে দেখিতে ইচ্ছা হয় না, এরূপ নহে; দেখিতে ইচ্ছা হয়, কথা কহিতে ইচ্ছা হয়, তবে সে হৃদয়ের শূন্যতা আর বিশেষ অনুভব হয় না। হিরণ্ময়ীকে একখানি পত্র লিখিবার ইচ্ছা হইলেও অপরে পাছে দেখিতে পায়, এইজন্য তাঁহার একটু লজ্জা বোধ হয়। এইটুকুই সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে এরূপ লজ্জার কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সত্যেনের মনে হিরণ্ময়ীর চিন্তার পরিবর্ত্তে মালতীর চিন্তা পুনরায় জাগরিত হইতে লাগিল। মালতী তাহার অদর্শনে আজি কত ব্যথা পাইতেছে, প্রতিমুহূর্ত্তে নিরাশার পীড়নে কতই না কাতরা হইতেছে! হিরণ্ময়ীকে এখনও বালিকা বলিলেই হয়। তাহার জ্ঞান হইতে এখনও বিলম্ব আছে। যদি শাস্ত্রমতে বিধবা বালা আমাদারাই নরকের পথে নীতা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা আমার পাপ। তাহার পরকালে নরকের কারণ যদি আ-

মিই হই, ইহকালে আমার সাধ্য থাকিতে তাহাকে অসীম যাতনানল হইতে রক্ষা না করায় কি পাপ নাই? আশাই মানুষের সুখ, আবার উহাই দুঃখের প্রধান কারণ। মালতীর আশাবহ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করা বা শীতল বারি সেচনে নির্ব্বাপিত করা, উভয়ই আমার সাধ্যাধীন। তবে, সে অনল নির্ব্বাপিত করিতে পারিলে, অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করি কেন?—এই ভাবের চিন্তায় সত্যেনের বর্ত্তমান দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে; এমন সময় মালতীর একখানি লিপি তাঁহার হস্তগত হইল। মালতীর অন্তরের কাতর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি সত্যেন যেন পত্রের প্রতি ছত্রে শুনিতে লাগিলেন। মালতীর জন্ম আবার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি দেখিতে যাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের পর এক মাস কাটিয়া গেল। বড় দিন আসিয়া পড়িল। কলিকাতায় এখন নানাদেশীয় ক্রীড়া কৌতুক, নাচ তামাসা আসিয়াছে। রাজধানীতে বেড়াইতে যাইবার এই উপযুক্ত সময়। সত্যেন্দ্রনাথ সময় বুঝিয়া পিতৃব্যের নিকট কএক দিনের জন্য একবার কলিকাতায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শচীকান্ত বাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন মাত্র,—"কোথায় থাকিবে?"

সতেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"দেখি, বিনোদের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে, যদি যায় ত তাহাদের বাসায় থাকিব, না হয় মেসো মশায়দের বাসায় থাকিব।"

ছোটবাবু, শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিয়া দিয়া, কলিকাতায় যাইবার অনুমতি দিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পরদিন প্রাতেই কলিকাতায় বেড়াইতে—ওরফে মালতী সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

সাংখ্যদর্শন। *

ভূমিকা

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি বেদবাক্য পুরুষগণের পরস্পর অবৈধধর্ম্ম প্রদর্শন করিতেছে। আকাশের ন্যায় পুরুষের অখণ্ডত্ব প্রতিপাদন করা, ঐসকল শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। সেই শ্রুতির যথাযথ অববোধার্থ সদ্যুক্তিপূর্ণ উপদেশ-নিচয় প্রদান করিবার

* শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বিএল; এফ্, আর, জি, এস্ মহোদয় যখন "সাহিত্যসংহিতার" সম্পাদক ছিলেন, সেই সময় এই প্রবন্ধের অত্যল্পাংশ মাত্র উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে

জন্য এবং জীব-নিবহের দুঃখ-দূরীকরণ মানসে ভগবান্ নারায়ণ, মহর্ষি কপিলরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি।

অগ্নি এবং সূর্য্যদেবের ন্যায়, যে পরমাত্মা উপাশ্রয় ভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন, আমরা সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সেই মহাচৈতন্যের উপাসনা করি।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি বেদবাক্যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, মোক্ষের সাধনীভূত আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, সেই শ্রবণাদির উপায়স্বরূপ কাহার অবলম্বন করিতে হইবে?—উত্তরে বলিতে হইবে যে, শ্রুতিবাক্য, যুক্তি এবং ধ্যান, এই তিনটিই যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে;—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবং॥

বেদবাক্য হইতে শ্রবণ, যুক্তি দ্বারা মনন, এবং মননান্তর যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সতত ধ্যান করিতে হইবে। এই তিনটিই আত্মসাক্ষাৎকারের কারণীভূত।

তন্মধ্যে বেদবাক্য হইতে শ্রুত পুরুষার্থ, পুরুষার্থের হেতুভূতজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত আত্মস্বরূপাদি সম্বন্ধে ভগবান্ কপিলদেব ষড়ধ্যায়ীরূপ বিবেকশাস্ত্র দ্বারা শ্রুতিসম্মত যুক্তিজাল প্রদর্শন করিয়াছেন। পদার্থের সংখ্যা নিরূপিত হয় বলিয়া এই বিবেক শাস্ত্রের নাম সাংখ্যশাস্ত্র। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে যস্মাৎপ্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানিচ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সংখ্যা অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মক্রমে চিদাত্মাতে প্রপঞ্চবিলাপন অথবা প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপাদন পূর্ব্বক, আত্মজ্ঞান সম্পাদন এবং প্রকৃতি ও অন্য চতুর্ব্বিংশৎ (চিদ্রূপ পুরুষ এবং প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত মহদাদি ত্রয়োবিংশৎজড়।) পদার্থ নিরূপণ করে বলিয়া সাংখ্য নামে অভিহিত হয়।

প্রবাদ আছে যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। এ প্রবাদ যে নিতান্ত মিথ্যা কিংবা অমূলক তাহা নহে। "মুক্ত বদ্ধয়োরন্যতরা ভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সাংখ্যকৃৎ নিরীশ্বরবাদেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে কি কপিলদেব বাস্তবিকই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন? না, তাহা নহে। অভ্যুপগমবাদ এবং প্রৌঢ়িবাদ অবলম্বন পূর্ব্বকই তিনি

অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রবন্ধও অবস্থত হয়। ইহার পরকীয়াংশ সর্ব্বথা পূর্ব্বাংশ সাপেক্ষ বলিয়া, এইক্ষণ পুনরায় প্রথমাবধিই মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। আশা করি, পাঠকগণ! ইহাতে কোনরূপ দোষ গ্রহণ করিবেন না। করিলেও সে দোষ আমারই,—'বান্ধবের' নহে। ইত্যলম্।

সাধারণতঃ ঈশ্বরের প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই ঈশ্বর প্রতিষেধ ব্যবহারিক। পারমার্থিক নহে। তবে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তিনি ব্যবহারিক প্রতিষেধই বা করিলেন কেন? এরূপ প্রতিষেধের উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্যই ঈশ্বরের ব্যবহারিক প্রতিষেধ করিয়াছেন। যদি ঐরূপ প্রতিষেধ না করিতেন, তবে, পরিপূর্ণ নিত্য-নির্দ্দোষ ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া, তাহাতেই সকলের চিত্ত আবিষ্ট হইত। তদ্রূপ চিত্তাবেশ নিবন্ধন বিবেকাভ্যাসের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই সাংখ্যাচার্য্য মহোদয় অভ্যুপগম ও প্রৌঢ়িবাদাদি অবলম্বন পূর্ব্বক, ঈশ্বরের ব্যবহারিক প্রতিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঈশ্বর নিরূপণ করা সাংখ্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। পুরুষার্থ এবং পুরুষার্থের সাধনীভূত প্রকৃতি পুরুষের বিবেকই এই শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। সুতরাং ঈশ্বরাংশে বাধ থাকিলেও সাংখ্যশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কোনরূপেই সঙ্গত নহে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, "তত্ত্বসমাস" নামক সাংখ্যদর্শন সত্ত্বেও এই ষড়াধ্যায়যুক্ত সাংখ্যদর্শন প্রণয়নের আবশ্যকতা কি? বরং ইহাতে পৌনরুক্ত্য ঘটিল। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে এরূপ বলা যায় না। কেন না, তত্ত্বসমাস গ্রন্থে, সংক্ষেপতঃ যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, ষড়ধ্যায়ীরূপ এই সাংখ্যদর্শনে সেই সকল বিষয়ই সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বসমাসোক্ত সংক্ষিপ্ত বিষয় সমূহ ইহাতে প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে বলিয়াই, ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন দর্শন কহে।

এই মোক্ষশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্ব্যূহ সমন্বিত। যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ভৈষজ্য এই চারিটি ব্যূহ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য; তদ্রূপ হেয়, হান, হেয়-হেতু এবং হানোপায় এই চতুর্ব্ব্যূহ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে ত্রিবিধ দুঃখ হেয়, সেই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ দ্বারা অবিবেককে হেয়-হেতু এবং বিবেক খ্যাতিকে হানোপায় কহে।

ভগবান্ কপিলদেব এই চতুর্ব্ব্যূহ সমন্বিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক সাংখ্যশাস্ত্র প্রথমতঃ আসুরিগোত্রসম্ভব জিজ্ঞাসমান জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর শিষ্য পরম্পরায় নানারূপে ইহার প্রচার হইয়াছে। ভগবান্ কপিলদেবই আদি বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং তৎপ্রণীত সাংখ্য দর্শন যে, সকল দর্শন অপেক্ষা প্রাচীনতম, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কেবল যে উহা প্রাচীনতম, তাহা নহে। যেমন প্রাচীনতম, তেমনই প্রধানতমও বটে। অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা, সাংখ্য দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব নানা রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। "সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ" প্রভৃতিবাক্যদ্বারা কপিলদেবের শ্রেষ্ঠতমত্ব প্রতিপাদিত হই-

য়াছে। পরন্তু, শ্রুতিস্মৃতিও এসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।"

"আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্ জ্ঞানৈ স্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥"

আদিতে জায়মান কপিল ঋষিকে যিনি উৎপাদন করিয়াছেন, এবং উৎপাদনানন্তর জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্যার্থও এই স্মৃতি বাক্যেই প্রকটিত হইয়াছে।

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ।"

ইত্যাদি; এবং—

"কপিলস্য সহোৎপন্নো ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্চর্য্যঞ্চেতি।"

"আজন্মসিদ্ধ আদিবিদ্বান্ কপিলঃ॥"

প্রভৃতি বাক্যও ভগবান্ কপিল দেবের শ্রেষ্ঠতমত্বের প্রতিপোষক। বিষ্ণুপুরাণাদিতেও তাঁহার বিষ্ণ্বতারত্বাদি নির্দ্দেশ দ্বারা বহুশঃ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈদৃশ শ্রেষ্ঠতম মহর্ষি কপিল দেবের বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রমাণ সংগ্রহে যত্নবান্ হওয়া বাহুল্যমাত্র। তথাপি, নিম্নে দুই একটি বাক্য বিবৃত হইল।

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ সমং বলম্।
অত্রবঃ সংশয়ো ভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥"

"পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

সাংখ্যজ্ঞানের সম জ্ঞান নাই, যোগবল তুল্য বল নাই। সাংখ্যজ্ঞান যে পরম-চরম জ্ঞান, তদ্বিষয়ে যে কাহারও সন্দেহ না হয়। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ; যে কোন আশ্রমবাসী, হউন, মুক্ত হইবেন, সংশয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ-
সাংখ্যশাস্ত্রী।

কবিসূক্তি।

প্রবল মোহেতে মন ডু'বে রহে যার,
সে ত নাহি বুঝে কভু শুভ আপনার;
মাথায় ফুলের মালা পড়িলে যেমন,
দূরে ফে'লে দেয় অন্ধ,—অহিশঙ্কা তার। . . . (কালিদাস)

সধবার বৈধব্য

অথবা

প্রেমের শ্মশান।

প্রকৃত ঘটনামূলক আখ্যায়িকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মে মাসের শেষ দিবস, লরা মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজি জুনের তৃতীয় সপ্তাহ পার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, লরা এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হয় নাই। উহার চৈতন্য জন্মিয়াছে,—বুদ্ধি স্থির হইয়াছে,—বিলুপ্তস্মৃতি আবার জাগরিত হইয়া মনের উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু, চলা ফেরা করিবার অথবা উঠিয়া বসিবারও তেমন শক্তি হয় নাই।

মূৰ্চ্ছা, সকল সময়ে বিপজ্জনক না হইলেও, কোন কোন অবস্থায় ঘোরতর বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে। লরারও তাহাই হইয়াছিল। লরা যখন শয়ন-গৃহের মর্ম্মর-খচিত পিচ্ছিল ও পাষাণ-কঠিন ভিত্তির উপর হৃদয়ের নিদারুণ বিলোড়নে,—ভয়ে,—দুঃখে,—দুর্ভাবনায়, বজ্রাহতবৎ অকস্মাৎ মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখন উহার মাথায় বড় আঘাত লাগিয়াছিল; এবং সে আঘাত অচিরেই মাস্তিষ্ক জ্বর অর্থাৎ Brainfever নামক বিকারে পরিণত হইয়াছিল। মায়ের কথা ত বলিবারই নহে, লরার পিতা অর্থ-সর্ব্বস্ব ওয়াল্‌টার রচ্‌ফোর্ডও, তখনকার অবস্থা দর্শনে, দুহিতার আরোগ্য বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইয়া, চিত্তে ভীত ছিলেন।

এখন আর কাহারও চিত্তে সে নৈরাশ্যের ভাব নাই। লরার জ্বর ত্যাগ পাইয়াছে,—বিকারের সমস্ত লক্ষণ দূর হইয়াছে, এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা, বালিকাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ বলিয়া, পিতা ও মাতার উৎকণ্ঠা উন্মূলন করিয়াছেন।

কিন্তু, এ আরোগ্য এক অর্থে নাম মাত্র। লরাকে এখন আর কেহই সে প্রমোদ-কুঞ্জ-বিলাসিনী প্রফুল্লমুখী লরা বলিয়া চিনিতে পারে না। উহার জ্যোৎস্নাসুকুমার সুন্দর মূর্ত্তির অর্দ্ধেক শোভা ছিল মাথার মসৃণ-চিক্কণ, নয়ন-মোহন, ঘনকৃষ্ণ কেশ-রাশিতে। চিকিৎসকেরা জ্বরবিকারের প্রবল-প্রকোপ-সময়ে, সে কেশরাশি মুণ্ডন করিয়াছেন। চক্ষু দুটি বসিয়া গিয়াছে। চক্ষে আর সে দীপ্তি নাই,—সে প্রেম-স্নেহের টল-টল মাধুরী নাই। গণ্ডদ্বয় পাণ্ডুর ও শীর্ণ। হাত দুখানি শুকাইয়া শুষ্ক লতার মত হইয়াছে; এবং এ অবস্থায়ও তাহাদের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার লরার আয়ত্ত নহে।

তবে, লরার আছে কি? আছে অঙ্গে পুরাতন রূপের লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র। প্রভাত সময়ের বিষাদ-বিশীর্ণা চন্দ্রলেখার মত, আজি লরা পুরাতন সৌন্দর্য্যের স্মৃতি-চিহ্নরূপিনী। লরার মা, লরার অতি ক্লিষ্ট মুখখানি এবং কাতর চক্ষু দুটির প্রতি কোন প্রকারেই স্থির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। তিনি যখনই লরার দিকে চাহিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে, এবং কণ্ঠস্বর বাষ্পোদ্গমে অবরুদ্ধ হয়।

আজি লরা, আপনিই একটু সুস্থির হইয়া, মাতার চিত্তসন্তর্পণের উদ্দেশ্যে, ধীরে ধীরে, মৃদুস্বরে বলিল,—"মা, তুমি অমন করিয়া আমার আরও উতলা করিও না। এ সংসারে কত বালিকাই ত বৈধব্যদুঃখে চিরজীবন দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রহে। মনে কর আমি বিধবা হইয়াছি,—বিবাহের পূর্ব্বেই বাগ্দান-ধর্ম্মে বৈধব্যের দুঃখে ডুবিয়াছি। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। ইহা ভাবিয়া আর করিবে কি? এ দেশের সকল প্রদেশেই ত মা শত শত (Nunnery) তাপসীনিবাস আছে। আমি, ঐরূপ কোন তাপসীনিবাসে আশ্রয় লইয়া, অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব; এবং তোমার মত মায়ের উদরে জন্মলাভ করিয়াছি, এই কথা স্মরণ করিয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে,—পবিত্র দেহে, জগদীশ্বরের কাছে, সতত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।"

এই কয়টি কথা কহিতেই, লরা অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং উহার দুটি ডব্‌ড'বে চক্ষু অশ্রুরাশিতে ভরিয়া গেল। মা তখন, অর্দ্ধশয়ানা অবস্থায়, লরাকে কতকটা ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, আপনার ও লরার, উভয়েরই চক্ষের জল রুমালে মুছিয়া বলিলেন,——

"দেখ্ লরা, তুই এইরূপ মন্দ কল্পনা করিস্ না। মন্দ কল্পনা ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবে অবিশ্বাসের পরিচায়ক। ইহা দুষ্য। তোর মন্দ কল্পনার কিছুই মূল নাই। হোরেস নিশ্চয়ই জীবিত আছে, এবং সে নিশ্চয়ই, তিন মাসের অবসান-সময়ে, তাহারই নির্দ্দিষ্ট দিনে, তোর্ কাছে উপস্থিত হইবে। আমি হোরেসের ভাবনায় কাঁদি না, আমি কাঁদি তোর ভাবনায়,—তোর কাতরতা দর্শনে। তুই যে প্রাণে বাঁচিবি, তাহা এই তিন সপ্তাহ কাল এক মুহূর্ত্তের তরেও আমি মনে করিতে পারি নাই।"

লরা একটু রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—"মা, এ কথাগুলি তোমাহেন মায়ের যোগ্য নহে। তুমি এমন নিষ্ঠুরের মত কথা কহিয়া আমার এই দুর্ব্বল হৃদয়ে আঘাত করিও না। তুমি যদি তাহার ভাবনা না ভাবিবে, তাহা হইলে, ইহ জীবনে আমার ভাবনাও আর ভাবিও না। সে যদি প্রাণে নিহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই আমার এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমাকে মা আত্মহত্যা করিতে হইবে না, আমি আপনা হইতেই তিল তিল করিয়া অজ্ঞাতসারে মরিয়া যাইব।

নরার মা বলিলেন,—"অবোধ, তুই তোর চিত্তের বিকলতায় আমার কোন কথারই প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছিস্ না। আমি হোরেসের ভাবনা ভাবি না, ইহা তোকে কে বলিল? অমন সুশীল, সুরূপ, উদারচরিত্র ও উচ্চাশয় যুবা যাহাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তির সহিত মা বলিয়া ডাকে—মাতৃজ্ঞানে ভালবাসে—সে রমণী কি মুহূর্ত্তকালও তাহাকে ভুলিয়া রহিতে পারে? তাহা নহে। আমি হোরেস্‌কে ভুলিলে তোকেও ভুলিব; কিন্তু আমি সত্যই তোকে বলিতেছি, হোরেস সর্ব্বপ্রকার কুশলে আছে। তাহার কোন দিক্ দিয়া কোন বিপদ ঘটে নাই। সে যখন রেলের ষ্টেসনে বেলা সাড়ে দশটার সময় টিকেট করে, তখন আমার লোকে তাহাকে দেখিয়াছে। সে, আর দুই তিন জনের সহিত, একটি স্যালুন গাড়ীতে সুখ-শান্তিতে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ইহাও আমার লোকে দেখিয়াছে। আর গাড়ী চলিয়া গেল, ইহা ত সহস্র লোকেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে! এমন অবস্থায়, সে কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিরূপে তোর ঘরে প্রবিষ্ট হইবে, আর তাহার বিপদই বা ঘটিবে কেন?"

নরা, মায়ের কথায়, ঈষৎ একটুকু আশ্বস্ত হইল বটে; কিন্তু তাহার আকৃতি দর্শনে বোধ হইল যে, আশ্বাসের সকল কথা যেন তাহার প্রাণে পঁহুছিতেছে না। সে সিদ্ধান্তের পথ না পাইয়া, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মায়ের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "মা, তবে আমি দেখিলাম কি? আমি ত হোরেস্‌কে আমার এই দুই চক্ষে, আমার বুডোর-গৃহের দ্বার-দেশে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। আমার নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু হোরেসের সহিত আমার যে চারি চক্ষে সুস্পষ্ট দর্শন হইয়াছে, সে বিষয়ে ত অণুমাত্রও সংশয়ের কথা নাই?"

মা। "তুই ধাঁধাঁ দেখিয়াছিস্। যাহারা সংসারের কোন কার্য্য কর্ম্ম না করিয়া, নিরন্তর এক জনকে এই ভাবে চিন্তা করে, তাহারা মাঝে মাঝে মনঃকল্পনার বিচিত্র শক্তিতে এইরূপ ধাঁধাঁ দেখিয়া থাকে।"

নরা। "মা, বাবাও কি তবে ধাঁধাঁ দেখিয়াছেন? ধাঁধাঁ দেখিয়া পিস্তল ছুড়িয়াছেন? তোমার কথায় মানিয়া লইলাম যে, আমিই যেন ধাঁধাঁ দেখিয়াছি, কিন্তু বাবা ধাঁধাঁ দেখিবেন কেন?"

মা। "হাঁ, তিনিও নিশ্চয়ই ধাঁধাঁ দেখিয়াছেন। দুই তিন জনেও, কখনও কখনও একই বস্তু কিংবা একই মূর্ত্তি সম্পর্কে, এক সঙ্গে এইরূপ ধাঁধাঁ দেখিয়া থাকে। নব্য-পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে, উল্লিখিত প্রকার বহুজন-দৃষ্ট ধাঁধাঁকে Collective Hallucination অর্থাৎ সম্মিলিত ধাঁধাঁ বলিয়া থাকেন *। তুই ধাঁধাঁ দেখিয়াছিস্

* ইদানীং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় Psychic Research Society নামে কয়েকটি বহুজন-সম্মানিত বৈজ্ঞানিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উল্লিখিত সভাকে বাঙ্গালায় অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান-সভা বলিয়া নির্দ্দেশ করা

প্রীতির প্রবল আকর্ষণে; তিনি ধাঁধাঁ দেখিয়াছেন, বিদ্বেষ-বিকারের তাদৃশ শাসনে। প্রীতি ও বিদ্বেষ উভয়ই মানুষের মন ও কল্পনার উপর, এ বিষয়ে, সমান শক্তিতে কার্য্য করে।”

লয়া যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে

যাইতে পারে। এই সভার অধিকাংশ সভ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, পারলৌকিক জীবনকে পার্থিব জীবনের ন্যায় সত্য বস্তু বলিয়া মনে করেন; এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তিনিচয়কে লোকান্তরবাসি নরনারীর প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সভার কোন কোন সভ্য—যথা পরলোকগত পড্‌মোর—প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও যুক্তি বলে উড়াইয়া দিতে চাহেন। পিতার ছায়ামূর্ত্তি, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পুত্রকে সম্ভাষণ করিতেছে, এইরূপ দর্শনকেও পড্‌মোর ও তাঁহার গুণপক্ষপাতি ব্যক্তিরা চক্ষের ধাঁধাঁ এবং স্পষ্টশ্রুত শব্দগুলিকেও শ্রুতিবিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হন না। Collective Hallucination অর্থাৎ সমবেত ধাঁধাঁ প্রভৃতি শব্দও এই সম্প্রদায়েরই মনঃকল্পিত নূতন শব্দ। পাঠক Phantasms of the Living (by Edmund Gurney M. A. Late Fellow of Trinity College, Cambridge, Frederic W. H. Myers M. A. Late Fellow of Trinity College, Cambridge, and Frank Podmore M. A) নামক দুই ভাগে বিভক্ত বৃহৎ পুস্তকখানি একটুকু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, উল্লিখিত রূপ নূতন-সঙ্কলিত শব্দনিচয়ের সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

না। সে, ঐ এক কথা সম্পর্কেই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া, কিসে কি হইল বুঝিবার জন্য যত্নবতী। তাই, লয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, “মা, বাবাও যে নিশ্চয়ই ধাঁধাঁ দেখিয়াছেন, তুমি তাহা কিরূপে বুঝিলে?”

মা। “কেন, সে কথা ত বাছা অনেক বারই তোকে বুঝাইয়া বলিয়াছি। তিনি নিজে কহিয়াছেন ধাঁধাঁ দেখিয়াছেন, এবং নিজেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন। তার পর, তুই যখন চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলি, তখন আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া তোকে কোলে তুলিয়া লইলাম, এবং সকলেই তোকে বেষ্টিয়া বসিলাম। বাড়ীর পরিচারকেরাও বাহির হইতে দৌড়িয়া আসিয়াছিল। যদি তোর ঘরে কোনপ্রকার জন-প্রাণী আসিয়া থাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই কাহারও না কাহারও সম্মুখে পড়িত।”

লয়া, মায়ের কথাগুলি অতিমাত্র প্রশান্তচিত্তে প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত শুনিল। শুনিল, আর কি যেন ভাবিল। ক্ষণ পরে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, যেন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের জন্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইল। মা, দেখিলেন যে, লয়া কথা কহিতেছে না, কিন্তু তাহার দুটি গণ্ডস্থল বাহিয়া ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে।

মাতা ও দুহিতার মাসাধিক কাল প্রতিদিনই এই এক প্রসঙ্গে এইরূপ আলাপ হইত; এবং আলাপের পর দুহিতা, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিয়া, শয্যার এক প্রান্তে

জীবন্মৃতার ন্যায় পড়িয়া থাকিত;—কোন কোন দিন, ধ্যান-মগ্ন তপস্বিনীর মত, ভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আপনা হইতেই একটু বা উঠিয়া বসিত।

লরার এই শেষোক্ত ভাবটি মায়ের মনে ভাল লাগিত না। তিনি, লরাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, কল্পনার ভ্রম,—মনের ভ্রান্তি ও "সমবেত ধাঁধাঁ" প্রভৃতি বিবিধ কথা কহিতেন; অথচ গৃহান্তরে যাইয়া আপনি অজস্র চক্ষের জলে ভাসিতেন। তিনি কথাটা ফুটিয়া কহিতেন না বটে, কিন্তু লরার মনে যে সংশয়, তাঁহার মনেও সেই সংশয়,—বুঝি হোরেস্ রেলের পথে অকস্মাৎ কোথাও বিপন্ন হইয়াছে,—বুঝি সে আর ইহলোকে নাই,—বুঝি লরা তাহারই ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, এবং গৃহস্বামীও সেই মূর্ত্তিকে সজীব মনুষ্য মনে করিয়া, মনের ক্রোধে, পশ্চাৎ দিক্ হইতে পিস্তল ছুড়িয়াছেন।

কিন্তু, আশা চিরকালই প্রিয়ভাষিণী,—প্রতারণার জন্য সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াও প্রাণতোষিণী। সকলই যায়, আশা যায় না। সকলই ফুরায়, আশা ফুরায় না। লরার মনেও আশা,—কখনও কখনও—ধীরে ধীরে কহিয়া থাকে,—"তিনটি মাসের অবশিষ্ট কাল অপেক্ষা কর, পুনরায় হোরেসের দর্শন পাইবে।" মায়ের মনেও সেই আশাই অপেক্ষাকৃত স্ফুটতরস্বরে কহে,—"হোরেসের কোন বিপদ হয় নাই; সে তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে,—তোমার লরার প্রাণ শীতল করিবে; এবং পুত্রের ন্যায় তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়া, পুরোবর্ত্তি বার্দ্ধক্যে, তোমার হাতের নড়ি হইবে!" মা ও মেয়ের মনের এই আশা পূর্ণ হইবে কি না, তাহা পূর্ণমঙ্গল বিধাতা ভিন্ন আর কে জানে,—কে বলিতে পারে?

আশার এইরূপ মধুর প্রতারণা সত্ত্বেও, লরার হৃদয় ও মন, ক্রমিক আরোগ্য ও শারীরিক শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি, কেমন একপ্রকার নির্ব্বেদবৈরাগ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল; এবং সে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় উচ্চভাবের আবেশে অভিভূতবৎ দৃষ্ট হইল। মা, সে ভাবের অর্থ বুঝিবার জন্য অশেষপ্রকার যত্ন করিলেন; কিন্তু শোকাকুলা বালিকার তথাবিধ বৃদ্ধজন-সমুচিত কঠোরগাম্ভীর্য্য দর্শনে ক্লিষ্ট হইয়া, কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না।

যাহার হৃদয় অভিনব শোকের অসহ্য অথচ অরুন্তুদ তুষানলে দিবারাত্রি দগ্ধ হইতে থাকে, সে যদি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করে, অথবা অবিরাম-প্রবাহি অশ্রুজলে আপ্লুত রহে, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে বোঝে, এবং বুঝিতে পারে বলিয়াই, তাহার শোক-দুঃখের সাথী হইতে যত্ন পায়। কিন্তু, যাহার দর-বিগলিত অশ্রুধারা উপযুক্ত সময়ের বহু পূর্ব্বে অকস্মাৎ অবরুদ্ধ হয়, অথবা যে সময়োচিত বিষাদ-বিলাপের পরিবর্ত্তে ভাবান্তরের আবেশে প্রশান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করে, অতিতর ঘনিষ্ঠ জনও তাহাকে সম্যক্ বুঝিতে পায় না। বোধ হয় অভাগিনী লরাকেও ইদানীং অনেকেই বুঝিতেছে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিনটি মাসের অবশিষ্ট কাল দেখিতে দেখিতেই পার হইয়া গেল। লরা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল; এবং আরোগ্যের সঙ্গে, আপনার সে নয়ন-মনোমোহন রূপরাশিতে যেন অধিকতর মনোহর হইয়া, পিতার প্রাসাদকে উজ্জ্বল করিল। কিন্তু হোরেস আর ফিরিয়া আসিল না,—হোরেসের কোন সংবাদও আর পাওয়া গেল না। লরার মা, হোরেসের সংবাদ পাইবার জন্য,গোপনে বহু অর্থ ব্যয় করিলেন,—পুনঃপুনঃ পত্র লিখিলেন,—পুনঃপুনঃ টেলিগ্রাম করিলেন, এবং দুই তিনটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়াও নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু, তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় কোন ফল ফলিল না;—সে রূপ-গুণ সম্পন্ন মধুরমূর্ত্তি যুবা, প্রেমোন্মাদিনী বালিকারে প্রেমের কুসুম-শৃঙ্খলে অমন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, আপনি কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহ আর জানিতে পারিল না। লরার মা, অনেক দিন, নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু, শিশির-সিক্ত উদ্যান-কুসুমে, মেঘমুক্ত অরুণের অমল-কিরণ-স্পর্শে, আশার যেরূপ হাসি ফোটে, তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়নে সে হাসি আর শীঘ্র ফুটিল না।

সৌভাগ্যবশতঃ লরার অবস্থা, যেন কি এক অজ্ঞেয় কারণে, ইদানীং একবারে অন্যরূপ। বাড়ীর অনেকেই মনে করিয়াছিল যে লরা, এই অসম্ভাবিত বিপৎপাতে, হয় প্রাণে মারা পড়িবে, না হয়ত চিরকালের তরে জীবন্মৃতবৎ অকর্ম্মণ্য রহিবে। কিন্তু লরার বাহিরের লক্ষণে এইক্ষণ সে ভাবের অণুমাত্র চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। তাহার শরীর এখন বেস সুস্থ,—মুখচ্ছবিও প্রকৃতিস্থ। মুখে আবার মৃদু মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে,—মৃদুমধুর কথা ফুটিয়াছে, এবং যে তাহার কাছে যাইয়া ক্ষণকাল বসিতে পারিতেছে, সে-ই তাহার প্রীতিস্নেহপূর্ণ আনন্দময় ব্যবহারে একটা নূতন ভাবের আভাস পাইতেছে।

বালিকাহৃদয়ে, এত দ্রুত, এ বিচিত্র পরিবর্ত্তের অর্থ কি? লরা কি তবে তাহার প্রাণারাধ্য হোরেসকে, এইরূপে, জলে ফুলে, বিস্মৃতির হিল্লোলে ভাসাইয়া দিয়া, আবার নূতন সুখের অন্বেষণে, মনে মনে, নূতন সঙ্কল্প পুষিতেছে? হা, প্রেম! তুমি কি সত্যই তবে রমণীর নবনীত-কোমল দুর্ব্বল হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া, শারিকা ও কপোতী প্রভৃতি বিহগীর হৃদয়ে যাইয়া ঠাঁই লইয়াছ? পবিত্রতা, তুমি কি সত্য সত্যই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছ? আর ধর্ম্ম, তুমিও কি মানুষের পদ-তলে দলিত হইয়া, পরিশেষে নামমাত্রে পরিণত হইয়াছ?

লরার বাহিরের ব্যবহার দেখিলে, আপাততঃ মনে এইরূপই একটা ধিক্কারের ভাব জন্মিতে পারে। বহিরঙ্গ ব্যক্তির আর কথা কি, যিনি লরাকে প্রাণের পুতুলরূপে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া, শিশুকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন, এবং লরার অনতিবিকশিত কো-

মল প্রাণের সহিত আপনার গভীরপ্রাণের অতিগভীর প্রীতিপ্রবাহ মিশাইয়া উহাকে প্রকারতঃ প্রেমের উচ্চতর বিকাশে পহুঁছিবার পথ দেখাইয়াছেন, তিনিও ইদানীং বালিকার ব্যবহারে একটুকু বিস্মিত। কিন্তু যিনি জীব-হৃদয়ের অন্তর্যামী, বোধ হয়, প্রেমময়ী লরা এইক্ষণ তাঁহারই ভাবে সমধিক অনুভাবিত, —তাঁহারই সর্ব্বজন-মঙ্গল্য বিশ্ব-শীতল-প্রেমে একটুকু বেশী অনুপ্রাণিত। নদীর স্রোত যখন, পাঁচ বৎসরের পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া, নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, সে খাত-পরিবর্ত্তে,কাহারও চিত্তে,বিস্ময় জন্মে না। কিন্তু মানুষের হৃদয়স্রোত যখন, পরিচিত খাত পরিত্যাগ করিয়া, অভিনব খাতে প্রবাহিত হয়, তখন বহু লোকই তাহা অপ্রাকৃত মনে করে। ইহা উচিত কি?

লরা, মাঝে মাঝে, তাহার ডায়েরী অর্থাৎ দৈনিক-বিবৃতিতে,প্রগাঢ় ধীরতার সহিত, দুই চারি "কলাম" লিখিয়া রাখিত। আমি এখানে বঙ্গের পাঠক ও পাঠিকাদিগকে সে দৈনিক হইতে ক'একটি পৃষ্ঠা, উপহার দিব। বঙ্গের যে সকল পুর-সুন্দরী প্রেমের উপাসনায় জীবন সার্থক করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা বালিকার স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়ে প্রেমের এই অচিন্তনীয় ও অপরূপ বিকাশ দর্শনে একটুকু প্রীত ও কিঞ্চিৎ চকিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আকস্মিক ভূকম্প যেমন অবনীর মূর্ত্তিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্ত ঘটায়,—অতিবড় উচ্চভূমিকে চক্ষের পলক ফিরিতে না ফিরিতে গভীর হ্রদে পরিণামিত করে,—গভীরতম নদ ও হ্রদকে নগরপত্তনের উপযোগি উচ্চ স্থান করিয়া তুলে, হৃদয়মনের আকস্মিক অন্তঃকম্পেও, নরনারীর জীবনে, অনেকস্থলে, তেমনই অভাবনীয় পরিবর্ত্ত ঘটিয়াথাকে। হোরেসের মূর্ত্তিদর্শন ও মৃত্যুশঙ্কায় মূর্চ্ছা, এবং মূর্চ্ছার পর মাসাধিক কালের মোহজ্বরে ও মনস্তাপে, লরার জীবনস্তরে, সহসা কিরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনার সামগ্রী বটে।

লরার ডায়েরী।

১৫ই সেপ্টেম্বর।

ঈশ্বর আছেন, ইহা কতকটা বুঝি। কিন্তু, ঈশ্বর করুণাময়,—না কঠোর দণ্ডবিধাতা,—ইহা ভাল করিয়া বুঝি না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝি, তাঁহার করুণা, মানুষের করুণার মত নহে। বুঝি তিনিই করুণা করিয়া আমাকে অতি কঠোর শাসনের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

শিশুরা যেমন একটি সুরম্য পুতুল অথবা একখানি সুদৃশ্য খেলনার সামগ্রী পাইলে, তাহা লইয়াই একবারে ব্যাপৃত রহে; এবং নিত্যনিয়মিত শিক্ষাপাঠেও উপেক্ষা দেখায়, আমারও ত ঠিক্ তাহাই ঘটিয়াছিল। আমি এই চারিবৎসর কাল মনুষ্যজীবনের কি কার্য্য করিয়াছি?—কিছুই না।—লিখি নাই, পড়ি নাই, একটি প্রিয়কথা কহিয়াও কাহারও চিত্ত তর্পণ করি নাই? আমি এই চারি বৎসর কোথায় ছিলাম; আর কি হইয়া রহিয়াছিলাম? স্মৃতিও হায়! এ প্রশ্নের উত্তরদানে আমার উপযুক্ত সাহায্য করিতে সমর্থ নহে।

আমি যে দিন হোরেসকে প্রথম দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার স্বপ্নময় প্রেমের রাজ্যে, শুধু সেই প্রেমের উপাস্যকে, কখনও চর্ম্মচক্ষে, কখনও বা মানস-চক্ষে, প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাকে লইয়াই দিনপাত করিয়াছি। সেখানে পিতা নাই,—মাতা নাই,—ভাই বন্ধু অথবা প্রতিবেশিদিগের সুখদুঃখও সেখানে নাই। সেখানে, সে আর আমি,—আমি আর সে। এইরূপ সর্ব্বজন-বিস্মৃতি—সর্ব্বজনে উপেক্ষা—অথবা সংকীর্ণ স্বার্থপরতার নামই কি প্রেম? ছিঃ!

মানুষের হৃদয় যখন প্রকৃত প্রেমে পবিত্র ও পরিপূর্ণ হয়, তখন সে পৃথিবীর সকলকেই বোধ হয় ভালবাসে, সকলকেই বোধ হয় আপনার প্রাণের উদ্বেল ভালবাসা কিছু কিছু বিলাইয়া দেয়। আমি কি আমার ঐ এক জন ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসিয়াছি?

পিতা,—জন্মদাতা। আমি কি দিনান্তেও পিতার নাম মুখে আনিয়াছি, কিংবা পিতার কোন সংবাদ লইয়াছি? পিতা আমার মায়ের মত নহেন, তাহা জানি। তথাপি তিনি পিতা,—প্রতিপালনকর্ত্তা। তাঁহাতে দুইচারিটি সদ্গুণও পরিস্ফুট। আমি কি সে সকল গুণে ভ্রমেও কখনও অনুরাগ দেখাইয়াছি? পিতার যদি পরলোকপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় আমার এ পাপ চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিত না। পিতার সম্বন্ধে সন্তানের ঐপ্রকার নিষ্ঠুর ঔদাস্য পাপেরই এক প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি কি না, তাহাও কি আমি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি?

ভাইটি আমার অনুজ ও আদর-প্রিয়। আমি ক্ষণমুহূর্ত্তও তাহাকে আদর করিয়াছি কি? সে সারা বৎসর বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে বোষ্টনে থাকে; বৎসরান্তে কখনও অল্প কিছু দিনের জন্য বাড়ীতে আইসে। সে ত আমায় কতই ভালবাসে; কত প্রীতিকর পুস্তক ও প্রিয়দর্শন বস্তু আমায় আনিয়া উপহার দেয়। কিন্তু, আমি জ্যেষ্ঠা হইয়াও, এই চারি বৎসর কাল, কখনও তাহাকে আমার এই আত্মভাবরুদ্ধ, আত্মসুখ-মুগ্ধ কঠোর হৃদয়ের এক ফোঁটা ভালবাসা দান করিয়া সুখী করিয়াছি কি?

পিতার অসংখ্য সেবক, অসংখ্য সেবিকা। তাহাদিগের ধনেই তিনি ধনী। কেন না, তাহারা অত্যল্প বেতনে অহোরাত্র পরিশ্রম করে বলিয়াই তাঁহার এই অপ্রমিত বৈভব। কিন্তু, আমি তাহাদিগকে এক পিয়ালা জল দিয়াও কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছি কি? তাহারা যখন অতিশ্রম-জনিত রোগের যন্ত্রণায় মুমূর্ষুর মত হইয়া কাতর নয়নে আমার করুণাপ্রার্থী হইয়াছে, আমি তখন তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিয়াছি কি?

হাঁ, মাকে একটুকু ভালবাসিয়াছি। মা, আমার স্বর্গের দেবতা; পিতার পরম শত্রুও তাঁহাকে ভালবাসে। সুতরাং, আমি যে পেটের সন্তান হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, ইহা কোন অংশেও বেশী কথা নহে। কিন্তু, তথাপি লজ্জার সহিত আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমার মায়ের প্রতি ভালবাসাও সর্ব্বতোভাবে স্বার্থশূন্য নহে।

মা যদি আমার প্রিয়তমকে ঐ প্রকার উদ্বেল হৃদয়ে ভাল না বাসিতেন, এবং তাহার প্রতি আমার এ হৃদয়ের তর-তর-প্রবাহিত গতি দেখিয়া আমায় প্রশ্রয়দানে উৎসাহিত না করিতেন, বুঝি তাহা হইলে, তাঁহার উপরও আমার তেমন অনুরাগ থাকিত না। এইরূপ অনুরাগকে নিশ্চয়ই মাতৃভক্তি নামে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে।

হায়, হোরেসত আমাকে কতদিনই এই সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়াছে,—মধুর কথায় বলিয়াছে,—কখনও বা মৃদুকটু দুরক্ষর কথায়ও বলিয়াছে। কিন্তু, আমি তাহার কোন কথাই বুঝি নাই। বোধ হয় বুঝিতে চাহি নাই বলিয়াই ঈশ্বর আমাকে এত দিনে বুঝাইয়াছেন। তবে, এখন আমার বুঝিয়াই বা ফল কি? জীবনের আশা ফুরাইয়াছে,—আকাঙ্ক্ষাও ফুরাইয়াছে। এখন আর এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিয়া আমার প্রয়োজন কি?

১৮ই অক্টোবর।

"আমার প্রিয়তম সত্যই কি তবে লোকান্তরবাসী হইয়াছে? বাড়ীর পাঁচ জনেই ত ফিস্ ফিস্ করিয়া এইরূপে কানাকানি করে। ইহারা কানাকানি না করিয়া, আমায় স্পষ্ট বলিলেই ত পারে। মা, কাহারও সহিত কানাকানি করেন না। মায়ের মুখ খানি, সততই বিষণ্ণ—অন্তর্গূঢ় দুঃখের কেমন এক প্রকার আবরণে আচ্ছন্ন। অমন সুন্দরী আমার মা; কিন্তু তাঁহার সে অতুল সৌন্দর্য্য এ দুঃখিনীর শোক-দহনে বিলুপ্তবৎ হইয়াছে। মায়ের মুখের দিকে চাহিলেই আমার চক্ষে জল আইসে। হা আমার মা গো! হা আমার মা!

মায়ের মনেও এই সংস্কারই ক্রমে দৃঢ় হইতেছে যে, হোরেস এখন আর পৃথিবীতে নাই। সে যদি পৃথিবীতে নাই, তাহা হইলে আমিই বা আর বৃথা এই পৃথিবীতে থাকি কেন? তাহার প্রাণ আর আমার প্রাণ পরস্পর-মিলিত দুই খণ্ড নবনীতের মত সম্পূর্ণরূপেই ত এক হইয়া গিয়াছিল। সেই একীভূত প্রাণের এক অর্দ্ধ—এই শীর্ণ দেহে ধুক্ ধুক্ করিতেছে; আর এক অর্দ্ধ—* *! হা বিধাতঃ! আমার সেই প্রাণাধিক-প্রাণার্দ্ধ কোথায় চলিয়া গেল! সে যেখানে চলিয়া গিয়াছে, আমিও যদি যত্নকৃত কার্য্যের দ্বারা সেখানে চলিয়া যাই, তাহা হইলে কি প্রকৃতই মহাপাতক হয়? ঐ পাতকের কথা স্মরণ করিলেই ত প্রাণটা ভয়ে শিহরিয়া উঠে।

না, আমাকে মহাপাতক করিতে হইবে না। আমার এই হৃদ্‌যন্ত্র ক্রমশঃ যেরূপ দুর্ব্বল হইতেছে,—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সময়ে সময়ে প্রাণের অভ্যন্তরেও যেভাবে কম্পের মত কেমন একটা অবস্থা জন্মাইতেছে, তাহাতে আমার আশা হয় আমিও অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িব? কিন্তু, হায়! এই দেহপাত হইলেই কি আমার সকল দুঃখের শেষ হইবে? পিঞ্জর যখন ভগ্ন হয়, পিঞ্জরের বিহঙ্গী তখন উড়িয়া যায়? আমিও কি সেই প্রকার উড়িয়া যাইব, এবং উড়িয়া

যাইয়া এই অনন্ত শূন্যের কোন স্থানে আমার প্রিয়তমের দর্শনলাভে প্রাণ জুড়াইতে পারিব? হা জগদীশ্বর! তুমিই জান,—তুমিই জান!

৩১শে অক্টোবর।

"হোরেসের সহিত সেই যে আমার শেষ দেখা,সে দিন হইতে---যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে—পাঁচটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এই পাঁচটি মাস আমি কি ভাবে কাটাইলাম! বাড়ীর অধিকাংশ লোকেরই এখন এই ধারণা যে, আমি হোরেসকে ভুলিয়াছি—হোরেসকে ভুলিয়া সংসারের সুখে অথবা স্বর্গলাভের অভিলাষে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত হইয়াছি। যদি এ কথার মধ্যে অণুমাত্রও সত্য থাকিত, তাহা হইলে আমি, আমার প্রাণের সূক্ষ্মতন্তুগুলি নখে ছিঁড়িয়া, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিতাম।

আমি হোরেসকে ভুলি নাই; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় হোরেসের ভাবে গাঢ়তর ডুবিয়াছি; সে যাহা যাহা ভালবাসিত, তাহারই যথাসম্ভব অনুষ্ঠান করিয়া, যেন প্রাণে তাহার একটুকু বেসী সন্নিহিত হইতেছি। তাহার অনুকরণে অধ্যয়ন করি,—পারি আর না পারি, প্রতি দিনই দুই তিন বার তাহার মত উপাসনায় উপবিষ্ট হই, এবং পরের উপকার-কল্পেও কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমার পক্ষে এই তিনই ত এক প্রকার নূতন ব্রত।

তাহার পর-দুখকাতর কোমল প্রাণ, কাহারও কোন দুঃখকষ্টের কথা শুনিলেই একবারে আকুল হইত; আমিও ত আমার এই ভস্মীভূত প্রাণে এখন সেইরূপ আকুলতা কিছু কিছু অনুভব করিয়া থাকি; এবং প্রতিবেশি দুঃখিদিগের মধ্যে প্রতিদিনই খুঁজিয়া খুঁজিয়া যৎসামান্য কার্য্য করিবার জন্য অধীর হই। তবে, এ কার্য্যে এখনও আমার কিঞ্চিৎ পরিমাণ অপরাধ রহিয়া যাইতেছে। কারণ, আমি পরের দুঃখমোচনরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপনেও ঈশ্বরের দিকে তত চাহি না,—যত চাহি হোরেসের দিকে। আমি যখন হোরেসকে ভুলিয়া শুধু ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে পরের সেবা করিতে পারিব, তখন কি আবার পাল্‌টিয়া প্রেমের ধর্ম্মে অপরাধিনী হইব? ধর্ম্মই ত এখন আমার প্রাণ-সর্ব্বস্ব; কিন্তু, ধর্ম্ম বড় সূক্ষ্ম বস্তু। উহার সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর ভাব, সকল সময়ে, আমার অশিক্ষিত বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। যিনি প্রেমধর্ম্ম ও পরোপকার-ধর্ম্ম এই উভয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কি এই অবোধ বালিকারে উপযুক্ত আলোকদানে পথ দেখাইবেন না?

১৪ই নভেম্বর।

"হায়, এ আবার আমার কি হইল! আমি হোরেসকে কল্য রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি; এবং স্বপ্নভঙ্গের পর, রাত্রির অবশিষ্ট সমস্ত সময় ফুকরিয়া কাঁদিয়াছি। তাহাকে কেন আবার এই ভাবে দেখিলাম! সে বুডোরের দ্বার-দেশে আমাকে যে মুর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল, কল্যকার স্বপ্নেও ঠিক্ সেই মুর্ত্তিতেই দেখা দিয়াছে;—সেই ভাবে, তাহার একখানি হাত মাথার উপরে, এবং আর

একখানি হাত বক্ষঃস্থলে ন্যস্ত রহিয়াছে, এবং যেন বড় আঘাত পাইয়াছে, (আহা, আর লিখিতে পারি না!) ইহাই আমাকে বুঝাইবার জন্য, বিষণ্নবদনে—অতি বিষণ্ন নয়নে—আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে।

আমার প্রাণাধিককে নিশ্চয়ই কেহ হত্যা করিয়াছে, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, যে-ই হত্যা করিয়া থাকুক, দয়াময় ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন। আমি তাহাকে মনে মনে চিন্তা করিয়াও বিদ্বেষ-বিকারের জ্বালাময় পাপে জীবন বিসর্জ্জন করিব না, এবং ক্রোধের আগুনে পুড়িয়া মরিব না। তাহার হৃদয়ে যদি অণুমাত্রও দয়া থাকে, তাহা হইলে সে এখানে আসিয়া আমাকেও মারিয়া ফেলুক,—তাহার সকল আপদ, সমস্ত অন্তরায়, একসঙ্গে দূর হউক।

একবার ইচ্ছা হয়, এ স্বপ্নের কথা মায়ের কাছে বিবরিয়া বলি, আবার মন ফিরিয়া আইসে। মা, আমার জন্য অশেষ দুঃখ পাইয়াছেন; তাঁহার দুঃখের বোঝা আর বাড়াইতে আমার ইচ্ছা হয় না। প্রেমের অনুরাগ আর স্নেহের বাৎসল্য কখনও এক বস্তু নহে। কিন্তু, মায়ের দিকে চাহিলে স্পষ্টই মনে লয় যে, স্নেহজনিত ভালবাসাও সামান্য সামগ্রী নহে! হোরেস চলিয়া গিয়াছে অবধি আমি আমার মাকে একটি দিনের তরেও প্রফুল্ল দেখি নাই; জীবনের নিত্য কার্য্যেও তাঁহার আর সে পুরাতন স্ফূর্ত্তি নাই। আমি কি করিয়া তাঁহার বুকের আগুন নিবাইব? আমি যে ভাবে—যে প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য যত্নে, আমার আপন প্রাণের অসহনীয় জ্বালা প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখি, তাহা আমার সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

১লা জানুয়ারী।

প্রেমের শৃঙ্খল গলায় গাঁথিয়াছি অবধি, প্রতিবৎসরই, নববর্ষের প্রথম দিবসে, আগে ঈশ্বরের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণতি ও প্রার্থনা করি; তার পর, প্রাণাধিকের নিকট প্রাণের সমস্ত ভালবাসা অথবা আমার দ্রবীভূত প্রাণটাকে সর্ব্বাবয়বে ঢালিয়া দিয়া, আনন্দে ফুলিয়া, পত্র লিখি। আজি কি করিব?—ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের পাদপীঠে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইব; পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিব। কিন্তু, আমার যে জন ঈশ্বরে অমন অনুরক্ত ছিল, সে কি এখন আর নাই? থাকিলেই বা কোথায় আছে, এবং কিরূপেই বা আমি তাহাকে আমার এ কোরকসদৃশ ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তি উপহার দিব?

হৃদয়, তুমি দগ্ধ হও,—একবারে দগ্ধ হইয়া যাও। তুমি পুড়িয়া পুড়িয়া—অনবরত পুড়িয়া—ভস্ম হও, আমি সেই ভস্মরাশি গায়ে মাখিয়া, এসিয়ার তাপসীদিগের ন্যায় তপস্বিনী হইব। চক্ষু, তুমি অহোরাত্র অশ্রু বর্ষণ কর। আমি সেই অশ্রুরাশিতে স্নাত-পূত হইয়া, চিত্তে ক্ষণকালের তরে, দেবতার নিঃস্বার্থ-নির্ম্মল জগন্মঙ্গল আনন্দ অনুভব করিব।

আর না—আর না—হা! আর ত পারি

না! এ দেহে আর কুলায় না, এ প্রাণেও বুঝি আর কুলায় না! হা জগদীশ্বর! তুমি, করুণার অপার সাগর, তুমি এ দুর্ব্বলা বালিকারে দুঃখের এই দুঃসহ দাব-দাহে রক্ষা কর। প্রভো! এ সময় একবার ফিরিয়া চাও। আমি প্রাণে বাঁচিতে চাহি না; কেন না, প্রাণে আমার আশা নাই, পিপাসা নাই। আমি মরিতেও চাহি না,—কারণ শুনিয়াছি, মৃত্যুর কামনাও নাকি মহাপাতক। আমি চাহি কেবল তোমার একটুকু কৃপা। তুমি তোমার অপার কৃপার কণিকামাত্র দানে, আমার প্রাণের আগুনটা নিবাইয়া ফেল।

৩১শে জানুয়ারী।

মাসের প্রথম দিবসে বড় কাঁদিয়াছি। আজি আর কাঁদিব না। আজি তত্ত্বজ্ঞানের কঠোরচক্ষে, প্রকৃত সত্যের পরীক্ষা করিতে যত্নপর হইব। আমার আত্মসম্পর্কে আসল কথাটা বুঝিয়া লইব। আমি কি?—আমি সধবা, না বিধবা?—সংসারিণী, না সন্ন্যাসিনী?—যে রমণী পবিত্র কৌমার ব্রত হইতে কল্পনায়ও পরিভ্রষ্ট হয় নাই, সে কি আপনাকে সধবা অর্থাৎ পরিণীতা স্ত্রী বলিয়া মনে করিতে পারে? বোধ হয় পা—রে।

এই যে কল্পনার কথা কহিলাম, এ কথাটা সত্য হয় নাই। আমি শরীর সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে কুমারী রহিয়া থাকিলেও, কল্পনায় কুমারী ছিলাম না। কেন না, আমার হৃদয়, মন ও প্রাণ সমস্তই আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলাম; এবং কিবা দিনে, কিবা নিশীথে, কিবা সমক্ষে, কিবা পরোক্ষে, সকল সময়ই তাহাকে পতি, গতি, প্রাণারাধ্য ও প্রাণেশ্বর বলিয়া জানিতাম। এমন অবস্থায় আমি সধবা বৈ কি?

কিন্তু, যদি এতদিন আমি সধবা ছিলাম, তবে কি এখন বিধবা হইয়াছি? আমার এই বৈধব্যের কথা মনে করিতেই আমার হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর পর্য্যন্ত একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। না, কখনও না,—আমি কখনও বিধবা হই নাই। আমি যখন তাহার বিয়োগ-ঘটনা চক্ষে দেখি নাই,—বিয়োগ-সংবাদও কাহারও কাছে নিশ্চয়তার সহিত প্রাপ্ত হই নাই, তখন কদাপি শুধু অমূলক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাকে বিধবা অর্থাৎ তাহার সহিত বিযুক্ত মনে করিব না।

আর বিয়োগ ঘটিয়া থাকিলেই বা কি? বিয়োগ ত দেশান্তর গমন অথবা দেহপিঞ্জর হইতে আত্মার বন্ধন মোচন। যদি পরলোকের কথা প্রকৃত সত্য হয়,—এখনকার অতিবড় বিখ্যাত জ্ঞানীরা যেরূপ বলিতেছেন,—তাঁহারা পরলোকবাসিদিগকে সময়ে সময়ে চক্ষে দেখিয়া, পারলৌকিক জীবনকে যে প্রকার প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সে কথায় যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সত্য থাকে,—সে লোকান্তর যদি সত্যই একটা দেশান্তরের মত চক্ষু কর্ণ ও হস্তপদের ব্যবহার যোগ্য স্থান হয়, তাহা হইলে এ জগতে কাহারও জন্যই ত বৈধব্য নাই। পতি কিয়ৎকালের তরে, দেশান্তরবাসী হইলেই, যদি রমণী আপনাকে পতিহীনা স্বাধীনা বলিয়া

চিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে সংসারে সতী বলিয়া পূজা করিব কার? এবং সতীত্বের জন্য পুষ্পাঞ্জলিই বা দিব কাহাকে?

"ফলকথা, সতীর জন্য জীবনের কোন অবস্থায়ই বৈধব্য সম্ভবে না। আমিও যদি জগদীশ্বরের কৃপায় কায়-মনঃপ্রাণে পতি-প্রাণা সতী রহিতে পারি, তাহা হইলে আমার জন্যও বৈধব্যদশা একবারে অসম্ভব।

"বৈধব্য নাই, অথচ সংসারও নাই, এ আমার এক বিচিত্র অবস্থা! আমি সধবার প্রেমময় হৃদয়ে সন্ন্যাসিনী,—গৃহবাসে থাকিয়াও তপস্বিনী। আমার মায়ের প্রাণে সামান্য একটুকু কাঁটার আঁচড় লাগিলে, সে আঁচড় আমার বুকে বজ্রাঘাতের ন্যায় অনুভূত হয়, এইজন্যই ত হাতে পায়ে বাঁধা আছি। নতুবা দেশের কোন তাপসী-নিবাসে প্রবেশ করিতে কে আমায় ঠেকাইয়া রাখে? কিন্তু আমি গৃহবাসে থাকিয়া তপোধর্ম্মের অনুকূল যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্ম করিবার অবকাশ পাই, তাপসীনিবাসে তাদৃশ কর্ম্ম, সকলের ভাগ্যেই, সংঘটিত হয় কি? তাই, যেমন আছি, কিছু দিন এমনই থাকিব,—গৃহে থাকিয়াই তপস্যার কঠোর ধর্ম্ম পালন করিব। সংসারের সর্ব্বসুখে বঞ্চিত রহিয়া, প্রেমময়ী সধবার প্রাণে, শুধু পরের সুখসম্পাদনেই, এ জীবন উৎসর্গ করিব।"

১লা ফেব্রুয়ারি।

"আমি সধবাই হই, আর বিধবাই হই, যুবজনেরা যে আমার প্রতি তৃষিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে, ইহাতে এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, মরিয়া যাই। সেই উৎকট জ্বর-বিকারের সময় ডাক্তারেরা একবার আমার মাথা মুড়াইয়াছিলেন। ইচ্ছা হয়, আবার সেই প্রকার মাথা মুড়াই, এবং এই মহার্ঘ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে (Sackcloth) শাণ-বসন পরিধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু, রূপের ঈদৃক্ বৈরূপ্য সম্পাদন পাপাত্মার অনুরূপ কার্য্য নয় কি? রূপের অনন্তসাগর অনন্তদেব জগদীশ্বর যত কিছু বৈভব সৃষ্টি করিয়াছেন, জ্ঞানীরা রূপের বৈভবকে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।—সে রূপকে মানুষ বিরূপ করিয়া রাখিতে যত্ন পাইবে কোন্ সাহসে?

"রূপের উপাসনা আসল কথা নহে। আসল কথা রূপের দর্শন অথবা প্রদর্শন উপলক্ষে লালসার সঞ্চারণা। সে অংশে দোষ আমাদিগের, না শুধুই যুবকদিগের। দোষ উভয়েরই। আমরাও যে কিয়দংশে অপরাধিনী, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এডিন বেলু ও চ্যানিঙ প্রভৃতি মহাত্মারা সর্ব্বদা যেরূপ পবিত্র ভাব-মণ্ডলে অবস্থান করিতেন, আমরা নারী হইয়াও যদি তাদৃশ ভাবমণ্ডলে অবস্থান করিতে না পারি,—যদি পবিত্রতার তাদৃশ উচ্চস্তরে উত্থিত রহিয়া, মাতৃভাব ও দুহিতৃভাবের উপযোগি স্নেহপূর্ণ শান্তদৃষ্টিতে সংসারের সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তা ও কুৎসিত দৃষ্টিকে শাসিত করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে আমাদিগের নারীজন্মে ও নারীজীবনে ধিক্। আর যাহারা সুকুমারমতি ও সরলপ্রকৃতি যুবতীদিগকে, পিপাসুনয়নের অতি প্রবল প্রাকৃত আকর্ষণে, লাল-

সার নিম্নতর গ্রামে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগেকেও সহস্রবার ধিক্। যার হৃদয়ে যাহা থাকুক, আমি ঈশ্বরের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া আপনার হৃদয়কে রক্ষা করিব; এবং যদি হৃদয়ের পবিত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারের সকল সম্পর্ক ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়, তাহাও করিব।"

৩১শে মে।

"আজি আমার এ নবজীবন অথবা জীবন্মৃত অবস্থার সংবৎসর পূর্ণ হইল। যদি পারিতাম, তাহা হইলে, আজিকার এই দৈনিক আমার অশ্রুজলে অথবা হৃদয়ক্ষত রুধির-দ্রবে লিখিয়া রাখিতাম। তাহা যখন পারিব না, তখন আর লিখিব কি? তথাপি লিখিবার দুই একটি কথা আছে। আমার সুখ নাই, কিন্তু প্রাণে একটুকু শান্তি জন্মিয়াছে। এ সংসারে শান্তির একমাত্র স্থান—সেই করুণানিধান। বোধ হয়, তাঁহাতে আমার একটুকু প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—বোধ হয়, প্রাণে তাঁহার অনুভূতিজনিত আনন্দ একটু একটু অনুভব করিতে পাইতেছি। ইহা আমার মত অভাগিনীর জন্য কম কথা নহে।

"আমার হৃদয়-শান্তির আর এক আশ্রয় অধ্যয়ন। আমি বিগত আট মাসে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, সুখের দিনে আট বৎসরেও তাহা পারিতাম কি না, সন্দেহ। সে আমায় অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছিল, আমি তাহার আজ্ঞা পালন করিয়াছি,—তাহার প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছি। আট মাসে ইতিহাস, বিজ্ঞান, চরিতাখ্যান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কতই যে কি পড়িয়াছি, তাহার অবধি নাই।

"সে জ্যোতির্বিজ্ঞান বড় ভালবাসিত, আমি তাই জ্যোতির্বিজ্ঞান লইয়া একটুকু বেশী পরিশ্রম করিয়াছি। তাহার ভালবাসার আর এক সামগ্রী পার্কারের প্রবন্ধ, আর লিথি ডোটেনের কবিতা। এ উভয়েরই অনেক অংশ এখন আমার কণ্ঠস্থ। ধন্য আমার জ্ঞানের গুরু পার্কার,—দীনের বান্ধব, দুর্ব্বলের বল,—প্রেমভক্তির দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি! আমি তোমার পদযুগলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। আর ধন্য মেয়ে লিথি ডোটেন!—প্রেমের কবী,—প্রেমসংগীতের অকাল-কোকিলা! ভগিনি! আমি তোমাকেও বারংবার ধন্যবাদ দি,—তোমাকে মনঃকল্পিত মূর্ত্তিতে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া আমার তাপিতপ্রাণে শীতল হই।

"লিথির প্রত্যেক কবিতায়ই একটুকু বিচিত্র মাধুরী আছে। আমি যেটি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিয়া থাকি, অমন কবিতা এই পৃথিবীতে কয়জন পুরুষে লিখিয়াছেন? হা লিথি! তোমার উপদেশ কি আমার এ জীবনব্যাপি প্রেমব্রতে অথবা তপোব্রতে কার্য্যে পরিণত হইবে?"

—"By that world of beauty,
And by that life of love,
And by the holy angels
Who listen now above,
I pledge my soul's endeavor
To do whate'er I can
To bless my sister woman,
And aid my brother man."

মনুষ্যের বহিঃস্থ জীবন প্রায় সর্ব্বত্রই হৃদয়নিহিত ভাব ও সঙ্কল্পের প্রতিবিম্বস্বরূপ। দুঃখিনী লরা এইক্ষণ কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে,—উহার হৃদয়পৃষ্ট কোমল ও কঠোর ভাবনিচয় বাহিরের জীবনে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকার বুঝিতে বাকি রহিয়াছে কি ?

(শিলারের কবিতার ভাবানুবাদ)

রূপের জগৎ অই নয়ন-গোচরে,
—প্রেমের জগৎ অই মাথার উপরে,—
আর অই দেবগণ, পবিত্র যাঁদের মন,
জীবের কল্যাণে যারা সর্ব্বত্র সঞ্চরে ;
এ তিনের নামে আজি প্রীতির নির্ভরে,
উৎসর্গ করিব প্রাণ সর্ব্বসুখ তরে ;—
—মনুষ্য মাত্রই ভাই, রমণী ভগিনী তাই—
সেবিব এ দেহে সদা প্রফুল্ল অন্তরে।

পাঠকের স্মরণ আছে, লরার পিতা ক্রোরপতি এবং তাঁহার অসংখ্য দাসদাসী। আমেরিকার সেই কলঙ্কলাঞ্ছিত দাসত্বপ্রথা নামতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু অদ্য পর্য্যন্তও কার্য্যে একবারে বিলোপ পায় নাই। সে দেশের ধনকুবের ব্যক্তিরা, অদ্যাপি পুরাতন নিগ্রোজাতির বংশসম্ভূত অসংখ্য নরনারীকে অধীনতার নানাসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহাদিগের দ্বারা নিজ নিজ বিশাল বাণিজ্য ব্যবসায়ের কার্য্য পরিচালনা করেন ; এবং এই নিরাশ্রয় দুঃখিদিগকে অহোরাত্র পরিশ্রম করাইয়া, পারিশ্রমিকের নামে অত্যল্প মাত্র অর্থদানেই পরিতুষ্ট রহেন। ইহাতে কাহারও আর কিছু বলিবার থাকে না। কেন না, তাঁহারা প্রচুর লাভ করেন, অথচ তাঁহাদিগের মানসম্ভ্রমও দেশীয় আইনের মুষ্টিগ্রহ হইতে অস্পৃষ্ট রহে।

লরার পিতৃগৃহস্থিত উল্লিখিত প্রকার স্বাধীন (!) দাস-দাসীরা এতকাল বড় অসহ্য কষ্টে দিনযাপন করিত। তাহাদিগের ইদানীং বড় আনন্দের দিন উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, লরা তাহাদিগের প্রত্যেকের কুটীরে প্রতিদিনই কোন না কোন সময়ে উপস্থিত হয় ; এবং তাহাদিগের যাহার যে কষ্ট থাকে, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করে।

লরার আর এক কার্য্য নগরের অসহায় ও অসমর্থ রোগিদিগের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার উপায় বিধান, এবং অনাথ বালক-বালিকার উপযুক্ত তত্ত্বাবধান। লরা সমস্ত দিন দুঃখিকাঙ্গালের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব্বত্রই শমায়ের প্রাণে সুখ-শান্তি বিতরণ করে ; এবং দিনান্তে যখন আপনার বিশ্রামনিকেতনে উপবিষ্ট হয়, তখন—সম্মুখে কেহ না থাকিলে—কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া, অশীতিপরা তাপসীর ন্যায় ধ্যান ও প্রার্থনায়, অথবা বৃদ্ধ পণ্ডিতের ন্যায় অধ্যয়নে ডুবিয়া রহে। এ দগ্ধ হৃদয় আবার কখনও পুষ্পপল্লবে শোভিত হইবে কি? তরুলতার একার্দ্ধ যদি আগুনে পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে অপরার্দ্ধে কুত্রচিৎ কখনও পাতা বাহির হয় ও ফুল ফোটে। কিন্তু যে বৃক্ষ অথবা যে ব্রততী সর্ব্বাবয়বে দগ্ধ হয়,—তাহার? সর্ব্বাঙ্গদগ্ধা লরার সম্বন্ধেও সেই প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরদাতা—কাল।

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।

(১)

মোহসংশয়ে মাতৃমূর্ত্তি

মা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন; মাতৃবৎসল পুত্র পৃথিবীতে রহিয়াছেন। এই দু'য়ের অচ্ছেদ্য স্নেহসম্বন্ধ কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে কি? পুত্র কিংবা কন্যা, বয়ঃপ্রাপ্ত * হইতে না হইতেই, বৃন্তচ্যুতকুসুম-কলিকার মত, কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; পিতা ও মাতা, পৃথিবীতে থাকিয়া, তাহাদিগের জন্য অহোরাত্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। ভালবাসার এমন সুখময়-বন্ধনও কখনও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে কি?

ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, অশেষপ্রকারে পরিশ্রম করিয়া, তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছেন; আর পৃথিবীর নরনারী পরলোকে যাইয়াও যে, সূক্ষ্মতর-পরমাণুগঠিত সুদৃঢ় শরীরে, ঠিক্ সেই আকৃতি ও সেই প্রকৃতিতে, বিদ্যমান রহিয়া, স্বকৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ-দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করে, এবং নিয়মবিশেষের অধীনতায় মনুষ্যকে পুনরায় দেখা দিতে পারে, ইহা তাঁহারা নিশ্চয়তার সহিত জানিতে পাইয়াছেন। এ সকল তত্ত্ব, ভারতীয় ঋষিদিগের যোগ-জ্ঞানলব্ধ অধ্যাত্মসত্যের আলোকে নূতন নহে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজিকালিকার প্রমোদ-কাব্যবিলাসী ভারতবাসী তাদৃশ শুষ্ক সত্যে অথবা কঠোর তত্ত্বে কতকটা উদাসীন।

ভারতবাসী, ইদানীং জড়বিজ্ঞানের উপাসক না হইলেও, উহাতে কিঞ্চিদংশে অনুরাগী; অথচ যে বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের সার,—মানব-জীবনের শেষপরিণতি-সংক্রান্ত যে মহৎ সত্যের সহিত পৃথিবীর সকল তত্ত্ব সংস্রবসূত্রে জড়িত, এখনকার সুশিক্ষিত ভারতসন্তানও সে বিজ্ঞান ও সে তত্ত্বে উপেক্ষান্বিত।

ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, এরূপ উপেক্ষার ভাব সত্ত্বেও, সত্য স্থানে স্থানে আপনার প্রভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া, প্রাচীন-পণ্ডিতসম্প্রদায়ের হৃদয়ের উপরও এইক্ষণ প্রভূতপ্রভাবে ক্রিয়া করিতেছে; এবং যাঁহারা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের কোন কথাই পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগকেও দর্শন ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের দিকে নূতন পথ দেখাইতেছে। পাঠক নিম্নলিখিত কাহিনীটিতে একথার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বিদ্যারত্ন দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের প্রৌঢ়যুবা। তিনি প্রাচীন-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদিগের মত টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন,—টোলে উপাধি পাইয়া-

* "প্রাপ্তাপস্নে চ দ্বিতীয়য়া।"

ছেন, এবং যৌবনের সুখ-বিলাস-সময়েও, মাথায় টিকি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ও গায়ে নামাবলী ধারণ করিয়া,প্রাচীন রীতির অনুসরণে, প্রাত্যহিক পূজা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

শশাঙ্কের বয়স যখন সবে পাঁচ মাস, তখন তাহার গর্ভধারিণী মাতা স্বর্গে চলিয়া যান; এবং শশাঙ্ক কিছু দিন বাড়ীর পুরন্ধ্রীদিগের স্নেহে ও অনুগ্রহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, পরিশেষে বিমাতা অর্থাৎ পিতার নব-পরিণীতার ক্রোড়ে প্রবৃদ্ধ শিশুর ন্যায় স্থান লাভ করেন। সেই হইতে বিমাতাই লালনে, পালনে, এবং সুখদুঃখময় সাংসারিকজীবনে, শশাঙ্কের মাতৃস্থানীয়া।

দ্বাবিংশতি বৎসরের সময়, শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন; এবং বিবাহের এক বৎসর পরেই বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করিয়া পিতা ও পত্নীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

শশাঙ্কের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর, তখন তাঁহার বয়ঃসমুচিত তরল হৃদয়ে এক ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইল; এবং তাঁহার পক্ষে আর এক বিবাহ কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্ন তাঁহাকে বড়ই আকুল করিয়া তুলিল। শশাঙ্ক আপনার বুদ্ধিদোষে, অথবা সমানবয়স্কদিগের অসঙ্গতপরামর্শে, নবযুবতী সহধর্ম্মিণীতে বীতস্পৃহ হইয়া, আর এক বিবাহের জন্যই মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং তাঁহার সঙ্কল্প যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বাহিরে আলোচনার বিষয় হইল, তখন বন্ধুবান্ধবেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাত্রী খুঁজিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে পাত্রীর অভাব নাই। যদি তুমি সাতাশী বৎসর বয়সের সময়েও সাড়ে তিন শত বিবাহ করিতে চাও, তাহা হইলেও তোমার জন্য পাত্রী যুটিবে। শশাঙ্কের জন্যও পাত্রী যুটিল। পাত্রী বার বৎসরের বালিকা, এবং শশাঙ্কবিদ্যারত্নের স্ত্রীর সহিত তুলনায় একটু বেসী সুন্দরী।

বাঙ্গালা ১৩০৩ সনের চৈত্র মাসে পুনরায় বিবাহের স্থির সঙ্কল্প, এবং ১৩০৪ সনের ২২শে আষাঢ় বিবাহের দিন, ইহা শশাঙ্কের বেশ স্মরণ আছে। ইহার মধ্যে ঠিক্ কোন্ সময়ে পাত্রীনির্ব্বাচন হয়, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই।

চৈত্র ও বৈশাখ পার হইয়া গেল, জ্যৈষ্ঠও যায়। ১৩০৪ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের ৩১শে দিবস সন্ধ্যাকালে, শশাঙ্ক তদীয় বাস্তু-ভবনের বহিঃখণ্ডে, বিগ্রহমণ্ডপের বারিন্দায় বসিয়া, সায়ংসন্ধ্যার মন্ত্র পড়িতেছেন; এবং একটুকু হৃষ্ট, একটুকু ক্লিষ্ট, একটুকু প্রীত, একটুকু ভীতচিত্তে, আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছেন। যে ব্যক্তি সাধ্বী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করিয়া, অর্থলোভে অথবা কোনরূপ অমূলক মনঃক্ষোভে, পুনরায় বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়, সে বিগ্রহমণ্ডপে উপাসনায় উপবিষ্ট রহিয়াও হৃদয়ে শান্তি পায় না।

বিগ্রহমণ্ডপ উত্তরের ভিটার ঘর। ঐ ঘরে একটি বই দ্বার নাই। সেই দ্বার দিয়া ঘরের লোক বারিন্দায় আসিতে পারে, এবং বারিন্দা হইতে ঘরে প্রবেশ করা যায়। ঘর

খানিরে খড়ের কুটীর বলিলেই সঙ্গত হয়। উহার মধ্য হইতে বহির্গমনের জন্য বারিন্দাই একমাত্র পথ। শশাঙ্ক, সেই বারিন্দায়, উত্তরমুখ হইয়া, দ্বারের সম্মুখে বসিয়া আছেন।

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। এমন সময় সহসা ঘরের দিকে শশাঙ্কের দৃষ্টি পড়িল; এবং শশাঙ্ক স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, ঘরের দ্বারদেশে একটি সধবা রমণী দণ্ডায়মানা। রমণীর হাতে শাঁখা, ললাটে সেকেলে ধরণের সুবৃহৎ সিন্দূর-বিন্দু, পরিধানে লালপেড়ে একখানি সাধারণ শাড়ী,—মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন, অথচ বাৎসল্যস্নেহের পরিপূর্ণতায় শান্তিপ্রদ। দৃষ্টিমাত্রই শশাঙ্ক বুঝিলেন যে, রমণী পৃথ্বীবাসিনী নহেন। কারণ, তাঁহার শরীরে একটুকু অপূর্ব্ব শুভ্র জ্যোতিঃ ছিল। তাদৃশ জ্যোতিঃ পৃথিবীতে মানুষের শরীরে পরিলক্ষিত হয় না।

শশাঙ্কের শরীর শিহরিল, বুকও একটুকু কাঁপিল, কিন্তু ভয় হইল না। রমণীর চক্ষে এমনই একটু বিচিত্র স্নেহময় কোমলতা ছিল যে, সে দিকে দৃষ্টি পড়িলে চিত্তে আর ভয় থাকে না। শশাঙ্ক বিদ্যারত্ন, তথাপি কেমন এক প্রকার ভীত-ভীত অথবা ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?" রমণী উত্তর করিলেন, "আমি তোর গর্ভধারিণী—মা।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শশাঙ্ক পাঁচ মাসের বয়স অবধি মাতৃহীন। তিনি যখন জানিতে পাইলেন যে, পুরোবর্ত্তিনী রমণী তাঁহার মা, তখন তাঁহার হৃদয়ে কেমন একটা ভাবের প্রবাহ প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। তাঁহার দেহ কণ্টকিত, অথচ জিহ্বা পরিস্ফুট শব্দোচ্চারণে অসমর্থ। তিনি, বহুচেষ্টায়, যুক্তকরে, এইমাত্র আবার কহিলেন,—"মা" !—

রমণী কহিলেন, "হাঁ অবোধ, আমিই তোর মা। তুই আমায় চিনিবি কেমন করিয়া? তোরে পাঁচ মাসের শিশু রাখিয়া, আমি পৃথিবীর তনু পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু, আমি মাঝে মাঝে তোকে দেখিয়া যাই,—তোর সংবাদ লই,—আমি তোর সকল কথাই জানি। তুই মনে অতি মন্দ সংকল্প ঠাঁই দিয়াছিস্ বলিয়া, আজি আমি তোকে দেখা দিলাম। তুই আর এক বিবাহ করিবি বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছিস্। সাবধান, এমন কুকার্য্য করিয়া পাতকে ডুবিস্ না। তুই আবার বিবাহ করিলে, তোর সংসার নষ্ট হইবে,—তোর অনেক প্রকার বিপদ ঘটিবে।"

শশাঙ্ক, মায়ের মুখের এই কঠোর শাসনবাক্য শুনিয়া, ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ রহিলেন। তার পর, যেই মাতাকে প্রণাম করিবার জন্য মনন করিতেছেন, অমনি চাহিয়া দেখিলেন, মা সেখানে আর নাই! শশাঙ্ক, অতিমাত্র দ্রুতপদে, নারায়ণের বিগ্রহমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি আরও বেশী বিস্মিত হইলেন। কারণ, সেখানে তাঁহার মা, কিংবা জন-প্রাণী, কেহই নাই!

শশাঙ্কশেখর বিদ্যারত্ন, ১৩০৪ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, এইভাবে, স্বর্গগত মাতার পবিত্র মূর্ত্তি চক্ষে দেখিয়া, এবং মায়ের আদেশবাণী

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কানে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎই দ্বিতীয় বার বিবাহের কুৎসিত সঙ্কল্প হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেলিলেন ; এবং আপনার ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নীর সহিত প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে গৃহধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শশাঙ্কের দাম্পত্যজীবন এক্ষণ সর্ব্বপ্রকারেই সুখ-শান্তির পুষ্পিত নিকেতন। কিন্তু, তাঁহার মনে নিয়তই এই কথা জাগে যে, তাঁহার লোকান্তরিতা মাতাই এই সাংসারিক সুখশান্তির প্রস্রবণরূপা। হৃদয়িক হিন্দু শিক্ষিত হউক, অশিক্ষিত হউক, সে পরলোক-গত পিতামাতার উপাসক। এই উপাসনারই এক নাম তর্পণ, আর এক নাম শ্রাদ্ধ। কিন্তু, শশাঙ্ক যে তাঁহার মাতার উপাসনা করেন, তাহা একটুকু পৃথক্ ভাবে। কেন না, তিনি ইহা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার মাতা, দেব-ধাম-নিবাসিনী হইয়াও, দূরবর্ত্তিনী নহেন। হয় ত শ্রাদ্ধ-তর্পণের সময়, তিনি সম্মুখে থাকিয়াই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ দান করেন।

শশাঙ্ক বিগত ছয় মাসের মধ্যে, আর এক দিন তাঁহার মাতৃদেবীকে চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং মায়ের মুখের কথা পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট শুনিয়াছেন। এই শেষ দর্শনের দিবস তিনি আর ক্ষণপ্রকটা ছায়ামূর্ত্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই। দেখিয়াই, মা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। শশাঙ্ক আমাদিগের একটি শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ। তিনি আমাদিগের নিকট যজ্ঞোপবীত স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধে যথাযথ বিন্যস্ত হইল। তবে, এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, তাঁহার প্রকৃত নাম শশাঙ্ক নহে। পাছে নাম প্রকাশ করিলে, তাঁহার পারিবারিক কথা লইয়া পাঁচ জনে আলোচনা করে, এইজন্যই তিনি প্রকৃত নাম গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই নাম-পরিবর্ত্ত ভিন্ন, আর সকল কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শশাঙ্ক, ব্রাহ্মণপণ্ডিত-শ্রেণির লোক হইয়াও, বান্ধবের ছায়াদর্শন-কাহিনী পাঠ করিবার জন্য সতত অধীর। তাঁহার বিশ্বাস যে, মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক শান্তির জন্য, ইহা অপেক্ষা মঙ্গল্য কথা আর সম্ভবে না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন

১। "শিশুতোষ। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী অবলম্বনে শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত। মূল্য এক আনা।" শিশুদিগের বর্ণশিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এক শত পুস্তক রচিত হইয়াছে ; সেই এক শতের মধ্যে এই একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ। আমরা বাবু মনোমোহনের আর কোন পুস্তক কখনও পাঠ করি নাই। কিন্তু

তাঁহার এই শিশুপাঠ্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, ভাবুকতা আছে, আর বিষয়-বিন্যাসের উপযোগি সুকোমল শব্দগ্রন্থন-নৈপুণ্যও প্রচুর আছে। তাঁহার পক্ষে, এই শিশুতোষ-রচনায়ই সাহিত্যিক উদ্যমের শেষ হওয়া উচিত নহে। শিশুতোষে শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার অবশ্যই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা,—নব, ঘন, ডগ-মগ, কোন, কেন, হেন, যেন; কতকগুলির হয় না, যথা ফল, জল, কল, ছল। গ্রন্থকার এই উভয়প্রকার শব্দের শ্রেণীভেদ করিয়া শব্দপাঠ রচনা করিলে, পুস্তকখানি, আমাদিগের বিবেচনায়, ছাত্রশিক্ষার অধিকতর উপযোগি হইত।

২। অর্ঘ্য। শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত। ইহা একখানি কবিতাপুস্তক। গণিয়া দেখিলাম ইহাতে অর্ঘ্য, আভাষ, ভ্রান্তপথিক, অতীতের স্মৃতি ও অনুতপ্তা অহল্যা প্রভৃতি একাত্তরটি কবিতা আছে। এই একাত্তরের কোন কোন কবিতা,পাঠ সময়ে,হৃদয়কে আকর্ষণ করে,—হৃদয়ে প্রীতিপ্রদ বস্তুর ন্যায় অনুভূত হয়। ইহা নিশ্চয়ই নূতন কবির পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা। কিন্তু,অর্ঘ্যকাব্যের সকল কবিতা এ প্রশংসা পাইতে অধিকারি নহে। আমরা 'বেতসীকুঞ্জে শকুন্তলা' নামক একটি কবিতা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলাম; অথচ, পড়িয়া শেষ করিতে পারিলাম না। আমরা যে শকুন্তলাকে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অলৌকিক পটে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া, মহাকবির মনোহর ভাষায় আপনা আপনি কহিয়াছি যে,—"নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি"—সেই শকুন্তলার কোন চিহ্নই অর্ঘ্যের কবিতায় দেখিতে পাইলাম না। ওথেলোর চিত্রও শকুন্তলাচিত্রের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কালিদাস ও শেক্সপীয়রের তুলিরচিত আলেখ্যের উপর পুনরায় তুলিপাত করিতে যাওয়া সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

৩। "জাতিতত্ত্ব, প্রথমভাগ। বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু, দ্বিতীয় শিক্ষক, বাবুর হাট হাইস্কুল, ত্রিপুরা।" এখানি জাতিতত্ত্বসংক্রান্ত বিচারবিষয়ক একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ, এবং ইহার উদ্দেশ্য বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ক্ষত্রত্ব প্রতিপাদন। আমরা এ পুস্তকের সমালোচনা করিব না। কারণ বান্ধব সাহিত্যপত্র। উহাতে আমরা কায়স্থজাতির ক্ষত্রত্ব সম্পর্কে কখনও কোন কথার অবতারণা করা উচিত মনে করি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন; পুস্তকখানি শাস্ত্রীয়শ্লোকাদির এক অপূর্ব্ব পেটক। কায়স্থমাত্রেরই ইহা শ্রদ্ধার সহিত কাছে রাখা বাঞ্ছনীয়; এবং যাঁহারা জাতিতত্ত্বের প্রকৃত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি আগাগোড়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১২ সন। [২য় ৩য় সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

২।৩

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের যুগ্মসংখ্যা, নয় ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইল। বৈশাখের সংখ্যায় এক ফর্ম্মা বেশী গিয়াছে। অবশিষ্ট দুই ফর্ম্মা শ্রাবণের সংখ্যায় থাকিবে। গ্রাহকবর্গই বান্ধবের একমাত্র আশ্রয়। ভরসাকরি, আমরা তাঁহাদের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইব না। গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ মূল্য প্রেরণ করিয়া, আমাদিগকে উপকৃত করুন। যাঁহাদের নিকট মূল্য বাকী আছে, আমরা আগামী শ্রাবণের সংখ্যা হইতে তাঁহাদিগের নিকট ক্রমে ক্রমে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিব। ভিঃ পিঃতে মূল্য দিতে যাঁহাদের আপত্তি থাকে, তাঁহারা দয়া করিয়া পূর্ব্বেই জানাইবেন।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৵০	৩।৵০
ষাণ্মাসিক	২৲	৵০	২৵০

পশ্চাদ্দেয়।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৪৲	।৵০	৪।৵০
ষাণ্মাসিক	২॥০	৵০	৩।৵০

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারি-সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হয় না। কারণ, তাঁহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। গ্রাহক-নম্বর ব্যতিরেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যেও বড় অসুবিধা ঘটে। **সুতরাং গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে কিংবা মূল্য প্রেরণ করিবার সময় দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না। নূতন গ্রাহকেরা "নূতন" এই শব্দের উল্লেখ করিবেন।**

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

☞ কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

বান্ধব-কুটীর,—ঢাকা।
১৩১১ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ
বি, এ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

কাল—কত কাল ?

(২)

"Time is Eternity
Pregnant with all Eternity can give".
(Young.)

ইহা বুঝিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি বলিয়াই বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছি যে, কালের আরম্ভ মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। মনুষ্যের বুদ্ধি, বিচারশক্তি, চিন্তা ও কল্পনা, এ জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে,—সকল তত্ত্বেরই আদি ও অন্ত চিন্তা করিতে কতকটা সামর্থ্য রাখে। কিন্তু, কালের আদিম অবস্থা অথবা আরম্ভমুহূর্ত্ত চিন্তা করা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য। কোটি কোটি—অনন্তকোটি বর্ষ কাল অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধদিকে প্রধাবিত হও, তথাপি কাল ফুরায় না,—কাল যে কালে আরব্ধ হইয়াছে, বুদ্ধি সেখানে যাইয়া পঁহুছিতে পারে না; এবং কোটি কোটি—অনন্তকোটি বর্ষ কালকে, যুগ-ব্যবচ্ছেদে, শত সহস্র ভাগে ভাগ করিয়া, কালের একটা আদ্যন্ত কল্পনা করিতে যত্নবান্ হও, চিত্ত তথাপি চিন্তা করিবার জন্য পথ পায় না।

কালের আরম্ভচিন্তা যেমন মনুষ্যের অসাধ্য, কালকে নিরাধার—নিরালম্ব—নিঃসত্ত্ব অর্থাৎ জীবনশূন্য, অথবা সর্ব্বতোভাবে শূন্যাত্মক চিন্তা করাও মনুষ্যের অশক্য। কাল ছিল, অথচ সে কালকে ব্যাপিয়া আর কিছু অথবা কেহই ছিলেন না, মনুষ্য ইহা ভাবিতে পারে না,—মনুষ্যের বুদ্ধি অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়াও এমন অন্তঃশূন্য অন্ধকারময় সিদ্ধান্তে আশ্রয় লইতে সমর্থ হয় না। পারে না বলিয়াই, ইয়ুরোপীয় পুরাতন দার্শনিকদিগের সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্বকথা—"Ex Nihilo Nihil Fit" এবং আধুনিকদিগের "Nothing comes out of Nothing" অর্থাৎ অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না; এই মহাসত্য দার্শনিক-সাহিত্যে অভ্রান্ত সত্যের মত আসন পাইয়াছে। যাঁহারা এই দুইটি বাক্য সর্ব্বদা মন্ত্রবৎ জপ করেন, কালের আরম্ভচিন্তা তাঁহাদিগের বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইলেও হৃদয়ে আনন্দময় ভোজ্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ, সেই অনাদিকাল ভাবিতে গেলেই, হৃদয়, অনাদিকালের আধার অথবা প্রাণদেবের স্বরূপচিন্তায়, সংসারের সুখ দুঃখ ভুলিয়া যায়।

কিন্তু, যিনি সেই অনাদি কালকে ব্যা-

পিয়া অবস্থিত আছেন, তিনি কি?—তিনি কেমন? তাঁহার সম্পর্কে আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, আমাদিগকে এই পর্যান্ত অবশ্যই বুঝিতে হইবে,—অবশ্যই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, এই অনন্ত সংসারে আমরা এইক্ষণ সজীব ও নির্জীব, সচেতন ও অচেতন, সুন্দর ও কুৎসিত, সূক্ষ্ম ও স্থূল, যাহা কিছু দেখিতেছি,—যে কোন পদার্থের পরিচয় পাইতেছি, তিনিই তাহার বীজস্বরূপ অথবা প্রস্রবণ।

চিন্তার এ পদ্ধতি একটুকু শ্রমসাধ্য, তথাপি ইহা অপরিহার্য্য। চাহিয়া দেখ, আজি গ্রামের প্রান্তবর্ত্তি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, শত শাখায় প্রসারিত হইয়া, শতসহস্র কীট-পতঙ্গ এবং কলকণ্ঠ ও কর্কশকণ্ঠ বিহঙ্গের বোঝা বহিয়া,—কোটরে কোটরে কালসর্প অথবা কম-কলেবর ক্ষুদ্র-জীবের আশ্রয়ভূত হইয়া, কি ধীর-স্থির অপরূপ শোভায় বিরাজিত রহিয়াছে!

এ বটবৃক্ষ পূর্ব্বে কোথায় ছিল? উত্তর —একটি সর্ষপপ্রমাণ বীজ-মধ্যে। যে বীজের মধ্যে আজিকার এই প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান বিরাট বট অলক্ষিত ভাবে নিহিত ছিল, সেই বীজ নিশ্চয়ই এইরূপ অনন্তকোটি বটের নিদানস্বরূপ। কারণ, যখন সেই বীজ হইতে একটি বট ফুটিয়াছে, এবং একটি বটের বীজনিবহ হইতে এক সহস্র বটের উৎপত্তি প্রতি দিন আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন ঐ আদিভূত বীজকে অনন্ত কোটি বটের প্রসূতি কিংবা প্রস্রবণ বলিতে কোন অংশেও আপত্তি হইতে পারে না।

এইরূপ আবার চাহিয়া দেখ, আমাদিগের নয়নের পুরোবর্ত্তি এই প্রকাণ্ড বিশ্ববট, অনন্ত কোটি শাখায় প্রসারিত হইয়া, অনন্ত কোটি পাখীর বোঝা বহিয়া, পল্লবে পল্লবে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ উপগ্রহ, অথবা অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তিষ্ঠিয়া থাকিবার স্থান দান করিয়া, কি বিচিত্র শোভা ও সামর্থ্যে বিলসিত হইতেছে! গ্রামচৈত্যের বট সম্বন্ধে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই বট সম্বন্ধেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিব, ইহা পূর্ব্বে কোথায় ছিল? উত্তর,—কালের আধারভূত সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর, অচিন্ত্য শক্তির অভ্যন্তরে। কালের প্রাণরূপিণী সেই অনাদ্যা শক্তিকে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানীরা যে সকল ভাবার্থগম্ভীর পবিত্র নামে পূজা করিয়াছেন, তাহার একটি নাম—কালী। এ নাম এখনকার বিজ্ঞান-দীক্ষিত নব্যবুবার কর্ণে প্রীতিকর হইবে কি? জ্ঞানীরা গদ্‌গদ কণ্ঠে স্তুতি করিয়া কহিয়াছেন,—

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ,
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কাল-সংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী,
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে।
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতি,
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে।
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী,
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা।

নামে কিছু আসে যায় না। কালের

প্রাণ-দেবকে তুমি তোমার অপূর্ণ মানুষী ভাষার বর্ণ যোগে শব্দ রচনা করিয়া, যে কোন নামে ইচ্ছা সেই নামেই, চিন্তা অথবা ধ্যান করিতে পার। কিন্তু ইহা তোমাকে নিশ্চয়ই মানিতে হইবে, এই মহাসত্যকে তোমার প্রাণের অভ্যন্তরে সতত পুষিয়া, হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে গাঁথিয়া লইতে হইবে যে, তুমি এই বিশ্ববটের শাখা ও প্রশাখায় এবং শত সহস্র পল্লবে আজি যাহা কিছু দেখিয়া বিস্মিত,—যাহা কিছু পাইয়া প্রীত, পরিপোষিত ও মোহিত হইতেছ, তাহা সেই অনাত্মা হইতেই প্রসূত হইয়াছে।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার চারি যুগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষা-সংক্রান্ত তৃতীয় যুগের সহিত ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার অধঃপাত যুগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্ম্মের অখণ্ড-প্রভাবে যখন সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত, বোধ হয়, এ কথা বলা অসঙ্গত নহে যে, তখনই আর্য্যসভ্যতা বিকাশ ও উন্নতির চরম অবস্থায় পঁহুছিয়াছিল।—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত এক রাজার অধীন ;—একই শাসন-নীতি দ্বারা সমগ্র দেশ শাসিত, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের রাজকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। ভারতের বাণিজ্য, তখন বিনা জাতিপাতে, অবাধে 'কালাপানি' পার হইয়া, দিগ্দিগন্তে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। ভারতের ধর্ম্মে এখ চীন, তাতার, তিব্বত ও জাপান প্রভৃতি দেশ, এবং সাগর-পরিখা-বেষ্টিত দ্বীপ ও উপদ্বীপসমূহ পরিপ্লাবিত হইতেছে। ভারতের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবিধ দেশের বিবিধ ভাষায় লিখিত, পঠিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়া পৃথিবীর সসম্মান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভারতের দর্শন ও বিজ্ঞান, তখন চরম উৎকর্ষে উদ্ভাসিত ও আর্য্যজাতির অতুল কীর্ত্তিরূপে পরিস্ফুট হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদে ধন্বন্তরির প্রতিভাপূর্ণ প্রভায় ফুটিয়া পড়িয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এক হস্তে সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র ও উপগ্রহ প্রভৃতি নভোমণ্ডলবিহারী জ্যোতিষ্কনিচয়কে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া, উহাদিগের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও গতিবিধির নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতেছে, এবং অন্য হস্তে, জ্যোতিষ্কের প্রস্ফুট আলোকে, নিয়তির পট উদ্ঘাটন করিয়া মানুষকে তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ এক সঙ্গে দেখাইয়া দিতেছে। ধর্ম্ম-নীতি, রাজ-নীতি ও সমাজ-নীতি, বিপ্লব-বিঘটনে যেন নূতন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া, "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহাভাবে, আপন আপন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছে।

এই সময়ে, লেখা পড়ার প্রয়োজন, সমাজের সকল অঙ্গেই, বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং লেখা পড়া এবং অন্যবিধ শিক্ষা-প্রক্রিয়াও সকল সমাজেরই নিত্য পরিগৃহীত বিষয় হইয়া পড়ে। এই সময়ে, কিবা পুরুষ কিবা স্ত্রীলোক, সকলকেই শৈশবে কোন না কোনরূপ শিক্ষাপ্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত।

এই অভ্যুত্থান, জানি না, কোন্ কাল-প্রেরিত দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে, সর্ব্বাঙ্গীণ পতনেরই পূর্ব্ব-সূচনা হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাণ-নিহিত কি যেন একটা অভাব, খুত বা ক্ষত আশ্রয় করিয়া, নিগৃহীত বৈদিক ধর্ম্ম ভারতে আবার জাগিয়া উঠিল। বৈদিক ধর্ম্মের প্রধান অবলম্ব ভক্তি। এই ধর্ম্ম-বিপ্লবে, যদি তদানীন্তন বৌদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বাবয়বে অক্ষুণ্ণ রহিয়া, কেবল ভক্তির একনিষ্ঠভাবে উহার জীবনসঞ্চার হইত, তাহা হইলে, ভারতীয় সভ্যতার এক অঙ্গও স্খলিত হইত না, এক কণাও খসিয়া পড়িত না। কিন্তু ভারতের গ্রহবৈগুণ্যে কার্য্যে তাহা হইল না। বৌদ্ধ-বিগ্রহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,—এক প্রকার অচিহ্ন করিয়া, সেই ভগ্নাবশেষের উপর ভক্তির ধর্ম্ম, প্রেম-পীযূষের পরিবর্ত্তে, শক্তির অসি করে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। ঈর্ষ্যা, হিংসা ও দ্বেষ পূর্ণমাত্রায় সন্ধুক্ষিত হইয়া, ভয়ঙ্কর আত্ম-কলহের সৃষ্টি করিয়া দিল। একচ্ছত্র ভারতসাম্রাজ্য, বিষ্ণুচক্রে একান্ন অংশে ছিন্ন, সতী-দেহের ন্যায়, পুনরায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক রাজ্য আর এক রাজ্যের বিপক্ষে খড়্গাহস্ত। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মর্ম্মকৃন্তনে নিষ্কোষিত-অস্ত্র। ভারত এইরূপে আত্ম-কলহে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িলে, ভিন্ন সভ্যতার ভিন্ন উপাদান আত্ম-শক্তি-প্রভাবে ভারতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, অদৃষ্টচক্রের গতি, অন্য প্রকারে আবর্ত্তিত করিল। আর্য্যসভ্যতার পুরাতন গৌরব চিরতরে অস্তমিত হইয়া গেল!

বিধাতার ইচ্ছায়, কালে,—দুঃখের দুর্দ্দিনে, ভারত এইরূপে হীনদশাগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িলে, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবে সমগ্র দেশ পর্য্যুদস্ত ও বিপ্লুত হইতে লাগিল। রাজ-নীতি, সমাজ-পদ্ধতি, ধর্ম্মজীবন ও গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা, আহার, বিহার, পোষাক, পরিচ্ছদ, রীতিনীতি ও শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্রমে স্ত্রীজাতির পক্ষে লেখা পড়া শিক্ষা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ বা দূষণীয় কলঙ্করূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে, কোন কুলকামিনী ভ্রম-ক্রমেও কাগজে কালির আঁচড় দিয়া একটা অক্ষর অঙ্কিত করিলে, যে পরিমাণ ভীত সঙ্কুচিত বা কলঙ্কিত হইয়া পড়িতেন, বোধ হয়, চোর চুরি করিয়াও সেই পরিমাণে শঙ্কিত, ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না। কালক্রমে ভারতে. বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিখিবার প্রথা একবারে রহিত হইয়া গেল।

স্ত্রীজাতি বলিয়া কথা কি?—এই ঘোর দুর্দ্দিনে,—ভারতের এই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন

অবিদ্যা-যুগে, পুরুষজাতিও ক্রমে বিদ্যাবিমুখ হইয়া পড়িল। জঠর-জ্বালাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আর্য্যোচিত স্বাভাবিক জ্ঞান-তৃষ্ণা যেন প্রশমিত হইয়া আসিল। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্যরূপ হইয়া উঠিল। এই সময়ে, প্রায়শঃ কেহই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেন না। অর্থের জন্য লেখা পড়া শিখিতেন,—উদরান্নের নিমিত্ত কালিকলমের আশ্রয় লইতেন। সর্ব্বত্রই অর্থকরী বিদ্যার আদর বাড়িয়া পড়িল;—জ্ঞানকরী অজ্ঞানের অন্ধ অবহেলায়, অন্ধকারে ডুবিয়া রহিল। সুতরাং, একদিকে বেদবেদান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রচলিত হইয়া বিস্মৃতির কক্ষে আশ্রয় লইল; —পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের" কামনায়, তিলক ও নামাবলীর আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। আর এক দিকে, কাব্য ও সাহিত্য অঙ্গে অঙ্গে বিকৃত বা জারিত-ভস্মে পরিণত হইয়া, যাত্রা ও কবির আসরে অকিঞ্চিৎকর 'ফিরতীর' লালসায়, হীনতরবৃত্তি অবলম্বন করিল; এবং দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মস্তিষ্কের পীড়ক অনর্থকর অবস্তুরূপে, কতিপয় "ভাবশূন্য শুষ্ক প্রণামের" কাঙ্গাল সংসার-অনভিজ্ঞ অধিবয়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া, সর্ব্বসাধারণের জন্য পারসীর বয়েত, সেরেস্তার কাগজপত্র ও মামলামোকর্দ্দমার দলিলদস্তাবেজের পসরা খুলিয়া দিল!

বিদ্যা অর্থকরী। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ধন উপার্জ্জন। এই সংস্কার ধীরে ধীরে সমাজের অস্থিমজ্জাগত ভাব হইয়া দাঁড়াইলে, এদেশে স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়া গেল। অন্তঃপুরচারিণী পুর-স্ত্রী ত আর পুরুষের মত কানে কলম গুঁজিয়া, চাকরি করিতে যাইবে না? তবে তাহাদিগের লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন কি? শুধু প্রয়োজনাভাব এমন নহে;—স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চাকরি করিবে, এরূপ উক্তি কেহ মুখের বাহির করিলেও, প্রাচীন কালের ভদ্রলোকেরা "রাম রাম" বলিয়া কানে হাত দিতেন। বস্তুতঃই এক সময়ে, ইহা এ দেশে ভদ্রলোকের জাতিপাত ও দুঃসহ কলঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। লেখা পড়া শিখিলে, পাছে কোন পুর-স্ত্রীর এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায়ই, স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার প্রতি সমাজের ঘোরতর অভিসম্পাত প্রযুক্ত হইল।—লেখা পড়ার স্কন্ধে বন্ধ্যাত্ব ও অকাল-বৈধব্য ইত্যাদি স্ত্রীজাতির চির-প্রাণাতঙ্ক বহু বিপত্তির অপবাদ চাপিয়া পড়িল। স্ত্রীজাতি কলম ছাড়িয়া তুলি ধরিলেন; অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সূচীকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা এইরূপে লেখা-পড়া ছাড়িলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের শিক্ষার পথ একবারে বন্ধ হইয়া গেল, এমন কথা নহে। তাঁহারা নিজেরা অধ্যয়নাদি করিতেন না সত্য, কিন্তু অন্য প্রকারে অধ্যয়ন-

জনিত কণ্ যোড়শ-উপচারে তাঁহাদিগের ভোগে আসিত। বলিতে কি, এ অংশে, পুরুষ অপেক্ষাও স্ত্রীলোকেরা, এই যুগে, কোন কোন দিকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রায় প্রত্যহই আপন আপন দৈনিক গৃহ-কর্ম্ম সমাধা করিয়া পাড়াপ্রতিবেশিনী পাঁচজনে মিলিয়া, একত্র হইয়া বসিতেন। গ্রামের কোন পূজ্যপ্রকৃতি বৃদ্ধ কিংবা কোন বিনীতস্বভাব যুবক অথবা কোন শিষ্ট, শান্ত বালক তাঁহাদিগকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কিংবা বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে লিখিত কোন পৌরাণিক প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহারা একাগ্র মনে উহা শুনিতেন। কখনও সীতার দুঃখে তাঁহাদের চক্ষে জল ঝরিত; কখনও কৌশল্যার ভাবে তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত; কখন কখন বা তাঁহারা সাবিত্রীর পবিত্র চরিত্র চিন্তা করিয়া, আনন্দভরে ডগমগ হইতেন। বালিকা ও যুবতী কন্যা এবং কোণের বধূরা আবার, বাড়ীর প্রাচীনাদিগের মুখে প্রস্তাব শুনার ছলে, ঐ সকল কাহিনী শুনিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। ইহা ব্যতীত, রামমঙ্গল, ঢপ ও যাত্রা গায়কের দল প্রায় প্রতিনিয়তই গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া বেড়াইত। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া তাহাদিগের গান শুনিতেন। এই সকল গীতের আমোদেও শিক্ষার পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়া পড়িত।

এই সময়ে, এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ বা উপায় ছিল,—পাঠকের কথকতা। স্ত্রীলোকেরা পুণ্যসঞ্চয়-কামনায় কৃতসঙ্কল্পা হইয়া, ধর্ম্মভাবে পাঠকের পাঠ শ্রবণ করিতেন। পাঠককর্ত্তৃক বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, অথবা অন্য কোন পুরাণ গ্রন্থ বা প্রসঙ্গ পঠিত হইত। বাটীর কর্ত্তা বা কর্ত্রীর রুচি, প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা অনুসারে এক একখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইত, পাঠক, প্রতিদিন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া, সমগ্র গ্রন্থের সমস্ত অংশ পড়িয়া ফেলিতেন। যে গ্রামে পাঠ হইত, সেই গ্রামের সর্ব্বসাধারণ আগ্রহের সহিত উহা শুনিত। পাঠ-শ্রবণে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীশ্রোত্রীদিগেরই আগ্রহ, উৎসাহ ও ভক্তি বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহারা একবার প্রাতে স্নাত ও পূত অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া, মূলগ্রন্থের সংস্কৃত পারায়ণ শ্রবণ করিতেন। অপরাহ্নে পাঠককর্ত্তৃক, প্রাতে পঠিত অংশের, সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় ও ভাবে, বিশদ ব্যাখ্যা হইত। সুদক্ষ পাঠক এই ব্যাখ্যার সময়, নানা রসের অবতারণা করিতেন। শ্রোতৃবর্গ যার-পর-নাই প্রীত, আমোদিত ও মোহিত হইয়া পড়িতেন। কথকতায় অভিনয় থাকিত ও নানা রাগরাগিণীসম্বলিত বিবিধ গীতের অনুষ্ঠান হইত।

যে গ্রামে কিংবা পল্লীতে যখন কথকের কথা হইত, সেই গ্রাম বা পল্লীর প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকদিগেরই তখন ঐ কথা শুনা অবশ্য

কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিত। তাঁহারা আত্মহারার মত বসিয়া উহা শুনিতেন এবং এইরূপে, অলক্ষিতভাবে, মুনি ঋষিদিগের পুণ্যাশ্রমে কথিত পুরাতন পুণ্যপ্রসঙ্গের প্রাণ-নিহিত রত্ননিচয়, তাঁহাদিগের আপন আপন প্রাণের কথা হইয়া যাইত। অনেক সময়, উহাই তাঁহাদিগের জীবন-বর্ত্মে আ-লোক-বর্ত্তিকার ন্যায় কার্য্য করিত। ঈদৃশ শিক্ষা-প্রণালীর ফলে, তাঁহারা শিক্ষিত বিষয়ের সহিত এতদূর তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন যে, তাঁহাদের কেহ, ভাগ্যদোষে, পুত্র হারাইলে, "আমার রামরে" বলিয়া কাঁদিয়া চিত্তের জ্বালা জুড়াইতেন; বৌ মরিলে, "আমার সীতালো" বলিয়া চীৎকার করিতেন। যে সময়ের পুত্র মাত্রই রাম এবং বৌ মাত্রই এইরূপ সীতাপদ-বাচ্য, সে সময়ের শিক্ষা যে পবিত্রতার দিক্‌দিয়া খুবই উন্নত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায়, অনিচ্ছায়, বেতের ভয়ে নীতি কথার অধঃকরণ, আর এইরূপ সুখ-প্রীতিকর মধুর উপায়ে, আপন আপন প্রাণের টানে, নীতিসূত্রে জীবনের গ্রন্থিবন্ধন, এই দ্বিবিধ শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর ফলপ্রদ, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে তাহা বলিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

এইরূপে এদেশের স্ত্রীজাতি আপনারা লেখা পড়ায় বঞ্চিত রহিয়াও, আর এক প্রকারে, দেশ ও সমাজের উপযোগিনী সুশিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা, তখন এইরূপ শিক্ষার মাহাত্ম্যে, অবস্থা বিশেষে, এক হিসাবে তদানীন্তন পুরুষ জাতি অপেক্ষাও যে এক গ্রাম উর্দ্ধে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বোধ হয়, কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

তাঁহারা গৃহকর্ম্মকেই নারীজীবনের অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন, এবং গৃহিণী কিংবা গৃহলক্ষ্মী নামেই সর্ব্বান্তঃকরণে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতেন। শত "সরস্বতী" আখ্যা অপেক্ষাও নিরাভরণা 'গৃহিণী' নামটিই তাঁহাদিগের নিকট অধিকতর গৌরবাত্মক উপাধিরূপে সম্মানিত ছিল। তাঁহারা বিনা অধ্যয়নে শিক্ষালাভ করিতেন। যাঁহারা, তাঁহাদিগের সেই নিত্যস্থায়ি অনধ্যায়ের অধ্যাপিকা ছিলেন, তাঁহারা ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী বা মানবদেহে মূর্ত্তিমতী দেবী। এ দেশের পুরমহিলারা তখন গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন, দ্রৌপদীর কাছে। পতিসেবা বা সতীধর্ম্মের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, সীতা বা সাবিত্রী। কর্ণের মহিষী পদ্মা শিখাইতেন অতিথি-সৎকার। তাপস কন্যারা, সেবাব্রত ও দয়ার করুণ-ধর্ম্ম।

এইরূপে, এই সময়ে, অতি পুরাতন কালের অর্থাৎ সেই শ্রুতি ও স্মৃতিযুগের শিক্ষা-পদ্ধতিই যেন, একটু রূপান্তরিত অবস্থায়, এ দেশের নারীসমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা পরের মুখে শুনিয়া শুনিয়া শিখিতেন; এবং শ্রুত কথা স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিয়া, সেই আদর্শে, আপনাদিগের রীতি, চরিত ও জীবন গঠন করিয়া লইতেন।

তাঁহারা সুখ-বিলাস কাহাকে বলে জানিতেন না; তাৎকালিক শিক্ষাপদ্ধতি ও সামাজিক অবস্থানে তাহা জানিবার জন্যও তাঁহাদিগের তত প্রবৃত্তি হইত না; প্রয়োজনও ঘটিত না। তাঁহারা অল্পে তুষ্ট থাকিতেন। সামান্য বসন-ভূষণে, এমন কি, হাতের দুগাছি শাঁখা ও সিঁথির এক বিন্দু সিন্দুরেই, পতিগৌরবে গৌরবিণীর পূর্ণতৃপ্তি হইত। এই শিক্ষা গুণেই, একদিন, নবদ্বীপের এক বেশভূষণ বিহীনা কাঙ্গালিনী ব্রাহ্মণপত্নী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপতির গৌরবে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই কুটিরবাসিনী দুঃখিনীর হাতের লাল সূতাগাছি যে দিন খসিয়া পড়িবে, সে দিন নবদ্বীপ অন্ধকার হইবে।"*

ফলতঃ, সে কালের তথাবিধ শিক্ষায় শিক্ষিতা মহিলারা, অধিকাংশ স্থলেই, মা অন্নপূর্ণার ন্যায় গৃহ আলো করিয়া রহিতেন। দেশের ঘরে ঘরে, স্নেহ, প্রীতি ও দয়ার দর্ব্বীতে পীযূষ-অন্ন বিতরিত হইত। পরিজনদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে পরিতৃপ্ত ভোজন করাইতে পারিলেই. গৃহিণীরূপিণী গৃহাধিষ্ঠাত্রী মা অন্নপূর্ণাদিগের দৈনিক ব্রত সুখে উদ্‌যাপিত হইত। গুরুজন ও পতি, পুত্র প্রভৃতির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেই তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে চলিয়া যাইত; অনশনেও অনশন-জনিত কষ্ট বোধ থাকিত না। তাঁহারা সর্ব্বাংশেই শীলতা, শিষ্টতা, ভব্যতা ও লজ্জার প্রতিকৃতি স্বরূপা ছিলেন। সেই অন্তঃপুরচারিণী, অন্তরালবর্ত্তিনী দয়াময়ীদিগের করুণ-দৃষ্টিতে পথশ্রান্ত অতিথি পরগৃহে স্বগৃহের শান্তি অনুভব করিতেন; দীন দুঃখী ও সন্তাপ-সন্তপ্ত আর্ত্তজনের প্রাণের জ্বালা বিদূরিত হইত। কোন সম্পর্কিত ব্যক্তি অভ্যাগতরূপে গৃহে উপস্থিত হইলে. অন্তঃপুরের হুলুধ্বনিতে তাঁহার সাদর সংবর্দ্ধনা হইত।

তখনকার পুর-কামিনীরা বিপদে সহানুভূতি, রোগে শান্তি এবং অনেক সময়, মরণেও পতির সহচারিণী সঙ্গিনী ছিলেন। রন্ধনশালা যজ্ঞাগারের ন্যায় সম্মানিত ছিল। সম্পন্নের গৃহেও তখন কদাচিৎ বেতনভোগী পাচকের স্থান হইত। জগৎপ্রসূতি, জগৎপালয়িত্রী ও জগদ্ধাত্রীরূপিণী গৃহিণীরাই, রন্ধন-যজ্ঞ-বেদীতে মূর্ত্তিমতী আহুতির ন্যায়, অনলের জ্বলন্ত অঙ্গেও যেন প্রীতিমধুর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়া, জগৎপালয়িত্রীর প্রাণে আনন্দে অধিষ্ঠিত রহিতেন। বড় বড় নিমন্ত্রণে, অনেক সময়, তাঁহারা আপনারাই রন্ধন ও পরিবেশন করিতেন; এবং ভোজনে লোকের তৃপ্তি হইলেই, আপনাদিগের সকল ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন। কৃত্তিবাসের রামা-

* এই পণ্ডিত-পত্নীর এতদূর দৈন্য দশা ছিল যে, শাঁখার অভাবে তিনি সধবার চিহ্ন স্বরূপ মাত্র একগাছি সূতা হাতে বাঁধিয়া রাখিতেন। ইহা দেখিয়া নবদ্বীপের তদানীন্তন রাজরাণী একটু উপহাস করিয়াছিলেন। সেই উপহাসেরই প্রত্যুত্তরে তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ ললনা উল্লিখিত রূপ উত্তর প্রদান করেন।

রূপে আছে,—মা জানকী রাম-মহিষীরূপে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ়া হইয়া, লঙ্কা-বিজয়ী অসংখ্য রামসৈন্যকে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ইহা রামচন্দ্রের জীবন-সময়ের কথা না হই-লেও, যে কৃত্তিবাসের সম-সাময়িক সামাজিক আচারের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণ, আমরা স্ত্রীশিক্ষা-সংক্রান্ত চতুর্থ যুগের কথা বলিব। পুরাতন যুগ-গণনায়, চতুর্থ যুগের আর এক নাম কলিযুগ। স্ত্রীশিক্ষার চতুর্থ যুগকেও, এই হিসাবে, স্ত্রীশিক্ষার কলিযুগ বা নব্যযুগ বলা যাইতে পারে। আমরা এই যুগেরই জীব। নব্যযুগের স্ত্রীশিক্ষায় আজি আমাদিগের গৃহ আলোকিত ও আমাদিগের ভবিষ্যৎও ঐ আলোকের ছটায় ঈষৎ আভা-সিত। এই আলোক, কোন কোন স্থানে, স্নিগ্ধ, মধুর ও প্রাণশীতল জ্যোৎস্নার ন্যায় সর্ব্বাংশেই সুখাবহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধি-কাংশ স্থলেই উহার খর-প্রখর তেজ একান্ত দুর্দ্দর্শ ও দুঃসহ; এবং কোন কোন স্থানে, উহার অনল-উদ্গারি শিখার লেলিহান-প্রতি-দর্শনে গৃহস্থ আপনার জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরটি লইয়াও নিরন্তর ভীত, ত্রস্ত ও শশব্যস্ত। প্রা-চীন আর্য্যজাতির সেই স্বভাবজাত পুরাতন কাঠামের উপর, মহম্মদীয় সভ্যতার অব-গুণ্ঠিত বিলাসিতা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, দণ্ডায়মান ছিল। এক্ষণ সেই মূর্ত্তির অঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বার্ণিশ বা অঙ্গরাগ ফলান হই-য়াছে। এই ত্রিবিধ ভাবের বিচিত্র সম্মিলনে এ দেশে যে একটা নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, আধুনিক স্ত্রীশিক্ষাও সেই সভ্য-তারই অবশ্যম্ভাবি ফল।

আজিকালি দেশের অবস্থা বস্তুতই অন্যরূপ। অধুনা এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সহিত অতি পুরাতন কালের সেই ব্রহ্মচর্য্যের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং নারীসমাজে, মৈত্রেয়ী বা গার্গীর ন্যায়, জ্ঞান-তাপসীর আবির্ভাব এক্ষণ অসম্ভব। স্ত্রীজাতির পক্ষে লেখাপড়া সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, এই সংস্কার যে যুগের একটা প্রধান কথা ছিল, যখন স্ত্রী-লোকেরা এ দেশে স্বয়ং লেখা পড়ার কোন ধার ধারিতেন না, অথচ পরের মুখে শুনিয়া শুনিয়া দেশ ও সমাজের উপযোগি সৎশিক্ষা লাভ করিতেন, সে যুগও এখন নাই; সুতরাং সে কালের সেই গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিতা মা অন্ন-পূর্ণারাও ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। আজিকালিকার স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর বস্তু।

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের তুল্য অধিকারে অধিকারিণী। এদেশেও, এখন আর স্ত্রীলোকের পক্ষে, লেখা পড়া শিক্ষা দূষণীয়, এই কুসংস্কারের ঠাঁই কোথাও নাই। ফলতঃ, কোন প্রকার অধ্যয়নই এক্ষণ আর স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ নহে। স্ত্রী-লোক, এখন এদেশেও, কোন কোন সম্প্র-দায়ে পুরুষের মত, লেখাপড়া শিখিয়া চাক-রির আশ্রয়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। শুধু চাকরি বলিয়া কথা কি, শক্তি থাকিলে,

ও ইচ্ছা করিলে, স্ত্রীলোকেরা, পুরুষের অবলম্বিত যে কোন পদবীগ্রহণ এবং যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। বেদ বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মুদী দোকানের খাতা পর্য্যন্ত, সমস্ত বিষয়েই স্ত্রীলোকের পূর্ণ অধিকার পঁহুছিয়াছে। স্ত্রীলোক মনে করিলে, বেদবেদান্তের আলোচনা দ্বারা 'অভয়ানন্দ স্বামী' হইতে পারেন; তন্ত্রের আশ্রয়ে, বেণী বিনাইয়া জটা বাঁধিয়া ত্রিশূল করে ভৈরবী সাজিতে পারেন; কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা দ্বারা 'রমা সরস্বতী', অথবা গদ্য পদ্য গ্রন্থ, কাব্য ও উপন্যাস রচনা দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রী রূপে, পুরুষের উপরে আসন লইতে পারেন; এবং বক্তৃতার ঝঙ্কারে,—বীণা বা এস্রারের তারে দীপকের তান ধরিয়া, মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন। স্ত্রীলোক এখন বি এ, এম্ এ, এম্ বি, এম্ ডি, ডি আর ও র‍্যাঙ্‌লার, যে কোন উপাধি অর্জ্জনে সমর্থ। সম্প্রদায়বিশেষে স্ত্রীলোকের কেরাণি, উকীল, বারিষ্টার হইতেও তেমন কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক নাই।

স্ত্রীলোক এখন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে, পুরুষের সহিত একাসনে বসিয়া গণিত ও বিজ্ঞানে পাঠ লইতেছে। চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে, স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া, শবাসনার মত মড়া কোলে করিয়া বসিয়া, শারীর-যন্ত্রের শিরা ও ধমনী পরীক্ষা করিতেছে। স্ত্রীলোক সেনানিবাসে কিঙ্কিণী-কিণাঙ্কিত কটিতে অসি ঝুলাইয়া, কবরী-চুম্বিত স্কন্ধে সঙ্গীন চড়াইয়া, কুচ্ কাওয়াত্ করিতেছে। আফিসে স্ত্রীলোক, ধর্ম্মাধিকরণে স্ত্রীলোক, ডাক্তারখানায় স্ত্রীলোক, ব্যবসায় বাণিজ্যে স্ত্রীলোক, রঙ্গগৃহে স্ত্রীলোক;—স্ত্রীলোকের আধিপত্য এক্ষণ সর্ব্বত্র।

আধুনিক পদ্ধতির স্ত্রীশিক্ষা, আমাদিগের দেশে, এখনও এই পরিমাণ অগ্রসর হইতে পারে নাই, এ কথা ঠিক্। কিন্তু তাহা না হইয়া থাকিলেও, সকল দিকের পথই ক্রমে উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার পথে কুসংস্কার মূলক বাধা বিঘ্ন, এখন প্রায় কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সর্ব্ববিষয়নিষ্ঠ, অবারিতদ্বার বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর নূতন পদ্ধতিতে, এ দেশে সাধারণতঃ কিরূপ ফল ফলিতেছে, এক্ষণ তৎসম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

লাপ্‌লণ্ডের তুষার-ক্ষেত্রে মালদহের আঁব, বাঙ্গালার বিলে বসোরার গোলাপ এবং আফ্রিকার শাহারায় মানস-সরোবরের পদ্ম, যেরূপ স্বভাবের বিরুদ্ধ-ব্যবস্থায় বিপন্ন, সেইরূপ, এক দেশের, একরকম জল বাতাসে স্ফুরিত এক শ্রেণীর শিক্ষা ও দীক্ষা, আর এক দেশের আর এক রকমের জল-বাতাসে, চিরদিনই, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিলাভে অসমর্থ। আজি কালি এ দেশে যে শ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, উহা এ দেশের মাটিতে স্বভাবের শাসনে আপনি বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই,—পাশ্চাত্য কলম হইতে, কলকৌশলে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উহার ঔজ্জ্বল্য অন্তর্নিবিষ্ট নহে,—ধার করা আলোর উপর ভাসা গিল্‌টির মত, বাহিরে ঝলমল। এ-

দেশের নিত্য নৈমিত্তিক 'আটপরে' ব্যবহারে উহার গিল্টি উঠিয়া যাইতে চাহে, অথবা গিল্টিতে বিষম দাগ লাগিয়া যায়। এই গিল্টির চাকুচক্য অবিকৃতভাবে রক্ষা করিতে গেলেও আবার, অনেক স্থলেই, সংসার বিকল, কিংবা অচল হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালীতে, এ দেশের কোথাও কোনরূপ সুফল ফলে নাই, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। অনেকে এই শিক্ষা-প্রণালীর অনুসরণেও সুশিক্ষা বা সৎশিক্ষা লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন; এবং তাঁহাদিগের দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রায় এদেশীয় রমণী-সমাজেরও মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা বড় কম। আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বর্জ্জিত বিধির মধ্যে রাখিয়া, বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার ফলস্বরূপ, ঘরে ঘরে যে শ্রেণীর রমণীমূর্ত্তির নিত্য বিকাশ ঘটিতেছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, বর্ত্তমান সময়ে, দেশের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত একটা সামাজিক পদ্ধতির একটু আভাস প্রদান একান্ত আবশ্যক। এদেশে, বিবাহের পূর্ব্বে, বর ও কন্যা দেখিবার রীতি বহুকাল হইতে চলিত আছে। পূর্ব্বকালে, বিবাহের সময়, বর-পরীক্ষায়, কন্যাপক্ষ বরের হস্তাক্ষর ও বংশমর্য্যাদা ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখিয়া লইতেন। বরপক্ষ দেখিতেন, কন্যার রূপ, কুলশীল, লাজলজ্জা প্রভৃতি গুণগ্রাম; এবং বালিকা গৃহকর্ম্মের কোন্ অঙ্গে কিরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছে বা করিতেছে, তাহারও একটু সংবাদ লইতেন। এক্ষণ বরসম্বন্ধে, দ্রষ্টব্য কিছু নাই, বলিলেও চলে। দ্রষ্টব্য কিছু না থাকিলেও, শ্রোতব্য কিঞ্চিৎ না আছে, এমন নহে। এক শ্রোতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস, আর শ্রোতব্য বৈষয়িক সংস্থান বা আর্থিক আয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস করা বরের যদি কিঞ্চিৎ বিত্ত সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে আর কথা নাই। সে স্বভাবচরিত্রে কালাপাহাড়, কুল-পরিচয়ে ভুঁইকোড়, অথবা দৈহিক সম্পদে আফ্রিকার কাফ্রি হউক, এ সকলের কিছুই আলোচ্য বা ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কন্যা সম্বন্ধে দেখিবার বিষয় অনেক। প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টব্য, অলঙ্কার ও দানসামগ্রী, দ্বিতীয় রূপ, তৃতীয় হস্তাক্ষর এবং চতুর্থ কন্যার সাঁপান-মার্জ্জিত অলক্তক-রঞ্জিত নবনীত-কোমল করে বা ফুলের অঙ্গুলে উল ধরিবার অভ্যাস কেমন। এই কএকটি জিনিষ দেখিবার যোগ্য হইলেই হইল। ইহা ভিন্ন দেখিবার, জানিবার বা শুনিবার বিষয় আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান বর ও কন্যা পরীক্ষার সর্ব্বত্র প্রচলিত এই সাধারণ সূত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বাতাসের গতি কোন্ দিকে, অনায়াসে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। ঈদৃশ উদ্বাহ-উৎসবের কন্যা,—ফুলশয্যার এই কোমল কলিই, এক এক গৃহের ভাবি গৃহিণী। কিন্তু এই ভাবি গৃহিণীগণ, বালিকা-বয়সে, শিক্ষা-বিষয়ে এইরূপ

পরীক্ষা দিয়াই, নহবতের মঙ্গল-ধ্বনি, ঢোল-ডগরের আনন্দ-নিনাদে আমোদিত এবং আতসবাজী ও আলোকমালায় উল্লসিত হইয়া, সংসারপ্রাঙ্গণে বধূ-বরণের উলুধ্বনি বা রসনা-ঝঙ্কারে অভ্যর্থিত হন। শিক্ষার উপক্রমণিকা যেমন লক্ষ্যশূন্য ও ভিত্তিবিহীন, পরিণামও হয়, তেমনই অসার, অকর্ম্মণ্য ও বিসদৃশ।

এ দেশে এক্ষণ লেখা পড়া করা স্ত্রী-শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোক মাত্রই কিছু কিছু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া থাকেন। অনেকে লেখা পড়া শিখিয়া পরীক্ষা দেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি ও পারিতোষিক দ্বারা শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে এ সমস্তই আশাপ্রদ ও প্রীতিকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষে, এ দেশের স্ত্রী-শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই, একটা পোষাকী আস্‌বাব বা সভ্যতার উপসর্গ বিশেষে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। সাধারণতঃ, এই শিক্ষায় না জন্মিতেছে পাণ্ডিত্য, না হইতেছে নারীচরিত্রের দেশকালের উপযোগী প্রয়োজনীয় বিকাশ। বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার প্রসাদে এ দেশের গৃহ ক্রমেই যেন গৃহিণীশূন্য অরণ্য হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণ প্রায় ঘরে ঘরেই গৃহিণীর আসনে নিষ্ক্রিয় ও নির্জ্জীব সজ্জিত প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। যে ঘরে দু-পয়সার সংস্থান আছে, সেখানকার এই প্রতিমা, বেশভূষায় বিলসিত, সোহাগের ধূপধুনা ও গন্ধচন্দনে সুরভিত, দৈনন্দিন ভোগরাগে ও বলি-নৈবেদ্যে সংবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বাংশেই প্রতিমা জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু যেখানে অভাবের তাড়না, অন্নজল লইয়াও টানাটানি, সেখানকার কুসুমকোমলা প্রতিমার অবস্থা অন্যরূপ। এ অবস্থায় সাধের প্রতিমা কখন হঠাৎ খরপ্রখরা চামুণ্ডা সাজিয়া সম্মার্জ্জনী করে রণরঙ্গিণী-বেশে, দণ্ডায়মানা হইয়া সুখ-লালসায় চির-তৃষিত লোল-রসনা দরিদ্র পতি বা পিতৃকুলের শোণিত-শোষণে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; কখনও বা আশাভঙ্গে ও মনোক্ষোভে জীর্ণা শীর্ণা মলিনা হইয়া, অশ্রু-সিক্তনয়নে বোধনেই বিসর্জ্জনের আয়োজন করিয়া লইতেছে; এবং যৌবনের স্ফূর্ত্তিতে বার্দ্ধক্যের অবসাদ টানিয়া আনিয়া, অকালে ঢলিয়া পড়িতেছে। সম্পন্ন বা অসম্পন্ন ধনী বা দরিদ্র, যাহার গৃহেই ঈদৃশ শিক্ষিতা প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হউক না কেন, ইহারা প্রায় সর্ব্বত্রই কোনও না কোন কল্পিত বা বাস্তব উপসর্গের বশে, অষ্ট প্রহর শয়ন-ঘরের অধিবাসিনী বা শয্যার আশ্রয়-প্রার্থিনী।

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ লেখা পড়া এবং লেখা পড়ার প্রধান বিষয় রঙ্গমঞ্চের নাটক বা কল্পকাননের উপন্যাস। এই উপন্যাসেরও আবার অধিকাংশই অপাঠ্য বা কুপাঠ্য কদর্য্য জিনিষে পরিপূর্ণ। পৌরাণিক উপন্যাসে গ্রথিত রামজানকী ও কুরুপাণ্ডবের বিষয়, এক্ষণ কুসংস্কারপূর্ণ অরুচিকর অতিরঞ্জিত কল্পিত কথা বলিয়া

উপেক্ষিত ও অবহেলিত, অথচ নব্য উপন্যাসের নূতন ছাঁচে ঢালা আলা-উদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপও আদরের আতরে সুবাসিত। নব্য শিক্ষিতাদিগের অনেকে হয়ত, কৌশল্যা কাহার বাপ, এবং রাম কাহার পত্নী,' এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়াও বিস্মিত হইবেন না; অথবা হাসির হিল্লোলে প্রশ্নকর্ত্তাকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না।—'ঐ সকল পুরাতন ছাই মাটীর খবর আমরা রাখি না', এই বলিয়া প্রকারান্তরে আপনাদিগের অজ্ঞতাকেই নূতন আলোক বা নবীন বিদ্যার অভিনব গৌরবরূপে নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াসপর হইবেন। তাঁহাদিগের অনেকেই বাড়ীর হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মুখে "সীতারাম" নাম শুনিয়া এখন রামায়ণ বা রামায়ণের সেই পুণ্যতপা মহাঋষি বাল্মীকির কথা চিন্তা করিবার সূত্র প্রাপ্ত হন না। সীতারামের পশ্চাতে 'রায়' শব্দ যোজনা করিয়া, আধুনিক ঔপন্যাসিকের চরণেই নমস্কার করেন।

উপন্যাসের উপাস্য বস্তু,—প্রেম। নায়ক নায়িকা সেই প্রেম-পূজার মহাবলি। প্রেম অমৃত। প্রেম মানব-হৃদয়ের চির-স্পৃহণীয় সঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু যে প্রেম ভগবানের বিভূতি, যাহার মাহাত্ম্যে ভক্তের অভিধানে ভগবানের নাম প্রেমময়, যে প্রেমে চৈতন্য প্রেমিক, যে প্রেম বিরাগী সীতার নয়নজলে রামনামের কল-নিস্বন ও অযোধ্যার সিংহাসনে বনবাসিনী সীতার স্থলবর্ত্তিনীরূপে, রূপ-যৌবনময়ী নবীনা কামিনীর পরিবর্ত্তে, সীতারই স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তির নয়নজলে পরিতর্পণ, সে অনলমিশ্র প্রেমামৃত আধুনিক অধিকাংশ উপন্যাসেরই ভোগ্য বা সেব্য নহে। এখনকার ঔপন্যাসিক প্রেম, প্রায় সর্ব্বত্রই গোলাপ-সুবাসিত মিশ্রির সরবৎ,—মুখপ্রিয় ও আপাত-মধুর সুখ-বিলাসে ঢল ঢল। ঔপন্যাসিক প্রেমের আদি, অন্ত ও মধ্য,—উৎপত্তি, লয় ও স্থিতি, সকলস্থানেই প্রচ্ছন্ন লালসার রসনাশীৎকার বা অনন্ত ভোগতৃষ্ণার নীরব প্রদাহ।

উপন্যাসের হিসাবে রূপ, যৌবন এবং সেই রূপ ও যৌবনের তৃপ্তি বিধায়ক লালসিত প্রেম, এই তিনটি পদার্থই যেন জগতের সার সম্পদ্। আধুনিক উপন্যাস পড়িলে স্বতই মনে এই ধারণা জন্মে যে, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরাগ ও বিরহ প্রেমাঙ্গের এই কএকটা অনুষ্ঠানই ইহ খলু মানবজীবনের সার সর্ব্বস্ব। মানুষ এই শ্রেণীর প্রেম করিবার নিমিত্তই জন্ম ধারণ করে, জন্মিয়া যাহা কিছু করিবার থাকে, ঐ প্রেমের জন্যই তাহা করে; এবং কএক দিন প্রেমের ডুরিতে বাঁধা প্রেম-পুতুলের ন্যায়, প্রেমের নাচ নাচিয়া জীবের স্বাভাবিক গতিতে অন্তিম শয্যায় ঢলিয়া পড়ে। প্রেম করা ভিন্ন জগতে যেন অন্য কোন কর্ম্ম নাই, অন্য কোন প্রয়োজন নাই,—অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই আধুনিক অধিকাংশ উপন্যাসের উৎপত্তি।

আজি কালিকার শিক্ষিতাদিগের পঠনীয় বস্তু এই শ্রেণীর উপন্যাস। তাঁহারা

পড়েন উপন্যাস, লেখেন প্রণয়-পত্র। প্রণয়-পত্রে উপন্যাসলব্ধ বিদ্যার পূর্ণ ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের অনেকেই এক্ষণ, অবিশ্রান্ত ঔপন্যাসিক প্রেম-চিত্রের অনুধ্যানে কেমন একরকম ভাববিলাসিনী বা স্বপ্নময়ীর ভাবে, এক এক গৃহে গৃহিণীর আসনে অধিষ্ঠিতা রহেন। ঈদৃশ কাব্যপ্রাণা স্বপ্নময়ীকে লইয়া গৃহবাস, কুসুমকোমলা ফুলরাণীর করে ধরিয়া কণ্টকাকীর্ণ বা কঙ্কর কঠোর সংসারবর্ত্মে বিচরণ কিরূপ কঠিন কর্ম্ম, যাঁহারা এ ভোগ ভুগিতেছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিয়াছেন।

এ দেশের বৈবাহিক প্রথার সহিত পূর্ব্বরাগ বা পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয় বিনিময়ের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ পূর্ব্বরাগের শোভনীয় বিনোদ-চিত্রেই ঔপন্যাসিক প্রেমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে যুব-জন-হৃদয়ে পূর্ব্বরাগ-রঞ্জিত ললিত প্রেমাভিনয়ের প্রতি এমনই একটা প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া যায় যে, আত্মজীবনে পূর্ব্বরাগের ভাবে একটু প্রণয়-খেলা না খেলিয়া লইলেই যেন প্রাণের পিপাসা আর কিছুতেই মিটিতে চাহে না। শিক্ষিতা নববধূ শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিয়াই প্রবাসী পতির সহিত সুদীর্ঘ পত্রীয় আলাপে পূর্ব্বরাগের অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। পঠিত উপন্যাস হইতে বাছা বাছা রসাল শব্দ ও প্রেমমাখা পদ বা বাক্য সংগ্রহ করিয়া প্রেম-পত্রের কালের পূর্ণ করা হয়। প্রাণের সংবাদ না লইয়াই, প্রাণাধিক প্রাণেশ্বর সম্ভাষণ এবং হৃদয়ের মত জিজ্ঞাসা না করিয়াই হৃদয়বল্লভ নামে, শিক্ষিতা নববধূ পতি নামক অপরিচিত যুবকের হাতে, অবশ্যই পত্রীয় পদ-রচনায়, হৃদয়, মন, জীবন ও সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দেন। কিন্তু এই উৎসর্গের মন্ত্র যখন চিঠির পৃষ্ঠায় কালি-কলমে চিত্রিত করা হয়, তখন হৃদয় ও মন যে ভয়ে ভয়ে, কখনও অলঙ্কারের বাক্সে, কখনও বা সোহাগের ঝাপীতে গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া থাকে, সেই হৃদয় মনের অপরিণত-বয়স্কা অধিস্বামিনী অনেক সময়ই, তাহা নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এই অনুষ্ঠান শুধু স্ত্রীপক্ষ হইতেই হয়, এমন নহে। এ পথেও পুরুষই স্ত্রীলোকের পথ-প্রদর্শক; এ শিক্ষায়ও পুরুষই স্ত্রীলোকের শিক্ষাগুরু।

নববধূর আর এক কর্ম্ম উলের ফুলদার টুপি, ষ্টকিং গলবন্ধ ইত্যাদি নির্ম্মাণ, অথবা কার্পেটে বুনট তোলা। লেখাপড়া শিক্ষা যেমন ভাল কাজ, এ সকলও তেমনই প্রশংসার্হ কর্ম্ম। কিন্তু ব্যবহারের দোষে লেখা পড়ার শেষ পরিণতি যেমন উপন্যাস পাঠে ও প্রণয়-পত্র রচনায়, এ সকলেরও, তেমন চরম উদ্দেশ্য প্রকটিত হইয়া পড়ে, সখের প্রদর্শন বা বিলাসের খেলায়।

এ দেশে ফুল-শয্যার দিন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বালিকাদিগের বৈবাহিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ফুল-শয্যার সেই ফুলময়ী বধূজীবনের প্রথম ভাগেও কিছুদিন তেমনই ফুলশয্যাশায়িনীর অবস্থায়ই থাকিয়া যায়।

সোহাগের সোহাগা বা ননীর পুতলি রান্না ঘরের আঁচে পাছে উনিয়া পড়ে, এই ভয়ে, সেদিকে তাহার গতি হইতে পারে না। তাহার দৈনিক কর্ম্ম, শয্যারচনা, পানের গোলাপী খিলি বানান, তাহাতেও চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলিনিচয়ের অপচয় আশঙ্কা। সখের কর্ম্ম,—পায়ে আলতা লাগাইয়া, বেণী বিনাইয়া খোপা বাঁধিয়া, সেই খোপায় রজত-ফুল গুজিয়া খট্টায় বসিয়া উপন্যাস পাঠ বা প্রণয়-পত্র রচনা; অথবা উলের উপরে আঙ্গুল ঘুরাণ। এই ভাবে দিন কাটিয়া যায়। ইহার উপরে, কখন মাথা ধরা, কখন মাথা ঘোরা, কখন বা অপস্মার বায়ু বা হিষ্টিয়ার মূর্চ্ছা ইত্যাদি নানা উপসর্গের নিত্য নূতন উৎপীড়ন।

এই শ্রেণীর অসার ও অকর্ম্মণ্য জীবন যাপনই আজিকালিকার শিক্ষিতা ভদ্র মহিলার পক্ষে সুখসম্ভোগের চরম আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। আগে নববধূর গুণগরিমা শিক্ষা দীক্ষার প্রথম পরীক্ষা হইত,—রান্না-ঘরে। এক্ষণ মেয়েকে শ্বশুরগৃহে যাইয়া রান্না করিতে হয়, ইহা শুনিলে তাহার পিতা মাতার ক্ষোভ ও মনস্তাপের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। তাঁহারা মনোদুঃখে ও আহত অভিমানে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, পাড়াপ্রতিবেশীরাও আসিয়া নয়নজলে বুক ভাসাইয়া দেয়। ঈদৃশ রুচি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা ও দীক্ষার পরিণাম কি, এক্ষণ ঘরে ঘরে তাহা নিত্য অনুভূত হইতেছে। অধুনা অনেকেই, গৃহলক্ষ্মী-রূপিণী এই সাজের পুত্তলিকাদিগকে খট্টায় শোয়াইয়া রাখিয়া, অতীতের যবনিকা উদ্ঘাটন করিতেছেন এবং সেই কালের সেই দয়া, মায়া ও স্নেহের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি পরার্থ আত্মোৎসর্গে নিত্য উৎসুকা, স্বেদার্দ্র-কলেবরা আনন্দময়ী অন্নপূর্ণাদিগকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বারংবার নমস্কার করিতেছেন; আর ভাবিতেছেন,—পুরাতন কালের সেই দীনাহীনা, নিরাভরণা নিরক্ষরা শিক্ষা ও এইক্ষণকার এই সাজর 'সাভিমান' প্রগল্ভ বিদ্যাভিনয়, এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা নামে সম্মান পাইবার যোগ্য কোন্‌টি?

বর্ত্তমান কালের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্তা রমণী রন্ধন-শালাকে পরিচারক, পরিচারিকা ও পাচক ব্রাহ্মণ বা বাবুরচি ভৃত্যের নিম্নশ্রেণীর অফিস মনে করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিতে পারেন; সন্তান পালন আয়ার কার্য্য স্থির করিয়া, তাহাতে উদাসীন রহিতে পারেন; বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পরিচর্য্যা দাসীর কর্ম্ম ভাবিয়া তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে পারেন; এবং এই সমস্ত সেবা-ব্রতের নীচ অনুষ্ঠানকে যুগধর্ম্মে, ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিয়া আপনি অষ্ট প্রহর সুখ-শয্যায় ভাবাবেশে নয়ন মুদিয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু সংসার তাহার ঈদৃশ শিক্ষার গৌরব, রূপের চমক, ও সুসভ্য মার্জ্জিত রুচির আড়ম্বর দেখিয়া নিরস্ত থাকিবার বস্তু নহে। জীবনাভিনয়ে এইরূপ সুখ-বিলাসের প্রথম অঙ্ক শেষ হইতে না হইতেই, সংসার বিকট ভ্রূকুটি সহকারে সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। স্বপ্নময়ীর

সমস্ত সুখ-স্বপ্ন আপনি ভাঙ্গিয়া যায়। কাব্যের তিলোত্তমা ও কল্পনার জগৎসিংহকে তখন আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রেমের স্নিগ্ধ অঙ্গে অনঙ্গের জ্বালা সঞ্চারিত হয়, কুসুমে কীট প্রবেশ করে। ঈদৃক স্ত্রীশিক্ষার পরিণাম ফল অনেক স্থলেই এই দাঁড়ায় যে, প্রণয়ে কলহ, সদ্ভাবে অভাব স্বাস্থ্যে রোগ এবং শান্তিতে ঘোর অশান্তির ঝড় বহিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।

সুরুচি বা সুখাসক্তির সম্মান রক্ষার্থ আপনি উননে জ্বাল ধরে না, দৈনন্দিন জঠর-জ্বালা আপনি নিবিয়া যায় না, এবং রোগীর শুশ্রূষা বৃদ্ধের পরিচর্য্যা এবং অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা, ইহার কোনটিই আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া রহে না। যে শিক্ষার পরিণাম এই ; তাহাকে শিক্ষা মনে করিয়াই আপনারা আনন্দিত হইবেন, না অশিক্ষা বা কুশিক্ষা বুঝিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন? কি করা উচিত একটি বার কেহ তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন কি?

যে শিক্ষিতা রমণী, উপন্যাসবর্ণিত কাল্পনিক চারুর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িতে দেখিলে, কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া দেন, তিনিই যদি আবার স্বগৃহের নিত্য-প্রত্যক্ষ ও সজীব চারু চুণি ও মতিকে রোগ-যন্ত্রণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট, অন্নবস্ত্রে বিপন্ন কিংবা দ্বেষ ও হিংসার বিষ-দংশনে জড়িত দেখিয়াও প্রাণে অস্পৃষ্ট রহেন ; যিনি কল্পনা-রাজ্যের কল্পিত আতি-থেয়তার অপ্রকৃত প্রসঙ্গে আনন্দে রোমাঞ্চিত হন, তিনিই যদি স্বগৃহে অতিথি অভ্যাগতের সমাগম দেখিলে, 'এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিল' এই ভাবিয়া বিধুবদনে রাহুর ছায়া টানিয়া আনেন, তাহা হইলে সেই শিক্ষা ও তাদৃক শিক্ষিতা রমণীকে কেহ প্রাণের সহিত সম্মান করিতে পারে কি? এরূপ পোষাকী শিক্ষার কৃত্রিম আলো অপেক্ষা অশিক্ষার অন্ধকারও সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

বস্তুতঃ আজি কালিকার স্ত্রী-শিক্ষা শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে,—ঘোরতর কু-শিক্ষা। কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা অনেকাংশে সহ-নীয় সন্দেহ নাই। অজ্ঞতা ও অশিক্ষা স্বভা-বতই শিক্ষালোকপ্রাপ্ত, বিজ্ঞজনের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেই ভালবাসে। সু-তরাং, কার্য্যক্ষেত্রে উহা শক্তির সহায় না হইলেও, অন্তরায় হয় না। কিন্তু কু-শিক্ষা সে শ্রেণীর সামগ্রী নহে। কুশিক্ষায় শিক্ষার মহিমা থাকে না, গর্ব্ব ও অভিমানটুকু ষোড়শউপচারে থাকে। সুতরাং কর্ম্মভূমিতে উহা পদে পদেই মারাত্মক অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান হইয়া বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

যে শিক্ষায়, খনির সোনা গলিয়া পুড়িয়া আপনার বিশুদ্ধ কান্তিতে আপনি ঝলমল করিতে সমর্থ হয়, যাহার প্রভাবে পশু মানুষ ও মানুষ দেবতা হইতে পারে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। কিবা পুরুষ কিবা স্ত্রী-লোক সকলের পক্ষেই তাদৃশ শিক্ষা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। কিন্তু শিক্ষার গিল্টি বা পো-

থাকি চমক সকলের পক্ষেই কু-শিক্ষা। শিক্ষা যেমন ভাল জিনিষ, শিক্ষার অভিনয় আবার তেমনই ভয়াবহ পদার্থ।

আজি কালিকার স্ত্রী-শিক্ষা অনেকস্থলেই এই শ্রেণীর পোষাকী বিদ্যা বা কুশিক্ষায় পরিণতি পাইতেছে। এদেশে, বর্ত্তমান সময়ে, প্রদর্শন-প্রখরা নব্য শিক্ষা প্রণালীর বহুল প্রচার হেতু, নারীজীবন, অনেক স্থলেই, সমাজের পক্ষে, অসার, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বহ ভার রূপে পরিগণিত হইতেছে সত্য, কিন্তু এখনও উহা বিলাসিতা বা সুখ-লালসার কলুষিত প্রবাহে কলঙ্কিত হইয়া, পৈশাচিক জীবনের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, এ দেশের আবহাওয়ায়, স্মৃতির সাহায্যে, ঋষি যুগের সেই পুণ্যময় পবিত্র সৌরভ এখনও, সময় সময়, সঞ্চারিত হইয়া থাকে; এ দেশের রুগ্ন, ভগ্ন, বা শিথিলগ্রন্থি সমাজ, এখনও ঋষি-প্রণীত সংহিতার দোহাই দিয়াই দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করে। অন্যদেশে ঈদৃক স্ত্রী-শিক্ষার ফলে, স্থানে স্থানে, কি ভয়াবহ ও ঘৃণার্হ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, ভয়, বিস্ময় ও ঘৃণায় প্রাণ শিহরিয়া উঠে;— হৃদয় ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিলাতের মানবতত্ত্বদর্শী, প্রগাঢ় পণ্ডিত, বিদ্বৎ সমাজে সম্ভ্রমনীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জোজেফ মারে (Joseph Murray) "Side light on English Society" সাইড্ লাইট অন্ ইংলিশ সোসাইটি" নামক গ্রন্থে, স্ত্রীজাতির কুশিক্ষাহেতু, ইংলণ্ডীয় সমাজের কি অধঃপাত,—দেশের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তাহারই সর্ব্বাংশে প্রামাণিক এক খানি বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আদর্শ রমণী, রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পবিত্র নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। মা, তোমার রাজ্যে কুশিক্ষা হেতু রমণীজাতির কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তুমি একবার তাহা দর্শন কর, গ্রন্থকারের ইহাই যেন, প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ছিল। মারের ন্যায় বিজ্ঞ গ্রন্থকার, বিলাতের যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসন-সান্নিধ্যে অশ্রুপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; সেই স্ত্রীশিক্ষারই আংশিক আদর্শে গঠিত, এই এক প্রকারের অসার ও অকর্ম্মণ্য গিল্‌টিইত আমাদিগের এ দেশেও স্ত্রীশিক্ষা রূপে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে! ঈদৃশ শিক্ষার পরিণাম কি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই একবার তাহা চিন্তা করিয়া, সময় থাকিতে, সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা মনে প্রাণে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। কিন্তু শিক্ষা এক কথা, শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কু-শিক্ষা আর এক কথা। যে স্ত্রীশিক্ষার অস্বাভাবিক প্রখর চমকে শিক্ষাভিমানিনী চক্ষু থাকিতে অন্ধ হন, যাহার দুর্ব্বহ ভারে, হস্ত পাদসত্বেও বিদ্যাভিমানিনী বিদুষী খঞ্জ বা পঙ্গুর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন; যে শিক্ষা মনের অন্ধকার দূর না করিয়া, সেই আঁধারকে ধারকরা জ্যোৎস্নার অস্থায়ি আবরণে ঢাকিয়া রাখে মাত্র, সে শিক্ষা সভ্যতার বিনোদ-অভরণ হউক, পদসম্পদ্ সম্পন্ন পাস-

কন্যা বরের প্রাণ-মনোহারি প্রলোভন হউক, অথবা ব্যবসায়ের বিপণিতে অজস্র অর্থ প্রসবিত্রী হউক, আমরা তাদৃশ শিক্ষাকে স্ত্রীজাতির পক্ষে কিছুতেই যথার্থ শিক্ষা বলিয়া সম্মান করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু যে শিক্ষা, অন্তশ্চক্ষুর উন্মীলনে, রমণীকে, ত্রিনেত্রা জগদ্ধাত্রীর ন্যায়, গৃহে গৃহে, সংসার-মদমত্ত উন্মার্গগামী কুঞ্জর ও ক্রুদ্ধ কেশরীর পৃষ্ঠদেশে, চারুতার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, যে শিক্ষা পাদ-দলিত পশুত্বের ভগ্ন পঞ্জরের উপরে দেবতার মূর্ত্তি গড়াইয়া তুলে, এবং যে শিক্ষা রমণীর কমনীয় প্রাণে সুপবিত্র প্রীতি, সুমধুর স্নেহ ও পরদুঃখ-কাতরা দয়ার সুবিমল উৎস খুলিয়া দিয়া, ধূলি কর্দ্দমাক্ত পৃথিবীর প্রাঙ্গণে অমরার সুষমা সৃষ্টি করিয়া লয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং তাদৃশ স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, আমরা মনে প্রাণে লালায়িত। রমণী যদি সুশিক্ষার সুকুমার মাধুরী, বা কুসুমের সুকোমল কান্তিতে কুসুমরূপে বিকশিত হইতে চাহেন, হউন ; কিন্তু সে কুসুম, কামিনী, শিরিষ বা যুঁই না হইয়া, পদ্মের পরাগ বা গোলাপের পরিমল মাখা, অপরিম্লান অটল হউক। রমণী যদি শিক্ষার মাহাত্ম্যে আলোকরেখা বা প্রভাময়ী রূপে দেদীপ্যমানা রহিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই থাকুন ; কিন্তু সে প্রভা বা আলোক-রেখা, জ্বালাকরাল অনলশিখা না হইয়া, প্রাণশীতল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকালাতে বিলসিত রহুক। রমণী যদি শিক্ষার প্রভাবে প্রবাহিণীর বেগে আবেগবিহ্বলপ্রাণে বহিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তেমনই প্রবাহিত হউন, কিন্তু সে প্রবাহিণী কুলঘাতিনী কীর্ত্তিনাশা না হইয়া, প্রেমের অশ্রুধারা যমুনা হউক অথবা স্নেহ ও দয়ার পুণ্যপ্রবাহিণী পতিতপাবনী ভাগীরথী হইয়া, ভারতের উষর বক্ষ শীতল করুক। ভারতের দরিদ্র অন্তঃপুরে মোগলাই শাহাজাদির মস্‌লন্দ বিন্যস্ত হইলে, অথবা পাতার কুটীরে বিবিয়ানা বৌর "বুডোর" বা বিলাস-সজ্জার বিনোদ বাসর নির্ম্মিত হইলে তাহা মানাইবে কেন? অভাবের গৃহে, অনটনের সংসারে, ভাবময়ী বা স্বপ্নময়ীর নবনীত কোমল বিরাম-শয্যা অপেক্ষা কর্ম্মময়ীর কঠোর কর্ম্মপীঠই যে অধিকতর আদরের সম্পদ্, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন?

শ্রী——সু

প্রাচীন জমিদার ও জমিদারী শাসন।

(ময়মনসিংহের ইতিহাসের জন্য লিখিত)।

সম্রাট্ আকবর সাহের সময় সমগ্র বঙ্গদেশ মোগল সিংহাসনের শাসনাধীন হয় নাই। জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশ কেবলমাত্র শাসনাধীন আনয়ন করিয়াই ইহধাম ত্যাগ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাহ সুজা রীতিমত বাঙ্গালার কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন।* এই সময়ে দেশ শাসনের ভার গ্রাম্য সমিতি ও গ্রাম্য মণ্ডলদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঢাকায় নায়েব সুবাদারের বাসস্থান ছিল। সরকার বাহুর সম্পূর্ণ ভার নায়েব সুবাদের হস্তে ছিল (১)

* Bengal was only subjugated during Jahangir's reign and properly assessed by Prince Shuja, a short time before 1658."

(১) তৎকালে বঙ্গদেশ ১০টী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল। যথা—ইছলামাবাদ (চট্টগ্রাম) শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী, জেলালগড় (পুর্ণিয়া) আকবর নগর (রাজমহল), রাজসাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ও বক্স বন্দর (হুগলী)। এই ১০টী ব্যতীত ঢাকাতে "মহকুমে সহর আমিন" নামে একটী প্রাদেশিক ফৌজদারী আফিস ছিল। বাজুহা ঐ প্রাদেশিক ফৌজদারীর অধীন ছিল।

রাজস্ব ও জমা জমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কাননগুর আফিস স্থাপিত ছিল। দশ কাহনীয়া (সেরপুর) অন্তর্গত দর্শা, মণিমসাহী (ময়মনসিংহের) অন্তর্গত বোকাই নগর ও বড় বাজুর অন্তর্গত নলিপা (২) নামক স্থানে তিনটী প্রধান কাননগুর কার্য্যালয় স্থাপিত ছিল। অন্যান্য বিচার আচার পরগণার চৌধুরী (জমিদার) দিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। জমিদারদিগের সনন্দেও তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইত। সেই সনন্দ বলে, জমিদার প্রজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারদিগের বিচার করিতেন। দস্যু ও তস্করের শাস্তি প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের বিচারের উপর দেওয়ানী আদালত ছিল।

জমিদারদের এইরূপ কার্য্যের জন্য পরিশ্রম স্বরূপ জায়গীর ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(২) নালিপা বর্ত্তমান সময়ে যমুনার প্রবাহে লয় পাইয়াছে। রেনেলকৃত মানচিত্রের নালফিই (Nulphia) বোধ হয় নালিপা।

মোগল শাসন সময়ে আইন কানুনের বিশেষ প্রাচুর্ভাব থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা অতি অল্প পরিমাণেই কার্য্যকরী হইত। এই সময়ে দেশে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। (১) রাজকর্ম্মচারীরা স্ব স্ব প্রাপ্তির চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে প্রজার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ শোষণ করিতেন, প্রজা প্রাণ রক্ষার জন্য যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিত।

সে সময় যে কেবল প্রজারই দুর্দ্দশার সীমা ছিল না তাহা নহে, জমিদারদিগকেও উচিত সময়ে খাজানা পরিশোধ না করিলে "বৈকুণ্ঠবাস" করিতে হইত। কষ্ট ও দুর্দ্দশার তুলনায় প্রজার অদৃষ্ট জমিদার অপেক্ষা শত সহস্র গুণে উত্তম ছিল। অনেক স্থলে প্রজা সর্ব্বস্ব হারাইয়াও স্ত্রী পুত্র লইয়া স্বাধীন ভাবে যথাতথা "গতর খাটাইয়া" দিনপাত করিত। জমিদারদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর ছিল না। জমিদার দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও, রীতিমত খাজানা চালাইতে অসমর্থ হইলেই সুবাদার-কিঙ্করগণের লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে নীত হইতেন এবং রাজস্ব আদায় না করা পর্য্যন্ত অনাহারে অল্পাহারে গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্র উত্তাপে, শীতকালে মারাত্মক শীতল জলে, রজনীতে উর্দ্ধদিকে পদদ্বয় বন্ধন অবস্থায় ভীষণ ভাবে প্রহৃত হইয়া দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্ত্তে রক্ষিত হইতেন। রেজাখাঁ এই পূতিগন্ধ-পরিপূর্ণ নরককেই হিন্দুদিগের প্রতি অবজ্ঞাচ্ছলে "বৈকুণ্ঠ" নামে অভিহিত করিতেন।* "বৈকুণ্ঠবাসের" গুপ্ত যন্ত্রণাতেও টাকা আদায় না হইলে প্রকাশ্য রকমে বিড়াল সাজিয়া রাজসভায় বসিয়া থাকিতে হইত। এই জীবনান্ত কষ্ট ও লজ্জাতেও টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হইলে হিন্দু জমিদারদিগকে মুসলমান বাবুর্চ্চির প্রস্তুত পুলাও অন্নের আস্বাদ গ্রহণ

(১) ১৩০৫ সনের পুণ্য পত্রিকাতে "বাদিয়ারের বিজ্ঞাপনী" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

* বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন;—

In order to enforce the payment of the revenues, he (Reja Khan) ordered a pond to be dug, which was filled with every thing disgusting and the stench of which was so offensive as nearly to suffocate whoever approached it: to this shocking place in contempt of the Hindoos he gave the name of "Bickoont" which in their language meant Paradise and after the Zeminder had undergone the usual punishment if their rent was not forthcoming he caused them to be drawn by a rope hid under the arms through this infernal pond. He is also stated to have compelled them to put on loose trowsers unto which were introduced creatures like cats. By such cruel horrid methods he extorted from the unhappy Zeminder every things they possessed, and made them weary of their lives."

করিতে হইত। এই উন্মুক্ত অত্যাচারের নিকট পদমর্য্যাদার বিচার ছিল না। বর্দ্ধমান সুসঙ্গের ন্যায় রাজাদিগকেও এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, প্রতাপাদিত্য সীতারামের ন্যায় লোকও এ অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদিগের সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য।

জমিদারদিগকে রাজস্বের টাকা সুবাদারের দেওয়ান খানার কিস্তিবন্দী মতে প্রদান করিতে হইত। দেওয়ানখানা পূর্ব্বে ঢাকা ও পরে মুর্শিদকুলিখাঁর সময় মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়। প্রতি কিস্তিতে জমিদার পক্ষ হইতে একজন বা দুইজন আমলা কাগজপত্র ও টাকা লইয়া রাজধানীতে যাইতেন ও কিছুকাল থাকিয়া দেওয়ান ও বক্সী, মোহরের হইতে আরম্ভ করিয়া, দপ্তরী খানসামা পর্য্যন্ত উদর পূরণ করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। রাজস্বের ত্রুটির জন্য জমিদারের আমলাদিগের উপরও সময় সময় অত্যাচার করা হইত।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে হুসেন কুলীখাঁই অত্যধিক অত্যাচারী বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাহার শাসন প্রভাবে ত্রিপুরা, কোচবিহার প্রভৃতি রাজ্যের প্রতাপান্বিত নৃপতিরাও তাহাকে উপঢৌকন প্রদানে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্ব্বে এতদ্দেশে জমিদারী অপেক্ষা ইজারার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ইজারা প্রথা রহিত করিয়া, জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব প্রদানের ভার অর্পণ করেন। এইরূপে তিনি বঙ্গে জমিদারের পদসৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি অনেককে জমিদার করিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের মান সম্ভ্রমের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখিলেন না। জমিদারদিগের জীবনের সহিত অর্থের তুলনায় তিনি অর্থকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং রাজস্ব অনাদায়ে অত্যাচার মাত্রা তাঁহার সময়ে অপরিমেয় ছিল।

বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার তৎসাময়িক বহু জমিদার বৈকুণ্ঠবাসের ভয়ে প্রাণের বিনিময়ে জমিদারী এবং এমন কি জাতিত্যাগেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে, দশ কাহনীয়ার (সেরপুর) জমিদার পক্ষে রাজস্বের হিসাব লইয়া, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ নাগ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। নিকাশে ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রসাদ কারারুদ্ধ হন, পরিশেষে জমিদার সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। এই উলঙ্গ উৎপীড়নের আতিশয্যে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারী ইস্তেফা প্রদান করিয়া জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করেন।* বাকী রাজস্ব প্রদান করিয়া জমিদারী বিনোদনারায়ণ নামক অপর এক ব্যক্তি গ্রহণ করেন। †

কাগমারীর জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধু-

* স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী বংশানুচরিত।

† Grant's Report &c.

রীও রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া কুলীখার ভীষণ অত্যাচারে পৈত্রিক ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ "বৈকুণ্ঠ বাস" ভয়ে পৈত্রিক নাম ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইনাতুল্যা চৌধুরী নাম গ্রহণ করতঃ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কুলী খাঁর অনুগ্রহ লাভ করিলেন। *

এইরূপে অমানুষিক অত্যাচার যে কেবল মুর্শিদকুলী খাঁর সময়েই হইত তাহা নহে, শাসন কর্ত্তাদিগের ও তৎ সভাসদ ও পরিষৎদিগের চরিত্রের তারতম্যানুসারে এইরূপ অত্যাচারের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিও ছিল। মুশলমান রাজত্বের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এইরূপ পাশব অত্যাচারে বঙ্গীয় জমিদারদিগকে অহরহ চিন্তাকুল রাখিয়াছিল এবং ইংরেজ শাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে, ঢাকা নগরে ডিপুটী গবর্ণরের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তখন ঢাকায় রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। এই সময়ে সুসঙ্গ রাজ্যের রাজস্ব অনাদায় হেতু, নাবালক রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়।

কোন বিশেষ কারণে বহু দিন সুসঙ্গ রাজ্যের নবাবী রাজস্ব বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজা রণসিংহের মৃত্যু হওয়ায় নাবালক কুমার কিশোর সিংহ সুসঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে একদা ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার সৈন্য সামন্ত আসিয়া শিশু রাজা কিশোর সিংহ ও তৎ অনুজ ভ্রাতা রাজসিংহকে ধৃত করিয়া ঢাকা লইয়া যায়। ভ্রাতৃ দ্বয় ঢাকার প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার নিকট নীত হইলে প্রত্যেক রাজকুমারের প্রতি দশ দশ কোড়া (বেত) মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। শিশু রাজাদ্বয় এই প্রাণান্তকরী আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উপায় নাই নিষ্ঠুর শাসকের "খাম খেয়াল' প্রতিপালিত হইতেই হইবে। রাজাদিগের সহিত বাঙ্ছারাম নন্দী নামক জনৈক ভৃত্য অনুগমন করিয়াছিল। প্রভুভক্ত প্রাচীন ভৃত্য বাঙ্ছারাম নিজ পৃষ্ঠদেশে রাজাদিগের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করেন। তৎকালিক নিয়মে একের দণ্ড অন্যে গ্রহণ করিতে পারিত। বাঙ্ছারামের প্রার্থনায় শিশুদ্বয় ঘাতকের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেন। ২০ কোড়া করিয়া প্রতিদিন নিরপরাধ বাঙ্ছারামের পৃষ্ঠদেশে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। বাঙ্ছারাম মৃতকল্প হইয়া ৩ দিন এইরূপ ভীষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। তথাপি রাজস্ব প্রদত্ত হইল না। ৪র্থ দিবস তোপাগ্নি মুখে শিশুরাজদ্বয়কে উড়াইয়া দিয়া জমিদারী হস্তান্তর করিবার কঠোরতর আদেশ প্রচারিত হইল।

* * * *

এই সময়ে জমিদারদিগের উপর এইরূপ

* কায়স্থ বংশাবলী।

অমানুষিক অত্যাচার হইলেও তাহাদের এলাকার মধ্যে ছিল। প্রকৃতি পুঞ্জের শাসন ও বিচারের ক্ষমতা অনেকটা তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে পারিলে জমিদারদিগের ক্ষমতাও কম ছিল না। কিন্তু প্রজার খাজানা রীতিমত প্রাপ্তির পক্ষে বহু পরিপন্থি ছিল।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

আমি কে ?

এই যে, সংসারসাগরের কর্ম্মোর্ম্মিমালার বিষমবলনে পুঞ্জিত ফেণবৎ ভাসিয়া বেড়াইতেছি,—আমি কে? এই যে, মায়াবিমুগ্ধ হইয়া মানবজীবনের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যথেচ্ছভাবে হাসিয়া কাঁদিয়া ঘুরিতেছি ফিরিতেছি,—আমি কে? এই যে, অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া ধরাকে সরা মনে করিতেছি,—আমি কে? এই যে, আদিত্য দেবের গতাগতি দ্বারা দিন দিন ক্ষীণায়ুঃ হইতেছি, বহু কার্য্যভার গুরু ব্যাপারনিকরে নিয়ত নিরত থাকিয়া কালাতিক্রম অনুভব করিতেছিনা,—আমি কে? এই যে, জন্ম-জরা-ব্যাপত্তি-মরণপ্রভৃতি প্রতিনিয়ত সন্দর্শন করিয়াও ভীত হইতেছি না, মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা সেবনে বিভোর হইয়া উন্মত্তপ্রায় বিচরণ করিতেছি,—আমি কে? এই যে, উন্নতি-পদবীতে আরোহণ করার প্রয়াস পাইতেছি, পঙ্গুকল্প হইয়াও পর্ব্বত লঙ্ঘনে উদ্যত হইয়াছি,—আমি কে? এই যে, বামনদেশ্য হইয়াও কর দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য স্পর্শনে অভিলাষ করিতেছি, লবণ পুত্তলিকা দেশীয় হইয়াও সমুদ্রের গভীরতা নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছি,—আমি কে?

বিজ্ঞ পাঠক! জানেন কি আমি কে? অথবা বলিয়া দিতে পারেন কি, আমাকে কে চিনেন? এই যে, "আমি আমি" করিয়া "আমার আমার" করিয়া দিবারাত্রি ভ্রাম্যমাণ হইতেছি, সেই আমি কে তাহার তো কোন সিদ্ধান্তে যেন স্থিররূপে এখনও উপনীত হইতে পারিলাম না। হায় দুরদৃষ্ট! অহো মোহ-মহিমা!!

পাঠক! এই যে, আপাদ মস্তক দেহ, ইহাই কি আমি? না, পাঠক! তাহা তো নহে। কেননা, আমার দেহ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা ভেদ নির্দ্দেশই হয়। যেমন আমার গৃহ, আমার বস্ত্র ইত্যাদি বলিতে গৃহ এবং বস্ত্রাদি আমা হইতে ভিন্ন বুঝায়, তদ্রূপ আমার দেহ বলিতেও দেহ আমা হইতে ভিন্ন ইহাই বুঝায়। সুতরাং দেহ আমি নহি। তবে আমি কে? ইন্দ্রিয়বর্গ কি আমি? না, তাহাও নহে। কেননা, আমার ইন্দ্রিয়

এইরূপই অনুভব হয়, কথিতও হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ আমি নহি। তবে আমি কে? বুদ্ধি কি আমি? না, আমার বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। এইরূপে নেতি নেতি বিচার পূর্ব্বক "আমি কে" এই প্রশ্নের উত্তরে যে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে কর চরণাদি অবয়ব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে, আমি নহি তাহাই প্রতিপন্ন হয়; পরন্তু এতৎ সর্ব্বাতিরিক্ত নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্মাই যে আমি তাহাই পূজ্যপাদ দার্শনিক পরমর্ষিগণ অবধারণ করিয়াছেন।

আমি (অহং) পদবাচ্য আত্মা, ইহা তাঁহারা যেমন অবধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আবার আত্মা অবাঙমনসগোচর অর্থাৎ বাক্য মনের অতীতও বলিয়াছেন। যাহা বাক্যের অতীত তাহা আমি শব্দ বা অহং পদ দ্বারা কিরূপে কথিত হইতে পারে? এ যে বিষম সমস্যা! উদ্ভট রহস্য!! অজ্ঞেয় তত্ত্ব!!!

পাঠক! একটা উপাখ্যান মনে হইল। জড় ভরতের বৃত্তান্ত বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সেই মহাভাগ ভরত, নরপতি ছিলেন। তদীয় চিত্তে বিবেক বৈরাগ্য উদ্রিক্ত হওয়া নিবন্ধন তিনি রাজত্ব পরিহার পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া শালগ্রামনামক স্থানে বহুকাল বাস করেন। তিনি যম নিয়মাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের বিশেষ উৎকর্ষ সম্পাদন করেন। সেই তপস্বী রাজা লোকসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং ভগবানের পূজাদি ক্রিয়ার জন্য সমিধ পুষ্প কুশাদি আহরণ করিতেন।

একদা তপস্বী রাজা ভরত মহানদীতে গমন পূর্ব্বক স্নানান্তে তদনন্তর কর্ত্তব্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। এমন সময় অরণ্যান্তরাল হইতে এক আসন্ন প্রসবা হরিণী পিপাসার্ত্তা হইয়া জলপানার্থ তথায় আগমন করিল এবং নদীতে জল পান করিতে লাগিল। হরিণীর জলপান প্রায় শেষ হইলে সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর এক গভীর সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইল। সকল জলস্থল প্রকম্পিত করিয়া সেই নাদের প্রতিনাদ দিগ্বিদিকে বিধাবিত হইয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল। সেই হরিণী সন্ত্রাসে নদী তটে উল্লম্ফন করিল। উচ্চ তটে উল্লম্ফন নিবন্ধন নদীতেই হরিণীর গর্ভপাত হইল। সেই গর্ভপতিত মৃগপোতক তরঙ্গমালান্দোলিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তপস্বী ভরত মমতাযুক্ত হইলেন এবং ঐ সদ্যঃপ্রসূত মৃগশিশুকে ধারণ করিয়া তীরে উঠাইলেন। গর্ভপাত পীড়া ও উল্লম্ফন বেগে পতিতা হরিণী তৎক্ষণেই সেস্থলে প্রাণত্যাগ করিল।

তপস্বী মৃগশাবক গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি মমতাকৃষ্টচেতা হইয়া দিন দিন সেই মৃগপোতক পোষণ করিতে লাগিলেন। মৃগশাবকও পরম যত্নে পুষ্যমান হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই মৃগশিশু কখনও আশ্রম ছাড়িয়া দূরে গমন করিলে তপস্বী ভরত

অত্যন্ত চিন্তাকুল হইতেন, রাজ্য তনয়াদি পরিত্যাগ করিয়াও তিনি হরিণশিশুর মমতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার যোগচর্য্যার বিশেষ ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সংসারত্যাগী বিবেকী বৈরাগী ভূপতি ভরত মৃগমায়াসক্ত হইয়া সমাধিভ্রষ্ট হইলেন। এমন কি মৃত্যুকালে একমাত্র সেই মৃগশিশুর চিন্তাই তাঁহার চিত্তে বিরাজ করিয়াছিল। তজ্জন্যই তিনি কালঞ্জর গিরিতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে যাহার মনে যে ভাব বিদ্যমান থাকে, তদনুরূপেই জন্ম হয়। সেই জন্যই দেবভাব উদ্রিক্ত করিবার জন্য, মৃত্যুকালে কর্ণমূলে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ প্রভৃতির রীতি আছে। যোগভ্রষ্ট ভরত জাতিস্মর হইলেন বলিয়া মৃগজন্মেও পূর্ব্ব জন্মের যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার মনে সমুদিত হইল। সুতরাং তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে মৃগজন্মেও মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শালগ্রামেই গমন করিলেন। তথায় শুষ্ক তৃণ পর্ণাদি দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মে ভোগাবসান পর্য্যন্ত আত্মপোষণ করিলেন। তদনন্তর মৃগদেহ পরিত্যাগ করিয়া সদাচারবিশিষ্ট নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। এই জন্মে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন হইলেন। কিন্তু কোন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন না। উপনীত হইয়াও বেদ পাঠ করিলেন না, কিংবা অন্য শাস্ত্রও পরিগ্রহণ করিলেন না। তাঁহাকে বহু কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট অত্যল্প মাত্র বাক্যে উত্তর দিতেন। এইজন্যই তাঁহাকে সকলে জড় ভরত বলিত। নগরবাসিগণ তাঁহার দেহ ও বস্ত্রাদি নিতান্ত অপরিস্কৃত থাকিত বলিয়া অবজ্ঞা করিত। বলা বাহুল্য যে, সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্নকারক। এই জন্যই যোগিগণ, যে ভাবে থাকিলে সাধারণ মানবেরা অবজ্ঞা করে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গ করে না, সেইরূপেই সন্মার্গে বিচরণ করিয়া স্বীয়কার্য্য সাধনকরেন। জড়ভরত সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজকে সর্ব্বদাই জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। ফলমূলাদি যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে উদরপূর্ণ করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ তাঁহাকে কদন্ন দ্বারা পোষণ করতঃ কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল। এমনকি, অন্যলোকেও তাঁহাকে ঐরূপ জড়বৎ দেখিয়া,আহারমাত্র দিয়া ভারবহনাদি আবশ্যক মত অনেক কর্ম্ম করাইয়া লইত।

একদা সৌবীর রাজা, "এই দুঃখসঙ্কুল সংসারে মানবগণের শ্রেয়ঃ কি" জানিবার জন্য ইক্ষুমতী নদীতীরস্থ কপিলাশ্রমে যাইতেছিলেন। তদীয় শিবিকা বহনার্থ বিনাবেতনে যে সকল বাহক নিযুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণরূপী জড়ভরতও এক জন। বলাবাহুল্য যে, সেই জাতিস্মর সর্ব্বজ্ঞানবান্ বিপ্রকে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে পূর্ব্ব অবশিষ্ট পাপক্ষয়ার্থই এইরূপে শিবিকা বহন করিতে হইল। সেই ব্রাহ্মণ জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন, আর অন্যান্য বাহক-

গণ শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। মহারাজ সৌবীর শিবিকার এইরূপ বিষমগতি অনুভব করিয়া বলিলেন, আঃ এ কি? ওহে! তোমরা এরূপ বিষমভাবে চলিতেছ কেন? সমানভাবে গমন কর। তথাপি উক্তরূপ বিষমগতি দেখিয়া আবারও বলিলেন, ও কি? তবু এরূপ বিষমগতিতে চলিতেছ কেন? পুনঃ পুনঃ মহারাজের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকা-বাহকগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল, "মহারাজ! এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এই বিষমগতি হইতেছে।" তখন রাজা বলিলেন, "ওহে! তুমি অত্যল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিতেছ। তবে কেন এত পরিশ্রান্ত হইয়াছ? তোমাকে ত বেশ স্থূল দেখিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রাজন্! আমি স্থূল নহি, আমি তোমার শিবিকা বহন করি নাই, আমি পরিশ্রান্তও হই নাই।"

রাজা বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি প্রত্যক্ষই! তোমাকে এইরূপ দেখিতেছি। তথাপি তুমি এ সকলই অস্বীকার করিতেছ কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রাজন্! আপনি কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন? আপনি বলিতেছেন, আমি শিবিকা বহন করিতেছি। একবারে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই দেখুন পাদদ্বয় ভূমিতে আছে। পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়ের উপর উরুদ্বয়, তদুপরি যথাক্রমে উদর, বক্ষঃস্থল বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ রহিয়াছে, সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা আছে তবে তুমি কিরূপে বলিতেছ যে, আমি শিবিকা বহন করিতেছি? ইহা কি মিথ্যা নহে? আর তুমি যে শিবিকায় উপবিষ্ট আছ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাও নহে। কেন না, ত্বদুপলক্ষিত শরীরই শিবিকায় আছে। শরীর ত তুমি নহ। আর যে বলিলে রাজন্! তুমি আমাকে স্থূল দেখিতেছ, তাহাও মিথ্যা। আমি স্থূল নহি। পঞ্চভূতময় এ-দেহই স্থূল দেখিতেছ। ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত যে আমি, তাহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না। তাহা কি দর্শনেন্দ্রিয়ানুভবযোগ্য? পঞ্চভূত বর্গের অবলম্বনেই আত্মা এক অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্যরূপে অনুভূত হইতেছে। আকাশ, বায়ু, জল, অনিল, ভূমি, এই পঞ্চভূত শব্দ,স্পর্শ,রূপ,রস ও গন্ধাখ্য পঞ্চ তন্মাত্রের অধীন। পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার তত্ত্বের অধীন। অহঙ্কার মহত্তত্ত্বের অধীন এবং মহত্তত্ত্বও সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতির অধীন। হে রাজন্! উক্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয় অবিদ্যা-সঞ্চিত কর্ম্মবশে আবহমান কাল হইতে আবর্ত্তিত হইতেছে। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্মা ত্রিগুণাতীত, সুতরাং প্রকৃতি হইতে পর। আত্মা কূটস্থ চৈতন্যময় সদা একরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার বৃদ্ধি ক্ষয়াদি কিছুই নাই। তবে কি রূপে আপনি আমাকে স্থূল দেখিতেছেন করিয়া উল্লেখ করিলেন, যথাক্রমে মৃত্তিকা,চরণ,জঙ্ঘা,উরু,কটি,উদরও হৃদয়ের উপরিভাগে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে যদি আমার ভার বোধ হয়, তবে তোমারই বা ভার বোধ না হয়

কেন ? যদি আমার উপর শিবিকার ভার উপন্যস্ত হয়, তবে যে কোন প্রাণীর উপর শুধু শিবিকার নহে, গিরি বৃক্ষাদি যাবতীয় পৃথিবীর ভারোপন্যাস কেন হইবে না ? তাহার অনুকূল কোন যুক্তি আছে কি ? প্রাকৃত বস্তুজাত হইতে আত্মা যদি সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে আমাতে ভারোপন্যাস কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ মৌনাবলম্বন করিলে, রাজা সত্বর শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন এবং স্তুতিসহকারে বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার দোষ ক্ষমা করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি কে? কেনই বা এইরূপ ছদ্মবেশে বিচরণ করেন ? এখানে আসিবারই বা কারণ কি? দয়াপূর্ব্বক বলুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্ "আমি কে ?' একথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবন্ধন দেহ উৎপন্ন হয়। সেই দেহে বুদ্ধি সমুপলব্ধ সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রতিবিম্বিত রূপে জপস্ফটিকের ন্যায় জীবে সংক্রামিত হয় মাত্র। ইহার অধিক কি বলা যাইতে পারে ?

রাজা বলিলেন, সোহহং বাক্যে অর্থাৎ "আমি সেই" এইরূপে ত আত্মার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। "যিনি নিত্য, আমি সেই" এইরূপে নির্দ্দেশ করিলেও ত অহং অর্থাৎ আমি শব্দ আত্মারই বাচক।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! "অহং" অর্থাৎ "আমি" শব্দ আত্ম উদ্দেশে ভ্রম বশতই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "অহং বা আমি" এই শব্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জিহ্বা এবং পরম্পরা ভাবে কণ্ঠাদিই উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের উচ্চারিত অহং শব্দ দ্বারা আত্মাকে বুঝাইতে পারে না। আবার "অহং বা আমি শব্দ বাচ্য জিহ্বাদিও হইতে পারে না ; কেন না, আমার জিহ্বা বলা হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপেবিচার করিলে "অহং বা আমি" বলিয়া বাক্যে কাহাকেও নির্দ্দেশ করা চলে না। সুতরাং "আমি কে" এ বাক্য বিফল। এই যে তুমি শিবিকাতে আরূঢ় রহিয়াছ, এই শিবিকা কাষ্ঠোৎপন্ন। ইহা কি শিবিকা, না কাষ্ঠ? ঐ যে তোমার ছত্র, তাহার শলাকাগুলি পৃথক্ করিলে ছত্র কোন্‌টি, স্থির করা যায় কি? এইরূপে দেহে অন্বেষণ কর, হস্ত পদাদি কিছুই আমি নহি। কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায় মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ব্যবহার-কর্ম্ম-নিমিত্তক দেহে হইয়া থাকে মাত্র। আত্মা দেব নহেন, গন্ধর্ব্ব নহেন, মানুষ নহেন, পিশাচ নহেন, দানব-যক্ষ কিন্নর নহেন বা পশু পক্ষ্যাদিও নহেন, বৃক্ষাদি স্থাবরও নহেন। প্রকৃতিতে অনাদি অবিদ্যাসঞ্চিত কর্ম্মভেদে শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। রাজা, প্রজা, তোমার আমার,ধন জন ইত্যাদি ব্যবহার পারমার্থিক সত্য নহে। কল্পনামাত্র। যাহার কোন কালে সংজ্ঞান্তর হয় না। সেই পরমার্থ সৎ পদার্থ আত্মা কি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না বা কোন প্রকারে বুঝান যাইতে পারে

না। রাজন্! তুমি পুত্রের পিতা, স্ত্রীর স্বামী, শত্রুর শত্রু, মিত্রের মিত্র, প্রজার রাজা, এখন বল দেখি তোমাকে এক কথায় কি বলা যায়? হে রাজন! এই তুমি আমার সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছ। তুমি কর চরণ প্রভৃতি, না সে সমুদয় হইতে স্বতন্ত্র? স্বতন্ত্র যাহা, তাহাই কি কোন প্রকারে বাক্যে প্রকাশ্য? এইরূপ চিন্তা দ্বারা নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিয়া বুঝ "আমি কে?" আমি বাক্যে উত্তর দিতে সক্ষম নহি যে "আমি কে?"

পাঠক! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত। সুতরাং "আমি কে" এই প্রশ্ন সতই মনে উদিত হইয়া যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকে বিচরণ করিয়া যাহা পাইলাম, তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে কি পাওয়া যায় তাহাও দেখুন এবং বুঝুন "আমি কে?" ইত্যলং বিস্তরেণ?

পাঠক! উক্ত উপাখ্যানের অপরাংশে সৌবীর রাজার পূর্ব্বোল্লিখিত "মানবগণের শ্রেয়ঃ কি?" এই প্রশ্নের উত্তর প্রকটিত হইয়াছে। তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। এ স্থলে যাহা উপযোগী, তাহাই পরিগৃহীত হইল।

ভট্টাচার্য্য

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ সাংখ্যশাস্ত্রী।

আঁধার জগতে।

কোথায় প'ড়েছি এসে
অজানা অচেনা দেশ,
এ কোথা দিয়াছ ফেলে
কোথা হ'তে পরমেশ!
এ যে দেখি ভয়ঙ্কর
তমসা গরভে ঢাকা,
চাই কত দেখিবারে
কিছু ত যায় না দেখা।
আঁধার মরতভূমি
মানব-নিবাস কেন?
কেন নাথ ও চরণে
অপরাধী মোরা হেন?

এ কঠোর কারাগারে
কেন মোরা আছি প'ড়ে?
বহু দূরে, দয়াময়,
বহু দূরে তোমা ছেড়ে!
কোথা সেই অনুপম
প্রেমময় নিকেতন,
কোথা এই ধরাধাম
শোকে তাপে নিমগন।
সে বড় অনেক দূর
কল্পনা পায় না পার;
কত দেশ দেশান্তর
মাঝে প'ড়ে আছে তার।

অনন্ত অসীম পথ
কেমনে আসিনু চ'লে,
বুঝিতে পারিনা কিছু
তুমি না বুঝায়ে দিলে।
স্বপনের স্মৃতি সম
সে সুষমা সে দেশের;
এখনো ফুটিয়া উঠে
তটে তটে মানসের।
দিব্য সে দেশের তরে
কেমন মনের টান!
অলক্ষ্যে—নিগূঢ় ভাবে,
আছে সদা বর্ত্তমান।
ভু'লে ভু'লে থাকি কত
ভুলিতে পারি বা কই?
নিভৃত মরম-টানে
সদা চমকিত হই।
প্রখর কিরণ-রাগে
সে দেশ দেদীপ্যমান;
বিশাল বিমানে দীপ্ত
কোটি কোটি বিবস্বান্।
বিমল-বিজলী-ভাতি
বিচ্ছুরিত অনিবার
কোথাও নাহিক কিছু
সমতুল সে প্রভার।
সে প্রভা তোমারি কান্তি
আকর তুমিই তা'র;
প্রশান্ত জলধি তুমি
সে ক্ষুদ্র প্রবাহ ছার।
তাহার স্ফুলিঙ্গ পেয়ে
গর্ব্ব করে ক্ষুদ্র ভানু

শত রবি সমাবেশ
তা'র ক্ষুদ্র পরমাণু।
সুনীল আকাশ অই
চন্দ্রাতপ নীলাম্বর;
মোদের সে প্রভা হ'তে
ঢেকে আছে নিরন্তর।
আঁধার আড়ালে থেকে
পারে না মরতবাসী
চর্ম্ম চক্ষে নিরখিতে
সে তব প্রতিভা-রাশি।
তারা রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
চন্দ্রাতপ-ছিদ্র-পথে,
সে দেশের ক্ষীণ জ্যোতিঃ
প্রতিভাত ধরণীতে।
নীল আস্তরণ ভেদি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরুণিমা,
মিটি মিটি চ'খে চেয়ে
প্রকাশে কি মধুরিমা!
কত নীহারিকা পথে
সে জ্যোতিঃ বিপথে পড়ে,
কুয়াসা তমসা কত
চারি ধারে ঘেরে তারে।
তবু কি প্রভাব তা'র
নয়নে ফলিত হ'লে
গভীর ভাবের উৎস
হৃদয়ে উছলি চলে?
পরাণ উধাও হ'য়ে
ছুটিয়া যাইতে চায়,
ঐ রন্ধ্র-পথ দিয়ে
পড়িতে তোমার পায়?

বলিবারে কেঁদে কেঁদে
তিতিয়া নয়ন-জলে,—
"দীন জনে দীননাথ!
কি দোষে বিমুখ হ'লে।"
"ঐ তব দিব্যালোকে
বঞ্চিত করিতে হেন
নীলপটে নর-লোকে
ঢাকিয়া রাখিলে কেন?
"রাখিলে ঢাকিয়া যদি
তবে কেন অনুক্ষণ
রন্ধ্র-পথে রশ্মি দিয়ে
বৃদ্ধি কর প্রলোভন?
"বাড়াইলে লোভ যদি
দেও বল ছুটিবারে
ছুটিয়া যাইব অই
তন্ত্রাতপ-পরপারে।
পড়িব সে দেশে গিয়া
মনে বড় অভিলাষ—
যে দেশেতে শশী সূর্য্য
কোটি কোটি পরকাশ।
ঘুচিবে বিকার যত
নয়নে লাগিবে ধাঁধা
পড়িব প্রেমের ফাঁদে
তোমার চরণে বাঁধা।
কহিব দূতের মত
এ দেশের বিবরণ
তব প্রতিনিধিগণ
করে যেই আচরণ।
কহিব মনের খেদে
কত কষ্ট পাইলাম;
শোক তাপ জ্বালা মলা
হেথা কত সহিলাম।
এ দেশে দুর্ভিক্ষ ক্লেশ,
মহামারী হাহাকার,
দারুণ দুর্দ্দৈব বশে
কষ্টের নাহিক পার।
এ দেশে শত্রুর পল্লী,
আত্মপর ভেদ জ্ঞান,
প্রবল পাপের স্রোত
খরবেগে বহমান।
এ দেশে মুখের হাসি
মুখেতে বিলয় পায়,
অজস্র অশ্রুর স্রোতে
হৃদয় ভাসিয়া যায়।
মানবে তোমার যদি
থাকয়ে দয়ার লেশ,
এ দেশেতে তা'রে কভু
পাঠা'ওনা, পরমেশ!
নিবিড় আঁধার শুধু
এ দেশের কুক্ষিগত;
বিপদ বিষাদ কত
সে আঁধারে অবিরত।
তব দেহকণা- হ'তে
দেহ-যষ্টি সৃষ্ট যা'র,
অন্তরে কেমনে, নাথ!
সহিবে সে এ আঁধার!
আপনার তরে শেষে
মাগিব চরণ সুধা,
দীর্ঘ প্রবাসের পরে
মিটা'ব ভবের ক্ষুধা।

কিছুতে এ দেশে পুনঃ
আসিতে চা'বনা ফিরে,
কর যদি পীড়াপীড়ি
সাধিব চরণ ধ'রে।
কিছুতে হ'ব না শান্ত
দয়া তব না পাইলে,
শ্রীপদ-পঙ্কজ তব
ধোয়াইব অশ্রুজলে।
হৃদয় প্রশান্ত তব
প্রেমাবেগে টল টল,
দয়ার সাগর তুমি
কেমনে রহিবে বল?
কত আশা করি মনে,
সে আশা কি পূরিবে না?
এ যে ভব কারাগার,
এ জ্বালা কি ঘুচিবে না?
দেও নাথ! দেও বল,
চ'লে যাই তব কাছে;
এ কুহকে ভু'লে হেথা
প'ড়ে থাকি কেন মিছে!
চাহি না মানব-কায়া
ছলনা, মায়ার ভাণ;
সাধের সুখের সৌধ
হোক সব খান্ খান্।
কর মোরে বিহঙ্গম
উড়ে যাব দিগন্তরে,
স্বদেশে যা'বার পথ
খুলে লই ঘুরে ঘুরে।
নক্ষত্র-ফটকে গিয়া
যাঁচিব প্রবেশ পথ;
যে কোন প্রকারে শেষে
পুরাইব মনোরথ।
আবেশে আপনা ভুলে
পাগল পতঙ্গ প্রায়,
আনন্দে আলোক দেখে
উৎসর্গ করিব কায়।
প্রোজ্জ্বল প্রভায় তব
পুড়িয়া হইব ছাই,
দেও নাথ! এই ভিক্ষা
অন্য শিক্ষা নাহি চাই।
মাটীর পুতুল সম
এই যে মানব-কায়
অই জ্যোতিঃ পেয়ে বহে
প্রাণের প্রবাহ তা'য়।
কি ছার আঁধার গেহে
জ্বলয়ে জীবন-বাতি
তাই ত দু'দিন তরে
চৌদিকে ছড়ায় ভাতি।
সে বাতি নিবিলে জ্যোতিঃ
মিশিবে তোমাতে পুনঃ
অন্য আশা মানবের
থাকিতে পারে কি হেন?

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ।

কাব্যপ্রকাশঃ।

অথ দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

দ্বিতীয় উল্লাস।

স্যাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোঽত্র ব্যঞ্জক স্ত্রিধা।

বৃত্তিঃ। অত্র ইতি কাব্যে এষাং স্বরূপং বক্ষ্যতে।

বৃত্তিঃ। ক্রমেণ শব্দার্থয়োঃ স্বরূপমাহ।

অনু। গ্রন্থকার এইক্ষণ ক্রমশঃ শব্দ ও অর্থের লক্ষণ বলিতেছেন।

বিবৃতি। দোষশূন্য, সগুণ ও সালঙ্কার শব্দার্থকে কাব্য বলে। ব্যঙ্গ্যার্থপ্রধান কাব্যকে ধ্বনি কাব্য, দুর্ব্বল-ব্যঙ্গ্যার্থযুক্ত কাব্যকে মধ্যম কাব্য, এবং ব্যাঙ্গ্যার্থবিরহিত কাব্যকে অধম কাব্য বলে। অতএব উৎকৃষ্ট কাব্যের ভিত্তি ব্যঞ্জনা, ব্যঞ্জনার ভিত্তি লক্ষণা ও অভিধা, এবং লক্ষণার ভিত্তি অভিধা ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইহাই শব্দের প্রকৃততত্ত্ব বা পরিচয় বলিয়া গণ্য। শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব বা পরিচয় না জানিলে, কাব্য রচনার অথবা কাব্যার্থ বুঝিবার কোন উপায় নাই। এই জন্য গ্রন্থকার এই উল্লাসে ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১)

(১) এই সংক্ষিপ্ত উল্লাসে শব্দশক্তির পরিচয় লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা কেবলনৈয়ায়িক, তাঁহারা প্রধানতঃ এই উল্লাসের টীকা করিবার উদ্দেশ্যেই কাব্যপ্রকাশের টীকা করিয়াছেন। বিখ্যাতনামা আলঙ্কারিক বামনভট্টকৃত প্রস্তাবনায় লিখিত আছে,— বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বকালে ন্যায়ের ছাত্রগণ শেষ-বিচার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কাব্যপ্রকাশের টীকা লিখিয়া নদীয়ার রাজসভায় উপস্থিত করিতেন; এবং তাহা প্রশংসাযোগ্য হইলে ভট্টাচার্য্য উপাধি পাইতেন। এই রূপে পূর্ব্বে গৌড় দেশে ন্যায়ের ছাত্রগণ অসংখ্য পরীক্ষা-টীকা রচনা করিয়াছিলেন। গদাধর ও জগদীশকৃত টীকাও এইরূপ পরীক্ষা-টীকা হওয়াই সম্ভবপর। নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক আচার্য্য রঘুনাথের গুরু মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রও কাব্যপ্রকাশের টীকা করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ শত শত টীকা করিলেও, সহৃদয়গণ, কাব্যপ্রকাশের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কাব্যপ্রকাশ পাণিনীয় দর্শনের উপরই সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। উহাতে আদ্যন্ত সূত্র, বৃত্তি ও ভাষ্যের মতানুসারেই কথা বলা হইয়াছে। কতিপয় নৈয়া-

অনুবাদ। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ তিন-প্রকার,—বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক।

বিবৃতি। এই তিনপ্রকার শব্দ কাব্যে প্রচলিত, এবং কাব্যের দর্শনস্বরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রেও ইহা স্বীকৃত আছে। ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রের মতে অনুমান দ্বারাই ব্যঞ্জনার কার্য্য চলে। কিন্তু, পঞ্চম উল্লাসে উক্ত মত অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভরতসূত্রের কোন কোন ব্যাখ্যাতাও অনুমান দ্বারা ব্যঞ্জনার কার্য্য চালাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে মত অসার বলিয়া চতুর্থ উল্লাসে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। উক্ত মত এখন সকল আলঙ্কারিকই পরিত্যাগ করিয়াছেন। আলঙ্কারিকদিগের মতে, কোন শব্দই নিয়ত বাচক, নিয়ত লাক্ষণিক, অথবা নিয়ত ব্যঞ্জক নহে। পরে বুঝা যাইবে, একই শব্দ অর্থভেদে কখনও বাচক, কখনও লাক্ষণিক ও কখনও ব্যঞ্জক বলিয়া গণ্য হয়। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার পরিচয় সত্বরই এই উল্লাসে দেওয়া হইবে।

বাচ্যাদয়স্তদর্থাঃ স্যুঃ।

বৃত্তিঃ। বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যাঃ।

অনুবাদ। সেই বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থকে যথাক্রমে বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ বলে।

বিবৃতি। এইটি ষষ্ঠ শ্লোক ও সপ্তম শ্লোকে বাচক শব্দের, নবম শ্লোকে লাক্ষ-ণিক শব্দের এবং ত্রয়োদশ ও উনবিংশ

য়িক টীকাকার কাব্যপ্রকাশে ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত শব্দকাণ্ড প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক টীকাকার তজ্জন্য ঐ সকল টীকাকারকে তীব্রভাষায় গালি দিয়াছেন। কেবল নৈয়ায়িক কেন,—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বাচস্পতিমিশ্র, মীমাংসক-প্রবর কমলাকর ভট্ট এবং ভারত-বন্দ্য নাগেশ ভট্ট প্রমুখ পণ্ডিতগণও কাব্য-প্রকাশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও, প্রথমতঃ কাব্যপ্রকাশের কাব্যপ্রকাশ-দর্শন-নাম্নী টীকা রচনা দ্বারা পরিচয় লাভ করার পর, সাহিত্যদর্পণ লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ, ১১৬০খ্রীঃ অব্দে রচিত মাণিক্যচন্দ্রের টীকা পূর্ণ হওয়ার দিবস হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর-কাল কাব্যপ্রকাশ ভারতীয় নিখিল পণ্ডিত-চূড়ামণিগণের বুদ্ধির নিকষ-প্রস্তরের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। আমরা কোন শ্রেণীর টীকাকারেরই ভাষানুবাদ গ্রহণ করি নাই, গ্রন্থের স্বারসিক অর্থ বুঝাইবার জন্য যথা-শক্তি স্থানে স্থানে টীকার ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়াছি। টীকাগুলির মধ্যে প্রস্থানভেদ ও প্রস্থানের অবান্তরভেদ এবং সহৃদয়তা ও বুদ্ধিভেদ বশতঃ অনেক মতভেদ বিদ্যমান আছে। তাহার পর মূল গ্রন্থও স্থানে স্থানে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। সহৃদয় টীকাকার ভীম-সেন দীক্ষিত বলিয়াছেন, কাব্যপ্রকাশের রাশি রাশি টীকা রচিত হইয়াছে; কিন্তু এই টীকারাশি রচনার পূর্ব্বেও কাব্যপ্রকাশ যেমন দুর্ব্বোধ ছিল, পরেও ঠিক্ সেইরূপ দুর্ব্বোধই রহিয়াছে; দুর্ব্বোধতার কিঞ্চি-ন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই!!

শ্লোকে ব্যঞ্জক শব্দের লক্ষণে বলা হইবে। বাচক শব্দের অর্থকে বাচ্যার্থ, লাক্ষণিক শব্দের অর্থকে লক্ষ্যার্থ, এবং ব্যঞ্জক শব্দের অর্থকে ব্যাঙ্গার্থ বলে, ইহা ক্রমশঃ বুঝা যাইবে।

তাৎপর্য্যার্থোঽপি কেষুচিৎ। ৬।

বৃত্তিঃ। আকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি-যোগ্যতাবশাৎ বক্ষ্যমাণস্বরূপাণাং পদানাং সমন্বয়ে তাৎপর্য্যার্থো বিশেষবপুরপদার্থোঽপি বাক্যার্থঃ সমুল্লসতীত্যভিহিতান্বয়বাদিনাং মতম্; বাচ্য এব বাক্যার্থ ইত্যন্বিতাভিধানবাদিনঃ।

অনু। পদার্থ (পদের অর্থ) কাহাকে বলে পরে ব্যাখ্যা করা হইবে। পদার্থসমূহ, পরস্পর আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা বশতঃ মিলিত হইয়া, সেই পদাবলীর অর্থের অতিরিক্ত বিশেষ-মূর্ত্তিবিশিষ্ট যে একটি অভিনব অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে বাক্যার্থ বলে। বাক্যাংশীভূত পদাবলীর অর্থসমূহ হইতে বাক্যের অর্থটি সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা অভিহিতান্বয়বাদী বা নৈয়ায়িকদিগের মত। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদী বা মীমাংসকগণের মতে বাক্যস্থ পদগুলির বাচ্যার্থ যাহা, সমগ্র বাক্যের অর্থও তাহাই। কাজেই তাৎপর্য্যার্থ নামক কোন স্বতন্ত্র অর্থ স্বীকার করা অনাবশ্যক। তাৎপর্য্যার্থটি পদের বাচ্যার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (১)

বিবৃতি। বক্তব্যের অসমাপ্তিকে আকাঙ্ক্ষা, এক পদার্থের সঙ্গে অন্য পদার্থের মিলনে বাধা না থাকাকে যোগ্যতা, পদার্থগুলি পরস্পর যত নিকটবর্ত্তী হইলে বাক্যার্থ বুঝিতে ব্যাঘাত না ঘটে, তত নিকটবর্ত্তিতাকে সন্নিধি বলে। নৈয়ায়িকদিগের মতে, এই আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতাজনিত সংসর্গ বশতঃ পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয় হইলে, বাক্যার্থ নামে নূতন একটি অর্থ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ বলেন,—"জল আন" এই বাক্যে, "জল" ও "আন" পদ নিজ নিজ বাচ্যার্থকে প্রকাশ করে; কিন্তু "জল আন" এই বাক্যের অর্থটি "জল" ও "আন" পদের সংসর্গজনিত তাৎপর্য্যার্থ মাত্র; উহা "জল" ও "আন" পদের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু ভাট্টমীমাংসকগণ বলেন, পদের অন্বয়শূন্য কোন অর্থই থাকিতে পারে না, কেন না পদ সকল অন্য পদের সঙ্গে অন্বয় রাখিয়াই অর্থ প্রকাশ করে। আমরা সুবিধার জন্য অন্বয়রহিত (Unconnected) পদার্থ কল্পনা করি মাত্র, বস্তুতঃ পদের অর্থ অনন্বিতভাবে চিন্তাও করা যায় না;—তাহার অর্থও শিখা যায় না, বুঝাও যায় না, কাজেই বাক্যার্থ পদার্থ হইতে নূতন কিছু নহে। অতএব নৈয়ায়িকদিগের কথিত তাৎপর্য্যার্থ কখনও স্বীকার্য্য নহে। অধিকাংশ টীকাকারের মত এই যে, বৃত্তিকার নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত মান্য করিয়াছেন; মীমাংসকগণ বলেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই বৃত্তিকার গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) বাক্যপদীয়ের মতও এই প্রকারের। যথা বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন। ইত্যাদি।

সর্ব্বেষাং প্রায়শোঽর্থানাং ব্যঞ্জকত্বমপীষ্যতে।

অন্বয়। প্রায় সমস্ত অর্থেরই ব্যঞ্জকতা আছে,—অর্থাৎ বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ এই তিনটিরই ব্যঞ্জকতা আছে, এবং এই তিনটিই ভঙ্গিক্রমে নূতন নূতন অর্থ প্রকাশ করে।

বিবৃতি। পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া লন, তাহাই আবার পরে সবিস্তর বলেন। এই জন্য ব্যঙ্গ্যার্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বার বার প্রদান করিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম উল্লাসে উহা ভালরূপে বুঝাইবেন।

বৃত্তিঃ। তত্র বাচ্যস্য যথা।

মাএ ঘরোবঅরণং অজ্জ হু ণত্থি ত্তি সাহিঅং তুম এ।
তা ভণ কিং করণিজ্জং এঅমে ণ বাসরো ঠাই॥ ১

অত্র স্বৈরবিহারার্থিনীতি ব্যজ্যতে।

অনুবাদ। মা, আজ গৃহে শাক ও কাষ্ঠাদি কোন সামগ্রীই নাই, তুমি নিজেই ইহা প্রতিপাদন করিয়াছ; অতএব বল, কি করিতে হইবে, সমস্ত দিবস ত আর এইরূপ বেলা থাকিবে না।

অতএব বুঝা গেল, শাকাদি আনয়ন ব্যপদেশে বালিকা, তদীয় প্রীতিভাজন-যুবজনের দর্শন-উদ্দেশে, বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুলা।

বিবৃতি। গৃহে কোন সামগ্রীই নাই, কাজেই ধার করিয়া চলিবে না;—"কি করিব," অর্থাৎ শাকাদি সংগ্রহ ছাড়া তখন অন্য কাজ নাই; এইরূপ "প্রথম প্রহর" শেষ বেলায় পাওয়া যাইবে না। কাজেই বিকালে বনে যাইতে পারিব না,—কুলকন্যার পক্ষে তাহা ভাল নহে। এইগুলি ব্যঙ্গ্যার্থ। ইহা দ্বারা প্রার্থনা ব্যঙ্গ্য হইয়াছে।

বৃত্তিঃ। লক্ষ্যস্য যথা।

সাহেন্তী সহি। সুহঅং খণে খণে দুনিআসি মজ্ঝ কএ।
সব্‌ভাবসিণেহ করনিজ্জসরিসঅং দাব বিরইঅং তুমএ॥ (১)

অত্র মৎপ্রিয়ং রময়ন্ত্যা ত্বয়া শক্রত্বমাচরিতমিতি লক্ষ্যং, তেন চ কামুকবিষয়ং সাপরাধত্বপ্রকাশনং ব্যঙ্গ্যম্।

অনুবাদ। লক্ষ্যার্থমূলক ব্যঙ্গের দৃষ্টান্ত। দূতীরূপে প্রেরিতা সখী নায়কের নিকট যাইয়া স্বয়ংই তদীয় প্রীতিলাভে প্রাণের লালসায় চরিতার্থ হইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া, প্রেরিকা কামিনী এই শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন;—সখি, তুমি

(১) সংস্কৃত—মাতর্গৃহোপকরণমদ্য খলু নাস্তীতি সাধিতং ত্বয়া। তদ্ভণ কিং করণীয়মেবমেব বাসরঃ ন স্থায়ী॥

(১) সাধয়ন্তী সখি সুভগং ক্ষণে ক্ষণে দূনাসি মৎকৃতে।
সদ্ভাবস্নেহকরণীয়সদৃশং তাবদ্ বিচারিতং ত্বয়া।

আমার জন্য সেই সুন্দরকে সাধিয়া সাধিয়া বারংবার কষ্ট পাইতেছ; আমার প্রতি তোমার সদ্ভাব ও স্নেহের সদৃশ কর্ত্তব্য তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এ স্থলে আমার প্রিয়ের সংসর্গ দ্বারা তুমি শত্রুতা আচরণ করিয়াছ, ইহাই লক্ষ্যার্থ; সেই লক্ষ্যার্থ দ্বারা "তুমি অপরাধিনী হইয়াছ" এই অর্থটি ব্যঙ্গ্য হইয়াছে।

বিবৃতি। উক্ত শ্লোকে "আমার জন্য" শব্দে "তোমার নিজের জন্য," "কষ্ট পাইতেছ" শব্দে "সুখ পাইতেছ," "সদ্ভাব ও স্নেহ" শব্দে "অসদ্ভাব ও নির্দ্দয়তা," "সদৃশ কর্ত্তব্য" শব্দে "বিসদৃশ কর্ত্তব্য" এইরূপ লক্ষ্যার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মিলিত লক্ষ্যার্থ দ্বারা শত্রুতাচরণ বুঝা যাইতেছে। এই লক্ষ্যার্থটি দ্বারা, "তুমি এরূপ কাজদ্বারা আমার নিকট অপরাধিনী হইয়াছ" এই ব্যঙ্গ্যার্থটি প্রকাশ পাইয়াছে।

বৃত্তিঃ। ব্যঙ্গ্যস্য যথা

উঅ নিচ্চল নিপ্পন্দা ভিসিনীপত্তম্মি
রেহই বলাআ।
নিম্মলমরগ-অভা-অণ পরিট্‌ঠিআ
সঙ্খসুত্তিব্ব॥ (১)

অত্র নিষ্পন্দত্বেন আশ্বস্তত্বং তেন চ জনরহিতত্বং। অতঃ সঙ্কেতস্থানমেতদিতি কয়াচিৎ কঞ্চিৎ প্রত্যুচ্যতে। অথবা মিথ্যা বদসি ন ত্বমত্রাগতোঽভূরিতিব্যজ্যতে।

অনুবাদ। ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ উৎপন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত—এক নায়িকা নির্জ্জন বনভাগে কমলপূর্ণ সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া নায়ককে বলিতেছেন,—হে নিশ্চল, তুমি ঐ দিকে দৃষ্টি কর, নির্ম্মলমরকতমণিনির্ম্মিত পাত্রোপরি স্থাপিত শ্বেতবর্ণ শঙ্খশুক্তির ন্যায় নলিনীপত্রে বলাকা নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ বলাকা (বক) যখন নিষ্পন্দ, তখন সে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত বা ভয়রহিত, কাজেই এস্থানে মনুষ্যের সমাগম নাই। কাজেই এইটি সঙ্কেতস্থান বা উভয়ের প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত স্থান। এই কথাটি নায়িকা নায়ককে বলিলেন। অথবা তুমি বলিয়াছিলে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তুমি আসিয়াছিলে, কিন্তু তাহা মিথ্যা, আসিলে বলাকা এত নিষ্পন্দ রহিত না।

বিবৃতি। এস্থলে বিশ্বস্ততাটি নিষ্পন্দ প্রভৃতি বাচক শব্দ দ্বারা ব্যঙ্গ্য হইয়াছে, আবার সেই ব্যঙ্গ্যার্থ দ্বারা "এইটি সঙ্কেত স্থানের যোগ্য" এই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হইয়াছে; অথবা বিশ্বস্ততারূপ ব্যঙ্গ্যার্থ দ্বারা "তুমি আসিয়াছ বলিয়াছিলা, কিন্তু আইস নাই" এই তিরস্কার ব্যঙ্গ্য হইয়াছে

বৃত্তিঃ। বাচকাদীনাং ক্রমেণ স্বরূপমাহ।

অনুবাদ। এখন বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক শব্দের লক্ষণ বলা হইতেছে।

(১) পশ্য নিশ্চল নিষ্পন্দা বিসিনীপত্রে রাজতে বলাকা,—
নির্ম্মল-মরকত-ভাজন-পরিস্থিতা শঙ্খশুক্তিরিব॥

বিবৃতি। এতদূর পরে বাচকশব্দ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতেছেন।

সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং যোঽর্থম্
অভিধত্তে স বাচকঃ। ৬।

অনু। যে শব্দ সাক্ষাৎভাবে প্রসিদ্ধ সঙ্কেতিত অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহাকে বাচক শব্দ বলে।

বিবৃতি। এই শব্দদ্বারা এই অর্থ বুঝাইবে, এরূপ নিয়মকে সঙ্কেত বলে। অভিধান ও ব্যাকরণাদিতে এই সঙ্কেত শিক্ষা করা যায়। গঙ্গা শব্দ উক্ত সঙ্কেত অনুসারে ভগীরথখাতস্থ জলপ্রবাহকে বুঝায়; উহাই গঙ্গা শব্দের সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থ; গঙ্গা শব্দটি এই জন্য উক্ত অর্থের বাচক শব্দ বলিয়া গণ্য। এইরূপে সাক্ষাৎভাবে যে শব্দে যে অর্থকে প্রতিপাদন করে, সেই শব্দ সেই অর্থের বাচক। এই শব্দে এই অর্থ বুঝাইবে ইত্যাকার একটা সঙ্কেত পূর্ব্ব হইতেই করা আছে, তুমি তাহা জানিয়া রাখ, ইহা বলিয়া দেওয়াই কোষের কার্য্য।

বৃত্তিঃ। ইহাগৃহীত সঙ্কেতস্য শব্দস্যার্থ প্রতীতেরভাবাৎ সঙ্কেতসহায় এব শব্দোঽর্থবিশেষং প্রতিপাদয়তীতি যস্য যত্রা ব্যবধানেন সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে স তস্য বাচকঃ।

অনু। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, যে শব্দের সঙ্কেত (১) জানা যায় না, তাহার অর্থপ্রতীতি হয় না; যে শব্দের সঙ্কেত জানা যায়, তাহার অর্থপ্রতীতি হয়; কাজেই সঙ্কেতজ্ঞানই অর্থপ্রতীতির কারণ; অতএব যে অর্থে যে শব্দের অব্যবহিত সঙ্কেত থাকে, সে অর্থের সেই শব্দটি বাচক বলিয়া গণ্য।

বিবৃতি। অন্বয় (Method of agreement) এবং ব্যতিরেক (Method of difference) দ্বারা সঙ্কেতের আবশ্যকতা বুঝা যায়। অভিনয় দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হইলেও তাহা বাচক নহে, কেননা তাহা শব্দ নহে ; বর্ণ দ্বারা মাধুর্য্যাদির অর্থ ব্যঞ্জিত হয়, প্রতিপাদিত হয় না। অতএব বর্ণ, মাধুর্য্যাদির বাচক নহে। ব্যঞ্জনা ও লক্ষণা প্রাপ্য অর্থ বাচক শব্দের অর্থ নহে, এইজন্য সূত্রে "সাক্ষাৎ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তি সূত্রে এই সাঙ্কেতিক অর্থ বা বাচ্যার্থ কি, তাহার সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে, এবং ঐ বিচার দ্বারা পদের অর্থ কি, শব্দদ্বারা কি জিনিষ সঙ্কেতিত করা আছে, ইত্যাদি কথা বুঝান হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

(১) এই শব্দে এই অর্থ বুঝিতে হইবে এরূপ নিয়মকে সঙ্কেত বলে। গঙ্গা শব্দ ভগীরথখাতস্থ জলের স্রোত বুঝাইবে এইরূপ নিয়ম আছে। গঙ্গা বাচকশব্দ, এবং ভগীরথখাতস্থ জলপ্রবাহ তাহার বাচ্যার্থ। উক্ত অর্থে উক্ত শব্দের সঙ্কেত চিরপ্রসিদ্ধ।

আজীবন সঙ্গিনী।

জর্ম্মণির সম্রাট্ আলবার্টকে নিদ্রিতাবস্থায় কোন গুপ্ত হত্যাকারী হত্যা করে। এই হত্যার জন্য ব্যারণ রিউডল্ফকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয়। ঘূর্ণমানচক্রে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে বধ করা হয়। পরে জানা যায় যে, তিনি নির্দ্দোষ। তাঁহার স্ত্রী লেডী জারট্রুড দিন রাত্র সেই শ্মশানে তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। বলপ্রয়োগেও কেহ তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইতে পারে নাই। কি ভীষণ যন্ত্রণায় তাঁহার স্বামীর একদিন একরাত্রি পরে সেই ঘূর্ণমানচক্রের গতিতে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা লোকে তাঁহার পত্রে অবগত হইয়াছিল।

সুরম্য প্রাসাদ মধ্যে নিশ্চিন্ত অন্তরে,
সুষুপ্ত পৃথিবীপতি ঘোর অন্ধকারে—
নিবিড় তিমিরে ঢাকা অমার রজনী
গর্জ্জিছে পবন রোষে যেন কালফণী—
গুপ্ত নরহত্যা রাণী দেখিল স্বপনে,—
সম্রাটে বধিছে যেন পশুর প্রমাণে
ক্রোড়ে টেনে নিল রাণী হৃদয়ের ধন,
সত্য সত্য রক্তস্রোতে ভাসিল তখন
কাঁদিয়া উঠিল রাণী আকুল হইয়া,
কত সেনা সেনাপতি আইল ছুটিয়া।
পাতি পাতি করি সবে খুঁজিয়া দেখিল,
কোথা পলাইল দস্যু কেহ না জানিল।
মহা মন্ত্রী অকারণে সন্দেহ করিয়া—
সদাশয় রুডল্ফে আনিল ধরিয়া।
দেশের প্রধান বীর নিষ্পাপ অন্তর—
মন্ত্রীর আক্রোশ ছিল তাহার উপর—
রাজার মৃত্যুতে মন্ত্রী পেয়ে অবসর,
আদেশে এখনি বধ দুরন্ত পামর—
বাঁধিল তখনি তাঁরে কলের চাকায়
চালাইয়া দিল কল যায় প্রাণ যায়।
প্রতি আবর্ত্তনে হয় যাতনা [illegible]ণ—
যায় প্রাণ যায় তবু যায় না জীবন।
দিন গেল রাত্রি এলো নাহিক বিশ্রাম,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা ঘোরে অবিরাম।
সকলে চলিয়া গেল ছাড়িয়া শ্মশান,
দাঁড়াইয়া দেখে মন্ত্রী সস্মিত বয়ান।
একটি রমণী মূর্ত্তি বিষাদ প্রতিমা,—
ধরিল মন্ত্রীর পায় ভিক্ষা চাহি ক্ষমা।
কেবলি রাণীর নিম্নে যাঁহার আসন,
যাঁহার সুখের তরে কত শত জন,
সর্ব্বদা ব্যাকুল কত সশঙ্ক অন্তরে,
ভিখারিণী বেশে আজি পর পায় ধরে।
তথাপি পাষাণ মন্ত্রী পাষাণ-অন্তরে,
তাঁরে লাথী মেরে হায় ফেলে কত দূরে।
মৃতপ্রায় রুডলফ যাতনা ভুলিয়া,
রাক্ষসের কাজ দেখি উঠিল গর্জ্জিয়া—
হে ঈশ্বর কোন পাপে এ শাস্তি বিধান?
সহে না সহে না প্রাণে এই অপমান,!

কেন প্রিয়তমে তুমি পিশাচের পায় ?
নির্ভয় হৃদয়ে আজ দেও গো বিদায়।
কোন দোষে দোষী নই মরিতে কি ভয় ?
জন্মিলে মরিতে হয় এ কথা নিশ্চয়।
ফিরে যাও প্রিয়ে কেন কাঁদাও আমায়
মন্দিরে আরাধ্য দেবী পিশাচের পায়!
বুঝি নাকি দেবী আমি যাতনা তোমার ?
কি করিব বাঁধা আমি শক্তি নাহি আর।
ফিরে যাও প্রিয়তমে ডাক ভগবানে,
আজ যেন মুক্তি পাই নিশা অবসানে
শুনিয়া স্বামীর কথা মুছিয়া নয়ন,
ধীর পদে গেল দেবী প্রভুর সদন।
যুক্তকরে ঊর্দ্ধনেত্রে দাঁড়াইল আসি,
পবন হিল্লোলে দোলে মুক্ত কেশরাশি।
বল'না বল'না নাথ যাইতে আমায়,
কোথায় যাইব আমি ত্যজিয়া তোমায় ?
তোমায় ফেলিয়া যেতে এই কি সময় ?
পাষাণে গড়েছে বিধি আমার হৃদয়।
এ জগতে আজ আর ভয় কি আমার,
নাচিছে ভীষণ মৃত্যু সম্মুখে তোমার,
বল নাথ শূন্য ঘরে যাব কোন প্রাণে
আমার যা কিছু আছে সকলি এখানে।
সুখ সৌভাগ্যের দিনে ছায়ার মতন
অনন্ত সুখের ছিল সঙ্গিনী যে জন—
সে দিনের স্মৃতি আজ হইয়া উদয়
মহাবলে বলীয়ান তাহার হৃদয়
সকলি সহিবে নাথ পাষাণীর প্রাণ
বলো না যাইতে নাথ ত্যজিয়া এ স্থান
হে ঈশ্বর দয়াময় করি নিবেদন ;—
দুর্ব্বলের বল তুমি দরিদ্রের ধন,
এ যাতনা কর শেষ নাথের আমার
স্বর্গপুরে লয়ে যাও ক্রোড়ে আপনার।
লও প্রভু লও মোর হৃদয়ের ধন
ইচ্ছাময় হোক তব ইচ্ছা সম্পাদন,
কে হেন আছিল সুখী জগৎ মাঝারে
এমন রতন রাজে কার কণ্ঠ হারে—
সুখের সাগরে প্রভু দিয়াছি সাঁতার
দাও শক্তি সহিবারে এই দুঃখভার।
ডাকিয়া ঈশ্বরে সতী ধরিল স্বামীরে
মুছাইল কাল ঘাম অতি ধীরে ধীরে
সতীর পরশে চাকা সহসা থামিল,
জড়দেহ তবু চাকা আর না সহিল,
সতীর প্রার্থনা যেন শুনে ভগবান,
করিলেন রুডলফের দুঃখ অবসান।
অনন্ত প্রণয়স্নিগ্ধ শান্তি নিকেতনে
দেবী বক্ষে ঢলে পড়ে শান্তি পূর্ণমনে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্।

অভিশাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দশম পরিচ্ছেদ।

সতীশের দ্বিতীয় পত্র।

মানব আশৈশব অন্তরের পূর্ণ আবেগে ভালবাসিয়া নিজ বক্ষের শোণিতে যে আশা পুষ্ট করিতে থাকে, সে আশায় নিরাশ হইলে দারুণ আঘাতে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটা মহা বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। সেই বিপ্লবে সকল উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, জীবনের প্রতি মমতা কমিয়া যায়, সকল আকর্ষণ শিথিল হইয়া থাকে, হৃদয় হইতে সকল সুখ শান্তি অন্তর্হিত হয়। এই অপূর্ণ আশার পীড়নে জ্ঞানশূন্য হইয়া কত যুবক আপনার সর্ব্বনাশ সাধন-দ্বারা নিজ অধঃপতনের মার্গ প্রসর করে তাহা কে বলিবে?

হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। তাহার ভাগ্যদেবীর একটি আদেশ পালিত হইল। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, সতীশচন্দ্র তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। দারুণ নিরাশার প্রথম স্পর্শেই তাঁহাকে সাতিশয় কাতর করিল। তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। আর বস্তুতঃ ঔৎসুক্য হইতে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে যে প্রেমের জন্ম হয়, কোন দুর্ব্বিপাকে তাহা লুপ্ত হইলে বরং সে যাতনার বেগ সংবরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। কিন্তু যে ভালবাসার উৎপত্তি স্নেহ হইতে, কোন কারণে তাহার মূলচ্ছেদ ঘটিলে, সে ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে লাগে। বাস্তবিকই হিরণ্ময়ীলাভের আশা ছিন্ন হওয়াতে সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। সতীশের ভালবাসা একদিন, দুইদিন, এমন কি দুই এক বৎসরে জন্মে নাই। অনেক দিনে জন্মিয়াছিল। তিনি দুঃখ-কষ্টে ক্রমশঃই উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট বলিয়া যে একটা কিছু আছে, সতীশচন্দ্র এক্ষণে তাহা ভুলিয়াছেন। তাঁহার মনের ধারণা সত্যেন্দ্র নাথই তাঁহার সকল অশান্তির মূল। সত্যেন্ মনে করিলেই ত বিবাহ না করিতে পারিত। তাহার প্রয়োজন সুন্দরী পত্নীলাভ। তা বলিয়া অপরের বক্ষে ছুরিকা বিঁধাইবার ক্ষমতা ত তাহার নাই। তাহার ধন আছে, সম্পদ আছে। দরিদ্রের ধন ঐ সামান্য বালিকাটিকে না কাড়িয়া লইলে কি চলিত না? যে মানুষ মানুষের অন্তরের ব্যথা না বুঝিল, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিলাম,

দুরাত্মা তাহাতে আমাকে পাদদলিত করিল। হায়! ভগবন্ ইহাই কি ধর্ম্ম? একজনের মনে এত ক্লেশ দিয়া সে কি সুখে কালাতিপাত করিবে? যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে অবশ্যই বিচার হইবে; কিন্তু তাহার ফলও ইহকালে ভোগ করিতে হইবে না। ঐশিক নিয়ম বিচিত্র,—মানুষের বুদ্ধির অতীত,অথবা আমরা যাহাকে সুখ বা দুঃখ বলি,তাহা হয় ত প্রকৃত সুখ বা দুঃখ নহে। কেন না, জগতে এমন অনেক লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রতিদিন সহস্র পাপে লিপ্ত থাকে, তথাপি তাহাদের সংসারে কোন অসুখ নাই। অন্তরে যে বিশেষ কোন কষ্ট নিহিত আছে, তাহাও মনে হয় না। আবার অনেক পরোপকারী পুণ্যাত্মা মহাত্মা সমস্ত জীবন ক্লেশ পাইতেছে, ইহাও নিত্য দৃশ্য বস্তু। আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা প্রকৃত সুখ হউক আর নাই হউক, তাহাতে আমরা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তাহাকেই সুখ বলিতে হইবে। পরকালে যাহাই থাকুক, সে পাপিষ্ঠ যত দিন বাঁচিবে, স্বর্গসুখ ভোগ করিবে; আর আমি বাঁচিয়া থাকিয়া এই সংসারে দুর্ব্বিষহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিব, তাহা কখনই হইবে না। আমি কাঁদিব, আর আমার প্রাণের প্রাণকে চুরি করিয়া, সে সুখ-সাগরে জীবন ব্যাপিয়া নিমগ্ন থাকিবে,তাহা আমি সহিতে পারিব না। আমি অর্থহীন, আর সে ধনবান্, এই ত প্রভেদ। দেখি, অর্থের কতদূর ক্ষমতা, যে অর্থ তাহার এত অহঙ্কার, এত দম্ভের কারণ; দেখি সে অর্থ তাহার নয়নের তপ্ত অশ্রু সংবরণ করিতে কতদূর সক্ষম। যদি প্রাণের শান্তি চলিয়া গেল, তবে আর কিসের প্রয়োজন? সব যাক্, চাহি প্রতিহিংসা প্রতিশোধ, আর কিছু নয়। কাঁদিতে আর ভয় নাই সে জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। সুখ-শান্তি-শূন্য হৃদয়ে বাঁচা মরা সমান। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাতেই বা ভয় কি? নরাধম প্রস্তুত হও, আজি হইতে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রহিল—প্রতিশোধ।

সতীশচন্দ্র এই মত ভাবিতে ভাবিতে বিকারগ্রস্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"প্রতিশোধ!" দুর্জ্জয় ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টাই এক্ষণে তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া যখন সতীশচন্দ্রের মস্তিষ্ক নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি উঠিয়া গিয়া একখণ্ড কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলেন, এবং নিম্নলিখিতরূপ লিখিলেন।—

"নির্দ্দয় পাষণ্ড!

"অর্থের অহঙ্কার কি ভিক্ষুকের ভিক্ষার পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিয়াছিল? দরিদ্রের ধন অপহরণ করিলে একটু মাত্রও কি ভয় হইল না? যে অপরিচিত, তিন মাস পূর্ব্বে একদিন তোমার নিকট যুক্ত-করে তোমার কৃপাভিখারী হইয়াছিল, আজ সেই হতভাগাই তোমার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য প্রস্তুত। পাপিষ্ঠ সাবধান হও, আমি যে অশ্রু

সাগরে ভাসিতেছি, তোমাকে সেই সাগরে ভাসাইব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি যদি ব্রাহ্মণ তনয় হই, তাহা হইলে আমার এ যাতনার প্রতিশোধ পাইবেই। আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আশা, উদ্দম সব অতল জলে নিমগ্ন হউক, আমার বাসনা আর কিছুই নহে,—জানিও শুধু—প্রতিহিংসা প্রতিশোধ। মনে রাখিও এ উন্মত্তের প্রলাপ নহে। ইতি"

"পাগল সতীশ"

সতীশচন্দ্রকে তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া কেহ কেহ বলিত,—"সতীশ পাগল হবে নাকি?" সেই কারণেই, কি কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি পত্র শেষে নাম লিখিবার স্থানে লিখিলেন—'পাগল সতীশ।' তৎপরে শিরোনামা লিখিয়া পত্র খানি পাঠাইয়া দিলেম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশা।

সত্যেন্দ্রনাথ মালতীর সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে, কলিকাতায় যাইবার জন্য বাহির হইলেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তাহা একবারও ভাবেন নাই। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই প্রথমে তাঁহার এই কথা মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি কিয়ৎকাল চিন্তার পর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া, মালতীদের বাটির উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বে যে বাটীতে ছিলেন, এক্ষণে অপর ভাড়াটিয়াদ্বারা তাহা অধিকৃত রহিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পথপার্শ্বে পাদচারণা করিতে করিতে মালতীদের বাটীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, প্রত্যেক গবাক্ষ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, একটিও মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। প্রাতঃকালে বাটি হইতে বহির্গত হইবার পর হইতে এপর্য্যন্ত একবারও বিশ্রাম করিতে না পাইয়া, সত্যেন্দ্রনাথ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অগত্যা নিরাশ হইয়া এক কলিকাতাবাসী বন্ধুর বাটিতে গমন করিলেন। মেসো মহাশয়ের বাসায় যাইলেন না।

সন্ধ্যার পর সত্যেন্দ্র নাথ বন্ধুর নিকট হইতে পত্রলিখনোপযোগী কাগজ খাম প্রভৃতি চাহিয়া লইলেন এবং এই মর্ম্মে মালতীকে একখানি পত্র লিখিলেন, যেন আগত কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পথপার্শ্বের বাতায়ন সমীপে তাঁহার জন্য সে অপেক্ষা করে এবং যদি একান্ত অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে রাত্রিতে কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুবিধা হইবে, তাহা যেন একখণ্ড কাগজে লিখিয়া জানালা হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করে।

তৎপরে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক দিনের পর বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকার লাভে নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। বন্ধুবর শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহকালে, তাঁহাদের বাটিতে যাইতে না পারার কারণ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে উভয়ে

আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন এবং অনেক কথা মনে করিতে করিতে সত্যেন নিদ্রিত হইলেন। পর দিন প্রাতে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই বাহির হইলেন; এবং মালতীদের বাটীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিসে গমন পূর্ব্বক স্বহস্তে পত্রখানি চিঠির বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া আসিলেন। যথাকালে স্নান আহার করিয়া দুই বন্ধুতে বাটি হইতে বহির্গত হইলেন। সত্যেন্দ্র বন্ধুকে বলিলেন,—"হয় ত আজ আস্তে আমার একটু রাত্রি হইবে।" বন্ধু অফিসে চলিয়া গেলেন, আর সত্যেন্দ্রনাথ একাকী পটলডাঙ্গায় তাঁহার মাতৃস্বসার সহিত দেখা করিতে গেলেন। মাসী মাতা সত্যেনকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে এরূপ একাকী আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, তুমি এমন সময়ে হঠাৎ যে একলা কলিকাতায় এলে?"

সত্যেন্দ্রনাথ উত্তরে এই মাত্র বলিলেন,—"মাসি মা, এখনও কি আমি ছেলে মানুষটি আছি যে, সঙ্গে আবার লোক আন্তে হবে? আমি কাল এসেছি, অন্য দরকার কিছু নাই। বড় দিনের সময় একবার বেড়াতে এলাম।"

সত্যেন বিগত কল্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। অথচ তাঁহার বাটিতে না আসিয়া অন্যত্রে ছিলেন বলিয়া মাসি মাতা আপনাদের দারিদ্রতার কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন; এবং অদ্য তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সত্যেন মাসিমাতার অনুরোধে সে দিন তথায় থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় চারিটা বাজিল। নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন সাহায্যে, জলযোগ কার্য্য সমাধা করিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ বেড়াইতে যাইবার ছলে মাতৃস্বসার নিকট বিদায় লইয়া, নির্দ্ধারিত সময়ে প্রেমিকার দর্শনলালসায় বিবিধ কল্পনা মাথায় লইয়া, উপস্থিত হইলেন। কিন্তু একি! এত লুকোচুরি, এত মিথ্যা কথা যাহার জন্য, সেই মালতী কৈ, সে ত পত্র পাইয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিবে না; তবে কি মালতী পীড়িতা হইয়াছে? সামান্য পীড়া হইলে সে কখনই সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিত না। পত্র কি তবে তাহার হস্তগত হয় নাই। না হইবারও কোন কারণ দেখি না। যাহাই ঘটিয়া থাকুক সে যে তাঁহার পত্র প্রাপ্ত হয় নাই, সত্যেন ইহাই স্থির করিলেন। আশায় বঞ্চিত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ মালতীর সহিত দেখা করিবার জন্য অন্য উপায় কি আছে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উপায়ই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন,—যদি সেই বাটীটি অদ্য শূন্য থাকিত, তাহা হইলে পরিচিত গৃহস্বামীকে আট দশ দিনের ভাড়া দিয়া সকল কার্য্যের সুবিধা করিয়া লইতেন। সন্ধ্যা ক্রমে উত্তীর্ণ হইল। অন্ধকারে আর মানুষ চেনা যায় না। আর অনর্থক তথায় থাকিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথমে বন্ধুকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, অদ্য তাঁহাদের বাটিতে যাইতে পারিবেন না এবং কল্য বাটি যাইবেন, দেখা করিবার আর সুবিধা হইবে না। রাত্রিতে স্থির করিলেন কল্য বাড়ি যাইবেন, আর এইবার বাটি যাইয়া যাহাতে মালতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎকার অনায়াসসাধ্য হয় তাহা করিবেন। প্রয়োজন হয়ত তাহাকে মাণিকনগরের কোন স্থানে গুপ্তভাবে রাখিবেন। কথাটি যত সহজে তিনি মনে করিলেন, ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তাঁহার পক্ষে ইহা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। অপর লোক হইলে হয়ত আমরা এ কথা বলিতাম না। সত্যেন মালতী প্রেমে বিভোর হইলেও, এখনও একেবারে জ্ঞানহারা হন নাই ; খুল্লতাতের প্রতি ভয় ভক্তি এখনও পূর্ব্ববৎই আছে। সকলেই প্রথমে চেষ্টা করেন, উভয়দিক বজায় রাখিয়া কার্য্য করিবেন, কিন্তু পরিণাম দাঁড়াইয়া যায় অন্যরূপ। প্রেমের সুধাময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে সব ভুলিয়া যান, সে সময় অন্য সকল বিষয়ই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সে সুধার আস্বাদগ্রহণে যিনি বঞ্চিত, তিনি ইহার কিছুই বুঝিবেন না। বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এমন দেব-কবি কে আছেন, যিনি লেখনীমুখ নিসৃত বর্ণনার দ্বার অপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের অমিয়স্বাদ গ্রহণ করাইয়া দিতে পারেন ? যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি অসাধারণ, আমাদিগের অবশ্য নের পরিণামে কি আছে কে জানে।

পরদিনই সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটি গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পত্রপ্রাপ্তির পর।

শচীকান্ত বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রকে এত শীঘ্র বাটি ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্যেন এত শীঘ্র যে ফিরে এলে, শরীর ভাল আছে ত ?"

সত্যেন্দ্রনাথ তদুত্তরে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কথাই জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর দুইখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি অতিপরিচিত হস্তের, আর একখানি নিতান্ত অপরিচিত হস্তের লেখা দেখিলেন। প্রথমোক্ত খানি নিজ হস্তের লেখা দেখিয়া, মালতীর পত্র বুঝিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি আবরণ ছিন্ন করিলেন। সত্যেন্দ্র নিজ নাম ধাম লিখিয়া কতকগুলি খাম দিয়াছিলেন, মালতী তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে হইলে, সেইগুলি হইতে লইয়া ব্যবহার করিতেন ; আর তিনি যে খামে মালতীর নিকট পত্রাদি লিখিতেন, সেগুলিও মালতীর দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। পত্রমোচন করিয়া দেখিলেন, মালতী তাঁহার শ্বশুরবাটি হইতে লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ৺শ্রীক্ষেত্রধাম দর্শনে যাইবেন এবং তৎপরে কাশী-বাসী হইবেন। সেই কারণে, বধূমাতাকে দেখিতে বাসনা হওয়াতে তাঁহাকে হঠাৎ লইয়া গিয়াছেন। তিনি তীর্থ যাত্রা করিলেই, মালতী কলিকাতায় যাইবেন; কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার শীঘ্রই কলিকাতা হইতে বদলী হইবার কথা আছে। মালতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাও—ললিত (বড়দাদার জ্যেষ্ঠপুত্র) কলিকাতাতেই থাকিবে।

কি কারণে,কলিকাতায় মালতীর সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই,সত্যেন্দ্রনাথ বুঝিলেন। মালতীর বড় দাদা বদলী হইবেন শুনিয়া, সুখের পথের একটি বিশেষ বিঘ্ন দূর হইবে ভাবিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাকে মাণিকনগরে আনিবার ইচ্ছা মন হইতে তিরোহিত হইল। যাহাতে সেই বাটিটি ভাড়া লইয়া নিজ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন স্থির করিলেন। মালতী কলিকাতায় না থাকাতে, পাছে তাঁহার দাদা বা অপর কেহ তাঁহার লিখিত পত্রখানি পাঠ করেন, ইহা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।

এইবার দ্বিতীয়পত্রখানি পাঠ করিলেন। এইখানি পাগল সতীশের পত্র। সত্যেন্দ্র উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আপন মনে ঈষৎ হাসিলেন। হায়! এই হাসি অনেকেই হাসিয়া থাকেন। অপরাহ্নে অমরের সহিত দেখা হইলে, হাসিতে হাসিতে পত্রখানি হস্তে দিয়া বলিলেন,—"নাও, তখন ত তোমরাই জোর করে বিবাহটা করালে, এখন এই বিবাদ থেকে রক্ষা কর। অমরনাথ চিঠিখানি হাতে লইয়া বলিলেন,—"তা হচ্চে, সত্যেনদা, এরই মধ্যে এলে কখন?"

"দু'টোর সময় এসেছি, চিঠিখানা পড় না!"

অমরও পত্র পাঠান্তে রহস্যের ভাবে বলিলেন,—এখন উপায়, তবে না হয় বৌদিদিকে সেখান থেকে আন্‌তে পাঠান যাক্।" অমর বাহ্যিক যে ভাব দেখাইলেন, অন্তরে তাঁহার সে ভাব ছিল না।

সত্যেন কলিকাতায় যাইবার প্রকৃত কারণ অমরকে বলিয়া যান নাই। মালতীর চিঠির কথাও অদ্য বলিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়।

মাঘ মাস পড়িল। সতেন্দ্রনাথের খুড়িমাতা শচীকান্ত বাবুকে বলিলেন,—"বৌমায়ের এই মাসে দিন করতে হবে।" শচীকান্ত বাবু পূর্ব্বেই আপন মনে এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। গৃহিণীর কথার উত্তরে বলিলেন,—"বেস ত ভাল দিন যদি থাকে, তাহলে এই মাসেই দ্বিরাগমন হবে।"

ভট্টাচার্য্যকে দিন দেখাইয়া মাসের শেষ ভাগে বধূমাতার দ্বিরাগমন হইবে স্থির হইল। যথাকালে বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি স্বয়ং মাণিকনগরে বৈবাহিক বাটিতে উপস্থিত হইয়া শচীকান্ত বাবুকে, জামাতা

বাবাজিকে যোড়ে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন। একটি শুভ দিনে সত্যেন্দ্রনাথ যোড়ে যাইয়া বধূমাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন, এইরূপে কথাবার্ত্তা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাদান করিয়াছেন, যাবৎ দৌহিত্রের মুখ দর্শন না করেন, তাবৎ জামাতার গৃহে ভোজন করিতে নাই; সেই কারণে, তথায় আহার করিলেন না। বৈবাহিকের অনুরোধে তাঁহার এক জ্ঞাতির বাটিতে উক্ত কার্য্য সমাধা করিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এই যোড়ে যাওয়া বা দ্বিরাগমনের সংবাদে দুঃখিত হইলেন না, বা আহ্লাদিতও হইলেন না। হিরণ্ময়ীর দ্বিরাগমনের জন্য যে দিন স্থির হইয়াছে, তাহার দুই দিবস পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রনাথ দ্বারবান্ ও খানসামা সমভিব্যহারে শাল, ষ্টকিন, ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরীয় শোভিত ও এসেন্স সুরভিত হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। বাটিতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"এসো বাবা, বোস বাড়ির সব ভাল ?"

সত্যেন বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ বাড়ীর সকলে ভাল আছেন।"

নূতন ভগিনীপতি আসিয়াছেন শুনিয়া হিরণ্ময়ীর কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় রমেশ ও বিজয় বাটির মধ্য হইতে দৌড়িয়া আসিয়া সত্যেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"নে,জামাই বাবুকে প্রণাম কর।

বালকদ্বয় তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তক নত করিয়া সত্যেনকে প্রণাম করিল। শ্বশুর মহাশয় অন্যত্র চলিয়া গেলেন, সত্যেন বালকদ্বয়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তাহারা তাহাদের পাঠশালার কথা, ঘোষদের অতুলের কথা, মাঠের পুষ্করিণীতে মাছ ধরান হইয়াছে তাহার কথা, বারোয়ারী সরস্বতী পূজার কথা প্রভৃতি তাহাদের যত কথা ছিল, সব বলিল। ছোট দিদি অর্থাৎ হিরণ্ময়ী তাহাদের উলের জুতা বুনিয়া দিয়াছে, এবং সরলা দিদি ও জ্যাঠাদের বাটির মেজ বৌ দিদি, জলখাবার সামগ্রীতে বাতাসা ভিজানের স্থানে খড়ের জল, শসার পরিবর্ত্তে অপক্ক বিম্বফল ও ইক্ষুর পরিবর্ত্তে আম্রারসের বোঁটা, ডিবের ভিতর আরশুলা দিবে; আর ও বাড়ীর ঠাকুরমা নেকড়া দিয়া লুচি ভাজিয়া দিবে এ কথা গুলিও উক্ত দিদি ও বৌ দিদির নিষেধ স্বত্বেও তাহারা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বসিয়া এই সব শুনিতেছেন, এমন সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীনাথ স্থানান্তর হইতে আগমন করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাহাকে পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। উভয়েই সমবয়স্ক, তাহাতে সম্বন্ধও চমৎকার, কাজেই উভয়ের মধ্যে আলাপ কথোপকথনের উৎস খুলিয়া গেল।

আজি স্ত্রী মহলে মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদের তিন বাড়ির স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বালিকা ও যুবতীগণ, কেহ জামাই

দেখিতে, কেহ নূতন জামাইয়ের সহিত কথা কহিতে, কেহ বা কাজ করিতে আসিয়াছেন। যুবতীরা সাধারণতঃ নূতন জামায়ের সহিত কথা কহিতে, তাঁহাদের সহিত রহস্য করিতে ভাল বাসেন; অথবা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় অনুষ্ঠান ভিন্ন যে জাতির দিকে চাহিয়া দেখিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাই, তাঁহারা সমাজের অনুমোদিত সেই জাতির সম্মুখে বাহির হওয়া বা কথা কহিবার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না। বাটিতে এত গোলমাল, উদ্যোগ, আয়োজন, কিন্তু অদ্য অধিক কার্য্যের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের আহারের জন্য, অথবা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন, আর হিরণ্ময়ীর বেশ বিন্যাস করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নয়।

বৈকাল হইল। সত্যেন্দ্রনাথের জলযোগের জন্য অন্দরে ডাক পড়িল। সত্যেন দেখিলেন, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলই সেই গৃহে আছেন। প্রথমে প্রণাম কাণ্ডটা সারিয়া ফেলিলেন। কেহ শুধু আশীর্ব্বাদ করিলেন, কেহ তামাসার সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে তিনি জলযোগার্থে নানা বর্ণ রঞ্জিত সুন্দর আসনে, যেমন উপবেশন করিলেন, অমনি একটা উচ্চ হাসির রোল গৃহ ও বাহির হইতে উঠিল। সত্যেন্দ্রনাথ হাসির কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এক প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার মাঝামাঝি বয়সের স্ত্রীলোক, যুবতীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —"নে না লো, তোরা খাইয়ে দে, বর কি নিজে খেতে জানে?"

প্রথমা যুবতী।—আমাদের হাতে খাবে কি আমরা যে কালো, তুমি হচ্চ রাঙ্গা ঠাকুর মা, তুমি খাইয়ে দাওগে।

দ্বিতীয়া যুবতী। না, না, খাইয়ে দেবার লোক যে, তাকে ডেকে নিয়ে এস, আমরা সব এখান থেকে উঠে যাই।

একজন "হিরেকে ধরে নিয়ে আসি"— এই কথা বলিয়া প্রকৃতই তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এইবার কথা কহিলেন, বলিলেন,—"কাকেও খাইয়ে দিতে হবে না; আপনারা বসুন, আমি আপনি খাচ্চি।"

প্রৌঢ়া। খাও ভাই খাও, কিছু লজ্জা করো না।

সত্যেন্দ্রনাথ হস্ত ধৌত করিবার মানসে যেমন শূন্য গেলাসের ঢাকা খুলিলেন, অমনি পুনরায় গৃহ হাস্যে পরিপূর্ণ হইল। তখন একজন পরিষ্কার পানীয় জল আনিয়া দিলেন। সত্যেন নিরুত্তর হইয়া হস্ত ধৌতান্তর ফলের রেকাবিখানি কিঞ্চিৎ নিকটে টানিয়া ধীরে ধীরে শসা, আক ভিন্ন অন্য ফল আরম্ভ করিলেন। সরবতের বাটীতে হাত দিলেন না দেখিয়া, দুই একজন বলিলেন,—"মিশ্রির পানা, ডাবের জল এসব খাও।" সত্যেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন,— "না, বৈকালে আর ওসব খাব না।" তখন

বালক বিজয়কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল, "দাদাতে আমাতে সব বলে দিয়েছি।" ইহা শ্রবণে মেজ বৌ দিদি বলিলেন,—"বেস করেচ।" এস্থলে 'সব' কথাটি বিজয় যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিল, বৌ দিদি 'বেস' কথাটি সেই ভাবে উচ্চারণ করিলেন। আর সরলা দিদি বলিলেন,—"কি বলচিস্ বল্‌ত, বিজে ভারি দুষ্ট হয়েচে।" শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিল, সবিশেষ বলিলে পর, সরলা সত্যেনের অসাক্ষাতে বিজয়কে একটি চড় দেখাইলেন। বিজয়ও মুখ ভঙ্গির সহিত তদ্রূপ চড় দেখাইলেন। যখন এই সকল কার্য্য চলিতেছিল, তখন সত্যেন্দ্রনাথ একখানি পেঁপে বদনে নিক্ষেপ করিলেন, অমনি আবার হাসি। সত্যেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে পেঁপে ভ্রমে বিলাতি কুমড়া মুখে দিয়াছেন, তিনি গম্ভীর ভাবে উহা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। একজন বলিলেন,—"কি খেলে?" সত্যেন বলিলেন,—"কেন পেঁপে। এমন সময় যিনি হিরণ্ময়ীকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন,—"না ভাই হিরেকে ধরে আনা আমার কাজ নয়, তোরা যদি কেহ পারিস্‌ত দ্যাখো" অপরা রমণী উত্তর দিলেন,—আচ্ছা এখন থাক রাত্রিতে দেখা যাবে।"

সত্যেন্দ্রনাথ মিষ্টান্নের রেকাবিতেও কএকবার অপ্রস্তুত হইয়া জলযোগ কার্য্য সমধা করিয়া জলপান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী একখানি খাদ্য দ্রব্যপূর্ণ রেকাবি হস্তে তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"না বাবা, কিছু খাওয়া হয় নি, আমি ভাল খাবার এনেছি খাও।" তৎপরে তিনি যুবতীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোরা সব ক্যামন, খাবার সঙ্গে ঠাট্টা কি, না ওসব আর করা হবে না। ছেলেমানুষ জামাই ওসব তামাসা আর করতে দোবো না।" হিরণ্ময়ীর মাতার এই কথা শ্রবণে একজন বলিলেন,—"তোমার ছেলেমানুষ জামাইটিকে আমরা খেয়ে ফেলব না।" আর একজন একপার্শ্ব হইতে বসনাঞ্চলে মুখ ঈষৎ আবৃত করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কচি খোকা, ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানেন না।" সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট আহার পূর্ব্বেই হইয়াছে একথা কিছুতেই শাশুড়ীকে বুঝাইতে না পারিয়া অগত্যা আরও দুই একটি উদরস্থ করিলেন।

এইরূপে কিঞ্চিৎ ন্যূন অর্দ্ধঘণ্টায় বৈকালিক জলযোগ ক্রিয়া সমাপনান্তে বহির্বাটিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উপস্থিত নারীবৃন্দ একবাক্যে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে সত্যেনের কথায় বাধা প্রদান করিলেন। এফ, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ, সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবাপন্ন পর-হৃদয়-জয়পটু যুবক আজি সামান্যা রমণীগনের নিকট পরাজিত হইয়া বুঝি তাঁহার মনের মধ্যে একটা গোলমাল অনুভব করিলেন, সেই কারণে তাঁহার আর রমণীরাজ্য ভাল লাগিতেছিল না; কিন্তু কি করেন, সুন্দরীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া তথায় অবস্থিতি

করিলেন। তাহার পর নানাপ্রকারের হাস্য রহস্য চলিতে লাগিল। কেহ জামাইকে ডুমুরের ফুলের সহিত তুলনা করিলেন, কেহ বলিলেন,—"কি ভাই আর চিন্তে পার কি?" কেহ বলিলেন,—"এই যে কনের ভাবনা ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেছ"আবার কোন-নবীনা বলিলেন,—"আমাদের না হয় ভুলে ছিলে, কিন্তু হিরেকে কি একখানা চিঠিও দিতে নেই?" কোন প্রাচীনা সত্যেনকে বনমালীর সহিত তুলনা করিয়া কিরূপে রাধাকে ভুলিয়া গোকুলে ছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপ যাহার যাহা ইচ্ছা বলিলেন। সত্যেন যাহা পারিলেন উত্তর দিলেন। সেই সকল কথা সবিস্তারে বলিতে হইলে আর একটি পরিচ্ছেদ বাড়াইতে হয়। এইবার তিনি বাহিরে আসিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। একটা সেকেলে মাগী অসভ্য ভাষায়, দেহের স্থান বিশেষের নাম করিয়া বলিল,—"লাল করে দিলে কে?" তখন সত্যেন নিজ শরীরের পশ্চাৎদিকে চাহিয়া, আসনে বসিবার কালে নকলের হাস্যের কারণ বুঝিলেন। দরপ্রবর্ত্তনান্তরে বাহিরে আসিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পরাজিত হইয়া কি উপায়ে তাহাদিগকে ঠকাইতে পারেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নলিনীনাথের সহিত একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। নলিনের কএকটি বন্ধুর সহিত আলাপ হইল। সন্ধ্যার পর শ্বশুরালয়ের সামান্য বৈঠকখানায় বসিয়া সেই সকল যুবকদিগের সহিত কথা বার্ত্তায় রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, রমেশচন্দ্র আসিয়া ভগ্নীপতিকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়াগেল।

এবার গৃহের ভাব অন্য প্রকার। সত্যেন্দ্রনাথ অপরাহ্নের ব্যাপার দেখিয়া রাত্রির জন্য যেরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং মনে মনে যেরূপ চিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, এবার তাহা দেখিলেন না। দেখিলেন শাশুড়ী ঠাকুরাণী খাদ্যের নিকট বসিয়া আছেন, আর কেহ নাই, সরলা তখনই উত্তপ্ত দুধের বাটি আনিয়া জুড়াইতে লাগিলেন। বৈকাল বেলা যাঁহারা জামাই দেখিতে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। কেবল সরলা ও বৌ দিদি আছেন, তাহাদের বাটী ভিন্ন নহে। শাশুড়ী বলিলেন,—"বিকালে ভাল ক'রে জল খাওয়া হয় নাই, এখন খাও বাবা। এবার আমি নিজ হাতে সব করিচি, কেউ ঠকায়নি।" উক্ত যুবতী দ্বয়ের ও এক ঠাকুরমার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও, হিরণ্ময়ীর জননীর জন্য কেহ এবার আর কোন প্রকার ঠকাইবার প্রয়াস পায় নাই। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী জামাতার নিকটে বসিয়া এটা খাও, ওটা খাও বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ঠাকুরমা চাট্নির বাটিটি দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন,—"দাঁড়াও হাত ধুয়ে আসচি ভাই।" এই কথায় সরলা বিশেষ সুখী হইলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাহাতে ও হিরণ্ময়ীর বৌ দিদিতে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, উভয়ে

সত্যেন্দ্রনাথ ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া রাত্রিতে একটু আমোদ করিবেন, অপরকে সে আমোদের অংশ দেওয়া বোধ হয় তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।

সত্যেনের আহারাদি হইল, পান মুখে দিলেন। ঠাকুরমা হাত নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হিরণ্ময়ীর মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বৌ, তোর জামাইয়ের সঙ্গে আমরা দুটো কথা কই, তুই এখান থেকে যা।" "না বাছা, আমার জামাইকে বেসী রাত জাগিও না, অসুখ হবে।" এই কথা বলিতে বলিতে গৃহিণী সত্যেন্দ্রনাথের ভুক্তাবশিষ্ট আহারীয় সমেত পাত্রখানি লইয়া কন্যাকে আহার করাইতে গেলেন। সরলা ঠাকুরমার গা টিপিয়া হাসি হাসি মুখে সত্যেনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর মা, জামাই নূতন শ্বশুর বাড়ী এসেছে আর শাশুড়ী বলচেন রাত্ জাগলে অসুখ হবে।"

ঠাকুরমা।—যা বল্লি।

মেজ বৌদিদি হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"বড় ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি খেয়ে নিলে, আচ্ছা এক পৌষে শীত পালায় না।"

সত্যেন। আপনি ছিলেন কোথা?

বৌদিদি। মহাশয়, ছিলাম এই পার্শ্বের ঘরেই। একবার ডাক্‌তে হয়।

সত্যেন। আপনাদেরে কি আমি ডাক্‌তে পারি।

সরলা। কেন, আমরা কি মহারাজ?

সত্যেন। না, মহারাজ হ'লে ত ডাক্‌তে পার্‌তেম, আপনারা তারও উপর।

ঠাকুর মা। না, না, তোরা পীর;—আমি নাত্‌জামাইয়ের হয়ে বলে দিচ্ছি। তোরা কি এই কত্তে এখানে রয়েছিস্ নাকি? আমার কথা শোন নাত্‌নীকে এইখানে নিয়ে আয়।

সরলা। ঠাকুরমা, আমাদের কর্ম্ম নয় হিরেকে নিয়ে আসা; তুমি যদি পার্‌ত নিয়ে এস।

ঠাকুরমা হিরণ্ময়ীকে আনিতে প্রস্থান করিলেন।

বৌ দিদি। ঠাকুরঝির সঙ্গে বিয়ের সময় কেমন আলাপ টালাপ হয়েছে?

সত্যেন। সে কথা আপনার জিজ্ঞাসা করাই ভুল, বিয়ের কনে সবই এক জাতের। আপনার কথা কি মনে নাই?

সরলা। সত্যি ত বৌ দিদি, সে আবার আলাপ।

বৌ দিদি। ঠাকুরঝি, তোমার এখন আট বছর বয়সে বিয়ে হ'য়েছিল, তোমার কথা ছেড়ে দাও। হিরে ঠাকুরঝি ত আর নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়!

সরলা। আচ্ছা ভাই, তুমি হিরেকে চিঠি লেখনা কেন?

সত্যেন। হিরণ্ময়ীকে চিঠি লিখ্‌লে উত্তর দিত?

বৌ দিদি। না দিত সে কেমন ক'রে জান্‌লে? এখন যাক্ কাল্ বাদে পরশু দিন ত তুমি তোমার জিনিষ নিয়ে চলে

যাবে, আবার দেখা কবে হবে?

সরলা। হাঁ, ফিরে সেখানে গেলে আবার আমাদের মনে থাক্‌বে! আমার কথা ছেড়ে দাও, আমিও দুদিন পরে বিদায় হ'য়ে যাবো, তুমি ভাই, যখন এখানে আসবে তখনই দেখতে পাবে।

ঠাকুরমা বহু কষ্টে হিরণ্ময়ীকে গৃহে আনিলেন। হিরণ্ময়ী আধ হাত ঘোমটা দিয়া এক পার্শ্বে বসিল। সকলে ধরিয়া বসিলেন,—একবার; হিরণ্ময়ীকে কোলে করিতে হইবে। সত্যেন বলিলেন,—"এখনও কি বর হ'য়ে আছি নাকি?"

ঠাকুর মা। না, এখন একটা নূতন সম্পর্ক হয়েছে! নাও ভাই, একটিবার কোলে কর. রাত্রিতে যখন কোলে কর্‌বে, তখন ত আর আমরা দেখ্‌তে যাব না?

সত্যেন্দ্রনাথ অনেক কথার পর মৌনদ্বারা সম্মতি জানাইলেন। ঠাকুরমা তখন হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে বসাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এবং রাত্রি হইতেছে দেখিয়া, "তবে ভাই তোমরা শোও"—বলিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া বাহিরে গেলেন। সুন্দরীযুগল বলিয়া গেলেন,—"কাল আবার দেখা হবে।"

সত্যেন্দ্রনাথ উঠিয়া ধীরে ধীরে ভিতর হইতে দ্বাররুদ্ধ করিলেন। তৎপরে হিরণ্ময়ীকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"হিরণ! বিছানায় এস।" হিরণ্ময়ী কোন উত্তর; দিল না, অতি সতর্কতার সহিত উঠিয়া, পায়ের মল, হাঁটুর ঊর্দ্ধে অর্থাৎ উরুদেশে সংস্থাপিত করিলেন এবং ধীরভাবে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিলেন।

সত্যেন বলিলেন,—"হিরণ ভাল আছ?"

হিরণ্ময়ী বলিল,—"আছি।"

সত্যেন বলিলেন,—"হিরণ, এখানে ত আর কেহই নাই, তুমি অমন করে শুয়ে রইলে কেন? আমার কাছেও কি লজ্জা করিবে?" হিরণ্ময়ী কোন উত্তর দিল না। সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, তখন হিরণ্ময়ী অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"বাহিরে লোক আছে।" সত্যেন বুঝিলেন যে, এখন আর কথা কহাইবার চেষ্টা করা বৃথা। তিনি হিরণ্ময়ীর শয্যাবিলুণ্ঠিত কোমল হস্তখানি নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"তবে এখন ঘুমাও, কিন্তু রাত্রিতে উঠ্‌তে হবে।"।

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর দিলেন না। উভয়ে প্রায় একঘণ্টাকাল নীরব থাকিবার পর, সত্যেন যখন বুঝিলেন যে, হিরণ্ময়ী এখনও বিনিদ্র আছে, তখন তিনি বলিলেন,—"হিরণ! এখনও ঘুমোও নি?" উত্তর হইল,—"না।" তৎপরে উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইল, তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা একটিও নাই। এইরূপ অর্থহীন আদরের শত শত কথায় দ্বিতীয় সাক্ষাতের প্রথম যামিনী অতিবাহিত হইল।

হিরণ্ময়ীর স্পৃহাশূন্য, আবেগ আকুলতাহীন সম্ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ পরমতৃপ্তি লাভ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

ছায়াদর্শন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

উপক্রমঃ।

ভক্তিধর্ম্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ ;
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।"

অর্থাৎ মানুষ যখন জড়দেহমুক্ত জীবাত্মাকে সূক্ষ্মতর তনুতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন সে কেমন একটা ভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। কেহ আশ্চর্য্যের ভাবে প্রণোদিত হইয়া, সে আত্মার কথা অন্যকে বুঝাইয়া কহে ; কেহ কানে শুনিয়াও নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করে ; এবং কেহ কেহ শুনিয়াও যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে, আত্মার অস্তিত্বে উদাসীন ও অবিশ্বাসী রহে। *

আমরা আজি পাঠকের নিকট অধুনাতন পারিসের যে কাহিনীটি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, ইহাও অতি বড় আশ্চর্য্য। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও ইহা প্রমাণ-সমর্থিত ও বহুলোকের পরিজ্ঞাত সত্য। ইংলণ্ডীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সুপরিচিত ধর্ম্মযাজক,

* উপরিলিখিত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামিপ্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়দিগের ভাষ্যের সহায়তায় গীতা পাঠ করিয়াছেন, আমাদিগের ব্যাখ্যা তাঁহাদিগের কাছে ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা শ্লোকের স্বারসিক অর্থের অনুগামিনী কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠক স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন। শ্লোকটির অন্বয় বিবৃতি এইরূপ,—

"কশ্চিৎ এনং (আত্মানং) আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যশ্চ এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, কশ্চিৎ শ্রুত্বা চ অপি এনং নৈব বেদ (জানাতি)।"

এই অন্বয়মুখী ব্যাখ্যার পোষকতায় শাঙ্করভাষ্যের কএকটি পঙ্‌ক্তি তুলিয়া দিলাম। এই পঙ্‌ক্তি কয়টি নিশ্চয়ই অধ্যাত্মবাদী পাঠকের প্রীতি জন্মাইবে।

"আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যং অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানং তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিৎ, আশ্চর্য্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ, আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।"

ধীমান্ (Frederick George Lee. D. C. L) ফ্রেডারিক জর্জ লী পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। ডক্টর লী, অধ্যাত্মতত্ত্বের অসংখ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, অতি কঠোর পরীক্ষকের ন্যায় প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছেন; এবং আপনি এই তত্ত্বে প্রগাঢ়বিশ্বাসী হইয়া, প্রাণে কিরূপ শান্তি ও পারমার্থিক সাধনার পথেই বা কিরূপ সহায়তা পাইয়াছেন, তাহা অকপট হৃদয়ে জানাইয়াছেন। আমরা বান্ধবের আশ্রয়-যোগে তৎসংগৃহীত আরও কএকটি বিচিত্র বিবরণ বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিয়াছি। আজিকার এ কাহিনীটির সত্যতা সম্বন্ধেও ডক্টর লীই সমাজের নিকট দায়ী। তাদৃশ সুপণ্ডিত সাধুসজ্জনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে কাহারও মনে কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, ইহাই তদীয় নামগ্রহণের মুখ্য কারণ। লী কাহিনীটির তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইয়া বলেন নাই। আমরা তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নপর হইব।

আত্মিক কাহিনী।

জর্ম্মণীর একটি যুবতী পারিস নগরে বেড়াইতে আসিয়াছেন। পারিস ফ্রান্সের রাজধানী,—শোভা ও সম্পদে মর্ত্ত্যের অমরাবতী। যুবতী সুন্দরী ও অতি বড় সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা,—রাজকুমারী না হইলেও রাজকুমারীর ন্যায়, সম্মানশালিনী, এবং বিষয়বৈভবে উচ্চপদবীরূঢ়া রমণী। পরিচারক, পরিচারিকা, অনুচর ও সহচর-সুহৃদ্ প্রভৃতি বহু পরিজন তাঁহার সঙ্গে।

যুবতী আর কখনও পারিসে আইসেন নাই। তিনি পারিসের একটা প্রাসাদ-প্রতিম হোটেলে অবতরণ করিলেন। হোটেলের কএকখানি ভাল ঘর তাঁহার জন্য ভাড়া করা হইল। যুবতীর শয়নগৃহ রূপে যে ঘরটি নির্দ্দিষ্ট হইল, উহা অসংখ্য প্রাসাদ-মালায় অলঙ্কৃত পারিস নগরেরই উপযোগি। শয়নগৃহের বহির্ভাগ যেমন মনোরম, অভ্যন্তরও তেমনই আশ্চর্য্য কারুনৈপুণ্যে চিত্তহারি।

যুবতী সুহৃদ্‌বর্গের সহিত যথাসময়ে, উপাদেয় ভোজ্যে নৈশভোজ সমাপন করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ইউরোপে, ভদ্রমহিলাদিগের শয়নগৃহে, বিশ্বস্তসহচরী বা পরিচারিকা ভিন্ন, অন্য কাহারও, বিনা অনুমতিতে, প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং একটি পরিচারিকা মাত্র শয়নগৃহে কিছু কালের তরে তাঁহার সঙ্গিনী হইল।

ইউরোপীয় সম্ভ্রান্তবংশের সুন্দরীরা এক এক সময় এক এক প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভোজনে এক পরিচ্ছদ, নৃত্যশালায় একবেশ, শয়নগৃহে আর এক সজ্জা। অপিচ, তাঁহারা বেশ-পরিবর্ত্তন প্রায়শঃ স্বহস্তে করেন না। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের ছাট, কাট ও অভ্যন্তরীণ গঠনও এমনই বিচিত্র যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত, তাহার সম্যক্ সমাধান সহজসাধ্য হয় না। পরিচারিকা, সুরম্য নৈশপরিচ্ছদে যুবতীকে সুসজ্জিত করিয়া দিবার নিমিত্তই, শয়নগৃহে কিয়ৎকাল তাঁহার সঙ্গিনী।

যুবতী শয়নগৃহে যাইয়া একটা কৌচের উপর উপবিষ্টা হইলেন; পরিচারিকা দ্রুত হস্তে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। পরিচারিকা চলিয়া গেলে, যুবতী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুসজ্জিত খট্টায় শয়ন করিলেন। যদিও তিনি পথশ্রান্তা, তথাপি তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। ঘরে শয়ন-সময়ের উপযোগি সুখ-সেব্য স্নিগ্ধ আলো জ্বলিতেছিল। নিদ্রা আসিতেছে না,—একাকিনী কি করিবেন,—যুবতী শয়ান অবস্থায় রহিয়াই, ঐ স্নিগ্ধ আলোকে, ঘরের চারিদিকে, দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন; এবং বহু মূল্য সাজসজ্জা ও বিবিধ কারুকার্য্যের মনোহারিণী শোভা দেখিয়া, মনে মনে গৃহস্বামীর বৈভব ও নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গৃহের সজ্জাসম্পদ্ তাঁহার ন্যায় উচ্চবংশসম্ভূতা, সুখ-সংবর্দ্ধিতা, সুশিক্ষিতা মহিলারও দর্শনযোগ্য বটে।

রমণী নিরুদ্বেগ মনে, এইরূপে নয়নাবর্ত্তন-সুখে আত্মবিস্মৃতবৎ * আছেন, এমন সময়, হঠাৎ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি দোহারা ভাজের একটা দরোজা খুলিয়া গেল। পরিচারিকা গৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে যুবতী স্বহস্তে ঐ দরোজা বন্ধ করিয়াছিলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়া মাত্রই, কি এক প্রকারের অপূর্ব্ব অথচ যেন অপার্থিব আলোকে সমস্ত ঘর দীপ্তিময় হইয়া উঠিল; এবং ঐ আলোকের সঙ্গে সঙ্গে, একটি পরম সুন্দর যুবাপুরুষ, ধীরপদ-বিক্ষেপে, যুবতীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। যুবা, গৃহে প্রবেশ করিয়াই, বিশেষ সতর্কতার সহিত দরোজাটি পুনরায় বন্ধ করিয়া ফেলিল।

নীরব-নিশীথে কোন যুবতী কিংবা কোন ভদ্রমহিলার শয়নগৃহে এইরূপে একজন অপরিচিত যুবপুরুষের প্রবেশ নিতান্তই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ও ভয়ানক গর্হিত কার্য্য। ইহাতে যাহা হইতে পারে, তাহাই হইল। যুবতী প্রথমতঃ চমকিত, শেষে ক্রুদ্ধ, উদ্বিগ্ন ও একটু ভীত হইলেন। কিন্তু তথাপি, যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। আগন্তুক যুবকের মুখপানে দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার ভয়, উদ্বেগ ও ক্রোধ একবারে তিরোহিত হইল। যুবক ফরাশি নৌসৈনিকের পরিচ্ছদে সজ্জিত। সে বয়সে নবীনযুবা ও ব্যবসায়ে সৈনিকপুরুষ হইলেও, রমণী দেখিতে পাইলেন,—তাহার পলকশূন্য চক্ষে ও পাগলের মত উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত নয়ন-তারায় না আছে কোন প্রকার লালসার আবিল আবেগ, না আছে সৈনিক-জনোচিত ঔদ্ধত্যের গর্ব্বিত কটাক্ষ। যুবকের সুন্দর মুখখানি, বিষাদের গাঢ় ছায়ায়, এমনই আবৃত যে, সুন্দরী তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়াই, তাহার সমস্ত ধৃষ্টতা মনে মনে মার্জ্জনা করিলেন। ক্রোধ বা ভয়ের আর কথা কি, তিনি যেন কেমন একটুকু দয়ার ভাবেই আবিষ্ট

* স্মৃ ধাতু সকর্ম্মক হইলেও, ক্রমদীশ্বরের মতে, রুহপ্রভৃতি ধাতুর ন্যায়, উহার উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবস্থা আছে।

হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, —সকরুণ দৃষ্টিতে যুবকের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

যুবকও কিছু বলিল না, অথবা রমণীর পানে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। সে একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া, ঘরের ঠিক মধ্য স্থানে উপবেশন করিল। চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া সে তাহার পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি পিস্তল বাহির করিল। ক্ষুদ্র হইলেও সাধারণতঃ যেরূপ পিস্তল লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এটি সেই শ্রেণীর নহে। ইহার গঠন একটু নূতন রকমের। যুবক পিস্তলটি হাতে লইয়া, এই প্রথম, অর্দ্ধশয়ানা ও অতিত্তর-বিস্মিতা যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দৃষ্টি বড় আকুল, বড়ই ক্লেশব্যঞ্জক, বড় ম্রিয়মাণ—যেন উহার প্রাণটা, পুড়িয়া পুড়িয়া, দ্রবীভূত হইয়া, সেই দৃষ্টির সহিত, ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। যুবক, যুবতীর মুখপানে চাহিয়া, অতি কাতরকণ্ঠে কহিল,—

"ভদ্রে, আমি আপনার অপরিচিত। কিন্তু সকলেই সকলের নিকট যাহা পাইতে অধিকারী, অপরিচিত হইলেও, বোধ হয়, আমি সেই ভিক্ষা আপনার নিকট চাহিতে পারি। আপনি দয়া করিয়া এই হতভাগ্য বিপন্নের জন্য প্রার্থনা করিবেন, এই আমার প্রাণের ভিক্ষা।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই, যুবক আপনার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িয়া দিল; এবং অমনি তাহার মৃতদেহ, চেয়ার হইতে ছুটিয়া, মাটীতে পড়িয়া গেল। পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটি অন্ধকার ও পরক্ষণেই নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

যুবক যখন পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়াছিল, যুবতী তখনই, ভয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়ায়, অতর্কিতভাবে, শয্যাতলে উঠিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি চক্ষের সান্নিধ্যে সেই অপরিচিত যুবককে এই ভাবে আত্মদেহের উপর সাংঘাতিক আঘাত করিতে দেখিয়া, কম্পিতকলেবরে শয্যাতলে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল না, কিন্তু কেমন একপ্রকার মোহপ্রভাবে তিনি আড়ষ্টবৎ হইয়া রহিলেন। তিনি চীৎকার করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। জিহ্বা যেন শুষ্ক তালুতে লাগিয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় নিদ্রা অসম্ভব। রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। তিনি সমস্তই বুঝিতেছেন, সমস্তই জানিতেছেন; কিন্তু কিছুই করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহার শরীর যেন তখন আর তাঁহার নহে।

এই ভয়াবহ কষ্টের দীর্ঘ রাত্রি অবশেষে প্রভাত হইল। পরিচারিকা, যথাসময়ে, শয়নগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া, যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্য উঠিল। সূর্য্যের সোনালী প্রভা হোটেলের মধ্যবর্ত্তি প্রাচীর-নিচয়ে হেলিয়া পড়িল, তথাপি যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। পরিচারিকা, প্রথম মৃদু মৃদু ডাকিল, দ্বারে মৃদু মৃদু আঘাত করিল, কোন উত্তর পাইল না। উত্তর না পাইয়া সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান ও

দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। তথাপি কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পরিচারিকা ইহাতে বিশেষরূপে ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া সঙ্গীয় অন্য লোকজন-দিগকে ডাকিয়া আনিল; অবশেষে বল-পূর্ব্বক দরোজা খুলিয়া সকলের অনুমতি সহকারে ঘরে প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা গৃহে প্রবেশ করা মাত্রই যুবতীর কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং পরিচারিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"গত রাত্রিতে একটি লোক, জানি না, কিরূপে ঐ দরোজা খুলিয়া, এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ঐ চেয়ারে বসিয়া পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করি-য়াছে। তাহার মৃতদেহ এখনও মেজেয় পড়িয়া আছে; দেখ।" যুবতীর ভীত-ভীত কণ্ঠস্বর ও ভীত-কণ্ঠের কথা সকলেই শুনিল; কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কেহ কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, যুবতীর এই উক্তি স্বপ্নের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুবতী সম্ভবতঃ কোন একটা দুঃস্বপ্নে এই দৃশ্য দেখিয়াছেন,—এখনও সে মোহ ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই,—এখনও সেই স্বপ্নস্মৃতিতেই কষ্ট পাইতেছেন।

যুবতী সঙ্গিদিগের এই সিদ্ধান্ত কোন প্রকারেই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ জাগরিত অবস্থায় প্রস্ফুট আ-লোকে যুবককে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তা-হার পরিচ্ছদ বৈচিত্র্য, মুখচ্ছবির সেই বিষন্ন ভাব,—সেই অদ্ভুত পিস্তলটি এখনও যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। আত্ম-হত্যার পূর্ব্বে, যুবক অতি কাতরস্বরে, তা-হার জন্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত যে অনু-রোধ করিয়াছিল, তিনি সেই উক্তিও যেন সুস্পষ্ট শুনিতেছেন। অতএব তিনি তাঁহার অতন্দ্রিত নেত্রের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও জাগ্র-চ্ছ্রবণের স্পষ্টপরিশ্রুত বিষয়কে স্বপ্নকল্পনা-রূপে কিরূপে মানিয়া লইবেন? তিনি কাহারও সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিলেন না; অথচ সে মৃতদেহের চিহ্নমাত্রও নাই, ইহাই বা কিরূপে হইল, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন না। যুবতী বিষম ফাঁপরে পড়িয়া, এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত, যার-পর-নাই অধীরা হইয়া উঠি-লেন।

কিন্তু, যুবতীকে এজন্য বড় বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। হোটেলের অধ্যক্ষ একটি ধীর-স্থির বিজ্ঞ লোক। তিনি এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া যুবতীর সঙ্গীয় একটি ভদ্রলোকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"যুবতী কন্যা রাত্রিতে যে ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অমন ক্লেশ পাইয়াছেন, ইহা আমারই অনবধানতা বা ত্রুটিতে ঘটিয়াছে। ঐ গৃহে তাঁহার শয়ন-স্থান নির্দ্দেশ করা নিতান্তই অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। কারণ, আপনাদিগের এই স্থানে উপস্থিত হইবার তিন রাত্রি পূর্ব্বে, ঐ গৃহে, ঠিক্ অমনি নিশীথ-সময়ে, একটি ফরাশি নৌ-

সৈনিক যুবা একটা বিচিত্র গঠনের পিস্তল দ্বারা গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই আত্মঘাতী সৈনিকের শব এখনও সমাধিস্থ হয় নাই, পরিচয় ও পরীক্ষাদি কার্য্যের জন্য 'মর্‌গে' পড়িয়া রহিয়াছে।"

ভদ্রলোক, হোটেল-অধ্যক্ষের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া, সৈনিকের শব স্বচক্ষে দেখিয়া লইবার উদ্দেশে মর্‌গে গমন করিলেন। কলিকাতার যে স্থানে শবপরীক্ষা ও শবের পরিচয়-গ্রহাদি কার্য্য হয়, উহাকে বোধ হয় করোনারের আফিস বলে। ফরাশি দেশে যেস্থানে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম (Morgue) মর্গ। ভদ্রলোক, মর্গে যাইয়া, শব ও পিস্তল উভয়ই খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। যুবতীর বর্ণিত আত্মঘাতী যুবক ও তাহার কর-ধৃত পিস্তল, অক্ষরে অক্ষরে এক, ভদ্র লোক পরীক্ষা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন, এবং বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমে এই ঘটনার সমস্ত কথা পারিসে অনেকেরই কর্ণগোচর হইল। পারিসের আর্চবিশপ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক মন্সেনিয়ার সাইবুরও * ইহা শুনিতে পাইলেন। অন্যেরা যে ভাবে কথা শুনিল, তিনি সে ভাবে শুনিলেন না। কথাটা তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া একেবারে প্রাণে গ্রথিত হইয়া রহিল। তিনি মনে মনে, এ বিষয়ে নানারূপ আন্দোলন ও আলোচনা করিয়া, অবশেষে জর্ম্মণ-যুবতীর সহিত এই প্রসঙ্গে আলাপ করা একান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি যুবতীর সহিত সাক্ষাৎকার-মানসে হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। যুবতী স্বয়ং সুশিক্ষিতা; সুতরাং তাঁহার অতিথি কিরূপ উচ্চপদবীরূঢ় ব্যক্তি তাহা সহজেই বুঝিলেন, এবং উপযুক্ত সমাদরে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। এই সাক্ষাৎকারে, প্রধানধর্ম্মযাজক প্রসঙ্গতঃ কথা উত্থাপন করিয়া, ঐ রাত্রিতে, সেই অলৌকিককণ্ঠে যুবতীর প্রতি যে উক্তি হইয়াছিল, তৎপ্রতি তাঁহার মন আকর্ষণার্থ বিশেষ প্রয়াস পাইলেন।

আমরা শুধু প্রার্থনার জন্য অনুরোধের কথা বলিয়াছি। কিন্তু আত্মঘাতী যুবক তাঁহার উক্তিতে প্রার্থনার প্রণালীটিও স্পষ্টঃরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। সে তাহার আত্মার সদ্গতিকামনায় "আভি মেরিয়া" (Ave Maria) এই মন্ত্র জপ করিবার নিমিত্তই যুবতীকে স্পষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল। প্রার্থনাপ্রণালীর এইরূপ প্রকার নির্দ্দেশে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, যুবক রোমান ক্যাথলিক।

প্রোটেষ্টান্টদিগের বিশ্বাস যে, মানুষ, মৃত্যুর পর, যুগ-যুগান্তর-ব্যাপি দীর্ঘকাল, ভূতলে—সমাধিস্থলে—অচেতনবৎ নিদ্রিত রহে; তার-পর মহাপ্রলয়-কালে উদ্বোধিত হইয়া, বিচারার্থ আহূত হয়। বিচারের

* Monseigneur Sibour, the Archbishop of Paris.

একটি নির্দ্দিষ্ট দিন আছে। সেই ভয়ঙ্কর দিনে সমস্ত জীবাত্মাই, একসঙ্গে, সমাধি হইতে সশরীরে গাত্রোত্থান করিয়া, জগদীশ্বরের বিচারবিধানে দণ্ডপুরস্কার লাভ করিয়া থাকে। ক্যাথলিকদিগের বিশ্বাস অন্যরূপ; উহা কিয়দংশে ভারতীয় পুরাতন ঋষিবাক্য এবং কিয়দংশে অধুনাতন অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিকদিগের মতের অনুরূপ।- তাঁহাদিগের এই দৃঢ় সংস্কার যে, তনুত্যাগের পরক্ষণেই জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত হইয়া আপন আপন কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে আরম্ভ করে। ক্যাথলিকদিগের বিশ্বাসই যে, প্রকৃত সত্যের সহিত সম্পৃক্ত, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আত্মঘাতী যুবকের ঐরূপ দর্শনদান তাহার একটা অকাট্য প্রমাণ। আর্চবিশপ এইভাবে যুক্তির অবতারণা করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্মে যুবতীর বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়া যুবকের অনুরোধ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য এ বিষয়েও যুবতীকে বহু উপদেশ দিয়া আসিলেন।

পারিসের এই বিস্ময়কর ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, এবং বস্তুতঃও ইহাই সত্য যে, মানুষ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রভাবে বিশ্বাসের যে সম্বল লইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, পরলোকেও যত কাল পর্য্যন্ত সে উন্নততর গ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ না হয়, তত কাল ঐ বিশ্বাসই তাহার হৃদয় ও মনের উপর কার্য্য করে। আত্মঘাতী যুবক পৃথিবীতে থাকা কালে, যেপ্রকার ক্যাথলিক ছিল, পরলোকে যাইয়াও সে সেই প্রকার ক্যাথলিকই রহিয়াছে। ক্যাথলিকগণ মেরীকে ঐশী শক্তিরূপে পূজা করেন, এবং মেরীর নিকট প্রার্থনা করিলেই জীবের মুক্তিলাভ হয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যুবক ঈদৃক্ বিশ্বাসের বশেই, তনুত্যাগের পরেও, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আবশ্যক মনে না করিয়া, পাপ-তাপ ও পারলৌকিক দুর্গতি হইতে মুক্তি কামনায় মেরীর নিকট প্রার্থনা করিতেই অমন আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছে।

আরও একটি কথা আছে। যুবক ঐ রূপে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যার পুনরভিনয় করিল কেন? ইহা একটি প্রসিদ্ধ কথা ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের একটি সুপ্রসিদ্ধ সত্য যে, যাহারা বুদ্ধির ঘোরতর বিপাকে পড়িয়া, আত্মহননরূপ ভয়াবহ সাংঘাতিক অনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহারা পারলৌকিক নিয়তির অব্যর্থ শাসনে বাধ্য হইয়াই পুনঃ পুনঃ আত্মহত্যার অভিনয় করে; এবং এইরূপে সেই দুঃসহ মর্ম্মপীড়া ও অসহ্য যাতনা বারংবার ভোগ করিয়া, মুক্তির পথ অন্বেষণ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এ অভিনয় দুই চারিবার করিলেই আত্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়, এমন নহে। কেহ কেহ, কর্ম্মানুসারে, শতাব্দী কাল, প্রতি দিন, কেহবা প্রতি মাসে একদিন, এই ভয়ঙ্কর অভিনয় ও এই উৎকট পৌনপুনিক আবৃত্তির দ্বারা আত্মকৃত কর্ম্মের গুরুত্ব অনুভব করে; এবং কেন এই মহা-

পাপের আশ্রয় লইয়া দুর্লভ মানবজন্মের অপব্যবহার করিয়াছি বলিয়া অশ্রুজলে ভাসে।

হতভাগ্য আত্মঘাতীর প্রতি, কতকাল পরে দেবপুরুষদিগের দয়া হয়, এবং তাহার নিষ্কৃতিলাভ ঘটে, তাহা অনিশ্চিত। এই হেতুই Spiritualist অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদীরা আত্মহত্যার নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন; এবং এই হেতুই ভারতের ঋষি তাপসেরা অনুগামীর সমস্ত মহাপাতক অপেক্ষাই আত্মহত্যাকে গুরুতর পাপ বা ভয়াবহ দুক্রিয়ারূপে নির্দ্দেশ রূপে নির্দ্দেশ করেন। লোকে এই দুর্ব্বহ ও ও দুঃসহ পাপানুষ্ঠান হইতে আপনা হইতে নিবৃত্ত থাকুক, এই উদ্দেশ্যেই ঋষিগণ আত্মঘাতীর জন্য শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদৈহিক অনুষ্ঠান ও অশৌচ গ্রহণ ব্যবস্থাও নিষেধ করিয়াছেন। আত্মঘাতী পিতার জন্য পুত্রের পক্ষে উত্তরীয় ধারণ পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ। তাই জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, আত্মঘাতীর ইহকাল নাই, পরকালও শীঘ্র নাই। পারীশের আত্মাহত যুবকের উল্লিখিতরূপ নৈশ-অভিনয় এই কঠোর সত্যেরই একটা অতি বড় বিস্ময়কর ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জর্ম্মণ-যুবতী আরও কিছু দিন ঐ হোটেলে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে শয়নগৃহে তিনি দিবসের আলোকেও পুনরায় পদক্ষেপ করিতে সাহস পান নাই। উহা সেই সময় হইতে কতকাল ব্যবহারের বহির্ভূত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, তাহা কেহ জানে না।

মাতৃসম্ভাষণে।

চকিত-নয়ন তুলি' চাহি' কার পানে
আশঙ্কা-সঙ্কুল চিতে বৃথা গো জননি,
সভয়-সন্তানগণে বক্ষে লয়ে টানি,
মাগিছ অভয়-ভিক্ষা অরণ্য-রোদনে?

দীর্ণ প্রাণ হতে তব অশ্রুপ্রবাহিণী
বিচ্ছেদি তোমার রাজ্য বহিবে যখন,
দুধারে রাখিও মাগো দুটি স্নিগ্ধ স্তন,
স্নেহধারা যার চির-সন্তাপহারিণী।

বাহিরে বিচ্ছেদ-নদী গর্জ্জুক ভীষণ,
মাতৃভাষা-সেতু-সূত্রে সবাকার প্রাণ,
দুই পারে রহে বান্ধা অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
হেন আশীর্ব্বাদ মাতঃ করগো সন্তানে;
এক স্তন্য, একভাষা—মাতৃ-ভক্তি ঋণ
দুই তীরে যেন মাগো জাগে চিরদিন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

ঐতিহাসিক চূর্ণচিত্র।

"যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তৎতদন্যথা।"

(১)

রঙের গোলাম।*

ফরাশি ইতিহাসের এক অধ্যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর রাজ সমাজ।

সৌখীনদিগের গ্রাবু খেলায়, কিস্মতের অঙ্কে, সাহেব তিন, বিবী দুই, আর রঙের গোলাম বিশ। সংসারের গ্রাবুতে, সাহেব বিবীর কিস্মতে, সময়ে সময়ে অঙ্কের সামান্য কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটে। কেন না, কোথাও সাহেব একাই এক শত,—"মহামহিম-মহিম-সাগরবর প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত,—শ্রুতিবিদারি হুঙ্কার-রত;" বিবী তাঁহার সে প্রাণাতঙ্ক প্রভার নিকট প্রভাতকালীনা বিষাদ-মলিনা চন্দ্রলেখা। কোথাও বা প্রখর-মুখরা খর-তর-ভঙ্গিভয়ঙ্করা, চিত্রনপরা বিবীমহোদয়ার কাছে সাহেব সততই ভীত-ভীত, এবং বিবেক-বৈরাগ্যের স্বাভাবিক বিবর্ণতায় মুখ-চ্ছবিতে লাঞ্ছিত। কিন্তু রঙের গোলাম, কিবা সংসারে, কিবা সৌখীনের সানন্দ ক্রীড়াবিলাসে, সর্ব্বত্রই সমান। তাহার মূল্য কোন স্থলেও কমে না। রঙের গোলামেরা ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং কাব্য-নাটকেও আদরের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং, আমার এ ঐতিহাসিক চিত্রে তাহা-দিগের আংশিক "ভাবানুপ্রবেশ" অসঙ্গত নহে।

প্রথম কথা এই, রঙের গোলাম বলিলে কাহাকে বুঝিব? রঙের গোলামকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে, আগে বুঝিতে হয় গোলাম। এই স্থানেই শব্দের অর্থ লইয়া বিষম গোল-

* আমরা বাঙ্গালায় লিখি গোলাম, কিন্তু এই শব্দই পারস্য ও উর্দ্দুতে লিখিত হইয়া থাকে—'ঘুলাম'। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এক ভাষার শব্দ, আর এক ভাষায় পরিগৃহীত হইবার সময়ে, আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় বিষয়েই, বিশেষ পরিবর্ত্তনের অধীন হয়। সময়ে সময়ে অর্থেও আশ্চর্য্য বৈপরীত্য ঘটে। এই গোলাম শব্দ তাহারও নিদর্শন। কেন না, মৌলিক আরবীতে ইহার প্রকৃত অর্থ ফুল্লবিকসিত নবীন যুবা। কিস্মত শব্দের অর্থে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই, উচ্চারণ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উহার প্রকৃত উচ্চারণ 'কিসৎ'। এই প্রবন্ধে কএকটি ফরাশি ও একটি ইটালিয়ান নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তৎসমুদয়ের বর্ণবিন্যাসেও বাঙ্গালা উচ্চারণের উপযোগিতার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। নহিলে, বাঙ্গালায় কলিকাতা না লিখিয়া ক্যালকাটা লিখিতে হয়।

যোগ। যাঁহারা শব্দার্থের নিগূঢ়রহস্য সমাজ-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোকে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগের মনে এইরূপ একটা সংস্কার শিশুকাল হইতেই নিবদ্ধ রহে যে, যিনি যে সম্পর্কে মনুষ্যজাতির সেবক, তিনিই সেই সম্পর্কে মনুষ্যের গোলাম। ঈদৃক এক-দেশ-দৃষ্ট অনিষ্ট সংস্কার যে সর্ব্বাংশেই অমূলক, তাহা বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, এই মানবজাতি যাঁহাদিগের আবির্ভাবে কৃতার্থ হইয়াছে,—যাঁহারা মনুষ্যসমাজকে ভাঙিয়া চূরিয়া, নূতন গড়িয়া, উন্নতির পর উন্নতির সোপানে টানিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন;—আপনাদিগের অন্যান্য আদরের উপাধিকে উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়া, সেবক উপাধির প্রতিই সমধিক প্রীতি দেখাইয়াছেন।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা, সেবাধর্ম্মের অনুরোধে, সংসারের সহস্র সুখ পরিত্যাগ করিয়াও, শুধু জীবিকার প্রয়োজনে, অর্থগ্রহণে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারাও কখনই গোলাম বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা নামতঃ সেবক হইলেও, সকলেই নিজ নিজ প্রতিভার প্রদীপ্ত জ্যোতিতে মনুষ্যজাতির নায়ক ছিলেন। মনুষ্যসমাজে কোথায় এমন ব্যক্তি কে ছিল যে, পামার্ষ্টন, গ্লাডষ্টোন অথবা জন ব্রাইটের চোখের দিকে চাহিয়া, তাঁহাদিগকে সাধারণ দৈবিক বৃত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে গোলাম বলিয়া চিন্তা করিতে সাহস পাইয়াছে? মনুষ্যসমাজে কোথায় কে এমন অভিমানী ছিলেন, যিনি রিশ্লুর নাম-উচ্চারণ-সময়ে, তাঁহাকে মুহূর্ত্তের তরেও পরাধীন পুরুষ বলিয়া মনে করিতে সমর্থ হইয়াছেন; অথবা সে নামের উপর শতবার সেলাম না দিয়া, তদীয় কর্ম্ম সমালোচনায় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছেন? এই সকল মহাপুরুষেরা নিত্যনিয়মিত সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জড়িত রহিয়াও, স্বভাবসিদ্ধ প্রভুত্ব-প্রভাবে, সমাজের সর্ব্বত্রই কিরূপ রাজপূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইতিহাসে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। রিশ্লুর স্বাভাবিক রাজ-প্রতিভা তদীয় সমসাময়িক জগতে, এমনই প্রসিদ্ধ ছিল যে, যিনি পদসম্পর্কে তাঁহার প্রভু, অর্থাৎ তাঁহার উপরিপদবীরূঢ় রাজ্যেশ্বর, তিনিও দণ্ডে দশবার তাঁহার কাছে মাথা নোয়াইতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন; এবং লোকে তাঁহাকে রিশ্লুর গোলাম বলিয়া পরিহাস করিলে, তাহাতে তিনি প্রীত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় চরিত্রবর্ণনার একটি কবিতা, স্বরনিবদ্ধ গাথার মত, দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কবিতাটি পাঠকের জ্ঞাতব্য।

এই স্থানে সমাহিত ত্রয়োদশ লুই,
অনালোক লোকান্তরে অচির-প্রস্থিত,
আমাদের রাজ্যেশ্বর,— আমাদের প্রভু,
যাজক-গোলাম বলি জগতে কীর্ত্তিত।*

* Here lies Louis the Thirteenth,—
lately deceased,

সচিববর রিশ্‌লু প্রথমবয়সে বিশপের পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া চিরকালই Priest অর্থাৎ যাজক শ্রেণির প্রধান ব্যক্তিরূপে পৃথক্ সম্মানভোগ করিতেন। রোমের পোপ যে তাঁহাকে (Cardinal) কার্ডিনেল উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও এই যাজকতা সম্পর্কে। তাঁহার যাজকতা হেতুই ত্রয়োদশ লুই যাজকের গোলাম উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন।

তবে কি গোলাম একটা জাতি? তাহাও নহে। যাঁহারা, জাতিতে বিশুদ্ধ হইয়াও, জীবনব্রতে গোলামের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা কাব্যসাহিত্যে বিট-বিদূষক প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র নামে কীর্ত্তিত হইয়া, বিচারের সার সিদ্ধান্তে গোলামের শ্রেণীতেই নিবিষ্ট হইয়াছেন।

বস্তুতঃ 'গোলাম' এই শব্দ জাতিবাচক কিংবা বংশবাচক নহে, উহা চিত্ত ও চরিত্রের অবস্থাবাচক মাত্র। কেহ, প্রাসাদবাসী আভিজাত হইয়াও, চিত্তের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যদুর্ব্বলতা এবং চরিত্রের অতি গর্হিত জঘন্যতায়, পরের গোলাম; কেহ, লতাতন্তুগ্রথিত ও লূতাতন্তুজড়িত পর্ণকুটীরের অধিবাসী হইয়াও, পূর্ব্বতন ঋষিদিগের ন্যায়, মনঃশক্তির অপ্রতিহত মহিমায়, মনুষ্যজাতির গুরু।

যাঁহারা পরচিত্তরঞ্জন, অর্থাৎ বাক্যে, ব্যবহারে এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধকার্য্যের প্রকারে, পরকীয় হৃদয়তর্পণের জন্য, সুকুমারমতি শিশু কিংবা সুশীলা অবলার ন্যায় সতত আকুল, তাঁহাদিগকেও গোলাম সংজ্ঞা প্রদান করা সুসঙ্গত নহে। কারণ, এ প্রীণনী নীতি মহাপুরুষ অথবা তদূর্দ্ধস্থিত দয়াধর্ম্মময় দেবপুরুষদিগেরই স্বাভাবিক রীতিগতি। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কবির কথাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। তাঁহাদিগের অলৌকিকবৎ আশ্চর্য্য চরিত্রের এ চারুরহস্য সাধারণ লোকের অবিজ্ঞেয়। তাঁহারা সকল স্থলে ও সকলের কাছেই আজ্ঞাবহের ন্যায় অনুগত;—তাঁহাদিগের

"প্রিয়প্রায়া বৃত্তির্বিনয়মধুরো বাচি নিয়মঃ।"

অর্থাৎ প্রীতিমধুরা ব্যবহার-পদ্ধতি ও বিনয়মধুরা বচন-রীতি প্রকৃত গোলামদিগকেও সময়ে সময়ে বিস্মিত করিয়া তুলে;—তাঁহারা শিক্ষা ও সাংসারিক সম্পদে এবং স্বভাবসিদ্ধ চারিত্রবৈভবে অতি বড় উচ্চপদবীরূঢ় হইয়াও, কি উদ্দেশ্যে,—কোন্ নিগূঢ় অভিলাষে, মানুষের কাছে কাতরমূর্ত্তি কৃতাঞ্জলি কাঙ্গাল, অথবা দীন-হীন অকিঞ্চনের ন্যায় অবস্থিত রহিতে ভালবাসেন, তাহা তাহাদিগের মনে অনেক স্থানে একটা কুৎসিত অভিসন্ধির মত প্রতিভাত হইয়া থাকে।

এই স্থলে তাই আবারও সেই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, সংসারে প্রকৃত গোলাম কে? আমার অভিধানে সে-ই প্রকৃত গোলাম, যে ভক্তিতে কখনও মানুষের কাছে মাথা নোয়ায় না, মাথা নোয়ায় ভয়ে;—যে প্রীতি স্নেহ, সৌজন্য, শিষ্টাচার, অথবা

Our King and our master,
and slave of a priest.

মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য প্রভৃতি মনুষ্যত্বভূষণ কোন ভাবের কাছেই অধীন হইতে ভালবাসে না; অথচ সময়বিশেষে শোবনীবৃত্তিকেও ধিক্কৃত করিয়া, অধীন হয় শুধুই প্রয়োজনের অনুরোধে। ক্ষণিক লাভ ও ক্ষণস্থায়ি প্রতিপত্তিই এই শ্রেণীর লোকের এক মাত্র উপাস্য। ইহারা সেই উপাস্য বস্তুর সিদ্ধিলালসায় পিতা মাতা, পূজাস্পদ গুরু, পরম-উপকারী হিতৈষী সুহৃৎ ও প্রাণারাধ্য প্রিয়-বস্তুকেও পশুবৎ বলিদান করিয়া প্রাণের আবিল আনন্দে কিছুকাল ডগ-মগ রহে;—এক মাত্র সেই সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনার জাতি-কুল-মান, ধর্ম্ম অথবা ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের মঙ্গলবিধায়ক সমস্ত কর্ম্ম বিধান অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করে; এবং আত্মার অত্যাজ্য ও অপরিহার্য্য স্বাতন্ত্র্য-সম্পদকেও অনায়াসে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, অতিমাত্র নিকৃষ্ট বৃত্তিতে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহারাই, সুযোগ অনুসারে, বিপন্ন দেবতার মস্তকেও পদাঘাত করিয়া, যার-পর-নাই জঘন্য জনের পাদলেহনে কৃতার্থতা লাভ করে; এবং সমৃদ্ধ পিশাচ ও সুসম্পন্ন অসুরকেও ইষ্টদেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া, নিজ নিজ মানবজন্ম সার্থক করিতে চাহে। ইহারাই মনুষ্যজাতির মধ্যে, শব্দের প্রয়োগ-সিদ্ধ অর্থে, প্রকৃত গোলাম। সাম্প্রদায়িক সংস্কারবদ্ধ ভ্রমান্ধ মনুষ্য যাহাদিগকে জন্ম-সম্পর্ক কিংবা জীবনী বৃত্তির দীনতা দর্শনে গোলাম জ্ঞানে ঘৃণা করে, তাহাদিগের অনেকেই, ইহাদিগের কাছে, এবং ইতিহাস-বিখ্যাত এপিক্টিটসের মত কেহ কেহ, সমস্ত মানবজাতির নিকট, স্বর্গাগত দেবতার ন্যায় পূজাস্পদ।

এপিক্টিটস দুঃশ্রব-দুরাত্মা নিরোর সময়ে, গোলামরূপে জন্ম লাভ করিয়াও জ্ঞানের নির্ম্মলতায় ও অসংখ্য গুণের অমলগৌরবে, আজি জগতে সক্রেটিসের সহিত সমান আসনে অধিরূঢ়। এড্রিয়ান ও মারকাস্ অরিলিয়স্ প্রভৃতি সম্রাটেরা তাঁহাকে গুরুর মত পূজা করিয়াছেন; এবং স্বনামধন্য সম্রাট্ এণ্টনিনস তাঁহাকে সত্যই দীক্ষাগুরুজ্ঞানে, হৃদয়ের উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তদীয় পাদচিহ্নের অনুকরণেই সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। *

রঙের গোলামেরা তৃতীয় শ্রেণীর লোক। অহোরাত্র অবিচ্ছেদে গোলামি করিতে হয়,—আত্মার সুখ, স্বাধীনতা, শান্তি, সমুন্নতি ও সদ্গতির আশা পরকীয় আকাঙ্খার

* "The heathen writings most to the purpose of this book, next after those which have recorded the life of Socrates, are the works of Epictetus and the Meditations of the Emperor Marcus Antoninus. Yes: Antoninus an Emperor, and Epictetus a slave, here meet in fittest association on one and the same ground of a noble mind. The court of Rome had beheld no finer-hearted gentleman than the slave." 'The Religion of the heart' by Leigh Hunt.

অনলে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করিয়া, গোলামের মত কাছে কাছে ও পাঁছে পাছে ঘুরিতে ফিরিতে হয়, এই জন্য লোকে উহাদিগকেও গোলাম নামে নির্দ্দেশ করে! কিন্তু উহারা গোলাম হইয়াও কতকটা প্রভু,—যাহার গোলামি করে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার পরিরক্ষক ও পরিচালক। সুতরাং উহারা সাধারণ গোলাম হইতে উচ্চতর শ্রেণীর মনুষ্য। প্রকৃতপক্ষে রঙের গোলামেরা কালিদাস ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবির চিত্রিত ও পণ্ডিত-প্রবর বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি আলঙ্কারিকদিগের বর্ণিত বিদূষক হইতেও একটুকু স্বতন্ত্র। বিদূষকের সংজ্ঞাবিধানে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, সে

"কুসুম-বসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃস্যাৎস্বকর্ম্মজ্ঞঃ।"

অর্থাৎ,—তাহার নামটি হইবে কুসুম, বসন্ত ও মাধব্য প্রভৃতি মধুরাক্ষরযুক্ত এবং অতএবই শ্রুতিমধুর। ইহার এই তাৎপর্য্য যে, তাহাকে যখন সততই প্রভুর প্রণয়রাজ্যে,—সাম-দান-ভেদ-প্রভৃতি বিবিধ গুরুতর "রাজকার্য্যে", প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য উপলক্ষে পুরসুন্দরীদিগের প্রমোদ-নিকেতনে যাইয়া রস-রঙ্গ করিতে হয়, তখন অন্ততঃ তাহার নামটি নিতান্ত মধুবর্ষি না হইলে মন ভিজিবে কিসে? অপিচ সে, সকল স্থানে, সকল প্রসঙ্গেই, হাসির কথা কহিয়া, সকলকে হাসাইবে; এবং তাহার কর্ম্মের পদ্ধতি, বপু ও বেশবিন্যাসের বিচিত্রভঙ্গী ও ভাষার রসময়-বিলাস নায়ক ও নায়িকা প্রভৃতি সমস্তেরই হাস্যজনক হইবে। এ সকল ছাড়া তার আরও দুটি বিশেষ গুণ চাই। সে প্রণয়ের কলহ-উৎপাদনে, এবং চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য প্রভৃতি সরস বস্তুর স্বাদগ্রহণেও সর্ব্বত্র সমধিক নৈপুণ্য দেখাইবে।

ঐতিহাসিক রঙের গোলামেরা রস-রঙ্গের ভাগী হইলেও উপরিকথিত সকল গুণের আধার নহে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, হাস্যরসের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য হইয়াও,রঙের গোলাম শ্রেণিতে মান্যগণ্য লোক। যথা 'লা সেজ্‌নে'। ফরাশি সম্রাট্ ত্রয়োদশলুইর এক প্রসিদ্ধ সেবক ছিল, তাহার নাম (La Chasnaye) লা সেজ্‌নে। সেজ্‌নেকে সকলেই সম্রাট্‌বরের সখের সারথি,—সুখতরীর কাণ্ডারী ও রঙের গোলাম বলিয়া সম্মান করিত। অথচ ত্রয়োদশলুই আপনিও কখনও হাসিতেন না; এবং সেজ্‌নের অধরেও কেহ কখনও শ্লেষ-পরিহাস-ভাবি মধুর-হাসির রেখাটি মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া চিত্তে আশ্বস্ত হইত না।

যে আপনি কখনও হাসে না, পরের মুখেও হাসির আভাস দেখিতে ভালবাসে না, তাহারও কি আবার রঙের গোলাম আবশ্যক হয়? এ রহস্যটুকু বুঝিতে হইলে, পাঠককে ফরাশিদেশীয় পুরাতন ইতিহাসের দুই এক পৃষ্ঠা লইয়া একটুকু আলোচনা করিতে হইবে।

যাঁহারা ফরাশি ইতিহাসে অত্যল্পপ্রবিষ্ট, তাঁহারাও জানেন যে, ত্রয়োদশ লুই এক অদ্ভুতপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার

হৃদয়ে প্রভুত্ব ও প্রেম, উভয় ভাবের পিপাসাই অতি ভয়ানক বেগে কার্য্য করিত; অথচ, কিবা তাঁহার প্রভুত্ব, কিবা তাঁহার প্রেম, কিবা রাজ-সমুচিত তেজস্বিতা, কিবা রমণীমোহন রস-রঙ্গ-লীলা, তাঁহার সমস্তই পরের দ্বারা সম্পন্ন হইত। তিনি দেখিতেন পরের চ'খে, শুনিতেন পরের কানে;* এবং লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে, তিনি পারিলে, বোধ হয়, চাখিতেও চাহিতেন পরের জিহ্বায়। ফলতঃ, আলস্য আর আকাঙ্ক্ষা,—তমোগুণের নিস্তব্ধ-নিষ্ক্রিয় বিষাদময় জড়তা, আর রজোগুণের জ্বালাময়ী লালসা, যদি প্রকৃতিবিশেষে অতি বড় বেসী মাত্রায় মিশ্রিত অথবা একীভূত হইয়া, একটি বস্তুরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই বিকট-বিরস ভাব-বিচিত্র বস্তুর নাম ত্রয়োদশ লুই।

এই প্রকারের লোক প্রভুত্ব করে কার প্রভাবে, আর প্রেমের পথেই বা অগ্রসর হয় কোন্ প্রাণে? বলা বাহুল্য, ত্রয়োদশ লুই প্রভুত্ব করিতেন (Born King) জাতাধিরাজ রিশ্‌লুর রাজপ্রভাবে, আর প্রেম করিতেন সেজ্‌নের প্রাণে? ত্রয়োদশ লুই এক সময় বড়ই মাতৃভক্ত ছিলেন। মা যাহা করেন, তাহাই কার্য্য; মা যাহা কহেন, তাহাই কথা। কিন্তু যেই তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহার প্রভুত্বের পথে কণ্টক, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে, রিশ্‌লুর প্রভাবে দুধের মাছির মত দূরে অপসারিত করিয়া, চিরজীবনের তরে কারাগারে নিরুদ্ধ করিলেন; এবং কোন দিন যে মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়া গেলেন। তিনি এক সময়ে তাঁহার রূপসী ভার্য্যা রাজ্ঞী এনার প্রতিও কতকটা অনুরক্ত ছিলেন,—অমন রূপবতী যুবতী,—অমন লাবণ্যময়ী রাজকুমারী ইউরোপের আর কোন রাজপ্রাসাদকে অলঙ্কৃত করে নাই বলিয়া মনের অন্তস্তলনিহিত অতিলুক্কায়িত কক্ষে একটু গর্ব্বিত ছিলেন। কিন্তু যেই তিনি বুঝিলেন যে, রাজমহিষীর সে অপ্রতিমরূপরাশি তাঁহার চক্ষু অপেক্ষাও প্রাসাদের অন্যান্য অধিবাসী এবং দেশ-বিদেশের শতসহস্র রূপবিলাসীর চক্ষে অধিকতর প্রীতি জন্মাইতেছে,—দেশীয় কবিরা সে রূপের স্তুতিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে,—রূপকথায় মধুরাক্ষরা গাথা স্থানে স্থানে গীত হইতেছে, অমনি তিনি মহিষীর মর্ম্মঘাতী শত্রু হইয়া, তাঁহার প্রেমের সখী (Hautefort) কুমারী হট্‌ফোর্টের প্রণয়-প্রার্থনায়, সেজ্‌নের হস্তে আপনার প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলেন; এবং সেবককে সূত্রধার করিয়া, সখীসংবাদ-যাত্রার রাগ-রাগিণী শিক্ষায় ব্যাপৃত হইলেন। এই হইতেই সেজ্‌নে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রঙের গোলাম এবং প্রাসাদের দ্বিতীয় প্রভু। কিন্তু, সেজ্‌নের এই উচ্চপদ দীর্ঘকাল অপ্রতিহত রহিল না। কারণ, কুমারী হট্‌ফোর্ট যেমন ছিলেন রাজমহিষীর সখী, তেমন ছিলেন তাঁহার প্রকৃত-হিতাভিলাষি সুহৃৎ। সুতরাং ষোড়শ লুইর প্রতপ্ত-নিঃশ্বাস ও সেজ্‌নের প্রেমার্দ্র আশ্বাস কিছুই তাঁহার কাছে বিকাইল না।

* নিমিত্তাভাবে নৈমিত্তিকস্যাপ্যভাবঃ, অর্থাৎ নিমিত্তের অভাবে নৈমিত্তিকেরও অভাব। সুতরাং, "কর্ণ" ও "স্বর্ণ" লিখিবার সময়ে মূর্দ্ধন্য ণ, এবং "কান" ও "সোনা" লিখিবার সময়ে দন্ত্য ন।

যে সময়ে সেজ্‌নে ছিল, রাজ্যেশ্বরের রঙের গোলাম, প্রায় সেই সময়েই অধিকতর কর্ম্মচতুর, নর্ম্ম-মধুর, রহস্যরক্ষণপটু ও বিশ্বস্তস্বভাব (La Porte) লা পোর্ট ছিল রাজ্ঞী এনার রঙের গোলাম।

পূর্ব্বে কহিয়াছি, ষোড়শ লুইর রাজমহিষী, তদীয় যৌবনের প্রথম বিকাশ সময়ে, রূপের সর্ব্বপ্রকার সম্পদে তদানীন্তন ইউরোপীয় জগতে, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রমণী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, সেই পথেই তাঁহার রূপ কখনও যেন ঢেউ খেলাইত, কখনও যেন উছলিয়া পড়িত। ঈদৃক্ রূপ, আদর্শসতীত্বের বিলাসক্ষেত্র ভারতভূমিতে এক বস্তু, আর রূপবৈভবের বাণিজ্যক্ষেত্র ইউরোপে আর এক বস্তু। উহা, সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা ও দময়ন্তী প্রভৃতির পবিত্র তনুতে স্থান লাভ করিয়া হয় এক পদার্থ; আর যাঁহারা দেশাচারের চিরপ্রচলিত শাসনে, পরের কণ্ঠে কণ্ঠলীনা ব্রততীর মত, দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিবার জন্য ব্যাকুল রহেন, তাঁহাদিগের তনুতে স্থান লাভ করিয়া হয় আর এক পদার্থ।

অতএব, ইহা না বলিলেও পাঠক বুঝিতেছেন যে, রাজ্ঞী এনার যে রূপরাশি এক সময়ে তাঁহার অতুল সম্পত্তি বলিয়া আলোচিত হইয়াছিল, তাহাই অতি শীঘ্র তাঁহার ঘোরতর বিপত্তির কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহার রূপের শিখা, ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ড এই দুইটি রাজ্যকে রণ-রঙ্গে উন্মাদিত করিয়া, ভয়ানক আগুন জ্বালিল। ইংলণ্ডের প্রধান সচিব,—হতভাগ্য প্রথম-চার্লসের প্রিয়তম মন্ত্রী (Duke of Buckingham) ডিউক অব্ বাকিংহামের "অতৃপ্তলালসা", সমক্ষে ও পরোক্ষে, সজীব মূর্ত্তিতে ও নির্জীব প্রতিকৃতিতে, ধ্যানে ও মননে, অহর্নিশ ঐ রূপের উপাসনা করিয়া, অচিন্তিত বিপত্তিতে পরিণত হইল। সে শোকাবহ স্মরণীয়কাহিনী এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। কিন্তু এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, উহার আদি, মধ্য, অন্ত, উপান্ত, সকল স্থলেই লা পোর্টের উপস্থিতি,—সর্ব্বত্রই লা পোর্টের প্রীণনী নীতি।

এ সময়ে ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ড উভয় রাজ্যে লা পোর্টের সমান প্রভাব। ফ্রান্সে, লা পোর্ট হাসিলে রাজ্ঞী হাসিয়াছেন, লা পোর্টের মুখখানি কোন সময়ে বিষাদে মলিন দেখিলে, একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাজ্ঞী এনা নয়নজলে ভাসিয়াছেন। ও দিকে, ইংলণ্ডেও আবার, হৃদয়রঞ্জন বাকিংহাম, লা পোর্টের মত পাণ্ডার যোগে রাজ্ঞী এনার পাদপীঠে পূজার পুষ্পাঞ্জলি প্রেরণের জন্য, পাগলের মত আকুলতা দেখাইয়াছেন। বাকিংহাম যখন এই অবৈধ ও অতিবিগর্হিত প্রেমের চরম-দক্ষিণায় তাঁহার মহার্ঘ প্রাণটিরে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করেন,—যখন তিনি, ফ্রান্সের অভিমুখে রণসজ্জায় অভিযান-সময়ে, স্বকীয় অর্ণবতরীর শীর্ষদেশে, শতরক্ষকে বেষ্টিত রহিয়াও, রিশ্‌লুর মন্ত্রমোহিত কেণ্টনের অস্ত্রাঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া ঢলিয়া পড়েন, তখনও তিনি লা পোর্টের মুখে রাজ্ঞীর একটি প্রীতিসূচক কথা শুনিবার জন্যই অস্থির।

লা পোর্ট, অতি ক্ষুদ্র লোক হইয়াও, রঙের গোলামরূপে দুইটা সমৃদ্ধিসমুচ্ছ্রিত শক্তিসম্পন্ন রাজ্যের রাজনীতিকে কিরূপ আকুঞ্চিত ও বিকুঞ্চিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, পাঠক ইহা দ্বারাই তাহা বুঝিয়া লই-

বেন। কিন্তু ক্ষুদ্র শ্রেণির লোক হইলেও, লা পোর্ট প্রভুভক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শনে বীরের মত অটলমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছে; এবং ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে ভয়ঙ্করকর্ম্মা রিশ্‌লু, রাজ্ঞীর সর্ব্বনাশকামনায় লা পোর্টকে বেষ্টিল দুর্গে আবদ্ধ করিয়া ভয়-প্রদর্শন ও যাতনা প্রদানের চরম করিয়া দেখিয়াছেন; লা পোর্ট তখনও নিস্পন্দ হৃদয়ে আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। হউক যেন রঙের গোলাম, যে বিশ্বাস-ঘাতকতার বিকাশগৃহরূপ রাজপ্রাসাদে, কিংবা রাজনৈতিক জগতে, বিশ্বাস-ধর্ম্মের বিশুদ্ধি রক্ষায় লা পোর্টের মত চারিত্রশক্তির আশ্রয় হইতে পারিয়াছে, তাহার চরিত্র ঐতিহাসিকের অধ্যয়নযোগ্য।

বাকিংহমের এক বিশ্রুত-চরিত রঙের গোলাম ছিল, তাহার নাম (Patrick) পেট্রিক; আর বাকিংহমের পালক ও পোষ্টা প্রীতিপ্রবণ প্রথম চার্লসেরও এক রঙের গোলাম ছিল, তাহার নাম (Parry) পারী। পারীকে রঙের গোলাম বলা ঠিক হয় না। তাহাকে সেবকশ্রেণীর মধ্যে শুদ্ধশান্ত, সহৃদারস্বভাব, প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিলেই সঙ্গত হয়। কিন্তু পেট্রিক সদাশয় হইলেও সর্ব্বাংশে রঙের গোলাম। বাকিংহম যখন ইংলণ্ডের প্রভু, দেশের বড় ও ছোট,—লর্ড ও লেডী, পদস্থ ও বিপন্ন,—সকলেই তখন, মুহূর্ত্তের তরেও পেট্রিকের দর্শন লাভ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত।

যদিও পেট্রিক ও পারী ইংলণ্ডের লোক, তথাপি, করাশি ইতিহাসের বিবিধ পরিচ্ছেদে তাহাদিগের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাই, তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। বিশেষভাবে বলিতে হইলে বর্ণনার্হ রঙের গোলাম বার্ণুয়িন। সে সত্যই মন্ত্রিবর ম্যাজেরিণের বহিশ্চর প্রাণরূপে সুদীর্ঘকাল করাশি রাজতরণীর প্রধান মাঝি ছিল। ম্যাজেরিণ করাশি জাতির বুকের রক্ত শোষণ করিয়া সম্রাট্ হইতেও অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই কুবের-ধনের মত ক্রম-সঞ্চিত ধনরাশির সমস্ত হিসাব এবং গূঢ়গুপ্ত ধনভাণ্ডারনিচয়ের সমস্ত কুঞ্জী থাকিত একমাত্র ঐ বার্ণুয়িনের হাতে; এবং তাঁহার বার্দ্ধক্যবিশীর্ণ জরাজীর্ণ দেহ সতত যে রমণীর যৌবনশ্রীতে বিলসিত রহিত, তাহারও বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক ছিল বার্ণুয়িন। ম্যাজেরিণ বয়সে বৃদ্ধ,—প্রধান-সচিব হইলেও পাদ্রি শ্রেণির লোক,—দ্রষ্টব্য (!) কামিনীকাঞ্চনের সম্পর্কশূন্য। তাঁহার আবার যৌবনশ্রীর জন্য ব্যাকুলতা কেন? সে তত্ত্ব পাঠককে এই ঐতিহাসিক চিত্রের আর এক পটে বুঝাইব। আজি তিনি ইহাই জানিয়া রাখুন যে, যে দেশের পণ্ডিতেরা মেরাট ও মেরাবো এবং রবিস্পিয়র ও বোনাপার্টিকে ইতিহাসের বিধাতা বলিয়া পূজা করিয়াছেন, বার্ণুয়িনকেও একসময়ে সেই দেশের সমাজ-সমালোচকেরা, দেশীয়দিগের সুখদুঃখের বিধাতা বলিয়া সম্মানের আসন দিয়াছেন।

লা পোর্ট ও বার্ণুয়িনের সহিত এক সঙ্গে নাম করা যায়, ফ্রান্সের ইতিহাসে তেমন ক্ষমতাপন্ন ও নীতিনিপুণ রঙের গোলাম বেশী দৃষ্ট হয় না। পরবর্ত্তি রিজেন্ট ফিলিপ্ অর্লিয়েন্সের একজনে কুলাইত না; এই হেতু তাঁহার রঙের গোলাম ছিল দুইটি। ইতিহাসে তাহাদিগের উভয়েরই নাম আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক পটে, কোনপ্রকার প্রসিদ্ধ কার্য্য-

কৌশলপ্রসঙ্গে, তাহাদিগের তুলিপাত হয় নাই বলিয়া, আমি এথানে তাহাদিগের কর্ণকটু কট-মট নাম লিপিবদ্ধ করিলাম না।

ফিলিপ অর্লিয়েন্সের পর, প্রীতিশূন্য অথচ প্রমোদ-সুখ-সাগর-মগ্ন পঞ্চদশ লুইর সময়ে, হঠাৎ আবার দুই রঙের গোলাম ফ্রান্সের প্রভুত্বপদে আরূঢ় হইল। তাহার একজনের নাম (Lepel) লিপেল, আর একজনের নাম (Bachelier) বাসিলিয়র। মন্ত্রিবর (D' Argenson) ডার্গেন্‌সন্‌, তদীয় প্রাসাদ-রহস্য নামক প্রথিত পুস্তকে, বাসিলিয়রের সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, "সে বুদ্ধি বিবেচনায় এক জন তাত্বিক বলিয়া গণ্য, আপনার সম্পত্তিতে পরিতৃপ্ত। তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট আয় আছে, গ্রামে একখানি বাড়ী আছে এবং একটি নায়িকা আছে। সে তাহার প্রভুকে ভালবাসে, প্রভুও তাহাকে ভাল বাসেন; কিন্তু সে জনসাধারণের হিতাভিলাষী। তবে ইহা অস্বীকার করি না যে, এইরূপ সম্পন্ন হইয়াও বাসিলিয়র সুন্দরী-সংগ্রহের পদত্যাগ করে নাই।" *

বাসিলিয়র সুন্দরীসংগ্রহের কার্য্য সম্পাদনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া, রাজার নিকট যে সম্পত্তি পুরস্কার পাইয়াছিল, তাহার বার্ষিক আয় ছিল সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। তাহার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাহাকে দিব্য-শক্তি সম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক জনে § কহিয়াছেন, "বাসিলিয়রের মনঃশক্তিকে অলৌকিক বলিতে পারি, তাহার বার্ষিক আয় সাড়ে সাত লক্ষ, এবং তাহার লাশেল নামক বাস-সম্পত্তি অতি বড় সুরম্য। সম্রাট্ মাঝে মাঝে স্বয়ং সেখানে যাইয়া থাকেন।" হা ফ্রান্স! হা ফ্রান্স! হা ফ্রান্স! তোমার বক্ষঃস্থল যে কিছু দিন পরেই, রাষ্ট্র-বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় প্লাবিত হইয়াছিল, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু আছে কি?

ইউরোপীয় ইতিহাসে এই শ্রেণির আরও অনেক রঙের গোলামের নাম আছে। কিন্তু, ইহা মানবজাতির সৌভাগ্য যে, ইতিহাসের সে স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—ফ্রান্স্ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সকল রাজ্যের ইতিহাসই রঙের গোলামদিগের নিরয়-সমুচিত রাজত্ব ও ন্যক্কারজনক নায়কতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসের কোন যুগেও রঙের গোলামেরা কোন স্থলে রাজত্ব করে নাই। যে দেশে রাজার নাম রামচন্দ্র কিংবা যুধিষ্ঠির,—রাজসমাজের অন্তর্ভুক্ত অতিমাত্র দুর্জ্জনের নাম দুর্য্যোধন, সে দেশে ইহা অসম্ভব। পরবর্ত্তি কবিরা বিদূষকদিগের অঙ্গে গোলামি আভার রঙ্ ফলাইতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু, তাহারা তুলনায় দেবতা।

* "Le sieur Bachelier is a philosopher, well content with his fortune, which is a good one. He has an income, a country-house, and a mistress. He loves his master and is loved by him; he desires the public welfare. * * * * It is time that Bachelier is still a go-between. (D' Argenson)

§ Imbert D Saint-Amand.

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "জ্ঞানযোগ,—দার্শনিকতত্ত্ব ; শ্রীনবচন্দ্র ন্যায়রত্ন বিরচিত।"—ইহা একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় পুরাতন-শ্রেণীস্থ টোলের পণ্ডিত, অথচ নব্যশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতশিক্ষক। যাঁহারা এদেশে, ইদানীং, বহুজ্ঞতা ও বহুদর্শন-জনিত সহৃদয়তার সম্পদে পুরাতন-তাত্ত্বিক-জ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক-শিক্ষার মধ্যস্থলে বিশাল সেতুস্বরূপ হইয়া, সমাজরক্ষার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় ঠিক্ সেই সম্প্রদায়ের লোক নহেন। কিন্তু, তাঁহার এই বৃহৎ গ্রন্থ তথাপি বহুলাংশে সময়ের উপযোগী হইয়াছে।

এই গ্রন্থে সংসার, ধর্ম্ম, জগৎ, জীবাত্মা, জন্মান্তর, মুক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম, সাকার উপাসনা ও জাতিভেদ, এই নয়টি বিভিন্ন নামে, নয়টি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিবেশিত হইয়াছে ; এবং প্রবন্ধগুলি, সংসার ও শাস্ত্র উভয়েরই বিজ্ঞসমুচিত সমালোচনা দ্বারা শাস্ত্রপ্রিয় প্রাচীন হিন্দুর হৃদয়ের বিশ্বাসকে বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছে। আমরা কোন প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব বাঞ্ছবে এমন স্থান নাই। কিন্তু ইহা নির্ভয়চিত্তে বলিতে পারি যে, তত্ত্বানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির পর্য্যালোচনায় প্রীতি লাভ করিবেন।

গ্রন্থকার, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন, এবং মন্বত্রিপ্রভৃতির সংহিতা ও বেদব্যাসের গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অতি দুর্লভ বাক্য সকল সঙ্কলন করিয়া, সরল ও সুপাঠ্য বাঙ্গালায় তাৎপর্য্যার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব, যাঁহারা মনোযোগের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা প্রীতিলাভের সঙ্গে ঐহিক ও পারত্রিক প্রয়োজনের উপযোগি জ্ঞানজনক কথাও বিস্তর শিখিতে পাইবেন। গ্রন্থের যে সকল অংশ নিরালম্ব মৌলিক, তাহাও নিতান্ত প্রশংসার্হ। 'সংসার' নামক প্রবন্ধই এ কথার প্রমাণ।

এই পুস্তকের নয়টি প্রবন্ধের মধ্যে একটির নাম 'জন্মান্তর', ইহা পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধটি না থাকিলেই ভাল হইত। কেন না, যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তকে, অধুনাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রখর আলোকে, গাঢ় মনোযোগের সহিত সমালোচনা করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা এ বিষয়ে যাহা লিখেন, তাহাতে পুরান তত্ত্বের পুনরুক্তিভিন্ন শিক্ষার উপযোগি সারকথা কিছু থাকে না। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই গ্রন্থ, বৃদ্ধ ও যুবা, এই উভয়শ্রেণীস্থ শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগেরই আদরযোগ্য। ইহা রয়েল আট পেজি দুই শত ছত্রিশ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই হিসাবে, ইহার মূল্য ২॥০ (আড়াই টাকা) হইলেও অনুচিত হইত না। কিন্তু সদাশয় গ্রন্থকার মূল্য অবধারণ করিয়াছেন ১৸০ (আঠার আনা) মাত্র। আমাদিগের ভরসা আছে, তাঁহার এই সদাশয়তা স্বদেশীয়দিগের দ্বারা পুরস্কৃত হইবে ; এবং গ্রন্থের দুই হাজার কাপি, দেখিতে না দেখিতেই, উঠিয়া যাইবে। গ্রন্থখানি কুমিল্লার অন্তর্গত চাঁদপুর হাইস্কুলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

২। "জাতক-কৌমুদী। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র।" স্মৃতির উপর যতটুকু নির্ভর করা যায়, তাহাতে বলিতে পারি যে, এ দেশে, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারও কাছে ফলিত-জ্যোতিষের আদর ছিল না। বৃহস্পতি দশমে থাকিলে, জীবনে ফলে এক ফল, এবং একাদশে থাকিলে হয় আর এক ফল, এইরূপ কথা শিক্ষিতেরা একেবারেই গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু শিক্ষিতদিগের হৃদয়ের সে ভাব,—মনের সে গতি, এইক্ষণ বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে;—যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন,—পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূজার্হ পণ্ডিত, তাদৃশ ব্যক্তিরাও, এইক্ষণ, বোধ হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরই পদচিহ্নের অনুসরণে, ভারতবর্ষে পুরাতন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন।

ফলতঃ, ইদানীং জ্যোতিষশাস্ত্র এ দেশের শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ের আরাধ্য বস্তু। আমরা ইহার একটুকু নিদর্শন দেখাইব। ঢাকার বাবু রজনীকান্ত আমীন ও বাবু রাজকুমার সেন নামে দুইটি বিখ্যাত জ্যোতিষিক আছেন। রজনীকান্ত ইংরেজীতে বি, এ, সংস্কৃত ব্যাকরণ-সাহিত্য ও অলঙ্কারে অধ্যাপকপদবীরূঢ়; অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রই অহোরাত্র তাঁহার জপ-মন্ত্র। রাজকুমার ইংরেজীতে এম, এ,—ঢাকা কলেজে গণিতবিজ্ঞানের অধ্যাপক; অথচ নবজাত-শিশুর কোষ্ঠী রচনায়ও রীতিমত কৃতী ও অনুরাগী। ফলিতজ্যোতিষের প্রতি শিক্ষিতদিগের কিরূপ অনুরাগ বাড়িয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই দুই পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলাম। জাতক-কৌমুদীরচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয়ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি বড় পণ্ডিত বলিয়া সুকীর্ত্তিত। তাঁহার এই জাতক-কৌমুদীতে গণিত পাণ্ডিত্যেরও বিলক্ষণ পরিচয় আছে। যাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিতে অভিলাষী, ইহা তাঁহাদিগেরই পাঠ্য, এবং অবশ্যপাঠ্য।

৩। "সরল সেতার-শিক্ষা;—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত সঙ্গীত এবং সেতার-শিক্ষার সরল উপদেশপূর্ণ, সঙ্গীতশাস্ত্রের মূলসূত্র, বচন, প্রমাণ, ইতিহাস সংবলিত, প্রত্যেক রাগের সা রে গা মা, গত,—বাদী, সংবাদী, আদি, জাতি ও গ্রাম, শ্রুতি তাল ইত্যাদি শিখিবার সহজ উপায়। শ্রীবনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সংকলিত ও সংরচিত। মূল্য ২৷৷৹ টাকা।"

আমরা সেতার-শিক্ষার এই অভিনব গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া একান্ত আপ্যায়িত হইয়াছি। ইহার বিষয়-বিন্যাসের পারিপাট্য দর্শনে বুঝিয়াছি যে, সঙ্গীতবিদ্যা ইউরোপে যেমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার বস্তু হইয়াছে, উহা বঙ্গদেশেও অচিরেই সেইরূপ বস্তুতে পরিণত হইবে। সঙ্গীতবিদ্যা পুরাতন ভারতে কিরূপ প্রাণস্পর্শি ভক্তি ও যত্নের সহিত সমালোচিত হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে; এবং যাঁহারা সারস্বতী ত্রিতন্ত্রীর সুখ-সাহায্যে সঙ্গীত-সুধাসাগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, এ গ্রন্থে তাঁহাদিগেরও শিক্ষার বস্তু প্রচুর আছে। আমরা ঈদৃক্ গ্রন্থের অতি অযোগ্য সমালোচক। কিন্তু তথাপি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, তাঁহারাই

এই শিক্ষা পুস্তকের উপযুক্ত আদর করিতে সমর্থ।

৪। "কৃষিসংগ্রহ, সরল বঙ্গানুবাদ সহিত, মহামুনি পরাশর প্রণীত, শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত।"—গ্রন্থপ্রকাশক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কৃষিসংগ্রহ ঋষি পরাশর প্রণীত কৃষিবিজ্ঞান। ইহাতে বৃষ্টিজ্ঞান, বাহনবিধি, গোশালা-নির্ম্মাণ-প্রণালী, হলসামগ্রীনির্ণয়, হল-চালনবিধি, বীজবপন, সারপ্রদান-বিধান, ধান্যরোপণ, ধান্যনিস্তৃণীকরণ, ধান্যচ্ছেদন-বিধি প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় সঙ্কলিত।" পাঠক ইহা দ্বারাই বুঝিতেছেন যে, আজিকালিকার অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট অন্নকাতর বঙ্গবাসী যে প্রকার গ্রন্থ পাইলে, বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারে, ঋষিপরাশরের জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ এই কৃষিগ্রন্থ তন্মধ্যে অত্যধিক আদরের সহিত গৃহীত হইবার যোগ্য। পরাশর নিজেই কহিয়াছেন,—

"সুবর্ণরৌপ্যমাণিক্য-বসনৈরপি পূরিতাঃ,
তথাপি প্রার্থয়ন্ত্যেব কৃষকান্ ভক্ততৃষ্ণয়া।
কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপি স্যাদন্নাভাবেন দেহিনাম্।
অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নমন্নং সর্ব্বার্থসাধকম্।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ।
অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যা বিনা ন চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ।
কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদিদোষযুক্তোঽপি মুচ্যতেঽতিথিপূজনাৎ॥"

আমরা নিজে এই শ্লোক কয়টির অনুবাদ না করিয়া, গ্রন্থপ্রকাশকের অনুবাদ হইতেই, কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিব। তিনি অনুবাদে কহিতেছেন,—

"স্বর্ণ, রৌপ্য, মাণিক্য এবং বহুমূল্য বসনাদিযুক্ত ব্যক্তিরাও অন্নার্থ কৃষকদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। যেহেতু কণ্ঠে, হস্তে, কর্ণে সুবর্ণ থাকিলেও অন্নাভাবে দেহিদিগকে উপবাস করিতে হয়। অন্ন প্রাণ, অন্ন বল, এবং অন্নই সর্ব্বার্থসাধক। দেব, অসুর, মনুষ্য সকলেই অন্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। এই অন্ন ধান্য হইতে উৎপন্ন হয়, ধান্য কৃষি বিনা হয় না, সুতরাং অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষি বিষয়ে যত্ন করিবে। কৃষি ধন্য, কৃষি পূজ্য এবং কৃষিই প্রাণিদিগের জীবন। (কৃষির প্রসাদাৎ) অতিথি সেবা দ্বারা হিংসাদি দোষ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"

গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় শ্লোকই এই রূপ সরল অনুবাদে সর্ব্বজনবোধ্য হইয়াছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, দেশের কৃষক হইতে ভূম্যধিকারিপর্য্যন্ত, সকলেরই ঈদৃক্ পুস্তকের সমস্ত কথা মনোযোগের সহিত পাঠ, পর্য্যালোচনা ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে বাঙ্গালি শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির ধান্যক্ষেত্রকে পীঠস্থান জ্ঞানে পূজা, কৃষাণদিগকে পূজার পুরোহিত, এবং কৃষিগ্রন্থকে সে পূজার তন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া সম্মান করিতে না শিখিল, সে বীরবলের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইতে পারে, বাঙ্গালি নহে। আর যে বাঙ্গালি, বৃদ্ধপরাশরের উপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া কৃষাণের সাংসারিক সুখশান্তি বিধান ও কৃষিসাধনার উপজীব্যস্বরূপ গোজাতির পরিরক্ষণ ও পর্য্যবধান কার্য্যকে জীবনের দশকার্য্যের মধ্যে এক প্রধান কার্য্যরূপে না বুঝিল, সে রুশ ও জাপের পদ-রেণু মাথায় লইয়া পাঁচটা বাহিরের কথা কহিতে পারে, কিন্তু সে বাঙ্গালি নহে। পরাশরের এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের জন্য লিখিত

হইয়া থাকিলেও, ইহা বঙ্গদেশেরই বিশেষ উপযুক্ত।

৫। "দ্রৌপদী, (কাব্য) শ্রীজগদীশ্বরী দেবী প্রণীত, শ্রীআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত"।—আমাদিগের পাঠকবর্গ অবশ্যই বঙ্গের অন্যতম মুখোজ্জ্বল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নের সুকীর্ত্তিত নাম বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুতা জগদীশ্বরী দেবী তাঁহারই সহধর্ম্মিণী। আমরা তাঁহাকে, প্রণত মস্তকে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। শ্রীযুতা গিরীন্দ্রবালা দত্তজায়া প্রভৃতি যে সকল পুর-মহিলা, নূতন ধরণের কবিতা লিখিয়া, কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নব্য সম্প্রদায়ের মেয়ে; কিন্তু জগদীশ্বরী দেবী পুরাতন কল্পের আচার-পুত, শঙ্খসিন্দুর-পরিশোভিত খাঁটি ব্রাহ্মণকন্যা ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রীতিপুষ্পার্চ্চিতা গৃহলক্ষ্মী। আমরা এই শ্রেণীস্থ পূজ্য পুরস্ত্রীকে, এই প্রথম, কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কবীর পদবীতে অবতীর্ণ দেখিলাম। সুতরাং আমাদিগের আনন্দ সহজে অনুমেয়।

শ্রীযুতা জগদীশ্বরী দেবী, কাব্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্টা হইলেও, কবি নামের যোগ্যা। তাঁহার গদ্যরচনায় কিরূপ চিত্তহারি মাধুর্য্য আছে, তাহা পাঠক, উৎসর্গপত্রের কএকটি পংক্তি পাঠ করিলেই, বুঝিতে পাইবেন। গ্রন্থকর্ত্রী, শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসীর সম্ভাষণে, কহিতেছেন,——

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর, বেদের বিভাগ কর্ত্তা, মহর্ষি দ্বৈপায়ন কোমল তুলিকা দ্বারা মহাভারতরূপ পটে যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; যে চিত্র বিলোকন করিয়া সমস্ত জগৎ মুগ্ধ; ভারবি প্রভৃতি মহাকবিগণ অদ্যাপি যে চিত্রের অনুলিপি করিতে যাইয়া অপারগ হইয়াছেন, আজ একটি নিরক্ষর-অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক তাহার অনুলিপি লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছে। জানি না, এরূপ সাহসিকতা ও ধৃষ্টতার অর্থ কি?

অর্থ কি এই প্রশ্ন লইয়া আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। মহাকবি কালিদাসই এইরূপ প্রশ্নের অর্থ করিতে যাইয়া অল্লাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

বস্তুতঃ জগদীশ্বরী দেবীর গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই গুণপনার পরিচায়ক। "দ্রৌপদী" আকারে খর্ব্ব হইলেও কুরুকুলের ধূমকেতুরূপিণী পার্থমনোমোহিনী দ্রৌপদীর ন্যায় বীররসবিহ্বলা ও তেজোময়ী। পুস্তকখানি পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইলে উহা একখানি উৎকৃষ্ট অবলাপাঠ্য কাব্য হইবে। উপরিধৃত গদ্য অংশের একটি পংক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রীর শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা ভয়ে ভয়ে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। গ্রন্থে আছে,—"একটি নিরক্ষর-অন্তঃপুরবাসিনী-স্ত্রীলোক।" এ স্থলে নিরক্ষর শব্দের দুরান্বয়তা পরিহার এবং বিশেষ্য বিশেষণের একলিঙ্গতা রক্ষার উদ্দেশ্যে,—"একটি অন্তপুরবাসিনী নিরক্ষর-রমণী" বলিলেই ভাল হয় না কি? আমরা মহামহোপাধ্যায়ের নিকট বহু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিব বলিয়া বহু দিন হইতে আশান্বিত।

চতুর্থ খণ্ড]　　শ্রাবণ, ১৩১২ সন।　　[৪র্থ সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৪

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ॥৵ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রাবণের বান্ধব প্রকাশিত হইল। ভাদ্রের সংখ্যা ৺ পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। ৺ পূজা নিকটবর্ত্তী। গ্রাহকবর্গ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে এই সময় সত্বর নিজ নিজ দেয় প্রদানে বাধিত করিবেন।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৵০	৩।৵০
ষাণ্মাসিক	২৲	৶০	২৶০

পশ্চাদ্দেয়।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৪৲	।৵০	৪।৵০
ষাণ্মাসিক	২॥০	৶০	৩॥৶০

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারি-সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হয় না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। গ্রাহক-নম্বর ব্যতিরেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যেও বড় অসুবিধা ঘটে। সুতরাং গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে কিংবা মূল্য প্রেরণ করিবার সময় দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না। নূতন গ্রাহকেরা "নূতন" এই শব্দের উল্লেখ করিবেন।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

☞ কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

বান্ধব-কুটীর,—ঢাকা।
১৩১১ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ। কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু সহকারী সম্পাদক।

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

(৮)

আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে, তাই আমরা বাহ্যিক পরমাণুর কম্পনগুলিকে বিশেষ অবস্থায় শব্দ-স্পর্শাদিরূপে বুঝিতে পারি। বিশেষ বিশেষ কম্পন ইন্দ্রিয়পথে আসিলেই বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে। আবার, মস্তিষ্কের পরমাণুর বিশেষ বিশেষ কম্পন, অন্তঃকরণের পথে উপস্থিত হইয়া, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-ভয়াদির বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও শব্দস্পর্শাদিময় বাহ্য পদার্থ—ইহারা একই উপাদানে ঘটিত। এইজন্যই, ইহাদের জাতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। একই পরমাণুর সূক্ষ্ম উপাদান (Essence) বাহিরে কম্পনরূপে ও দেহে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়া আছে। "বিষয়-সমানজাতীয়ং করণং মন্যতে শ্রুতির্নতু জাত্যন্তরম্। বিষয়স্যৈব স্বাত্মগ্রাহকত্বেন সংস্থানান্তরং করণংনাম"—শঙ্করভাষ্য (বৃহঃ উপ ৪।৪।১২) বাহিরে উহারা বিষয়রূপে যে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিণত হইয়াছে, দেহেও সেই সেই ভাববিশেষের সংস্কারময় অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়া আছে। কাজেই ইহাদের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শব্দাদির জ্ঞান (Consciousness) কিরূপে উপস্থিত হইল? শব্দ উৎপাদিত হইতে যেরূপ কম্পন আবশ্যক, মনে কর, পরমাণুর তদ্রূপ কম্পন হইল; সেই কম্পনের গ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেই বিশেষ কম্পনকে গ্রহণ করিল; এবং অন্তঃকরণেও সেই কম্পনের দ্বারা তদনুরূপ সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু, সেই বিশেষ কম্পন হইতে, শব্দ-জ্ঞান (Sound-Consciousness) কিরূপে উৎপাদিত হইল? কম্পন ত জড়ীয় ক্রিয়া মাত্র। জড় হইতে কিরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইল? উভয়ের মধ্যে তাদৃশ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল কি প্রকারে? এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়? ইউরোপীয় দর্শনে ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। "How are these physical processes *connected* with the facts of consciousness"? "They appear together, but we do not know why." (Tyndall). বিবর্ত্তবাদেও, প্রাণ কিরূপে জড় হইতে প্রথম অভিব্যক্ত হইল, ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদত্ত হয় নাই। জড় ও জড়ীয় শক্তি, উভয়ই এক হউক;—অথবা একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে আমরা না বুঝিতে পারি,—তাহাই হউক;—অথবা জড়ের বিশ্লেষণ করিলে, শক্তিমাত্রই অব-

শিষ্ট থাকুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইতেছে না। এইরূপ, মানসিক ভাবনিবহের (Ideas) বিশ্লেষণ করিলে, উহারা states of consciousness হউক;—বা সেই states of conciousness গুলি একই consciousnessএর বিভিন্ন ক্রিয়া বা অবস্থাই হউক;—তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইতেছে না। এই বাহিরের জড় (Matter বা Force) ও ভিতরের জ্ঞান (consciousness), এতদুভয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল কিরূপে ? পাশ্চাত্য দর্শনে ইহার সদুত্তর নাই। সাংখ্যদর্শনের মতে, এ উভয়ের সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয় ; জ্ঞানাতীত ("অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ"—সাংখ্যদর্শন)। বৌদ্ধদর্শন বলেন, সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু সে সম্বন্ধ কিরূপে হইল, তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই। বেদান্ত, এ প্রশ্নের উত্তর অন্য ভাবে দিয়া থাকেন। বেদান্ত বলেন,—"তুমি জড় ও চেতনের সম্বন্ধের কথা তুলিয়াছ। এ কথাটা ওভাবে বলিও না। তুমি কথাটা ঘুরাইয়া বলিতেছ। জড় ও জ্ঞানকে তুমি গোড়া হইতেই পৃথক্ মনে করিতেছ। বাস্তবিকপক্ষে, এক জ্ঞান বা চৈতন্যই সদ্বস্তু। সেই জ্ঞানে যাবতীয় ক্রিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বাহ্যিক ক্রিয়াই বল, আর মানসিক ক্রিয়াই বল, উভয়েরই অন্তরালে এক অখণ্ডজ্ঞান পড়িয়া আছে। তাহারই বক্ষে সমস্ত ক্রিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে। বাহিরের ও ভিতরের ক্রিয়ার উপাদান একই। সেই উপাদানটিই ক্রিয়ার মূলবীজ। সেই উপাদানটি কি ? উহাকে "মায়া" বলিতে পার, "প্রকৃতি" বলিতে পার, বা পরমাণুর সূক্ষ্ম Essence বা ধাতু বলিতে পার, (তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিৎ মায়ামেকে পরে ত্বণূন্"—যোগবাশিষ্ঠ)। যাহাই বল, উহা জ্ঞানেরই শক্তি মাত্র। এই শক্তি জ্ঞানেরই বক্ষে ধৃত রহিয়াছে। "স্বরূপমের কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তম্"—শ্রীধর স্বামী। এই জ্ঞান ও শক্তি একই পদার্থ, ভিন্ন নহে। শক্তি যখন ক্রিয়ার আকারে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই ক্রিয়া গুলি অবশ্যই অপূর্ণ। কিন্তু সেগুলি পূর্ণতার দিকেই ধাবিত হইতেছে ;—সেই অপূর্ণ ক্রিয়ার পূর্ণতা পাইবার যোগ্যতা আছে। এই জন্যই ক্রিয়া ও জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন বলিয়া, আপাততঃ বোধ হইলেও, উহারা ভিন্ন নহে। কিন্তু বেদান্তের এরূপ সিদ্ধান্তের মূল কোথায় ? এ সিদ্ধান্তে সাংখ্যের সম্মতি আছে কি না ?

আমরা দেখিতে পাইতেছি, জাগতিক প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, একটি সত্তা অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যাইতেছে। এই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা (Substratum) না থাকিলে, আমরা পরিবর্ত্তনই বুঝিতে পারিতাম না। বৃক্ষের ব্যক্তি-গত বা স্বগত ভেদ ঘটিতেছে বটে, কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনস্রোতের অন্তরালে, বৃক্ষত্বের বা বৃক্ষ-সত্তার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না। এইরূপ, সমুদয় অনুভূতি, চিন্তা, হর্ষ শোকাদির ভিত্তিরূপে একটি অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বর্ত্ত-

মান আছে। বাহিরের ও ভিতরের এই সত্তাদ্বয় বাস্তবিকপক্ষে একই, ভিন্ন নহে। গুণ সমষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, আমরা গুণীর পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনায় আনিতে পারি না। গুণের প্রত্যক্ষকালে, সঙ্গে সঙ্গে মাখামাখিভাবে গুণীর অস্তিত্বও সূচিত হয়। তাই, বেদান্ত বলেন,—জ্ঞান ও শক্তি একই। জ্ঞান ছাড়া শক্তি, বা শক্তিছাড়া জ্ঞানের ধারণা হয় না; উভয়েরই অস্তিত্ব একই সময়ে সূচিত হয়। শক্তিছাড়া যখন শক্তিমানের জ্ঞান অসম্ভব, তখন মূলতঃ উভয়ই যে এক নহে, তাহা কে বলিতে পারে? এই সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে, এই জটিল তত্ত্বের অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাংখ্যদর্শনেরও এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেই, বস্তু প্রত্যক্ষকালে, প্রথমে নির্বিকল্পজ্ঞান হয়, পরে সবিকল্পজ্ঞান হয়। এই নির্বিকল্প সামান্য জ্ঞানই, সেই সত্তা বা Substratum এর জ্ঞান মাত্র। সাংখ্যমতে এই সত্তার নাম "প্রকৃতি।" বেদান্তমতে ইহার নাম "মায়া"। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, বেদান্তমতে শক্তি ও শক্তিমান্ একই বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সাংখ্যমতেও, পুরুষ নিষ্ক্রিয় নির্গুণ সত্তা মাত্র। এ মতে যদিও পুরুষের বহুত্ববাদ অবলম্বিত হইয়াছে, তথাপি সেই বহুত্ববাদ কেবল কথার কথা মাত্র। পুরুষ বস্তুগত্যা একই। সাংখ্য, বেদান্তের ন্যায়, শুদ্ধচৈতন্যে ও বিশিষ্টচৈতন্যে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না। একই পুরুষ বা চৈতন্য সর্ব্বত্র অবিক্রিয় ভাবে অবস্থিত; দেহাদি উপাধিভেদে সে চৈতন্যের কোন ভেদ সাধিত হয় না। এই উপাধিজন্য ভেদ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়াই, সাংখ্য, পুরুষকে, অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষকে এক বলিতে পারেন নাই, বহু বলিতে হইয়াছে। কিন্তু এভাবে, বহু বলিলেও, বস্তুগত্যা তাঁহার পুরুষ একই দাঁড়াইতেছে। এই ভাবিয়াই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছিলেন;—"নহি পরঃ পুরুষসামান্যং * * * * * সন্নিধিমাত্রেণ প্রেরকত্বাৎ" (সাংখ্যভাষ্য, ৩। ৫৭)। "জন্মমরণাদির ব্যবস্থার জন্য বহুপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে।" (সাংখ্যকারিকা, ১৮);—কারিকার এই যুক্তিটি প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবিক পুরুষ একই। একই পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেহাদিভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। "উপাধির্ভিদ্যতে ন তদ্বান্" সাংখ্যদর্শনের এই সূত্রও তাহাই প্রতিপাদন করে। আর একটি কথাও লক্ষ্য করিতে হইবে। সূক্ষ্মশরীরই স্থূলদেহ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে, জন্ম ও মরণ হইল, এ কথা বলা যায়। এই সূক্ষ্মশরীর মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। মুক্তি হইলে সূক্ষ্মশরীর থাকে না। সুতরাং যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ। মুক্তি হইলেই পুরুষের একত্ব ঘটিল। কাজেই, আমাদের বোধ হয় যে, সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ কথার কথা মাত্র।

এই পুরুষ বা চৈতন্য সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ কেন হয়? তদুত্তরে সাংখ্যের সেই বিখ্যাত ২১ কারিকা। "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য" ইত্যাদি। ভোগ্যভোক্তৃতা সম্বন্ধজন্য এই সংযোগ (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। এই ভোগ ভোক্তৃতা ভাব কি ও কেন এই সংযোগ হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ ১৭ কারিকায় উত্তম প্রদর্শিত হইয়াছে। "সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ"। এই কারিকাটি বুঝিলেই, বেদান্ত ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত যে একই তাহা বুঝা যাইবে। এই কারিকাদ্বারা ইহাও বুঝা যাইবে যে, সাংখ্য স্পষ্টতঃ ঈশ্বর না মানিলেও, বেদান্ত যে যুক্তি বলে সগুণ ঈশ্বর মানিয়া লইয়াছেন, সাংখ্যেরও সেই যুক্তিতে সম্মতি আছে। এখন আমরা এই কারিকাটির তাৎপর্য্য-নির্দ্ধারণের জন্য অগ্রসর হইব। বিষয়টি গুরুতর। তাই, আমরা পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কিন্তু অদ্য প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়িয়াছে। বারান্তরে এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ,।

কর্ণ কে?

কর্ণ ও কবিত্বের সম্বন্ধ কি?

কুরুপতি দুর্য্যোধন সুগভীর বিষাদ-ভারাক্রান্তহৃদয়ে পরম বৈরী পাণ্ডবের এই সুদুঃসহ গৌরব-লীলা কোনও মতে সক্লেশে সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার স্বভাব-ঈর্ষ্যা-কলুষিত-হৃদয় অমিত ও দুর্নিবার দাহে জ্বলিতে লাগিল। ইন্দ্রপ্রস্থের এই সর্ব্বাতিসারিণী গৌরবশ্রী তদীয় নয়নে তীব্রশূল-সম অসহনীয় হইল। সেই বিরাট-সভায়,—ভারতের অনন্ত ঐশ্বর্য্যদ্যোতিনী সেই মহতী সভায়—কুরুপতি কিরূপে ও কোন্ পাপ-সাধনে, তাদৃশ ধর্ম্মোন্নত পরম-বিশুদ্ধশীল পাণ্ডবেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, সেই আসুর-অভিসন্ধির পাপ-লীলাময়ী চরিতার্থতা বিষয়ে, পাপমনাঃ গান্ধার-রাজ শকুনিপ্রমুখ ভারত ধূমকেতুগণের সহিত নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যথারূপ প্রারব্ধ যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, উপস্থিত মহীপালগণ স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুর্ম্মনায়মান দুর্য্যোধনও অসূয়াদগ্ধ হৃদয়ে ভারতের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া—ভারত-শোণিতে তদীয় অন্তর্নিহিত সুদারুণ-ঈর্ষ্যানল

প্রশমিত করিবার জন্য—হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। পাপমতি গান্ধাররাজ শকুনি নৈসর্গিক শাঠ্যপূর্ণ উপদেশ দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রবল ঈর্ষ্যানল সন্ধুক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অসূয়াগ্নির দুর্ব্বার-ইন্ধন স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত ও উদ্বেজিত করিতে আরম্ভ করিলেন। একে মনসা তাহাতে ধুনার গন্ধ। কৌরবেশ্বর অনিবার্য্য বেগে জ্বলিয়া উঠিলেন। মহাভারতে মহান্ সর্ব্বনাশের প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইল।

এই সর্ব্বনাশের মূলে, কুরুপতির ঈর্ষ্যা আর পাপচেতা গান্ধার রাজের হলাহলময়ী সর্ব্বার্থনাশিনী মন্ত্রণা, এই উভয়ই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টরূপে ক্রিয়াশীলা ছিল। মনস্বিতার প্রোজ্জ্বল-বিগ্রহ মহাবীর কর্ণ এই ক্ষেত্রে—এই অতি ভীষণ সমস্যায়—নিতান্ত অসহায় অবস্থায় চিত্রার্পিতের ন্যায় ছিলেন। তিনি আশৈশব দুর্য্যোধনেরই একান্ত অনুগত, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহারই প্রিয়চিকীর্ষু। ধর্ম্মহৃদয় পাণ্ডবের নিষ্কারণ অনিষ্টাচরণ ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। আর, সেই অনিষ্টাচরণে মহাবীর কর্ণের কি ইষ্টোপপত্তি ছিল? তিনি অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর; বিশাল ভারতবর্ষে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহামহিম রাজাধিরাজগণের সম্মুখে তদীয় রাজত্ব-গৌরব মহাসমুদ্রে অতি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর ন্যায় অতিতর অকিঞ্চিৎকর ছিল। রাজ্যসম্পদে তিনি সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের সমকক্ষতা লাভ করিবেন —ভারত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন—এতাদৃশী উন্মাদ-কল্পনা ক্ষণকালের তরেও মহাবীর কর্ণের হৃদয় বিলোড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ভারতের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নগণ্য অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন; তাহাও দুর্য্যোধন প্রসাদাৎ। অতএব, কেমন করিয়া, মহাত্মা কর্ণ ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি যুধিষ্ঠিরের বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন? আর সেই অহেতুক বৈরাচরণে তাঁহার এমন কি ইষ্ট সাধিত হইবে বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি তাদৃশ কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে সমর্থ হইতে পারেন? কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে -একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; ইহা সার্ব্বভৌম নিয়ম। মনস্তত্ত্বদর্শিগণ মানবীয় জ্ঞানকৃত যাবতীয় অনুষ্ঠানের মূল-প্রদেশে সর্ব্বদাই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের লীলা দেখিতে পান। এই উদ্দেশ্য প্রায়ই স্বার্থমূলক—আত্মার্থ—প্রণোদিত—স্বসুখ-প্রেরিত। কিন্তু, এই স্থলে পাণ্ডবধ্বংসরূপ বিরাট কার্য্যে মহাবীরের কি স্বার্থময় উদ্দেশ্য আছে, বুদ্ধি আদৌ তাহার পরিগ্রহ করিতে সমর্থ নহে। স্বার্থ দুর্য্যোধনের। কেন না, যুধিষ্ঠির শক্তিহীন বা পর্য্যুদস্ত হইলে, তিনিই ত ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্যের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু, কর্ণের সে আশা একেবারে বিড়ম্বনা। দুর্য্যোধন সততই যুধিষ্ঠিরকে আপনার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়াছেন; —তাঁহার আমূল সর্ব্বনাশই আপনার অভ্যুদয়ের একমাত্র নিদান ও কারণ রূপে জ্ঞান করিয়াছেন; এবং তদনুসারে আজীবন তাঁহার বিনাশ-সাধনে প্রযত্নবান্ রহিয়াছেন।

কিন্তু, সূত-তনয়—জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত—শোচনীয়রূপে সাংসারিক অত্যাচারে নিপীড়িত—অঙ্গাধিপের এই মহীতলে এমন কি ছিল যে, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও সে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেন? প্রকৃতির মর্ম্মার্থদর্শী মহাত্মা বেদব্যাস এই অতি নিগূঢ়স্থলে অবোধ্য-কর্ণচরিত্রবর্ণনে অতীব সতর্ক হইয়াছেন। তিনি মহৌজাঃ কর্ণকে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণাদাতা বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু, মন্ত্রণাদানের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণে কিংবা লক্ষ্যাঙ্কনে মহাকবি যে, অসাধারণ কবিত্ব ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে এই স্বভাব-উচ্চ চরিত্রের নিরুপম মাধুরী প্রভূত পরিমাণে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অতি অগাধ চরিত্র-চিত্রণে নিখিলতত্ত্বদর্শী ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপ লোকোত্তর কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যথার্থই কাব্যসমুদ্রের অমৃত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তিনি এই ক্ষেত্রে অখিলার্থগ্রাহিণী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিসংযোগে গান্ধাররাজেরই সর্ব্বতোমুখী মুখরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুষ্টাশয় শকুনির এবংবিধ প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া মহাকবি সেই অতুল সুচারু চরিত্রচন্দ্রমার একটি অতিভীষণ অভিভব-কলঙ্ককালিমা অপনীত করিয়াছেন। তবে, এখন স্বভাবতঃ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, দুরাশয় শকুনি কোন্ স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় উত্তেজিত ও উদ্দীপিত হইয়া—কোন্ অভীষ্ট সাধনার বশবর্ত্তী হইয়া—লোকক্ষয়কর এতাদৃক্ ভয়াবহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? মহাকবি এস্থলেও অতি অমানুষিক কবিত্বভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থানে এই উভয় চরিত্র পরস্পর বিপরীত ও বিভিন্ন পথাভিসারি। গান্ধাররাজ চিরদিনই কোন অতি নিগূঢ় কারণে কৌরবগণের প্রতি জাত-বিদ্বেষ ছিলেন, এবং স্বকীয় অপরিহার্য্য নীচজনস্বভাবসুলভ কৌটিল্যের বশবর্ত্তিতা স্বীকার করিয়া বৈরসাধন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে অবকাশ অনুসন্ধান করিয়াছেন। ক্রূর-হৃদয় শকুনি কৌরবের সর্ব্বনাশকেই জীবনের মৌলিকসূত্র জ্ঞান করিয়াছেন। কর্ণ দুর্য্যোধনের সার্ব্বভৌমিক হিতসংসাধনই স্বকীয়, মহত্ত্ববিলসিত কর্ম্মময় জীবনের ধারণসূত্র মনে করিয়াছেন। দুরাশয় শকুনি সুবিপুল কৌরব-বংশের স্বয়ং প্রলয়কেতু। আর, মহাবীর কর্ণ পরম মিত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সুখদুঃখাদি পার্থিব যাবতীয় অবস্থার চিরসহচর; গান্ধারাধীশ্বর দুর্য্যোধনের পরম শত্রু; আর, অবিচলিত-প্রেমা অঙ্গেশ্বর তাঁহার সুদীর্ঘ বিপৎসঙ্কুল জীবনতরণীর একমাত্র বিশ্বস্ত নিয়ামক কর্ণধার ছিলেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এই উভয় চরিত্র মূলতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিসম্বাদি। শকুনির কর্কশহৃদয়ে নিদারুণ বৈরসাধনবাসনার বিরূপ লীলা—প্রবল শঠতা—নীচতা ও আবিলতার বিষময়ী ধারা ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কর্ণচরিত্রে নৈসর্গিকী ঋজুতা—চিরন্তন সুহৃদ্ দুর্য্যোধনের সার্ব্বজনীন শুভসংসাধন—মহত্ত্বের পবিত্র ও জীবনময় স্ফুরণ ব্যতীত আর

কিছুই অবলোকিত হয় না। পরার্থে আত্মোৎসর্জ্জন—আত্মবিস্মৃতি—আত্মাহুতি সেই মহিমময় চরিত্রের ভুবনাতিসারি অলঙ্কার। মহাকবি অসামান্য কবিত্বসহকারে এই উভয় চরিত্র আলিখিত করিয়াছেন, এবং মহিমোদ্ভাসিত কর্ণচরিত্রের বিশ্ববিমোহন আলেখ্যাঙ্কনে যে কবিত্ববিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা সত্য সত্যই অতীব দুর্ল্লভ

দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যার পাশবী তাড়নায় উত্তেজিত ও বিক্ষুভিত হইয়া, অক্ষক্রীড়াব্যপদেশে ধর্ম্মাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ করিলেন। ধর্ম্মনন্দনও অনতিক্রমণীয় ধর্ম্মের অনুশাসন-পরতন্ত্র হইয়া সেই সর্ব্বাশুভ বিগ্নকল্প আমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। সুদূরদর্শী মহামতি বিদুরাদি কৌরব কুলের উজ্জ্বল চারিত্রিক নক্ষত্রগণ উপস্থিত অক্ষক্রীড়ার ভয়াবহ অপকারিতা পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বিবেকানুগত উপদেশ প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে এই সর্ব্বার্থবিনাশিনী বুদ্ধি হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক প্রয়াসপর হইলেন। কিন্তু, সেই মধুরোপদেশ মহাসাগরে জলবিম্বের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া গেল! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে ঐশ্বর্য্য-পরিশোভমানা কুরুসভায় সানন্দে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রীড়া প্রারব্ধ হইল। ঋজুহৃদয় যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি প্রাণাধিক চারি ভ্রাতাকে, আসমুদ্র সাম্রাজ্য, রাজসিংহাসন, অসংখ্য দাস দাসী, হস্ত্যশ্ব রথ সকলই হারিলেন। যাজ্ঞসেনী প্রভৃতি পণে বিক্রীতা হইলেন। ধর্ম্মদ্বেষী দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরব পাংশুলগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় আনিয়া লোমহর্ষণ পৈশাচিক নিগ্রহ করিলেন। এমন কি, সে দুর্ব্বৃত্ত পাপের পৈশাচী লীলার চরম অভিনয় প্রদর্শন করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজমহিষী দ্রৌপদীর বস্ত্র মোচনে প্রবৃত্ত হইল। এতাদৃশ ঘোরতর কলঙ্ক ধর্ম্মপ্রদীপ্ত ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার অভিনীত হয় নাই। বোধ হয়, আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরেও কোটি কোটি ভারত সন্তান সেই অনপনেয় দুঃসহ কলঙ্কভার মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক এই পুণ্যভূমিষ্ঠ মহাক্ষেত্রে পর্শুচিত ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। আর্ত্তা, ধর্ষিতা এবং অসহায়া দ্রৌপদীর প্রতপ্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে হতভাগ্য আমরা এখনও বিদগ্ধ হইতেছি; আরও কতকাল যে দগ্ধ হইব, তাহা দূর ভবিষ্যৎ প্রকটিত করিবে। দ্রৌপদীর অন্তরস্থ বিষাদময় আকাশভেদী হাহাকার এখনও—আজ সহস্র সহস্র যুগান্তেও যেন—এই ক্ষত্রিয়াভিমানিনী ভারত-ভূমি হইতে তিরোহিত হইল না,—আর বোধ হয়, হিন্দুজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ বিলোপ না ঘটিলে, এই গভীর হাহাকার কোন ক্রমেই অন্তর্হিত হইবে না। পুণ্যপ্রাণ ভীষ্ম দ্রোণাদি ধানুষ্কমণ্ডলী একেবারে স্তম্ভিত হইলেন; সমাগত সভ্যগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় সর্ব্বোতোভাবেই নিশ্চল, স্থির ও তুষ্ণী-

ভূত হইলেন। সেই বিরাট রাজন্যবর্গ-মণ্ডিত সভাস্থল নিগৃহীতা দ্রৌপদীর নয়ন-জলে অভিষিক্ত হইল,—সেই উষ্ণাশ্রু একদিন তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রে পরিণত হইয়া ক্ষত্রিয়বৃন্দকে অনিবার্য্য বেগে ভাসাইয়া দিয়াছিল; আর, কৌরবকুল সেই নয়ন-জলে চিরকালের তরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সভাতলে কেবল দ্রৌপদীর হাহাকার—দিগন্তব্যাপী সুগভীর আর্ত্তনাদ—আর সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ।

দ্রৌপদীর এই লোমহর্ষণ ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্কজনক অপমান স্বরূপ পিশাচসুলভ দুষ্কার্য্যে মূঢ়প্রাণ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আর পাপাশয় গান্ধাররাজেরই সর্ব্বাগ্রগণ্যতা ছিল। মহাবীর কর্ণ কদাপি এবংবিধ পাশব অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদানে মুখরতা প্রদর্শন করেন নাই। দুর্য্যোধনের চিরশুভদ্বেষিণী পাপীয়সী ইচ্ছাই সেই অতি বিগর্হিত কার্য্যের একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণরূপে সর্ব্বত্র প্রতিভাত। তন্মধ্যে, ক্রূরস্বভাব শকুনি ও পাপবুদ্ধি দুঃশাসনের সহযোগিতা ছিল। মহাপ্রাণ কর্ণ সেই অধর্ম্ম-অকীর্ত্তিকর অধ্যবসায়ে তিলার্দ্ধ কালের জন্যও প্রারম্ভিক প্ররোচনা বা উৎসাহ প্রদান করিয়া দুরপনেয় কলঙ্কগ্রস্ত হয়েন নাই। তবে, তিনি সভাস্থলে পাণ্ডবদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। মহাকবি ইহা অপেক্ষা তাঁহার উপর আর অধিকতর কলঙ্ক আরোপণ করেন নাই। কর্ণ স্বভাবতঃ তেজঃপূর্ণ ছিলেন। প্রকাশ্য সভায় স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীর এতাদৃশ লোমহর্ষণ নিগ্রহ—তাঁহার গভীর খেদোক্তি—উষ্ণ নিঃশ্বাস—উচ্ছ্বসিত নয়নধারা—আর তেমন মহাভুজ মহাবীর ভর্ত্তা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির ও ধীর—এই ভয়াবহ প্রতিবিধের অপমানের প্রতীকার চেষ্টায় সর্ব্বথা বিমুখ ও নিশ্চেষ্ট। বোধ হয়, অভিমানদৃপ্ত কর্ণ পাণ্ডবগণকে তৎসময় একেবারেই অপদার্থ ও কাপুরুষ বলিয়া হৃদয়ের তৎকালীন উচ্ছ্বাসে তাঁহাদের দগ্ধপ্রাণে ভূয়োভূয়ঃ কটূক্তির কশাঘাত করিয়াছিলেন। বীরসিংহ বৃকোদর আর অরাতি-নিসূদন মহাবিক্রম সব্যসাচী প্রতিবিধিৎসায় সমর্থ হইয়াও যে কোনও এক অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মানুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া সেই চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই, কি করিতে পারেন নাই, মহাবল কর্ণ সাময়িক উচ্ছ্বাসে যেন একেবারেই উচ্ছ্বসিত হইয়া—হৃদয়ের গভীর আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা কোনরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, ইহাও যে এই মহাবীর চরিত্রচন্দ্রের দুর্নিবার কলঙ্ক তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু, এই কলঙ্ক কেবল তাঁহার নিজের নহে। ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং অপরাপর সভাস্থ নরপতিবৃন্দও ইহার জন্য চিরকলঙ্কিত। সেই সভায় কি এমন কেহই ছিলেন না, যিনি পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসনকে এই অতি ভয়াবহ পাশব অধ্যবসায় হইতে নিবর্ত্তিত করেন? সেই বিরাট সভাতলে কি এমন কেহই ছিলেন না, যিনি অগ্রসর হইয়া এই দারুণ

অনর্থকর ঘোরতর প্রত্যবায় হইতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন ? আর্ত্তা ও বিপন্না যাজ্ঞসেনীর অশ্রু মুছাইবার যোগ্য পাত্র কি সেই বিপুল সভায় কেহই ছিলেন না ? তাই বলিতেছিলাম, এই কলঙ্ক কেবল কর্ণের নহে —ইহা ভারতীয় ক্ষত্রিয়-কলঙ্ক—ইহা ভারতের জাতীয় কলঙ্ক—জাতীয় কলঙ্ক বলিয়াই ত আমাদের আজ এতাদৃশী ভয়াবহ দশা— আমরা ঘৃণিত শশক-স্বভাব ! আমরা দুর্ব্বিষহ কলঙ্ক-ভার কুসুমোপহারের ন্যায় দগ্ধমস্তকে সংস্থাপন পূর্ব্বক জগৎসমক্ষে এইরূপ অপদার্থ বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত !!

পাণ্ডবগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দীনহীন ভিক্ষুকবেশে অরণ্যবাসী হইলেন। ঈর্ষ্যাকলুষিত দুর্য্যোধন পাণ্ডবের এই শোচনীয় অত্যাহিতে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতে লাগিলেন। বনবাসী হইলেও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি তাঁহার নিদারুণ উৎকট বৈরভাবের অরোধনীয় বেগ সম্পূর্ণ প্রশমিত হইল না। তাদৃশ মর্ম্মস্পর্শিনী শোচনীয় অবস্থাতেও তিনি তাঁহাদের সাংঘাতিক অনিষ্ট সাধনে নিরস্ত রহিলেন না। সিন্ধুপতি জয়দ্রথ ও অপরাপর কৌরব সেনানী সমভিব্যাহারে সেই দুঃখ-দুর্দ্দশার অতলজলধিজলমগ্ন নিষ্কলুষ পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তিনি অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহাবীর কর্ণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ণের স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই আবদ্ধ ও প্রতিহত ছিল। কৃতজ্ঞতার অনতিক্রমণীয় প্রণোদনা এবং অদ্বৈত অবিকারি মৈত্রীর দুর্জ্জয় প্রেরণায় প্ররোচিত হইয়া, কর্ণকে অনেকস্থলেই স্বাধীন বিবেকানুসরণে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। তাঁহার নৈসর্গিক মহত্ত্ব, দেবদুর্ল্লভ ধর্ম্মভাব ও জন্মানুবন্ধিনী ঋজুতা, অনেক সময়ই, অবস্থার অনিবার্য্য শাসনক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে স্বচ্ছন্দ অনুবর্ত্তনে সমর্থ হয় নাই। ইহা প্রকৃতির বিশ্বজনীন সুদুর্জ্জয় শাসন। জগতের বহু পুণ্যশ্লোক স্মরণীয়নামা পুরুষসিংহ সংসারের এবম্বিধ অনভিভবনীয় নিষ্ঠুর তাড়নে অধীর ও অভিভূত হইয়া, সময় সময়, ধর্ম্মের চিরন্তন সরল-পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ইহা সত্য সত্যই মানবজাতির দুঃখ ও অগৌরবের কথা। পরচিত্তানুবর্ত্তনে মহাপ্রাণ কর্ণ অম্লানবদনে এই দুর্নিবার কলঙ্কভার মস্তকে গ্রহণ করিলেন। যিনি একদিন সনাতন ধর্ম্মের মহীয়সী প্রণোদনায় প্রাণোপম পুত্রের প্রাণ-বিনিময়েও অতিথি ব্রাহ্মণের সৎকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, চিরন্তনী কর্ত্তব্যবুদ্ধির হিরণ্যবিগ্রহের পুণ্যপাদতলে, যিনি একদিন নৈসর্গিক স্নেহ, মমতা প্রভৃতি হৃদয়িকী বৃত্তির পূর্ণ উৎসাদনে মেদ মাংসের উপর ধর্ম্মের বিজয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্তৃপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহামহিম মহাপুরুষবরেণ্য কর্ণ কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-জ্ঞান-পরিশূন্য ছিলেন ? যিনি ধর্ম্মের মহত্তম আদর্শ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের অক্ষয় পুণ্যবিগ্রহ, সেই মহাজ্ঞানোজ্জ্বল কর্ণ কি একেবারেই হিতাহিত বোধশূন্য ছিলেন ? তিনি সমস্তই জানিতেন, সকলই বুঝিতেন ; কিন্তু, তিনি কি করি-

বেন ? তিনি যে জ্ঞানান্ধ দুর্য্যোধনের প্রতি-পালিত—তাঁহারই অনুগ্রহে আশ্রিত—তাঁহারই অনুগত—তিনি যে কুরুপতির জন্য স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেক সমস্তই অপরিহার্য্যরূপে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন!! তাই বলিতেছিলাম, কর্ণ কি করিবেন? মহাবীর অযোগ্যস্থানে আত্মবিক্রয় আত্ম-সমর্পণ—আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন,—অভিমানবিমূঢ় অন্ধমতি দুর্য্যোধন তাদৃশ অপ্রাকৃত উচ্চার্থপরিবোধক আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত ব্যবহারে সমর্থ হয়েন নাই। যদি সেই অপাত্রন্যস্ত বিশ্বাসের প্রকৃত ব্যবহার হইত, তাহা হইলে, আজ এই ভুবন-ইতি-হাস-প্রকীর্ত্তিত পুরুষশ্রেষ্ঠের অনুপম চরিত্র-চন্দ্রে যে দুই একটি অনভিলষণীয় কলঙ্ক-রেখা অবলোকন করিয়া আমাদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ ও দারুণ দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইতে নিঃসংশয় আমরা সর্ব্বতোভাবেই পরিমুক্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু, প্রকৃতির সার্ব্বভৌম দুর্মোচ নিয়মে—সর্ব্বনিয়ন্তার অমোঘ বিধানে—সাংসারিক ইতিহাসে তাহা হইতে পারে নাই। হায়! যখন এই মহাবীর-চরিত্রপানে দৃষ্টিপাত করি, তখন যথার্থই প্রকৃতির রৌদ্র-ভাব চিন্তা করিয়া ভয় ও বিষাদে একবারেই অবসন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়ি; তখন মনে লয়, যদি স্বকীয় আরাধনার ধন স্বীয় মান পরপদে উৎসর্গ করিয়া মনুষ্য কিঞ্চিৎ নি-শ্চিন্ত রহিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয়, এই কলুষপঙ্কিল সংসার মুহূর্ত্ত মধ্যে দৈব-নিবাস স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত! কিন্তু, সে আশা নিতান্তই নিশীথ স্বপ্ন। কর্ণ অবস্থার জীব—বিশ্বজনীন নিয়মাধীন—প্রকৃতির ক্রীড়নক—বিধাতার অমোঘ প্রবল শাসনপরতন্ত্র—স্বেচ্ছানুবর্ত্তন সর্ব্বদা করিতে পারেন নাই—সেই জন্যই পার্থিব ইতিহাসে তাঁহার অবস্থার বিস্ময়াবহ বিপর্য্যয়ে—অন্য-রূপ—বিসদৃশ মুর্ত্তি ফুটিয়া পড়িয়াছে! কর্ণ-চরিত্র মহাকাব্য মহাভারতের দুর্জ্জেয় রহস্য! কিন্তু, এ কথা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ অতএব স্বীকার্য্য যে, যাঁহারা নিজের চিরোপাস্য মান পরপদে উৎসর্গ করিয়া সংসারের যাবতীয় অত্যাচার, অকীর্ত্তি ও উৎপীড়ন, ধীরতা ও মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতার ন্যায় নীরবে অকাতরপ্রাণে সহ্য করেন; এবং অনন্ত কলঙ্কের অসহ্য ভারও মস্তক-দেশে সংস্থাপন করিয়া আপনাকে অশেষ প্রকারে অন্ধকারে সুখী ও কৃতার্থ জ্ঞান করেন, জাগতিক ইতিহাসে তাঁহাদের যথা-র্থই অতি বড় প্রধান ও সমুচ্চ স্থান। তাঁহারা সর্ব্বত্রই মানবজাতির চিরারাধ্য—তাঁহাদের পবিত্র পুণ্য নাম যদি না মনুষ্যের হৃদয়-রত্নসিংহাসনে চিরকাল অক্ষুণ্ণ প্রতি-ষ্ঠিত রহে, এবং তাদৃশ জগদ্বন্দ্য মহাভাগ-গণের অমেয় মহত্ত্বের সুবর্ণ বেদিকার সর্ব্ব-মঙ্গলাবহ পাদপ্রদেশে যদি না মনুষ্যজাতি প্রীতিভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণে আপনাকে চরিতার্থ মনে করে, তাহা হইলে মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের পুরাতন বিভেদ সূত্র অচিরেই ছিন্ন হইবে; এবং মনুষ্য-নিষেবিত পৃথ্বী শীঘ্রই

পিশাচের তাণ্ডবলীলার নিত্য ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই। বিশ্বের প্রলয়েও সেই সমস্ত মহিমার্ণব পুরুষ-কেশরিগণের পুণ্য নাম বিলুপ্ত হইবে না। এই মহত্বই সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরসিংহের অতুল বৈভব ছিল; এই মহত্ববলেই তিনি নর-জগতে অমর—তিনি মানবহৃদয়রাজ্যে অপ্রতিহত আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন। আর, যে মহাকবি এতাদৃক্ চরিত্রাঙ্কনে হৃদয়স্থ সৌন্দর্য্যসুষমা ঢালিয়া দিয়া হৃদয়ের পরিতর্পণ করিয়াছেন,—সেই মহাপ্রাণের চরণারবিন্দে চিরদিনই মনুষ্যজাতি প্রীতিশোধিত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

বনবাসের নিরূপিত কালান্তে পাণ্ডবগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং চর-প্রমুখাৎ দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদের রাজ্যের পুনর্গ্রহণ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ভ্রান্তিবিহ্বল দুর্য্যোধন অস্বীকৃত হইলেন। এমন কি, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চখানি গ্রামের প্রার্থী হইলে, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। কুরুপতি বিবেকশূন্য ও পরিণাম-চিন্তাবিহীন হইয়া দৃঢ়তার সহিত প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও প্রদত্ত হইবে না। বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণবিগ্রহ স্বয়ং বাসুদেব মাধ্যস্থ্য অবলম্বন দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ভোগ-বিমূঢ় দুর্য্যোধন অচ্যুতের সেই মঙ্গলময়ী কথায় কোন ক্রমেই কর্ণপাত করিলেন না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। ধর্ম্মবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, মহাবল ধর্ম্মাত্মা কর্ণকে, অনেক কথা কহিলেন। কর্ণ অটল ও নির্ব্বিকার। ফলতঃ, এই মহাবীর চরিত্রের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মজ্ঞান, কাব্য সৌন্দর্য্যের সারাৎসার এবং কবির যুগান্তরব্যাপিনী সাধনার মহাফল। কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তরে উভয় পক্ষীয় যুযুৎসু বীরগণ সশস্ত্র সমবেত হইলেন। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বীরশ্রেষ্ঠ কুরুক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্ষত্রিয়-ক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ—ভারতের প্রলয়-কেতু—হিন্দুর প্রচণ্ড বাড়বানল—আরব্ধ প্রায়। বাসুদেব কোন পক্ষেই অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া, প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ, ও তৎপরিবর্ত্তে দুর্য্যোধনকে সুবিপুল মহাপরাক্রম নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন। ক্ষত্রিয়-সূর্য্য ভীষ্ম, বীরগুরু দ্রোণ, বীরতিলক কর্ণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রথম প্রবৃদ্ধ মহাবীর শান্তনুনন্দন সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত হইলেন, অপ্রমেয়-প্রভাব বিশ্ববিজয়ী পার্থ পিতামহের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণ, নৈসর্গিক স্নেহপরতন্ত্র হইয়া, একবার মাতৃ দর্শন করিলেন। তিনি চিরকালই মহাপ্রাণতার চরণোপাসক। ভয়াবহ সমরানল প্রজ্বলিত। ক্ষত্রিয়মণ্ডলী ভস্মীভূত হইবে। ধীমান কর্ণও জানিতেন, বাসুদেবসহায় পাণ্ডবগণ অসংশয় বিজয়শ্রী লাভ করিবেন, এবং যুদ্ধে তাঁহার বিনাশ অপরিহার্য্য। সেই জন্য স্নেহের প্রচণ্ড আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া মাতৃচরণ সন্দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ করিবার জন্য অভিলাষী

হইলেন। না হইবেন কেন? মাতৃকার্য্য অস্বাভাবিক ও পিশাচোচিত হইলেও, মহাবীর কর্ণ আর কর্ত্তব্যের পুণ্য-পথচ্যুত হইতে পারেন না। তাহা হইলে, কর্ণের অনন্য-সাধারণ মহত্ত্ব কোথায়? আর, যে কর্ণের চরিত্র-সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় কবির এতাদৃশী অতলস্পর্শিনী মহাপ্রাণতা, তাহারই বা অবলম্বন থাকে কৈ? কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র নিয়ামক এবং সংসারপথের একমাত্র অবলম্ব, তিনি কেবল জননী কেন, বিশ্বসংসারও যদি প্রবল অত্যাচারের বজ্রাঘাতে তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলেও তিনি অটল ও অবিকৃত রহেন। তাই কর্ণ কঠোর ও দুরতিক্রম কর্ত্তব্যজ্ঞানের মহাশাসন মস্তকে গ্রহণ করিয়া, জননীর শ্রীচরণ সন্দর্শনে গমন করিলেন। কুন্তী কর্ণকে দেখিয়া লজ্জিতা হইলেন; কর্ণ জননীর লজ্জায় মর্ম্মাহত হইলেন। জননীর অনুতাপ কর্ণ-হৃদয়ে কোটী শেলাঘাতের ন্যায় বাজিল।—মাতৃদুঃখকাতরতায় কর্ণ অভিভূত ও বিবশ হইলেন। কুন্তীর দুঃখ স্বকৃত অনুষ্ঠানের স্মৃতিতে—আর, কর্ণের যন্ত্রণা জননীর দুঃখ-পরিচিন্তনে। এইরূপ পরদুঃখানুভূতি—পরদুঃখকাতরতাই যথার্থিকী মহাপ্রাণতা। কর্ণ নিবেদন করিলেন, যুদ্ধ সমুপস্থিত। তিনি ধর্ম্মানুশাসনে কুরুপক্ষাবলম্বী হইয়াছেন। প্রাণপণে পাণ্ডবাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। হয় নিজের বিনাশ, না হয় পাণ্ডবক্ষয় অবধারিত। কুন্তী আকস্মিক অশনিসম সুদারুণ বাক্য শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন। জননীসুলভ কোমলতা সহকারে কর্ণকে নিষেধ করিলেন। বহু দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিলেন। পরমমিত্র পাণ্ডবপক্ষ সমাশ্রয় করিবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ প্রকাশ করিলেন। ভয়াবহ বিষময় পরিণামের কথাও জানাইলেন। দুর্য্যোধন পর—কৌরব পরপক্ষ; যুধিষ্ঠিরাদি অনুজ—সহজমিত্র—স্বপক্ষ—স্নেহাস্পদ কুন্তী অনেক বুঝাইলেন। কর্ণ বিচলিত হইলেন না। তিনি স্থির, অভ্রভঙ্গ ও অটল। মাকে সান্ত্বনা করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার প্রাণরক্ষক—আশ্রয়দাতা—পরমবন্ধু। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই কৌরবেশ্বর মহাসমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। তিনি এই ভয়াবহ সঙ্কটসময়ে কৌরবপতির একমাত্র কর্ণধার। আজীবন তিনি দুর্য্যোধন দ্বারাই অনুগৃহীত ও পরিরক্ষিত। এই বিষম সময়ে তিনি কেমন করিয়া প্রাণদাতা—জীবনাবলম্ব—দুর্য্যোধনকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারেন? আর, কিরূপেই বা কৃতজ্ঞতার মহাধর্ম্ম পদদলিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক জগতে অক্ষয় অকীর্ত্তিপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন? পাণ্ডব স্বজন হইলেও দুর্য্যোধনই তাঁহার পরম মিত্র ও আত্মীয়। কিরূপে কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে এমন আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন? আর কিরূপেই বা স্নেহানুরোধে কর্ত্তব্যের চিরন্তন পবিত্রমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘোরতর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন? তিনি কহিলেন, যতক্ষণ কর্ণ-ধমনীতে একবিন্দু

শোণিত সঞ্চরণ করিবে ততক্ষণ—কিছুতেই তিনি প্রভুদ্রোহী কৃতঘ্ন নরাধমের ন্যায় নিতান্ত অপদার্থ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক, দুর্য্যোধনের প্রতিকূলতাচরণ করিবেন না। কুন্তী নিরস্তা হইলেন।

এই স্থলেই মহাকবি কর্ণের মহাপ্রাণতার অবিনশ্বর প্রোজ্জ্বল চিত্র প্রদান করিয়াছেন। কবির কবিত্বের চরম বিকাশ—মহাবীর চরিত্রের সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ—এই স্থানেই অতীব পরিস্ফুট। এবম্বিধ মনোহারি অঙ্কন—এতাদৃশ অনুপম সৌন্দর্য্য চিত্রণ—এইরূপ মহত্ত্ব প্রতিপাদিনী উচ্চপ্রাণতা বস্তুতই জগতে প্রীতিসংযোগে নিত্য আরাধনার সামগ্রী। কবিত্ব কাহাকে বলে? সৌন্দর্য্য কি? মহত্ত্বের পরমাভিধান কোন্ লক্ষণাক্রান্ত? যাহাতে ভাব আছে—ভাবের প্রাণময় উচ্ছ্বাসে প্রাণ, কি যেন কি এক অপূর্ব্ব অজ্ঞেয় ভাবে, আপনা আপনি নৃত্য করে—অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়—যাহার প্রভাবে মনুষ্য দেবত্ব লাভ করে—যাহার আবেগ ও আকর্ষণে প্রাণের পিপাসা মিটিয়া যায়—যাহাতে হৃদয়ের শান্তি, আশা ও আশ্বাস—যাহাতে আদর্শের অনন্ত ভাব-বিলসিত বৈচিত্র্য—যাহার মধুর-মোহন-ধ্বনি শ্রবণে প্রাণ উন্মাদিত হয়; এবং কোন্ অলক্ষ্য পথে তাড়িত বেগে প্রধাবিত হয়—যাহার পরিচিন্তনে সর্ব্বথা আত্মবিস্মৃতি ঘটে—তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বা সৌন্দর্য্যাবলোকনই কবিত্ব—কবিত্বই মহত্ত্ব; কেন না, মহত্ত্ব না থাকিলে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয় না—সৌন্দর্য্যের নানা-তরঙ্গ-বিলসিত বৈচিত্র্যোপলব্ধি হয় না। চিন্তার নিখিল সংশয়চ্ছেদিনী, নিখিলার্থদর্শিনী ঐন্দ্রজালিকী প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া ভাবুকতার প্রাণময়ী ও সর্ব্বার্থপ্রতিপাদিনী শক্তি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির অন্তর্দ্দেশে গমন করিলে এক অনাদি, অনন্ত পথে অনন্ত ক্রিয়া বা বিলাস বই কিছুই অনুভূত হইবে না। এই অপরিচ্ছিন্ন অনন্তোচ্ছ্বাস সৌন্দর্য্য-প্রবাহই ভাবুকের হৃদয়ানন্দ—প্রেমিকের তরঙ্গায়িত প্রেমের সুখদ হিল্লোল—কবির সুধামাখা কবিত্ব ও দার্শনিকের পরম বিজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের প্রাণময় বিকাশেই বিশ্বের ক্রিয়া ও চেষ্টা এবং অনন্ত আবর্ত্তময় মোহন-বিলাস-চাঞ্চল্য আনন্দের প্রাণনিহিত উৎস। এই অসীম অচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য এক অখণ্ড মহার্ণবস্বরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের অচ্ছেদ্য আশ্রয়সূত্র জাগতিক সত্তা—বিশ্বের অনন্ত পথাভিসারিণী ক্রিয়া এই জীবনময় সৌন্দর্য্যেরই প্রাণদ আনন্দ উল্লাস! গ্রহে, নক্ষত্রে, অনিলে, অনলে, অণুতে, পরমাণুতে, সেই সৌন্দর্য্যধারা সঞ্চরণশীলা;—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্নপদার্থ এই বিরাট অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রবাহেরই অনন্ত অভিব্যক্তি। পরার্থসাধিনী দয়া, প্রাণদায়িনী প্রীতি, মহাযজ্ঞস্বরূপ প্রেম—যাহা কিছু হৃদয় সৌন্দর্য্য তাহা এই অপ্রমেয় অগাধ সৌন্দর্য্যেরই বিভিন্নরূপ স্ফূর্ত্তি—নানাপথে নানাভাবে প্রেমময়ী ক্রিয়া মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ-

ক্রিয়া—আনন্দময়ী স্ফূর্ত্তি। ইহার অভাবই বিশ্বের প্রাণশূন্যতা—বিনাশ বা ঐকান্তিক স্পন্দন। প্রকৃতার্থদর্শী মহাকবি এই অপ্রতিসম্ভোগ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যের অন্তর্দ্দেশে গমন করেন—প্রেমসংযোগে ইহার বিলাস ভঙ্গী নিরীক্ষণ করেন, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহারই বিশ্ববিমোহন আলেখ্য প্রদান করিয়া পৃথিবীকে চরিতার্থ করেন। এই সৌন্দর্য্য চিত্রই কাব্য—এই চিত্রই মনুষ্যকে পরম আশ্বাস আর সর্ব্বসন্তাপহারিণী আশা প্রদান করেন। বোধ হয়, এই দগ্ধ সংসারে—এই অপরিহার্য্য অসংখ্য শোকদুঃখপরিপূর্ণ সংসারে—কঠোর শাসনের ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর দৃশ্যস্বরূপ সংসারে এবম্বিধ দুই এক খানি সৌন্দর্য্য চিত্র না থাকিলে, নর-নিবাস বসুন্ধরা, মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইত। পৃথ্বী এতাদৃশী কাব্যপুণ্যসলিলা মন্দাকিনীর পুণ্যসঞ্চারে অভিষিক্ত না হইলে, মুহূর্ত্তেই প্রেত-পিশাচের বিকট লীলাভিনয়ের অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় ক্ষেত্রে পরিণত হইত। তাই বোধ হয়, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় ও মঙ্গলময় সার্ব্বভৌম নিয়মে সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই অনির্ব্বচনীয় কৃপায়—ভূপৃষ্ঠে সময় সময় কাব্যামৃত সঞ্চারিত হয়। উহা পৃথিবীকে উদ্‌বোধিত রাখে এবং মানব জাতিকে আশ্বাসের অস্ফুট ও প্রাণদ সঙ্গীতে সম্মোহিত করে। মহার্থদ্রষ্টা মহাকবি বেদব্যাস বিশ্বব্যাপি সৌন্দর্য্যের প্রীতিবিবশা উদ্দীপনায় মহাবীর কর্ণচরিত্রে কর্ত্তব্য জ্ঞানের লোকবিমোহন আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্যই বেদব্যাস মহাকবি—অনুপম সৌন্দর্য্যস্রষ্টা—অতুল মহত্ত্বের অক্ষয় দেবমূর্ত্তি; তাহা না হইলে, এবংবিধ লোকোত্তর চরিত্রের সৌন্দর্য্য আলিখিত হয় না; মনুষ্যের আশা ও আশ্বাসশূন্য পথে বিলীন হয়; এবং মনুষ্য দুঃখ দুর্গতির ঘোরতর তমোময় কূপ-গর্ভে নিপতিত রহে। তাই আজ আমরা সহস্র সহস্র বৎসর পরও কর্ণচরিত্রের অনুপম সৌন্দর্য্যচিত্র সন্দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকি; এবং তাদৃক্ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যদর্শী মহাকবি বেদব্যাসের শ্রীচরণাম্বুজে কৃতজ্ঞতার পূতপুষ্পোপহার লইয়া সাগ্রহ ও সানন্দে অবনত মস্তক হই।

ক্ষত্রিয়ক্ষয়কর ভারতবিনাশি সমর উপস্থিত। কৌরবস্থর্য্য বীর কুলপ্রদীপ মহারথ ভীষ্ম মহাতেজাঃ সব্যসাচীর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ণ এই মহাসমরে অনুপস্থিত। রণ-প্রারম্ভেই ভীষ্মের সহিত কর্ণের মনোমালিন্য ঘটিল,—কারণ, কর্ণের অসহ্য প্রগল্‌ভতা। পঞ্চ সায়কে, পঞ্চ দিনে পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশ সাধনে আপনার সামর্থ্য প্রকাশই কর্ণের অনুচিত ধৃষ্টতা। যাহা শান্তনুনন্দন দেবব্রতের অসাধ্য—সূতনন্দন কর্ণ কেমন করিয়া কোন্ সাহসে সেই অসাধ্যসাধনে কৃতোদ্যম? তাই, ভীষ্ম রোষ-কোষায়িত-লোচনে পরুষ-ভাষায় মহারথ কর্ণকে অজস্র তিরস্কার করিলেন,—এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ণ যুদ্ধ করিলে তিনি যুদ্ধে বিরত রহিবেন। কর্ণের এতা-

দৃশী ধৃষ্টতা ভীষ্মের একান্তই অসহনীয়। মনস্বী বীরচূড়ামণি কর্ণ শান্তনু-নন্দনের সহিত বিধিসঙ্গত প্রতিবাদ করিলেন। কর্ণ সততই স্বীয় ভুজবীর্য্যে সম্যক্ কৃতপ্রত্যয় ছিলেন। তিনি পার্থ প্রভৃতি মহাপ্রভাব ধনুর্দ্ধরকে শৌর্য্য ও ক্ষাত্র-পরাক্রমে আপনা অপেক্ষা অনেক অংশে হীন ও লঘু জ্ঞান করিতেন। তিনি স্বকীয় স্বভাব-সুলভ অভিমানের সহিত মনে ভাবিতেন, সুবিশাল ভারতক্ষেত্রে তাঁহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কর্ণকে গর্ব্বিত ও প্রগল্‌ভ বলিয়া অমিত কর্কশ ভাষায় ধিক্কার প্রদান করিলেন। এই স্থলে এই অত্যুচ্চ চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বহু কথাই বলিবার আছে। বীরত্বগরিমায় মহাবীর কর্ণ তদানীন্তন শূরশ্রেষ্ঠগণের একতম ছিলেন। যিনি একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া শূরত্ব মহিমার চরমলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বীরগুরু ক্ষত্রিয়ারি ভার্গব যাঁহাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রকাশে চরিতার্থ করিয়াছিলেন, বীর-ইতিহাসে তিনি কোন ক্রমেই ভীষ্মাদির অপেক্ষা হীনতর ছিলেন না। মহাপরাক্রম কর্ণ স্বকীয় বীরত্বাভিমানে প্রদীপ্ত ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরমণ্ডলীকে তিনি সর্ব্বদাই অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন। আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসই ইহার কারণ। ইহাতে নিরর্থক বাক্যাস্ফালন, ধৃষ্টতা বা কাপুরুষতা দ্যোতিত হয় নাই। বরং, তিনি যে নিজশক্তির প্রকৃত মর্য্যাদা পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহা মহাপুরুষগণেরই অন্যতর উপলক্ষণ। অসারতা ও অভিমানকে একই সংজ্ঞায় অভিহিত করা সর্ব্বতোভাবেই অসমীচীন পরশুরাম-শিষ্য দ্রোণ-শিষ্যাদি অপেক্ষা হীনতর, এবম্বিধ হীনতা পরিবোধক ভাব তদীয় স্বভাবোন্নত হৃদয়কে ক্ষণতরেও আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অভিমানে অহঙ্কার নাই—আত্মাদরের অনুচিত অনিয়ন্ত্রিত বিকার নাই। ইহাতে আত্মমর্য্যাদার চিহ্ন আছে—আস্ফালন নাই; স্বকীয় গুণপরিগণনা আছে,—বিকার নাই; বিশ্বাস আছে,—ভয় নাই। এবংবিধ সুপবিত্র উন্নতভাব সত্য সত্যই সংসারপথে মানবের বড়ই স্পৃহণীয় পদার্থ। কর্ণ এই অতি উন্নত মহাভাবে সমৃদ্ধ ছিলেন। মহাবীর কর্ণ সত্যনিষ্ঠায় ভীষ্মাচার্য্যাদির অপেক্ষা কোনক্রমেই ন্যুন ছিলেন না; বরং, প্রতিজ্ঞা পরিপালনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তিনি এক এক স্থলে যেরূপ অনন্যসাধারণ মহত্ত্বগৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন, সমগ্র মহাভারত মহাকাব্যে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। এই স্থলে বীরভাস্কর শান্তনুতনয়ের সহিত এই লোকোত্তর চরিত্রের তুলনাপ্রসঙ্গে দুই একটি কথার অবতারণা, বোধ হয়, একেবারে অনাবশ্যক বা অসমীচীন হইবে না। মহারথ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনাদিরই আশ্রিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মদেব কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতার অনুরোধে কিছুতেই কৌরব পক্ষাবলম্বী না হইয়া পারেন না। কেননা, প্রতিপালকের উপকারসাধন অপেক্ষা, বোধ

হয়, এই মহীতলে মহত্তর মানবধর্ম্ম আর কিছুই নাই। কর্ত্তব্যানুরোধেই সূক্ষ্মদর্শী বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মাচার্য্য উপস্থিত যুদ্ধের বিষময়ী অপকারিতা সম্বন্ধে স্নেহাস্পদ দুর্য্যোধনকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অন্ধ দুর্য্যোধন সেই সকল বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। তদনন্তর, যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য তখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা পূর্ব্বক পরমপ্রীতিভাজন পাণ্ডবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন।

কৌরব পক্ষাবলম্বনে পিতামহ স্বকর্ত্তব্যের সীমাচক্রেরই বিধিপূর্ব্বক অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। দুর্য্যোধনও জানিতেন, পিতামহ রণক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান্ বীরধর্ম্ম--সাক্ষাৎ ক্ষত্র-প্রভাব—স্বয়ং কালাগ্নি—মুহূর্ত্তে ত্রিপুর বিনাশে সমর্থ। এই মহীয়সী সুখকরী আশার দৃঢ়ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই প্রথম সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রবল বিশ্বাস, তাঁহার নিশিত সায়ক দুর্ব্বল পাণ্ডব কোনরূপেই সংবরণ করিতে পারিবে না। পিতামহ বিশ্ববিজেতা। পাণ্ডব সেই বীরত্বের মহাস্রোতোময় মহার্ণবে কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে ভাসিয়া যাইবে। পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেই হৃদয়পোষিত সুখাশা পরিপূর্ণ করিতে পারেন নাই। যদিও কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে পাণ্ডবের সর্ব্বতোমুখী বিজয়বাসনা—সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ ব্যতিরেকে—ক্ষণতরেও দুর্য্যোধনের মঙ্গলকামনা স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই। মহাবীর ভীষ্ম যদি অদ্বৈত ও অকৃত্রিম কৌরব শুভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া পাণ্ডবের সহিত সমরক্ষেত্রে দুর্ব্বার বেগে প্রাদুর্ভূত হইতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ কতদূর যে সেই সুদুর্জ্জয় বীরত্ববহ্নি সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন, তাহার অবধারণ বড় সুখকর নহে, আর সেই প্রলয়-সমরের অন্তিম ফল যে কিরূপে পরিণত হইত, তাহাও স্থির করা বড় অধিক সহজ বলিয়া অনুমিত হয় না। এইরূপ কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্টা পক্ষপাতিতা ক্ষণকালের জন্যও তাদৃশ মহোচ্চ ভীষ্মচরিত্রের গৌরব দ্যোতিনী বলিয়া পরিকল্পিত হইতে পারে না। তাঁহার বিকৃত দ্বৈধভাব উচ্চভাবের চিরবিরোধী এবং সর্ব্বতোভাবেই বিসংবাদী। উচ্চার্থ-পরিবোধিনী ঋজুতাই মহাবীর চরিত্রের উজ্জ্বলতম অলঙ্কার। যদি মহাবীর ভীষ্ম স্পষ্টাভিধানে দুর্য্যোধনের নিকট স্বকীয় হৃদয়-নিহিত পাণ্ডবাভিমুখী কল্যাণ-বাসনা প্রকাশ করিতেন; তাহা হইলে, কৌরবপতি সেই লোকভয়ঙ্কর সমরে অন্য-পাত্রে সেনাপতিত্বের তাদৃশ দুর্ব্বহ দায়িত্বভার সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু, তিনি দৈবদুর্ব্বিপাকে অতি শোচনীয়রূপে প্রতারিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডব-শুভানুধ্যায়ী ভীষ্মের প্রতি কৃতপ্রত্যয় হইয়া দুর্য্যোধন ভ্রমান্ধকারে অপ্রতিবিধেয়রূপে নিপতিত হইয়াছিলেন; এবং কে সাহস করিয়া কহিবে, সেই ভয়াবহ ভ্রমই তাঁহার আমূল সর্ব্বনাশের প্রধানতম কারণ স্বরূপে পরিণত হয় নাই? বোধ হয়, শান্তনু-তনয়

পাণ্ডববাহিনীর দুরতিক্রম মহাবেগে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কৌরব বলক্ষয়ে ফলতঃ বহুবিধ অবকাশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলে মহারাজ দুর্য্যোধন চরমে সেই ভীষণ রণে সর্ব্বস্বান্ত হতভাগ্যের ন্যায় গভীর হাহাকারে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

কিন্তু, মহাবীর কর্ণচরিত্রে তদ্বিধ কোনও দ্বৈধভাবের ক্ষীণতম ছায়াও পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া একসংস্থা প্রীতি-সহযোগে আশ্রয়দাতা-পরমমিত্র-কৌরবেশ্বরেরই মঙ্গল সাধনে স্বকীয় মহত্তম জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সেই মহীয়সী কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া স্নেহ, মমতা প্রভৃতি পরাভিমুখী নৈসর্গিকী বৃত্তির অচ্ছেদ্য-বন্ধনটি পর্য্যন্ত অকাতরপ্রাণে ও অনায়াসে সহস্র অংশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন! তিনি দুর্য্যোধনের সার্ব্বভৌমিক হিতসাধনরূপ মহাযজ্ঞে পার্থিব-সুখসম্ভোগবাসনা অম্লানবদনে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাদৃশী পরার্থসাধিনী উচ্চপ্রাণতার দ্বিতীয় অভিনয় জাগতিক ইতিহাসে সংঘটিত হয় নাই, বোধ হয় এই কথা বলিলে সত্যের অপলাপ বা অবমাননা হয় না। তিনি মহাবীর রূপে মহারুদ্র ভাবে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অমিতবিক্রমে পাণ্ডব-বাহিনীকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়াছেন; এবং প্রাণকল্প-গাণ্ডীবীর প্রাণ বিনাশে অতীব সতর্ক ভাবে যাবতীয় সুযোগের অন্বেষণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্যের সর্ব্বাতিভাবী প্রবলাবর্ত্তে স্নেহের দুশ্ছেদ্য সুদৃঢ় তন্তু পর্য্যন্ত কোটি অংশে ছিন্ন হইয়াছে। স্নেহ, মমতা প্রভৃতি আত্মগত-হৃদ্‌বৃত্তির উপর চিরন্তনকর্ত্তব্যের মহতী বিজয়শ্রী অনন্ত কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পিতামহ ভীষ্ম স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠতম-মার্গ হইতে দুর্জ্জয়বেগে দূরে অপসারিত হইয়াছেন; কর্ণ, অচল-অটল-উত্তুঙ্গহিমাদ্রির ন্যায় স্বকীয় গন্তব্য-পথে অপ্রতিহতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন; শান্তনু-নন্দন স্নেহের প্রবল-স্রোতোমধ্যে কর্ত্তব্যের মহত্তম-ধর্ম্মকে একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছেন; মহাবীর কর্ণ বীরানুসন্ধানী দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যের উচ্চতম হিরণ্যবিগ্রহের নিকট স্নেহ মমতার পূর্ণাহুতি করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, কর্ণের সর্ব্বোচ্চ চরিত্র মহাভারত মহাসমুদ্রে প্রকৃত অমৃত—এই অমৃতের তুলনা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশীমোহন বসাক বি, এ।

বিয়োগে। *

যা মধুযামিনী যাপিনু হরষে,
সে নিশিতো আজ ফিরিল অই,
মম যৌবন-বন-ছিন্ন লতিকা
ফিরিয়া আবার আসিল কই ?
আজিও তো ফুটে কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জুল জাতি যুঁথিকা,
ফুল্ল কুসুম-বক্ষে,
আজিও তো সুখ-লক্ষ্যে,
মক্ষিকাকুল সান্ধ্য-সোহাগে তুলিছে শঙ্খ-গীতিকা !
আজিও তো অই বহিছে গঙ্গা রৌপ্য লহরী তুলিয়া।
লহরে লহরে পদ্ম
দিতেছে অর্ঘ্যপাদ্য,
আঁধার ছুটে শ্যাম সরসা অঞ্জলি ডালা ভরিয়া !
আজিও তো এই চম্পকময়ী চান্দনী হাসে মন্দ,
শান্তোজ্জ্বল-দরশা
হৃদয়ে জাগায়ে ভরসা,
অন্তরে পড়ে লুটিয়া বিমল স্নিগ্ধ মলয় গন্ধ !
গড়িতে চাহি গো স্বর্গ মথিয়া বিয়োগ-বিধুরা ধরা,
মেলিয়া চক্ষু পুলকে,
উল্লাসে চাহি আলোকে,
শূন্য হৃদয়ে চাহিয়া নেহারি ঊর্দ্ধ আকাশে তারা,
সে কি আজি নব ছন্দে,
ভূতল গগন বন্দে,
মর্ত্ত্য পুরিয়া আভাষে উঠে মন্দ্র কূজিত সারা !

* হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বিভেদে গেয়।

রয়েছি নিত্য জাগিয়া মত্ত হরষে কত নিশি,
শান্তজড়তা ছাপিয়া,
শুধুই পড়েছে ব্যাপিয়া
তপ্ত ব্যাকুল চাহনি আমার সুপ্ত তিমির রাশি,
আজি তো আবার ফিরিয়া
সে নিশি আসিল হাসিয়া,
এ আলোকে মোর কাননে কি পুনঃ
ফুটিবে সে চারু হাসি !

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা।

(ময়মনসিংহের ইতিহাসের জন্য লিখিত।

যে দিন রাজস্ব বাকীর জন্য সুসঙ্গের নাবালক জমিদারদ্বয়কে তোপাগ্নিতে, অতি নৃশংস ভাবে, হত্যা করার দিন অবধারিত ছিল, সেই দিন অতি প্রত্যুষে ইংরেজের ভীষণ তোপধ্বনি বুড়িগঙ্গার প্রসর হৃদয় আলোড়িত করিয়া ঢাকানগরীতে নূতন বিপ্লব জাগাইয়া দিল। সেই শুভ দিনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিজয়কেতন ঢাকানগরী বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইংরেজ ঢাকা অধিকার করেন। ইংরেজ ঢাকানগরী অধিকার করিয়াই শাসনকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি অধিকার করেন ও কোম্পানীর বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। তাঁহারা এই সময় ময়মনসিংহে অগ্রসর হইয়া বেগুনবাড়ীতে এক কুঠি স্থাপন করেন এবং কিশোরগঞ্জ ও বাজিৎপুর প্রভৃতি স্থানের পর্ত্তুগীজ ও ফরাশিদিগের কুঠিগুলি হস্তগত করেন।

অতঃপর ঢাকা বিভাগের শাসনসংরক্ষণের বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। বন্দোবস্ত প্রথমতঃ পূর্ব্বানুরূপই চলিতে থাকে। শাসনকার্য্যের সুবন্দোবস্ত ও রাজকর আদায় জন্য দুইটি বিভাগ স্থাপিত হয়—হুজুরি ও নিজামত। হুজুরি বিভাগ প্রাদেশিক দেওয়ান খানার অধীন হয়। দেওয়ানখানা মুর্শিদাবাদে স্থাপিত থাকে। ঢাকায় পূর্ব্বের ন্যায় ডিপুটী দেওয়ানের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজামতের সেরেস্তা ডিপুটী দেওয়ানের

অধীন হয়। এতৎ প্রদেশের করসংগ্রহ ও ভূমির বন্দোবস্তের কার্য্যভার ডিপুটী দেওয়ানের হস্তে থাকে। নিজামতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারভার ন্যস্ত হয়।*

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ড রাজস্ব পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করেন। ঢাকা বিভাগের রাজস্ব পরিদর্শক (Superintendent of Revenue) ঢাকা আসিয়া দপ্তর খুলিলে দেওয়ানী ও নিজামত উভয় বিভাগ তাঁহার অধীন নীত হয়। (১)

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গলার গবর্ণর হইয়া রাজস্ব পরিদর্শকের পদগুলি উঠাইয়া দেন ও কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন। সেই সময় দেওয়ানী আদালতেরও সৃষ্টি হয় এবং কালেক্টর তাহার কর্ত্তা (Superintendent) হন। (২) মুর্শিদাবাদের রাজধানীও কলিকাতায় পরিবর্ত্তিত হয়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় রাজস্বকর্ম্মচারী অত্যাচারী রেজা খাঁ বিতাড়িত হন; এবং তৎপরিবর্ত্তে মিডলটন প্রতিষ্ঠিত হন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া সুশাসনে প্রবৃত্ত হন। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা রাজ্য একরূপ অরাজক অবস্থায় চালিত হইয়াছিল।(৩)

* L. Cley's report on Dacca Dist.
(১) Do (২) Do
(3) "During this period (1765—1772) there could scarcely be said to have been any Government at all." Marshman's History of Bengal, page 113.

রেজা খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া হেষ্টিংস পুনরায় এতদ্দেশের রাজস্বের নূতন হিসাব ধার্য্য করিলেন। তাহার ইঙ্গিত অনুসারে রাজস্বকর্ম্মচারী মিডলটন নূতন বন্দোবস্ত ধার্য্য করেন। মিডলটনের বন্দোবস্তে বহু জমিদার নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা খাজানা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে পারিলেন, তাঁহারা জমিদার রহিলেন, যাঁহারা পারিলেন না, তাঁহারা জমিদারী ছাড়িয়া দিলেন। বৃদ্ধি ডাকে একের পৈতৃক জমিদারী অপরে গ্রহণ করিল। এদিকে রাজস্বের কিস্তিতে সে বৎসর সরকারী রাজস্ব কম উশুল হইল। হেষ্টিংস চিন্তিত হইলেন।

হেষ্টিংস রাজস্বের নূতন উপায় চিন্তা করিয়া চারি জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত করিলেন। কমিটি মফস্বলে যাইয়া ভূমি তদন্ত করিয়া খাজানা ধার্য্য করিতে লাগিল। এই কমিটি "কমিটি অব সার্কুট" নামে পরিচিত ছিল। এই বার জমিদারদিগের আরও সর্ব্বনাশ হইল। রেজা খাঁ বৃদ্ধিহারে খাজানা ধার্য্য করিয়া অত্যাচারীরূপে বর্ণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মিডলটন রেজা খাঁর নাম লোপ করাইয়াছিলেন। এখন "কমিটি অব সার্কুট" মিডলটনকেও পরাজয় করিল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উপদেশ ও শাসন নিয়মানুসারে, কমিটি পাঁচ বৎসরের জন্য মহাল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মহাল ডাক হইতে লাগিল। যে বৃদ্ধিহারে রাজস্ব

স্বীকার করিল, সেই মহাল গ্রহণ করিল। এইরূপে রামের লক্ষ টাকা রাজস্বের পৈতৃক জমিদারী শ্যাম লক্ষের উপর বিংশতি মুদ্রা অধিক ডাকিয়া লইল। জমিদারগণ পৈতৃক জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া, অত্যাচারী রেজা খাঁর আশীর্ব্বাদ করিয়া, নীরবে অশ্রুপাত করিল। (১) এইরূপ স্থলে পূর্ব্ব মালীক রাজস্ব হইতে কিছু কিছু খোরাকী পাইতেন মাত্র (২)। এইরূপ ডাক বিলিকে ইজারা বলা যাইত। এইরূপ বন্দোবস্তে সরকারী খাতায় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু কিস্তির সময়ে উশুল সেরূপ হইল না।

ইজারাদারগণ মহালে প্রবেশ করিয়াই জমিদারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দিতে লাগিলেন। কেহ প্রজার উপর পীড়ন করিলেন; প্রজা জমিদারের ইঙ্গিতে বাড়ী ঘর ত্যাগ করিল। ভূমি পতিত পড়িল, সুতরাং খাজানা বন্ধ হইল। ইজারাদারও কিস্তিবন্দি মতে দেয় পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে দুই বৎসর চলিলে পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এতৎ প্রদেশের জন্য ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার অধীনে স্থানে স্থানে নায়েব নিযুক্ত হয়। নায়েব ইজারাদার হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই নায়েবদিগের উপর দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। মন্ত্রিসভার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা থাকে। ময়মনসিংহের রাজস্ব এই মন্ত্রিসভার অধীন ছিল। বিচার-শাসন পরগণার জমিদারেরা করিতেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস জমিদারদিগকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ একখানা সনন্দের অনুলিপি উদ্ধৃত করিলাম।

"পরগণে ময়মনসিংহের ॥• আনা হিস্যার অর্দ্ধেক ।• আনী হিস্যাতে চৌধরাই পদে নিযুক্ত হইলেক।

(১) "The actual collection was managed by the farming system according to which tenders were invited for each purganah * * * A settlement for five years (1772—1777) was concluded with the highest bidder, whether they were the prervious Zaminders or not" W. W. Hunter's a dessertation on landed property &c &c.

(২) When Zaminders were thus ousted a subsistance allowance was granted to them out of the Revenue. W. W. Hunter's a dessertation on landed property & &

Mns no 1300.

N. B. Sanad to Ratan Mala and Narayani, the widows of Krishno Kishor. granting to them the right of the 8 ans Division of Mymensing and Jafarsahi formerly employed by...(illegible) Registered by order of the Hon'ble the Resident and Council of Revenue at Fort William.

The 12th. July 1774.

জাহাঙ্গীর নগরের মোতালক বৈকুণ্ঠ তুল্য বাঙ্গালাদেশের পরগণে ময়মনসিংহ ও জফরসাহী সরকার বাজুহার ও গয়রহ চাকলে ঘোড়াঘাটের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কার্য্য নির্ব্বাহের দেওয়ান মুন্সী ও চৌধুরীয়ান ও কাননগোয়ান ও প্রজাগণ ও জিরাতিয়ান মোজাক অর্থাৎ খাজানা বেশী করার ক্ষমতাপ্রাপ্তগণ অবগত হও যে কৌন্সিলের আদেশ হইয়াছে যে উপরোক্ত পরগণা জাতের ॥০ আনী হিস্যার অর্দ্ধেক ।০ আনী হিস্যা কৃষ্ণকিশোর রায়ের দখলে যে ছিল তাহাতে তৎস্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা (২) নারায়ণী হকদার সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার সনদ উল্লিখিত রত্নমালা ও নারায়ণীকে দেওয়া যায় অর্থাৎ তাহারাই হকদার হইলেক আর উল্লিখিত পরগণা জাতের ॥০ আনা হিস্যার অর্দ্ধ ।০ আনা হিস্যাতে কৃষ্ণকিশোর রায়ের চৌধুরাই পদের স্থলে রত্নমালা ও নারায়ণী নিযুক্ত হইলেক। আর উল্লিখিত পদের কার্য্য খুব মনোযোগের সহিত দস্তুর মতে শাসন সমরক্ষণ করে যাহাতে কোন এক বিষয়েরও ত্রুটি না হয়, সরকারি খাজনা সময় মতে উশুল তহশীল করিতে থাকে আর প্রজা ইত্যাদির প্রতি সংবিচার কর আর খাজানা ও জিরাতি বেশী হওয়ার চেষ্টা করিবা আর আপন জায়গাতে চোর এবং ডাকাইতকে স্থান দিবা না আর রাস্তা ঘাটের বিশেষরূপ খবরদারি করিবা যাহাতে পথিকগণ খাতিরজমার সহিত আইসা যাওয়া করিতে পারে আর যদি কেহর মাল চুরি যায় তবে চোর ডাকাতকে মালসহ গ্রেপ্তার করিয়া মালিককে মাল দেওয়াইয়া ঐ চোর ডাকাইতদিগকে সাজা দিবা যদি গ্রেপ্তার করিতে না পার তবে কেন পারিলা না তাহার কারণ দর্শাইবা আর প্রত্যেক বৎসরের কাগজাত সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করিবা। আর বাজে অর্থাৎ সাধারণ লোক হইতে কোন রকমের জমা লইবা না। উপরোক্ত হুকুম সমস্তের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগী থাকিবা। ইংরেজী সন ১৭৭৪।১২ই জুলাই বাঙ্গালা সন ১৮১। ৩১শে আষাঢ়।

জাহাঙ্গীরনগরের মোতালক বৈকুণ্ঠ তুল্য বাঙ্গালা দেশের ও জাফরসাহীর সরকার বাজুহার ও গয়রহ চাকলে ঘোড়াঘাটের মৃত কৃষ্ণকিশোরের হিস্যাতে উক্ত কৃষ্ণকিশোরের স্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা ও (২) নারায়ণী কৌন্সি হইতে মকরার হইলেন। কিসমত পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহার কিসমত পরগণে জফরসাহী সরকার চাকলা ঘোড়াঘাট।"

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইজারা ম্যাদ উত্তীর্ণ হইলে সকাউন্সীল গবর্ণর জেনারেলের অনুমতিক্রমে পুনরায় পরগণা ও মহালগুলি এক বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত হয়। এইরূপ বাৎসরিক ম্যাদি বন্দোবস্ত ১৭৮১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময় কোম্পানীর পক্ষে রেনেল সাহেব বাঙ্গালার ভূমি জরিপ করিয়া দেশের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। রেনেলের মানচিত্রে বহু প্রাচীনতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই মানচিত্র বর্ত্তমানসময়ে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী কলিকাতাতে রাজস্ব আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত উদ্ভাসিত হয়। ৫ জন সভ্য লইয়া গবর্ণর জেনারেলের নিম্নে বোর্ড অব্ রেভিনিউ নামক সভার সৃষ্টি হয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রেসিডেণ্টদিগকে প্রাদেশিক কমিশনারের পদে স্থাপন করা হয় ও প্রদেশে প্রদেশে কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। এই কালেক্টরগণ কোথাও Resident কোথাও Chief এবং কোথাও বা Collector বাচ্যে অভিহিত হইতেন। এই সময় বিচার কার্য্যের জন্য স্থানে স্থানে জজের পদও সৃষ্ট হয়।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডে (Dey) ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও মিঃ ডানকেনসন (Duncanson) জজ নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইহারাই ঢাকার প্রথম মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও জজ। তৎকালে ঢাকা কালেক্টর চিফ নামে (Chief of Dacca) অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহের রাজস্ব বিভাগ তখন প্রধানতঃ ঢাকার চিফের অধীন ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের কোন কোন স্থান শ্রীহট্ট ও সেনবরসের অধীন ছিল। বগুরা, রংপুর প্রভৃতিস্থান সেনবরসের অধীন ছিল। এই সময় বাঙ্গালায় ভীষণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ময়মনসিংহ জেলায় বিস্তৃত হয়।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

অভিশাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীগৃহে।

দুই দিবস শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া যথা সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ পত্নীকে লইয়া বাটিতে আসিয়াছেন। হিরণ গৃহস্থের কন্যা, এই বয়সে অনেক কাজ শিখিয়াছে। শ্বশুর বাড়িতে গুরুজনদিগের সহিত কিরূপ ভাবে কথা কহিতে হইবে, কনিষ্ঠদিগকে কিরূপ যত্ন করিতে হয়, ননদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, উচ্চৈস্বরে কথা কহিতে নাই, সর্ব্বদা মাথায় কাপড় দিয়া থাকিতে হয়, যে যাহা বলিবে শুনিতে হয়, ইত্যাদি সকল কথা মাতা কন্যাকে স্বামীগৃহে আসিবার কালে তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। হিরণ্ময়ী স্বভাবতঃই সুশীলা, মাতার উপদেশ মত সকল কার্য্য করিতে লাগিল, এবং শীঘ্রই সংসারের সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিল।

হিরণ এবার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া একটি নূতন লোককে দেখিতে পাইলেন, সে— শৈলজা। শৈলজা অমরনাথের স্ত্রী, বয়স পঞ্চদশ অতীত হইয়াছে মাত্র; আর হিরণ্ময়ীর বয়ক্রম ত্রয়োদশ চলিতেছে। এক্ষণে

শৈলজাই হিরণের একমাত্র সঙ্গিনী বলিলেই হয়। আর দুই তিন বৎসরের ছোট বড়তে বড় আসিয়া যায় না। সত্যেনের বিবাহের সময় শৈলজা সূতিকাঘরে ছিলেন; সেই কারণে তখন হিরণের সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই। শৈলজাকে প্রায় সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, সেই জন্য প্রত্যহ রায়দের বাটীতে আসিবার সুবিধা পান না, তথাপি অন্ততঃপক্ষে এক দিন অন্তরও আসিয়া থাকেন। সন্ধ্যা হয় হয়, সূর্য্যদেব সমস্ত দিন নিজ তেজোময় কিরণ ছড়াইয়া এক্ষণে চক্রবাল ত্যাগ করিয়াছেন। বিহগগণ একে একে আকাশ মার্গ দিয়া নিজ নিজ নীড়াভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। চাষারা শূন্যছালা পৃষ্ঠে বলদ তাড়াইয়া দূরস্থিত হাট হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। আর ফাল্গুনের নাতিশীতোষ্ণ মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ পার্শ্ববর্ত্তি কাননের আম্রমুকুলের মধুর বাস বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রায়দের বিশাল মুক্ত ছাদে চারিধারে উচ্চ আলিসা দেওয়া। হিরণ ও শৈলজা তথায় বসিয়া কথা কহিতেছেন।

হিরণ। তুমি যদি ভাই মাঝে মাঝে আস, তা হ'লে আমার আর কোন কষ্ট হয় না। সমস্ত দিন, কাকীমা কি ঠাকুরমা, পিশিমাদের কাছে বসে থাক্‌তে আমার ভাল লাগে না।

শৈলজা। মা একলাটি, তাই ভাই এলে চলে না। তুমি সরোজিনীর সঙ্গে খেলা করতে পার না?

হিরণ। ওদের সঙ্গে আমার ভাল লাগে না; ওদের আর কিছু নাই,—কেবল ঠাট্টা। আর ওদের সঙ্গে মিশতে আমার বারণ করেচে।

শৈলজা। কে, বড় ঠাকুর বুঝি বারণ করেছেন?

হিরণ চুপ করিয়া রহিল। শৈলজা বলিল, "বুঝিচি। হাঁ ভাই, আজকাল বড় ঠাকুরের কাছে আর লজ্জা তত করে কি? কাল কি কথা হলো?"

হিরণ। তোমাদের কি কথা হয়েছিল আগে বল?

শৈলজা। আমাদের কথা ভাই আর কি শুনবে, প্রথমে ত ঘরে ঢুকেই খোকার সর্দ্দি হয়েচে বলে আমায় বকুনি। তার পর ঐ কথা নিয়ে খানিকক্ষণ গেল। তোমার কাছে এসেছিলুম কি না জিজ্ঞাসা করলে। তার পর কি দুটো চারটে কথা হল অত মনে নাই।

হিরণ। হাঁ ভাই, ঠাকুরপো তোমায় খুব ভালবাসে না?

শৈলজা কি বলিতে যাইতেছিল এই সময় ঠাকুরমা ছাতে আসিয়া বলিলেন,—"ওমা, এই ভর্ সন্ধ্যা বেলা দুটিতে ছাতে বসে আচ, আমি বলি নাত্ বৌ গেল কোথা। শৈল! তুইত ভাই জানিস, এই খোলা ছাতে থাকতে আছে?"

শৈলজা। এই যাই ঠাকুরমা, বেশ হাওয়া দিচ্চে, বৌ দিদির সঙ্গে বসে গল্প কয়চি। তুমি ত ভাই আর সে সব গল্প টল্প বল না।

ঠাকুরমা। এখন কি আর বুড়ীর সে গল্প ভাল লাগে, এখন সব বৌদের গল্প যে শুন্‌বে। আজ দুপুর বেলা মনে করেছিলুম বিকেলে একবার নাত বৌয়ের কাছে যাব। ছোট বেলা, সময় পাই নে।

শৈলজা। এমন কি কাজ ঠাকুর মা যে, এমন টুকটুকে নাত্‌ বৌয়ের কাছে দু দণ্ড বসে কথা কইতে পার না?

ঠাকুরমা। 'মন বোঝে না তীর্থ করি,
মিছে কাজে ঘুরে মরি।'

শৈলজা। ঠাকুরমা, বেস ছড়া কাট্‌তে পার

ঠাকুরমা। নাত বৌ আমার সঙ্গে কথা কয় না তাইত আসি না। এমন সন্ধ্যাবেলা ছাতে থাকে না, নীচে চল।

তিন জনেই দ্বিতলে নাবিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া শৈলজা হিরণ্ময়ী ও ঠাকুরমার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। হিরণের বিশেষ ইচ্ছা হইতেছিল, যে কল্য আসিবার জন্য বলিয়া দেয়, কিন্তু ঠাকুরমা থাকাতে লজ্জায় বলিতে পারিল না।

যে দিন শৈলজা আসে, সেই দিনই উভয়ে, বাটীর যে স্থানে হয়, নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপে গল্প করিয়া থাকে। হিরণের এই শৈলজার সংসর্গ বড়ই তৃপ্তিকর বোধ হয়। কুসুমহাটিতে পিতৃগৃহে সে সর্ব্বদাই কএকটি সমবয়স্কা সখিদের সহিত থাকিত। সেই কারণে অন্যান্য সহচরী অভাবে শৈলজাকে মনোমতরূপ পাইয়া এত শীঘ্র তাহার সহিত এতদুর সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছে। এখানে আসিয়া হিরণের সঙ্গিনীর অভাব ভিন্ন আরও দুই একটি কারণে তাহার মনটা একটু কেমন কেমন লাগিত। সংসারের সামান্য বালকবালিকা হইতে প্রাচীনাগণ পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সর্ব্বদা অত্যন্ত আদর যত্ন করে, ইহা তাহার আদৌ ভাল লাগে না। "বৌ মার খাওয়া হলো না," "আজ বৌ মার পেট্‌ ভরে নি," "বাপেদের গাই আছে, বৌ মার ভাল দুধ খাওয়া অভ্যাস, তাই এখানকার গয়লাবাড়ীর দুধ খেতে পারে " "ক'দিনে বৌমা রোগা হ'য়ে গেল ইত্যাদি প্রকার মন্তব্য তাহার নিকট প্রীতিকর নহে। সংসারে এত লোক থাকিতে, কি কারণে সকলে এই দরিদ্রের দুহিতার প্রতি এত প্রখর দৃষ্টি, এত স্নেহ, যত্ন, আদর করে, তাহা সে বুঝিতে পারে না; আর সেই কারণেই ইহাতে তাহার বিরক্তি আনয়ন করে। তাহার ইচ্ছা সকলের ন্যায় সেও একজন থাকে; ইচ্ছামত কাজকর্ম্ম করে, আহারাদি নিজ অধীনে থাকে। নববিবাহিতার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুযায়ী, হিরণ বাটীর অপর সকলের উঠিবার অগ্রে, প্রত্যূষে শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসে। বেলা ১১।১২ টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বসিয়া দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দেয়। তাহার পর হইতে 'শৈলজা কখন আসিবে, আজি যদি আসে ত বেস হয়' ইত্যাদি চিন্তায় অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত কাটে। যদি সে আইসে, ত সমস্ত দিনের একাকিনী থাকার ক্লেশ সব ভুলিয়া যায়।

সে চলিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর হইতে স্বামী-সন্দর্শন-লালসা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং সে দিন কি কথা কহিবে, তাহারই একটা প্রোগ্রামের খসড়া মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে। যে দিন শৈলজা না আইসে, প্রকৃতই সে দিন মন খারাপ হইয়া যায়, আবার রাত্রি সমাগমের সহিত স্বামীর কথা মনে আসিয়া মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে।

যুবকযুবতীদিগের লজ্জা বালির বাঁধ সদৃশ। একবার কোন প্রকারে ভাঙ্গিলে আর রক্ষা নাই, অচিরে সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। হিরণের সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, বাকি সামান্য মাত্র। আর, এ বয়সে ঘর করিতে আসিয়া যদ্যপি এখনও স্বামীর নিকট লজ্জা করিবে, তাহা হইলেই বা এই সভ্যতা-প্লাবিত উনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্য কি? এখনও তাহার অন্তরে যে লজ্জাটুকু আছে, তাহা স্বল্পে অপসারিত হয় না, তাহা হইবার নহে। সেই টুকু সরাইবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ ইচ্ছুক, যেন তাহা হইলেই তিনি কৃতার্থ বোধ করেন। হিরণ স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্ত তাহা ত্যাগ করিতে অভিলাষিণী, কিন্তু সম্প্রতি তাহা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত। যাহা হউক,সত্যেন্দ্রনাথ স্বীয় ভার্য্যার চরিত্রে বড়ই সন্তুষ্ট।

সত্যেনের খুড়িমাতার ইচ্ছা বউ-মা এখন আর তত ছেলে মানুষ নাই, কিছুদিন এই স্থানে থাকে। কিন্তু আবার পাঁচ জনের কথায়, কিছু দিনের জন্য পাঠাইয়া শীঘ্রই পুনরায় আনিবেন, ইহাই শেষ স্থির করিলেন। হিরণ্ময়ী কিছু কম একমাসকাল স্বামীভবনে বাস করিয়া অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন পূর্ব্বক পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মালতীর সহিত পুনর্ম্মিলন।

হিরণ চলিয়া গেল। কএক দিনের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার বিরহ বিশেষরূপে অনুভব করিলেন। আর বলিতে কি যাইবার কালে হিরণ যদিও আনন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে যাইল, কিন্তু দুই পাঁচ দিবস যাইতে না যাইতেই সেও বুঝিল, যে তাহার হৃদয়ের কিছু অংশ তাহার অজ্ঞাতসারে মাণিকনগরে শ্বশুর বাড়ীতে রহিয়া গিয়াছে। হিরণ মাতুলালয়ে, পিতৃষসা বা মাতৃষসা গৃহে অনেক বার গিয়াছে, কখনও বা কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া আসিয়াছে; ফিরিয়া আসিলে হয় ত কাহারও কাহারও জন্য মন কেমন করিয়াছে; কিন্তু একবারও এরূপ ভাব অনুভব করে নাই। তাহার এই প্রথম, কিন্তু সত্যেনের তাহা নয়।

হিরণ মাণিকনগরে থাকিতেই সত্যেন মালতীর কলিকাতা গমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে মালতীর জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন, মালতীও সে সংবাদ অবগত আছেন। সত্যেন্দ্রনাথ পৌষ মাসে মালতীর সহিত সাক্ষাৎকারলাভে বিফলমনোরথ হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিবার পরই, সেই ভাড়াটিয়া বাটীর অধিকারীকে

পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সে বাড়ী শূন্য হইলেই যেন তাঁহাকে সংবাদ প্রেরণ করে। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্কল্প এক্ষণে পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তিনি কলিকাতায় মালতীর দর্শন না পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাণিকনগরের কোন স্থানে আনিয়া রাখিবেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে সঙ্কল্প নাই, কারণ, মাণিকনগরে আনিয়া, গুপ্তভাবে রাখার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। এই কারণে তিনি স্থির করিয়াছেন, যখন সুবিধা হইবে, সেই বাটীতে দুই পাঁচ দিনের জন্য থাকিয়া, তাঁহার সহিত পূর্ব্বমত দেখা সাক্ষাৎকার করিবেন। এই সঙ্কল্পের মূল মালতীর বড় দাদার কলিকাতা হইতে বদলি হওয়া।

যে সময়ে হিরণ্ময়ী ছিল, তখন মালতীর কথা সর্ব্বদা মনে আসিলেও, সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয় তাঁহার দর্শনলালসায় পীড়িত হইত না। এক্ষণে হিরণ বাপের বাড়ী গিয়াছে, তাঁহার চিন্তায় সত্যেনের কয়দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু আবার সেই ভস্মাচ্ছাদিত অনল জ্বলিয়া উঠিল। সত্যেন শুনিয়াছিলেন, ফাল্গুনের শেষে সেই বাটীটি শূন্য হইবার কথা আছে, চৈত্রের প্রায় আধা আধি হইয়া গেল, তিনি গৃহস্বামীর পত্র পাইলেন। এইবার তিনি কলিকাতায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি প্রকারে খুল্লতাতের অনুমতি গ্রহণ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে অন্য উপায় না দেখিয়া, কলিকাতায় জামাজুতা কিনিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া শচীকান্ত বাবুর অনুমতি গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কখনও জামাজুতা কিনিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথের কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হইত না, ইহা শচীকান্ত বাবুর স্মরণ ছিল; তথাপি তিনি যে কোন আপত্তি করিলেন না, তাহার কারণ তিনি ভাবিলেন সত্যেন ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, হয়ত বা বৌমার জন্য কোন কিছু আনিবে, এক্ষণে একটু একটু করিয়া স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় যাইয়া প্রথমে সেই বাড়ীটি ভাড়া করিলেন। মালতী সত্যেনের কলিকাতায় আসিবার কোন সংবাদ জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই। সত্যেন অবিলম্বে দ্বিতলে উঠিয়া সাত মাস পরে আবার সেই বাতায়ন সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন, নিতান্ত সম্মুখে দাঁড়াইতে কেমন বাধ বাধ বোধ হওয়াতে একটু সরিয়া কাখির আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মালতীদের গৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া গৃহকুট্টিম পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, বারেন্দায় যে স্থানে সোপান সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাও বেস স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মালতীর ছোট ভাই উপরে উঠিল, মনে হইল এইবার মালতী আসিবে; পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে কে কথা কহিল, মনে হইল বুঝি মালতী। এইপ্রকার কএক দণ্ড কাটিলে পর যথার্থই কএকটি কমলা লেবু হস্তে মালতী আসিলেন, আর একটি, স্ত্রীলোক, সম্ভবতঃ দাসী

সঙ্গে সঙ্গে আসিল। মালতী বাক্স খুলিয়া কএকটি পয়সা তাহার হস্তে দিল, সে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্রনাথ মালতীর কৃশ অঙ্গ ও মলিনা মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—"এই কি সেই মালতী?" তিনি যে তাঁহারই জন্য এরূপ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া বড় কষ্ট হইল। পাছে আবার অন্যত্র চলিয়া যান, এই মনে করিয়া মনের আবেগে ঈষৎপ্রস্ফুটস্বরে সত্যেন ডাকিলেন,—"মালতী।"

মালতী অনেক দিনের পর সেই হৃদয়ালোককরী, অশেষ সুখের আকর সত্যেন্দ্রনাথের কথা দূর হইতে অস্পষ্টভাবে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, ফিরিয়া দেখিবামাত্র চক্ষে চক্ষে মিলিত হইল। মালতী ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসিলেন "কখন আসিয়াছ, আর কে বাটীতে আছে" ইত্যাদি। মালতী সত্যেনের আশা ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন, এখন তাঁহাকে দেখিয়া মনোমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণনার অসাধ্য। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে থাকিয়া উভয়ের রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। মালতীর মাতা নিম্ন হইতে ডাকিলে পর, "রাত্রিতে দেখা হইবে।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যেনও বৈকালিক আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি শেষ করিয়া বাসা হইতে বহির্গত হইলেন।

মালতীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া কলিকাতায় নাই, জননী বৃদ্ধা, এখন আর মিলনের পথ অধিক বিপদসঙ্কুল নহে। গভীর রজনীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া, জননী ও বালকেরা নিদ্রিত হইলে, অভিসারিকা ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একবারে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন। আজি আর সে উন্মুক্ত ছাদে নহে। আজি এক নিভৃত কক্ষে প্রেমিক প্রেমিকায় মিলন হইল। সত্যেন মালতীকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন,—"মালতী! তোমার এ কি, এমন চেহারা কেন?"

"তুমি বেস ভাল আছ? বিবাহ এখন হ'ল না কেন?"

সত্যেন পত্রে বিবাহের কথা মালতীর নিকট গোপন করিয়াছিলেন, তিনি এইমাত্র লিখিয়াছিলেন যে, কোন কারণে উপস্থিত বিবাহ হইবে না। মালতীর নিকট বিবাহের কথা আজিও গোপনে রাখিবেন এইরূপ মনস্থ ছিল, কিন্তু তাহা আর পারিলেন না। ভালবাসা যদি প্রকৃত হয়, তবে তাহার নিকট বড় লুকোচুরি চলে না। সত্যেন মালতীর এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক্ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না। বলিলেন,—'মালতী, আমি বিবাহ করেছি; অপর সকলের সন্তোষের জন্য, আমার সন্তোষের জন্য নহে।"

মালতী যেন একটু স্তম্ভিত হইলেন, বলিলেন,—"কবে বিবাহ হ'ল আমায় লেখ নি কেন?"

"কেন লিখি নি মালতী, তা আমি নিজেই জানি না, লিখতে ইচ্ছা করিলে কে যেন আমার হাত চেপে ধর্‌ত।"

"তাতে দোষ কি করেচ, একটা সামান্য বিধবার জন্য বিয়ে করবে না ! কেমন বৌ ? বেস মনোমত হয়েছে ত ?"

সত্যেন এইবার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। প্রকৃতপক্ষে ভার্য্যা মনোমতই হইয়াছে, কিন্তু এ কথা মালতীকে বলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"দোষ, আমার সহস্র দোষ ; আমারই জন্য তোমার শরীরের এ দশা, আর আমার দোষ নাই ? মালতী, তোমায় ছুঁয়ে তোমার শপথ করে বলচি, এ বিবাহ সত্যই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে।"

"কেন সত্যেন তুমি মনকে অন্যায় কষ্ট দিচ্চ ? আমি তোমার স্মৃতিতে সুখ বোধ করি, আমি আর কিছু চাহি না, যে ক'দিন মালতীকে মনে থাকবে, এই রকম মাঝে মাঝে যেন একবার দেখতে পাই। জেনো সত্যেন, তা হলেই এ হতভাগিনীর যথেষ্ট হবে। তুমি আমায় ভালবাস একথা মনে হ'লে আমার আর কোন কষ্টই থাকে না।"

*　　　　*　　　　*

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনের অনেক কথা হইল। মালতীর শুষ্কপ্রায় হৃদয়ে অনেক দিনের পর আবার একবিন্দু শীতলবারি পতিত হইল। কিন্তু বিধাতা বিমুখ, মানব কি করিতে পারে ! সে বারিকণা পড়িতে না পড়িতেই, দুষ্ট কীটে পান করিয়া ফেলিল। সে কীটটি—চিন্তা।

মালতী সত্যেনের বিবাহের কথা শুনিয়া যে, নিরাশার ব্যথায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, তাহা নহে। সত্যেন তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন তাহা জানেন, তথাপি তিনি যে চিরদিন তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী থাকিতে পাইবেন, এ দুরাশা মনে কখনও স্থান দেন নাই। তবে কেন মালতী প্রাণপ্রতিমের অর্দ্ধাঙ্গিনী লাভের কথা শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। দুঃখে, অভিমানে, ক্রোধে বা সত্যেন্দ্রনাথের তাঁহার প্রতি ভালবাসার লাঘব হইয়াছে মনে করিয়া তিনি চিন্তিত হন নাই। পরিণামে পত্নীপ্রেমে যখন হৃদয় পূর্ণ হইবে, তখন সত্যেন নিজ অন্তর হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিবেন, এ ভাবনাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মালতী নিজ অদৃষ্টের পরিণাম চিন্তা করিতে জানেন না বা করেন না। যদি কখন সে চিন্তা করিতে যান, তাহা হইলে অন্তশূন্য অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। সুতরাং যে কয়দিন আলোকে আলোকে যায়, বেস, এই মনে করিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

সত্যেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম প্রণয়ের কালে মালতী যে ভাবের কোন কথা মনে আসিতে দেন নাই, এক্ষণে তাহা মনে হইল। সত্যেন্দ্রনাথের সরলা বালিকা পত্নীর সুখের পথে কণ্টক হইবেন ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"আমি দরিদ্র বিধবা, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত, তখন পরের হৃদয় অধিকার করিয়া আর একজনকে কাঁদাইবার আমার কি অধিকার আছে ? কাঁদিতে হয় আমি কাঁদিব, মানস

মধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া দিবানিশি দেখিব, তাঁহার অমৃতময় স্মৃতিতে হৃদয় আচ্ছন্ন রাখিব, তাঁহাকে আর আমার চিন্তা মনে রাখিতে দিব না, তাঁহার সংসার-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আমি কে? এখন আর তাঁহাকে আমার বলিবার অধিকার নাই, সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে।"

মালতি! এই সুযোগ। মানস-তরী ফিরাও, এই চিন্তার অবসানের সহিত তোমার সকল চিন্তা দূর হউক। তোমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিভিন্ন। এই সুযোগ ছাড়িলে বুঝি বা আর ফিরিতে পারিবে না, অকূলে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ চারি পাঁচ দিবস কলিকাতায় থাকিয়া বাটী ফিরিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু হইয়া গেল দশ দিন। পাছে পিতৃব্যের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই মনে করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও বাটী ফিরিলেন। বড় সুখেই এই দশটি দিন কাটিল। সত্যেন ভাবিলেন,—এ সুখের তুলনা নাই; মালতী জগৎপিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, বুঝি স্বর্গের উপাদানে গঠিত।

মালতী অনেক কষ্টে দুই তিন দিন চেষ্টা করিয়া নয়নের জল ফেলিতে ফেলিতে সত্যেনকে আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সত্যেন তচ্ছ্রবণে হাসিতে হাসিতে "তাই করা যাবে, এতদিন যে আমার হৃদয়-রাজ্যটি অধিকার ক'রে বসে ছিলে, তার করটি এখন দেয় কে?"—এই কথা বলিয়া প্রণয়ের বিবিধ মধুর প্রক্রিয়ায় সব ভুলাইয়া দেন। মালতী আবার মনে মনে অমনি বলিয়া উঠেন "না না, এ সোনার বাতি নিবাইতে পারিব না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মালতী ডুবিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বর্ণিত সময়ের পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র-নাথের সরলতা, দয়া, মমতা তেমনই আছে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে একটি মহা-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। হিরণ্ময়ী এখন নিজ ঘর সংসার চিনিয়াছে, এখন আর সেই অবগুণ্ঠনবতী কনে বৌয়ের বিষম লজ্জা তাঁহার নাই। হিরণ এক্ষণে মূর্ত্তিমতী সরলতার সদাপ্রফুল্ল হাস্যময়ী প্রতিমা, রায়েদের বাটীর যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। হিরণের সরলতা, স্নেহ, ভক্তি, ও দয়া দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার এই নূতন জীবনে নূতন সুখের সময় দুঃখ একটি।

দর্শনেই দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়, অদর্শনে তাহার হ্রাস হইয়া থাকে। মালতীর সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারের পর হইতে সত্যেনের মালতী-প্রেম পুনরায় যেন নবীন ইন্ধন সহযোগে হুতাশনের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে এমন হইল যে, মালতীকে অন্ততঃ মাসের মধ্যে একবার না দেখিলে চলে না। প্রথম কএকবার শচীকান্ত বাবুর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, কেবল মাত্র খুড়ী মাতাকে

বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর তাহাও আর অধিক দিন পারিলেন না; পাছে বাটীর সকলে উদ্বিগ্ন হন, কেবল মাত্র এই কারণে কোন সরকার গোমস্তাকে বলিয়া যাইতেন, 'কলিকাতায় প্রয়োজন আছে, কাকা খুঁজলে পরে বোলো।' আর হিরণ্ময়ী যখন থাকে, তাহাকে কখনও একটা কাজ আছে, কখনও নিমন্ত্রণ আছে, ইত্যাদি প্রকার বলিয়া যান। সরলা হিরণ বা খুড়ী মাতা যাহাই বুঝুন, আগতবার্দ্ধক্য বিজ্ঞ শচীকান্তের কিছুই বুঝিতে বাকি নাই। তিনি পুত্রাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের এবংবিধ আচরণ ও চরিত্র দর্শনে বিশেষ চিন্তান্বিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। সত্যেনের প্রতি তিনি কখনও কঠিন হন নাই, এক্ষণে তাঁহাকে সংশোধিত করিতে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথার কৌশলে দুই একবার তিনি সত্যেনকে বলিয়াছিলেন, যে এখন তাঁহার বয়স হইয়াছে, আর শুধু আমোদ করিয়া বেড়াইলে ভাল দেখায় না, কাজকর্ম্ম দেখা কর্ত্তব্য। সে সকল কথায় সত্যেন্দ্রনাথ নিরুত্তর থাকিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। কখনওবা পিতৃব্যের কথা বুঝিতেন, কখনওবা বুঝিতেন না; যাহা হউক ফলে তাঁহার কথায় কোন উপকার দর্শে নাই।

ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, সত্যেন্দ্রনাথের উচ্ছৃঙ্খল ভাব হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শচীকান্ত বাবু বিষম চিন্তায় দিনে দিনে বিমর্ষ হইতে লাগিলেন। তাঁহার অতুল বৈভব, দেশপূর্ণ সম্ভ্রম তাঁহার অবর্ত্তমানে কি প্রকারে রক্ষা হইবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি অধীর হইতে লাগিলেন। কি করিলে সত্যেনকে ফিরাইতে পারেন, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারেন না। উপায় ও ক্ষমতা থাকিতে যদি সেই উপায় অবলম্বন করিতে বা সেই ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে যে অশান্তি ও অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, তাহা অপরকে বুঝান যায় না। মনের প্রতিকৃতি গ্রহণের যন্ত্র আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। শচীকান্ত বাবুর ক্ষমতা আছে, উপায়ও কতকটা ভাবিয়া আনিতে পারেন, কিন্তু কিছুই করিতে সাহস করেন না, ভাবেন সব একালের ছেলে, পাছে হিত করিতে বিপরীত ঘটে, পাছে অধিক পীড়াপীড়ি করিলে বাটী হইতে একবারে চলিয়া যায়। তিনি বিরক্ত হইয়া অবশেষে একদিন সত্যেনকে নিকটে ডাকিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,— "সত্যেন! তোমার মনোগত কথা খুলিয়া বল। এখন তুমি আর বালক নহ, সকল বিষয় বুঝিতে পার, তোমার জ্ঞান হইয়াছে, প্রতিদিন বলা বা তিরস্কার করা ভাল দেখায় না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর কত দিনই বা বাঁচিব, এসময় তোমাকে এরূপ দেখিয়া আমি বড় মনের কষ্টে আছি। তোমার এখন কর্ত্তব্য সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে সকল চিন্তা হইতে অবসর দেওয়া। আর তুমি কিনা তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের পিতাপিতামহের নাম সম্ভ্রম

সব ডুবাইতে বসিয়া আমায় চিন্তার সাগরে মগ্ন করিতেছ। তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে বলিলেই পাইবে, তোমার পৃথক বৈঠকখানা আছে বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আপনার বিষয় কার্য্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। তোমার যদি কোন সখ থাকে আমায় বলিও, আমি তাহা মিটাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। বোধ হয়, সত্যেন, আর তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না। এখন হইতে তোমাকে সাবধান ও সৎপথে চলিতে দেখিলেই পরম সন্তোষ লাভ করিব।"

সত্যেন্দ্রনাথ নত মুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। পিতৃব্যের নিকট পূর্ব্বে কখনও এরূপ তিরস্কৃত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি লজ্জায় ও ঘৃণায় দুঃখিত হইলেন, এইবার হইতে বাটিতে থাকিয়া খুল্লতাতের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

এই ঘটনার পর কিছু দিবস সত্যেন্দ্রনাথ নিজ সঙ্কল্পমত চলিতে লাগিলেন। শচীকান্ত বাবুও আনন্দিত হইলেন, মনে করিলেন বোধ হয় সত্যেনের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু হায়! প্রবল লালসা প্রতিদ্বন্দী হইলে সে সঙ্কল্প কয়দিন থাকে? প্রেমের আকুল পিপাসায় হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলে, লজ্জা ভয় রক্ষা করিয়া চলা দুরূহ, একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়। দিন যাইতে লাগিল সত্যেনের সঙ্কল্পও শিথিল হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, বিষয়কার্য্য নিয়ম মত দেখিবেন, কিন্তু মালতীকে না দেখিলে থাকিতে পারিবেন না, অতএব এইবার তাঁহাকে মাণিকনগরে আনিতে পারিলে বোধহয় আর কোন পক্ষে অসুবিধা হয় না। বাসনা, ও লালসায় অন্তর পরিপূর্ণ থাকিলে সকল বিষয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া কার্য্য করা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ পরিণামের কোন চিন্তাই করিলেন না। বাটী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে কোন একটি বাটী ঠিক করিলেন এবং তথায় দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া মালতীকে তাঁহার বৃদ্ধা জননীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য লইয়া আসিয়া তথায় রাখিলেন। মালতীর বাটী হইতে বাহির হইবার কালে একবার পদদ্বয় কম্পিত হইল, বুকের ভিতর স্পন্দনের বেগ দ্রুত হইল, নয়নেও একবিন্দু অশ্রু ফেলিলেন। তিনি ভাবিলেন প্রাণের প্রাণকে এইবার সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবেন। হায়! হায়! অবোধ বালা একবার ভাবিল না যে, এই অশ্রু তাঁহার সহচর হইল, আজি হইতে তাঁহার অন্তরাকাশের উদয়োন্মুখ তরুণ অরুণ পুনঃ অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইল। মালতী ডুবিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

সধবার বৈধব্য

অথবা

প্রেমের শ্মশান।

প্রকৃত ঘটনামূলক আখ্যায়িকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জড়জগতে যেমন রসায়ন-প্রক্রিয়ার অদ্ভুত মহিমায় সমস্ত বস্তুতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত ঘটে, মনোজগতেও সেইরূপ, সুখ দুঃখ, প্রেম-সম্মিলন ও প্রিয়-বিচ্ছেদ-জনিত শোক-সন্তাপ,—পাপ-পুণ্যের চিন্তা অথবা অনুষ্ঠান, এবং অনুতাপ ও অন্তঃস্নিগ্ধ আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি সজীব ভাবের সূক্ষ্মতর রাসায়নিক শক্তিতে অতি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে।

জড়জগতের রসায়ন, অর্থাৎ Material Chemistry—জাড়্কীন-রসায়ন নামে অভিহিত হইতে পারে। উহার প্রভাবে, তাম্র সুবর্ণের উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে,—যাহা এ মুহূর্ত্তে সুবর্ণের মত সুখ-সুন্দর পীত-আভায় নয়নের প্রীতি জন্মাইতেছিল, তাহা মুহূর্ত্ত পরেই লোহিত-রাগে পরিণতি পায়। কিন্তু, উহার কোনরূপ প্রক্রিয়াপ্রভাবেই রূপ ও সৌরভের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতিস্বরূপ সুরম্য গোলাপ ধুস্তূরের মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না।

মানসিক রসায়নে, তাদৃশ অসম্ভব পরিবর্ত্তও, মানুষের চক্ষের উপরে, ধীরে ধীরে, সংসাধিত হয়;—যেরূপ সলজ্জমধুর মনোহর হৃদয়কুসুমকে মনুষ্য মুকুলিত গোলাপটি বলিয়া মনে করিত, সেইরূপ হৃদয়ও, বনতাপসী ধুস্তূরার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সকলের ভয় ও বিস্ময় জন্মায়।

পাঠকের প্রীতিস্নেহাস্পদা প্রেমবিহ্বলা লরার প্রকৃতিতেও, ধীরে ধীরে, এইরূপ বিস্ময়জনক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। পাঠকের সহিত লরার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন সে আঠার বছরের বালিকা অথবা ঈষদুস্মিষিতা যুবতী। সেই লরা এইক্ষণ সপ্তবিংশতিবর্ষীণা, সংসার-মণ্ডপের কঠোর-পীঠাসীনা, কৃচ্ছ্রব্রতা তাপসী। এই নয়টি বৎসরে, সেই লরাই যে এই লরা হইয়াছে,—যে চলিয়া যাইবার সময়ে সকলের চক্ষেই অপ্রতিম রূপের একখানি প্রতিমা বলিয়া প্রতীত হইত, সেই লরাই যে আজি, কষ্টার্জ্জিত জ্ঞানের গৌরবে,এবং মনঃশক্তি ও চারিত্রসম্পদের অতুল প্রভাবে, ঠিক্ একটি দেবরমণীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া নিতান্ত পাষাণহৃদয় বিষয়িব্যক্তিরাও অকৃত্রিম ভক্তিতে মাথা নোয়াইতেছে।

লরার সে লাবণ্য-ঢল-ঢল, তরঙ্গতরল, উজ্জ্বল রূপ কোন অংশেও বিলুপ্ত হইয়াছে কি? তাহা নহে। কিন্তু তথাপি বাহিরের সে রূপের মাধুরী, অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, শক্তি ও ভাবের আলোকে যেন কেমন একপ্রকার আলোকিত হইয়া,—প্রমোদ-প্রীতির প্রফুল্ল সুষমা, অপার্থিব পবিত্রতার সহিত যেন কেমন এক ভাবে মিশিয়া, লরার মুখচ্ছবিতে এমনই একটু অপূর্ব্ব পরিবর্ত্ত ঘটাইয়াছে যে, সমানবয়স্ক যুবজনেরাও এইক্ষণ তাহার বয়সের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। লরা এইক্ষণ তাহাদিগের মধ্যে কাহারও অভিভাবিকা,—কাহারও উপদেষ্ট্রী, এবং সকলের কাছেই মাতা কিংবা অগ্রজার ন্যায় স্নেহময়ী শাসয়িত্রী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, আমেরিকার কতকটি রমণী, ইংলণ্ডের আভরণস্বরূপা মিস্ কব্ * প্রভৃতির ন্যায়, বড় পণ্ডিতদিগের মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছিলেন। লরাও ইদানীং উল্লিখিতরূপ পণ্ডিত রমণী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। সে, এই সময়ের মধ্যে,জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল শাখায়ই গাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, সর্ব্বাংশে নূতন মানুষের মত হইয়াছে; এবং (Sara Underwood) সারা আণ্ডার-উড্, (Lilian Whiting) লিলিয়ান্ হোয়াইটিং ও (Abbey Judson) আবি জড্‌সন্ § প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদিনীদিগের সহিত, সৌহার্দ্দের প্রগাঢ় নির্ভরে,নানাস্থানে দীর্ঘকাল একত্র বাস ও প্লাঞ্চেট প্রভৃতি অভিনব যন্ত্রের প্রয়োগচালনা অভ্যাস করিয়া, আপনিই একটি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক "মিডিয়ম" রূপে বিকসিত হইয়াছে।

যৌবনের প্রথম-বিকাশ-সময়ে লরার

---

* চিরকুমারী কব্ (Miss Cobbe) অল্পদিন হয় স্বর্গগত হইয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স আশী কিংবা পঁচাশী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবন, জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মানুশীলনে, তপস্বিনীর ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন। তিনি শিশুর মত সরলচিত্ত হইয়াও, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের লেখায়, সমানপদবীরূঢ় পণ্ডিত জনের সসম্মান পদ্ধতিতে ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়া, নির্ভয়ে তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ও স্বরচিত জীবনচরিত আধুনিক উচ্চসাহিত্যের উজ্জ্বল আভরণস্বরূপ।

§ সারা আণ্ডারউড অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার বাসস্থল সিকাগো। তিনি এবং তাঁহার পতি মিষ্টার বি, এফ্ আণ্ডারউড (Mr. B. F. Underwood) উভয়েই সিকাগো নগরে সূক্ষ্মদর্শি বৈজ্ঞানিক ও ধার্ম্মিক লোক বলিয়া সম্মানিত। Vide 'Automatic or Spirit-Writing with other Psychic Experiences,' by Sara A. Underwood. লিলিয়ান হোয়াইটিংও অদ্যাপি জীবিত থাকা সম্ভব। আবি জাড্‌সন অল্পদিন হইল আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনই মিডিয়ম বলিয়া প্রসিদ্ধ; শেষোক্ত রমণী দুটি অকৃতপতিকা। তাঁহাদিগেরও বহু গ্রন্থপত্র আছে।

একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী ছিল। সেই লাইব্রেরীই এইক্ষণ এক বিশাল গ্রন্থালয়রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। উহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত, এবং পরমার্থতত্ত্বের দুর্ল্লভ গ্রন্থাবলীর সহিত বিজ্ঞান ও দর্শনের নূতন ও পুরাতন নানাবিধ গ্রন্থ, সংকলিত হইয়া, ধনকুবেরের প্রাসাদকে পণ্ডিত-সেব্য সারস্বত-মন্দিরের শোভা প্রদান করিয়াছে; আর Theosophy অর্থাৎ দিব্যবিদ্যা, Occult Science অর্থাৎ তত্ত্বরহস্য, Mesmerism অথবা মৈস্মরী ক্রিয়া, এবং Spiritualism অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদের অসংখ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থবদ্ধ মাসিকপত্রনিচয়, পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সযত্নে সংগৃহীত হইয়া, লাইব্রেরীটিকে নগরের একটা দর্শনীয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। লরা, তাহার জীবনের ব্রতধর্ম্মপালনার্থ, দিবসের প্রধান এক ভাগ, প্রতিবেশি-দীনদুঃখিদিগের কুটীরে কুটীরে, ঔষধ-পথ্য ও রোগশুশ্রূষার উপযোগি বিবিধ সামগ্রী লইয়া, পাদ-চারে ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং যখনই একটু অবকাশ পায়, তখনই লাইব্রেরীতে উপবিষ্ট হইয়া, গভীর মনঃসন্নিবেশের সহিত অধ্যয়ন করে, অথবা আমেরিকার বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতদিগের সহিত পরলোক, পরমার্থতত্ত্ব ও মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতি প্রভৃতি বিষয়প্রসঙ্গে আলাপ ও আলোচনায় নিমগ্ন রহে।

আমেরিকার তদানীন্তন পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা মাঝে মাঝে, লরার সহিত আলাপের অভিলাষে, তদীয় পিতৃপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তন্মধ্যে ডক্টর রবার্ট হেয়ার এম ডি, আচার্য্য স্যামুয়েল ওয়াট্সন, লরেণ এলবার্ট সারমেন্ এবং পণ্ডিতবর এপ্স্ সারজেণ্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। * ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, প্রথিতনামা ধর্ম্মসংস্কারক এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচারক। লরাও এখন কায়মনঃপ্রাণে সেই পথেরই পথিকা। অপিতু, লরা একটি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মিডিয়মরূপে নিয়ত ক্রিয়াম্বিতা। মিডিয়ম কাহাকে বলে, কথাটা এখানে সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিব।

চুম্বক লৌহের কিরূপ অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন। সে শক্তির সাধারণ নাম আকর্ষণী। অধ্যাত্মবাদীরা অশেষ বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, চুম্বকের প্রকৃতিতে যে শক্তির নাম আকর্ষণী, মনুষ্যপ্রকৃতিনিহিত তাদৃশ শক্তিবিশেষের নাম (Animal Magnetism) জান্তব-চৌম্বক। উহা মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি। সমস্ত মনুষ্যের শরীরেই উহা অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহে; এবং

---

* রবার্ট হেয়ার এম, ডি, আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, এবং সার্ উইলিয়ম ক্রুক্স্ প্রভৃতির সমানশ্রেণিস্থ ব্যক্তি। তৎপ্রণীত Experimental Investigation of the Spirit Manifestations বিখ্যাত গ্রন্থ, এবং বিজ্ঞ পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। অবশিষ্ট পণ্ডিতত্রয়রচিত গ্রন্থনিচয়ও দুর্ল্লভ বস্তু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

যাহার শরীরে যখন উহা, সুচারুরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া, কার্য্যের উপযোগি হয়, সে তখন মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক প্রকৃতিসম্পন্ন নর-নারীর সে কার্য্য কি? কার্য্য অনেক প্রকার। তন্মধ্যে লোকান্তরিত সূক্ষ্মশরীরিদিগের শক্তির প্রবাহকতাই মুখ্য কার্য্য বলিয়া পরিচিত। বিদ্যুৎ সকল স্থলেই আছে, অথচ সকলপ্রকার জড়পদার্থ বিদ্যুতের প্রবাহক নহে। কাচ ও শুষ্ক কাষ্ঠ সংসারে শতসহস্র কার্য্যের সহায় হইলেও উহাদের দ্বারা বিদ্যুতের পরিচালনাকার্য্য নির্ব্বাহ পায় না; কিন্তু লৌহ ও তাম্রের তারে তাহা সহজে নির্ব্বাহ পায়। এইরূপ আবার অতি সাধুচরিত্র সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা আত্মিক-শক্তির মিডিয়ম হইতে পারেন না; অথচ অনক্ষর মূর্খ এবং অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তিও উৎকৃষ্ট মিডিয়মরূপে বিকসিত হইয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মায়। তাদৃশ মিডিয়মেরা যেখানে উপবিষ্ট থাকে, অধ্যাত্মদেহধারি নর-নারীরা সেখানে, তাহাদিগের দেহনিহিত উল্লিখিত মাধ্যমিক শক্তির বলে, জড়পদার্থের উপর নিজ শক্তি চালনা করিয়া কার্য্য করেন; এবং কখনও কখনও, রক্তমাংসের তনুবিশিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া, সুস্পষ্ট ভাষায় কথা কহেন।

লরা যখন তাহার অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিক সুহৃদ্দিগের নিকট জানিতে পারিল যে, তাহার শরীরে একটু বেশী পরিমাণ মাধ্যমিক শক্তি আছে, আর শ্রদ্ধার সহিত যত্ন করিলে সেই শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তখন সে প্রতিদিন দিনে ও রাত্রিতে, কিছুকাল তদগতহৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, একটি প্লাঞ্চেট লইয়া নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইত, এবং প্লাঞ্চেটে কিছু লেখা হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিত।

প্লাঞ্চেট মনুষ্যের হৃদযন্ত্রাকৃতি একটি অতি ক্ষুদ্র ও অতি লঘু ত্রিপদ কাষ্ঠযন্ত্র। উহার ঐ তিনটি পদের একটি পদ তীক্ষ্ণাগ্র লেড্-পেন্সিলযুক্ত, আর দুইটি পদ দুইটি ক্যাষ্টর অর্থাৎ চালকাঙ্গুরীয়যুক্ত। উহা দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ সাত ইঞ্চ, এবং পরিসরে পাঁচ ইঞ্চ। যদি কোন মিডিয়ম, উহার নীচে একখানি কাগজ রাখিয়া, উহাকে প্রান্তদেশে দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া রহে, তাহা হইলে, উহার ঐ পেন্সিল আপনা হইতে পরিচালিত হইয়া নানাপ্রকার অর্থযুক্ত লেখা লিখিতে আরম্ভ করে। *

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাদেশে, উল্লিখিত আশ্চর্য্য যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়, এবং উহা ফ্রান্স দেশে অসংখ্য পণ্ডিতের দ্বারা পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়া 'প্লাঞ্চেট' আখ্যা লাভ করে। এখন প্লাঞ্চেটের পরিবর্ত্তে (Ouija

* উপরিধৃত কথাগুলি পণ্ডিতবর এপ্‌স্ সারজেণ্ট (Eppes Sargent) প্রণীত "Planchette or the Despair of Science, being a full account of modern Spiritualism, its Pheno-

Board) উইজা বোর্ড নামে তদনুরূপ আর একটি যন্ত্র অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়েরই এক অর্থ—এক উদ্দেশ্য; অর্থাৎ পেন্সিলটিরে মানুষে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করে না, অথচ সে পেন্সিল আপনিই চলে, আপনিই লেখে, আপনিই প্রশ্নকর্ত্তার মনোগত প্রশ্ন অবগত হইয়া বহুজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় তাহার উত্তর দেয়।

দুঃখিনী লরা যখন প্ল্যাঞ্চেটের নীচে একখানি সাদা কাগজ রাখিয়া তাহার প্রার্থনাগৃহে উপবিষ্ট হইত, তখন প্রথমতঃ উহাতে স্পষ্ট লেখা ফুটিত না, লেখার পরিবর্ত্তে নানারূপ আঁকা বাঁকা পংক্তি ফুটিত। দেখিলে বোধ হইত যেন পরপারবর্ত্তি কোন ব্যক্তি প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিল ধরিয়া লেখা অভ্যাস করিতেছেন, অথচ ইচ্ছার অনুরূপ লিখিতে পারিতেছেন না। এই ভাবে মাসেক কাল কাটিয়া গেলে, প্রথম একদিন স্পষ্ট লেখা ফুটিল। সেই লিখিত পংক্তি ক'টি এই,—

"প্রাণাধিকা লরা, আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছেই আছি। তোমাকে আগে যত ভালবাসিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী ভালবাসি। আমার লিপিশক্তি ক্রমে বাড়িবে, তার পর আরও বহু কথা লিখিব।—তোমার প্রিয়তম হোরেস।"

যে দিন প্রথম এই লেখা ফুটিল, সে দিন লরা বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু নয়নের উচ্ছলিত প্রবাহ অবরোধ করিতে পারিল না—তাহার তপ-জপ, জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য ও কঠোর-সংযমবৃত্তি কিছুই সে অধীর ও উদ্বেল হৃদয়কে কিঞ্চিৎকাল নিয়ন্ত্রিত রাখিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে, সে প্রাণে একটুকু সুস্থির হইয়া, লিখিত কাগজটুকু হাতে লইয়া, মায়ের কাছে গেল। সেখানে মায়ের চক্ষে আবার দরবিগলিত ধারা দেখিয়া উভয়ে মিলিয়া বহুক্ষণ কান্দিল। মাতা ও দুহিতা এই প্রথম প্রমাণসহকারে জানিতে পাইল যে, হোরেস নিরুদ্দেশ হয় নাই; সে কোনরূপ দুর্ঘটনায় অকস্মাৎ লোকান্তরবাসী হইয়াছে। এ সংস্কার ছায়ামূর্ত্তির দর্শন অবধিই তাহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। কিন্তু, যাহা এত দিন সংশয়াত্মক সংস্কারমাত্র ছিল, তাহা এইক্ষণ নিঃসংশয় বিশ্বাসে পরিণত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য যখন পৃথিবীর তনু পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকে যাইয়া, সূক্ষ্মতর (Ethereal) ইথিরিয়েল অর্থাৎ তেজঃপদার্থময় আকাশিক তনু প্রাপ্ত হয়, তখন সে, মসীসিক্ত

---

mena, and the various Theories regarding it, with a survey of French Spiritism", নামক চারি শত পৃষ্ঠাত্মক সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইল। এপ্‌স্ সারজেণ্ট, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য অঙ্গে, আরও বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় সমান আদৃত; কিন্তু ঔপন্যাসিক রঙ্গপ্রিয় দুর্ভাগা বঙ্গে একপ্রকার অপরিচিত।

লেখনী অথবা পেন্সিল প্রভৃতি পার্থিব বস্তু হাতে লইয়া, কিংবা প্লাঞ্চেট প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে আপনার আয়ত্ত করিয়া, কাগজে ও শ্লেটে কিছু লিখিতে পারে কি? লরা যে লেখাটুকুরে হোরেসের লেখা মনে করিয়া নয়নজলে ভাসিয়াছে, অথচ প্রাণে কেমন একটু অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছে, সে লেখা প্রকৃতই তাহার প্রিয়তম হোরেসের লেখা বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে কি?

যাঁহারা অধ্যাত্ম-তত্ত্বসংক্রান্ত কথা লইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন; এবং সত্যপ্রিয় পণ্ডিতগণ সে সকল গ্রন্থপাঠে বিস্মিত ও মোহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ, পরপারবর্ত্তি সূক্ষ্মশরীরীর শক্তিসঞ্চালিত পেন্সিল কিংবা লেখনীর লেখা পাঠ করিয়া, আপনার ধর্ম্মে ও জীবনের নিত্যকর্ম্মে নূতন পথ লইয়াছেন; এবং কেহ কেহ, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার নৈরাশ্যময় অন্ধকার হইতে অকস্মাৎ মুক্তিলাভ করিয়া, হৃদয়ের অননুভূতপূর্ব্ব উদ্বেল আনন্দে ঈশ্বরের নাম লইয়াছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানমূলক যুক্তিতর্কের শতসহস্র পুস্তক এক দিকে, এবং কথিতপ্রকার বিস্ময়াবহ লেখার একটি পংক্তি আর এক দিকে। ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বাসীর নিকট, এ অর্থে, ইহার মূল্য অসীম।

পণ্ডিতদিগের মতে এই প্রকার লেখার সাধারণ নাম—Spirit-Writing অর্থাৎ আত্মিকী লেখা। এ নাম অসঙ্গত নহে। কেন না, যে লিখে সে নিশ্চয়ই লোকান্তরবাসি আত্মিক কিংবা আত্মিকা।

আত্মিকী লেখা অনেক প্রকার। টেবলের উপরে একখানি সাদা কাগজ ও আর একটি পেন্সিল রহিয়াছে; পেন্সিলটি মনুষ্যের স্পর্শাদি সম্পর্ক বিনা, আপনি উঠিয়া, মানুষের করধৃত পেন্সিলের মত, নানা কথা লিখিতেছে। ইহা একপ্রকার লেখা। অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিকদিগের ভাষায় ইহার নাম—Direct Writing * অর্থাৎ অপ্রযুক্ত লেখা।

* Direct Writing অর্থাৎ অপ্রযুক্ত লেখা নামে একখানি আশ্চর্য্য পুস্তক, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর হইল, লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের রচয়িতা সর্ব্বজন পূজিত সাধুচরিত্র (Mosos Stainton) মোজেস্ ষ্টেণ্টন। তিনি সে পুস্তকে ঈদৃশী লেখার সহিত পার্থিব জগতের কোনরূপ কল, কৌশল ও সম্পর্ক না থাকার যে সকল অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ ও পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অপ্রযুক্ত লেখার প্রমাণ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে পাঠকের অবগতির জন্য আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিব। সে গ্রন্থের নাম 'What I Saw At Cassadaga Lako' অর্থাৎ 'আমি কাসাদেগা হ্রদে কি দেখিয়াছি'। ইহাও একখানি সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ গ্রন্থ, এবং গ্রন্থকার (A. B. Richmond) এ, বি,

পেন্সিলটি মনুষ্যের হস্ত কিংবা মনুষ্যধৃত কোনরূপ যন্ত্র দ্বারা প্রযুক্ত হয় নাই, এই নিমিত্ত লেখার নাম অপ্রযুক্ত।

দু'খানি শ্লেটের মধ্যে পেন্সিলের একটু কণিকা ভরিয়া, শ্লেট দুখানিরে সূতা কিংবা ফিতা দ্বারা শক্তরূপে বাঁধিয়া, ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; অথচ ঐরূপ দৃঢ়বদ্ধ শ্লেটে অতি মৃদু টুক্ টুক্ শব্দে নানা প্রসঙ্গে লেখা হইতেছে। এইরূপ এবং ঈদৃক্ আরও বহু প্রকারের লেখা অপ্রযুক্ত সংজ্ঞার অন্তর্গত। সার্ উইলিয়ম ক্রুক্স্ এবং প্রফেসার ঝল্নার প্রভৃতি পৃথ্বীবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা, দিবা দ্বিপ্রহরে, সুপরিরক্ষিত ঘরে,—অনেক সমকক্ষ বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতের প্রখরদৃষ্টিগোচরে, উল্লিখিতরূপ অপ্রযুক্ত আত্মিকী লেখা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আর এক প্রকার আত্মিকী লেখা আছে, উহার ইংরেজী নাম Automatic Writing. এইরূপ লেখাকে বাঙ্গালায় অনায়ত্ত লেখা বলা যাইতে পারে। * এই শ্রেণীর লেখা মানুষের হাতেই সম্পাদিত হয়, অথচ সেই হাত মানুষের আয়ত্ত রহে না; যেন কোন অদৃশ্য ব্যক্তি সেই হাতখানি সবলে ধরিয়া তাহা ব্যবহার করে। সুতরাং এইরূপ লেখাকে অনায়ত্ত লেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কোন শঙ্কা নাই। সুবিশ্রুতনামা ষ্টেড্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত "জুলিয়ার পত্র" নামক জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাহার হাতে লেখা হয়, সে যদি ষ্টেড্ কিংবা মোজেস্ ষ্টেণ্টনের মত সর্ব্বত্র পূজিত সাধু ব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তদীয় কর-চালিত লেখায় বিশ্বাস স্থাপন কঠিন। কিন্তু ষ্টেড্ অথবা ষ্টেণ্টন যেখানে শপথ করিয়া বলেন যে, লেখার একটি শব্দও তাঁহার নহে, সেখানে অবশ্যই সংশয়ের কোন কারণ থাকে না। * অনায়ত্ত লেখা ভারতবর্ষে অপরিচিত অথবা অপ্রচলিত নহে। কাব্যসাহিত্যের আশ্রয়-কল্পতরু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও এই প্রকার লেখা এদেশে লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তবে, যাঁহাদিগের হস্তে 'ভার' অর্থাৎ আত্মিকী শক্তির আবেশ হইয়াছে, তাঁহারা ষ্টেড কিংবা ষ্টেণ্টন নহেন।

প্লাঞ্চেটের লেখা অপ্রযুক্ত ও অনায়ত্ত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি। উহা নিশ্চয়ই অনায়ত্ত লেখা হইতে অধিকতর প্রামাণিক। কেন না, যে পেন্সিলটি প্লাঞ্চেটের অঙ্গে গ্রথিত

রিচ্মণ্ড্ পরীক্ষাপটু প্রামাণিক লোক। তিনি পেনিসেলভানিয়ার একজন বড় ব্যারি-ষ্টর, অথচ বহু গ্রন্থ রচনা উপলক্ষে সুকীর্ত্তিত গ্রন্থকার।

* অনায়ত্ত লেখা সম্পর্কেও ইংরেজীতে বহু পুস্তক আছে। কিন্তু পাঠক Hon'ble Robert Dale Owen প্রণীত "Footfalls On The Boundary Of Another World" এবং William Stead সম্পাদিত "Border Land" নামক গ্রন্থবদ্ধ পত্রিকার চারি ভালুম পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পাইবেন।

* Vide 'Spirit Teachings through the Mediumship' of William Stainton Moses (M. A. Oxon).

রহে, তাহাকে মানুষ হাতে ধরে না, অথবা অঙ্গুলি দ্বারাও স্পর্শ করে না; অথচ ঐ অস্পৃষ্ট পেন্সিলে, মনোগত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে, যে সকল কথা লিখিত হয়, সেগুলি এমনই অর্থযুক্ত, অন্তঃস্পর্শি ও অবস্থার অনুরূপ যে, কোন জ্ঞাতসার ব্যক্তি, দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া উত্তর দিতেছে, এ বিষয়ে বিচারক্ষম ব্যক্তির চিত্তে অণুমাত্রও সংশয় থাকে না।

ইহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতেছেন যে, লরার মনেও এইক্ষণ আর কোন সংশয় নাই। সংশয় থাকিলে তাহার চক্ষে জল ঝরিত না, এবং সে মায়ের গলা ধরিয়াও কাঁদিতে পারিত না। কিন্তু ঐ লেখা যে নিশ্চয়ই হোরেসের লেখা, এবিষয়ে তাহার সমস্ত সংশয় উন্মূলিত হওয়ায়, আর এক দিক্ দিয়া একটুকু দোষ ঘটিল। সে এইক্ষণ, সংসারের সকল কর্ম্মে উদাসীন হইয়া, প্লাঞ্চেট লইয়াই সময় যাপন করিতে লাগিল।

ফলতঃ, লরা প্লাঞ্চেটের সাহায্যে, পাঁচ ছয় মাসের ক্রমিক পরিশ্রমে, এত সুপাঠ্য ও সদুপদেশপূর্ণ লেখা পাইল যে, তাহাতে এক খানি গ্রন্থ হইতে পারে। সে ইদানীং তাহার লাইব্রেরীর পুস্তকরাশিতেও কতকটা উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়া, স্বকর-ধৃত প্লাঞ্চেটের লেখাই সতত পাঠ করিত; এবং আপনার চিত্তে কোন বিষয়ে কখনও একটুকু সংশয় ঘটিলে, প্লাঞ্চেটের নীচে কাগজ রাখিয়া ধ্যানাবিষ্টবৎ বসিয়া থাকিত।

অপিচ, যে অদৃশ্যমূর্ত্তি পুরুষ প্লাঞ্চেট লইয়া লিখিতেন, তাঁহারও বোধ হয়, উহাতে বড় অনুরাগ ও শক্তি জন্মিয়াছিল। কেন না, যখনই লরা প্লাঞ্চেট ধরিত, তখনই পেন্সিল চলিত, এবং দ্রুতলেখকের লেখনীর মত অবিরাম লিখিয়া যাইত। এইরূপ অবিরত দ্রুতলেখা, অদৃশ্য লেখক ও দৃশ্যমান মিডিয়ম, দুইয়েরই বিশেষ শক্তি ও সমপ্রাণতার পরিচায়ক।

আমরা পাঠককে ইতঃপূর্ব্বে লরার ডায়েরী হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উপহার দিয়াছি; এইক্ষণ তাহার প্লাঞ্চেটের লেখা হইতেও তদীয় জীবনবৃত্তসংক্রান্ত অংশটুকু বাছিয়া লইয়া আদরের সহিত উপহার দিব। পাঠক, ডায়েরী পাঠ করিয়া, আমেরিকার এই সুখসমৃদ্ধিসংবর্দ্ধিতা সুন্দরী যুবতীর হৃদয়ের গতি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন; এক্ষণ তাহার প্লাঞ্চেটের লেখা পাঠ করিলে, ইহলোক ও পরলোক এই উভয় জগতেরই একটি সম্বন্ধসূত্র হাতে লইয়া, তত্ত্বের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইবেন।

পাঠককে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নগুলি প্লাঞ্চেটের লেখা নহে। উহার প্রত্যেক অক্ষরই লরার নিজের লেখা, এবং শুধু উত্তরনিচয়ই প্লাঞ্চেটের লেখা। যাহারা প্লাঞ্চেট লইয়া রীতিমত কার্য্য করে, তাহারা এই ভাবে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রশ্নগুলিও সংগ্রহ করিয়া রাখে। নিম্নে প্লাঞ্চেটের উক্তি বলিয়া যে সকল কথা

উদ্ধৃত হইল, তাহা এক দিবসের লেখা নহে। আমরা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে তারিখ-গুলি নির্দ্দেশ করিলাম না।

প্লাঞ্চেটের লেখা।

প্রশ্ন—"প্রিয়তম, তুমি এত কালের পর এ দুঃখিনীর সংবাদ লইয়াছ। তোমায় শত ধন্যবাদ! তোমায় শত সাধুবাদ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি সততই যদি আমার কাছে আছ, তাহা হইলে, একটি দিনও দয়া করিয়া, এক বার দেখা দিয়া, অথবা এইরূপ একটি কথা কহিয়া, আমার দগ্ধ হৃদয় শীতল কর নাই কেন?"

উত্তর—"মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেওয়া, অথবা জড়বস্তুর উপর শক্তি সঞ্চারণ করিয়া, পেন্সিল প্রভৃতির সাহায্যে, মনের কথা লেখা, লোকান্তরবাসীর সহজসাধ্য নহে। আমি পার্থিব তনুত্যাগের পরক্ষণেই যে তোমাকে দেখা দিতে পারিয়াছিলাম, তাহা আমার নিজের শক্তিতে নহে। একটি দেবপুরুষ সে সময়ে আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। তিনিই আমার হৃদয়ের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া, তোমাকে মুহূর্ত্তের তরে দেখা দেওয়ার জন্য, আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে, আমার সে আকাঙ্ক্ষা তখন পূর্ণ হইত না।

আমি আজি যে, প্রিয়তমে, এ ভাবে, তোমার কাছে বসিয়া, হাতে প্লাঞ্চেটের পেন্সিল ধরিয়া, যথেচ্ছ লিখিয়া যাইতেছি, ইহা কতকটা আমার নিজের শক্তিতে, কতকটা তোমার শক্তিতে। এ রহস্য এখন কোন মতেই ভাল করিয়া বুঝিবে না; যখন জড় দেহ হইতে মুক্তি পাইবে, তখন বুঝিবে। তোমার শরীরে যেমন ক্রমে ক্রমে, মিডিয়মের শক্তি ফুটিয়াছে, আমিও সেইরূপ, ক্রমে ক্রমে, লিখিবার শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছি। এখন আমি বিনা ক্লেশে, বিনা আয়াসে, যত ইচ্ছা তত লিখিয়া যাইতে পারি। তুমি কিংবা তোমার মত একটি ভাল মিডিয়ম প্লাঞ্চেটের একপ্রান্তে একখানি হাত রাখিলে, এখন আর কিছুতেই আমার পেন্সিলের গতিরোধ হয় না। কিন্তু, প্লাঞ্চেট লইয়া আমি প্রথম কএকটি মাস কিরূপ কষ্ট পাইয়াছি, এবং তোমাকেও বা কত কষ্ট দিয়াছি, তাহা কি তুমি এত শীঘ্রই ভুলিয়া গেলে?"

প্রশ্ন—"তুমি আর ত হোরেস, আমায় ছাড়িয়া যাইবে না?"

উত্তর—"না প্রিয়তমে, আর না। তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিলে, আমি এতকাল পৃথ্বীধামে পড়িয়া থাকিতাম না।"

প্রশ্ন—"আমি তোমার কথাটি, বন্ধু, ভাল করিয়া বুঝি নাই। তোমার কথার আভাসে এইরূপ একটুকু বোধ হইতেছে যে, ভালবাসাও যেন একটা পাপ, এবং তুমি সেই পাপেই যেন পৃথিবীর নিম্নধামে আকৃষ্ট রহিয়াছ। ইহাই কি সত্য?"

উত্তর—"না, প্রিয়তমে, ভালবাসা পাপ নহে। ভালবাসাই সুখের সার, সাধনার চরম ও পুণ্যের প্রাণ; এবং কিবা ভূতলবাসী মনুষ্য, কিবা উর্দ্ধধামনিবাসি দেবতা, উভাই

সকলের জন্য সতত-প্রার্থিত স্বর্গদুর্লভ অমৃত। ভালবাসা পাপ নহে,—নিঃস্বার্থ-নির্ম্মল ভালবাসার সহিত পাপের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে যদি স্বসুখলালসা মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা পাতকপ্রতিম। আমি তোমাকে যেমন দেখি ভালবাসার চক্ষে,—বলিতে লজ্জা হয়,—বলিতে প্রকৃত পক্ষে যার-পর-নাই দুঃখ হয়,—তথাপি সত্যের অনুরোধে কথাটি বলিতে হইতেছে,—আমি তোমাকে আজও তেমন দেখি লালসার চক্ষে। আমি কত প্রকারেই ত চেষ্টা করি, কিন্তু তথাপি হৃদয়কে আমার সম্পূর্ণরূপে বশে আনিতে পারি না। এই লালসার সূতাটুকু ছিঁড়িতে পারিলেই আমার সদ্গতি হইবে।"

প্রশ্ন—"হা প্রিয়তম! তুমি এ কি নিষ্ঠুর কথা বলিলে? এ লালসার আকর্ষণটুকু ছিঁড়িতে পারিলেই কি তুমি এ হতভাগিনীরে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে?"

উত্তর—"না, লরা; আমি এখনও যাইতেছি না, তখনও যাইব না। আমি এখনও তোমার কাছে আছি, তখনও তোমার কাছে কাছেই থাকিব; কিন্তু থাকিব নিঃস্বার্থ, নিস্পৃহ, পরসেবাব্রত, নির্ম্মলচিত্ত দেবতার মত। সে ভাব বড়ই প্রীতিকর ও শান্তিজনক। সেই উদার ও উন্নত ভাব আমি কল্পনা দ্বারা হৃদয়ে পরিগ্রহ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্তও আত্মজীবনে কার্য্যে ফলাইতে পারি না। কবে পারিব, তাহা ঈশ্বর জানেন।"

প্রশ্ন। "তবে আমি তখন তোমার পর হইব, না হোরেস? এবং তুমি আমার সেবা দ্বারাই পরসেবার পুণ্য সঞ্চয় করিবে!"

উত্তর। "আমার কথার নিগূঢ় অর্থ তাহা নহে। তোমার ও আমার জীবন, সুদূর ভবিষ্যতের কোন সময়ে, নিশ্চয়ই এক হইয়া যাইবে,—এক প্রবাহে চলিবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়,—যে পর্য্যন্ত জীবনের গতিতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ কিংবা পার্থক্য থাকে, সে পর্য্যন্ত আমিও তোমার কাছে, এবং তুমিও আমার কাছে, একটু পর।"

প্রশ্ন। "ভাল প্রিয়তম, হ'লেম যেন 'একটু পর'। তুমি এইমাত্র 'জীবন' শব্দ ব্যবহার করিলে। জীবন তোমাদিগের কি প্রকার?

উত্তর। জীবন তোমাদিগের যেরূপ, আমাদিগেরও ঠিক্ সেইরূপ। তুমি যেমন জীবিত আছ, আমিও সেইরূপ জীবিত আছি। বরং আমি অথবা আমার মত যাহারা দেহমুক্ত, এবং পরলোকে আসিয়া সংস্থিত, তাহারা সকলেই অধিকতর জীবিত।

—জীবিত যাদেরে ভাব, তাহারাই মৃত;
মৃত যারা, আছে তারা,
অক্ষয় জীবনে, সুসংস্থিত।
তাহাদের লাগি বৃথা হও আকুলিত,
বৃথা শোক, বৃথা দুঃখ,
তাহারা ত সদা সন্নিহিত।" *

* প্লাঙ্কেটের লিখিত মূল কবিতাটি এই—
"The living are the only dead;
The dead live—never more to die;
And often when we mourn them fled,
They never were so nigh!"

প্রশ্ন—"আমি তোমার কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তোমরা অধিকতর জীবিত এ বাক্যের অর্থ কি?"

উত্তর—"অর্থ অতি সহজ, অর্থ অতি সুখকর। আমি তোমায় সহজে ও সরলভাষায় সে অর্থ বুঝাইব। বৃক্ষ জীবিত পদার্থ, ইহা ত বুঝ। জীবন না থাকিলে, উহা শাখা প্রশাখায় বাড়িবে কেন, এবং উহাতে ফুল ফুটিবে অথবা ফল ফলিবে কাহার শক্তিতে? তাই বলিতেছি, বৃক্ষ জীবিত পদার্থ। অথচ ঐ যে পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গী, বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, আপনার ভাবে আপনি মৃদু মৃদু গাইতেছে, উহাও জীবিত। কিন্তু এই দুইয়ের জীবনী শক্তিতে কিছু প্রভেদ নাই কি? সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়—আছে। বৃক্ষের সুখ নাই, দুঃখ নাই, এবং এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইবারও শক্তি নাই। বিহঙ্গীর সুখ আছে, দুঃখ আছে, এবং যথেচ্ছ যাতায়াতের শক্তি আছে। সুতরাং উহার জীবন শ্রেষ্ঠতর।

"এইরূপ আবার তোমাদিগের ও আমাদিগের কথা। তোমাদিগেরও জীবন আছে, আমাদিগেরও জীবন আছে। কিন্তু উভয়বিধ জীবনের পার্থক্য বড় বেশী। তোমাদিগের যাতায়াত সীমাবদ্ধ, আমাদিগের যাতায়াত-সুখের ক্ষেত্র অসীম। আমরা বিহঙ্গের সঙ্গে উড়িতে পারি, মৎস্যের সঙ্গে ভাসিতে কিংবা ডুবিতে পারি, এবং বায়ু ও বারিধি উভয়েরই প্রবাহের উপর, তরঙ্গে নাচিয়া, কিংবা পাদচারে চলিয়া, বিদ্যুৎ হইতেও দ্রুততর গতিতে চলিয়া যাইতে পারি। যাতায়াতের এ আনন্দ, পৃথিবীর তনুত্যাগের পর, প্রথমতঃ কিছুকাল বড়ই অপূর্ব্ব বোধ হয়। পৃথিবীতে তোমরা সকল সময়েই মৃত্যুভয়ে ভীত,—সে ভয়ের আর সীমা নাই, —এবং রোগ ও শোকভয়েও তোমরা সতত জড়ীভূত। আমাদিগের মৃত্যু নাই, রোগ নাই, এবং যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে হারাইব বলিয়াও আর ভয় নাই।"

প্রশ্ন—"তুমি রোগের কথা বলিতেছ, প্রিয়তম। তোমাদিগের কি প্রকৃতই রোগভোগের উপযোগি দেহ আছে, এবং সেই দেহে কি পরিচয়যোগ্য আকৃতি আছে?"

উত্তর—"তুমি যে এইরূপ প্রশ্ন করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমি যখন পৃথিবীর তনুতে বদ্ধ ছিলাম, তখন আমার মনেও এইরূপ প্রশ্ন হইত। আমি তখন মনে করিতাম যে, Spirit অর্থাৎ আত্মা আর বাষ্প এক প্রকার পদার্থ; এবং Spiritual World অর্থাৎ অধ্যাত্মজগৎ আকাশের ন্যায় শূন্য। এখন দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি যে, মনুষ্য অধ্যাত্মজগতের প্রকার ও প্রকৃতি বিষয়ে পৃথিবীতে থাকা কালে যত কিছু কল্পনা করে, সমস্তই অলীক ও অমূলক। আমি কথাটা কিরূপে তোমায় স্পষ্ট বুঝাইব?

তোমরা জলস্থলময়ী পৃথিবীকে সকলেই সকল সময়ে দৃঢ়সারা ও ভিত্তিস্থিরা স্থায়িভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাক। কেন না, যখন পৃথিবীতে পাদ-চারণা কর, তখন এমন একটা ভাব কখনও তোমাদিগের মনে

আইসে না যে, তোমরা শূন্যে রহিয়াছ— শূন্যে চলা ফিরা করিতেছ; এবং শূন্য হইতে দূরতর শূন্যে পড়িয়া যাইতেছ। আমরাও পৃথিবীর উপরিস্থিত অধ্যাত্মধামকে দৃঢ়সার ও ভিত্তিস্থির স্থায়ি বস্তু বলিয়াই সর্ব্বদা মনে করি। ইহাও পৃথিবীরই মত জলস্থলময়, এবং আমরা যখন পাদ-চারণা করি, তখন আমাদিগের কখনও এমন মনে লয় না যে, আমরা শূন্যে আছি,—শূন্যে বিচরণ করিতেছি; এবং শূন্য হইতে অধস্তন শূন্যে চলিয়া পড়িতেছি।

"পৃথিবীর সকল স্থলেই দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ আছে, এবং কোন কোন স্থলে সপ্ততল গৃহও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তুমি যদি, প্রিয়তমে, সমস্ত পৃথিবীটিকেই একটি সপ্তভূমিক বিশাল নিকেতন বলিয়া চিন্তা করিতে পার, তাহা হইলে প্রকৃত তথ্য কতকটা বুঝিতে পাইবে। সপ্ততল গৃহের যেমন প্রত্যেক স্তরে দৃঢ়তা ও স্থায়িতা অনুভূত হয়, এই সপ্তভূমিক পৃথিবীরও প্রত্যেক ধামেই সেইরূপ দৃঢ়তা ও স্থায়িতা অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক ধামেই স্থল আছে, জল আছে; চিন্তা ও কল্পনার অগম্য অসংখ্য প্রকার তরু আছে, লতা আছে, এবং উচ্চ ও অনুচ্চ পর্ব্বতমালা, 'প্রবহমানা' নদী, প্রীতিপ্রদ প্রস্রবণ, প্রফুল্লকুসুম-সরোবর, গভীর হ্রদ, গভীরতর সমুদ্রপ্রভৃতি দৃশ্য আছে। সে জল ও স্থল, অথবা জল-স্থলের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল, এবং তরুলতা ও পর্ব্বাদির উপাদান-পদার্থ, পৃথ্বীবাসী মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, অতি দৃঢ়—বাস্তব পদার্থ। যদি কোন মনুষ্য এই অনন্তবিস্তৃত ও অনন্তপ্রকার বিচিত্র পদার্থে পরিশোভিত অধ্যাত্মজগতের শোভা ও সম্পদের মহিমা দর্শনে অনন্তকাল ব্যাপৃত রহে, তথাপি তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না,—সে দেখিয়া শেষ করিতে পারে না।"

প্রশ্ন। "যে দেখে ও শোনে, তাহার চক্ষু ও কর্ণের কথা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত ত কিছুই কহ নাই?"

উত্তর। "সেই কথাই এখন কহিব। তুমি ইতঃপূর্ব্বে আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, আমাদিগের দেহ আছে কি না, এবং সে দেহ কেমন। তোমার প্রশ্নের উত্তরে ইহাই আমার বক্তব্য যে, আমাদিগের প্রত্যেকেরই দেহ আছে,—সেই দেহই মনুষ্যের সারদেহ, এবং উহা পার্থিব দেহ অপেক্ষা শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর। মনুষ্য যখন বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তখন দর্পণে তাহার আপাদ-মস্তক-ব্যাপি একখানি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সমস্ত মনুষ্যেরই স্থূল-শরীরের অভ্যন্তরে ঠিক্ ঐরূপ আর একখানি সূক্ষ্মতর শরীর বিদ্যমান আছে। ঐ সূক্ষ্ম শরীরই আত্মিক-মূর্ত্তি অথবা আত্মা। উহাই মৃত্যুকালে বাহির হইয়া যায়, এবং উহা বাহির হইয়া গেলেই, পৃথিবীর দেহ অন্তঃসারশূন্য অকর্ম্মণ্য বস্তুর মত মাটিতে পড়িয়া রহে।"

প্রশ্ন। "তুমিও কি, প্রিয়তম, এইরূপ বাহির হইয়াই আপনার অধ্যাত্মদেহের পরিচয় পাইয়াছ?"

উত্তর। "হাঁ নরা, আমিও দেহমুক্ত হইয়াই আমার আত্মপরিচয় পাইয়াছি, এবং আত্মপরিচয়ের সঙ্গে চিরস্থায়ি অধ্যাত্ম দেহেরও পরিচয় পাইয়াছি। আমি আমাদিগের যাতায়াত-সুখ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছ যে, এ দেহ আগুনে পোড়ে না, জলে ভিজে না, এবং কোনরূপ রোগেও ক্লেশিত হয় না। আমরা যে কখনও কখনও আহত-ব্যথিত অথবা ব্যাধিপীড়িত অবস্থায় মনুষ্যকে দেখা দেই, তাহা শুধুই পরিচয় অথবা নিজ নিজ পার্থিব জীবনের শেষ অবস্থা জ্ঞাপনের জন্য। অপিচ, এ দেহের শক্তি বড় বেসী। তোমার চক্ষু যাহা দেখিতে না পায়, আমার চক্ষু তাহা অনায়াসে দেখিয়া থাকে। তুমি টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের সাহায্যে যাহা না করিতে পার, আমি এ দেহে, মনঃশক্তির প্রভাবেই তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারি। যাঁহার অধ্যাত্মদেহ, সর্ব্বপ্রকার শক্তির বিকাশে, পারলৌকিক কর্ম্মজীবনের উপযোগি হইয়াছে, তিনি সম্রাটের সিংহাসনকেও স্বকীয় দেহসম্পদের তুলনায় তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

তবে, আমাদিগের এ দেহে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও সুখের অনুভূতি অন্যরূপ, অথচ অতি আশ্চর্য্য নিয়মের অধীন। পৃথ্বীবাসিদিগের মধ্যে যাহারা অতি বড় পাপিষ্ঠ,—যাহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যেই পরের অনিষ্ট ঘটে, পরের প্রাণে আঘাত লাগে,—যাহাদিগের হৃদয় ও মন, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, অভিমান, আত্মম্ভরিতা, এবং অশেষপ্রকার অপবিত্র লালসায় সতত পরিপূর্ণ থাকে, তাহারাও, বাহিরের সৌন্দর্য্যে কিছুকাল সুন্দর, —আর অর্থ, বিত্ত ও শারীরিক-শক্তিপ্রভৃতি বহিঃস্থ সম্পদের প্রভাবে, কিছু কাল সুখিত কিংবা সুখ-সমর্থ—রহিতে পারে। এখানে তাহা একবারে অসম্ভব। কেন না, এখানে অন্তরে ও বাহিরে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—অতি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। যে অন্তরে সাধু,—অন্তরে পবিত্র ও প্রেমময়, সে-ই এখানে বাহিরে সুন্দর, বাহিরে সুখ-শীতল; এবং যে অন্তরে অসাধু,—অন্তরে অপবিত্র ও ঈর্ষ্যাক্রোধাদি মন্দভাবের অধীন, সে বাহিরেও অতি বড় বিরূপ ও সকল সময়েই অন্তর্জ্বালাময় বিষাদে মলিন।

ফলতঃ যে সকল নর-নারী জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, পরমার্থনিষ্ঠা ও পরোপকারপরায়ণতা প্রভৃতি দুর্ল্লভ গুণের গৌরবে দেবতাদিগেরও পূজনীয়, এখানে তাঁহারা কিরূপ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য লাভে কৃতার্থ হন, তাহা লিখিয়া কিংবা কহিয়া বুঝাইতে পারিব না। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছ। সে পূর্ণবিকসিত শরচ্চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নাও তাঁহাদিগের অলৌকিক রূপের জ্যোৎস্নার নিকট হীনপ্রভ। তাঁহারা অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদিগের রূপের আলো সে গৃহকে আলোকিত করিয়া তোলে। যাহারা নিতান্ত ভীরু ও বিপন্ন, তাহারাও তাঁহাদিগের আনন্দপ্রফুল্ল অভয়মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে আশ্বাসিত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা সর্ব্বাংশে অপকর্ম্মা,—যাহা-

দিগের পার্থিব জীবন দুষ্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস মাত্র,—যাহাদিগের হৃদয় নানাবিধ কদর্য্য-কলুষিত নিকৃষ্ট ভাবের আবেগ-বিহ্বলতায় জলন্ত নরকের প্রতিকৃতিস্বরূপ, তাহারা পার্থিব-দেহ ত্যাগের পর এমনই বিকট, ভয়ঙ্কর, বিষ-জর্জ্জরিত ও ঘৃণার উদ্দীপক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় যে, সে মূর্ত্তি দর্শনে, পরের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রী পুত্রও ভয়ে স্থানান্তরে পলাইয়া যায়।

কিন্তু, করুণানিধান জগদীশ্বরের এই এক অচিন্তনীয় মহিমা যে, লোকান্তরবাসি সূক্ষ্মশরীরীর এ দুর্নিরীক্ষ্য বীভৎস মূর্ত্তি চিরস্থায়ি হয় না। তাহার দয়ার্হ হৃদয়, অনুতাপের অন্তর্দ্দাহে অহোরাত্র দগ্ধ হইয়া, ক্রমে যখন একটু একটু করিয়া ভাল হইতে থাকে,—তাহার অভ্যন্তরীণ কুষ্ঠকলঙ্ক অশ্রুপ্রবাহে প্রক্ষালিত হইয়া, আত্মায় যখন একটু একটু স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তি জন্মায়, তাহার প্রতিমূর্ত্তিও তখন, ক্রমে আবার, ভালর দিকে অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হয়; এবং সেই পতিত-নারকীই, কালে আবার পুণ্যাত্মার প্রেমোজ্জ্বল পবিত্র-সুন্দর মধুর মূর্ত্তি লাভ করিয়া, পতিতপাবন জগদীশ্বরের পাপোদ্ধার নামে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করে।"

প্রশ্ন। "প্রিয়তম, তুমি লিখিয়া যাইতেছ, আর আমার বুকটা ভয়ে যেন থর থর কাঁপিতেছে! কর্ম্মফলের এইরূপ অবশ্যম্ভাবী ও অনুল্লঙ্ঘনীয় পরিণাম চিন্তা করিলে, প্রাণে আর সোয়াস্তি থাকে না,—পৃথিবীর কোনপ্রকার সুখ ও সম্মানের জন্যই প্রাণ আর অগ্রসর হইতে চাহে না। হা করুণাময়! না জানি মৃত্যুর পরে আমার অদৃষ্টে কি ঘটে,—না জানি আমি অভাগিনী কিরূপ কদর্য্য মূর্ত্তি লাভ করিয়া, চিত্তের ঘৃণা ও দুঃখে, কোথায় যাইয়া পলাইয়া রহি।"

উত্তর।—"না প্রিয়তমে, তোমার কোন রূপ দুর্গতি হইবে না। তুমি পৃথিবীতে রূপের রাণী বলিয়া সহস্র নয়নের পূজা পাইয়াছ। যখন পৃথিবীর তনু পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করিবে, তখনও তুমি দেবতাদিগের কাছে রূপ ও গুণের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজা পাইবে।"

প্রশ্ন।—"আমার সম্পর্কে এইরূপ প্রীতিকর ও প্রাণশীতল কথা অন্যে বলিতে পারে; কিন্তু তোমার মুখে, হোরেস, এ সকল কথা শোভা পায় কি?"

উত্তর।—"হাঁ, আমার মুখেই, প্রিয়তমে, এ সকল অথবা ইতোধিক প্রীতিকর কথা ইদানীং তোমার সম্পর্কে বিশেষরূপে শোভা পায়। তোমাকে আমি যেমন জানি, এ জগতে জীবের মধ্যে কে আর তেমন জানে? তোমার শরীর ও শরীর-সংস্পৃষ্টজীবন অনাঘ্রাত কুসুমের মত পবিত্র। তবে, তোমার হৃদয়ে বড় বেসী প্রচ্ছন্ন রূপাভিমান ও বড় প্রবল ভোগ-লালসা ছিল; সে সব এখন আর নাই। তোমার রূপের অভিমান, রূপনিধান জগদীশ্বরের ধ্যানে বিলয় পাইয়াছে। তোমার সে অতৃপ্ত-লালসার উদ্দান-বহ্নিও বহুকাল হইল নির্ব্বাণ হইয়াছে, এবং তাহার ভস্মরাশি অমৃতরেণুতে পরিণত হইয়া

এইক্ষণ অসংখ্য দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দান করিতেছে।

তোমার আর এক দোষ ছিল, লরা, পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা, এবং অনুজ-প্রভৃতির প্রতি উপেক্ষার ভাব। সৌভাগ্য বশতঃ, সেই বিষয়-সুখান্ধ পিতা, এইক্ষণ তোমার নিঃস্বার্থ স্নেহ ও নিঃস্বার্থ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া, প্রীতি ও পরার্থনিষ্ঠার পথ লইয়াছেন। যিনি আগে দিনান্তেও একবার ঈশ্বরের নাম লইতেন না, তিনি এক্ষণ রীতিমত ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছেন। যিনি ভুলিয়াও কখনও পরের উপকার করিতেন না,—কাহারও কোনরূপ সামান্য উপকার করিতে হইলেও, তাহাতে ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব করিতেন, তিনি এইক্ষণ আপনা হইতে অবসর খুঁজিয়া পরের উপকার করিতেছেন। এ সকলই ত তোমার পুণ্যময় জীবনের অলক্ষিত ক্রিয়ার প্রভাব।

তোমার ভাইটিও এইক্ষণ, শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে প্রেম-ধর্ম্মানুগত শ্রেষ্ঠতর জীবনের উৎকর্ষ অনুভব করিয়া, আর এক মানুষ হইয়াছে। তা ছাড়া, এ প্রদেশের কত সহস্র দুঃখী, তোমাকে মাতা ও দুহিতা জ্ঞানে উপাসনা করিয়া, জীবনের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিবার পথ পাইয়াছে, তাহার অবধি নাই। দেবপুরুষেরা তোমার অমল চরিত্র ও অতিমাত্র কোমল তপোময় চিত্তবৃত্তির এ বিচিত্র গতি নিরন্তর পাঠ করিতেছেন; এবং তুমি, কালের পরিপূর্ণতায়, লোকান্তরে সমাগত হইয়া, কিরূপ স্বপ্নাতীত সুখ-সম্পদে চরিতার্থ হইবে, তাহারও আলোচনা করিতেছেন।"

প্রশ্ন—"না, হোরেস, তুমি আমার এখনকার এই দুঃখাচ্ছন্ন কঠোর সাধনার সম্মুখে সুখ-সম্পদের এইরূপ প্রলোভন-পট ধারণ করিয়া আমাকে ধাঁধাঁয় ফেলিও না। কিন্তু তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি অনেক বারই, অনেক প্রসঙ্গে, দেবতার কথা কহিয়াছ। তুমি দেবতা বল কাহাকে, আর দেবতারা কি আমার মত দুঃখিনীরও সংবাদ লন?"

উত্তর।—"পৃথিবীর যে সকল নরনারী, পরলোকে আসিয়া, নিজ নিজ পুণ্যবলে,—পুণ্যপ্রেমময় চরিত্রের প্রভাবে, এবং বিশ্বাস-ভক্তির সুধা-স্নিগ্ধ জ্ঞানের মহিমায়, ঊর্দ্ধধামে স্থান লাভ করেন, তাঁহারাই দেবতা; এবং তাঁহারাই অধিকতর ঊর্দ্ধস্থিত, উচ্চশক্তি-সম্পন্ন, অসংখ্য-লোক-শাসন-ক্ষম, স্বভাব-সুন্দর, সর্ব্বজন-সুখাভিলাষী দেবপুরুষদিগের উপদেশ-ক্রমে পৃথ্বীধামের অনন্ত কার্য্যে অনন্তদেব-জগদীশ্বরের নিত্যনিযুক্ত ভাগ্যবান্ সেবক। তাঁহাদিগের কার্য্য অশেষ প্রকার। এই যে মানুষ অহরহঃ মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছে, তাঁহারাই চরমসময়ে তাহাদিগের আশ্রয় ও অভিভাবক হন; এবং তাহারা, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে, যে স্থানে যাইবার যোগ্য হয়, তাহাদিগকে সেইস্থানে লইয়া যান্। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ রক্ষক, কেহ শিক্ষক,—এবং সকলেই নিজ নিজ উৎকর্ষজনিত-শক্তির পরিমাণ

অনুসারে—অগতির গতি ও অন্যের উপকারক। তাঁহারা আসিতেছেন, যাইতেছেন,—উপরস্থের উপদেশ লইতেছেন, এবং সেই উপদেশ ক্রমে দুঃখীর দুঃখমোচন ও পাপদগ্ধের পরিত্রাণ সম্বন্ধে কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদিগের আলস্য নাই, অবসাদ নাই, এবং মুহূর্ত্তেরও বিরাম নাই। পরের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদিগের পরমব্রত, এবং তাহাতেই তাঁহাদিগের সুখ।

পৃথিবীর শত সহস্র শিশু, প্রতিদিন, রোগে ও নানারূপ বিপৎপাতে, বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত, কালের স্রোতে কিরূপ ভাসিয়া যাইতেছে, তাহা চক্ষে দেখিতেছ না কি? দেবতারাই তাহাদিগকে বুকে সাপটিয়া লইয়া যান; এবং তাহাদিগের লালন, পালন, পরিপোষণ, এবং শিক্ষা ও সুখ-সংবর্দ্ধনের জন্য, ঠিক্ মায়ের প্রাণে কার্য্য করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া নয়নমনের প্রীতিকর মনোহর গৃহবাসে অবস্থিত রহেন। তাঁহারা আরও কত কার্য্য করেন, তাহার অবধি নাই। পৃথিবীর প্রাসাদে ও পর্ণকুটীরে, এবং আরও নানাবিধ স্থলে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাঁহাদিগের যাতায়াত হইয়া থাকে।"

প্রশ্ন। "ভাল হোরেস, তুমি যে গৃহবাসের কথা কহিলে, অধ্যাত্মজগতের অধিবাসীরা গৃহবাস-সুখেও কি সন্তৃপ্তি লাভ করেন?"

উত্তর। "হাঁ লরা, এখানে সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ গৃহ আছে। কিন্তু এখানকার শরীর যেমন কর্ম্মফলের প্রতিকৃতি, গৃহবাসও সেইরূপ সমস্ত জীবনের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের প্রতিরূপ। যাহারা পৃথিবীতে, সোনার অট্টালিকায় বাস করিয়াও, অবস্থানুরূপ পুণ্য সঞ্চয় ও প্রতিবেশীর সুখশান্তিবিধানে বিমুখ রহে, তাহাদিগের অনেকে এখানে আসিয়া অতি দীন হীন তৃণকুটীরে আশ্রয় লয়; এবং যাহারা পৃথিবীতে, যার-পর-নাই শোচনীয় দশায়, সামান্য কুটীরে অবস্থান করিয়া, সেই অবস্থায়ও পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহারা এখানে আসিয়া, শুভাগত রাজরাজেশ্বরের মত, সোনার অট্টালিকার অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিশুরা এখানে, যেরূপ সুরম্য প্রাসাদে ও প্রাসাদ-লগ্ন সুখশোভন উদ্যানে, স্নেহকরুণার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী দেবরমণীদিগের ক্রোড়ে লালিত হইয়া, সমানবয়স্ক শিশু ও স্বর্গগত পিতামহী প্রভৃতির সঙ্গে অবস্থান করে, মনুষ্যের কল্পনাও তাহা ধারণা করিতে পারে না।"

প্রশ্ন। "হা! আমি কি সংসার-সমুদ্রের পরপারে যাইয়া একটুকু শান্তির স্থান পাইব;—শান্তিনিকেতনসদৃশ সামান্য একখানি কুটীর লাভ করিয়াও, সেখানে নয়ন ভরিয়া সর্ব্বদা তোমায় দেখিতে পাইব?"

উত্তর। "তুমি নিশ্চয়ই, প্রিয়তমে, অতি রমণীয় প্রাসাদের অধিবাসিনী হইবে; এবং সেখানে, একদিন নহে—এক বৎসর অথবা এক শতাব্দী নহে—এক কোটিকল্প কাল আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গীরূপে

সর্ব্বদা কাছে দেখিবে। ইহাই অনন্ত-প্রেম-নিলয়, প্রেমময় পরমেশ্বরের এই অনন্ত প্রেম-রাজ্যে দাম্পত্যপ্রেমের চরম পুরস্কার। যে দম্পতি একে অন্যকে আপনার একমাত্র প্রেমারাধ্য বস্তুজ্ঞানে, অনাবিল প্রাণে, চির-জীবন তপস্বীর ভাবে পূজা করে, ইহাই তাহাদিগের সেই প্রেম-তপস্যার শেষ দক্ষিণা। তাহারা দুইজনে, পরিশেষে, ঠিক একজনের মত হয়;—এক স্থানে—একই নিকেতনে, একস্থ অবস্থিত রহে;—এক উদ্দেশ্যে, একই উদার, উন্নত ও জগন্মঙ্গল্য অভিলাষে, এক সঙ্গে বিচরণ করে;—অপিচ, শিক্ষায় ও দীক্ষায়, আশায় ও আকাঙ্ক্ষায়, এবং যোগে ও জীবনের নিত্য নিয়োগে সর্ব্বতোভাবে একীভূত হইয়া, নিজ নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। তুমি, প্রিয়তমে, তোমার প্রেম-জীবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই একাগ্রহৃদয়া,—এখন ত পুণ্যপুঞ্জময়ী প্রেম-তাপসী। তুমি যে এ প্রেমব্রতের সুদূর ও সমুন্নত পরিণামে আশার সম্পূর্ণ সাফল্যে সার্থক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু—"

প্রশ্ন। "কিন্তু আবার কি হোরেস?"

উত্তর। "কিন্তুর মধ্যে অনেক কথা। আজি আমি এখন আর ভাল বোধ করিতেছি না;—লিখিতে উৎসাহ পাইতেছি না অত কথা আজি এখন গুছাইয়া লিখিতে পারিব না। আর একদিন লিখিয়া বুঝাইব।"

প্রশ্ন। "না, আমার বিশেষ অনুরোধ, যাহা কিছু পার, সংক্ষেপে লেখ।"

উত্তর। "লরা, তুমি সংক্ষিপ্ত কথায় কিছুই বুঝিবে না, অথচ অকারণ ধাঁধাঁয় পড়িবে, এবং মনে বড় ক্লেশ পাইবে।"

প্রশ্ন। "প্রাণাধিক, আমি তোমার তিরোধান অবধি অহোরাত্র যে ক্লেশে জর্জ্জরিত আছি, তাহার উপরও আবার ক্লেশ আছে?"

উত্তর। "হাঁ অল্পকাল—অত্যল্প কালের জন্য তোমার ও আমার অদৃষ্টে,—লৌকিক ব্যবহারে, সামান্য একটুকু ক্লেশ ও বিড়ম্বনা আছে। তুমি যদিও ধর্ম্মতঃ আমারই স্ত্রী, এবং কায়মনঃপ্রাণে আমারই উৎকৃষ্টার্দ্ধস্বরূপা, তথাপি দ্রষ্টব্যে তোমার শীঘ্রই আর একটা বিবাহ হইবে। ইহা অনুল্লঙ্ঘনীয়; কেন না, ইহা দেবতাদিগের বিধান।"

লরা যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত প্রাণে ও তৃষিত নয়নে প্লাঞ্চেটের পেন্‌সিল-লিখিত প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিতেছিল। যখন লেখা শেষ হইল, তখন সে ঘৃণায় ও দুঃখে আত্মহারার মত হইয়া,—আর যেন তাহার প্রাণের হোরেস সেই পুরাতন পার্থিব দেহেই তাহার সম্মুখে আছে, এইরূপ বিশ্বাসের মোহে লোকান্তরের ব্যবধান-ঘটিত সকল কথাও একবারে ভুলিয়া, পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; এবং "ছিঃ! তুমি এ কি ছাই লিখিতেছ" বলিয়া প্লাঞ্চেট ছাড়িয়া, দূরে সরিয়া বসিল। বহু দিনের পর আজি আবার লরার দুই চক্ষে ধারা বহিল। সে, বারংবারই,—যেন আপনার অজ্ঞাতসারে,—বলিতে লাগিল,—হা জগদীশ্বর! হা জগদীশ্বর!

"বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্র"

গ্রামের প্রান্তরেখায় তর-তর-বাহিনী তরঙ্গসংকুলা নদী। নদীর অদূরে, নিম্নোৎখাত তট-ভূমির উপরে, সারি সারি সৌম্য-শ্যামল, শীতলচ্ছায়াবহুল, নয়ন-মনোহর বৃক্ষ, এবং প্রত্যেক বৃক্ষেরই শাখা ও প্রশাখায় অসংখ্য কল-রুত বিহঙ্গ। বৃক্ষগুলির মধ্যে আম, জাম, কাঁটাল, কদম্ব, বকুল, বট, অশ্বথ, পাকুর এবং সাল ও শিমুল প্রভৃতি সকল জাতিই শোভা পাইতেছে; এবং প্রত্যেক বৃক্ষই, বিহগ-নিবহের সুখ-সম্পদে, অতি সুন্দর আশ্রয়তরুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু, বৃক্ষের স্থায়িতায় কাহারও বিশ্বাস নাই। কেন না, যেখানে উহারা প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম "ভাঙ্গন কূল"। পদ্মা, কীর্ত্তি-নাশা, মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি স্রোতঃ-সঙ্কট শঙ্কাজনক নদী ও নদের "ভাঙ্গন-কূল" সর্ব্বত্র সুপরিচিত; এবং ভাঙ্গন-কূলের বিষাদ-মলিন "ভয়ঙ্কর-শোভা" যে একবার নিবিষ্ট-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সে আর কখনও তাহা ভুলিতে পারিয়াছে কি না, তাহাও সংশয়িত। এক একটি বৃক্ষ, কাল-স্রোতের মত তল-বাহি জলস্রোতের ক্রমিক খননে, ক্রমে ক্রমে শীকড়ে ও শরীরে শীর্ণশক্তি হইয়া, অকস্মাৎ একদিন, বিজয়ার সুসজ্জিত প্রতিমার মত, ক্ষুধাতুর তরঙ্গের আবর্ত্তগভীর অতল-জলে ডুবিয়া যাইতেছে; এবং যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছে, তাহারা বিসর্জ্জনযাত্রী ভক্তের ন্যায়, কিছুকাল নয়ন-জলে ভাসিয়া, ধীরে ধীরে নিজ নিজ জীবনের নিত্য অনুষ্ঠানে ফিরিয়া যাইতেছে। আর অঙ্গলগ্ন বিহঙ্গনিচয়? উহারাও, অঙ্গলগ্ন সুহৃৎস্বজনের ন্যায়, সেই বৃক্ষবিরহিত, বিষাদ-চিহ্নিত শূন্য স্থানে, যেন শূন্য মনে, কিছু কাল উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, —এবং সেই একপ্রকার বিহঙ্গকণ্ঠের বিষাদ-গীতি বিরস-তানে গাইয়া, কোথাও যাইয়া উপবিষ্ট হইতেছে।

আমি অদৃষ্টদোষে, এ জীবনে, অনেকবার ভাঙ্গন-কূলের বিষাদ-সংগীত কানে শুনিয়াছি। ইদিলপুরের পূর্ব্বরেখাবর্ত্তি গ্রাম-মালার বড় বড় বৃক্ষ যখন, কএক বৎসরের ক্রমিক ভাঙ্গনে, মেঘনাদের তরঙ্গগ্রাসে একে একে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তখন সত্যই, গ্রামস্থ গৃহস্থের "হায় হায়"—শব্দের সহিত বিহগ-কণ্ঠের বিলাপধ্বনি শুনিয়া অশ্রুসিক্ত হইয়াছি। রাজাধিরাজ রাজবল্লভের সোনার রাজনগর যখন, বহুসংখ্য প্রাসাদ এবং প্রাসাদ-প্রতিম প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া, পদ্মার জলে ডুবিয়াছিল, তখন কৃষক যেমন তাহার কাঁধের লাঙ্গল ছাড়িয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়াছে, আমিও হাতের কলম বিস্মৃত হইয়া, ঠিক্ ঐ কৃষকের মতই কাঁদিয়াছি। হায়! আমি আজি কাঁদিতেছি বাঙ্গালাসাহিত্যের "ভাঙ্গন-কূল" দর্শনে। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র

এই কয়টি বৎসর হইতেই "ভাঙ্গন-কূলের" ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; এবং যেই উহার তট-রেখার এক একটি বৃক্ষ সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অমনি চারিদিকে একটা হাহাকার-ধ্বনি উঠিতেছে। এইরূপ হাহাকার-ধ্বনি এ ভাবে আর শুনিতে পারি না। বঙ্গসন্তান, অল্পদিন হইল, কএকটি অতি বড় সুন্দর ও স্বাদুফল-সমৃদ্ধ মহামহীরুহের সম্পাত-দর্শনে আকুল হৃদয়ে ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছে। সে বিলাপধ্বনির নিবৃত্তি হইতে না হইতেই বাঙ্গালি আবার যে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা প্রাণে সহ্য হয় না।

বঙ্গের সাহিত্যপ্রিয় সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই আজি যাঁহার জন্য কাঁদিয়া অধীর, তিনিও নিশ্চয়ই এ ভাঙ্গনকূলের একটি বহুশাখা-শোভী বিশাল বৃক্ষ ছিলেন। কারণ, দেখিতেছি দেশের সুদূর প্রান্তে,—মুদী পসারি, কাঠুরিয়া মিস্তিরি, কামার কুমার, শাঁখারি কাঁসারি, মণিহারি-ফিরিওয়ালা এবং মাঠের কৃষাণের কাছেও তিনি "বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্র" এই এক নামে পরিচিত; এবং তাঁহার এই অকাল-বিয়োগসংবাদে অতিনগণ্য সাধারণ লোক এবং সামান্যশিক্ষান্বিত পাঠশালার বালক-বালিকাও হৃদয়ে ব্যথিত। সাহিত্য-সেবার এরূপ সার্থকতা সকলের ভাগ্যেই সংঘটিত হয় না।

কিন্তু এ বৃক্ষের কিছু বিশেষ মহিমা, অথবা "বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্র" এ উপাধির কিছু নিগূঢ় মাহাত্ম্য আছে কি? আছে কি না, তাহা পাঠককেই বিচার করিতে অনুরোধ করিব।

ইহা সকলেই এইক্ষণ একবাক্যে ও উল্লসিতহৃদয়ে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র বঙ্গদেশে আজি একটি সজীব শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এবং সে শক্তির নিত্যনিয়মিত সাধু শাসনে, সিংহাসনে রাজা, সমাজে সামাজিক, প্রাসাদে প্রভুত্ব-শালী ভূস্বামী কিংবা ধনকুবের, কুটীরে কৃষি-জীবী, সকলেই অল্প অথবা অধিক মাত্রায়, কখনও শাসিত, কখনও উৎসাহিত, কখনও মনঃকল্পিত মন্দ কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত, এবং কখনও বা মনোবুদ্ধির অচিন্তিতপূর্ব্ব মঙ্গল্য কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ, বঙ্গের বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, ও সঞ্জীবনী, এবং তদনুকল্পে নব্যযুগ, আনন্দবাজার, ঢাকা-প্রকাশ, ঢাকাগেজেট, ও চারুবার্ত্তা প্রভৃতি পত্র দ্বারা দেশের কতই যে উপকার, আর দেশীয়দিগের কত প্রকারেই যে প্রভাব ও অধিকারের বিস্তার হইতেছে, তাহা কেহই এক ছত্তরে লিখিয়া শেষ করিতে পারে না। রাজা অবিচার করিলে, তখন লোকে দোহাই দেয় সংবাদপত্রের, এবং প্রবল প্রতিবেশী অথবা পরপীড়ন-প্রয়াসী বিচারক কিংবা পুলিষ যদি বিশেষ কোন অত্যাচার করে, তখনও লোকে আশ্রয় লয় সংবাদপত্রের।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের এই সর্ব্বজন-শাসনী স্বদেশ-রক্ষিণী প্রভাব-সম্পৎ কতকাল হইতে? সম্পদের প্রথম অভ্যুদয় অপেক্ষাকৃত পুরাতন কালের কথা হইলেও, বোধ হয় ন্যায়পরায়ণ ও হৃদয়িক ব্যক্তিরা নিঃশঙ্কচিত্তে কহিবেন যে, এই-

ক্ষণকার বঙ্গের এই অক্ষুন্ন বৈভব ও বিশেষ মহিমা যোগেন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত, অল্পমূল্যে প্রচারিত বঙ্গবাসীর "বহু প্রচার" হইতে। বঙ্গবাসীর পূর্ব্বে অতি অল্প লোকই সংবাদপত্র পড়িত, এবং তাহাও পড়িত অন্য উদ্দেশ্যে অন্য প্রকার অভিলাষে। কাব্যরসপ্রিয় সৌখীন বিষয়ীরা প্রভাকর ও ভাস্কর পড়িত, এবং প্রভাকরের সেই সুপ্রসিদ্ধ—"নমো নমো ভাস্কর, লস্কর, তস্কর নমস্তে,"—প্রভৃতিকালের উপযোগি কামধুরা শ্লেষকবিতায় কতই না আমোদ পাইত। বঙ্গীয় সংবাদপত্রের সেই ছিল একদিন। সংবাদপত্র মজলিসী ইয়ারের মত "মজার কথা" কহিয়া মন ভুলাইত বটে, কিন্তু সমবেত-জাতীয়-হৃদয়ের অন্তঃস্থিত শক্তির উপর কোন অংশেও কার্য্য করিতে সমর্থ হইত না।

প্রভাকর ও ভাস্করের পর বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ, গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের ঢাকাপ্রকাশ, এবং সম্ভাবশতক-রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিজ্ঞাপনীও, কিছু কাল, বঙ্গের অল্পসংখ্যক পাঠককে প্রাড্‌বিবেক ও মলিম্লুচ প্রভৃতি কঠোর-শব্দবহুলা কট-মট বাঙ্গালায় আমোদশূন্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া, সংবাদপত্রের আর এক পরিচ্ছেদ দেখাইল; এবং অক্ষয়চন্দ্রের সাধারণী, চুঁচুড়া হইতে সহসা প্রকাশিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গালার অঙ্গরাগচ্ছটা প্রদর্শনের দ্বারা, সাহিত্যিকদিগের আনন্দ জন্মাইল। কিন্তু, কিবা শাস্ত্রাচার্য্যের সোমপ্রকাশ, কিবা সাহিত্যরসিকের সাধারণী, ইহার কাহারও দ্বারা দেশের প্রকৃত কাজ হইল না,—দেশীয় আপামর-সাধারণের আশা মিটিল না।

কিন্তু, যখন ইহার কিছুকাল পরে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের "বঙ্গবাসী" নূতন মূর্ত্তি ও নূতন স্ফূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, টোলের পণ্ডিত, তহশীলকাচারির পাটওয়ারি, এবং ধনী ও নির্দ্ধন, সুশিক্ষিত ও সামান্যশিক্ষিত প্রভৃতি সকল শ্রেণির লোককেই সংবাদপত্র পড়িবার জন্য উৎসুক করিয়া তুলিল;—ফিরিওয়ালারাও যখন নগরে ও গ্রামে, গলিতে গলিতে ও পল্লীতে পল্লীতে, দৈ-দুধের মত নগদ দুপয়সায় বঙ্গবাসী বিক্রয় করিয়া এক নূতন রঙ্গ দেখাইতে লাগিল; এবং একই বঙ্গবাসী যখন, হরবোলার মত, হাস্যকরুণ-কান্তমধুর প্রভৃতি নানা রসের নানা কথা কহিয়া, ও মন্বত্রি-প্রমুখ মহর্ষিদিগের সুদূরযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের গুরুতর বোঝা মাথায় বহিয়া, সকল শ্রেণির পাঠককেই প্রাণপ্রিয় ভোজ্য যোগাইতে আরম্ভ করিল, তখন বঙ্গের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, সকল দিকেই একটা জয়ধ্বনির মত আনন্দধ্বনি উঠিল;—বঙ্গে সংবাদপত্র-নিহিতা সামাজিক ও সাহিত্যিক শক্তির অভাব ছিল, বঙ্গবাসী সেই অভাব পূরণ করিয়া বাঙ্গালির হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া দিল। বঙ্গবাসী এখন পুরাণ হইয়াছে। বঙ্গবাসীর পথানুসারি প্রতিযোগি পত্রনিচয়ও, এইক্ষণ, যশে ও মানে পরিপুষ্ট হইয়া, পুরাতন বস্তুর মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহার দূর-দর্শিনী প্রতিভ

প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাঁহার নাম এ বঙ্গে এত শীঘ্রই পুরাণ হইবে কি? যিনি কবিকৃত্তিবাসের সে কোমল-মধুর কবিতা লিখিবার শক্তি না পাইয়াও, তাঁহারই মত সৌভাগ্যপ্রভাবে, দাঁড়ি মাঝী, এবং ধোপা নাপিতকেও বাঙ্গালা শিখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, বাঙ্গালি তাঁহাকে,—বঙ্গবাসীর সে ক্ষণজন্মা যোগেন্দ্রচন্দ্রকে, সহজেই ভুলিতে পারিবে কি?

কিন্তু বঙ্গবাসীই যোগেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে। তিনি রাজলক্ষ্মী, নেড়া হরিদাস ও মডেলভগিনী প্রভৃতি বহুসংখ্য উপাদেয় উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে উচ্চ আসন পাইয়াছেন;—বাঙ্গালা-লেখার নূতন ও পুরাতন বিবিধ বাঁধা রীতির পার্শ্বে আপনিও একটি তরল-কোমল শব্দস্থখোচ্ছলা সরল রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া ভাষার বৈভব বাড়াইয়াছেন;—বর্ষে বর্ষে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মহাভাগবত, এবং পুরাণ ও স্মৃতিসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা, দেশের সকল প্রকার লোকের মধ্যেই, শাস্ত্রীয় জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়াছেন;—শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ও বাঙ্গালার সুদুর্লভ-সাহিত্য গ্রন্থ প্রচারের দ্বারা দেশের অতি দীন-দুঃখী পাঠকের গৃহেও গ্রন্থালয় স্থাপনের আনন্দ জন্মাইয়াছেন;—তাঁহার হিন্দি বঙ্গবাসীর দ্বারা হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশেই বাঙ্গালির মানসিকশক্তির মাহাত্ম্য বাড়াইয়াছেন,—এবং অচির-প্রকাশিত টেলিগ্রাফের প্রচার-দ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যেও দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা পাঠের পথ খুলিয়াছেন।

এমন অক্লান্তকর্ম্মা নীরব কর্ম্মবীর,—এমন সর্ব্বতোমুখ-প্রতিভাসম্পন্ন প্রশান্তস্বভাব সাহিত্যশূর বঙ্গদেশে শীঘ্রই আবার জন্মগ্রহণ করিবে, এইরূপ আশা করিতে আমাদিগের সাহস হয় না। অথবা দুঃখিনী বঙ্গ-মাতা, এইরূপ সুকৃতিসন্তানকে কালের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, শীঘ্রই প্রাণে সান্ত্বনা পাইবেন, এমনও আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। আমাদিগের যে গিয়াছে, সে-ই একটা দিক্ অন্ধকার করিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান আর কে পূরণ করিয়াছে? যোগেন্দ্রচন্দ্রও দেশের একটা দিক্—দেশীয় সাহিত্যক্ষেত্রের একটা ভাগ অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন। তবে, তাঁহার এই এক বিশেষ সৌভাগ্য, তিনি তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভগুলিরে জলস্ত আলোক-স্তম্ভের মত উদ্দীপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের বঙ্গবাসী, বিদ্যাসাগর-চরিত ও শকুন্তলারহস্য-প্রণেতা প্রসিদ্ধনামা লেখক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রভৃতি ভক্ত সহযোগিদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে; এবং কিবা বঙ্গবাসী, কিবা টেলিগ্রাফ, কিবা শাস্ত্রপ্রকাশ, কিবা সাহিত্যিক গ্রন্থপ্রকাশ, তৎপ্রবর্ত্তিত সমস্ত কার্য্যই সমান ভাবে রক্ষা করিবার জন্য, শ্রীমান্ বরদাপ্রসাদ বসু প্রভৃতি পিতৃভক্ত ও পৈত্রিক কর্ম্মানুরক্ত পুত্রত্রয় প্রগাঢ় উৎসাহের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় ইঁহাদিগের উৎসাহ ও উদ্যম জীবনের নূতন ব্রতে ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধিত হউক; এবং স্বর্গগত যোগেন্দ্রচন্দ্রের সুফলা কীর্ত্তি অসংখ্য বাঙ্গালির গৃহে আরও বহুকাল সুখ-শান্তি বিতরণ করুক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত"। বাঙ্গালা-সাহিত্য, শিল্পবিজ্ঞানের গ্রন্থসম্পদে যার-পর-নাই দরিদ্র হইলেও, পরমার্থতত্ত্বের গ্রন্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার প্রমাণ বাঙ্গালার গীতা-সাহিত্য। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা যে পারমার্থিক সাহিত্যজগতের একটি প্রসিদ্ধতম বস্তু, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। সেই এক ভগবদ্-গীতা সম্বন্ধে টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, অনুভাষ্য, গদ্যানুবাদ ও পদ্যানুবাদ নামে বাঙ্গালায় এত গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহাতে ছোট খাট একখানি গ্রন্থধানীর একটা দিক্ পূর্ণ হইতে পারে। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়কে যদি গীতাসাহিত্য নামে অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে, বাবু সত্যেন্দ্রনাথের এই গীতা-নুবাদ নিশ্চয়ই তন্মধ্যে উচ্চকল্পের গ্রন্থ বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য।

এই বৃহৎ গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগে উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় ভাগে গীতার অনুবাদ। উপক্রমণিকা অংশ পৃথক্ মুদ্রিত হইলে, উহাতেও একখানি অনতিবৃহৎ উপাদেয় গ্রন্থ হয়। উহা গীতার কাল নির্ণয়, গীতার ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং গীতার দর্শন, এই তিন নামে তিনটি দীর্ঘ প্রবন্ধে পল্লবিত, এবং প্রত্যেক প্রবন্ধই গীতাসংক্রান্ত বহুবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূরিত। গ্রন্থকার এই উপক্রমণিকাটি মাত্র লিখিয়া নিবৃত্ত রহিলে, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ যশ হইত। কারণ, উহার আদ্যোপান্ত সমস্তই পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমশীলতার পরিচায়ক। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ পদ্যানুবাদ। অনুবাদের কথাই আগে কহিব। কেন না, অনুবাদ লইয়াই গ্রন্থ।

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাসাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ,—গীতিরচনায় প্রথিতনামা কবি। তাঁহার কোন কোন তত্ত্বসংগীত তৃষাতুর উপাসকের হৃদয়ে অমৃতধারা ঢালিয়াছে; এবং বাঙ্গালির প্রাণে স্বর্গীয় অমৃতলহরীর মত অনুভূত হইয়াছে। তাঁহার এ অনুবাদও প্রশংসার্হ। ইহা প্রায় সকল স্থলেই সরল,—অনেক স্থলে যার-পর-নাই সুন্দর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বত্র মূলের অনুরূপ অথবা আক্ষরিক নহে। গীতা ভারতীয় হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং গীতার অনুবাদ সর্ব্বাংশেই আক্ষরিক হওয়া আবশ্যক।

আক্ষরিক-অনুবাদের উপযোগি সামগ্রীও অনেক আছে। কারণ, সত্যেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে আরও অনেকে গীতার অনুবাদ করিয়াছেন; এবং তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপনে অন্যকৃত অনুবাদ লইয়া আলোচনার কথা আপনিই কহিয়াছেন। সেই সকল অনুবাদ মূলের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া পড়ি-

লেই, লেখার দোষ ও গুণ, অভাব ও বৈভব, চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট পরিলক্ষিত রহে। এমন অবস্থায়, আক্ষরিক অনুবাদের জন্য এইরূপ সৌভাগ্যসম্পদ সত্ত্বেও, সুধীর-প্রকৃতি সত্যেন্দ্র বাবু কেন অনেক স্থলেই মূলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অতিক্রমের নিদর্শন দেখাইব। প্রথম অধ্যায়ের মূলে অর্জ্জুনের উক্তিতে—

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥২৮।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥
নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥" ৩১॥

ইহার অনুবাদ এইরূপ,—

"আত্মীয় স্বজন হেরি,
হে মুরারি, যুদ্ধে সম্মিলিত,
শুকায় আনন মম,
সর্ব্ব অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত; । ২৮।
শিহরি উঠিছে গাত্র,
কাঁপে দেহ থর থর তাহে,
হাত হ'তে গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে
শোষে তনু দাহে। ২৯।
আর না তিষ্ঠিতে পারি
উতলা আমার হল মন,
নানা কুলক্ষণ, সখা,
দিশি দিশি করি নিরীক্ষণ। ।৩০।
স্বজনে বধিলে রণে
কোন মতে নাহি পরিত্রাণ,
চাহি না বিজয় আমি,
রাজ্য সুখ, ঐশ্বর্য্য সম্মান। ৩১।"

অষ্টাবিংশ শ্লোকের মূলে প্রথম আছে অঙ্গাবসাদের কথা, তার পরে আছে মুখশোষের কথা। অনুবাদক, এই পৌর্ব্বাপর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া, প্রথম লিখিয়াছেন মুখশোষের কথা, পরে লিখিয়াছেন রোমাঞ্চের কথা। পৌর্ব্বাপর্য্যের ঈদৃক্ ব্যতিক্রম, দোষ হইলেও, সামান্য দোষ। কিন্তু শব্দার্থের ব্যতিক্রম সামান্য দোষ নহে। মূলে আছে "সীদন্তি মম গাত্রাণি",—ইহার অনুবাদে "সর্ব্ব অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত" এই পদাবলী কেমন করিয়া মানিয়া লইব? মূলের 'সীদন্তি' পদ অতি গভীর দুঃখ, অথবা গভীরতর বিষাদ ও ভয়ের জ্ঞাপক। 'রোমাঞ্চ' পদে সেই অর্থব্যক্তি হয় কি? অপিচ, ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে যখন 'রোমাঞ্চ' শব্দের পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে, তখন এই

শ্লোকে ইহার পুনরুল্লেখ নিশ্চয়ই অধিকার-বহির্ভূত। উল্লিখিত অষ্টাবিংশ শ্লোকের অনুবাদে কবিবর নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—
"দেখিয়া স্বজন, কৃষ্ণ! সমবেত, রণোৎসুক,
অবসন্ন গাত্র মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ। ২৮।"

এই অনুবাদের ছন্দ একটু "সংস্কৃত ঘেঁসা" হইলেও ইহা বিশুদ্ধ ও অর্থজ্ঞাপক। দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদে,—"হাত হ'তে গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে" এই পংক্তি প্রকৃত অর্থের জ্ঞাপক; কিন্তু তথাপি ইহা উল্লিখিত কবিতায় স্থান পাইতে পারে না। কেন না, গ্রন্থকার যে ছন্দ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম পংক্তিতে আট আখর ও দ্বিতীয় পংক্তিতে দশ আখর। কিন্তু তিনি এই এক পংক্তিতে বারটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া স্বপ্রবর্ত্তিত ছন্দের ভয়ানক ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন, এবং ইহার পরের পংক্তিতে দশ আখরের পরিবর্ত্তে ছয়টি আখর দিয়া আরও গোল বাধাইয়াছেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার "সংস্কৃত ঘেঁসা" ছন্দে লিখিয়াছেন,—
"পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত"

আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায়,এ স্থলে, নিম্নলিখিত পংক্তি দুইটি, মূলের অর্থ এবং গ্রন্থ-পরিগৃহীত ছন্দের অধিকতর অনুরূপ হয়। যথা,—"হাতের গাণ্ডীব খসে,
দগ্ধ হয় তনুত্বচ দাহে।"
"তনুত্বচ" শব্দে আপত্তি থাকিলে, "গাত্রচর্ম্ম" লেখা যাইতে পারে।

ত্রিংশ শ্লোকের অনুবাদে "ভ্রমতি" পদের ভাবার্থজ্ঞাপনে 'উতলা' শব্দ এবং একত্রিংশের অনুবাদে "শ্রেয়ঃ" অর্থে 'পরিত্রাণ' শব্দের প্রয়োগ ঠিক্ হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। অথচ ঐ ত্রিংশ শ্লোকের কোথাও "দিশি দিশি" শব্দ নাই, কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু তাহা আপনা হইতে ভরিয়া দিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের পুস্তকে, এই শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ, সর্ব্বাংশে মূলের অনুরূপ হইয়াও, সরল হইয়াছে। যথা,—
"নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন,
হে কেশব, দুর্নিমিত্ত করিতেছি দরশন।
"বধিয়া স্বজনে রণে নাহি দেখি শ্রেয়োমুখ।
না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ, নাহি চাহি রাজ্যসুখ।"

ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, "ভ্রান্ত" শব্দটি উপরিধৃত পংক্তিতে ভাল বসে নাই। "হইতেছে ভ্রান্ত মন", এইস্থলে "হতেছে ভ্রমিত মন" "অথবা ভ্রমিতেছে মোর মন" বলিলেই বোধ হয় অর্থব্যক্তি ও বাঙ্গালার বাঙ্নিয়মের সহিত বেশী সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু "ভ্রান্ত" আর "উতলা" এই দুইটি শব্দের মধ্যে "ভ্রান্ত" শব্দই "ভ্রমতি" পদের অধিকতর সন্নিহিত।

যাহা হউক, কুত্রচিৎ অর্থাতিক্রম এবং ক্বচিৎ বা অতিরিক্ত পদনিবেশ-প্রভৃতি দোষ সত্বেও সত্যেন্দ্র বাবুর এ গ্রন্থ সাধারণতঃ অনুবাদের লালিত্য গুণে একশ্রেণিস্থ পাঠকের বিশেষ প্রীতিকর হইবে। তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপনে নবীনচন্দ্রকৃত অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তৎপ্রণীত পুস্তকের দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রের অনুবাদ, সকল

স্থলে, জলের মত তরল, অথবা সমালোচ্য অনুবাদের মত সুখ-শ্রুত না হইলেও, উহা যে মূলের একটু বেশী নিকটবর্ত্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আমরা উপক্রমণিকার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে অসমর্থ। কারণ, গ্রন্থকার ৯৬ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘপ্রবন্ধে এত ভালকথা ও নূতনকথার অবতারণা করিয়াছেন যে, সমালোচক অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা ব্যয় না করিলে, প্রকৃতপক্ষে কিছুই বলিতে পারে না। তবে, অতি সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার উপক্রমণিকায় যে সকল ভালকথা আছে, তাহার সমস্তই নূতন নহে, এবং যে সকল নূতনকথা আছে, তাহারও সমস্তই ভাল নহে। তদীয় সারসিদ্ধান্ত যে হিন্দুসমাজের হৃদ্য হইবে না, ইহা বলা অনাবশ্যক।

উপক্রমণিকার প্রথম পৃষ্ঠায় "Expected" অর্থে "প্রত্যাশিত" শব্দ দেখিয়া আমরা একটুকু বিস্মিত হইয়াছি। এখনকার এই বিদেশিবর্জ্জনের দিনে বাঙ্গালায় এইরূপ বিসদৃশ বিদেশিগন্ধি শব্দ কোন অংশেও শোভা পায় কি? "প্রত্যাশিত" শব্দ ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডায়মান হইতে পারে কি না, সে বিষয়েও আমাদিগের অতি বড় সন্দেহ। "তারকাদিভ্য ইতচ্" এই প্রসিদ্ধ সূত্রের আশ্রয় লইয়া, 'তারকিত' ও 'পল্লবিত' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 'প্রত্যাশিত', এই নিষ্প্রয়োজন-নূতন শব্দ সৃষ্টি করিলে, উহার অর্থ হয় প্রত্যাশান্বিত অথবা প্রত্যাশাযুক্ত, এবং সুতরাং উহা বিশেষণ হয় প্রত্যাশাকারী পুরুষের। সে অর্থে লেখকের উদ্দেশ্য রক্ষা পায় কোথায়? "Expected" শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদে আশস্ত, অথবা ণিচ্ প্রত্যয়ের সাহায্যে আশংসিত পদ ব্যবহার করা যায় কি না, তাহা পণ্ডিতদিগের বিচার্য্য।

উপক্রমণিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায়, গ্রন্থকার, গীতাপ্রোক্ত কথার সম্ভব ও অসম্ভব-বিচারে, গুণাকর-কবির দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"শিলা জলে ভেসে যায়,
বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

আমরা এই উদ্ধৃতির পার্শ্বে নোট লিখিয়া রাখিয়াছি—"ছিঃ! কি ভয়ানক আত্ম-বিস্মৃতি!" বাবু সত্যেন্দ্রনাথ উদারপ্রকৃতি ও উচ্চাশয় পুরুষ; বোধ হয় কতকটা সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত। তাই, গীতার অলৌকিকবাদ-সংক্রান্ত অতি গভীরতত্ত্ব বাক্যবলে উড়াইতে যাইয়া, তিনি ভ্রমবশতঃ, গুণাকরকৃত বর্ণনাবিশেষের পংক্তিদ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই পংক্তি ক'টি প্রত্যাহৃত হইবার যোগ্য

উপক্রমণিকার শেষ পৃষ্ঠায় "সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্মগ্রন্থ" এই পদদ্বয়ও তাদৃশক্ষমতাপন্ন বিজ্ঞ-লেখকের উপযুক্ত বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় নাই। এইরূপ অপপদ নিশ্চয়ই লেখনীর আকস্মিক স্খলন অথবা মুদ্রাকর-প্রমাদ। কিন্তু এ সকল অনবধানতাজনিত দোষের কথা পরিত্যাগ করিলে, গ্রন্থে প্রশংসার কথাও অশেষ আছে, এবং সেই জন্যই এই

পুস্তকের পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ একান্ত প্রার্থনীয়।

২।—"A Note on Dharma-Gola or A System of Co-operative Corn-Bank for Prevention of Famine with Rules and Regulations, by Rai Parvati Sankara Choudhuri"—আমাদিগের এ দেশে মাঝে মাঝেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। সে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দেশীয় ধান্যজীবী কৃষকেরা, রাজা, রাজপুরুষ ও ভূম্যধিকারিদিগের সাহায্য ভিন্ন, আপনারা কিছু কার্য্য করিতে পারে কি? ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতার সুপরিচিত জমিদার, সেই প্রশ্নের উত্তরে, "ধর্ম্মগোলা" নামক এক প্রবন্ধ ইংরেজীতে লিখিয়াছেন; এবং প্রবন্ধের সঙ্গে, তেওতা ও জয়গঞ্জের ধর্ম্মগোলা কেমন চলিতেছে, তাহার কতকগুলি নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া, এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

রায় পার্ব্বতীশঙ্করের প্রকৃত পুস্তক পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক নহে। তাহার উপর অতিরিক্ত দশ পৃষ্ঠা ধর্ম্মগোলার নিয়মাবলী। সুতরাং এ প্রবন্ধ যে সাহিত্যিক সামগ্রী নহে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু, প্রবন্ধলেখক দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আপনার উদ্ভাবনী বুদ্ধি দ্বারা, ধর্ম্মগোলা অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে ধান্যভাণ্ডার সংস্থাপনের যে নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নামে বঙ্গের সর্ব্বত্র সাধুবাদ হওয়া অসঙ্গত নহে। তিনি দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা প্রভৃতি বহুগুণে বঙ্গীয় ভূস্বামিগণের ভূষণস্বরূপ। যদি কালে, বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, প্রস্তাবিত প্রণালীতে ধর্ম্মগোলা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেই পুণ্যেই তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবেন। তাঁহার এই প্রবন্ধটি ইংরেজীতে লিখিত না হইয়া, কৃষকেরাও বুঝিতে পারে এইরূপ সহজবোধ্য সরল বাঙ্গালায় লিখিত হইলেই ভাল হইত; এবং ইহা, আট আনা মূল্যে বিক্রীত না হইয়া, বিনা মূল্যে সর্ব্বত্র উপস্থিত ও বিতরিত হইলেই শোভা পাইত। এ কার্য্য এখনও হইতে পারে। কারণ, তিনি যাহা ইংরেজীতে লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে, তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তির, এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিতে পারে না।

৩।—"A Discourse on the Study of Sanskrit, by Bisweswar Das B. A."—প্রবন্ধরচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, সংস্কৃতশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে, যেরূপ উৎসাহের সহিত হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই পণ্ডিতসমাজের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার প্রবন্ধ একবিংশতি পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়া থাকিলেও, ইহা পাঠ করিয়া পাঠক নূতন চিন্তার পথ পাইবেন। প্রবন্ধ প্রকৃতই সুপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে, পাঠসময়ে হৃদয়ে একটুকু প্রীতি জন্মিলেও পিপাসার তৃপ্তি জন্মে না।

চতুর্থ খণ্ড] ভাদ্র, ১৩১২ সন। [৫ম সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৫

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।৷০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভাদ্রের "বান্ধব" প্রকাশিত হইল। ৺ পূজা অতি নিকটবর্ত্তী। গ্রাহকবর্গের সহানুভূতিই বান্ধবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। গ্রাহকবর্গ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে এই সময় সত্বর নিজ ২ দেয় প্রদানে বাধিত করিবেন।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৵০	৩।৵০
ষাণ্মাসিক	২৲	৶০	২৶০

পশ্চাদ্দেয়।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৪৲	।৵০	৪।৵০
ষাণ্মাসিক	২।০	৶০	২॥৵০

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারি-সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হয় না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। গ্রাহক-নম্বর ব্যতিরেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যেও বড় অসুবিধা ঘটে। সুতরাং গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে কিংবা মূল্য প্রেরণ করিবার সময় দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না। নূতন গ্রাহকেরা "নূতন" এই শব্দের উল্লেখ করিবেন।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

☞ কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

বান্ধব-কুটীর,—ঢাকা।
১৩১১ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

প্রকৃতি পুরুষ বিবেক

এবং

জন্ম ও মৃত্যু।

আমরা গত আশ্বিন মাসের বান্ধবে "মহামায়া" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের মত বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তদীয় প্রিয় শিষ্য, বয়স্য ও ভক্ত উদ্ধবকে এই বিষয়ে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্য পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

মানবদেহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, নভোনিল, জ্যোতিরূপ প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই ইহার অন্তর্ভুক্ত আছে।

উদ্ধব ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে প্রভো! আমি শুনিয়াছি আপনি অষ্টাবিংশতি প্রকার তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঋষিরা কেহ ষড়্‌বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়ষ, কেহ ত্রয়োদশ, কেহ একাদশ, কেহ নয়, কেহ সাত, কেহ ছয়, কেহ চারি সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন। ঋষিরা কি অভিপ্রায়ে তত্ত্বসংখ্যার নানারূপ পার্থক্য ও বৈচিত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।" শ্রীভগবান্ বলিলেন, "আমার মায়ামোহিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। শম, দম, সাধন দ্বারা তাঁহাদিগের মতভেদ নিরাকৃত হয়। তত্ত্ব সকলের পরস্পর অনুপ্রবেশদ্বারা, অর্থাৎ এক তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, যেমন কারণতত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বের অনুপ্রবেশ এবং কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বের অনুপ্রবেশ, এইরূপে বক্তার অভিপ্রায় ও যুক্তি অনুসারে তৎসমুদায় গৃহীত হইয়া থাকে।

অনাদি কাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান সম্ভবে না, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং প্রকাশজ্ঞান। এই জন্য জীব ও ঈশ্বর ভেদ করিলে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। আবার উভয়ের চিৎশক্তির অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অত্যন্ত ভেদ কল্পনা করা বৃথা। তবে যে আত্মজ্ঞান নিবন্ধন ভেদ দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানও সত্ত্বগুণমূলক, এবং সত্ত্বগুণ প্রকৃতির গুণ মাত্র। এইরূপ যুক্তিতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়।

প্রকৃতির্গুণ সাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ॥
সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞান মিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেবচ॥
(শ্রীভাগবত, ১১।২২।১১—১২ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)।

সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই তিন গুণ জীবের নহে। সত্ত্বগুণ স্থিতি সম্পাদন করে, রজোগুণ উৎপত্তির হেতুভুত হয় এবং তমোগুন নাশ করে। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে কর্ম্ম, এবং তমঃ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং যাঁহা হইতে গুণক্ষোভ উৎপন্ন হয় তিনিই ঈশ্বর, তিনি কাল (কালাখ্য স্বচেষ্টাত্মক ঈশ্বর), স্বভাব (কর্ম্মবাসনা ও কর্ম্মপরিণাম) এবং সূত্র (মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াশক্তিপ্রধান প্রাণাখ্য মহতত্ত্ব)। সুতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা ব্যতীত মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে সমস্ত তত্ত্বই জড়া প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ও অচিৎ।

প্রকৃতির পরিবর্ত্তে যদি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন তত্ত্ব ধরা যায়, তাহা হইলে ভগবদুক্ত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই নয়তত্ত্ব।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক উভয়াত্মক মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পঞ্চ বিষয় বা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভুতের সূক্ষ্ম তন্মাত্র।

এই সমুদায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তদুপরি পরমাত্ম ধরিলে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব, এবং প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে বিশ্লিষ্ট করিলে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়।

সৃষ্টির আদিকালে পুরুষ দর্শনমাত্র করেন —"স ঐক্ষত"। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপিণী হইয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ দ্বারা সৃজ্য, পাল্য ও সংহার্য্য পদার্থের আদ্যাবস্থা বা কারণ ভাব ধারণ করেন।

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ধাতু সকল প্রকৃতির বলে লব্ধবীর্য্য হইয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন।

প্রত্যেক মহাভুতে তৎপরবর্ত্তী মহাভুতের সৃষ্টির বীজ সূক্ষ্মরূপে নিহিত আছে। আকাশে মরুৎ সূক্ষ্মাবস্থায়, মরুতে তেজ সূক্ষ্মাবস্থায়, তেজে অপ্ সূক্ষ্মাবস্থায় এবং অপে ক্ষিতি সূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। অথবা তন্মাত্র "শব্দ"দ্বারা আকাশ, স্পর্শ দ্বারা মরুৎ, গন্ধ, রস ও রূপদ্বারা অপর মহাভুত, ও সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহা হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সৃষ্টির কথা পরে বলা যাইবে।

যাঁহারা চারি তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা তেজঃ, জল, অন্ন ও আত্মা এই চারিতত্ত্ব স্বীকার করেন, এবং ইহা হইতে অন্য সমুদয় তত্ত্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া তৎসমুদায়কে ইহাদের অন্তর্ভূত বলেন।

ছয় তত্ত্ববাদীদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত ও পরমাত্মা এই ছয় তত্ত্ব মাত্র। পরমাত্মা ভূত সকলকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন, সুতরাং জীব পরমাত্মাতে ও অন্য সমুদয় ভূতে অন্তর্ভূত মাত্র।

সপ্ততত্ত্ববাদীদের মতে ক্ষিত্যপ্ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই সপ্ত তত্ত্ব। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি ইহাদের অন্তর্ভূতমাত্র।

সপ্তদশ তত্ত্ববাদীরা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, এবং আত্মা এই সপ্তদশতত্ত্ব স্বীকার করেন।

ষোড়শতত্ত্ব গণনায় আত্মাকেই মন বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তদন্তর্ভূত বলা হয়।

ত্রয়োদশ তত্ত্ববাদীরা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই ত্রয়োদশ তত্ত্ব স্বীকার করেন।

অনন্তর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রকৃতি মায়া, পুরুষ ঈশ্বর, উভয়ের স্বরূপ বিভিন্ন, কারণ প্রকৃতি জড়া অচিৎ ও পুরুষ চিৎ অজড়। তথাপি প্রকৃতির কার্য্য,—অচিৎ দেহে ও চিৎ আত্মার ভেদ দৃষ্ট হয় না কেন? প্রকৃতির কার্য্য,—দেহে আত্মা লক্ষিত হয়েন এবং আত্মাতে দেহ লক্ষিত হয়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ।
মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈ র্বিধত্তে।
বৈকারিক স্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেকথাধিভূতমধিদৈবমন্যৎ॥

(শ্রীভাগবত, ১১।২২।২৮—২৯)।

প্রকৃতি এবং পুরুষ অত্যন্ত ভিন্ন। প্রকৃতি নানাবিকারযুক্ত, পুরুষ নির্ব্বিকার; প্রকৃতি নানাত্ববিশিষ্ট, পুরুষ এক, প্রকৃতির জ্ঞান অন্যের সাপেক্ষ, পুরুষের জ্ঞান নিরপেক্ষ, প্রকৃতি অন্য কর্ত্তৃক প্রকাশ পায়, পুরুষ স্বপ্রকাশ। দেহাদিরূপ প্রকৃতির কার্য্য ও সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রকৃতির গুণক্ষোভবশতই হইয়া থাকে। হে অঙ্গ! আমার ত্রিগুণময়ী মায়া নানা প্রকার ভেদবুদ্ধি বিধান করে, এবং নানা প্রকার বিকারবিশিষ্ট হইলেও প্রধানতঃ ত্রিবিধ বিকারযুক্ত,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

চক্ষু আধ্যাত্মিক, রূপ আধিভৌতিক, এবং অক্ষি গোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যাংশ আধিদৈবিক। ইহারা পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু পরস্পরের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। চক্ষু দ্বারা রূপের জ্ঞান জন্মে। চক্ষু জড় পদার্থ, তাহার রূপজ্ঞান গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না, সুতরাং চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রবৃত্তি অনুসারে রূপজ্ঞান হয়। আকাশে বর্ত্তমান

যে সূর্য্যমণ্ডল, তাহা অপরের অপেক্ষা ব্যতীত, স্বয়ংই স্বপ্রকাশ। সেইরূপ পরমাত্মা এই সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আদি কারণ, যে সকল হইতে ভিন্ন, স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকাশকদিগেরও প্রকাশক, অতএব তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব স্বতঃসিদ্ধ। চক্ষুর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু, কর্ণ শব্দ ও দিক্, জিহ্বা রস ও বরুণ, নাসিকা গন্ধ ও অশ্বিনীকুমার, চিত্ত চেতয়িতব্য ও বাসুদেব, এবং মন মন্তব্য ও চন্দ্র, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

প্রলয়-সময়ে এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় পদার্থ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে লীন ছিল। সেই বৃহৎ (ব্রহ্ম) একমাত্র পরব্রহ্ম স্বীয় যোগমায়ার সাহায্যে পুরুষ ও কার্য্যকারণরূপিণী প্রকৃতিরূপে দুই প্রকার হইলেন। প্রলয়কালে পরমাত্মা আত্মস্থ থাকেন, এই বিশ্বের উৎপত্তি লয় দ্বারা তিনি লক্ষিত হয়েন।

জীবের অদৃষ্টবশতঃ এবং পুরুষের ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির গুণসাম্য ভঙ্গ হইয়া গুণক্ষোভ হয় ও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণত্রয় উৎপন্ন হয়। সাংখ্যদর্শন মতে এই তিন গুণ অতি সূক্ষ্ম মহাণু, তাহাদের নানা প্রকার সংযোগ বিয়োগে নানাবিধ সৃষ্টির বিকাশ ঘটে। প্রথমে ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, তৎপর সেই গুণবিকার হইতে জীবের ভ্রম হেতু বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মিল। তামস অহঙ্কার হইতে মহাভূত, তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও বৈকারিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জন্মিল।

পুরুষের ইচ্ছানুসারে পঞ্চীকৃত মহাভূত দ্বারা ব্রহ্মের আয়তনস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, ব্রহ্মের নাভিদেশে বিশ্বনামক লোককারণ এক পদ্ম উৎপন্ন হইল, সেই পদ্মে চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তপস্যাবলে রজোগুণ দ্বারা লোকপালগণের সহিত মর্ত্ত্যদিগের আবাসভূমি ভূর্লোক, ভূতগণের আবাসভূমি ভুবর্লোক, দেবতাদিগের আবাসভূমি স্বর্লোক, এবং নির্ম্মলগতি যোগী তাপস ও সন্ন্যাসীদিগের আবাসভূমি মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক এবং ভক্তগণের আবাসভূমি বৈকুণ্ঠলোক সৃষ্টি করিলেন। মর্ত্ত্যগণ স্বর্লোক পর্য্যন্ত গমন করিলেও পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন, কিন্তু ভক্তিযোগবলে কিংবা তপস্যাবলে কোনরূপে মহর্লোকে উপনীত হইতে পারিলে, তথা হইতে ক্রমোন্নতি হয়, পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই জন্যই কথিত হয়, মানবজন্ম দুর্ল্লভ জন্ম, দেবতারাও তাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

যতকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, তত কাল পর্য্যন্ত পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে জীবদিগের নিমিত্ত অবিচ্ছেদে এই মহৎ সৃষ্টি প্রবৃত্ত থাকে। তৎপর যেরূপ ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীতক্রমে লয় হয়। যথা—মর্ত্ত্য শরীর অন্নে লীন হয়, অন্ন ওষধিবীজে লীন হয়, ওষধিবীজ পৃথিবীতে ও পৃথিবী

গন্ধে লীন হয়। গন্ধ জলে লীন হয়, জল রসে, রস জ্যোতিতে, জ্যোতি রূপে লীন হয়। রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শে, স্পর্শ আকাশে, আকাশ শব্দ তন্মাত্রে, ইন্দ্রিয় সকল তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বকারণে লীন হয়। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল মনে লীন হয়। শব্দ তামস অহঙ্কারে, তামস অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব স্বীয় গুণে লীন হয়, গুণ সকল অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত কালে লীন হয়। অব্যয় কাল মায়াময় জীবে লীন হয়, জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় পায়, শেষে পরমাত্মা কেবল আত্মস্থ থাকেন।

সাংখ্যকারিকায় আছে;—

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥"

ধর্ম্মের দ্বারা মানবগণের ঊর্দ্ধগতি, অধর্ম্মের দ্বারা অধোগতি প্রাপ্তি ঘটে। প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান জন্মিলে, মোক্ষ লাভ হয়। বিপর্য্যয় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞানতা হেতু বন্ধ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বন্দীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

এখন জন্ম মৃত্যুর বিষয় কথিত হইতেছে। জন্ম মৃত্যু দুই প্রকার, (১) লোকপ্রসিদ্ধ জন্ম মৃত্যু, (২) সূক্ষ্ম জন্ম মৃত্যু।

বাস্তবিক জীবাত্মা অজন্মা ও অমর, তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। যেমন মহাভূত অগ্নি কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, কিন্তু তিনি কাষ্ঠ সংযোগে ও বিয়োগে জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হন, সেইরূপ জীবাত্মা অজ ও অমর হইয়াও কর্ম্মবীজ প্রভাবে ভ্রান্তিবশতঃ জাত ও মৃতের ন্যায় প্রতীত হয়েন।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতং।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥
ধ্যায়ন্মনোঽনুবিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনুশাম্যতি॥"

মানবগণের মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর কর্ম্মাধীনতা বশতঃ পাঁচ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে। অশ্বারূঢ় ব্যক্তি যেমন অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তদ্রূপ আত্মাও মন হইতে ভিন্ন হইয়াও মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীরের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে।

সূক্ষ্মশরীরানুবর্ত্তী জীবাত্মার স্থূল শরীরের সহিত বিয়োগই মৃত্যু এবং সংযোগই জন্ম। কর্ম্মপরতন্ত্র মন কর্ম্মোপস্থাপিত দৃষ্ট মর্ত্ত্যলোকস্থ বিষয়াদি (পরদারাদি—ইতি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) শ্রুত দেবলোকস্থ বিষয়াদি (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) ধ্যান করিতে করিতে তদাকারী হয়, পূর্ব্বের ধ্যাত বিষয় হইতে সর্ব্বথা বিচ্যুত হয়, তৎপর পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয়।

কর্ম্মোপস্থাপিত বিষয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ বশতঃ অত্যন্ত হর্ষ শোকাদি জন্য কোন জন্তুরই আর পূর্ব্ব দেহের স্মৃতি থাকে না। এই যে অত্যন্ত বিস্মৃতি, ইহার নামই মৃত্যু।

দেহকে সর্ব্বতোভাবে আত্মরূপে অভিমান করা বা স্বীকার করাকেই জন্ম বলে। বর্ত্তমান দেহস্থ জীব প্রাক্তন স্থূল দেহ স্মরণ করে না, যেমন বর্ত্তমান স্বপ্নস্থ বা মনোরথগ্রস্ত জীব প্রাক্তন স্বপ্ন বা মনোরথ স্মরণ করে না তদ্রূপ। বর্ত্তমান দেহস্থ-জীব প্রাক্তন আত্মাকেই "আমি ৬ষ্ঠ বৎসর বয়স্ক, আমি ৭ম বৎসর বয়স্ক, আমি পূর্ব্বে ছিলাম না" এইরূপ অপূর্ব্বরূপে নূতনের ন্যায় দর্শন করে।

ইহাকেই লোক-প্রসিদ্ধ জন্মমৃত্যু বলে। ইহা ব্যতীত সূক্ষ্ম জন্মমৃত্যুও আছে। জীবগণের শরীর অলক্ষ্যগতি কালপ্রভাবে প্রতিমুহূর্ত্তে উৎপন্ন ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। কালের গতি অতি সূক্ষ্ম, এইজন্য তাহা সহসা ধারণা করা যায় না, অনুমান দ্বারা বোধগম্য হয়। যেমন কাল সহকারে দীপজ্বালা ও নদীর স্রোতগতি ও প্রবাহদ্বারা এবং বনস্পতির ফল, পক্কতা দ্বারা অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কালপ্রভাবে জীবগণের অবস্থাদি বিহিত হয়। জঠরে প্রবেশ, গর্ভ বাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, মধ্যবয়স, জরা ও মৃত্যু শরীরের এই নয়টি অবস্থা। যেমন তেজের গতি ও স্রোতের প্রবাহ থাকা সত্বেও এই সেই দীপ, এই সেই জল, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ কালসহকারে অবস্থাবিশেষকৃত হইলেও এই সেই মনুষ্য এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার উৎপত্তি ও নাশ নাই, দেহেরই উৎপত্তি ও নাশ আছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য। যাহার আদি আছে ও অন্ত আছে, যাহার উৎপত্তি আছে ও বিনাশ আছে, তাহাই অনিত্য ও অসত্য। যাহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই; তাহাই নিত্য ও সত্য। হিন্দুদর্শনের মূল ভিত্তিই এই——"না সতো বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, তাহার জন্ম বা অস্তিত্ব সম্ভবে না। যাহা সৎ, যাহা সত্য তাহার অভাব, অনস্তিত্ব বা একান্ত ধ্বংস সম্ভবে না।

আত্ম-অনাত্মবিষয়ে বিবেকহীন মনুষ্য দেহে আত্মার অভিমান বশতঃ মুগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। তত্বজ্ঞানদ্বারা সূক্ষ্মশরীরের নাশ হয়, কর্ম্মফল ধ্বংস হয় ও সংসার বন্ধ হয়। ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসে সেই ফল লাভ করা যাইতে পারে। অগ্নি যেমন অনায়াসে শুষ্ক তৃণরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ ভগবৎপ্রেম এক মুহূর্ত্তে ইহজন্মের ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল দগ্ধ করে।

জীবগণ উত্তম ও অধম কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া সত্ত্বগুণের তারতম্যানুসারে ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের তারতম্যানুসারে অসুর ও মনুষ্য এবং তমোগুণের তারতম্যানুসারে জড় ও তীর্য্যক জন্ম প্রাপ্ত হয়।

আত্মা অকর্ত্তা, তাঁহার সংসার হইবার কারণ দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট হইতেছে। যেমন নর্ত্তক ও গায়কগণের ধর্ম্ম (স্বরতালাদি ও

শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্রবীরভয়ানকাদি রস। দ্রষ্টা সভ্যগণের অন্তঃকরণে স্ফুরিত হয়, অথবা বালকগণ যেমন নৃত্যকারী ও গানকারী লোকদিগকে অনুকরণ করে, তদ্রূপ সুখ-দুঃখাদিরূপ বুদ্ধি, ধর্ম্মদ্রষ্টা আত্মাতে সংক্রামিত হয়, বুদ্ধিগুণে আকৃষ্ট হইয়া অকর্ত্তা জীবাত্মাও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। যেমন নৌকারূঢ় ব্যক্তি তীরস্থ অচল বৃক্ষকে ধাবমান মনে করে, যেমন জল বিচলিত হইলে তীরস্থ প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ বিচলিত বলিয়া বোধ হয়, যেমন চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইলে জগৎ ঘূর্ণায়মান বোধ হয়. সেইরূপ গ্রাহক মনের গুণগ্রাহ্য বিষয়ে অবভাসিত হয়। কলত্রাদিতে বাস্তবিক লাবণ্যাদি নাই, লাবণ্যাদি বিষয়গ্রাহক মনের ধর্ম্ম। গ্রাহক মনের ধর্ম্ম লাবণ্যাদি, যেমন গ্রাহ্য বিষয় কলত্রাদিতে অবভাসিত হয়, তদ্রূপ মনোনিবন্ধন আত্মার সংসার হয়। (শ্রীধরস্বামী ও দীপিকা-দীপনং)। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি, জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়, সুখদুঃখাদি, উপাধি বুদ্ধির ধর্ম্ম, ভূতাবিষ্ট জীবের ন্যায় আত্মাতে অবভাসিত হয়। যেমন সর্পাদি গ্রাহ্য মনুষ্যে সর্পাদির ধর্ম্ম অবভাসিত হয়, তদ্রূপ। (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)। যেমন মনোরথকালে ও স্বপ্নদর্শনসময়ে বিষয়ানুভব হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা মিথ্যা, সেইরূপ আত্মার সংসার-বন্ধনও মিথ্যা, "মনঃপরং কারণ মামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ," মনই একমাত্র কারণ, এই মনই সংসার-চক্রকে নিয়ত পরিভ্রমণ করাইতেছে। (এই বিষয় মল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিক্ষুগীতায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে)।

এখন দেখা যাউক, এই সংসার কিরূপে বন্ধ করা যায়, কিরূপে ঘটিকাযন্ত্রের কাঁটার ন্যায়, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাহার একমাত্র উপায়, সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস করা। মানবশরীর তিন প্রকার, (১) স্থূলশরীর (২) সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর (৩) কারণশরীর। পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নজাত বীর্য্য হইতে যে দেহ জন্মে, ও যাহা অন্নাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম স্থূলশরীর অথবা আত্মার অন্নময় কোষ। স্থূলশরীরের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর এবং তাহার অভ্যন্তরে কারণ-শরীর। আত্মা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত।

"এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীর মিত্যুচ্যতে।" (বেদান্তসার)

মনোময়, প্রাণময়, ও বিজ্ঞানময় কোষকে সূক্ষ্মশরীর কহে। মনোময়কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন। প্রাণময় কোষ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ। বিজ্ঞানময় কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। এতদতিরিক্ত আমোদ প্রমোদরূপ বৃত্তিযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ। সূক্ষ্ম-শরীর বা সিদ্ধশরীরের আবশ্যকতা কি, তৎসম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় আছে,—"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।

তত্ত্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।”

কোন পদার্থের আলেখ্য যেমন সেই পদার্থ বিনা সম্ভবে না, কোন বস্তুর ছায়া যেমন সেই বস্তু বিনা থাকিতে পারে না, সেইরূপ সূক্ষ্মশরীর ব্যতীত বুদ্ধ্যাদিতত্ত্ব অবস্থান করিতে পারে না।

সৃষ্টি সময়ে প্রত্যেক পুরুষের জন্য এক একটি লিঙ্গ শরীর উৎপাদিত হয়, তাহার গতি অব্যাহত, কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারে, এবং তাহা প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব), অহ-ঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা সূক্ষ্মশরীর রচিত (অন্য মতে)। ধর্ম্মাধর্ম্মাদির দ্বারা সম্পর্কিত হই-য়াই উহা ভোগের নিমিত্ত এক ভোগায়তন (ষাট্‌কৌষিক) শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। কারণ, স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিলে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ অসম্ভব।

নট যেমন রাম, হনুমান্, সীতা, রাবণ প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ অভিনয় করে, লিঙ্গশরীরও সেইরূপ পুরু-ষের ভোগের জন্য মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গের আকার অর্থাৎ স্থূলশরীর ধারণ করিয়া থাকে। প্রকৃতির অসামান্য বিভূতি বশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। স্থূলশরীরকে ষাট্‌কৌষিক বলার কারণ এই যে, উহা মাতৃ-পিতৃজ। মাতা হইতে লোম, শোণিত মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত। (মল্লিখিতযুগধর্ম্ম, ৭৮—৮৫ পৃষ্ঠা)

মানবের জঠরে প্রবেশ কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, যাহা চিন্তা করে, যাহা বাসনা করে, যাহা অভি-মান করে, যাহা অভিনিবেশ করে, তৎ-সমস্তই তাহার সংস্কার, কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ভাবী জন্মের কর্ম্মবীজ, এবং তৎ-সমস্তই তাহার চিত্তবৃত্তি, মননির্ম্মিত সাত্ত্বিক বৃত্তি, রাজসিক বৃত্তি ও তামসিক বৃত্তি ও তদনুসারেই তাহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে।

থিওসফী সম্প্রদায়ের মতে আমাদের কা-মনা, সঙ্কল্প, চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা ;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তি দ্বারা, কামিক দেহ নির্ম্মিত হয়। যোগভাষ্য মতে ঐ সকল বৃত্তি দ্বারা বাসনাশরীর রচিত হয়। এই কামিক দেহ বা বাসনা-শরীর শীর্ণ বা ক্ষীণ করিতে পারিলেই আত্মা মুক্ত হয়। ভক্তিযোগবলে ভক্ত-দেহ গঠিত হইয়া ভগ-বানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করা যাইতে পারে। সকলেরই কর্ত্তব্য সৎকার্য্য অনুষ্ঠান ও তীব্রভাবনার দ্বারা যত্নপূর্ব্বক আত্মার জন্য দৃঢ়ভূমি প্রস্তুত করা অথবা আত্মার অব-স্থানের জন্য সাত্ত্বিক বৃত্তির অনুষ্ঠান দ্বারা সুন্দর হৃদয়মন্দির বা বাসনাশরীর বা লিঙ্গ-শরীর প্রস্তুত করা।

যোগভাষ্যে আছে, চিত্তনদী কল্যাণ ও পাপ উভয় দিকেই প্রবাহিত হয়। যে স্রোত পরিণামে কৈবল্যদায়ক ও বিবেকের দিকে প্রবাহিত তাহা কল্যাণবহ, এবং যাহা সংসারদায়ক ও অবিবেকের দিকে প্রবাহিত তাহা পাপবহ। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত

প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শন ও অভ্যাস দ্বারা কল্যাণস্রোত প্রবাহিত হয়।

"তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।"

চিত্ত যাহাতে স্থির থাকে, তদ্বিষয়ক যত্নকে অভ্যাস বলে। অভ্যাস নিরন্তর শ্রদ্ধাসহকারে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠান করিলে দৃঢ়ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি লভ্যতঃ॥

চিত্ত বৃক্ষের দুইটি বীজ, প্রাণ স্পন্দন ও বাসনা। তাহার একটি ক্ষীণ হইলেই উভয়ই ক্ষীণ হয়।

প্রাণস্পন্দন নিরোধার্থ দৃঢ় অভ্যাসের প্রয়োজন। বাসনা পরিত্যাগের জন্য, কামনা ও কর্ম্মফল নাশের জন্য বৈরাগ্যের প্রয়োজন। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিবার ও বাসনা ত্যাগ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় সাধুসঙ্গ এবং সৎচিৎ আনন্দময়কে পরম প্রীতি করা।

যাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না ও বিস্মরণ হয়, তাহাদিগের সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়।

"সাধবো হি পুনঃ পুন র্বোধয়ন্তি স্মারয়ন্তি চ।"

সাধুগণ পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দেন ও স্মরণ করাইয়া দেন।

(মল্লিখিত যুগধর্ম্ম, ৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা)।

শ্রীজানকীনাথ পাল, শাস্ত্রী, বি, এল।

পশ্চিম বুন্দেলখন্দ

বুন্দেলখন্দের অনেকগুলি ইতিহাস আছে; কিন্তু একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। একখানিতেও সমগ্র বুন্দেল রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণ, রাজস্ব এবং জন-সংখ্যার বিষয় আলোচিত হয় নাই, এবং তৎপাঠে বুন্দেলরাজগণের ও সর্দ্দারদিগের বংশাবলী অবগত হওয়া যায় না। এই সকল অভাব মোচনের নিমিত্ত ললিতপুরের ডেপুটী কমিশনর মেজর জন লিণ্টন মহাশয়ের আগ্রহে বুন্দেলাঠাকুর ও জায়গীরদার দেওয়ান বিজ্‌হি বাহাদুর মহবত সিং, ঝাঁন্সির কমিশনর ও বুন্দেলখন্দের পলিটিকাল এজেণ্ট মিঃ কুণ্টনের সহকারিতায়, বুন্দেলখন্দের ইতিহাস প্রণয়নের ভারগ্রহণ করেন। বুন্দেলাপরিবারের পরিচিত যে সকল লেখকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, উহার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের উল্লেখ আছে। দেওয়ান বাহাদুর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন;— ভারতবর্ষের ইতিহাস (হিন্দি), বিষ্ণুপুরাণ (হিন্দি); কইপারিয়া (হিন্দি); জয়সিংহ-চরিত্র (হিন্দি); পত্রপ্রকাশ (হিন্দি); বুন্দেলচরিত্র (হিন্দি); Geography of the Central Provinces কৃষ্ণনারায়ণের ইতি-

হাস (উর্দ্দু); ওয়াকিয়ট-ই-বুন্দেলখণ্ড (ঐ); Imperial Gazetteer of Bundelkhand. দেওয়ান বাহাদুর বলেন,—"এতদ্ব্যতীত আমি এই প্রদেশের অধিবাসী এবং বুন্দেল রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকট হইতে আমি অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি এবং ইমারতের উপর প্রাচীন লিপি প্রভৃতি দেখিয়াছি, সুতরাং আমার বিবরণ ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের অধিকাংশ লোকেই হিন্দি জানেন ও বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য এই ইতিহাস হিন্দিতে লিপিবদ্ধ হইল। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) ইতিহাস, (২) ভূগোল।"

এসিয়াটিক সোসাইটির জরন্যালে, "History of Western Bundelkhand" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মিঃ সি, এ, সিলবার্ড হিন্দি-ভাষায় লিখিত দেওয়ান বাহাদুরের এই ইতিহাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতেই এই প্রবন্ধটি সংকলন করিলাম।

বুন্দেলখন্দ ভারতবর্ষের একাংশ, ইহার উত্তরে যমুনা, দক্ষিণে নর্ম্মদা, পূর্ব্বে টন্স (Tons), পশ্চিমে কালিসিন্ধু। যৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির ভারতসিংহাসনে উপবিষ্ট, তৎকালে শিশুপাল বুন্দেলখন্দে রাজত্ব করিতেন; এ রাজ্য তখন চেদ্‌ডেস্ নামে অভিহিত হইত। শিশুপালের পর তাঁহার বহুতর বংশধর এইরাজ্য শাসন করেন, কিন্তু পরিশেষে ইহা অযোধ্যার রাজা কারামের হস্তে পতিত হয়। তিনি কালিঞ্জারে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন; এবং শিশুপালের চান্দেরি (১) নগর গেরু পাহাড়ের সানুদেশে স্থানান্তরিত ও পরমেশ্বর নামে একটি জলাশয় খনন করেন। বর্ত্তমান চান্দেরি হইতে সাত মাইল দূরে শিশুপালের চান্দেরির ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। এখন উহা 'বুড়ি চান্দেরি' (২) নামে পরিচিত। মুন্সি কৃষ্ণনারায়ণের ইতিহাসে লিখিত আছে, রাজা কারামের রাজ্য অযোধ্যা হইতে মউমাগুসোয়ার (৩) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁহার বংশধরগণ অনেক বৎসর ধরিয়া তথায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। এই বংশের শেষ রাজা সোধি রাজ্যত্যাগ করিয়া কাচ্ এবং ভূপে পলায়নপর হন। যমুনাদেব তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া চেদেসের রাজা হন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, চান্দপুর, (৪) চন্দ্রপুর (৫) এবং

(১) গোয়ালিয়ারে; ললিতপুর হইতে ১৮ মাইল পশ্চিম।

(২) বুড়ি চান্দেরি বর্ত্তমান চান্দেরির ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে; উহার প্রভূত ভগ্নাবশেষ সমুহ এখন নিবিড় অরণ্যের শীতল ক্রোড়ে সমাবিস্থ।

(৩) উজ্জয়িনীর নিকট।

(৪) ঝান্সি জেলায়, বালাবেহত পরগণার একটি জনহীন পল্লী। চান্দেলের মন্দিরাদির অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) সাগর জেলায় দোগাছ পরগণায়। সাগর হইতে ২০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব।

সিরোঞ্জ (১) নগরে প্রস্তরের উপর এখনও তাঁহার অশ্বের পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই উক্তির প্রধান কারণ বোধ হয় এই, তিনি ঐ অংশের অধিপতি ছিলেন এবং চান্দেরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যমুনা হইতে নর্ম্মদা এবং চাম্বেল হইতে টন্স পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় উজ্জয়িনীর রাজা ভরত, মধ্যভারত জয় করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা বিক্রম সিংহাসনে আরোহণ করতঃ "চান্দেসনরপতি" এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং জ্ঞানী নরপতি ছিলেন; কথিত আছে,—সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। চান্দেস্ তাঁহার রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং তাঁহার রাজ্য 'মধ্যদেশ' বলিয়া পরিচিত ছিল।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যমুনা হইতে নর্ম্মদা এবং চম্বেল হইতে কৈল একদা নাগবংশি-ক্ষত্রিয়ের করতলগত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের শাসনকাল নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে নিম্নলিখিত সময় লিখিত হইয়াছে;—

০	রাজাভীমনাগর।
২৫	খোরজোর।
৫০	ধরমযাত।
৭৫	আশামকদিনামার।
১০০	ব্রহাপত।
১২৫	নাগেন্দ্র।
১৫০	বিয়াগান্দ্রনাগ।
১৭৫	বমুনাগ।

২১৫ সালে এই বংশের শেষ রাজা দেবনাগ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে—২৪৩ সালে রাজা গোপালের সেনাপতি কাচওহা (Kachhwaha) বংশীয় টোরামান, ইরান (২) অবরোধ করিয়া, ভোপাল হইতে ইরান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ করায়ত্ত করেন। এই সময়েই টোরামানের পুত্রকর্ত্তৃক গোয়ালিয়র পরাজিত হয়। ৩৫৮ সালে দেবনাগ নারওয়ারে (৩) প্রস্থান করেন এবং শূরসেন নামক টোরামানের এক বংশধর তাঁহার স্থানে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনিই ২৮৫ সালে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ক্রমান্বয়ে তাঁহার ৪০০ জন বংশধর রাজ্যপালন করিবেন। তদবধি গোয়ালিয়র তাঁহাদের রাজধানী হয়। শূরসেনের বংশধর বহুকাল মধ্য-ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। ৫৯৩ সালে কনোজের নরপতি

(১) টঙ্কের (Tonk) একটি সহর। I. M. রেলওয়ের "বীণা" ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল দূরে।

(২) সগর জেলায় খেমলাসা পরগণায়, বীণা নদীর তীরে। বীণা রেলষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে। (For an account of the ruins here, see Cunningham's Archaeological report).

(৩) গোয়ালিয়রে, সিন্ধু নদীর তীরে।

এই রাজ্য আক্রমণ করেন এবং গোয়ালিয়র, চান্দেরি ও নারওয়ার ব্যতীত সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া লন। কিন্তু কাচওহাগণ পুনরায় সৌভাগ্যসূর্য্য হস্তগত করিতে সক্ষম হন। ইত্যবসরে ঠাকুরচাঁদ মাহোবার (১) নিকটবর্ত্তী বহুতর গ্রাম নিজ দখলে আনয়ন করেন। এই ঠাকুরের বংশধরদিগকে চান্দেল বলে।

কাচওহা রাজ্যের শেষ নরপতি (৮৪র্থ) তেজকারাণ। ঐতিহাসিক ধনদেব ইঁহাকে কৃষ্ণনারায়ণ বলিয়াছেন। ৯৩৩ সালে পারিহররাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া গোয়ালিয়র জয় করে। কৃষ্ণনারায়ণ বা তেজকারাণ রাজধানী ত্যাগ করতঃ ধানদাহারে (২) পলায়নপর হন। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ নারওয়ার এবং ইন্‌হুরকিতে (৩) বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন।

পারিহর রাজ্যের প্রথম রাজা বজ্রধন মধ্য-ভারত জয় করেন। এই সময় মাহোবার চান্দেলগণ শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। বজ্রধনের পর, রাজা কিরাত, রাজা ভুবনপাল প্রথম এবং রাজা পদপাল রাজ্য শাসন করেন। মহিপালের পর ১০৯৩ সনে দ্বিতীয় ভুবনপাল সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং ১১৬১ সালে রাজা মধুসূদন রাজমকুট শিরে ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই চান্দেলগণ গোয়ালিয়র ব্যতীত সমস্ত রাজ্য জয় করেন। ১২৩২ সালে মধুসূদনের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র টোমর ঠাকুরের হস্তে পতিত হয়।

এখন চান্দদীপ এবং তাঁহার বংশধরগণের বিবরণ বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, কাচওহাদিগের রাজত্ব সময়ে ঠাকুরচান্দ মাহোরা হইতে কনোজ পর্য্যন্ত হস্তগত করেন এবং পারিহর রাজগণের সময়ে তাঁহার বংশধরগণ সমস্ত রাজ্য গ্রাস করিয়া বসেন।

চান্দদীপের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ওয়াকিপত (৪) রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বরাজ্যের সহিত আজিঘর সংযুক্ত করেন। তাঁহার পুত্র বিজাই, ছত্তরপুর (৫), মউ (৬), চান্দেরি প্রভৃতি জয় করেন। তৎপর যথাক্রমে যশোধর্ম্ম দেব, জিয়াইপাল এবং কিরাতবর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন। শেষ নরপতি কিরাতবর্ম্ম গণ্ডদিগের (Gonds) নিকট হইতে পান্না এবং সাহাঘর (৭) ছাড়াইয়া লন। কিরাতবর্ম্মের পর জয়বর্ম্মা, সোলক্ষণ, পৃথুর বর্ম্মা সিংহাসনে আরো-

(১) হামিরপুর জেলায়, চান্দেলদিগের একটি প্রধান স্থান।

(২) জয়পুরের নিকট।

(৩) গোয়ালিয়ার ষ্টেটে, জালাউন হইতে ৩২ মাইল দূরে।

(৪) সম্ভবতঃ বাকপতি।

(৫) সম্ভবতঃ বুন্দেলখন্দ এজেন্‌সির মধ্যস্থিত ঐ নামের রাজধানী।

(৬) ছত্তরপুরের দশ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

(৭) সগর জেলার একটি নগর (সাহাঘর পরগণা)।

হণ করেন। তাহার পর ১১১৮ সালে গোবিন্দচাঁদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সমগ্র মধ্য প্রদেশের একছত্র নরপতি হন। তৎকালে কেবল গোয়ালিয়র এবং অন্য দুই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পারিহরদিগের শাসনে ছিল, গোবিন্দচাঁদ তাহাও নিজ শাসনে আনয়ন করেন।

১১৬৩ সালে নরবর্ম্মা, ১১৬৭ সালে পারমল এবং ১২০৯ সালে নরহর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নরহরের রাজত্ব সময়ে গণ্ড, লোদি, আহির এবং অন্যান্য অনেকে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এই রাজ্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। শেষ রাজা ভোজবর্ম্মা, পারমলের পৌত্র। ইনি যতদিন রাজত্ব করেন, ততদিনই তাঁহাকে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, কোনটাতে জয় কোনটাতে বা পরাজয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব সময়ে বীরবুন্দেলা শক্তি সঞ্চয় করিয়া মউ (১), মাহোনী (২) কালপি এবং কালিঞ্জর জয় করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ ভোজবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে চান্দেল রাজ্য উচ্ছন্ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কালিঞ্জর, মাহোবা, দেওঘর (৩) এবং মদনপুরে (৪) চান্দেল ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল স্থানের প্রাসাদ-গাত্রে হিন্দি অক্ষরে লিপি খোদিত আছে।

চান্দেল রাজ্যের উচ্ছেদের পর বুন্দেল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, ইহার বহুপূর্ব্বে সুরাজবংশের বংশধর, ঘারওয়ার ক্ষত্রিয়গণ কাশীতে রাজত্ব করিতেন। ঘারওয়ারের শেষ রাজা চইত কারাণ কৃষ্ণনারায়ণ তাঁহাকে বীরভদ্র বলিয়াছেন। "বুন্দেল চরিত্রে" উল্লিখিত আছে যে, এই রাজ্যের আয় বাৎসরিক এক ক্রোর টাকা ছিল।

বীরভদ্রের পাঁচ পুত্র ছিল ;—(১) ইন্‌রি (রাজ সিংহও বলিত), (২) হংসরাজ, (৩) মোহন, (৪) মান এবং (৫) জগদাস ওরফে পাঞ্চাম। কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার সমধিক প্রিয় ছিল। রাজা জীবিতাবস্থায় রাজ্য বিভাগ করিয়া, অর্দ্ধেক তাঁহার প্রথম চারিপুত্রকে ও অপরার্দ্ধ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পাঞ্চামকে দান করিয়া যান। ইহাতে কনিষ্ঠের সহিত জ্যেষ্ঠদিগের মনোমালিন্য উপ-

(১) ঝান্সি জেলায় মউ রাণীপুর নামক পরগণা।

(২) এস্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন; গোয়ালিয়রে মোহিনী নামক একটি স্থান আছে।

(৩) ঝান্সি জেলায়, বালাবেহাত পরগণা বেতোয়ারের উপর। ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল।

(৪) ঝান্সি জেলায় মারাউরা পরগণায়, ললিতপুর হইতে ৩৬ মাইল। For an account of the ruins, see Cunningham's Archaological Reports and Babu Chandra Mukerji's Report on the Antiquities of Lalitpur.

স্থিত হয়; এবং তাহার ফলে,—১১৭০ সালে রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পাঞ্চাম জ্যেষ্ঠগণ কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বিতাড়িত হন। তাঁহার রাজ্য অগ্রজগণ বিভাগ করিয়া লন।

কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হওয়ায় পাঞ্চামের ঘোর দারিদ্র্য উপস্থিত হয়। ১২২৮ সওয়াল সম্বতের প্রারম্ভে (১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি বিন্ধ্যাচলে গমন করেন এবং ভ্রাতাদিগেকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর যতিধর্ম্ম অব-লম্বন পূর্ব্বক বিন্ধ্যেশ্বরী বা দুর্গার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। কএকদিন আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া অনবরত দুর্গার স্তব করেন; কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হয় না। অষ্টমদিবসে তিনি অগ্নিকুণ্ডে উপবেশন করেন এবং নবম দিনে একপদে দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গার আরা-ধনা করেন, তথাপি দেবী প্রসন্না হন না। শেষ দিন তিনি স্বীয় মস্তক কাটিয়া দেবীকে উপহার দিতে মনস্থ করিয়া, খড়্গদ্বারা যেই মস্তক কাটিবেন, অমনি, দেবী বলিলেন,—"তুমি নৃপতি-তুল্য সুখানুভব করিতে পারিবে।" পাঞ্চাম বলিল,—"আপনি আ-মার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং আমি যে ভ্রাতৃগণকে পরাজিত করিয়া হৃত-রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিব, তাহার কোন নিদ-র্শন প্রদান করুন।" দেবী কোন উত্তর করিলেন না। পাঞ্চাম দেবীকে নিরুত্তর দেখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক খড়্গদ্বারা জিহ্বা ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, দেবী দেখা দিয়া বলিলেন,—"জয়—জয়, তুমি জয়ী এবং রাজ্যেশ্বর হইবে; তোমার বংশধরগণ, মধ্য-ভারতে রাজত্ব করিবে।" যখন পাঞ্চাম তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হন, তখন অস্ত্র লাগিয়া তাঁহার শরীরের একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হয়; দেবী তদ্দর্শনে বলেন,—'বুদিত বা বুন্দেলা (এক বিন্দু)' এবং পরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে, তোমার বংশধরগণ বুন্দেলা নামে পরি-চিত হইবে। অতঃপর দেবী অন্তর্হিতা হন। পাঞ্চাম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতাদিগকে পরাজিত করতঃ রাজ্য পুনর্গ্রহণ করেন, এবং বেনারসে রাজধানী স্থাপন করেন। পাঞ্চামের জ্যেষ্ঠগণের বংশধরগণ এখনও ঘারওয়ার ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেছে।

পাঞ্চামের একটি পুত্র হয়। দেবীর আজ্ঞা-নুসারে তাহার নাম বীরবুন্দেলা রাখেন। শুনা যায়, বীরবুন্দেলার রাজত্ব সময়ে সাহা-বুদ্দীন ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং ১১৯৫ সালে কনৌজের রাজা জয়চাঁদকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। মুন্সি কৃষ্ণনারায়-ণের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পিতার অনু-মত্যনুসারে বীরবুন্দেলা, তাতার খাঁ আফ-গানের সহিত একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই সংগ্রামে খাঁর পক্ষের ৭২ জন কর্ম্মচারী আ-হত হয় এবং বীরবুন্দেল স্বহস্তে তিন শত জনকে তীরের দ্বারা বিদ্ধ করেন। এই পরা-জয়ে খাঁর গতিরোধ হয়; সুতরাং বলা যা-ইতে পারে যে, পাঞ্চামের সময়, সাহাবুদ্দীন ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর ১২১৪ সালে বীর-বুন্দেলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৪৯ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন। ১২৩১ সালে কালপি. মাহোনী এবং ভোজবর্ম্মা চান্দেলকে পরাজিত করিয়া কালিঞ্জর স্বীয় রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করেন। বীরবুন্দেলা মারার (Marra) (১) ঘারোয়াদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্য্যাতিত করিয়া রেওয়া, অযোধ্যা এবং দোয়াব পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড বিস্তৃত করেন। বুন্দেলাচরিত্রে এই সকল বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তাঁহার পর কারাণতীর্থ রাজমুকুট গ্রহণ করেন। তিনি নিমরাণা চৌহানের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া কারাণতীর্থ নাম প্রাপ্ত হন। বেনারসের প্রসিদ্ধ মন্দিরের মধ্যে ইহা একতম। তিনি কাশী বা বেনারসনগর ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালে তদীয় পুত্র অর্জ্জুনপাল মাহোনীতে গমন করিলে গোয়ালিয়রের টোয়ার তাঁহার হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। কাচপ্রিয়া এবং খরসিংহ চরিত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনিই সর্ব্ব প্রথম মাহোনীতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং কালপি, মউন, মাহোন এবং কালিঞ্জর শাসন করেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল ;—(১) বীরবল, (২) সোহানপাল এবং (৩) দয়াপাল। ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১২৬৩ সালে রাজা অর্জ্জুনপাল, তদীয় পুত্র সোহানপালকে কাতেরঘরে (২) প্রেরণ করেন ; তথাকার দুর্গ তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবল সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্য বণ্টন করার সময় তিনি সোহানপালকে দুই একখানি গ্রাম মাত্র দেন। গণেশখারার (৩) ধান্ধ স্বীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। সোহানপাল এই বণ্টনে সন্তুষ্ট না হইয়া, ৪৫ জন সিপাহী এবং ১৩ জন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে কুরারের (৪) রাজা নগার নিকট গমন করেন। বুন্দেলচরিত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভ্রাতার নিকট হইতে রাজ্য লইয়া দিবার জন্য নগার সাহায্যপ্রার্থী হন। সোহানপাল যদি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সঙ্গে পানাহার করিতে এবং বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞা করেন, তবে নগা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন। সোহানপাল এই কথায় অতিশয় রুষ্ট হইয়া কুরার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, নগা তাঁহাকে বলপ্রকাশে অবরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করেন এবং এইরূপে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়।

(১) মির্জাপুর জেলার পশ্চিম ভাগে।

(২) কাতেরা নামেই অধিকতর পরিচিত ; ঝান্সি জেলার মউ পরগণায়।

(৩) গোয়ালিয়রে, ঝান্সি হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে।

(৪) ঝান্সি হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে।

সোহানপাল ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া মুক্তামান চৌহানের নিকট পলায়ন করেন। মুক্তামান ধন্দ্রদেবের বংশধর এবং নগার চারি হাজার সৈন্যের অধিনায়ক। সোহানপাল তাঁহার নিকটও ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করেন; কিন্তু তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হন না।

অতঃপর সোহানপাল তাঁহার সামান্য অনুচরগণকে পশ্চাতে রাখিয়া, একাকী যথাক্রমে সালিঙ্গর, চৌহান এবং কাচওয়াহাদিগের নিকট যাইয়া নিজ কাহিনী বিবৃত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন না। অবশেষে কারগারার (১) জায়গীরদার পানপাল নামক একজন পানোয়ার ঠাকুর তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং উভয়ে পরামর্শ করেন যে, কোন প্রকারে রাজা নগাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। তাঁহার রাজ্যের মূল্য তের লক্ষ টাকা। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সোহান পাল কুরারে যাইয়া নগাকে বলিবেন যে, পানাহার প্রভৃতি প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন এবং প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক রাজাকে আত্মীয় স্বজন সহিত নিমন্ত্রিত করিয়া স্বভবনে আনয়ন করিবেন। সোহান পাল কুরারে যাইয়া পরামর্শ মত কার্য্য করিলেন। কিয়দ্দিবস পর রাজা নগা তাঁহার ভ্রাতৃ এবং আমাত্যগণ সমভিব্যাহারে সোহানপালের ভবনে উপনীত হন। পানপাল তিন শত ক্ষত্রিয় লইয়া তথায় পূর্ব্বেই লুকাইয়া ছিলেন। রাজা নগা অনুচরগণসহ যেই আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অমনি পানপাল এবং সোহানপাল তাঁহাদের প্রতি আপতিত হইয়া নৃশংসভাবে সকলকে হত্যা করিয়া তৎক্ষণাৎ কুরারদুর্গ অবরোধ করিলেন।

এবম্প্রকারে ১৩৪৫ সম্বতে (১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) ২রা কার্ত্তিক বুধবারে সোহানপাল কুরারের রাজা হন এবং পানপাল ও মুক্তামানকে মন্ত্রিত্বে বরণ করেন। মন্ত্রিদ্বয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"আমার দুঃখের সময় তোমরা ব্যতীত অন্য কেহ যেমন আমাকে সাহায্য করে নাই, তেমন তোমরা ভিন্ন অন্য কেহ আমার পরিবার মধ্যে বিবাহ করিতে পারিবেন না।" (২)

(১) গোয়ালিয়ারে, ঝান্সি হইতে ২৭ মাইল পশ্চিমে।

(২) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের (of the N. W. P. 20) বুন্দেলদিগের উৎপত্তি এবং কুরাররাজের বিনাশ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত এই বিবরণের সাদৃশ্য নাই। পূর্ব্বোক্ত বিবরণই আমাদের নিকট সমিচীন বোধ হয়। কুরার রাজের অধঃপতনেই বুন্দেলাদিগের সৌভাগ্য রবির অভ্যুদয় হয়। ক্রুক্স্ ট্রাইবস্ এবং কাষ্টস্এ (Crook's Tribes & Castes II. 163) এই দুই বিবরণই কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু পান্নার এক নরপতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রশল কর্ত্তৃক পান্না সর্ব্ব প্রথম রাজ-বাসস্থান বিবেচিত হয়। এই সময়ে দেশের অধিকাংশ গণ্ডদিগের অধীন ছিল।

এই সংকল্প অনুসারে তিনি পান পালের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দেন। এবং যৌতুক স্বরূপ ইটাউরা (১) গ্রাম প্রদান করেন। তৎকনিষ্ঠ দয়াপালকে এক লক্ষ টাকার জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় হইতে ক্ষেত্রীগণ বুন্দেলা, পানয়ার এবং ধানদেয়া—এই তিন শাখায় বিভক্ত হয়। সমগ্র বুন্দেলরাজ্যের রাজস্ব ২৬ লক্ষ টাকা। এতন্মধ্যে অর্দ্ধেক বীরবলের এবং অপরার্দ্ধ সোহান পালের অধিকৃত ছিল।

সোহান পালের দুই পুত্র ছিল,—সাজেন্দ্র এবং রাম। ১২৯৯ সালে জ্যেষ্ঠ সাজেন্দ্র পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহারও দুই পুত্র ছিল—(১) নানক দেব, (২) সৌনক দেব। জ্যেষ্ঠ নানকদেব ১৩২৬ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পৃথ্বী-রাজ এবং ইন্দ্ররাজ নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ১৩৬১ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। পৃথ্বীরাজ সুশাসনের নিমিত্ত বহুতর আইন গঠিত করিয়াছিলেন এবং বীরবল ও দয়াপালের পক্ষীয় বুন্দেলা-দিগকে বশীভূত করিয়া কুরারে 'মাহেন্দ্রী' নামক এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তিনি মদনী পাল (২) এবং কেশব নামক দুই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ১৪০০ সালে মদনীপাল সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যু কালে অর্জ্জুন দেব, মল এবং ভীমসেন নামক তিন পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৪৪৩সালে জ্যেষ্ঠ অর্জ্জুনদেব পিতৃস্থান অধিকার করেন। 'কাব্যপ্রিয়া'তে অর্জ্জুন দেবের অতিশয় প্র-শংসা করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, তিনি বেদচতুষ্টয় এবং অন্যান্য পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং দ্বিজ-দিগকে দশ মহাদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র,—(১) মালখাঁ এবং (২) ছত্রশল। ১৪৭৫ সালে মালখাঁ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একজন শক্তিশালী ও বিজ্ঞ নরপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৪৮২ সালে তিনি বালোললোদির (৩) সহিত রণ-আহবে প্রবৃত্ত হন এবং ১৫০৭ সালে অন্তিম কালে—প্রতাপ রুদ্র, সাহ, জইত, জগজিৎ, বররার সিংহ, বাওসিংহ খারাগ সেন এবং বীরচাঁদ নামক আট পুত্র রা-খিয়া যান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রতাপরুদ্র সিংহাসন লাভ করেন। ১¼ ক্রোর টাকা রা-জস্ব প্রদানে তিনি ইব্রাহিম লোদির (৪) রা-জ্যের কতকাংশ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ইব্রাহিম তৎকালে বাবরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। বাবর সম্রাট্ হইয়া ১৫১৪সালে (৫) চান্দেরির রাজা মেদিনী রায়ের রাজ্য জয় করতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রতাপরুদ্রের

(১) ঝান্সি পরগণায়, ঝান্সি হইতে ৩তের মাইল।

(২) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে (২১ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে, রাম চাঁদ, পৃথ্বীরাজের পুত্র, তৎপুত্র মদনীপাল।

(৩) ১৪৫১—১৪৮৮ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। (৪) ১৫১৭-১৫২৬।

(৫) Keaneর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ঘটনার সাল ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে।

হস্ত হইতে কেবল মাত্র কাল্‌পি উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। অবশিষ্ট রাজ্য তাঁহাদেরই শাসন করিতে বাবর অনুমতি দেন। ১৫৮৭ সম্বৎ (১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ১৩ই বৈশাখে তিনি (Orcha) নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর জনশ্রুতি এইরূপ ;—একদা তিনি Orchaর নিকট শিকার করিতেছেন এমন সময়ে, একটি গভীর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আর্ত্তনাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে শব্দ প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন,—একটি গাভীকে এক ভীষণকায় সিংহ আক্রমণ করিয়াছে। তিনি সিংহকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন ; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। তৎপর পুনরায় বন্দুক ভরিয়া গুলি করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি তরবারি দ্বারা সিংহকে আক্রমণ করিলেন ; এবং নিজের প্রাণের বিনিময়ে সিংহকে বধ করিয়া গাভীকে রক্ষা করিলেন। সিংহকর্ত্তৃক তিনি এমনি আহত হইয়াছিলেন যে, প্রাসাদে পৌঁচিতে না পৌঁচিতেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া যায় (১৫৩১)।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল

সমাধিক্ষেত্র।

সংসার জ্বালায় মন হইল অস্থির
বিরাগে সংসার প্রতি করিয়ে ধিক্কার,
শান্তি লাভ আশা করি হলেম বাহির,
দেখিলাম দৃশ্য কত বিবিধ প্রকার।

দেখিলাম পুরোভাগে সুন্দর নগর,
হইলাম নগরের প্রান্তে উপনীত,
নির্জ্জন নীরব স্থান অতি মনোহর,
সুন্দর সমাধিক্ষেত্র প্রাচীরে বেষ্টিত।

তার মধ্যে স্তম্ভ কত আছে বর্ত্তমান,
উচ্চ, নীচ, স্থুল, সরু, নবীন, প্রাচীন,
গাইছে নীরবে সবে ধরি সমতান,
"এ সংসারে কেহ নাহি রবে চিরদিন।"

নীরবে ঘোষণা করি সুধাইছে সবে,
"রবে না রবে না কেহ রবে না সংসারে,
পলকে উদয়, লয় পলকেই হবে,
মিশাইবে পঞ্চে, পঞ্চভূতের আকারে।"

কোথায় জনম কার, কোথা আগমন,
কোথা ছিল কার্য্যক্ষেত্র, কোথায় বসতি,
কোথায় সমাধি, কোথা দেহের পতন,
নিতান্তই অনিশ্চিত জীবনের গতি।

সমাধিক্ষেত্রের সব মনেতে ভাবিয়া
বিষম বৈরাগ্য ভাব উপজিল মনে,
ভাবিলাম কাঁদিব না সংসার লাগিয়া
অসার সংসারে আর যাব না জীবনে

এ সব দেখিয়া মুখ ফিরানু যখন,
মুহূর্ত্তে বিরাগী মন হল অনুরাগী,
সংসার বৈরাগ্যভাব বিলীন তখন,
আবার কাঁদিল মন সংসারের লাগি।

শ্রীআদিনাথ দাস।

সৌন্দর্য্য ও উপাসনা

অনাদিসিদ্ধ অপ্রমেয় বিশ্বব্যাপি সৌন্দর্য্যের প্রীতিনিষ্ঠ সবিলাস অনুধ্যানে, বা একসংস্থা অচলপ্রতিষ্ঠা নিয়তপরিকল্পনায়, উদ্দীপনার উদ্বেগ মহিমময় বিজৃম্ভণ, বা অনন্তোর্ম্মিসম্বলিত দুর্ব্বার মহাকর্ষণ। সেই প্রাণাভিরামা সর্ব্বাতিশায়িনী নিখিলার্থসংসাধিনী মহীয়সী প্রেরণায় হৃদয়ের দুর্লঙ্ঘ্য সমুচ্ছ্রায়। উপাসনার মৌলিক ও পারমার্থিক অভিধানে সেই বিশ্বপ্রাণকল্প মহাকর্ষণের মোহমন্ত্র বা সর্ব্বোদ্‌ভাবিনী ঐন্দ্রজালিকী শক্তির নিত্য পরমাভিব্যক্তি।

অনন্ত স্রোতোময় অপরিসঙ্খ্যেয় আবর্ত্তসঙ্কুল সেই অচ্ছিন্ন বিরাট সৌন্দর্য্যপ্রবাহ এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চবিশ্বের ধারণসূত্রস্বরূপ অনুস্যূত। সৌন্দর্য্যই বিশ্বের প্রাণ, এবং সর্ব্বমঙ্গল্যা মহাশক্তি। সৌন্দর্য্যের আবেগময় স্ফুরণে প্রাণানন্দ; এবং উচ্ছ্বাসের জীবনময়ী বিলাসবিচিত্রা মহালীলা। অসংখ্য তারকাবিলসিত গগনপটের অনুপম সুষমা, সাগরাভিসারিণী তটিনীর প্রাণবিনোদন কুলু কুলু ধ্বনি, বিহঙ্গাবলীর শ্রুতিসুখাবহ মনোমোহকর কূজন, বৃক্ষ পত্রের সুচারু শোভা, শারদশশধরের চিত্তহারিণী অতুল রূপমাধুরী, ভূধরের উচ্চতা, সমুদ্রের গভীরতা, সূর্য্যের বিশালতা, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র যাবতীয় নৈসর্গিক ভূতসম্ভব, সেই বিশ্বপ্রাণসূত্রস্বরূপ অপ্রতিসঙ্খ্যেয় মহাসৌন্দর্য্যসমুদ্রেরই নানাভাববিচিত্র দেশকালনিরুদ্ধ মাঙ্গলিক বিজৃম্ভণ।

ঐতিহাসিক যুগের অতিদূরপ্রান্তে, মহাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ঋজুহৃদয় আর্য্য হিন্দু, একদিন প্রাণের অনিবার্য্য সম্মাকর্ষণে, প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্যবৈভবের ভাবপরিকল্পিত মোহিনী অনুপ্রাণনায় আত্মবিস্মৃতের ন্যায় অবস্থিত ছিলেন। নৈসর্গিক ভূত গ্রামের অনন্ততরঙ্গবিলসিত অখণ্ড সৌন্দর্য্যসাগরে নিমগ্ন রহিয়া, তদানীন্তন আর্য্য হিন্দু, অলভ্য ও অচিন্ত্য ভাবাবেশে আবিষ্টবৎ হইয়া, যেন

বিস্ময়-ভক্তিপরিপ্লাবিত হৃদয়ে, উন্মুক্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে, সেই দৃশ্যমান জড় প্রকৃতির অন্তরালে এক অনির্ব্বচনীয় ভাগবত সৌন্দর্য্যের প্রীতিবিহ্বলা অর্চ্চনায় ভাবোচ্ছ্বসিত ও প্রেমাকুল প্রাণের সম্যক্ পরিতর্পণ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রাণারাধনায়—সৌন্দর্য্যের প্রেমনিষ্ঠ-মহিমান্বিত অর্চ্চনায়—সেই মুগ্ধহৃদয় আর্য্য হিন্দু চরমে চরমসৌন্দর্য্যের অনুশীলনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই জগন্মঙ্গল্যা মহীয়সী সাধনার পরমসিদ্ধির মহাভাষ্যস্বরূপ, নিখিলতত্ত্বের সারাৎসার ভুবনপ্রাণপ্রস্রবণ মহাস্তোত্রস্বরূপ, অক্ষয় অমৃতমধুর অক্ষরে, অবনীর প্রতিগৃহে সেই ঋষিসমুদীরিত "জ্ঞানং সত্যং শিবং সুন্দরং" বরেণ্যবাণী, হিরণ্যদেবীপ্রতিমার ন্যায়, ভাবসঞ্জীবিত হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি সংযোগে নিত্যধ্যেয়। কালের সেই অচিন্ত্য দূরব্যবধানেও, মহাতত্ত্বপিপাসু আর্য্যহৃদয়, সৌন্দর্য্যোপাসনার অতি দুরাসদ অনিবার্য্য মহাকর্ষণে, সেই সুদুর্দর্শ অনন্তসত্যের কত উর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচিন্তনে সত্যসত্যই চিত্ত অভাবনীয় অবসাদগ্রস্ত ও বুদ্ধি জড়তা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, সৌন্দর্য্যের লীলাময় সমাকর্ষণ জীবজগতের প্রাণশক্তি—জাগতিক ক্রিয়াবৈচিত্র্য; এবং ইহার তিরোধান বিশ্বের চরম বিলয়ন। নৈসর্গিক যাবতীয় চেষ্টা বা ক্রিয়ার অনন্ত ভাবময়ী গতি সেই মোহিনী আদ্যাশক্তিরই জীবনময়ী স্ফূর্ত্তি।

সৌন্দর্য্যের ভাবময়ী উপলব্ধি বা সৌন্দর্য্যের মহাকর্ষণে প্রেমোচ্ছ্বাস উপাসনার পরম অভিধান। সৌন্দর্য্য না রহিলে প্রেমের নিত্যানন্দদায়িনী স্ফূর্ত্তি কোন্ অলক্ষ্য শূন্যমার্গে বিলীন হইত! প্রেমে সংযোগ—সংশ্লেষ—বিরাটসৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকের প্রতিপাদ্য জাগতিক অদ্বয়তা। প্রেমসঞ্চারি সেই সৌন্দর্য্যই একত্ব বা একত্বের প্রাণ তন্তু। কাননের প্রফুল্ল কুসুমের সহিত বিশাল সৌরজগতের, বা ভূপৃষ্ঠস্থ উত্তুঙ্গ দুরারোহ শৈলশৃঙ্গের সহিত অতলস্পর্শ সাগর সলিলের, অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের সহিত জীবের ক্ষীণতম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সহিত, কি অচ্ছেদ্য অনাদি সার্ব্বভৌম সম্বন্ধ, তাহার প্রীতিনিষ্ঠা বিনির্ণীতিই মহাসত্য। তত্ত্বার্থী প্রেমিক সেই বিশ্বজনীন নিগূঢ় সম্বন্ধের মৌলিক কারণান্বেষণেই প্রেমসহকৃতা উপাসনায় যোগস্থ তপস্বীর ন্যায় তন্ময় রহেন। প্রেমে হৃদয়ের সহজ উদ্দীপনা—প্রাণের উত্তেজনা—বস্তু তত্ত্বোপলব্ধি। একদিন আর্য্যহিন্দুর প্রেমসমুদ্ভাসিত প্রাণে এই মহাতত্ত্ব যে ভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, লৌকিক ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলোকিত হয় না। অতীন্দ্রিয় জ্ঞাননিধি উপনিষদের মহাসত্যপ্রতিপাদনে; আনন্দময় পুরাণের অলঙ্কার সুশোভিত পবিত্র গাথায়; প্রাণমনোমদ কাব্যের বিচিত্র আলেখ্যে; সর্ব্বত্রই সেই চিরন্তন পারমার্থিক তত্ত্বেরই প্রেমোজ্জ্বলা মহীয়সী গীতি। উপাসনায় আত্মাহুতি আত্মোৎসর্জ্জন। কেননা,

তাহা প্রেমের নিত্যধর্ম্ম। প্রেমে আকর্ষণ—উদ্দীপনা—প্রেরণা— আত্মবিসর্জ্জন— উপাসনার পরমানন্দ লীলা।

উপাসনার প্রারম্ভিক ক্রিয়া হইতে উহার চরমাভিঘাত বা পরম স্ফুরণ পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃতিরই তন্ময়ী লীলা। সৌন্দর্য্যের মহাকর্ষণে মানবী সত্তার সার্ব্বভৌমী প্রবৃত্তি অথবা অনন্তে অনন্ত বিস্তৃতি। পার্থিব নিখিল ঘটনায় এই মহাতত্ত্ব অতি অভ্রান্ত ও নির্ব্যূঢ়রূপে উপপন্ন। যিনি সাধনার মহিমোদ্ভাসিতা প্রেরণায় যতদূর পুরোবর্ত্তী, আত্মাহুতির বিনিময়ে তিনি ততদূর বিধি-নির্দ্দিষ্ট অমল অথচ অমিত শক্তির প্রাণদ সঞ্চার অনুভব করিয়া থাকেন। ভূপৃষ্ঠে এতাদৃশ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাস সমলঙ্কৃত করিয়াছে। এই অপরিহার্য্য অজস্র শোকদুঃখসঙ্কুল বসুন্ধরায় ইহাই মানব-হৃদয়ের ঐকান্তিকী শান্তি। প্রাণোপম তনয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ শুভেচ্ছাপ্রণোদিত পিতার ফুল্লবদনে আত্মত্যাগ, পতিগতপ্রাণা পত্নীর হৃদয়সর্ব্বস্বের প্রিয়চিকীর্ষায় সানন্দ নিষ্কাম আত্মাহুতি, সৌভ্রাত্রের প্রেরণায় ভ্রাতৃপ্রবরের তদ্গত আত্মোৎসর্জ্জন, স্বদেশবৎসল মহাপ্রাণ পুরুষের দুর্ণিবার বেগে প্রাণ পরিত্যাগে স্বদেশরক্ষাব্রতের উদ্যাপন, সত্য-প্রবণ দার্শনিকের সর্ব্বথা আত্মবিস্মৃতের ন্যায় দুর্ব্বোধ তত্ত্বমীমাংসায় একনিষ্ঠ মনোভিনিবেশ, যোগরত তাপসের ন্যায় সৌন্দর্য্যের চিরন্তন সাধক মহাকবির অচল ও অপ্রতিহত অনুধ্যান, এবম্বিধ পার্থিব অবিরাম প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী সেই অপ্রমেয় সৌন্দর্য্য শক্তিরই মেদুর-মধুর বিজয়দুন্দুভি প্রকটিত করিতেছে। যে পবিত্র স্থানে এই বিশ্বজনীন মহাশক্তির সলীল আনন্দ আবর্ত্ত, সেই সাক্ষাৎ স্বর্গে একপ্রাণা আত্মবিস্মৃতি—উপাসনার সর্ব্বমঙ্গলময় প্রাণবিজৃম্ভণ।

জ্ঞানগরীয়সী প্রাচীন গ্রীক্‌ভূমির বরিষ্ঠ তাত্ত্বিক প্লেটো বিশ্বের আদিম প্রদেশে এক অখণ্ড মাঙ্গলিকী সত্তার উপপত্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যের মহাকর্ষণে উদ্‌ভ্রান্ত ও তরঙ্গায়িত হইয়াছিলেন। যে শিবশক্তির পরিকীর্ত্তনে বা প্রাণসংযোগে অনুধ্যানে সেই মনীষিসিংহ নিরন্তর তন্ময় ছিলেন, তাহাই সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যবহুল সহজ অভিধান। সেই তত্ত্ব অনন্ত, স্বতঃসিদ্ধ এবং অব্যয়। সত্য—সৌন্দর্য্য—শিবশক্তি সেই বুধবরেণ্য একই আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া এই নরনিবাস বসুন্ধরার পুণ্যসলিলা সুরধনীর অমৃতসঞ্চার করিয়াছেন। প্লেটোখ্যাত সেই সত্য প্রচার সনাতনী অবিপ্লুতা আর্ষী বাণীরই দ্বিতীয় সমুদীরণ বা প্রীতিমিশ্র অপূর্ব্ব ভাষ্য।

কবি প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য্যসাধক। সৌন্দর্য্যানুভূতিই কাব্যের মৌলিক প্রস্রবণ। মহাসাধনাসাধ্য নিয়ত ধ্যেয় সেই অপরিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যপ্রবাহের প্রেমবিমিশ্রা উপাসনাই কাব্যসৃষ্টি। উপাসনা ও কাব্য এই দুই ব্যবহারিক বিভিন্ন শব্দে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে কি? রূপকল্পনায় ধ্যান—ধ্যানে আনন্দের উদ্বেল অর্ণবপ্রবাহ—সর্ব্বতোমুখী আত্মবিস্মৃতি। ভগবান্ বাল্মীকি

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ভুবনপাবন রামায়ণ সর্ব্বপ্রধান কাব্য। কেন না, মহর্ষি বাল্মীকি সৌন্দর্য্যের হিরণ্যবিগ্রহের পাদপ্রদেশে যে প্রেমপুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, জগতের কেহই সেই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের অধিকারী হন নাই। রামায়ণ যে অবোধ্য অতীন্দ্রিয় মহাসৌন্দর্য্যতত্ত্বের পরম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বিচিত্র আলেখ্য এবং যে দুরবগাহ মহাসত্যের পরিবোধক, এই মেদিনীমণ্ডলে তাহার দ্বিতীয় তুলনা নাই। মানবী সভ্যতার আদিমস্তরে সৌন্দর্য্যানুধ্যান বা সৌন্দর্য্যোপাসনা যে অপূর্ব্ব ভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল, তাহার বিনির্ণয় সর্ব্বতোভাবেই বুদ্ধির অগম্য। প্রাচীন জগতের আর একজন অতি প্রধান কবি হোমার্। তিনিও সৌন্দর্য্যের সহজ আরাধনায় হৃদয় সন্তর্পণ করিতে প্রয়াসপর ছিলেন। তিনিও সেই মহাতত্ত্বের ঐকান্তিকী অর্চ্চনায় আপনাকে চরিতার্থ করিতে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু, সেই মহাপ্রাণ মহাকবি বুদ্ধির অনিবার্য্য ভয়াবহ বিপাকে নিপতিত হইয়া, অতি অস্পষ্ট ভাবে, সৌন্দর্য্যের সেই দুর্লক্ষ্য স্পৃহনীয় গ্রামে উপনীত হইতে না হইতেই, অলঙ্ঘ্য মহাবেগে স্খলিত হইয়াছিলেন। ইলিয়ডের কেন্দ্রীভূতা পাপীয়সী হেলেন মনুষ্যজাতির ভয়াবহ শোচনীয় অধঃপাতেরই অতি বিকট বিকৃত চিত্র। আর, রামায়ণনায়িকা জগদারাধ্যা ভুবনবিমোহিনী বৈদেহী সৌন্দর্য্য সুষমার অপ্রাকৃত উর্দ্ধতম বিকাশ। মানবী বুদ্ধি বা বুদ্ধির সর্ব্বোদ্ভাবিনী শক্তি যতদূর উত্থিত হইতে পারে, লোকবন্দ্যা জানকীর সর্ব্বমঙ্গল্য চরিত্রচিত্র তাহার সম্যক্ সুসমঞ্জস প্রকর্ষ। বাল্মীকি স্বভাব সরলতার প্রিয়তম সাধক। সাধনায় সেই মহাকবি প্রেম-অনুপ্রাণিত নির্ব্বিকার মহাযোগী। যোগে সৌন্দর্য্যের লোককল্যাণাবহ পরম সাক্ষাৎকার। যে সমুদ্বেল সমুচ্ছ্রিত প্রেমপ্রবাহ উপাসনার পরমাভিধান, বা মৌলিক অনাদি হেতু, তাহা বাল্মীকির বিশাল হৃদয়ের অনন্ত সৌন্দর্য্যসুষমা ; এবং তদীয় বিশ্বমঙ্গলনিদান লোকপাবন রামায়ণ মহাকাব্য মহামুকুরে সম্যক্ সচিত্র ও সজীবরূপে প্রতিফলিত। সৌন্দর্য্যের দেশকালাতীত যে অচ্ছিন্ন অনাদি প্রবাহ কাব্যচিত্রের মূলসূত্র, তাহার মহোচ্চ ভাববিলসিত সোচ্ছ্বাস আনন্দপ্রকাশ ইলিয়ড্ আলেখ্যে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। বাল্মীকির সেই লীলাবিভাসিত হৃদয় সৌন্দর্য্যের অক্ষয় অনন্ত প্রস্রবণ! অহো! কি অভাবনীয় হৃদয়গৌরব!! অহো! কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যোপাসনা!! অবনীর যে কবি সেই অতি দুরারোহ অনন্তপথবিসারি মহাসৌন্দর্য্যের প্রেমলীলাময়ী আরাধনায় বা সৌন্দর্য্যের প্রীতিপ্রণোদিত সাধনায় যতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে কুসুমাঞ্জলি সহযোগে মানবজাতির উপাস্য। সেই জন্যই আজ সহস্র সহস্র যুগান্তেও সেই লোকগুরু কবিকুল-কেশরী মহর্ষি বাল্মীকি মনুষ্য-হৃদয়সিংহাসনে অক্ষুণ্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

সৌন্দর্য্যের সুপবিত্র নৈমিষারণ্যে ভারতীয় প্রাতঃস্মরণীয় মনীষিগণ ভাবোদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে একসংস্থ মহাযোগীর ন্যায়, সেই পরম তত্ত্বের অবিকৃত উপাসনায় আত্মানন্দ লাভ করিয়াছেন। সেই অতীত পুণ্যকাহিনী অধোগত ভারতবাসীর অনন্ত অমৃতময়ী সমাশ্বাসবাণী। ভগবান্ কপিলের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, সকলই সেই অক্ষয় অনন্ত সৌন্দর্য্যেরই বিভিন্ন লৌকিক অভিধান। সৌন্দর্য্যের মহাকর্ষণ বিনা বস্তুতত্ত্বাধিগম সর্ব্বতোভাবে নিসর্গবিরুদ্ধ। সৌন্দর্য্যের অলঙ্ঘ্য আহ্বানে প্রেমবিভ্রম, তাহারই আনন্দময়ী মহালীলা উপাসনা। সৌন্দর্য্য—প্রেম—বস্তু তত্ত্বোপপত্তি—উপাসনা—একই মহাসত্যেরই কল্পিত উপাধি বিশেষ। সেই চিরাতীত ঋষিগণের হৃদয়মুকুরে, সেই পারমার্থিক মহাতত্ত্ব অপূর্ব্বভাবে অনন্তপথে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সকল বরেণ্য নরসিংহগণ, উপাসনারই অমৃতমধুর পবিত্র হিল্লোলে বা সৌন্দর্য্যানুধ্যানেরই উচ্চতর অনুপ্রাণনায় সন্দীপিত হইয়া, ঐন্দ্রিয়িক সত্তার দেশকালাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পরিধি অনিবার্য্য বেগে সহস্রধা ছিন্ন করিয়া, ভোগবিলাসমোহের বিকৃত পৈশাচ শাসনের উপর সৌন্দর্য্যের অনন্ত বিজয়শ্রী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের ব্যবহারিক অর্থে অনন্ত বৈচিত্র্য থাকিলেও, তাহার পারমার্থিকী ক্রিয়ায় অদ্বৈত ভাবই অবলোকিত হয়। অভিধান বৈচিত্র্যে বস্তুতত্ত্বের বৈপরীত্য ঘটে না। সৌন্দর্য্য পারমার্থিক বস্তু, উপাসনা তাহার প্রেমসমুদ্ভাসিত ভাবময় মহোচ্ছ্বাস কিংবা প্রীতিনিষ্ঠ ঐকান্তিক পরিগ্রহ। পূর্ণ আত্মাহুতিই উহার চরম প্রকর্ষ বা অন্তিম নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। ঐন্দ্রিয়িক তাণ্ডবতাড়নে বা স্নায়বিক উত্তেজনায় যে ভয়াবহ ভাব দৈহিক অবস্থার বিপরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত করে, তাহা কোনক্রমেই উপাসনার অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক প্রেমোত্থ অমলানন্দের মহাসংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। স্নেহ, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি হৃদ্‌বৃত্তি সৌন্দর্য্য শক্তিরই বিভিন্ন প্রাণদ স্ফুরণ। এই সকল পরার্থসাধিনী হৃদয়—মহত্ত্বপ্রতিপাদিনী অত্যুচ্চবৃত্তি উপাসনার দুরারোহ ও দুর্গম মার্গে বড় অধিক উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। যেহেতু, এবম্বিধা সাধ্বীয়সী বৃত্তির অনুবর্ত্তনে আত্মবিস্মৃতির অমৃতলীলা সমুজ্জ্বলরূপে প্রকট। আত্মবিস্মৃতির আত্মাহুতির পরিপূর্ণ নির্ব্বিশেষ অবস্থা, উপাসনারই পরিপূর্ণতার প্রকৃষ্ট অভ্রান্ত চিহ্ন এবং সর্ব্বথা উহার পরিবোধক হইলে, মনুষ্য কোন্ প্রাণে ও কি সাহসে, মনুষ্যত্বের পরিজ্ঞাপিনী তাদৃশী মহোচ্চ বৃত্তিরাজিকে উপাসনার পরমাভিধানে আখ্যায়িত করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে; এবং কিরূপেই বা মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের চিরন্তন বিভেদসূত্র উৎপাটিত করিয়া, জগতে দুর্নিবার কলঙ্ক সংস্থাপন করিবে? পতিপুত্রবিয়োগবিধুরা অনাথা রমণীর অজস্র দুঃখের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যস্বরূপ নয়নজল যাঁহার অশ্রু সঞ্চালিত করিতে পারে, তিনি নিঃসংশয় মনুষ্যনিবাসে দেবত্বের অতি সন্নিহিত। কেননা, সেই

পরার্থতৎপর মহাপ্রাণ পুরুষসিংহ প্রীতির পূতোপাসনায় সৌন্দর্য্যেরই বিকার বিনির্ম্মুক্ত মহাসাধক। তাদৃশ দেবদুর্ল্লভচারিত্রমহিমোদ্ভাসিত পুরুষপ্রবরের পবিত্র নামোদ্দেশ্যে যদি ভক্তির অনাবিল অঞ্জলি নিপতিত না হয়, তাহা হইলে মানবীয় অধঃপাতের অক্ষয় অকীর্ত্তি, শশিদিবাকরের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত, কিছুতেই প্রক্ষালিত হইবে না।

মহর্ষি বাল্মীকি যেরূপ সৌন্দর্য্যাকর্ষণের প্রীতিবিহ্বল উদ্দীপনায় পুণ্যশ্লোক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বৈদেহী প্রভৃতির অতিতর মোহিনী গাথার প্রাণময় সঙ্কীর্ত্তনে সৌন্দর্য্যোপাসনার গরীয়ান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, হৃদয়নিহিত দুর্ব্বহ ও দুর্ব্বার প্রীতিপ্রবাহ কিঞ্চিৎ সন্তৃপ্ত করিয়াছেন; মহার্থদ্রষ্টা মনুষ্যজাতির চিরারাধ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও সেইরূপ প্রেমাকুলপ্রাণে তাদৃশ অত্যুচ্চ ও অপ্রাকৃত চরিত্র যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম ও পার্থ প্রভৃতির লোকোত্তর অবদান পরম্পরার পরিকীর্ত্তনে চরিতার্থ হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সৌন্দর্য্যেরই প্রিয়সাধক; সৌন্দর্য্যের মোহন মধুর সঙ্গীতে ইঁহারা সকলেই কি যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন।

প্রকৃতির মর্ম্মার্থগ্রাহী কবিবর শেক্স্পীয়ারও সৌন্দর্য্যের অনভিভবনীয় অভিঘাতে সর্ব্বথা বিবশ ও বিকল হইয়া সুধাসিক্ত কাব্যচিত্রে স্বকীয় অলোকসামান্য হৃদয়গৌরব প্রকটিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সৌন্দর্য্যের মোহন আহ্বানে তিনিও উদ্‌ভ্রান্ত বা উন্মাদগ্রস্ত। তিনিও অপ্রমেয় আনন্দসম্ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, সৌন্দর্য্য সাধনার পরিতর্পণ সমাহিত করিয়াছেন। তদীয় বিশ্ববিমোহন আলেখ্যে তাঁহার অবারিত প্রেমোচ্ছ্বাস যেন সহস্র পথে বিকীর্ণ হইয়া সৌন্দর্য্য উপাসনার দুর্দ্দম আকর্ষণে, মনুষ্য মহত্ত্বের উচ্চতম গ্রামের কতদূর সন্নিহিত হইতে পারে, তাহাই যেন অবিনাশি সুবর্ণাক্ষরে বিঘোষিত করিয়াছে।

কবিকুলপ্রদীপ স্বভাবের প্রিয় বরপুত্র কালিদাস এবং অনুপম সৌন্দর্য্যস্রষ্টা কবিগৌরব মহাপ্রাণ ভবভূতি, সৌন্দর্য্যের পরপারে গমন করিয়া, হৃদয়যোগে, প্রেমাভিষিক্ত প্রাণে, উপাসনার সঞ্জীবনী লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপরিশুদ্ধ হৃদয়সরসীসলিলে সেই সৌন্দর্য্যভঙ্গীরই বৈচিত্র্যলীলা বিরাজিতা।

গ্রীক্ সভ্যতার মধুর অরুণোদয়ে, মহাতাত্ত্বিক, জ্ঞানপ্রবুদ্ধ পিথাগোরাস্, ভাবব্যাকুলপ্রাণে, যেন সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিনী মহাসিদ্ধির আনন্দসাক্ষাৎকারে, সৌন্দর্য্যকেই অবোধ্য ভাষায়, বিশ্বের উৎপত্তি বা বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক কারণস্বরূপে, নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। শ্রুতিসুখাবহ প্রাণসম্মোহন সুদূর আকাশ সঙ্গীত সেই অতীন্দ্রিয় চিরন্তন অখণ্ড সৌন্দর্য্য প্রবাহেরই উজ্জ্বল ভাষ্য। তিনি ভাববিভ্রান্ত প্রাণে, সেই মহাসৌন্দর্য্যেই আপনার বিষয়পরিধির অন্তর্গত সসীম ও সান্ত সত্তাকে সর্ব্বতোভাবে নিমজ্জিত করিয়া, অপার্থিব ও অনির্ব্বচনীয় সুধাস্বাদে

সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানি-গুরু প্লেটো, মহাপ্রাণ অ্যারিষ্টোটল, বুধবর স্পিনোজা, মহর্ষিকান্ত্ এবং প্রত্যক্ষবাদী অগাষ্ট্ কোম্ত্ ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব জ্ঞানবৃত্তির আপেক্ষিক বিকাশানুপাতে সেই নিত্যধ্যেন পরম সৌন্দর্য্যেরই বিভিন্ন রূপও উপাধি দ্বারা ঐকান্তিকী উপাসনায় তন্ময় মহাযোগীর ন্যায় ধ্যাননিরত রহিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের সেই অনন্ত মার্গানুসারিণী নানা বৈচিত্র্যময়ী গতি তাঁহাদিগকে অদম্যবেগে কোন্ অলক্ষ্য অনির্দ্দেশ্য মহাগ্রামে সমুত্থাপিত করিয়াছে!! সর্ব্বত্রই একই তত্ত্বেরই জীবনময়ী স্ফূর্ত্তি। ইঁহারা সকলেই সৌন্দর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের প্রেমাশ্রিত অনুধ্যানকে মনুষ্যহৃদয়ের দেবপ্রতিমা জ্ঞানে নিয়ত বিধিপূর্ব্বক এক প্রতিষ্ঠা প্রীতিসংযোগে উপাসনা করিয়া মানবলক্ষ্যের সন্নিহিত হইয়াছেন।

কবিবর স্বভাবশিশু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও ভাবাবেশে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া—সৌন্দর্য্যের দুর্ল্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে আত্মবিস্মৃত হইয়া, চিরকাল উপাসনাতত্ত্বের অমৃতমাধুরী উপভোগ করিয়াছেন। বহির্জ্জগতের আনন্দসুষমা তদীয় প্রেমপ্রবণ হৃদয়কে সমালোড়িত করিয়া দেবত্বের পূর্ণাধিকারী করিয়াছে। কোকিলের প্রাণোন্মাদকারি কূজন বা গগনপটের বিচিত্রভঙ্গী কিংবা তটিনীর শ্রুতি-সুখকর ধ্বনি যাবতীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বৈভবই তাঁহার নিত্য ধ্যেয় ছিল, এবং অবিকৃতরূপে তাহারই ভাবোদ্বেল হৃদয়ে অনুধ্যানে বা প্রীতিময়ী উপাসনায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন।

রূপকল্পনা মনুষ্যের নিসর্গসিদ্ধ অপরিহার্য্য নিত্যধর্ম্ম। কেন না, যে অনাদি ও অনন্ত সৌন্দর্য্য বিশ্বজগতের বিধাতৃস্বরূপ বিরাজিত, দেশকালাবরুদ্ধ ঐন্দ্রিয়িক বা ভৌতিক সত্তা তাহারই অস্ফুট অথচ সুচারু স্ফুরণ। সাগরে তটিনীর গতি; জীবপ্রাণ সেই জন্যই সেই সৌন্দর্য্য সমুদ্রে অতৃপ্য পিপাসায় অবিরাম প্রধাবিত। কেহ বাসন্তী সুষমার বিচিত্র বিলাস অবলোকনে আবিষ্টবৎ অবস্থান করেন, কেহ শারদীয় চান্দ্রমসী প্রভার সলীলবিলাস নিরীক্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েন; কেহ জ্ঞানে তৃপ্ত; কেহ ভক্তির অমৃত নামে আত্মবিস্মৃত; কেহ পিতার অভয় নামে চিত্রার্পিত; কেহবা জননীর সস্নেহ দৃষ্টিস্মরণে বিমোহিত। সর্ব্বত্রই এই সৌন্দর্য্যেরই সঞ্জীবনী সন্দীপনীলীলা। যখন এই পরমার্থ পরিবোধক সৌন্দর্য্যের বিলাসময়ী ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন পার্থিব জগতের ভাবান্তর সঙ্ঘটিত হয়। তখন জননী প্রদীপ্ত হুতাশনে সানন্দে জীবন উৎসর্গ করেন; পত্নী সমুদ্রের অতলস্পর্শ সলিলে প্রাণ ত্যাগ করেন; এবং তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব অনির্দ্দেশ্য ভাবাবেশে বহির্জ্জগতের ক্রিয়া হইতে থাকে। উপাসনার আনন্দ-ক্রিয়ায় অনলের উত্তাপ, সলিলের শৈত্য এবং অনিলের স্নিগ্ধতা, যেন সমীকৃত ও নির্ব্বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সমুদ্রের গভীরতা, পর্ব্বতের উচ্চতা এবং আকাশের বিশালতা কি এক অজ্ঞেয় অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্মিলিত হয়! তখন সিংহ

ন, কোকিলের কূজন, অশনি নিঃস্বন সমতাপ্রাপ্ত হয়! তখন আলো ও অন্ধকার, শীত ও গ্রীষ্ম একীকৃত হয়! তখন হিংসায় প্রীতি, ঘৃণায় প্রেম, শত্রুতায় মৈত্রীর প্রাণদ সঞ্চার হয়! তখন ব্যাঘ্রের দশন, সর্পের দংশন, গণ্ডারের বিষাণ কিছুতেই মনুষ্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন সমুদ্রপতন, হস্তিপদতলে দলন, বিষগ্রহণ কিছুতেই প্রহ্লাদের প্রাণাতঙ্ক হয় না। তখন শচীদেবীর আর্ত্তনাদ, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণভেদী বিলাপ, চৈতন্যকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না! তখন অর্জ্জুনের শোক, যুধিষ্ঠিরের দুঃখ, দ্রৌপদীর প্রতপ্ত শ্বাস অদম্যবেগে কোন্ অলক্ষ্যপথে বিলীন হয়! তখন সক্রেটিসের বিষগ্রহণে আনন্দ, লুথারের ধর্ম্মপ্রচারে উল্লাস; লাটিমারের অনল প্রবেশে অবিচলিত দৃঢ়তা, বসুন্ধরাকে বিশোধিত করে।

উপাসনার প্রাথমিক সঞ্চারেই সৌন্দর্য্যানুধ্যানের অনুল্লঙ্ঘ্য আশ্চর্য্য বিলাস। উহা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। বহির্জগতের আনন্দদৃশ্যের অন্তস্তলে প্রেমিকের দুর্দ্দম ভাবোন্মত্ততা। শারদীয় সৌন্দর্য্যসুষমা বাহ্যপ্রকৃতির আনন্দাভরণ বা তাহার রসময়ী ধাত্রী। ভাবুকের উন্মাদিত প্রাণে সেই অতি রমণীয় দৃশ্য চাঞ্চল্যোৎপাদনে তাঁহাকে সবেগে ও সবলে অনন্তের উর্দ্ধ রাজ্যে আকর্ষণ করে; তিনি আকুল ও অধীর হয়েন, এবং অনন্তের অনন্ত বিস্তারে পরমা সমাধি লাভ করেন। যে প্রাণোন্মাদকারিণী অনন্ত রসাত্মিকা সর্ব্বসন্তাপহারিণী পরমার্থপ্রতিপাদিনী লোক পাবনী ভগবতী মূর্ত্তি প্রেমোদ্‌ভ্রান্ত মহাপ্রাণ সাধকের অনন্ত উন্নতির মৌলিক হেতু, তাহা সেই অনাদি অপ্রমেয় অখণ্ড ভাগবত সৌন্দর্য্যেরই বিলাসতরঙ্গান্দোলিত জগন্মোহন নিত্য চিত্র। সেই জন্যই সেই পারমার্থিক চিত্রের পরিলোকনে তাঁহার সরস হৃদয়ের অমিত ও অমেয় আনন্দউচ্ছ্বাস সংস্রবে উদ্‌বেল হইয়া, তাঁহাকে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্ধার্য্য ভাবাভিঘাতে, সমান্দোলিত করে! জীবপ্রাণ সৌন্দর্য্যের সানুরাগ অন্বেষণেই আত্মানন্দ প্রাণানন্দ লাভ করে, কেননা, তাহার প্রাণ সেই অনন্তসৌন্দর্য্যসমুদ্রেরই সাময়িক তরঙ্গ বিজৃম্ভণ। সেই জন্যই ভাগবত নিয়মের বিশ্বজনীন ধর্ম্মে, সাগরের অনন্ত বিস্তারে বিস্মৃতি বা সমাধিলাভই, তদীয় স্বভাবধর্ম্ম। যে ভাগবতী মূর্ত্তির অনুধ্যানে তাঁহার হৃদয়ানন্দ, তাহারই সোচ্ছ্বাস স্ফুরণ তদীয় সত্তার আদিম কারণ। মহাসাগরে তরঙ্গের বিলয়,—উহাই তাহার চরমোদ্দিষ্ট লক্ষ্য পরিণতি; সেই জন্যই উপাসনায় মানবীয় পরিপূর্ণতা। এক দিন উপাসনার মহাস্তুতি গানে, পরমতত্ত্বজ্ঞ পার্থ, সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত শান্তিনিবাস বাসুদেবের বিশ্ববিসারিরূপ সমুদ্রে কালস্থানাবচ্ছিন্ন জড়ীয় সত্তা বিস্মৃত হইয়া, এক বাঙ্‌মনোহতীত মহাশান্তির আবেশে তন্ময় হইয়া ছিলেন!

সেই জন্যই কহিতেছিলাম, সৌন্দর্য্যের পরিকল্পনায় উপাসনা। উপাসনায় প্রেমোত্থ মহানন্দ; কেননা, তাহাতেই মানবী

সত্তার বিশ্বজনীন প্রবৃদ্ধি অথবা অনন্তে ঐকান্তিক বিগমন। ইহাই চিরোদ্দিষ্টা নিখিলার্থ প্রদায়িনী পরমা পরিপূর্ণতা।

আর একবার নিযুত কণ্ঠে সমতানে সৌন্দর্য্যের নিত্য বিজয়সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তিত হউক, আর একবার লক্ষপ্রাণে উপাসনার অমৃত নামে প্রীতিকুসুমাঞ্জলি সমর্পিত হউক; এবং আর একবার সেই পুরাতনী ঋষি সমুদীরিতা মহাবানীর পরিকীর্ত্তনে জীবনিবাস বসুন্ধরা পরিশোধিত হউক। মহীয়সী আর্য্যভূমি মহনীয় নামা বাল্মীকি ব্যাস প্রসবিনী; এই গঙ্গা-সিন্ধু-গোদাবরী-নর্ম্মদা-নিষেবিত মহাক্ষেত্র, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, অর্জ্জুনের আরাধ্যা জননী; এই মহাতীর্থে, কপিল, শঙ্করাচার্য্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র সগৌরবে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন; এবং এই গরীয়সী ভুবনোজ্জ্বলা ভূমিতেই সত্য ও সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও উপাসনা সুসমঞ্জসরূপে নিয়ত সলীল বিরাজ করিয়াছে। এই জগদ্‌বন্দ্যা দেবভূমি অনন্তকাল সৌন্দর্য্যের মহাভাবোদ্দীপিত অমৃতানুধ্যানে, প্রানমনোমোদিনী উপাসনার গরীয়সী লীলায়, সমুদ্‌ভাসিতা থাকুন।

শ্রীশশীমোহন বসাক এম্, এ।

মঞ্জিলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উদয়পুরের পঞ্চ ক্রোশ উত্তরে পরাশরনামক এক ঘন পাদপরাজিপূর্ণ বৃহদরণ্য আছে; তন্মধ্যস্থ ত্রিকূটগিরির সানুদেশে একটি অতি প্রাচীন দেব-মন্দিরাভ্যন্তরে একজন যোগী একটি শিবলিঙ্গের পুরোভাগে অজিনাসনে সমাসীন। তাঁহার পরিধানে রক্তাম্বর; দেহ চন্দনচর্চ্চিত, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্ত-রেখা, গলে পদ্মবীজ মালা। তাঁহার পার্শ্বে দুইটি যুবক গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন;—তন্মধ্যে একটির বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর ও অপরটির অষ্টাদশ বৎসর হইবে। তাঁহাদিগের বিশাল দেহ, বলব্যঞ্জক দেহের গঠন এবং মনোহর আকৃতি দেখিয়া তাঁহাদিগকে কোন উচ্চকুলসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সহসা গম্ভীরভাবে যোগিবর বয়ঃকনিষ্ঠ যুবককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "পৃথ্বীরাজ!—তোমাদের পিতা উদয়পুরের অধীশ্বর রাণা রায়মল্লের পরলোক প্রাপ্তির পর, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সঙ্গসিংহ চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে।"

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। সমস্ত স্থান

নীরব, নিস্তব্ধ ও তমসাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকার-রাশি ভেদ করিয়া যুবকদ্বয় চলিয়াছেন; সহসা পৃথ্বীরাজের শাণিত অসি তদগ্রজ সঙ্গসিংহের শিরোপরি উত্থিত হইল। ভীষণ অসি প্রহারে সঙ্গসিংহ ধরাশায়ী হইলেন—পৃথ্বীরাজ মৃতপ্রায় অগ্রজের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অচিরে উক্ত ঘটনা চিতোরের অধীশ্বর রাণা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইল; তিনি পৃথ্বীরাজকে তিরস্কারপূর্ব্বক রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার অন্য মহিষীর গর্ভজাত সন্তান জয়মল্ল, চিতোরসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া, বিঘোষিত হইল।

পৃথ্বীরাজ বীর, সাহসী ও বুদ্ধিমান্। তিনি হতাশ হইলেন না, প্রত্যুত অটল উদ্যমে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার অনুরক্ত, সাহসী ও কার্য্যক্ষম রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক একটি দল সংগঠন করিলেন এবং গদবার প্রদেশান্তর্গত গানোর নগরের অধিপতিকে পরাভব করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন। * * *

উদয়পুরের পশ্চিমে অভ্রভেদী ভীষণ আরাবল্লীনামক পর্ব্বত বিরাজিত। তৎসানুদেশস্থ চৌন্দনামক ভীলপল্লীর গিরিদুর্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহা একটি দুর্গম শৈলশিখরে সংস্থিত এবং চতুর্দ্দিক উন্নত পাষাণময় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের একটি নিভৃততম কক্ষে বীর করিমচাঁদ বন্দিভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। রাও করিমচাঁদ প্রমারবংশীয় বীর রাজপুত। যবন অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, একটি শিশু পুত্রসহ আরাবল্লী পর্ব্বতের একটি বিজন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। কালে তিনি এরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন যে, আজমীরের নিকটবর্ত্তী শ্রীনগর অধিকার করিলেন। তাঁহার পুত্র জগমলও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার পিতার অনুরূপ ছিলেন। কি শারীরিক সামর্থ্যে, কি সমরকৌশলে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা সমস্ত উদয়পুর রাজ্যে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত।

করিমচাঁদের রাজ্যলিপ্সা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উৎকট রাজ্যলাভ-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভীলনগরী চৌন্দ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন।

দিবা অবসান হইয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম কিরণে শৈলগাত্র ও অত্যুন্নত দ্রুম-শীর্ষস্থ পত্রাবলি রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে। এহেন সময়ে দ্বাবিংশতি বর্ষীয় একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক ধীরে ধীরে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়া গমন করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল; দেখিলেন সম্মুখেই একটি অশ্বারূঢ়া ভীলকুমারী ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহার দিকে আগমন করিতেছে, উভয়েই উভয়ের মুখপানে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া

রহিলেন ; যুবক দেখিলেন,—ভীলকুমারীর বয়ঃক্রম প্রায় সপ্তদশ বর্ষ হইবে, মুক্ত কেশদাম পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; দেহ নাতিদীর্ঘ, কিন্তু বলব্যঞ্জক ; বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখাকৃতি সুন্দর ও সরলতাময়। ভীলকুমারী একবার সান্ধ্যপ্রকৃতির প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোক ক্রমে বিলীন হইল। প্রকৃতি সুন্দরী কৃষ্ণবেশ পরিধান করিল। সহসা অদূরে বনাভ্যন্তরে মনুষ্য স্বর যুবকের কর্ণগোচর হইল ; হঠাৎ চারিজন বলিষ্ঠ ভীল তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ক্ষিপ্রহস্তে যুবক তাঁহাদিগকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়া নিকটস্থ বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বদিক রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রস্থ তরুশির উষার বালসূর্য্য কিরণসম্পাতে সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। উষাসমীরণ বিকশিত সুগন্ধি কুসুমের সৌগন্ধ বহন করিয়া ইতস্ততঃ সুগন্ধিময় করিয়াছে। এই শান্তিময়ী উষাকালে, বন-কুসুম-শোভিত একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী তটে, একখণ্ড পাষাণোপরি উক্ত যুবক চিন্তামগ্ন। যুবক সহসা দেখিতে পাইলেন,—সেই ভীলকুমারী পুষ্পসাজে ভূষিতা হইয়া তাঁহার দিকে আগমন করিতেছে ;—হস্তে ধনুর্ব্বাণ,—তাহাও পুষ্পভূষিত। ভীলকুমারী উক্ত শিলখণ্ড সমীপস্থ নির্ঝরিণী তটে উপবেশন পূর্ব্বক একটি একটি করিয়া পুষ্প জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহা যে স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সে একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল। যুবক তাহাকে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন, "ভীলকুমারী, এ সংসারে তোমার কে আছে ?" সে ধীরে ধীরে নম্রভাবে কহিল, "ভীল-সর্দ্দার ধঙ্কুলের নাম আপনি শুনিয়াছেন কি ?—আমি তাঁহারি একমাত্র কন্যা। যুবক বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মঞ্জিলা ?" সে স্থিরভাবে উত্তর দিল "হাঁ।" যুবকের ললাটদেশ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইল, নেত্রদ্বয় সমধিক উজ্জ্বল হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহা তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "চৌন্দ সমরে তোমার বীরত্ব প্রশংসনীয় বটে।" ভীলকুমারী মৃদু হাস্যসহকারে যুবকের মুখপানে একবার স্থির দৃষ্টে চাহিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। অদূরে একটি গীতধ্বনি শ্রুত হইল ;—

"নীরবেই ফোটে ফুল বন মাঝে হায় !
নীরবেই হাসে ফুল কেবা দেখে তায়।"

অর্দ্ধ সমাপ্তি গীতধ্বনি ক্রমে ক্রমে অস্পষ্টতর হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গভীরা যামিনী ;—দ্বিপ্রহর অতীত। সমস্ত স্থান নীরব নিস্তব্ধ, গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত দিক্ আবৃত। সেই অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক তিনশত সশস্ত্র যোদ্ধাসহ নীরবে চৌন্দদুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে। যুবক ক্রমে চৌন্দ-

দুর্গ সমীপস্থ একটি ঘন বৃক্ষলতাপূর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; তথায় অন্য একটি যুবক সশস্ত্রে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান ছিল। দণ্ডায়মান যুবক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "রমল, সমস্ত প্রস্তুত?"

রণমল উত্তর দিল, "হাঁ"। এই বলিয়া অদৃশ্য হইল।

কতিপয় মাত্র চৌন্দ-দুর্গ রক্ষক ভীল শান্তিময়ী নিদ্রা-ক্রোড়ে বিরামলাভ করিতেছে; কেহ কেহ অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বসিয়া রহিয়াছে। সহসা তাহারা আক্রান্ত হইল। তাহারা আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই একটি যুবকের প্রচণ্ড অসি আঘাতে ধরাশায়ী হইল। দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত হইল। সহসা ভীষণ নাদে দুর্গোপরিস্থ প্রকাণ্ড দামামা বাদিত হইল। সেই গম্ভীর ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। যুবক দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক করিম চাঁদের উদ্ধার সাধন করিলেন। করিমচাঁদ তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, জগমল, তুমি অন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিলে, কারণ ঐ দামামা নির্ঘোষই আমাদিগের একমাত্র বিপদের মূল।" জগমল কহিল, পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি কোন বিপদই গ্রাহ্য করি না।"

এই বলিয়া দুর্গ-শিখরে আরোহণ করিল; দেখিল, ভীলকুমারী মল্লিকা ধনুর্ব্বাণ হস্তে দামামার নিকট দণ্ডায়মানা! মল্লিকা কহিল, "যুবক অগ্রসর হইও না;—আর এক পদ অগ্রসর হইলে আমার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র তোমার দেহ বিদ্ধ করিবে।" জগমল ঘৃণার হাসি হাসিয়া তাহার নিকটে আসিল;—মল্লিকা ধনুকে তীর সংযোজন করিল,—জগমল তাহার হস্ত ধারণ করিল—সহসা মল্লিকার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল,—তীর ধনুক হস্তচ্যুত হইল;—মল্লিকা কহিল, "যুবক পলায়ন কর।"

সহসা পর্ব্বত-নিম্নে ভয়ানক কোলাহল শ্রুত হইল; অবিলম্বে সহস্র ভীল যোদ্ধা চৌন্দ-দুর্গ সমীপে সমবেত হইল। করিমচাঁদ ও জগমল তাহাদের অল্পসংখ্যক যোদ্ধা সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। অল্প সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা তাহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সহসা দূরে অগ্নিরেখা দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা ভীষণাকার ধারণ করিল;—রণমল ভীল-পল্লিতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে! সুষুপ্ত ভীলগণ জাগরিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহাদিগের গৃহ জ্বলিতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু ও স্থবিরভীলগণ তাহাদিগেরই নয়ন-সমীপে দগ্ধ হইতে লাগিল! পলায়মান ভীলগণ রাজপুত যোদ্ধাদিগের অস্ত্রে নিহত হইতে লাগিল! রণমল তথা হইতে করিম চাঁদের নিকট আগমন পূর্ব্বক ভীলদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের ভীষণ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ভীলগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। চৌন্দ-দুর্গ অধিকৃত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রসিদ্ধ আফগান বীর লীল কর্তৃক তোডাটঙ্ক অধিকৃত হইলে, তদধিপতি রাও শূরতান তাঁহার একমাত্র দুহিতা তারাবাই সহ বেদনোর নগরে সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তারাবাই পরম রূপবতী ছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাজস্থানের অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিপার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন—কারণ শূরতান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তোডাটঙ্ক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তৎকালীন চিতোরাধিপ রাণা রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল তাঁহার বিবাহ প্রার্থী হইয়া কতিপয় সৈন্যসহ তোডাটঙ্ক উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, অচিরে আফগান বীর লীলের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি পরাজিত হইলেন। ভগ্ন-মনোরথ জয়মল্ল অনন্যোপায় তারাবাইকে গোপনে কৌশলে হরণ করিলেন এবং পার্ব্বত্য-পথে চিতোরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত রাগে পশ্চিম গগন রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে। নিদাঘবায়ু কতক স্নিগ্ধ হইয়াছে; দিবাচর বিহঙ্গমগণ মনের সুখে সেই দিনের তরে একবার শেষ গান করিল। জগমল শ্রীনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে চৌন্দ-দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সহসা পথিমধ্যে জয়মল্ল ও তাঁহার সঙ্গীয় ১০।১২ জন সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধা একটি শিবিকা সহ গমন করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইল; তিনি তাহাদিগের অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হইলেন। তিনি অকুতোভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত করিলেন; এবং ভীষণ অসি প্রহারে জয়মল্লের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শিবিকাভ্যন্তরস্থ যুবতীর উদ্ধার সাধন হইল। তারাবাইএর অনুপমেয় সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া তিনি বিমোহিত হইলেন। তৎপ্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে নিরাপদে পঁহুচাইয়া দিলেন,—কিন্তু সে মনোমোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়-পটে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিল।

জয়মল্লের নিধনে পৃথ্বীরাজের ভাগ্য-গগন পরিস্কৃত হইল। রাণা রায়মল্ল এতৎসংবাদ শ্রবণে অতিশয় শোকপ্রাপ্ত হইলেন এবং পুনরায় পৃথ্বীরাজকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

তারাবাইএর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিবরণ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি রাও শূরতান ভবনে উপস্থিত হইলেন।—তারাসুন্দরীর অসীম সৌন্দর্য্য, সরল স্বভাব, বুদ্ধিমত্তা এবং বীরোচিত গুণাবলী দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া রাও শূরতান নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিলেন; তিনি নবভাবে তোডাটঙ্ক উদ্ধারবিষয়ে-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পৃথ্বীরাজ প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হইলেন এবং বিদায় গ্রহণাভিলাষে তারাসুন্দরীর নিকট

গমন করিলেন। পৃথ্বীরাজের মনোহর রূপ দর্শনে তারাসুন্দরী তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন,—সজলনয়নে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। * * * * *

চোন্দ-দুর্গ-পরিবেষ্টিত পরিখা পার্শ্বে দুইটি যুবক চিন্তামগ্ন;—একটি জগমল্ল ও অপরটি রণমল্ল। সহসা রণমল্ল জগমল্লকে কহিল, "ভাই জগমল, বৃথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর; ভালবাসা অবনতির সোপান-স্বরূপ; সম্মুখে কঠোর অসীম কর্ম্ম-ক্ষেত্র;—তোমার বাহু যুগলে প্রচুর সামর্থ্য আছে, হৃদয়ে প্রচুর সাহস আছে, কর্ম্মে ঐকান্তিক যত্ন আছে—নবীন বয়স;—নবীন উৎসাহ, কঠোর উদ্যমে বিস্তৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও,—সুখী হইবে।—ভালবাসা ভুলে যাও।"

জগমল অশ্রদ্ধা-পূর্ণ-হাস্যসহকারে কহিল, —"অসম্ভব।"

রণমল বিরক্তিসহকারে কহিলেন, "তবে মর।"

জগমল হাস্যসহকারে কহিলেন, "এক দিন সকলকেই মরিতে হইবে।" কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হয় তোডাটঙ্ক উদ্ধার, না হয়, মরণ।"—এই বলিয়া দুর্গোপরিস্থ দামামায় ধ্বনিত করিলেন,—জলদ-গম্ভীর নাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, অচিরে দুর্গ-নিম্নে সহস্র সহস্র ভীলযোদ্ধা সমবেত হইল। জগমল ও রণমল দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা তোডাটঙ্ক অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এ দিকে পৃথ্বীরাজ আফগানদিগের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; বীরনারী তারাবাই পুরুষসাজে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসীম বীরত্বে যবনদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ বন্দি হইলেন। সহসা অদূরে ভীষণ কোলাহল শ্রুত হইল।—দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র ভীল যোদ্ধা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যবনদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। জগমল অসংখ্য অরি নিপাত পূর্ব্বক আফগান সেনাপতির মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিলেন, কিন্তু তথাপিও যবনসৈন্য রণে ভঙ্গ প্রদান করিল না; অকুতোভয়ে দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে লাগিল। একজন যবনবীর প্রাণের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছিল। রণমল প্রচণ্ড বিক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। যবনবীর তাঁহার মস্তকোপরি তীক্ষ্ণধার অসি উত্তোলন করিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।—তিনি বিস্ময়সহকারে দেখিলেন, মহিলা ধনুর্ব্বাণ হস্তে অশ্বোপরি আসীনা। মুহূর্ত্তে দুর্গদ্বার ভগ্ন হইল।—তোডাটঙ্ক উদ্ধার হইল। পৃথ্বীরাজ তারাবাই সহ প্রফুল্ল অন্তরে সমরস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

বিজয়োৎফুল্ল জগমল রণমলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ ভাবী প্রিয়তমা তারাবাইর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হৃদয়ে আশা,—মোহময়ী আশায় হৃদয় পূর্ণ, —আশা-জনিত আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া ভাবি প্রিয়তমা সন্দর্শনে চলিলেন।

যামিনী গভীরা; দ্বিযাম অতীত। সমস্ত স্থান নীরব। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী-জ্যোৎস্নাময়ী ধরণী—জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতি। বিমল চন্দ্রালোক-পরিস্নাত হইয়া আরাবল্লির শৈলরাজি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শুভ্র শশি-কিরণে বিকশিত অরণ্যকুসুম হাসিতেছে। অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলরাজিবেষ্টিত একটি অতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ হ্রদ নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জগমল নৈশ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে ভাবে মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন। সহসা সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণে তিনি অতি বিস্মিত হইলেন। সে সঙ্গীত বামা-কণ্ঠ ধ্বনিত—বিরহিণী প্রেমিকা-হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শি নৈরাশ্য-গীত।—

"নীরবেই ফোটে ফুল, বন মাঝে হায়!
নীরবেই হাসে ফুল, কেবা দেখে তায়?
নীরবে ফুটিয়া ফুল, নীরবে শুকায়।
দেখে না জানে না কেহ এ সংসারে হায়!

দেখিলেন,—ভীলকুমারী মঞ্জিলা হ্রদ-তটে শিলাখণ্ডোপরি বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে গান করিতেছে। কেশদাম মুক্ত। সর্ব্বাঙ্গ কুসুম ভূষণে ভূষিত। পার্শ্বে তীর ধনুক পতিত। তিনি তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এখানে, এতরাত্রিতে, একাকী, কেন মঞ্জিলা?" মঞ্জিলা তাঁহার মুখপানে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পুনঃ প্রশ্নে কহিল, "এখানে, অতরাত্রে, একাকী, কেন জগমল?"

জগমল কহিলেন, "রণ-শ্রান্তি দূর করিবার আশায়।" ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক মঞ্জিলা কহিল, "আমিও তাই।" জগমল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যুদ্ধে গিয়াছিলে?" —ধীরভাবে মঞ্জিলা কহিল, 'হাঁ'। জগমল নীরবে কিয়ৎকাল চিন্তাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিশীথে, এহেন নির্জ্জন স্থানে, একাকী ভ্রমণ করিতে তোমার ভয় হয় না?"—মঞ্জিলা গম্ভীরভাবে কহিল, "যে, নির্জ্জন গিরি-গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শৈশবে নির্জ্জন অরণ্যে, নির্জ্জন পাহাড়ে, নির্জ্জন নির্ঝরিণী তটে, একাকী ভ্রমণ করিয়াছে, যাহার জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে অতিবাহিত হইয়াছে, সে কি নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিতে ভয় পায়? জগমল কহিলেন, "এভাবে কতকাল ভ্রমণ করিবে?" কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া মঞ্জিলা কহিল, "বোধ হয় চিরকাল।" জগমল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উভয়েই নীরব। মৃদুমন্দ নৈশ-সমীরণে ধীরে ধীরে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি নিদ্রিত হইলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন,—মঞ্জিলার ক্রোড়দেশে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত রহিয়াছে;—মঞ্জিলা স্থিরদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে;—চন্দ্র পশ্চিম গগনে অস্তমিত প্রায়, তাহার উজ্জল কিরণ ম্লান হইয়াছে; দুই একটি বন-বিহঙ্গ মধুর স্বরে গান করিতেছে;—ধীরে ধীরে প্রভাত-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; শৈল-গাত্র, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি অস্পষ্ট আঁধারে আবৃত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া স্নেহপূর্ণ-স্বরে জগমল কহিলেন, "মঞ্জিল, সমস্তরাত্রি জাগরণ করি-

য়াছ!" মঞ্জিলা নীরব—তাহার দৃষ্টি ম্লান চন্দ্র-প্রতিন্যস্ত!—ধীরে ধীরে আপন মনে গাইল।

"নীরবেই ফোটে ফুল, বন মাঝে হায়!
নীরবেই হাসে ফুল, কেবা দেখে তায়?
নীরবে ফুটিয়া ফুল, নীরবে শুকায়।
দেখে না জানে না কেহ এ সংসারে হায়।"

সে সঙ্গীত-ধ্বনি বায়ুর সহিত খেলিতে খেলিতে অনন্ত আকাশে লীন হইল। চিন্তাকুল হৃদয়ে জগমল তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীরাজ রাও শূরতানের একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে তারাবাইসহ প্রেমালাপে নিমগ্ন। উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্যে মোহিত; উভয়ে উভয়কে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তারাবাইএর প্রতিজ্ঞা পৃথ্বীরাজের সৌন্দর্য্যসলিলে বিধৌত হইয়াছে। সহসা উভয়ে দেখিলেন, যোদ্ধৃবেশে জগমল তাঁহাদিগের নয়ন সমীপে দণ্ডায়মান! জগমল গম্ভীরভাবে কহিলেন, "সুন্দরি! প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে বড় সুখী হইব।" তারাবাই সেই যোদ্ধার সুন্দর মুখমণ্ডল প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় পৃথ্বীরাজময়, জগমলের সৌন্দর্য্য ও বীরত্ব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না, ধীরে ধীরে কোমল স্বরে কহিলেন, বীরবর! অভাগিনীকে ক্ষমা করুন; ইচ্ছা করিলে আপনি আমা অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী রমণী লাভ করিতে পারিবেন। জগমল ক্রোধসহকারে কহিলেন, "সুন্দরি,এই-ই কি তোমার প্রতিজ্ঞা!—আপন সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হইও না—অনর্থক তোমার অনিষ্ট সাধনে আমাকে বাধ্যকরিও না।" তারাবাই সবিষাদে কহিলেন, "বীরবর! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তাহা পারিব না; কারণ, পৃথ্বীরাজকে আমি মনে মনে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি।" জগমল নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ; আশার উন্নত শিখর হইতে তিনি একেবারে নিরাশার গম্ভীরতম গহ্বরে নিপতিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় শতধা চূর্ণ হইল;—তিনি কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, ক্রোধ-অভিমান-ঘৃণা-নৈরাশ্য-বিজড়িত স্বরে কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত; কিন্তু তবুও আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও।" এই বলিয়া হতাশ প্রেমিক সহসা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। মহাসমারোহে পৃথ্বীরাজের সহিত তারাবাইর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। উভয়ে পরম সুখী হইলেন।

উক্ত ঘটনার পর, সার্দ্ধমাস অতীত হইয়াছে। একদিন জগমল রণমলের সহিত চৌন্দদুর্গ সমীপস্থ বৃক্ষবাটিকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"রণমল, আমার আর জীবনে কোন সাধ নাই। উৎসাহ, উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, আশা সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে।" রণমল বলিলেন,—"ভাই জগমল, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছিলাম, ভালবাসা জাগ্রৎ-স্বপ্ন মাত্র। বিবেক-

বিহীন ব্যক্তিগণই ইহা লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। ভালবাসা বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন দাও। অসি হস্তে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও,—সুখী হইবে।" উদাস-ভাবে নিরাশ যুবক কহিলেন, "ভাই, তোমার উপদেশ প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু চির-কালের তরে আমার সব সুখ ফুরাইয়াছে। বোধ হয়, অধিক দিন আমি আর বাঁচিব না।" প্রশান্তভাবে রণমল কহিলেন,"জগমল, তুমি মরিবে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই; কারণ, মৃত্যুই জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু রণক্ষেত্রে বীরের ন্যায় মরিও। তোমার নিকট কখনও কোন বিষয়ে অনুরোধ করি নাই, কেবল মাত্র আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করিও,—তোমার নিকট হইতে সহোদরাধিক স্নেহ লাভ করিয়াছি, মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; ভাই, তুমি কি আমার এ অনু-রোধটি রক্ষা করিবে না?"

গম্ভীরভাবে জগমল কহিলেন,—"তবে তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হ'ক"। এই বলিয়া দুর্গশীর্ষস্থ বিরাট রণদামামা ধ্বনিত করি-লেন। অচিরে সহস্র সহস্র ভীল যোদ্ধা সমবেত হইল। জগমল জলদগম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"রণের জন্য প্রস্তুত হও,—যে সমস্ত বীর জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, তাহারাই অগ্রসর হও।" ভীল-যোদ্ধৃগণের ভীষণ কোলাহলে পর্ব্বতশিখর প্রতিধ্বনিত হইল। জগমল ও রণমল দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভীলবাহিনী প্রভূত পরাক্রমে গদবার প্রদেশ আক্রমণ করিল, এবং ভীষণ যুদ্ধের পর তাহা অধিকৃত হইল। রাও করিমচাঁদ তাঁহা-দিগের সহিত যোগদান করিলেন; এবং সদ্রি, বাটুরা ও নিমচ প্রভৃতি উদয়পুরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত স্থানসমূহ অধিকার পূর্ব্বক চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এতদ্ বিবরণ রাণা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদিগের দমনার্থ একটি বিরাট-বাহিনী সজ্জিত করিয়া তাহা পৃথ্বীরাজের কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করিলেন। অচিরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তাহাতে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন।

স্বীয় পুত্রের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে রাণা অতি-শয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পঞ্চদশ সহস্র সুশিক্ষিত রাজপুত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ হইল; রাজপুত ও ভীলগণ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল; উভয় পক্ষে বহুযোদ্ধা হতাহত হইল। করিম চাঁদ ও জগমলের সুতীক্ষ্ণ অসিমুখে পতিত হইয়া, কত শত রাজপুত বীর জীবন বিসর্জ্জন করিল; যুদ্ধ ক্রমে ভীষণতর হইল। কিন্তু এ যুদ্ধে রণমল নির্লিপ্ত!—তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। জগমল দেখিলেন, তাহার পরাজয় অবশ্য-ম্ভাবী, তিনি জীবনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য শত্রুদল ভেদ করিয়া, পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হইলেন এবং প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধদেশে সাংঘাতিক অসি প্রহার করিলেন; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া

ভূতলে পতিত হইলেন। রাজপুত সৈন্য পরাজিত হইল।

পৃথ্বীরাজের নিধন সংবাদ শ্রবণে রণমলের নেত্র হইতে অশ্রু নির্গত হইল, তিনি ত্বরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া দেখিলেন পৃথ্বীরাজ শোণিতশয্যায় শায়িত; তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাণ-প্রায়। তিনি গদগদশ্রুলোচনে সবিষাদে কহিলেন, পৃথ্বি!—ভাই আমার,—তোমার দাদা সঙ্গের সহিত একবার কথা কও, একবার "দাদা" বলিয়া সম্বোধন কর!" সহসা পৃথ্বীরাজের নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইল, অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন "দা-দা,—আমি যাই;—উঃ—বড় জ্বালা—ক্ষমা"। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল! জগমল নির্ব্বাক্, স্তম্ভিত!

রাত্রির দ্বিযাম অতীত। তারাবাই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ধীরভাবে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন; এবং তাঁহার পতিহন্তা জগমলের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চিতা সজ্জিত করিতে গম্ভীর-ভাবে আদেশ প্রদান করিলেন।

চিতা সজ্জিত হইল। পৃথ্বীরাজের নির্জ্জীব-দেহ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তারাবাই চিতার উপরে শয়ন করিলেন। অগ্নি-সংযোগে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইলে, ক্রমে তাহা ভীষণাকার ধারণ করিল। জগমল, সঙ্গ সিংহ এবং সমবেত ভীল ও রাজপুত যোদ্ধৃগণ এই রোমহর্ষণ ঘটনা অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। তামসী নিশি। সমস্ত স্থান নীরব, নিস্তব্ধ,—পার্ব্বত্য প্রদেশে গভীর নীরবতা বিরাজমান। মস্তকোপরি কৃষ্ণবর্ণ আকাশ,—উজ্জ্বল নক্ষত্র-খচিত আকাশ,—সে আকাশ আজি চন্দ্র-শূন্য। ভূতলে অগ্নিময়ী চিতা; চিতা-ক্রোড়ে পৃথ্বীরাজ-বক্ষে স্বর্ণ-প্রতিমা! জগমল প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়, স্থিরদৃষ্টে, সেই স্বর্ণ-প্রতিমাখানি দেখিতেছেন।—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিরহিত!—সহসা সেই নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি সঙ্গীতধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিলেন একটি ভীলবালা কুসুম-ভূষণে ভূষিত হইয়া এলায়িতকেশে ধনুর্ব্বাণ হস্তে, গীত গাইতে গাইতে, চিতার নিকটে আসিল। ভীলবালা গাইতেছিল,—

"নীরবেই ফোটে ফুল, বন মাঝে হায়!
নীরবেই হাসে ফুল, কেবা দেখে তায়?
নীরবে ফুটিয়া ফুল, নীরবে শুকায়।
দেখে না জানে না কেহ এ সংসারে হায়!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জয়মল্ল ও পৃথ্বীরাজের অকাল নিধনে রাণা রায়মল্ল নিরতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গ সিংহ পিতৃসমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি তাঁহার পদধূলি গ্রহণান্তর স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। আসন্ন-মৃত্যু বৃদ্ধের নয়নদ্বয় সমধিক উজ্জ্বল হইল। নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল। তিনি সঙ্গ সিংহকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক চিরতরে নয়ন নিমীলিত করিলেন।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গসিংহ চিতোর সিংহা-

সনে অধিরোহণ করিলেন এবং জগমলকে বিবিধ উপহার প্রদান পূর্ব্বক তদধিকৃত প্রদেশ সমূহের শাসন-কর্তৃত্ব অর্পণ করিলেন। জগমল নিয়ত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া বহু দেশ জয় করিলেন। কিন্তু তিনি সতত্ই গম্ভীর, চিন্তিত, বিষণ্ণ ও সংসার-সুখে বীতস্পৃহ ছিলেন; পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বিজন কাননে, নির্ঝরিণী তটে একা একা ভ্রমণ করিতেন।

সঙ্গসিংহ একজন রণ-বিশারদ নৃপতি ছিলেন। তিনি জগমলের সাহায্যে অচির কাল মধ্যে যবন নৃপতিদিগের বিরুদ্ধে অষ্টাদশবার জয়লাভ করিয়াছিলেন; এমন কি স্বয়ং দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীও দুইবার তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে পরাভূত হইয়াছিলেন।

বীরবর বাবর দিল্লি জয় পূর্ব্বক তাঁহার বিজয়ী সৈন্য চিতোরাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে শিকড়ির সন্নিকটবর্ত্তি স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সেই যুদ্ধে রণকেশরী সঙ্গসিংহ ও বীরশ্রেষ্ঠ জগমলের ভয়াবহ বিক্রমবহ্নিতে অসংখ্য তাতার সৈন্য পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা ভীষণরূপে পরাজিত হইল। বাবর ভীত ও হতাশ হইলেন; কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। পরন্তু অদম্য উৎসাহে ভীত সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করতঃ পুনরাক্রমণ জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং জগদীশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শপথ করিয়া মদিরা ত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। সঙ্গসিংহ ও জগমল যুদ্ধসংক্রান্ত কথোপকথন করিতে করিতে একটি গিরিবর্ত্ম দিয়া অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। সহসা মঞ্জিলার গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল;—তাঁহারা দেখিলেন অদূরে মঞ্জিলা অনন্যমনে বন্যকুসুম চয়ন করিতেছে। জগমল স্নেহপূর্ণ স্বরে তাহাকে কহিলেন, "মঞ্জিল! আর কতকাল পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিবে?" মঞ্জিলা ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "জগদীশ্বর জানেন!" সঙ্গসিংহ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঞ্জিল, তুমি বিবাহ করিবে না? বিবাহ কর, সুখী হও।" মঞ্জিলা মৃদু মধুর হাস্যসহকারে "আমি বিবাহ করিয়াছি" এই বলিয়া, জগমলের মুখ প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল—সে দৃষ্টি, সরলতাময়, আকাঙ্ক্ষাময়, বিষাদ ও প্রেম-বিজড়িত উদাস দৃষ্টি। মঞ্জিলা মুহূর্ত্তে মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সঙ্গসিংহ স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "মঞ্জিল! তুই কি প্রার্থনা করিস্ বল্; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুই যাহা প্রার্থনা করিবি, তাহাই পূর্ণ করিব।" মঞ্জিলার বিষণ্ণ মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল হইল, এবং চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। ধীরে ধীরে কহিল, "আমি দুঃখিনী ভীল, আমি যদি রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিতাম"—

সঙ্গসিংহ সহাস্যে কহিলেন, "তাহা হইলে কি হইত?—জগমলের সহিত তোর বিবাহ হইত?" মঞ্জিলা নিরুত্তর রহিল। সঙ্গসিংহ গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মঞ্জিলা, অচিরে

তোর মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।” তিনি এই বলিয়া জগমলসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং যাইতে যাইতে জগমলকে কহিলেন, “জগমল, তুমি মল্লিকাকে বিবাহ করিবে?” জগমল বিস্মিতভাবে কহিলেন, “কাহাকে? ভীলবালাকে!” সঙ্গসিংহ গম্ভীরভাবে কহিলেন, “জগমল, আমার কথায় তুমি বিস্মিত হইয়াছ,—কেন, বল দেখি? তুমি গৌর, সে কৃষ্ণ,—তুমি উচ্চকুলজাত, সে নীচকুল-সম্ভূতা; তুমি শিক্ষিত, সে অশিক্ষিতা; তাই বুঝি? কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমারই মতন সেও কি জগদীশ্বরসৃষ্ট জীব নয়? তোমারই মতন তারও কি মনোবৃত্তি নাই?—বিবাহ—বিবাহের উদ্দেশ্য কি?—মনোমিলন—হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ। জগমল! মল্লিকাকে বিবাহ কর, সুখী হইবে।” জগমল কহিলেন, “সঙ্গ সিংহ তুমি বলিয়াছ ভালবাসা জাগ্রৎ-স্বপ্ন মাত্র!—তবে কেন বিবাহের নিমিত্ত অনুরোধ কর? অসবর্ণ বিবাহে সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট, তাকি তুমি জান না? তারাবাইর সৌন্দর্য্যে আমার হৃদয় পূর্ণ! তারাবাইর মূর্ত্তিখানি এ হৃদয়-মন্দিরে সদা প্রীতি-কুসুমে অর্চ্চনা করি। সঙ্গ সিংহ! আমার অদৃষ্টে জগদীশ্বর বিবাহ লেখেন নাই—আমাকে এ অনুরোধ করিও না।” সঙ্গসিংহ বিরক্তভাবে কহিলেন, “তবে কি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে?” জগমল কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন, “তবে তোমার প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হ’ক—আমি বিবাহ করিব, কিন্তু—” সহসা জগমল নীরব হইলেন।

এ দিকে বাবর ভগ্নোদ্যম সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করতঃ পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। ফতেপুর শিকড়ির বিশালক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে কামানশ্রেণী স্থাপন করিলেন। বীর রাজপুত সৈন্যগণ তাহাদিগকে ভীষণতেজে আক্রমণ করিল। রণ-তুরঙ্গগণের হ্রেষারবে, রণ-মাতঙ্গগণের বিকট বৃংহণে এবং উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের ভৈরব হুঙ্কারে রণস্থল ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে কামানোদ্গীর্ণ ধূম-পুঞ্জে সমরস্থল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সেই বজ্রনাদি ভীষণ কামানসমূহের জ্বলন্ত গোলকাঘাতে কত শত রণ-নিপুণ রাজপুত বীর মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইল। কিন্তু তথাপিও রাজপুত সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল না। জগমল ও সঙ্গসিংহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। জগমল জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্বলন্ত কামান-শ্রেণী অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন; তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইল! বহু সৈন্য সংহার পূর্ব্বক অবশেষে তিনি তাহা অধিকার করিলেন, কিন্তু সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন; রাজপুত সৈন্যগণ বিকট জয়নাদ করিল। বাবর প্রমাদ গণিলেন; অনন্যোপায় হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সেই দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

মূর্চ্ছিত জগমল শিবিরে নীত হইলেন। সঙ্গসিংহ ও মঞ্জিলা তাঁহার বিশেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি আট ঘটিকার পর তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল। সঙ্গসিংহের সহিত যুদ্ধ বিষয়ে কিয়ৎকাল আলাপের পর, তিনি নিমীলিত নেত্রে কিছুকাল নীরবে চিন্তামগ্ন রহিলেন; সহসা সঙ্গসিংহকে কহিলেন, "সঙ্গসিংহ, পৃথিবী অসার, অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল; পৃথিবীবাসী জীবগণের অবস্থাও সম-ধর্ম্মাক্রান্ত। এ সুখ, দুঃখ ও মোহের অধীন হওয়া উচিত নয়, কারণ সুখ, দুঃখ ও মোহ পৃথিবী-জাত নয়; আত্ম-হারা হইও না। কারণ আত্মাই বিশ্বের আত্মা।" এই বলিয়া কিছুকাল স্থিরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার হৃদয়-ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। মুখশ্রী উজ্জ্বল, প্রশান্ত ও পবিত্র আকার ধারণ করিল,—বদন মণ্ডলে বিষাদের লেশমাত্রও দৃষ্ট হইল না। তিনি হাস্যসহকারে কহিলেন, "মঞ্জিলার সহিত আমার বিবাহ দিবে না?" সঙ্গসিংহ মঞ্জিলার মুখপানে একবার দৃষ্টিপাত করি-লেন, ভাবে তাহার সম্মতি দেখিলেন। ধীরে ধীরে মঞ্জিলার বাম হস্ত জগমলের দক্ষিণ হস্তে স্থাপন করিয়া অগ্নি ও তরবারি স্পর্শে তাঁহাদের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং নবদম্পতি যুগলে আশীর্ব্বাদান্তর প্রস্থান করিলেন। জগমল ও মঞ্জিলা পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন।

এদিকে দৃঢ়-ব্রত বাবর কিছুতেই ধৈর্য্য-চ্যুত হইলেন না; পরন্তু, উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত রহিলেন, এবং তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার বাসনা অচিরে পূর্ণ হইল। কারণ, তিনি সঙ্গসিংহের বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র রাইসিনের শাসনকর্ত্তা শিলাদিত্যকে প্রভূত পরিমাণে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করি-লেন এবং সন্ধি-বন্ধন অস্বীকার করতঃ সমর ঘোষণা করিলেন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সঙ্গসিংহ জগমলের সহিত সাক্ষাৎকার করি-লেন; দেখিলেন জগমল প্রফুল্লচিত্তে মঞ্জি-লার সহিত কথোপকথনে নিমগ্ন। সঙ্গসিংহ কিয়ৎকাল আলাপের পর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। জগমল গম্ভীরভাবে কহিলেন, "সঙ্গসিংহ! মনে আছে কি তোমার—পরাশর অরণ্য—ত্রিকূট গিরি —পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক তোমার হত্যা—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌যোগী দেবাদিত্য—যাহার নিকট তোমাদের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য-ফল জানিবার জন্য তোমরা উভয় ভ্রাতা গমন করিয়া-ছিলে? আমিও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমার ভাবি-অদৃষ্টফল জানিবার জন্য তাঁ-হার নিকট গমন করিতেছিলাম, পথিমধ্যে তোমাকে সাংঘাতিকরূপে আহত অবস্থায় পতিত দেখিয়া অনেক যত্নে, অনেক চেষ্টায় তোমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া আপন আবাসে ভ্রাতৃ-সদৃশ যত্নে রাখিলাম, এবং এ পর্য্যন্ত সে ভাবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই— হাঁ, বলিতেছিলাম কি, আমি দেবাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করায়, তিনি কহিলেন, "তোমার অদৃষ্টা-

কাশ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে অন্ধকাররাশি ভেদ পূর্ব্বক একবার মাত্র বিদ্যুৎ বিকশিত হইবে। সম্বৎ ১৫৮৪, ২০ কার্ত্তিক তারিখে মহা ঝড় বহিবে, সে ঝড়ে তরী নিমগ্ন হইবে"—সঙ্গসিংহ! অদ্য না ২০শা কার্ত্তিক? তোমার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া ভালই হইয়াছে," এই বলিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গসিংহ সাশ্রু-নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অচিরে ভীষণ সমর সংঘটিত হইল। বীর-কেশরী সঙ্গসিংহের ভীষণ বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া বাবরের সৈন্যদল পলায়নোন্মুখ হইল। সহসা রাজপুত-কুল-কলঙ্ক শিলাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বাবর-সৈন্যসহ মিলিত হইল। সঙ্গসিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল; তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন! রাজপুত সৈন্য পরাজিত হইল!

সঙ্গসিংহের শোচনীয় পরাজয়-বার্ত্তা জগমলের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল, তাহার ক্ষতগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত নিঃসারিত হইতে লাগিল। সহসা তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। মঞ্জিলার প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাঁহার আর চৈতন্য সঞ্চার হইল না। তিনি ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন!

জগমলের মৃত্যুতে মঞ্জিলার নেত্র হইতে এক বিন্দুও অশ্রু নির্গত হইল না। গম্ভীর-ভাবে চিতা উপরি জগমলকে শয়ন করাইয়া মঞ্জিলা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল, মঞ্জিলা স্থিরদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল। যথাকালে চিতাগ্নি স্নিগ্ধ করতঃ মঞ্জিলা গিরি আবাসে প্রস্থান করিল। পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে, বিজন উপত্যকায় কিংবা তটিনী-কূলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিত; কখন কখন জ্যোৎস্নাময়ী কিংবা তামসী নিশীথে হতাশ প্রাণের বিষাদমাখা মর্ম্মভেদি গান পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিত;—নীরব, নিস্তব্ধ, গিরি প্রদেশে সে গীত-ধ্বনিশ্রবণে কোন কোন পথভ্রষ্ট পথিকের হৃদয়ে ভয়-সঞ্চার হইয়াছিল।

শ্রীবরদারঞ্জন শীল।

কাব্যপ্রকাশঃ।

অথ দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

দ্বিতীয় উল্লাস।

সঙ্কেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদি র্জাতিরেব বা।

অনু। বাচক শব্দ দ্বারা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও যদৃচ্ছোপাধি অথবা কেবল জাতিই সঙ্কেতিত হয়। অর্থাৎ শব্দ একমতে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চারিটি বুঝায়, অন্য মতে কেবল জাতি বুঝায়।

বিবৃতি। এক একটি গো এক একটি গো-ব্যক্তি। সমুদয় গো-ব্যক্তিতে যাহা সমবেত ভাবে সামান্যাকারে বিদ্যমান আছে, তাহাকে গোত্ব বা গো-জাতি বলে। এইরূপে গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি এক একটি জাতি আছে; তন্মধ্যে ধবলীনামক গো বিশেষ, হরিদাসনামক মনুষ্যবিশেষ সেই সেই জাতিগত ব্যক্তি। জাতি ছাড়া ব্যক্তি, ব্যক্তি ছাড়া জাতি থাকে না; উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। গো এই শব্দের সঙ্কেত গোত্বে (গো-জাতিতে) অথবা গো-ব্যক্তিতে, অর্থাৎ গো শব্দ আমরা গো-জাতি বা গো-ব্যক্তিকে বুঝিব, ইহা বিচার্য্য।

বৃত্তিঃ। যদ্যপ্যর্থক্রিয়াকারিতয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-যোগ্যা ব্যক্তিরেব, তথাপি আনন্ত্যাদ্ ব্যভিচারাচ্চ তত্র সঙ্কেতঃ কর্ত্তুং ন যুজ্যতে ইতি, গৌঃ শুক্লশ্চলোডিত্থ ইত্যাদীনাং বিষয়বিভাগো ন প্রাপ্নোতীতি চ তদুপাধাবেব সঙ্কেতঃ।

অনু। যদিও প্রয়োজন সম্পাদন ক্রিয়া নির্ব্বাহকতা (১) বশতঃ ব্যক্তিই (২) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয়, (৩) তথাপি ব্যক্তিতে

(১) গো সামান্যকে গো-জাতি, গো-বিশেষকে গো-ব্যক্তি বলে। (ব্যক্তি শব্দে প্রকাশ বুঝায়। বি—অন্জ ভাবে ক্তিন্। গোত্বজাতি গো বিশেষে অভিব্যক্ত বা মনুষ্যের গোচর হয়; সামান্য গোত্ব স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যাকরণ দ্বারা এইরূপ অর্থ প্রকাশ পায়)।

(২) জল আনয়ন, গো-দোহন ইত্যাদি ব্যবহার কালে ঘটবিশেষ বা গো-বিশেষই প্রযুক্ত বা অপ্রযুক্ত হয়, সমস্ত ঘটজাতি বা গো-জাতি কোন স্থলে নিযুক্ত হয় না। কাজেই ব্যবহারে ব্যক্তিই প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়।

(৩) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয়ীভূত= প্রবৃত্তি নিবৃত্তির যোগ্য=প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত হয়।

সঙ্কেত করিলে (৪) আনন্ত্য (৫) ও ব্যভিচার (৬) এই দুইটি দোষ জন্মে, এই কারণে এবং ব্যক্তিতে সঙ্কেত করিলে গো, শুক্ল, চল, ডিথ এই চারি প্রকার শব্দ প্রয়োগের কিছুমাত্র বিষয়ভেদ (৭) থাকেনা, এই কারণে, ব্যক্তিতে সঙ্কেত হইতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তির উপাধিতেই (৮) সঙ্কেত হয়।

(৪) ব্যক্তিতে সঙ্কেত করিলে = ব্যক্তিকে শব্দের অর্থ বলিয়া গণ্য করিলে।

(৫) আনন্ত্য দোষ—গো-জাতিতে অসংখ্য গো-ব্যক্তি জগৎ ভরা বিদ্যমান্ আছে। যখন প্রথম গো শব্দের সঙ্কেত করিতে বা গো এই নামকরণ করিতে বসিবে, তখন যদি এক একটি গো-বিশেষ ধরিয়া ধরিয়া গো নাম করিতে যাও, তবে জগতের অনন্ত গোব্যক্তির প্রত্যেকটি ধরিয়া ধরিয়া গো নামকরণ হইতেই পারিবে না; গো ব্যক্তিতে নাম করিতে গেলে, এই অনন্তবার নামকরণরূপ আনন্ত্য দোষ ঘটে, অতএব গো শব্দের সঙ্কেত গো-ব্যক্তিতে হইতে পারে না।

(৬) ব্যভিচার দোষ—যদি অনন্ত গো-ব্যক্তির কতিপয় গো-ব্যক্তিতে গো এই নামকরণ করিয়া বিরত হও, তবে গো-জাতীয় অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নাম গো হইবে না, তাহাদের নাম অগো হইবে; একই জাতির কতক গো, কতক অগো হইবে; যদি বা অবশিষ্টগুলির নাম না করিয়াও, তাহাদিগকে গো বলিতে চাও, তবে সঙ্কেতিত না হইয়াও তাহারা গো শব্দের বাচ্য হইল এবং সঙ্কেতিত অর্থ প্রকাশ না করিয়াও, গো শব্দ-বাচক শব্দ হইল। তবে "বাচক শব্দ সঙ্কেতিত অর্থ প্রকাশ করে," এই মূল শাস্ত্র টিকিল কৈ? এই উভয়টিই ব্যভিচার দোষ।

(৭) বিষয়ভেদ থাকেনা—"গো, শুক্ল, চল ও ডিথ" এই চারিটি শব্দে বস্তু, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা বুঝায়। লোকে চারিটি শব্দ প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, এই গো-বিশেষে গোজাতি, শুক্ল গুণ, চলনক্রিয়া ও ডিথ সংজ্ঞা সমবেত আছে। যদি গো-ব্যক্তি বুঝানই প্রত্যেক শব্দের উদ্দেশ্য হয়, তবে চারিটির প্রত্যেকটিতে গো-ব্যক্তি বুঝাইবে, তাহা হইলে তাহারা মনুষ্য, মনুজ, মানব ও মর্ত্ত্য শব্দের ন্যায় পর্য্যায় হইয়া উঠিবে; কেন না, উহাদের কোনটির প্রতিপাদ্য বিষয়ই বিভক্ত হইতে পারে না, বিষয় বিভাগ হইতে পারেনা, একই ব্যক্তিই প্রত্যেকের বিষয় হয়। তদবস্থায় চারিটির যে কোন একটির প্রয়োগ করিলেই হয়, অবশিষ্ট পর্য্যায় তিনটি ত্যাগ করিতে হয়। তবে আর "গো, শুক্ল, চল ও ডিথ সংজ্ঞাযুক্ত" এরূপ শব্দ ব্যবহার করা গেল না। কিন্তু তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক।

(৮) অতএব ব্যক্তির উপাধিতেই সঙ্কেত—উপাধি শব্দে ধর্ম্ম বুঝায়; জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চারিটিই ধর্ম্ম, কিন্তু জাতিই প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম। (পরে ব্যাখ্যা আছে)। এই জন্য এস্থলে উপাধি শব্দে জাতি বুঝাই-

বিবৃতি। পূর্ব্ববর্ত্তিনী কারিকায় বলা হইয়াছে যে, শব্দ সঙ্কেতিত অর্থ (কোবাদিতে নির্দ্ধারিত অর্থ) প্রকাশ করে, তাহাকে বাচক শব্দ বলে, এবং সঙ্কেতিত অর্থকে বাচ্যার্থ বলে। এই কারিকায় বলিতেছেন যে, শব্দের সঙ্কেতিত অর্থটি কীদৃশ? অর্থাৎ সঙ্কেতিত অর্থটি ব্যক্তি, জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞা? বৃত্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

বৃত্তিঃ। উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ. বস্তুধর্ম্মো বক্তৃযদৃচ্ছা সন্নিবেশিতশ্চ। বস্তুধর্ম্মোঽপি দ্বিবিধঃ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোঽপি দ্বিবিধঃ— পদার্থস্য প্রাণপ্রদোবিশেষাধানহেতুশ্চ।

অনু। ব্যক্তির উপাধিতেই সঙ্কেত হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই উপাধি দুই প্রকার, বস্তুর ধর্ম্ম এবং বক্তার ইচ্ছানুসারে আরোপিত ধর্ম্ম। বস্তুর ধর্ম্মও দুই প্রকার, সিদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধ্য ধর্ম্ম। সিদ্ধ ধর্ম্ম দুই প্রকার, একটি পদার্থের প্রাণপ্রদ এবং অন্যটি বস্তুর বিশেষাধানহেতু। (এগুলি নিম্নে ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া বলা হইতেছে)।

বৃত্তিঃ। তত্রাদ্যোজাতিঃ। উক্তং হি বাক্যপদীয়ে নহি গৌঃ স্বরূপেণ গৌঃ নাপ্যগৌঃ গোত্বাভিসম্বন্ধাৎ তু গৌরিতি।

অনু। তন্মধ্যে বস্তুর প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম (১) বলে জাতিকে। বাক্যপদীয়কার (ক) ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন,—"গোপদের ধর্ম্মী বিশেষকে স্বকীয় অবস্থায় গো বলিয়াও ব্যবহার করা যায় না; অগো বলিয়াও ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু উহা গোত্বের

(ক) মহর্ষি পতঞ্জলি পাণিনি ব্যাকরণের যে অতি গম্ভীরার্থক ব্যাখ্যা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে মহাভাষ্য, ফণিভাষ্য বা পাতঞ্জল মহাভাষ্য বলে। ভর্ত্তৃহরি যে গ্রন্থে ন্যায়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উক্ত মহাভাষ্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রন্থকে বাক্যপদীয় বলে। হেলারাজ প্রমুখ অতি-বড় পণ্ডিতগণ বাক্যপদীয়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। মহাপণ্ডিত কৈয়টও ভাষ্যপ্রদীপ নাম দিয়া মহাভাষ্যের এক টীকা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিতের পৌত্র বিখ্যাত হরিদীক্ষিতের ছাত্র ও ভারতের সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ নাগোজীভট্ট ভাষ্যপ্রদীপোদ্যত নাম দিয়া ভাষ্যপ্রদীপের টীকা লিখিয়াছেন এবং স্বকৃত মঞ্জুষায় মহাভাষ্যোক্ত শব্দশক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। মম্মটাচার্য্য অতি বড় পাণিনিবিৎ; এই জন্য তিনি পাণিনি সূত্র বৃত্তিভাষ্য ও টীকার মর্ম্ম জলবৎ বলিয়া যাইতেছেন।

(১) ...য়াছে। গো-ব্যক্তিতে সঙ্কেত করিলে যখন আনন্ত্য ও ব্যভিচার দোষ এবং শব্দ প্রয়োগে বাধা হয়, তখন ব্যক্তির উপাধি বা জাতিরূপ ধর্ম্মেই সঙ্কেত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, গো সংজ্ঞা সমস্ত গো-জাতিতে করা হইলে, আনন্ত্য বা ব্যভিচার দোষ দূর হয়; জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চারি প্রকার অর্থবাচক শব্দেরই প্রয়োগ হইতে পারে; কেন না, গোত্বজাতি শুক্ল গুণ, চলন ক্রিয়া ও ডিত্থ সংজ্ঞা পরস্পর পৃথক্, জাতিশব্দের সঙ্গে তাহাদের পর্য্যায়তা হয় না। নিখিল গো-জাতি শুক্ল নহে, চল নহে ও ডিত্থসংজ্ঞক নহে। শব্দগুলি পর্য্যায় হইল না। গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞার সঙ্গে জাতির পার্থক্য বুঝিলেই ইহা বেশ বুঝা যায়।

সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলে উহাকে গো বলিয়া ব্যবহার করা যায়। (২)

বিবৃতি। বস্তুর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে (যথা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা) তন্মধ্যে জাতি নামক ধর্ম্মকে বস্তুর প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম বলে। গো পিণ্ডকে গো ব্যক্তি বা গো বস্তু বলে, নিখিল গো ব্যক্তিতে সমবেত লোমলাঙ্গুলাদি সাধারণ ধর্ম্মরূপ গোত্বটিকে জাতি বলে, ইহা বুঝাইয়াছি। দৃশ্যমান কোন ব্যক্তি বা বস্তু কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা না বুঝিলে, সেই বস্তু গো কি অশ্ব, ইহা বুঝা যায় না; কাজেই তাহা গো কি অশ্ব শব্দের ব্যবহার যোগ্য হয় না। একটি গো বহুদূরে পিণ্ডাকারে দৃষ্টি—গোচর হইলে, তাহার অবয়ব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবার পূর্ব্বে, তাহা গো কি অশ্ব কিছুই বুঝা যায় না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে উহা উপযুক্ত ভাবে নিকটবর্ত্তী হইয়া লোমলাঙ্গুল-গলকম্বলাদি সাধারণ ধর্ম্মরূপ গোত্বজাতি বিশিষ্ট হইয়া উঠে, সে মুহূর্ত্তে উহাকে গো বলা যায়, অর্থাৎ গো শব্দের ব্যবহার যোগ্য বলা যায়: এ স্থলে গো অর্থাৎ যাহাকে গো বলিতে ইচ্ছা, সেইটি গোত্বজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে স্বকীয় অবস্থায় গো বা অগো কিছুই ছিল না, পরমুহূর্ত্তেই গো জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়া গো হইল। অতএব গোত্ব জাতি উক্ত গো ব্যক্তির প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম (খ)। কোন বস্তু বুদ্ধিগোচর বা ব্যবহার যোগ্য হইলেই সপ্রাণ বা সজীব হয়, তৎপূর্ব্বে উহা মৃত বলিয়া গণ্য। জাতিই বস্তুমাত্রকে বুদ্ধিগোচর বা ব্যবহার যোগ্য করে, অতএব জাতি বস্তুর প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম। ইহাতে বাক্যপদীয় বচন ও ব্যাখ্যা করা হইল। এখন বৃত্তির অনুবাদ পাঠ করিলে উহার অর্থ বুঝা যাইবে।

বৃত্তিঃ। দ্বিতীয়ো গুণঃ শুক্লাদিনা হি লব্ধসত্তাকং বস্তু বিশিষ্যতে।

অনু। দ্বিতীয় ধর্ম্ম অর্থাৎ বিশেষাধানহেতু নামক ধর্ম্ম বলে গুণকে। কেন না, বস্তু, পূর্ব্বোক্ত প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ, সত্তা লাভ করিবার পর, শুক্লাদি গুণদ্বারা, স্বজাতীয় অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ হয়। এই জন্য গুণকে বিশেষাধানহেতু বা ভেদজনক ধর্ম্ম বলে।

বিবৃতি। যে বস্তুকে গো বলা হইবে, তাহা সমীপবর্ত্তি হইয়া যে মুহূর্ত্তে গোত্বজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, সেই মুহূর্ত্তে সে প্রাণ বা ব্যবহার যোগ্যতা লাভ করে, তাহার পর অর্থাৎ জাতিসম্বন্ধ জন্মিবার পর, ক্ষণকাল,

(খ) ইহা রসগঙ্গাধরের মতানুযায়িনী ব্যাখ্যা। এই বিচারটি বস্তুতঃ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বিষয়ক। ইংরেজীতে যাহাকে কন্‌সেপ্‌চুয়েলিজ্‌ম্ (Conceptualism) এবং নমিনেলিজ্‌ম্ (Nominalism) বলে, তাহার সঙ্গে এই বিচারের সাদৃশ্য আছে। অতি দূরবর্ত্তী দৃশ্যমান গো বিষয়কজ্ঞান প্রায় নিরালম্ব বা প্রায় নির্ব্বিশেষ, এই জন্য তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান কোন জ্ঞান নহে; কিন্তু যখন উহা নিকটবর্ত্তী হইয়া জাতিরূপ অবলম্বনযুক্ত হয়, তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞান স্পষ্ট হয়। জাতি-গুণাদি আলম্বনশূন্যজ্ঞান সাধারণ মনুষ্য সমাজে দেখা যায় না। ৺তর্কবাচস্পতিও এই আভাস দিয়াছেন।

উক্ত গোব্যক্তি শুক্ল কৃষ্ণ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার গুণশূন্য অবস্থায় থাকে; তাহার পরক্ষণে (আরও নিকটে আসিলে) উক্ত গোব্যক্তি শুক্ল বা কৃষ্ণরূপ গুণযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ গোজাতীয় অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্ হয়। অতএব গোব্যক্তি প্রথম জাতির সম্বন্ধ দ্বারা প্রাণপ্রাপ্ত হইবার পর গুণপ্রাপ্ত হয়।

প্রদীপ বলেন, গুণ ও জাতির সঙ্গে সমকালেই বস্তুর সম্বন্ধ হয়। কিন্তু শুক্লাদি গুণের সঙ্গে বস্তু সম্বন্ধ কখন কখন অপগত হয়, বস্তুর সঙ্গে জাতি সম্বন্ধ কখনও নষ্ট হয় না (১)। জাতি ও গুণ এই জন্য পরস্পর পৃথক্।

জাতি ও গুণ এই দুইটিই বস্তুর সিদ্ধ ধর্ম্ম। গুণ ও জাতির সমস্ত অবয়বই একই ক্ষণে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে।

বৃত্তিঃ। সাধ্যঃ পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বঃ ক্রিয়ারূপঃ।

অনু। (জাতি ও গুণ বস্তুর সিদ্ধ ধর্ম্ম, কিন্তু) ক্রিয়াকে বস্তুর সাধ্য ধর্ম্ম বলে। কেন না, উহা উৎপাদ্য, এবং উহার এক অবয়ব পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ও অন্য অবয়ব পরবর্ত্তী কালে অবস্থান করে; কোন ক্রিয়ারই সমস্ত অবয়ব যুগপৎ এককালে বিদ্যমান থাকে না।

বিবৃতি। পাক করা একটি ক্রিয়া। চুল্লীতে পাত্র স্থাপন করা কালে পাকক্রিয়া আরম্ভ হয়; তণ্ডুল অন্নাকারে পরিণত হইয়া গেলে উহা সমাপ্ত হয়। উহাতে জলদান, আলোড়ন ইত্যাদি বহুসংখ্যক ব্যাপার আবশ্যক। সমস্ত ব্যাপারই স্পন্দনাত্মক। কার্য্যতঃ পাকক্রিয়া বহুক্ষণব্যাপিনী স্পন্দনধারা মাত্র। প্রথম ও শেষ স্পন্দন মধ্যে যত স্পন্দন আছে, সকলই ভিন্ন ভিন্ন কালে বর্ত্তমান থাকে; অথচ, এই পূর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তি স্পন্দনাবয়বগুলিতে এক কল্পনা করিয়া পাককে একটি ক্রিয়া বলা হয়। এই জন্য পাক ক্রিয়া বস্তুর সিদ্ধ ধর্ম্ম নহে সাধ্য, সম্পাদনীয় বা সাধনীয় ধর্ম্ম।

ক্রিয়া একটি কল্পনা মাত্র। ভাষ্যে আছে,—ক্রিয়াহি নামাত্যন্তাপরিদৃষ্টা পূর্ব্বাপরীভূতাবয়বা ন শক্যতে পিণ্ডীভূতা সন্দর্শয়িতুম্। অর্থাৎ ক্রিয়া নিতান্ত অলক্ষিত, উহার অবয়বগুলি পূর্ব্বাপরীভূত; উহাকে পিণ্ডাকারে দেখাইবার উপায় নাই। এই জন্য বাক্যপদীয়ে আছে,—

গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্।
বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে।

অর্থাৎ ক্রমিক ব্যাপারের অঙ্গীভূতরূপে ভাসমান বিভিন্ন অবয়ব দ্বারা উপলক্ষিত, একত্ব বুদ্ধি দ্বারা যাহা এক বলিয়া কল্পিত হয়, এমন ক্রমশজাত ব্যাপারসমূহকে ক্রিয়া বলে। বিভিন্ন অবয়বগুলির মেলন অসম্ভব হইলেও বুদ্ধি দ্বারা এক কল্পনা করিয়া লওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্, এ।

(১) সাধারণ পাঠক বিরক্ত হইবেন আশঙ্কায় "সত্ত্বে নিবিশতে" ইত্যাদি ভাষ্যোক্ত গুণ লক্ষণ ব্যাখ্যা করা গেল না।

অন্তিম দর্শন।

অথবা

অনন্তযাত্রার বিদায়গ্রহণ।*

(২)

জাহাজের কর্ত্তা ক্যাপ্টেন রিড ; এবং সে জাহাজের অসংখ্য সুখ যাত্রীর মধ্যে এক যাত্রী ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি বায়রণ। বায়রণ ইংলণ্ড হইতে লিস্‌বন নগরে যাইতেছেন ; এবং জাহাজে বহুশাস্ত্রদর্শী ও বহুভাষাবিলাসী ক্যাপ্টেন রিডের সঙ্গ পাইয়া, নানারূপ কথোপকথনে ও কৌতুক-সমালোচনে দিন-পাত করিতেছেন। কৌতুকপ্রিয় ক্যাপ্টেন রিডও বায়রণের সঙ্গ পাইয়া কৃতার্থ।

এই লিস্‌বন-যাত্রার সময়, একদিন, ক্যাপ্টেন রিড, গভীর রাত্রিতে, তাঁহার ক্যাবিনে শুইয়া আছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল যে, কাহার যেন একখানি হাত তাঁহার পায়ে লাগিল ; এবং হাত খানি, মুহূর্ত্ত পরেই, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া, তাঁহার কান্ধে আসিয়া স্থাপিত হইল। ক্যাপ্টেন রিড তৎক্ষণেই শশব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বসিলেন ; কিন্তু বসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণে আর শান্তি রহিল না।

ক্যাবিনে সমস্ত রাত্রি প্রখর আলো থাকে ; তখনও ছিল। ক্যাপ্টেন রিড সে আলোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইটি, শয্যার পার্শ্বে তাঁহার পাদ-প্রান্তে বসিয়া আছে ; এবং অতি বিষাদক্লিষ্ট নয়নে, যেন নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। হা! ভাই আসিল কোথা হইতে ? ভাইটি তাঁহার সুদূর ভারতবর্ষে, সৈনিকবিভাগে, নিম্নশ্রেণিস্থ সেনানায়কের কাজে নিযুক্ত। সে কেমন করিয়া তাঁহার জাহাজে আসিয়া উপবিষ্ট হইবে ?

রিড কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একবার চক্ষু বোজেন, আবার চক্ষু মেলেন। কিন্তু মূর্ত্তিলক্ষিত ভ্রাতা, অবিচলিত ভাবে, যেমন ছিল, তেমনই আছে। সে নড়ে না, চরে না, উঠিয়াও যায় না। তবে, এই এক দুঃখ, সে কি যেন কহিতে চাহিতেছে,—তাহার চক্ষু কথা কহিবার ভঙ্গীতে একদৃষ্টে স্থির রহিয়াছে, অথচ মুখে কথা ফুটিতেছে না।

যখন এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন ক্যাপ্টেন রিডের হৃদয়ে সাহস, ঔৎসুক্য ও ভ্রাতৃস্নেহ তিনটি ভাবই যুগপৎ একটুকু বেসী ক্রিয়া করিতে লাগিল। তিনি হাত বাড়াইয়া ভ্রাতার হাত ধরিলেন। সে হাত আর্দ্র। তাহার পৃষ্ঠে ও কান্ধে হাত

* অন্তিমদর্শন নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ বিগত মাঘ মাসের বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বুলাইলেন। তখন দেখিলেন তাহার গায়ের সে (Uniform) সৈনিকবস্ত্রও সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র।* এ আর্দ্রতা তাঁহার বড়ই বিস্ময় জন্মাইল। কারণ, তিনি স্পর্শ দ্বারা স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতার অঙ্গাবরণ বস্ত্রাদি হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

এইরূপে আর কয়েকটি মিনিট অতীত হইতে না হইতেই ক্যাপ্টেন রিডের অন্তরাত্মা অকস্মাৎ আর একটা ভাবে অভিভূত হইল। তাঁহার প্রাণে এতক্ষণ কোন ভয় ছিল না, এখন বড় ভয় জন্মিল। বুঝি ঐ আর্দ্রতার অনুভূতি তাঁহার মনে কেমন একটা দুর্ভাবনা জন্মাইল। তিনি ভীত-ভীত কণ্ঠে জাহাজের একটি কর্ম্মচারীকে, নাম ধরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। যেই সে কর্ম্মচারী তাঁহার ক্যাবিনে প্রবেশ করিল, অমনি সম্মুখস্থ মূর্ত্তি, তাঁহার চিত্তপটে বিষাদের একখানি প্রতিকৃতি চিরকালের তরে প্রতিবিম্বিত রাখিয়া, আকাশে মিশিয়া গেল।

ক্যাপ্টেন রিডের চক্ষে সে রাত্রিতে আর নিদ্রা আসিল না। তিনি রাত্রির অবশিষ্ট সময় জাহাজের নানা স্থানে পাদচারণা করিয়া বেড়াইলেন; রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে লর্ড বায়রণকে নৈশ দর্শনের সমস্ত কথা বিবরিয়া বলিলেন। লর্ড বায়রণ ঘোরতর অবিশ্বাসী। কিন্তু বিবরণের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আলোচনা করিয়া, তিনিও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। উভয়েই বুঝিলেন যে, রিড যাহাকে দেখিয়াছেন, তাহার কোন বিপদ ঘটিয়াছে; এবং জীবনের চরম-যাত্রা সময়ে, ভ্রাতাকে শেষের সেই শেষদর্শন দান করিয়া, আপনার প্রাণের ভালবাসা জানাইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত দর্শনের তিনটি মাস পরে, ক্যাপ্টেন রিড জানিতে পারিলেন যে, তিনি যে রাত্রিতে, যে মুহূর্ত্তে, তাঁহার ভ্রাতার মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, সেই রাত্রিতে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই, তাঁহার ভ্রাতা ভারতসমুদ্রের তরঙ্গগ্রাসে ভবযন্ত্রনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। রিড তাঁহার জীবদ্দশায় একটি দিনও এই কাহিনীর একটি কথা বিস্মৃত হন নাই। লর্ড বায়রণের হৃদয়েও এ বৃত্তান্ত দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনিও, মাঝে মাঝেই, এ প্রসঙ্গে, সুহৃৎস্বজনের সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার নৈরাশ্যময় অবিশ্বাসের মধ্যেও বিশ্বাসের একটুকু আলোক-রেখা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু এ তত্ত্ব এইক্ষণ যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পৃথিবীতে প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে উন্মাদগ্রস্ত অথবা অভিমান-বিত্রস্ত অহম্মুখ ভিন্ন অন্য কাহারও আর অবিশ্বাসের সম্ভাবনা নাই।

এই কাহিনীর একটি কথা অর্থগ্রহ বিষয়ে কঠিন। জলমগ্ন ব্যক্তিদিগের ছায়ামূর্ত্তিতে আর্দ্রতার চিহ্ন আরও অনেক ঘটনায় পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আর্দ্রতার অনুভূতি বড়ই বিচিত্র। যেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে জল নাই, সেখানে হাতে জল লাগিবে কেন? এইরূপ ভ্রান্তিকে অধ্যাত্মবাদীরা (Psycholization) সাইকলিজেসন নামে ব্যাখ্যা করেন। ইহার এই অর্থ যিনি দর্শন দান করিতেছেন, তিনি যে শক্তিতে দৃষ্টির উপর ক্রিয়া করিয়াছেন, সেই শক্তিতে স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরও ক্রিয়া করিয়া, তন্মুহূর্ত্তে ঐরূপ বোধ জন্মাইয়াছেন।

* "He found the Uniform. in which it appeared to be clothed, dripping wet."

সংক্ষিপ্ত সমালোচন

১। "প্রবন্ধমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত"। যিনি অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও উত্তরচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকসমূহের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনিই আজি, এ 'প্রবন্ধমঞ্জরী' উপহার দিয়া, বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন। ধন্য বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ! তাঁহার সাহিত্য-সেবাব্রতে মুহূর্ত্তেরও বিরাম নাই,—শরীরে এবং মনেও কোনরূপ অবসাদ নাই। বাঙ্গালি মাত্রই তাঁহাকে চিরকাল প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। প্রবন্ধমঞ্জরী, প্রকৃত প্রস্তাবে, "প্রবন্ধস্তবক" নামে অভিহিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, ইহা বিভিন্ন প্রকারের বাষট্টিটি প্রবন্ধে গ্রথিত। প্রবন্ধগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নাই,—বিষয়গত সাদৃশ্যও কিঞ্চিন্মাত্র নাই। অথচ সকল প্রবন্ধেই কিছু না কিছু শিখিবার কথা আছে। ভাষা কোন স্থলে সরল, কোন স্থলে সুকঠিন, এবং কোন কোন স্থলে মুদ্রাকর-প্রমাদে কিঞ্চিদ্দূষিত। যথা,—৫৭০ পৃষ্ঠায়, যুদ্ধের "অভিনব অস্ত্র" নামক প্রবন্ধে "এতাধিক",—৫৬৪ পৃষ্ঠায় "স্ত্রীলোকের কাজ," নামক প্রবন্ধে "স্ত্রীপক্ষী"। কিন্তু যাঁহারা, দুই তিনটি দিন পরিশ্রম করিয়া, এই উপাদেয় পুস্তকখানির আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রম সফল হইবে।

২। "সতীপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।" এই পুস্তকখানি বঙ্গের শিক্ষিত-ললনাদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। সকল স্থলে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিবেন কি না, তাহা সন্দেহের কথা; কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা সৎকথার আলোচনে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। গ্রন্থকার সংস্কৃতে সুশিক্ষিত; কোন কোন কবিতায় তাহার পরিচয় আছে। যথা স্বর্গপ্রয়াণ বর্ণনে,—

> "সতীর পরাণ ধরণী ছাড়িয়া,
> গগনের পথ তেজে উজলিয়া,
> গ্রহগণজ্যোতিঃ নিষ্প্রভ করিয়া,
> চলিল ঊর্দ্ধে অমর-যানে;
> আবহের সীমা করি পরিহার,
> নিমেষে ছাড়িয়া প্রবহাধিকার,
> ছুটে অবিরত স্থির নির্ব্বিকার,
> কোথায় নিবৃত্তি হবে কে জানে?

কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে, এবং ইহা পড়িবার সময়ে বিদ্যাসাগর-ধৃত সিদ্ধান্তশিরোমণির একটি শ্লোক আমাদিগের স্মৃতিতে উদিত হইয়া বড়ই আনন্দ জন্মাইয়াছে। যথা,—

> ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ
> স্যাদুদ্বহস্তদমু সংবহসংজ্ঞকশ্চ। (ইত্যাদি)

কিন্তু পুস্তকের সকল কবিতা এইরূপ সুন্দর নহে। কোন কোন কবিতায়, রসের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি থাকিলেও, শব্দ বড় কর্কশ; কোথাও বা শব্দ মধুর, অথচ রস অস্ফুট। অনেক স্থলে ছন্দের বড় ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, অর্থাৎ একই কবিতার কোন শ্লোকের কোন এক পাদে নয় আখর, কোন এক পাদে দশ আখর, এইরূপ ক্রমভঙ্গ-ঘটনায় ছন্দের ব্যবস্থা অবহেলিত হইয়াছে। ইহা ভাল নহে। তথাপি, মোটের উপরে, "সতীপ্রশস্তি" সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া আদর পাইবার যোগ্য।

চতুর্থ খণ্ড] আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩১২ সন। [৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৬। ৭

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৶০	৩।৶০
ষাণ্মাসিক	২৲	৶০	২৶০

পশ্চাদ্দেয়।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৪৲	।৶০	৪।৶০
ষাণ্মাসিক	২৷০	৶০	২৷৶০

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারি-সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হয় না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। গ্রাহক-নম্বর ব্যতিরেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যেও বড় অসুবিধা ঘটে। সুতরাং গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে কিংবা মূল্য প্রেরণ করিবার সময় দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না। নূতন গ্রাহকেরা "নূতন" এই শব্দের উল্লেখ করিবেন।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে আগে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতিবার মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

বান্ধব-কুটীর,—ঢাকা।
১৩১১ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ
বি, এ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

দার্শনিকমতের সমন্বয়

[৯]

সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদিত প্রকৃতির স্বাধীনসত্তা যে কথার কথা মাত্র; সাংখ্য যে প্রকারান্তরে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন; এ কথার আভাষ মাত্র আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দিয়াছি। অদ্য তাহারই সমালোচনা করিয়া আমরা দেখাইব যে, বেদান্ত ও সাংখ্য বস্তুগত্যা একই। মূলে কোন পার্থক্য নাই।

"সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়া-
দধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং-
প্রবৃত্তেশ্চ"॥

সাংখ্যের এই বিখ্যাত কারিকার কথা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কারিকা হইতে, আমরা 'পুরুষের' অস্তিত্ব-পক্ষে প্রধানতঃ চারিটি যুক্তি পাইতেছি। (১) যাহা সংহত পদার্থ, তাহার পৃথক্ সত্তার কোন প্রয়োজন নাই; উহা কোন চেতন পদার্থেরই প্রয়োজন সাধনের জন্য অবস্থিত। (২) ভোগ্য বা জ্ঞেয় থাকিলেই, তাহার ভোক্তা বা জ্ঞাতা আবশ্যক। জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া, জ্ঞেয় বস্তুর স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না। (৩) অচেতনের স্বাধীন প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত, জড়ের ক্রিয়া অসম্ভব। (৪) এমন একটি অবস্থা আসিবে, যখন এই জড়বর্গ থাকিবে না; সে অবস্থায় কেবল চৈতন্য মাত্র অবস্থিত রহিবে।

সাংখ্যমতের প্রবল প্রতিপক্ষ, অদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য্যও, উপরি উল্লিখিত যুক্তিগুলিকেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদের পোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক তাঁহার বেদান্তভাষ্য দেখুন। "ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিরশ্বাদিভির্বাহনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে" (বে০ ভাষ্য, ২।২।২)। জড়শক্তি, চৈতন্য দ্বারা চালিত না হইলে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। সাংখ্যও, "প্রবৃত্তেশ্চ" ও "অধিষ্ঠানাৎ" এই দুই যুক্তিদ্বারা সেই কথাই বলিতেছেন। জড় প্রকৃতির প্রথম প্রবৃত্তি, চেতন হইতেই লব্ধ। চেতনের অধিষ্ঠান বশতঃই, জড়প্রকৃতি প্রথমে কার্য্যাভিমুখিনী হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও, জড়প্রকৃতির অধিষ্ঠাতারূপে চেতন সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই আমরা, জড়প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীল বলিয়া দেখিতেছি। ইহাই ত সাংখ্যের

যুক্তি। এ কথার সহিত বেদান্তের বিরোধ কোথায়? যদি এইরূপই হইল, তবে প্রকৃতির স্বাধীনসত্তা রহিল কৈ? বেদান্তমতে, অনন্তদেশকালব্যাপ্ত জ্ঞান যখন সৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে নিযুক্ত, তাহাই ব্রহ্মের "ঈশ্বর-ভাব"। জড়প্রকৃতির প্রবৃত্তি বা কার্য্যোন্মুখতার সঙ্গে, অধিষ্ঠাতা পুরুষ-চৈতন্যকেও ত এ হিসাবে, "ঈশ্বর" সংজ্ঞায় অভিহিত করায় আমরা কোন হানি দেখিতেছি না। বেদান্ত মতে, ঈশ্বর যে কেবল কার্য্যে প্রবৃত্ত্যুন্মুখ, তাহা নহে; তিনি সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। "অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম" (বেদান্ত ভাষ্য, ১।১।১)। সাংখ্যের পুরুষ-চৈতন্যও কি প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইতেছেন না? "অধিষ্ঠানাৎ" ও "ভোক্তৃভাবাৎ" এই দুইটি কথা দ্বারা আমরা তাহাই পাইতেছি। দ্রষ্টা ব্যতিরেকে দৃশ্য এবং জ্ঞাতা ব্যতিরেকে জ্ঞেয় থাকিতে পারে না, ইহাই কি "ভোক্তৃভাবাৎ" কথাটির তাৎপর্য্য নহে? এরূপ জ্ঞাতা বা ভোক্তা যে সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে সাংখ্যমতে অসম্মতি কোথায়? সাংখ্যের "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ" এই সূত্রের দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত করান যাইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ের মতেই, জাতি (Species) হইতে ব্যক্তি (Individual) পৃথক্ নহে। ব্যক্তি, জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। জাতিই পরিণত হইয়া ব্যক্তির আকারে ব্যক্তীভূত হয়। সুতরাং জাতির জ্ঞানেই, ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়। অতএব, যে চৈতন্য জাতির (অবিশেষের) অধিষ্ঠাতা, তাহা ব্যক্তিরও (বিশেষেরও) অধিষ্ঠাতা। প্রকৃতি যদি জ্ঞেয় হয়, তবে তাহা সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় ভাবেই জ্ঞেয় হইবে। ব্যষ্টি যখন সমষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত, তখন যে চৈতন্য, সমষ্টিস্বরূপে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া, প্রকৃতির জ্ঞাতা, সে চৈতন্য কাজেই সমষ্টিভাবে সর্ব্ববিৎ ও ব্যষ্টিভাবে সর্ব্বজ্ঞ। শঙ্করের ভাষ্যেও এই কথা প্রকারান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। "অবিশেষভাবেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্ববিৎ, বিশেষভাবেন সর্ব্বংজানাতীতি সর্ব্বজ্ঞং"। প্রকৃতির ক্রিয়ার মূলে যখন পুরুষের অধিষ্ঠান না হইলে চলে না,—যখন জড়প্রকৃতির প্রবৃত্তি চৈতন্য হইতে লব্ধ, তখন বেদান্তের ঈশ্বর ও সাংখ্যের পুরুষ একই দাঁড়াইতেছে। আর একটি কথা আছে। সাংখ্য, কার্য্য-কারণের অভেদবাদী। কার্য্য অব্যক্তরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়াই, প্রকৃতির অপর নাম "অব্যক্ত"। জড়ীয় কার্য্যমাত্রেই মূলকারণ-প্রধানে শক্তিরূপে লুকায়িত ছিল। প্রকৃতিকে কার্য্যজননশক্তি না বলিলে, তাহা হইতে কার্য্যস্রোত আসিতে পারিত না। কারিকায় পুরুষকে প্রধানের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই পুরুষ, প্রধান হইতে যে কার্য্যস্রোত বাহির হইবে, তাহারও অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্তা। এতএব, পুরুষ "সর্ব্বশক্তিসমন্বিত"ও হইতেছেন না কি?

এই প্রধান বা অব্যক্ত অবস্থাটি যে জ্ঞানেরই প্রবৃত্ত্যুন্মুখ অবস্থা, সাংখ্য তাহা

স্পষ্ট না বলিলেও, তাহা বুঝা যায়। সাংখ্য, তাঁহার প্রধান দ্রব্যটিরে যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সাংখ্যের প্রধানের বর্ণনা কিরূপ? মহত্তত্ত্বাদি যাবতীয় পদার্থই পরিচ্ছিন্ন ও সাবয়ব। কিন্তু প্রধান নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন। মহত্তত্ত্বাদি দ্রব্য, সুখদুঃখাদি বিকারজনক, কিন্তু প্রধান সেরূপ নহে। প্রধান সুখদুঃখাদির উপাদান বটে, কিন্তু উহার বিকারজনকতা নাই। বিশেষ বিশেষ বস্তুজ্ঞানের উহা ভিত্তিস্থানীয়। আর একটা কথাও অনুধাবনযোগ্য। সাংখ্যমতে, প্রধানের ক্ষীরবৎ অন্ধভাবে, আপনি আপনি প্রবৃত্তি হয়;—অথচ জড়ের প্রবৃত্তি, চৈতন্যের অধিষ্ঠানসম্ভূত। সাংখ্যে এই দুই কথাই আছে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বোধ হয় যে, বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবার একটা অন্তর্নিহিত শক্তি (Potentiality) জড়ের আছে। আবার প্রকৃতির এই প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা, চৈতন্যের যোগ ব্যতিরেকে উৎপাদিত হয় না। সাংখ্যমতে পুরুষ, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। কাজেই, Logically সাংখ্য কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, জড়কে সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যই, সেই প্রবৃত্তি প্রদান করে? তিনি এ ভাবে "ঈশ্বর" স্বীকার করিতে পারেন না। তাই, তিনি প্রকারান্তরে বলিয়া দিলেন যে, উভয়ের যোগ ব্যতীত, প্রবৃত্তি হয় না; উভয়ের যোগ হইলে, তবে প্রবৃত্তির আরম্ভ। অর্থাৎ এক নিষ্ক্রিয় সত্তার বক্ষঃস্থলেই, এই প্রবৃত্তি পরস্পরা কার্য্য করিয়া যাইতেছে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, এক নিষ্ক্রিয় চৈতন্যের বক্ষধৃত অব্যক্তসত্ত্ব, হইতে,—প্রথমে মহত্তত্ত্ব, পরে অহঙ্কারতত্ত্ব উদ্ভূত হইল। এ কথার অর্থ এই যে, প্রথমে জ্ঞানের সৃষ্ট্যুন্মুখ প্রবৃত্তি, পরে তাহার ইচ্ছাত্মক ক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। জ্ঞানাত্মক ও ইচ্ছাত্মক,—এই উভয়বিধ প্রবৃত্তি হইতেই নিখিল কার্য্য দেখা দেয়, ইহাই সাংখ্যের তাৎপর্য্য। এই জ্ঞানাত্মক প্রবৃত্তির পূর্ব্বাবস্থা বা প্রকৃতির অবস্থা এবং চৈতন্যের অবস্থা একরূপ। উভয়েই সুখদুঃখাদি সর্ব্ববিকারবর্জ্জিত; উভয়েই অপরিচ্ছিন্ন; উভয়েই সর্ব্বপ্রবৃত্তির বীজভূত; উভয়েই কারণরূপে অবস্থিত; উভয়েই সর্ব্বব্যাপক, ক্রিয়াহীন। উভয়েই সৎ। আমাদের লৌকিকজ্ঞানে উহারা একই সত্ত্বামাত্র। কাজেই উহারা যে অভিন্ন নহে, তাহা কে বলিতে পারে? কার্য্যের অব্যক্ত-অবস্থারই নামান্তর "শক্তি"। এই অব্যক্তাবস্থাই প্রধান বা প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতি, কার্য্যের জননী শক্তি মাত্র। উহা চেতনের অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত (১৭ কারিকা দেখ)। ইহার তাৎপর্য্য তবে এই হইতেছে যে, নিষ্ক্রিয়চৈতন্য সত্তার বুকে ক্রিয়ার বীজ ধৃত রহিয়াছে। সাংখ্যের এইরূপ তাৎপর্য্যের সহিত, বেদান্তের বিন্দুমাত্র বিরোধ সম্ভবে না। সুতরাং সাংখ্যের প্রকৃতির স্বাধীনসত্তা কথার কথা মাত্র।

আরো কথা আছে। অব্যক্ত হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি নামক পদার্থ আবির্ভূত

হইল, তাহাই পরিণত হইয়া অহঙ্কাররূপে দেখা দিল। তাহা হইতে শব্দস্পর্শাদি গ্রাহ্য বিষয়সমূহ এবং উহাদের গ্রাহক চক্ষুকর্ণাদি শক্তি উদ্ভূত হইল। এখন বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি ত জড় ও অচেতন। বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি ত জ্ঞানেরই অবস্থান্তর মাত্র। এই বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দস্পর্শাদি ও চক্ষু কর্ণাদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞান কাহার? অচেতন জড় হইতে বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অথচ আমরা সাংখ্যশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, জড় প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্করাদি উদ্ভূত হয়!! ইহার তাৎপর্য্যটিও বুঝিতে হইবে। সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তাৎপর্য্যই এই যে, আত্মা বা চেতনের উপরে ভৌতিক বিকার দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। নতুবা জড় হইতে বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইল, এ কথার কোন অর্থ থাকে না। এ কথাটি বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে। আমরা সাংখ্যশাস্ত্র পড়িবার সময়ে, এই কথাটি ভুলিয়া যাই বলিয়াই, প্রকৃতিকে স্বাধীনসত্তামরী বলিয়া মনে করি। পুরুষকে একপার্শ্বে রাখিয়া, সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হয় না। প্রকৃতির প্রত্যেক অভি-ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই, পুরুষকেও অবস্থিত দেখিতে হইবে। ভৌতিক বিকারসমূহই, আত্ম-জ্ঞানের অবস্থান্তর ঘটায়। সেই জ্ঞা-নকে ছাড়িয়া দিয়া, কেবল ভৌতিকবিকার গুলির বিবরণ দিতে গেলেই, এইরূপ ভ্রম-প্রমাদে পড়িতে হয়। সাংখ্য, ভৌতিক বিকারগুলির যেরূপ পরিভাষা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার মনের ভাব বিল-ক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আমরা সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচনাকালে, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাই!! বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দস্পর্শাদি এবং চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণাদি, —এগুলি সমস্তই এক অখণ্ড জ্ঞানেরই অবস্থান্তর-জ্ঞাপক শব্দ। বুদ্ধি বলিতে, পু-রুষ বা চেতনেরই বুদ্ধি বুঝায়, জড়ের বুদ্ধি বুঝায় না। অহঙ্কারাদি শব্দও তদ্রূপ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমরা মনে করি, যেন একটা জড়ীয় উপাদান কিরূপে বিকৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিণত হইতেছে, সেই জড়ীয় অচেতন বিকারগুলিকেই যেন কেবল বুদ্ধি প্রভৃতি বলিয়া থাকে!! সেই বিকার গুলির দ্বারা যে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের (চেতনের) ই অবস্থান্তর ঘটিতেছে, এবং সাংখ্য যে সেই জ্ঞানেরই অবস্থান্তর-প্রাপ্তির বিবরণ দিতেছেন, এই আবশ্যকীয় কথাটি ভুলিয়া যাই। এবং মূলে এই ভুল করি বলিয়া, প্রকৃতিকে স্বাধীনসত্তাবতী বলিয়া মনে করি। হা! দুরদৃষ্ট!!

উপরে, সংক্ষেপে যে তাৎপর্য্য দিয়াছি, সাংখ্যের বাস্তবিক অর্থ এইরূপ। এভাবে দেখিতে গেলে সাংখ্যের প্রকৃতি স্বাধীনা হইতে পারেন না, এবং প্রকারান্তরে তাঁহার পুরুষ ও বেদান্তের ঈশ্বর একইরূপ দাঁড়ায়। বৌদ্ধ যেমন স্পষ্টতঃ না হইলেও, প্রকারা-ন্তরে আত্মা স্বীকার করিয়াছেন,—এ কথা

আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি ;—সাংখ্যও তদ্রূপ, প্রকারান্তরে, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর স্বীকার করিতেছেন, ইহাও আমরা দেখিলাম। কিন্তু সাংখ্যের ঈশ্বর-স্বীকার বিষয়ে, উপরে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তদপেক্ষাও সুন্দর, আর একটি উপাদেয় যুক্তি আছে। কিন্তু সে তত্ত্ব বারান্তরে সমালোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্—এ,।

হিগেলের পরমার্থবাদ ও তাহার ইতিহাস।

সুদূর পুণ্যক্ষেত্র জ্ঞানভূয়িষ্ঠ জর্ম্মাণির বিশাল অমলাকাশে, যে সকল সুখসুন্দর স্বভাবসমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কনিচয় বিশ্বমাঙ্গল্য নিয়মক্রমে, সমুদিত হইয়া, স্ব স্ব আপেক্ষিক প্রভাব ও প্রাধান্যে সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ বিস্মিত, প্রদীপ্ত ও সমুদ্ভাসিত করিয়াছে, তন্মধ্যে মহাপ্রাণ প্রকীর্ত্তিতযশাঃ হিগেলের নাম, সমধিক উল্লেখ যোগ্য। এই প্রত্যক্ষ বিশ্বে যে পুরুষপ্রবর জ্ঞানের গভীরতায়, চিন্তার বৈভবে এবং অধ্যাত্মশক্তির সর্ব্বাতিশায়ি মহিমময় জ্যোতিঃ বিসারিত করিয়া সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানপিপাসু মানবহৃদয়ে প্রভুত্ব ক্রিয়া ও অতিতর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েন, তিনি স্বভাবনিয়মে, প্রীতিভক্তির আনন্দ-অঞ্জলি সংযোগে,সেই পরিমাণে মনুষ্য জাতির একান্ততঃ প্রাণারাধ্য। সমগ্র ইউরোপখণ্ডে এই অবনীবিশ্রুত মহামনাঃ হিগেলের চিন্তাশক্তির দূরগামিনী প্রভুতা পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানোন্নতির হিরণ্ময় ইতিহাসের বিস্ময়াবহ আনন্দময় মহাপর্ব্ব স্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবপ্রাণ বোধপূর্ব্বক বা অবোধপূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত ভাবে, সুখানুসন্ধানে সতত নিরত। উদ্দেশ্য—পরম আনন্দাধিগম—সুখোপলব্ধি——দুঃখের ঐকান্তিকী বিনিবৃত্তি। মানবীয় সভ্যতার আদিমস্তরে—মনুষ্যজ্ঞানের নব-অরুণোদয়ে—যখন মনীষা-প্রদীপ্ত হিন্দুপ্রাণ হৃদয়নিহিত দুর্দ্দম আবেগে মহাতত্ত্বান্বেষণে ধ্যানস্থ নির্ব্বিকার মহাযোগীর ন্যায় অবস্থিত ছিলেন ; তখনও সেই অতৃপ্ত ও অতৃপ্য জ্ঞানপিপাসার অভ্যন্তরে সর্ব্ববিধ সংসার-সুলভ-দুঃখ-নিবৃত্তির এক অজিত ও অজেয় প্রযত্নই পরিলোকিত হয়। জ্ঞানাচার্য্য সুধীর আর্য্যহিন্দুর যাবতীয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় এই দুঃখনিবারিণী সাধীয়সী মহীয়সী চেষ্টা অতীব স্পষ্ট ও প্রবলভাবে দেদীপ্যমান। পুণ্যস্মরণীয় পরমতত্ত্বার্থদর্শী

মহাভাগ কপিল দুঃখযামিনীর নিবিড় তমিস্রার বিকট ও করাল দৃশ্য সন্দর্শনে ভীতভীতবৎ হইয়া, অতি ভীষণ জীবদুর্গতির পরিচিন্তনে, দুঃখাকুলহৃদয়ে, গভীর প্রতপ্ত নিঃশ্বাসের সহিত পারমার্থিক জ্ঞানানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল, জগন্মঙ্গল্য অমূল্য রত্ন সাংখ্য দর্শন। যিনি জীবজগতের মাঙ্গলিক ব্রতে এক সংস্থ মহাযোগী, তাঁহারই পুণ্য পদারবিন্দে মানবজাতির সমবেত কৃতজ্ঞতার পুষ্পপুঞ্জাঞ্জলি। তাই, আজ সহস্র সহস্র যুগান্তেও মহর্ষি কপিলের অনন্ত পুণ্যরাশির ন্যায় মহোচ্চ অতি পবিত্র আভ্যুদয়িক নাম, জ্ঞানানুসন্ধিৎসু মনুষ্যপ্রাণে, প্রীতিসহযোগে নিত্যধ্যাত।

যে স্থানে শান্তির সুখসমীরণ সদা প্রবাহিত, সেই স্থানেই নৈসর্গিক সহস্রমুখ জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখদুর্গতির মর্ম্মন্তুদ আঘাতে চূর্ণীকৃত জীবপ্রাণ, দুর্ব্বারবেগে, আনন্দের পরিসেবায়, প্রধাবিত। অবনীর জ্ঞান ভাণ্ডার সাংখ্য বা নিখিল কল্যাণরাশি বেদান্ত, মনুষ্য হৃদয়রাজ্যে, সেই অতি আশ্চর্য্য কারণেই, এতাদৃশ বিপুল ও প্রবল আধিপত্য অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সাংখ্যের অমের অমৃতমধুর জ্ঞানোপদেশে, বেদান্তের অতীন্দ্রিয় মহাতত্ত্ব প্রতিপাদন চেষ্টায়, জ্ঞানোজ্জ্বল ষ্টয়িক্‌গণের মহার্থপরিবোধক নির্ব্বিকার উপদেশরাশিতে, অথবা সুখপরায়ণ এপিকিউরাস্ এবং পিরহোর সুখসেবার অতি তরল কথায়, সর্ব্বত্রই প্রণালীবদ্ধ একই তত্ত্ব প্রতিভাত। আজ, সেইজন্যই পাশ্চাত্য মনীষী মহানুভাব পুণ্যনামা হিগেলের পরমার্থতত্ত্ব পর্য্যালোচনায়, প্রবৃত্ত হইলাম। তদীয় দর্শনশাস্ত্র, পারমার্থিক তত্ত্বের দুর্ব্বোধতায়, ভাষার অবোধ্য কর্কশতায় এবং চিন্তার অতলস্পর্শিনী গভীরতায়, এরূপ বিজড়িত ও সংশ্লিষ্ট যে, অতিতর সাবধানতা এবং একনিষ্ঠ ধৈর্য্য ব্যতিরেকে সেই অতি কঠোর দুরবগাহ মহাতত্ত্ব, কোন ক্রমেই পরিগৃহীত হইতে পারে না। ফলতঃ, তদীয় দর্শনশাস্ত্র ইউরোপীয় যাবতীয় জ্ঞানগ্রন্থ হইতে অধিকতর জটিল, এবং বিষয়ের কষ্টবোধ্যতায় সমধিক অস্পষ্ট।

কেহ কেহ সমীচীন যুক্তির সহিত নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, হিগেলের পরমার্থবাদ, পুরাতনী জগদ্বন্দ্যা অমৃত নির্ঝরিণী বেদান্তবাণীরই পাশ্চাত্য প্রতিধ্বনি। এই কথার নির্ব্যূঢ় যাথার্থ্য সুস্পষ্টরূপে উপপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ, জগতের আধুনিক যাবতীয় জ্ঞানানুশীলনে বা বিজ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে, সেই চিরন্তন আর্যজ্ঞানেরই কুত্রচিৎ স্পষ্ট কুত্রচিৎ অস্পষ্ট প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি পরিলোকিত হয়। বিশ্বনিয়ন্তার সর্ব্বমঙ্গল্য নিয়মে, মেদিনী দিন দিন জ্ঞানের অনন্ত পথে অগ্রসর হইতেছে; অভিনব তত্ত্বের মনোরঞ্জিনী আবিষ্ক্রিয়ার দিনদিন মানবী শক্তির বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে; এই আশা ও আশ্বাসের অমৃতস্রাবিণী কথায় প্রাণের আনন্দ সহস্র সহস্র পথে অনন্ত ধারায় উৎসারিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা

বিচার্য্য ও স্মরণীয় যে, আধুনিক জগতের সর্ব্ববিধ আবিষ্ক্রিয়াই আর্য্যমনীষিগণের প্রজ্ঞানেত্রে কোন না কোনক্রমে প্রতিভাত হইয়াছিল। কাজেই, বেদান্তদর্শনে হিগেল-প্রতিপাদিত পরমার্থ জ্ঞানের বীজ নিহিত ছিল, ইহা কোনরূপেই বিস্ময়ের কথা নহে। এবং এমন কি হিগেলের দর্শনশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম নিধান বেদান্তের অমৃত-ভাষ্য, এ কথায় নির্দ্দেশ করিলে, কোনক্রমেই সত্যের অবমাননা বা অপলাপ হইবে না।

হিগেল্ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি সময় হইতেই ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিষয়িণী আলোচনায় জর্ম্মণি উদ্ভাসিত হইতেছিল। হয়, জ্ঞাননিষ্ঠ হিগেল্ সেই সমস্ত মহাতত্ত্ব স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল বশতঃ স্বয়ং অবগত হইয়া থাকিবেন, কিংবা, পরমতত্ত্বের অনুশীলনের সার্ব্বভৌমিকতা ও নির্ব্বিশেষ সম্ভবপরতায়, এমন বহুবিধ তত্ত্বের বিনির্ণয় করিয়াছেন, যাহাতে বেদান্ত দর্শনে ও তৎ-প্রতিপাদিত পরমার্থবাদে অতিআশ্চর্য্য ও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হিগেলের অতি দুর্ব্বোধ ও দুরধিগম্য পরমার্থবাদের বিচার ও বিশ্লেষণের পূর্ব্বে,—তৎপূর্ব্ববর্ত্তি দর্শন শাস্ত্রাদির কিঞ্চিৎ আলোচনা, বিষয়ের অসাধারণ গৌরবে, সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। কেননা, হিগেলের অধ্যাত্মতত্ত্ব তদানীন্তন ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি দর্শন শাস্ত্রাদির পরিমার্জ্জিত পরিবর্দ্ধন এবং সৌষ্ঠবান্বিতা পরিপুষ্টি। অধুনাতন ইউরোপীয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-গরিষ্ঠ তাত্ত্বিক কান্ত্, তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান-সমৃদ্ধ পুণ্যনামা ফিকটে,—এবং বিশ্ববিশ্রুত বুধবর শেলিং প্রভৃতি মনীষিগণের দিগন্তব্যাপি জ্ঞানগরিমায় জর্ম্মাণ সমালোকিত ছিল। ঐ সকল দর্শন শাস্ত্রের সহিত হিগেলের পরমার্থবাদ এরূপ দুশ্ছেদ্য ও অপ্রতিবিধেয়-রূপে বিজড়িত যে ঐ সকল অধ্যাত্মতত্ত্বের স্পষ্ট ও বিশদ সমালোচন ব্যতিরেকে, হিগে-লের পারমার্থিক তত্ত্বের পরিস্ফুট জ্ঞান বুদ্ধি-শক্তির সর্ব্বতোভাবে অতীত ও অনধীন।

এই জগতে ইহা সার্ব্বজনীন নিয়ম যে, যে স্থানে জ্ঞান সেবার একসংস্থ প্রীতিসহকৃত অনুরাগ, সেইস্থানে যেন ঐশী শক্তির সর্ব্বসুখাস্পদ বিধিক্রমে, নানাবিধ অনুকূল কারণের সমবায় উপস্থিত হয়। যে সময় জ্ঞানাচার্য্য হিগেল্ তদীয় অগাধ অসামান্য জ্ঞানের অনন্ত চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থপ্রণয়নে নিরত, তখন প্রকৃতির সার্ব্বভৌম নিয়মে, নানাবিধ শুভাবহ সুখসাধন সমবেত ছিল। তদীয় দর্শন এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সমষ্টীকৃত অবশ্যম্ভাবি সহজ ফল। হিগেলের পরমার্থ-বাদের উপর মহর্ষি স্পিনোজার প্রভাবও বড় অধিক ও সুস্পষ্ট। একদিকে তদীয় দর্শন যেমন বেদান্ত দর্শন ও স্পিনোজার অদ্বৈতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত ও আকা-রিত, সেইরূপ অপরদিকে ইমানুয়েল কান্তের গভীর বিজ্ঞানবাদ, ফিক্‌টেও শেলিঙ্গের পরমাত্মবাদের প্রভায় সমুদ্ভাসিত। ইউরো-পীয় দর্শন শাস্ত্র কান্তের পূর্ব্বে যে ভাবে বিদূষিত ও বিকৃত হইয়াছিল, মানবীয় চিন্তাশক্তি যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল কষ্ট কল্পনায় কলু-

ষিত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাদৃশ ভুবনপ্রকীর্ত্তিত মহর্ষি কান্তের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জগন্মঙ্গলাবহ আবির্ভাব না হইলে, জ্ঞানবিজ্ঞানদৃপ্ত ইউরোপখণ্ড অসার বাগ্‌বিতণ্ডার অতি বিরূপ অসার ক্ষেত্রে অতি শোচনীয় রূপে পরিণত হইত, সন্দেহ নাই। একদিকে কার্টিজিয়ান্ দর্শনশাস্ত্রের অলৌকিক অনিয়ন্ত্রিত বাগ্‌বাহুল্য ও মমতাভিমানের অতি ভীষণ আঘাতে এবং আত্মাকাঙ্ক্ষী যুক্তির দৃঢ়ভূমির সমুৎসাদনে জ্ঞানবিজ্ঞানের অতুল অমৃতনির্ঝর স্বরূপ দর্শন শাস্ত্রের অতীব শোচনীয় ও ভয়াবহ অবস্থা হইয়াছিল, অপর দিকে তদ্রূপ ডেভিড্ হিয়ুম্ প্রভৃতির অন্তঃসার শূন্য "শূন্যবাদ" জ্ঞানপিপাসু মনুষ্য জাতিকে বড়ই ভয়ব্যাকুল ও হতাশ করিয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অভ্যন্তরে বা অন্তরালে যে জ্ঞানানুস্যূতা অনাদি অপ্রমেয় মহাশক্তির নিত্যলীলা বর্ত্তমান, তাহার মূলেও অতি নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে মনুষ্যকে বড়ই আকুল ও বিত্রাসিত করিয়াছিল। একদিন যেমন ডেকার্ট ও ম্যাল্‌ব্যাঙ্কের মমতাভিমানের অতি শ্লথ-ভূমির সমুৎসাদনে, জ্ঞানবৃদ্ধ মহাযোগী স্পিনোজা, অদ্বৈতবাদের সুবর্ণ অক্ষয় প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহর্ষি কান্ত্‌ও, ডেভিড্ হিয়ুম্ প্রভৃতির অসার ভিত্তির উপর দেববিগ্রহের রচনায় ধরণীমণ্ডল চরিতার্থ ও বিমুগ্ধ করিয়াছেন। হিয়ুমের "সংশয় বা শূন্যবাদে" প্রাণে কি যেন কি এক ভয়াবহ আতঙ্ক সঞ্চার হয়; যেন মনুষ্য আশাশূন্য, আশ্বাসের সুমধুর সঙ্গীতে অপ্রতিবিধেয়রূপে বঞ্চিত। দৃশ্যমান সংসার যেন আলোশূন্য —আশাশূন্য—যেন দগ্ধ মরুভূমি। যাহা দেখিতেছ, সকলই মায়িক বিজৃম্ভণ—মায়ার পরপারে কোন নিত্যসত্তার মোহন বিলাস নাই। সেই অতি ভীষণ সমস্যার সময়—জ্ঞানেতিহাসের সেই অতি নিদারুণ দুর্ব্বিপাকের ভয়াবহ সন্ধির সময়—বুধবরেণ্য কান্ত্ জর্ম্মাণির বিশাল আকাশে, ভাস্কর সূর্য্যের ন্যায়, প্রচণ্ডবেগে সমুদিত হইয়া, সর্ব্ববিধ অনর্থবাদ সমূল উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সেই নৈরাশ্যময় শূন্যবাদের শিথিল ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতের অন্তরালে এক অতীন্দ্রিয় অনাদিসিদ্ধ অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ড সত্তার বিনির্দ্দেশে মনুষ্যের পরিম্লান হৃদয়ে আশার সুধাধারা সঞ্চারিত করিলেন। কাল ও স্থানের স্বাধীন ও বাস্তবী সত্তার অস্বীকারে, ইচ্ছাতে হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। হিগেলের দর্শনশাস্ত্রে এই বিজ্ঞানবাদেরই পরিপুষ্ট অপূর্ব্বভাষ্য। ভৌতিক জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত; উহা সর্ব্বথা অস্বতন্ত্র ও আপেক্ষিক। উহা চরমজ্ঞান বলিয়া কোনক্রমেই পরিগৃহীত হইতে পারে না।

তিনিও আশার সুখসুমধুর গীতি শুনাইতে শুনাইতে, সেই পূর্ণনির্গুণ অখণ্ডতত্ত্ব মানবজ্ঞানের বহির্ভূত, এই ঘোরতর নৈরা-

শ্যের কথায় প্রাণে ভয় ও ব্যাকুলতা সমুৎপাদন করিলেন। মনুষ্যের সসীম জ্ঞান যতই সম্প্রসারিত ও প্রবর্দ্ধিত হউক না, উহা কোনক্রমেই সেই মনোবুদ্ধির অতীত অনির্ব্বচনীয় মহাসত্তার অবচ্ছেদ বা পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে না। সেই পারমার্থিক মহাতত্বের পরিগ্রহ চেষ্টা, বালকস্বভাবানুকারিণী অর্থশূন্যা কষ্ট চেষ্টা মাত্র। ঐ যে গগনমণ্ডল পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহা যেন নাতিদূরে নিম্ন ভূমিতে লীন হইয়াছে; মনুষ্য অবোধ কল্পনার অনিবার্য্য শাসনে উন্মত্তপ্রাণে তদনুবর্ত্তনে অগ্রসর হয়, যতই সম্মুখবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই সেই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বিলয়ন-রেখা অনন্তপথে দূরবর্ত্তিনী হয়। ভ্রান্ত মানব আর অগ্রসর হইবার অনর্থক চেষ্টায় প্রতারিত হয় না। অপূর্ণজীব কেমন করিয়া ও কোন্ সাহসে, সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অপ্রমেয় মহাতত্বের অবধারণে ও অধিগমে প্রযত্নপর হইতে পারে? এই চেষ্টাসহকৃত আশা বিকার-বিভ্রমেরই ২য় সংজ্ঞা। সান্ত সসীম অপূর্ণ জীব-বুদ্ধি, অনাদি অপূর্ণ সত্তার পরিমাপিণী বা পরিবোধিনী, এবংবিধ অযৌক্তিক আপাত মনোরম বাক্যে সত্যপরায়ণ বুধবর কান্ত্, মনুষ্যের মনঃ ভুলাইতে সচেষ্ট হয়েন নাই। মানবজ্ঞানের প্রান্তপ্রদেশে প্রাকৃতিক নিয়মের যে অনতিক্রমণীয় রেখা নির্দ্দিষ্ট ও অঙ্কিত হইয়াছে, জীববুদ্ধি কেমন করিয়া, সেই অনাদিরেখার অতিবর্ত্তনে সাহসী হইবে? এবং কিরূপেই বা তাদৃশী অতিকল্পিত আশার অতিকোমল ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, মনুষ্য আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে পারে? ডেকার্ট ও ম্যালব্র্যাঙ্কের সেই অসত্য মধুরবাক্যে, মহর্ষি কান্ত্, ক্ষণতরেও আস্থা স্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই, কিংবা, লাইব্নিজের শ্রুতিসম্মোহন বচনে মুহূর্ত্তও আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। যে স্থানে মনুষ্যের জ্ঞানারম্ভ, সেই স্থানেই তাহার পরিসমাপ্তি ও পর্য্যবসান। কান্ত্প্রতিপাদিত এই তত্ব, কার্টিজিয়ান্ দর্শনশাস্ত্র ও হিয়ুমাদির সংশয়বাদ, এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিসম্বাদি মতের সমন্বয় চেষ্টা। কিন্তু, এই কঠোর সত্যবাদে মনুষ্য কি কদাপি প্রীতি বা তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তাদৃশ দুরক্ষর অজ্ঞেয়বাদে সেই অচিন্ত্য তত্বের অনন্ত মহিমার পরিকীর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মনুষ্যের ব্যাকুলহৃদয় কদাপি তাহাতে শান্তি বা সমাশ্বাস লাভ করিতে পারে নাই। এই অতি প্রচণ্ড পরুষ অজ্ঞেয়বাদ কেবল তদানীন্তন অলীক ও অসার মত-রাশির সর্ব্বতোমুখী নিরসন চেষ্টা। বস্তুতঃ, কান্তের সমগ্র দর্শন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, তাঁহার এই অতি কঠোরভাষিণী চিন্তা সেই পরমার্থ তত্বের জ্ঞাতব্যতা অতি গোপনে ও অস্পষ্টভাবে স্বীকার না করিয়া পারে নাই। তদীয় দর্শন শাস্ত্রের এই অস্পষ্টতায় হিগেল প্রমুখ অতি বড় প্রধান দার্শনিকগণের অধ্যাত্মবাদ বিরচিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্রহ্মাণ্ডপ্রপঞ্চ ও মানব-

জ্ঞানচক্রের এবংবিধ নিয়তি নির্দ্দিষ্ট অলঙ্ঘ্য রেখার বিনির্ণয় করিলেও, তিনি কদাপি সেই অতীন্দ্রিয় মহাবস্তুর সত্তায়, মুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্র সন্দিহান হয়েন নাই। জড়ীয় জগতের জ্ঞানক্রিয়ায় দুই তত্ত্বের প্রাধান্য। জড় ও অজড়ের অন্যোহন্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই জ্ঞান। জ্ঞাতব্য ও জ্ঞাতার ক্রিয়া-সমবায়ই জড় জগতের উপলব্ধি। এই জ্ঞান সর্ব্বথা বিমিশ্র। জড়ীয় উপাদান ইন্দ্রিয়লব্ধ; অজড় উপাদান জ্ঞাতার স্বতঃসিদ্ধ মানসিকধর্ম্মপ্রদত্ত। উদাহরণবিশেষ দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত করা যাইতে পারে। "তাপ বস্তুমাত্রকেই সম্প্রসারিত করে।" তাপ ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ের অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিগৃহীত; কার্য্যকারণসম্বন্ধনির্দ্দেশ স্বতঃসিদ্ধ মানসধর্ম্ম। বহির্জগতের ঘটনানিবহের একত্ব—আন্তর রাজ্যের অনন্ত ভাবের অদ্বয়ত্ব—এতদুভয়ের বন্ধনসূত্র—সমন্বয় ও সমবায় ভূমি-কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্লক্ষ্য দুর্ব্বোধ অনন্ত রাজ্যে? চৈতন্যের অদ্বয়তা—ঐকিকতা—ভূতসঙ্ঘের অনন্ত অবিরাম প্রবাহ এক ও অভিন্ন—এই দুই আপাতিক বিরুদ্ধ বিপরীত জগৎ কোন্ মহাসূত্রে কিরূপে একীকৃত—সমীকৃত ও অদ্বৈতাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই অতি প্রয়োজনীয় নিগূঢ় প্রশ্নের কি অভ্রান্ত যথার্থ উত্তর নাই? নিখিলসংশয়চ্ছেদিনী পরমা প্রজ্ঞার পুণ্যাশ্রয়ে, সেই বুধসিংহ, ইন্দ্রিয়াতিগ অক্ষয় অনাদি স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতত্ত্বের (Ding an sich) পরিকল্পনায় এই অতি গভীর প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। এই অস্খলিত মহাভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, তৎপরবর্ত্তী জ্ঞানাচার্য্য ফিক্‌টে বিজ্ঞানবাদের প্রচার করিলেন। আত্মাই সৎ—আর সকলই অসৎ। জড়জগতের স্বাধীন ও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। উহা আত্মধর্ম্মেরই দুরতিক্রম অনুশাসনে সমুদ্ভাবিত। উহা বিনাশি। আত্মা অবিনাশী। এই আত্মপরিকল্পিত বাহ্য জগৎ আত্মার বিসম্বাদি ও বিপ্রকর্ষক। সেই প্রতিযোগি ক্রিয়া হইতে আত্মার আত্মজ্ঞান—অনাত্মের বন্ধন মোচন—ব্রহ্মাণ্ডের সমুৎসাদন—চৈতন্যের স্বরূপাবধারণ। মহাত্মা ফিক্‌টে বেদান্তানুকারি এই পরমপবিত্র তত্ত্ব (Subjective Idealism) "পৌরুষের বিজ্ঞানবাদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পর শেলিঙ্গের পরমার্থবাদ। এই অধ্যাত্মতত্ত্ব মহাযোগী স্পিনোজার পরমার্থতত্ত্বেরই ভাবান্তরিত প্রতিধ্বনি। আত্মা—অনাত্মা—জড়—অজড়—দুই বিপরীত জগতের সন্ধি ও সমন্বয় সেই পূর্ণ মহাতত্ত্ব। তাহা অনাদি অনন্ত এবং অপৌরুষেয়। সেই পরম বেদিতব্য মহাগ্রামে বিকার-সম্পর্ক নাই—বিক্ষোভের তাণ্ডব তাড়না নাই—বিকার-বিক্ষোভানাশ্রিত অচিন্ত্য অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ মহাসত্তা—সকল তত্ত্বের মূলভূমি। ব্যক্তিগত সসীম সাদি চৈতন্যের পূর্ণাবসানে—সেই বিশ্বব্যাপি অখণ্ড অনন্ত সত্তার আত্মাহুতি—কি যেন কি এক অপূর্ব্ব অজ্ঞেয় অনির্ব্বচনীয় মনো-

বুদ্ধির বহির্ভূত চৈতন্যসাগরে ক্ষুদ্রতরঙ্গের স্বরূপাবধারণ—অথবা তরঙ্গের বিশ্বজনীন বিবৃদ্ধি। এই জ্ঞানই জীবের চরমোদ্দিষ্ট পরমলক্ষ্য। ইহাই মানবের সারাৎসার। এই জ্ঞান সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ইহা অন্যবিধ যাবতীয় ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কিংবা নৈয়ায়িকী যুক্তির তুলনাস্থল নহে। এই জ্ঞানই পরম বিজ্ঞান, এবং মানবের অখিল কল্যাণপুঞ্জ। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আমরা জ্ঞানবরিষ্ঠ হিগেলের অতি গভীর পরমার্থবাদে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহামহিম কান্ত্ ও তৎপরবর্ত্তী দার্শনিকগণের প্রভাবে প্রভাবিত ও আকারিত হিগেলের পরমার্থবাদে, সেই সেই দর্শন শাস্ত্র হইতে নানারূপে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়। যে পরম তত্ত্বকে মহর্ষি কান্ত্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই মহাতত্ত্বকে হিগেল্ কদাপি বহিঃস্থ অজ্ঞেয় বলিয়া উপপাদিত করিতে প্রয়াসপর হয়েন নাই; উহা পূর্ণজ্ঞানের সম্ভবপরতায় সর্ব্বতোভাবেই বেদিতব্য। এই অতি মূল প্রদেশে, সামঞ্জস্যের অভ্যন্তরে, অতি আশ্চর্য্য বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে শেলিঙ্গের ন্যায় পূর্ণতত্ত্ব বহিঃস্থ আত্মা ও অনাত্মতত্ত্বের সংশ্লেষক, সংযোজক ও আশ্রয়নীয় পরম সূত্রস্বরূপে উপপন্ন হয় নাই। এই সকল দর্শনশাস্ত্র প্রারম্ভে এবং উপপত্তির সুশৃঙ্খল ক্রমে, অনেকাংশে বিষম ও বিভিন্ন রহিয়া, চরম সিদ্ধান্তে প্রায় একীভূত হইয়াছে। বিশেষতঃ ফিক্‌টে ও শেলিং এতদুভয় তদীয় পরমার্থবাদের উপর যে ভাবে ক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, দার্শনিক ইতিহাসে তাহা সত্যসত্যই বড় অধিক স্মরণীয়। সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণ তত্ত্ব—সেই পরম বেদিতব্য সারাৎসার মহাবস্তু—সেই অনাদি অক্ষয় অপ্রমেয় নিত্যসিদ্ধ পরমার্থ—আপনারই অনাদি স্বতঃসিদ্ধ অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তিতায়—লীলাক্রমে ব্রহ্মাণ্ডপ্রপঞ্চস্বরূপে অবভাসমান হয়। বাহ্যজগৎ—প্রাকৃতিক ব্রহ্মাণ্ড—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দসম্বলিত এই বিরাট বিশ্ব—সেই মৌলিক মহাতত্ত্বেরই লীলাময়ী স্ফূর্ত্তি। জাগতিক ঘটনাবলী—ভূচর, খেচর, জল, স্থল, অনল, অনিল, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্, সাবয়ব, অনবয়ব—প্রত্যক্ষ যাবতীয় জড়পদার্থ তাহা এই মৌলিক মহাবস্তুরই অপরিহার্য্য স্বকীয় অথচ নির্দ্দিষ্ট অবস্থাবিশেষ। মনুষ্য পূর্ণ—পূর্ণজ্ঞানে তাহার অনন্যসাধারণ অধিকার—উহাই তাহার পরম বৈভব। সেই পূর্ণস্বতঃসিদ্ধ মহাতত্ত্ব সৎ—চিৎ। হিগেলের দর্শনশাস্ত্রে এই পরম তত্ত্বের ত্রিবিধ অবস্থা বিনির্ণীত হইয়াছে। আদিম অবস্থা (Pure Spirit) শুদ্ধ আত্মা, দ্বিতীয় অবস্থা প্রকৃতি; তৃতীয় অবস্থায় অনন্ত পূর্ণতত্ত্বের উপপত্তি। এই শেষ অবস্থাই সাধনার চরমলক্ষ্য এবং বিশ্বজনীন মহাসিদ্ধি।

এই শেষ স্তরে প্রকৃতির অভ্যন্তর দিয়া আত্মার স্বরূপাবধারণ—আত্মার প্রত্যাবর্ত্তন—অভিসংপ্রবেশ সচ্চিতের মোহন রূপমাধুরীর পূর্ণোপভোগ। হিগেল্ প্রাথমিক

অতএব প্রধান বলিয়া, ("Substance") বস্তুজ্ঞানকেই প্রারম্ভিক স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহার ন্যায় সাধারণ, সহজ, মৌলিক ও সার্ব্বজনীন জ্ঞান আর কিছুই নাই। বিভিন্ন অবস্থায় ইহার পরস্পর বিরোধি ভাবের নির্দ্দেশ করিয়া, তাদৃশ প্রাথমিক বস্তুরও অলীকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অন্যোহন্য বিরোধ ও বিসম্বাদিতায় একবস্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পনারই উদ্ভাবিত বলিয়া, অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে। এই মুহূর্ত্তে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, পরমুহূর্ত্তেই তাহার সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন অবস্থা। একত্বে—দ্বৈত্ব—অনেকত্ব—কিরূপে সম্ভবপরতায় পরিগ্রাহ্য হইতে পারে? এইরূপে প্রতীয়মান যাবতীয় বিপরিবর্ত্তপ্রবাহের নাস্তিত্ব প্রতিপাদনে এক অনাদিসিদ্ধ সার্ব্বভৌম পূর্ণতত্ত্বের মহারাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন। এই পরমতত্ত্বের গতি আছে—ক্রিয়া আছে—পরিণাম ও বিবর্ত্ত আছে। পরম বৈজ্ঞানিক স্পিনোজার সেই আদ্যাসত্তার (Substance) ন্যায় হিগেল্ কথিত (Pure Spirit) শুদ্ধ আত্মা গতিশূন্য ও নিষ্ক্রিয় এবং অবিপরিণামী নহে। কর্ত্তৃত্বে ও বস্তুত্বে গতি ও স্থিতিতে যে প্রভেদ, হিগেল ও স্পিনোজার মহোচ্চ দর্শনে তত বৈচিত্র্য। সিদ্ধান্তের পার্থক্য অতি সামান্য; কিন্তু, আদি ও মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বেদান্ত দর্শন যাহাকে অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য অচিন্তনীয় জ্ঞানে "মায়ার" অবোধ্য মোহময়ী সংজ্ঞায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, সেই "অঘটনঘটন পটীয়সী" অনন্তরূপময়ী নানাবিলাসবিচিত্রা বৈদান্তিকী মায়া, হিগেলের পরমার্থবাদে, আভ্যন্তরীণ স্বতঃসিদ্ধ শক্তি বা স্বকীয় সহজগতি এই গভীরার্থবোধক অভিধানে সংজ্ঞিত হইয়াছে। এই মায়ারই বা স্বগতির আবর্ত্তবহুলা বিলাসময়ী লীলায় ভৌতিক জগতের অনন্তোর্ম্মিসঙ্কুল বিচিত্র স্ফুরণ। তাত্ত্বিকজ্ঞানের আনন্দ বিলাসে, সূর্য্যোদয়ে তমিস্রার ন্যায়, এই মোহময়ী, সংসারপ্রসবিত্রী মায়ার আমূল তিরোধান অবশ্যম্ভাবি। তখন ভৌতিক শাসনের রৌদ্রমূর্ত্তি আর প্রাণাতঙ্ক উৎপাদিত করিবে না,—তখন সংসারবন্ধন আর হৃদয় উৎকণ্ঠিত ও উদ্‌বেজিত করিবে না; তখন নৈরাশ্যের নৃশংস শাসনে মনুষ্য চূর্ণীকৃত হইবে না; এবং জীব সাধনার অন্তে মহাসিদ্ধি লাভের ন্যায়, স্বকীয় সহজ পরিপূর্ণতার মাঙ্গলিক স্মরণে, নিত্যানন্দের উপভোগে সমর্থ হইবে। কি চিরন্তনী পুরাতনী জ্ঞানদা ঋষিসমুদীরিতা বৈদান্তিকী তত্ত্বকথায়, কি পরমজ্ঞানী হিগেলের অত্যুচ্চ পরমার্থবাদে, উভয়ত্রই "মায়া" এবং সহজস্বগতির সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কোথা হইতে কোন্ দুর্জ্ঞেয় কারণে, "সচ্চিদানন্দ" সেই অজ্ঞেয় সংসারকারণভূতা মায়ার আশ্রয়ে বিশ্বসৃষ্টি করিবেন, নিখিলার্থগ্রাহিণী আর্ষী মনীষা তাহার সুস্পষ্ট অবধারণে যেন ভীতভীতবৎ দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। আবার, হিগেলও বুদ্ধির তাৎকালিক অপূর্ণতায়, সহজ আভ্যন্তরীণ শক্তির কারণ সহকৃত ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণে সর্ব্বতোভাবেই অসমর্থ হইয়া-

ছেন। তথাপি, সেই মায়ার ঘোরান্ধকারের অবসানে,পরম বেদিতব্য মহাতত্ত্বের আনন্দ-সাক্ষাৎকারের অমৃতস্রাবিণী মহীয়সী বার্ত্তার মহিমময় মঙ্গল্য প্রচারে, হতাশ মনুষ্যের বিশুষ্কপ্রাণে আশা ও আশ্বাসের পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী উৎসারিত করিতে বিমুখ হয়েন নাই। সেই সিদ্ধির প্রাণদ সঞ্চারে—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং
ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য-মুক্ত-
স্বভাববান্॥"

তখন অনন্তে আত্মদর্শন—স্বরূপাবধারণ পরম আনন্দ—নিত্যমুক্তি। হিগেলের সমগ্র পরমার্থবাদে, মানবীয় পরিপূর্ণজ্ঞানের নিঃসংশয় অভ্রান্তসুধাপ্রস্রবণ সহস্র পথে ক্ষরিত হইতেছে। বুদ্ধির শোচনীয় বিকার ও দুর্নিবার বিপাকগ্রস্ত শপেনহরের বিজাতীয় রোষ বিমিশ্রা পরুষভাষা বা অতি অসংযত উচ্ছ্বসিত গভীর আর্ত্তনাদ, কিছুতেই মনুষ্য-প্রাণের সেই অজস্র আনন্দ কোনরূপে বিকৃত ও মলিন করিতে সমর্থ হইবে না। ব্রহ্মাণ্ড অপ্রতিরোধনীয়া চৈতন্যবিহীনা অনন্ত-অনর্থোৎপাদিনী বলীয়সী অন্ধা শক্তির অপরিহার্য্য লীলা বা উচ্ছৃঙ্খল ক্রিয়া, এতাদৃশী ভ্রান্ত ও কষ্ট-কল্পিত অসার কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানোজ্জ্বল মনুষ্যহৃদয় কদাপি বিবশ ও বিত্রাসিত হইবে না।

জ্ঞানিগুরু কাণ্টের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বিজ্ঞানবাদ হইতে পরম তাত্ত্বিক হিগেলের পূর্ণ-পরমার্থ তত্ত্বে সর্ব্বত্রই ধারাবাহিণী প্রাণানন্দ-দায়িনী মহীয়সী আশ্বাসময়ী অমৃতধারা। মনুষ্য অযুতকণ্ঠে, সহস্র প্রাণের সমবেত আবেগে, সেই বুধবরেণ্য-বৃন্দ-নিষেবিত অতি উচ্চ পুণ্যনিবাসের সুখসঙ্কীর্ত্তনে, হৃদয়াবেগের পরিতর্পণ করিবে, কদাপি দানবী-সেবার উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসে বিকল ও বিবশ হইয়া, অধঃপাতের বিকট বিগ্রহ স্থাপিত করিবে না; এবং মনুষ্যত্বের সুখ-সমুজ্জ্বল নামে অবনীর অলঙ্কার স্বরূপ কপিল ও শঙ্করাচার্য্যের সহিত কান্ট ও হিগেলের পুণ্য চরণারবিন্দে, প্রীতিসহযোগে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণে প্রাণানন্দ লাভ করিবে।

শ্রীশশিমোহন বসাক এম. এ।

অভিশাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মালতীর স্বপ্ন ভাঙ্গিল।

মালতী এখানে আসিয়া যদিও সত্যেন্দ্রনাথের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক সাক্ষাৎ পান, তথাপি তাঁহার এখানে কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। একাকী থাকা কখনও অভ্যাস নাই, সুতরাং রাত্রিতে একেলা থাকিতে বড় কষ্ট হয়। সত্যেন প্রায় প্রতিদিনই একবার করিয়া মালতীর নিকট গমন করেন, যে দিন যে সময় সুবিধা হয়, সেই দিন সেই সময়েই যান। প্রথম প্রথম প্রায় দিবাভাগেই যাতায়াত করিতেন; এক্ষণে সন্ধ্যার পরও মধ্যে মধ্যে যাইয়া থাকেন এবং দুই এক দিন রাত্রি অতিবাহিতও করিয়াছেন। যে দিন রাত্রি বাস করেন সে দিন তিনি অতি প্রত্যূষে সকলের উঠিবার পূর্ব্বে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। আশাতেই আশা বাড়ে, আর লোভেই লোভ বাড়ে। ক্রমে সত্যেন্দ্রের যাতায়াত ও মালতীর নিকট অবস্থিতির কাল বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

যাহা দুই জনে জানিয়াছে, তাহা দশ জনে জানিতে আর কত বিলম্ব হয়? মালতী ও সত্যেন্দ্রনাথের কথা অগ্রে দুই পাঁচ জন দাসীশ্রেণীর লোক জানিল, তাহার পর গ্রামের অনেক গৃহস্থ রমণীরা জানিলেন, তাঁহাদের পথে, ঘাটে, মাঠে সারাদিনব্যাপি আলোচনা আন্দোলনের ফলে অবশিষ্ট নরনারী জানিল। ক্রমে শচীকান্ত বাবুর স্ত্রী শুনিলেন, রায় মহাশয়কে কেহ শুনাইতে সাহস করেন নাই; কাজেই তিনি পরে শুনিলেন। অমর অনেকদিন শুনিয়াছেন। আর সকলেই যদি শুনিল, তবে হিরণ্ময়ীর কি আর শুনিতে বাকি থাকে? সে অনেক দিনই বুঝিয়াছিল, তৎপরে যে দিন এই সংবাদ রায়দের বাটীতে প্রথম প্রবেশ করে সেই দিন সবিশেষ শুনিল। হিরণের এখন সব বুঝিবার ক্ষমতা হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে এক্ষণে যে কষ্ট তাহা বর্ণনাতীত, তাহার অন্তরে বাহিরে সমান-যন্ত্রণা। স্বামী মুখে যত্নই করুন আর যাহাই করুন, তাঁহাকে পরনারীরত দেখিলে কোন্ রমণী স্থির থাকিতে পারেন? হিরণ বড় ব্যাথাই পাইল। আর বাহিরে, সকলের মুখেই স্বামীর নিন্দার কথা শুনিতে শুনিতে, এক অনির্ব্বচনীয় যাতনায় তাঁহার শরীর পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যে দিন সত্যেন্দ্রনাথ রাত্রিতে বাটী আসেন না, সে দিন হিরণ একাকী শুইয়া আপন মনে সমস্ত রাত্রি রোদন করে।

স্বামী যে রাত্রে বাটীতে আসেন নাই, এ কথা যাহাতে সংসারের অপর কেহ না জানিতে পারেন, সে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করে। সত্যেনের জন্য শচীকান্ত বাবু ও তাঁহার পত্নীপ্রভৃতিকে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া থাকিতে দেখিয়া, হিরণ বিরলে অশ্রুপাত করে। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কতদিন সত্যেনকে এই সকল বিষয়ের কতকগুলি কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎকালে একদিনও তাহা পারে নাই। এখন হিরণ্ময়ীর সুখশান্তি যাহা কিছু শৈলজা; তাহার সহিত কথা কহিয়াই, হিরণ কিছু শান্তি লাভ করে। সংসারের মধ্যে তাহার সমবয়স্কা অন্য যাহারা আছে, তাহারা নানাবিধ ঠাট্টা বিদ্রূপদ্বারা তাহাকে বড় কষ্ট দেয়। হিরণ নীরবে সকলই সহিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ এখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহাদের কথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। অপরের জানাতে তাঁহার আর লজ্জা ভয় বড় ছিল না, ভাবনা ছিল পাছে খুল্লতাত জানিতে পারেন; এক্ষণে তিনি জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া সত্যেন যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তাঁহার মনের ধারণা—শচীকান্ত বাবু, উপায়ান্তর না দেখিয়া, এক্ষণে তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও, ক্ষমা করিয়াছেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি ক্রমে প্রত্যহ অপরাহ্ণকালে মালতীর নিকট যাইয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে, কয়েকদণ্ড থাকিয়া বাটী আসিতে-লাগিলেন।

শচীকান্ত বাবু প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের এবংবিধ আচরণ প্রতিদিন চক্ষের সমক্ষে দেখিয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া আছেন। তিনি ভাবেন, সত্যেন যখন নির্ভীক মনে তাঁহার বাটীতে,—তাঁহার সাক্ষাতে, এতদূর ঘৃণাকর পাপকার্য্য অবাধে করিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহাকে আর নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা বৃথা, সে চেষ্টার ফলে নিজের অবমাননা লাভ ভিন্ন আর কি হইবে। রায় মহাশয় সত্যেনের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘৃণা, দুঃখ ক্রোধে এক অব্যক্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে তিনি স্থির করিলেন,—অদৃষ্টে যাহার যাহা আছে তাহাই হইবে, আর সংসারের দুঃখ যাতনার মধ্যে না থাকিয়া সস্ত্রীক কাশীবাস করিবেন; কেবল আর একবার অপরের দ্বারা সত্যেনকে সাবধান হইতে বলিবেন মাত্র।

যে মালতী, হিরণ্ময়ীর, শচীকান্ত বাবুর ও বাটীর অপর সকলের অসুখের মূল কারণ, সেই হতভাগিনী মালতীই কি এখন আর সুখী? তাঁহারই বা কি সুখ?—কোন সুখই আর তাঁহার নাই। সকলের দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসহনীয়। মালতী এখন সকলের লক্ষ্য স্থল হইয়াছেন। পল্লীর সকল বাটীতেই—বিশেষতঃ স্ত্রীমহলে—সর্ব্বদাই তাঁহার কথা আন্দোলন হইয়া থাকে। মালতীকে পরমা সুন্দরী কল্পনা করিয়া কেহ বলেন,—"খুব সুন্দরী না হ'লে কি আর সত্যেন বাবুকে বশ করতে পেরেচে?" কেহ বলেন,—ছুঁড়ির রূপ না থাকলে কি [illegible] সোনার বৌকে ভুলে তার জন্য পাগল হয়?"

অনেকের ধারণা মালতীকে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক অলঙ্কার দিয়াছেন।

মালতী যদিও একাকী বাটীর মধ্যেই থাকেন, একবারও বাহির হন না, তথাপি তাঁহার সকল কথাই কর্ণগোচর হইয়া থাকে। সত্যেনের জন্য তাঁহার বাটীর সকলেই যে অসুখে কালযাপন করিতেছেন, শচীকান্ত বাবু যে নিতান্ত দুঃখে ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন এবং সুহাসিনী হিরণ্ময়ীর মুখে যে হাসি তিরোহিত হইয়া তাহাকে দিনে দিনে ম্লান করিতেছে, সকলই মালতী শুনিলেন। যাহাতে মালতীকে সুখের চরম সীমায় আনয়ন করিয়াছে, তাহাই অপর কয়েক জনের দুঃখের কারণ, তাহাই আর একটি বালিকার মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ, এমন কি তাহাই হয়ত পরিণামে একটি সুখের সংসারকে দুঃখের চির আবাস করিবার কারণ হইবে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মালতী বড়ই কাতর হইয়া উঠেন। যাহার সুখ শান্তি হরণ করিয়া তিনি এত সুখের অধিকারিণী, তাহার অবিরাম নয়নাশ্রুপাতের কথা চিন্তা করিয়াই মালতী সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথা পাইলেন। সত্যেন মালতীর নিকট যে দাসীকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে পূর্ব্বে তাঁহাদের বাটীতে ছিল, ছাড়িয়া আসার পরও মধ্যে মধ্যে তথায় যাইত, এক্ষণে সত্যেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে মালতীর নিকট নিযুক্ত হইয়া অবধি যাতায়াত বাড়িয়াছে। মালতী তাহারই মুখে সকল সংবাদ অবগত হন।

যত দিন যাইতে লাগিল, মালতীর সুখের কাননের চিন্তার পাদপটি ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এ দিকে সত্যেন্দ্রনাথ শচীকান্তের অনুশাসনে মালতীর নিকট যাতায়াত কমাইলেন, তিনি যে দিন তথায় যান, অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া আসেন। মালতী যদি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সত্যেন বলেন,—শরীর খারাপ আছে, নচেৎ বিশেষ আবশ্যক আছে। প্রকৃত কারণ যদিও কোন দিন বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা তিনি পারেন না। সত্যেন্দ্রনাথের জন্য যে তাঁহার বাটীর সকলেই অসুখী, একথা মালতী অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পান নাই, তিনি বলেন মালতীর কথা বাটীর কেহ জানেন না। মালতী ভাবেন,—'সত্যেনের ইহা গোপন করিবার কারণ কি? স্বার্থহানি বা ভয় এই দুইটি কারণেই লোকে কোন কথা গোপন করে, আমাকে তাঁহার ভয় কিসের, আর আমার নিকট বলিলেই বা কি স্বার্থ হানির সম্ভাবনা। পূর্ব্বে যখন কোন কারণে দুই একদিন আসিতে পারিত না, পরদিন আসিয়া সর্ব্বাগ্রে না আসার কারণ আপনিই বলিত, কিন্তু একদিনও অসুখ বা প্রয়োজনের কথা শুনি-নাই; কেবল যে দিন সুযোগ না পাইত, আসিত না ইহাই শুনিতাম। এখন প্রকৃতই কি অসুস্থতা ও প্রয়োজন বশতঃই আসিতে পারে না, আর এমন প্রয়োজন কি হইয়া থাকে যাহাতে আমার কাছে দুই দণ্ডের জন্য আসা যায় না? তবে কি তাঁহার

প্রয়োজন জানিবার আর আমার অধিকার নাই? এখন হয় ত আমি তাঁহার গলগ্রহ হইয়াছি। যতদিন ভালবাসা থাকে ততদিন কোন লাঞ্ছনাই লাঞ্ছনা বলিয়া মনে হয় না, প্রকৃতই ত সত্যেন আমারই জন্য কত লাঞ্ছনা ভোগ করেন, কিন্তু এখন কি আর সে ভালবাসা নাই? যদি তাহা থাকে, তবে এখন প্রতিদিন আসে না কেন? আর আসিলেই বা তখনই চলিয়া যায় কেন? হয় ত আমার জন্যই এখন আমার কাছে আসা, আমাকে দেখিবার সে আকুল পিপাসা আর নাই। তবে কি আমার ভরা জোঁয়ারে ভাঁটা পড়িল, জীবন-বসন্তের এইখানেই অবসান হইল! আর যদি এখনও না হইয়া থাকে, দুই দিন পরে যে না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? আজীবন পরের সামগ্রী ভোগ করিয়া সুখে কাটাইবার আমার কি অধিকার আছে? আমি পূর্ব্বজন্মে মহাপাপ করিয়াছি, এ জন্মে তাহার ফল ভোগ করিতেছি; আবার এ জন্মে নিজ সুখের জন্য কত লোককে কাঁদাইতেছি, ইহারও ফলভোগ করিব। আহা! হিরণ্ময়ীর কত যাতনা, আমি তাহার প্রাণের প্রাণকে কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সত্যেন—সে আমার জীবন, কিন্তু জীবনের প্রতি আমার জোর কি? এ জীবন টুটিলে কি আমি মরিব? না, তাহা হইলেও আমার আর কোন ভাবনা নাই। ভালবাসা হারাইলে মানুষ মরে না কেন? যদি না মরে, তবে হারায় কেন? আর যদি হারায়, তবে পায় কেন? আমি মরিতে পারিলে আর কোন কষ্টই ছিল না, কিন্তু তাহার কি উপায় নাই? এখনও যাহা আছে দুইদিন পরে যখন তাহা থাকিবে না, তখন মরিতে পারিলেই ভাল হয়। সত্যেন কি করিয়া সে ভালবাসা ভুলিবে? তবে আমাকে এ সুখের সাগরে আনিল কেন? আমার কাহারও ধন চুরি করিবার অধিকার নাই সত্য; কিন্তু আমার ধন, আমার প্রাণটি সত্যেনের চুরি করিবার কি অধিকার ছিল? না, না, তাহাকে চোর বলায় পাপ আছে; তাহার কিসের অভাব যে, সে এই হতভাগিনীর সামান্য প্রাণটি চুরি করিবে? আমিই ত তাঁর কাছে আমার মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, আমিই ত আমার সুখের জন্য তাঁর সুখ ও উন্নতির পথে কাঁটা দিতেছি। না, আর না, আর আমি তাঁহার পথে দাঁড়াইব না, সে বালিকাকে আর মারিব না। আমি মন্দভাগিনী, আমার সুখ দুঃখে আসিয়া যায় না; বুঝিয়াছি আমার সুখরবি অস্তগমনোন্মুখ, এই বেলা আলোকে আলোকে চলিয়া যাই। কিন্তু যাই কোথা, আমার কোথায় স্থান আছে? দুঃখিনী জননীকে বৃদ্ধ বয়সে কাঁদাইয়াছি, এ পোড়া মুখ আর সেখানে দেখাইতে পারিব না। শ্বশুরকুলেই বা কে আছে যে, তথায় আশ্রয় লইব। শাশুড়ী ছিলেন তিনিও নাই, আর থাকিলেও কি সেখানে মুখ দেখাইতে পারিতাম! তিনি কি আর ফিরিবেন, আজি যদি তাঁর সন্ধান পাইতাম, তাহা হইলে বড় সুবিধাই হইত। এ পোড়া

দেশে থাকিলে সত্যেনকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। কাশী মহাসহর লক্ষ লক্ষ লোকের বাস; আমি স্ত্রীলোক, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিব না, কিন্তু আমার আর তাঁহার নিকটে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। * * * * *"

মালতী বহুক্ষণ ধরিয়া এই ভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে প্রকারেই হউক কাশী যাইবেন। একবার মাত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারি দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সত্যেন আসিলেন। মালতী পূর্ব্বের মত তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। আজি তাঁহার বদনকমল শুষ্ক, জ্যোতিহীন। সত্যেন কিছুকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; মালতীকে তৎপরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া তিনি তাহার হাতটি নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মালতি! আজ তোমার এ কি ভাব? কি হ'য়েছে?"

মালতী কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন সত্যেনকে কি প্রকারে মনের কথা বলিবেন। সত্যেন পুনরায় কোমল স্বরে বলিলেন,—"মালতি! আমি কয়দিন আসি নাই, সেই জন্যই কি কাঁদচ?

মালতী এইবার ধীরে ভাঙ্গাকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"সত্যেন তুমিই এ হতভাগিনীর আঁধার হৃদয় আলো করিয়াছ; এত সুখ, যা কখনও কল্পনাতেও আসিত না, তা তোমার দয়াতেই পেয়েছি। কিন্তু ভাই! এ অকূল সুখের সাগর আমি পার হ'তে কিছুতেই পারব না। আমার নিজের ক্ষমতা নাই, আর তোমার সাহায্য লইবার অধিকারও আমার নাই। আমার অনুরোধ এ সর্ব্বনাশীকে মার্জ্জনা ক'রো, তোমার নির্ম্মল সংসার আমিই নষ্ট করতে বসেছিলাম। এ অসীম সুখের কথা কখনও ভুলতে পারব না; কিন্তু আর না, আজ হতে তুমিও মনে করিও যে, মালতী নাম জগৎ হ'তে বিলুপ্ত হয়েছে, এ পাপিনীর নাম আর মনে রেখো না। আজ হ'তে আমি তোমায় আপন ভ্রাতা বলিয়া মনে করিব।"

সত্যেন কাতরভাবে বলিলেন,—"তোমার এ কি করিলাম মালতি!"

মালতী বলিলেন,—"আমার যা ছিল, তাহাই রহিল, তুমি নূতন আর কি করিয়াছ? সকল দিন কি সমান যায়, আমার সুখের দিন গিয়াছে। তোমার কোন দোষ নাই। এ আমার জীবনের একটা মিথ্যা স্বপ্ন, সব স্বপ্ন কি সত্য হয় সত্যেন?"

সত্যেন মালতীর মুখে আজি অকস্মাৎ এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। মালতী আরও কতকগুলি কথা বলিলেন। সত্যেন যথাসময়ে চলিয়া গেলেন, মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় দিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। মালতী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একাকিনী কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর নিঃস্তব্ধ রজনীতে আলোক

হস্তে একবার মুকুর মধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে নিজ দেহের যে কয়েকখানি আভরণ ছিল, উন্মোচন করিলেন, চুল কাটিয়া ছোট করিলেন, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বেশ ধারণ করিলেন। আর একবার দর্পণে নিজ মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। বাতায়ন সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, এখনও রাত্রি অনেক আছে। আবার বসিয়া বসিয়া কত অশ্রুপাত করিলেন। যখন দেখিলেন দু একটি বিহগ প্রভাতী গাইবার উপক্রম করিতেছে, বিরল-নক্ষত্র আকাশের চন্দ্র হীন-প্রভ হইয়াছেন, তখন মালতী একাকিনী বাটীর বাহির হইলেন। পূর্ব্বে স্বপ্নে যে ভয়ানক পথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, মালতী অদ্য তদপেক্ষা দুর্গম ও অন্ধকার পথ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মোহ ঘুচিল।

সন্ধ্যার পর সত্যেন্দ্রনাথ মালতীর নিকট হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া একাকী বসিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছেন. এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"আপনাকে ছোট বাবু ডাকচেন।"

অধুনা শচীকান্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া কথা বার্ত্তা বড় কহেন না, আর সত্যেনও এখন পূর্ব্বের মত তাঁহার নিকটে বসেন না, খুল্লতাতের সহিত নানাবিষয়ের নানা গল্প এখন আর নাই। শচীকান্ত বাবুরও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, প্রায় কোন লোকের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সাক্ষাৎ কথোপকথন বিরল হইয়া আসিতেছে। আজি অকস্মাৎ খুড়া মহাশয়কে এমন সময়ে ডাকিতে দেখিয়া সত্যেন চিন্তিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। সত্যেনকে দেখিয়া শচীকান্ত বাবু বলিলেন,—"সত্যেন বসো।"

সত্যেন নিতান্ত অপরাধীর মত এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, মুখে কোন কথা নাই। তখন রায় মহাশয় বলিলেন,—"বাবা সত্যেন! আমাদের এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়েছে, মনে মনে বাসনা করেছি, আর সংসারে না থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কোন পবিত্র দেবস্থানে বাস ক'রে,ভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করি। মনে করেছি আপাততঃ কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের কাছেই থাকৃব। তোমায় আর কি বলব বাবা, তোমার বুদ্ধি আছে, যাতে তোমার পিতা, পিতামহের নামটি বজায় থাকে, তাই ক'রো। কমলচকের একটা সুবন্দোবস্ত ক'রে যেতে পারলেই ভাল হতো, কিন্তু তা পারলাম না, যাবার জন্য মনটা বড় অস্থির হয়েছে, তুমি আগে ঐ লাটটা ঠিক করে পৈতৃক ক্রিয়াকলাপগুলি সব বজায় রাখতে চেষ্টা ক'রো, সংসারের

খরচপত্র একটু হিসাব ক'রে চলো। কোন ভাবনা নাই, আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন।"

রায়মহাশয়ের এই কথাগুলি বলিতে চোখে জল আসিল, তিনি চুপ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের আর কি উত্তর আছে, তিনিও নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। শচীকান্ত বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—"বাবা, চোখের জল ফেলো না, তোমার কোন চিন্তা নাই, ঈশ্বর না করুন, তোমাদের তেমন অসুখ বিসুখ করিলে বা কোন বিশেষ আবশ্যক উপস্থিত হইলে, আমি সংবাদ পাইবামাত্র আস্‌ব। প্রথম প্রথম তোমার একটু কষ্ট হবে, তার পর সব সয়ে যাবে। মাধব রহিল, উমাচরণ রহিল, উহারা পুরাতন ও বিশ্বাসী; আর তুমিও এখন কাজ কর্ম্ম সব বুঝ্‌তে শিখেচ, ভাবনা কিছু কোরো না। আমি কালই যাত্রা করব, এইরূপ ইচ্ছা করেছি, এখন হাসি মুখে আমাকে বিদায় দাও। তোমাদের চখে জল দেখে যেতে আমার বড় কষ্ট হবে।"

সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইতেছিল, খুড়ামহাশয়ের চরণে ধরিয়া একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহারই জন্য শচীকান্ত বাবু নিজ সংসার, নিজ আলয়, স্বদেশ ও জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। সত্যেন যদ্যপি শচীকান্ত বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার মানসিক ক্লেশের অনেক উপশম হইত; আর কে বলিতে পারেন যে, ইহাতে রায় মহাশয়ের সংসার ত্যাগ স্থগিত না হইত। সত্যেন কিন্তু কোন মতেই তাহা পারিলেন না।

রাত্রি প্রভাত হইল। সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মোহজাল সেই সঙ্গে অপসারিত হইল। যথাকালে শচীকান্ত বাবু প্রতিবেশী ও আত্মস্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বারাণসী যাত্রা করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কোন কথাই কহিলেন না, রোদন করিতে করিতে পিতৃসদৃশ পিতৃব্যকে ষ্টেশনে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃব্যের বর্ত্তমানেই গৃহস্বামীর আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

স্রোতের টানে

কোথা হ'তে এসে, কোথা যেতেছিনু,
পথে মেঘ এল ঘিরে,
মহা গোলমালে একা দিশেহারা,
কোথা বা যাইব ফিরে !
কোথা হ'তে এনু, কোথা ঠাঁই মোর ;
পথমাঝে এসে ঘন-ঘটা ঘোর ।
হেথা হোথা খুঁজে প্রণালী না পাই,
ওই ঝড় এল !—কোথা আর যাই ;
বেঁধে কাজ কিবা,কোথা'ই বা ফিরি ?-
জানিনি তো কোথা বাড়ী !
জীবন মরণ ভাবিতে ভাবিতে
হাল খানি দিনু ছাড়ি ।

ভেসে ভেসে শেষে এক দিকে দেখি
খানিক সিঁদুরে রাঙা,
পড়েই রইনু নিরাশ নিথির,
দেহ মন সবি ভাঙা ।
ভেবে ভেবে কত কি জানি গড়িনু,
কখন আবার ঘুমায়ে পড়িনু ;
সুধু মনে পড়ে জপ-মন্ত্র ছিল
"যা, হবার হোক !"—তাই বুঝি নিল
প্রবাহ-লহরী তরী খানি টানি,
কয়'টি চরের মাঝে ।—
আঁখি মুছে দেখি শিয়রে আমার
প্রভাতী তারাটি রাজে ।

এ কি !—অভিষেক ?—না পাগল আমি ?—
সভাই বিহগ কুঞ্জে,
দু'একটি তারা রজনীর শেষে
প্রভাতীর পদ পূজে ।
এই মতে মোর হ'ল অভিষেক,
সবি কেটে গেছে—শরতের মেঘ !
মৃদুল মধুর ভাদরের বায়
শ্রান্তি হরিতে জাগাল আমায় ;—
সুদীক্ষা লইনু মহাযাত্রার
মহা পারাবার পানে ;
কাল রাত গেছে প্রভাতে জেগেছি
অচেনা বিহগ গানে ।

পাল তুলে দিনু,—ভরা পাল খানি
আশার শারদ বায় ;
ঋজু কল কল, আবর্ত্ত-বিহ্বল
কখন তরণী যায় ।
আগে ধীরে ধীরে তীরে তীরে যাব,
আরতি, ভজন, সুখগীতি গাব,
পথে যদি পাই সুসঙ্গ লইব
পূজা-শেষে তা'রে মালা পরাইব ;
তপে জপে যাব তরী বেয়ে বেয়ে
অজানা দেশাভিমুখে,
সময় বুঝিয়া শেষে পাড়ি দিব
শান্ত সবল বুকে ।

শরত কেটেছে, শীত কেটে গেছে,
মধুমাস কেটে গেছে,
ধরাণের শেষে জলদের দল
দূরে ওই দেখা দেছে।
প্রখর রৌদ্রে মধুমাসে, শীতে,
কেটে গেছে ক'টি যুগ জয় গীতে;
ভবের তীরের আধ পথ বাকি,
তীরে তীরে যেতে দায় ঘটে না কি ?
চপল ঢেউটা ঠেলে নিয়ে তীরে
আছাড়ি মারিবে শেষে !
বাকি পথ টুকু যাইতে নারিব
তাপসী গৈরিক-বেশে ?

সংসারের তীর দূরে রেখে যেতে
প্রখর প্রবাহে পড়ি;
পাড়িটার আগে ক্ষুধার জ্বালায়
তাহে মজিবারে ডরি।
তীরে ডাকে কেহ, কেহ সুধু হাসে,
পারে যাবে যা'রা টেনে নিতে আসে;
কারেও না শুনি, ধরা নাহি দেই,
কা'র দলে যাব আজো ঠিক নাই!—
পুরাণো তুফানে আজি তা'ই ডরি,
তরী কেহ ভেঙ্গে ফেল!
হৃদি-পাল মোর ভরা তবু মিছে
এ কূল ও কূল গেল!

শ্রীমণীন্দ্রকুমার রায়।

কাব্যপ্রকাশঃ।

অথ দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

দ্বিতীয় উল্লাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৃত্তিঃ। গৌঃ শুক্লশ্চলো ডিত্থ ইতি চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিরিতি মহাভাষ্যকারঃ।

অনু। এইজন্য মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন, ব্যবহারে শব্দের প্রবৃত্তি চারি প্রকার, যথা "গো, শুক্ল, চল ও ডিত্থ।"

বিবৃতি। বাক্যপদীয় উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণীভূত মূল মহাভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়া স্বমত সমর্থন করিলেন।

বৃত্তিঃ। পরমাণ্বাদীনাং গুণমধ্যপাঠাৎ পারিভাষিকং গুণত্বম্।

অনু। বৈশেষিকদর্শনে অণু মহৎ হ্রস্ব ইত্যাদিভাবে পরমাণুকেও গুণের মধ্যে ধরা হইয়াছে; কিন্তু পরমাণুতে গুণের লক্ষণ নাই; পরমাণু বস্তুতঃ গুণ শব্দ নহে, জাতি শব্দ। বিশেষ সুবিধার জন্য মহর্ষি কণাদ উহাকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজেই মূল বৈশেষিককার মহর্ষি কণাদের সঙ্গে তত্ত্বাংশে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কোন মতভেদ নাই। (একটি দোষ পরিহার করা হইল।)

বৃত্তিঃ। গুণক্রিয়া যদৃচ্ছানাং বস্তুত একরূপাণাং অপি আশ্রয়ভেদাদ্ ভেদ ইব লক্ষ্যতে যথৈকস্য মুখস্য খড়্গমুকুরতৈলাদ্যালম্বনভেদাৎ।

অনু। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, ব্যক্তি বিশেষে শব্দের সঙ্কেত করিলে আনন্ত্য ও ব্যভিচার দোষ ঘটে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পরিদৃষ্ট গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞায় সঙ্কেত করিতে গেলেও ত সেই দোষই থাকিয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা বস্তুতঃ একই রূপ ; যেমন একই মুখ নির্ম্মল খড়্গ, দর্পণ ও তৈলাদির আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, সেইরূপ বস্তুতঃ একই গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা, গো মনুষ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় মাত্র, কিন্তু আশ্রয়ভেদ দ্বারা গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞার বস্তুতঃ কোন ভেদ জন্মে না ; বরং ইহা সেই গমনক্রিয়া, সেই শুক্লবর্ণ, ইহা সেই সংজ্ঞা এরূপ অভিজ্ঞান বা পরিচয় দ্বারা উহাদের ঐক্য প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে।

বিবৃতি। দর্পণাদি মুখের আশ্রয় নহে, প্রতিবিম্বের আশ্রয় ; এই ভাবে বস্তু ও গুণ, ক্রিয়া এবং সংজ্ঞার আশ্রয়। যেমন একই মুখ সহস্র সহস্র স্বচ্ছ বস্তুতে সহস্র সহস্র ভাবে প্রতিবিম্বিত হইলেও মুখ একই থাকে, সেইরূপ শুক্লগুণও একই বটে, দর্শনীভূত ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এ স্থলে বেদান্তের মতে কথা বলা হইতেছে।

বৃত্তিঃ। হিমপয়ঃ শঙ্খাদ্যাশ্রয়েষু পরমার্থতোভিন্নেষু শুক্লাদিষু যদ্বশেন শুক্লঃ শুক্ল ইত্যাদ্যভিন্নাভিধান প্রত্যয়োৎপত্তি স্তৎ শুক্লত্বাদি সামান্যম্, গুড় তণ্ডুল পাকাদিষ্বেবমেব পাকত্বাদেঃ, বালবৃদ্ধশুকাদ্যুদীরিতেষু ডিত্থাদি শব্দেষু চ প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু ডিত্থাদিষু বা ডিত্থত্বাদ্যস্তীতি সর্ব্বেষাং শব্দানাং জাতিরেব প্রবৃত্তি নিমিত্ত মিত্যন্যে।

অনু। মহাভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যা করিয়া এখন মীমাংসকদিগের মত ব্যাখ্যা করিতেছেন। মীমাংসকগণ বলেন, শব্দের সঙ্কেত কেবল জাতিতে। তাঁহারা বলেন বরফ, দুগ্ধ ও শঙ্খ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে অবস্থিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াও যাহার অস্তিতা বশতঃ বরফ শুক্ল, দুগ্ধ শুক্ল, শঙ্খ শুক্ল এইরূপ অভিন্ন শুক্লাদি-শব্দ-ব্যাপার-জনিত জ্ঞান জন্মে, তাহাই শুক্লাদি গুণের জাতি বা বৈশেষিকোক্ত সামান্য। যেমন গুণে জাতি সিদ্ধ হইল, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন পাক ক্রিয়ায়ও একই পাকত্বরূপ ক্রিয়া-জাতি সিদ্ধ হয় ; সেইরূপ বালক বৃদ্ধ ও শুকাদি পক্ষি দ্বারা উচ্চারিত ডিত্থাদি সংজ্ঞা দ্বারা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল মনুষ্যাদি দেহপিণ্ডে সেইরূপ ডিত্থত্বাদি সংজ্ঞা-জাতি সিদ্ধ হয়। অতএব গো, শুক্ল, চল ও ডিত্থ এই চারি প্রকার শব্দের প্রয়োগেই জাতিই প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সংজ্ঞা প্রবৃত্তির কারণ নহে। কাজেই শব্দের শক্তি জাতিতেই বটে।

বিবৃতি। শুক্লগুণ বরফাদি নানা বস্তুতে থাকে, কাজেই বলিতে হয় যে, পৃথক্ পৃথক্

বস্তুর শুক্লত্ব পরস্পর পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু তথাপি যেমন সমস্ত বস্তুর শুক্লগুণ একটা ঐক্যগুণ দ্বারা শুক্লত্বজাতি স্থির করিয়া লই, সেইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে বিদ্যমান পাকাদি ক্রিয়ায়ও ঐক্যবুদ্ধি দ্বারা পাকত্বাদি জাতি স্থির করি, সেইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বক্তৃ দ্বারা উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তনশীল মনুষ্যদেহ-পশ্বাদিতে প্রযুক্ত ডিত্থাদি সংজ্ঞার ও একত্ব কল্পনা দ্বারা ডিত্থত্বজাতি স্থির করি।

বৃত্তিঃ। তদ্বান্ অপোহো বা শব্দার্থঃ কৈশ্চিদুক্তঃ ইতি গ্রন্থ-গৌরব-ভয়াৎ প্রকৃতানুপ যোগাচ্চ ন দর্শিতম্।

অনু। কেহ কেহ বলেন, "তদ্বান্" (১) ই—শব্দের অর্থ. কেহ কেহ বলেন, "অপোহ" ই (২) শব্দের অর্থ। পুস্তক বৃহদাকার হইয়া উঠে এবং প্রস্তুত বিষয়েও উহাদের বিশেষ উপযোগিতা নাই বলিয়া এই দুইটি মত প্রদর্শন করা গেল না।

বিবৃতি। (১) তদ্বান্—এইটি নৈয়ায়িকদিগের মত। তদ্বান্ শব্দে তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝায়। নৈয়ায়িকদিগের মতে শব্দের সঙ্কেত জাতিতে হইতে পারে না, কেননা জাতিতে সঙ্কেত হইলে, শব্দদ্বারা ব্যক্তি বুঝা যাইবে কিরূপে? ব্যক্তিতে সঙ্কেত হইলে আনন্ত্যাদি দোষ ঘটে। জাতি ছাড়াও ব্যক্তি থাকে না। অতএব বলিতে হয় যে, জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিই শব্দের অর্থ। এইটি মিশ্রিত মত।

(২) অপোহ—এইটি বৌদ্ধ মত। অপোহ=অতদ্ ব্যাবৃত্তি=তাহাই, তাহা ছাড়া অন্য কিছু নহে। বৌদ্ধক্ষণভঙ্গবাদিগণ স্থায়িনী কোন জাতি বা সত্তা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে গোত্ব বা গোজাতি বলিয়া নিত্য কিছু বিদ্যমান নাই; কাজেই জাতিতে শব্দের সঙ্কেত হইতে পারে না; সেইরূপ অনিত্য ব্যক্তিতেও সঙ্কেত হইতে পারে না, কাজেই জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেও সঙ্কেত হইতে পারে না। কাজেই গোশব্দের অর্থ গোজাতি, বা গোব্যক্তি. বা গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তিও নহে; কিন্তু গো শব্দের প্রতিপাদ্য গো ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহাই, গো শব্দের অর্থ।

সমুখ্যোঽর্থ স্তত্রমুখ্য ব্যাপারোঽস্যাভিধোচ্যতে। ৮।

বৃত্তিঃ। স ইতি সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতঃ। অস্যেতি শব্দস্য।

অনু। সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত জাত্যাদিই শব্দের মুখ্যার্থ। সেই মুখ্যার্থে শব্দের যে মুখ্য ব্যাপার বা বৃত্তি, তাহাকে অভিধা বলে।

বিবৃতি। সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থের প্রতিপাদক শব্দকে বাচক শব্দ বলে, সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত অর্থকে বাচ্যার্থ বলে। বাচক শব্দ বাচ্যার্থ বুঝাইবার পূর্ব্বে তাহার একটা ব্যাপার হয়; বাচকশব্দজনিত বাচ্যার্থের স্মৃতিকে এই ব্যাপার বলে। বাচ্যার্থকে শক্যার্থ, মুখ্যার্থ বা অভিধেয় অর্থ বলে। এইরূপে বাচ্যার্থ ও বাচক শব্দ বুঝাইয়া লাক্ষণিক শব্দ ও লক্ষ্যার্থ বুঝাইতেছেন।

মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎসা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। শব্দের পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অর্থের বাধা হইলে, সেই মুখ্যার্থের যোগে প্রসিদ্ধি অথবা প্রয়োজন বশতঃ অন্য অর্থ প্রতিপাদন করাকে লক্ষণা বলে। লক্ষণা বস্তুতঃ শব্দের মুখ্যার্থে অবস্থান করে, তথাপি উহা বাচক শব্দে অবস্থান করে বলিয়া; আরোপ করা হয়।

বৃত্তিঃ। কর্ম্মণি কুশল ইত্যাদৌ দর্ভগ্রহণাদ্যযোগাৎ গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ চ গঙ্গাদীনাং ঘোষাদ্যাধারত্বাসম্ভবাৎ মুখ্যার্থস্য বাধে বিবেচকত্বাদৌ সামীপ্যে চ সম্বন্ধে রূঢ়িতঃ প্রসিদ্ধেঃ, তথা গঙ্গাতটে ঘোষ ইত্যাদেঃ প্রয়োগাৎ যেষাং ন তথা প্রতিপত্তিস্তেষাং পাবনত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ প্রয়োজনাৎ চ, মুখ্যেন অমুখ্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎস আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ সান্তরার্থনিষ্ঠোলক্ষণা।

অনু। ইনি কার্য্যকুশল এরূপ বলিলে কার্য্যের সময় ইনি কুশচ্ছেদন করেন, (১) এরূপ বুঝায় না, গঙ্গায় ঘোষ (গোপপল্লী) বলিলে, গঙ্গাজল ঘোষের অধিকরণ কারক (২) এরূপও বুঝায় না; তদবস্থায় কুশল ও গঙ্গাশব্দের কুশচ্ছেদন ও জলপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থের বাধা ঘটে, (৩) এবং কুশ কর্ত্তনকালীন বিবেচকতা ও গঙ্গার সামীপ্যরূপ (৫) সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে; কুশলাদি শব্দ নিপুণার্থে প্রসিদ্ধি আছে, (৬) গঙ্গার তটে বলিলে ঘোষে পাবনত্বযোগ পাওয়া হয় না, গঙ্গায় ঘোষ বলিলে সেই পাবনত্বাদিরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কাজেই পাবনত্বাদি প্রাপ্তি রূপ প্রয়োজন সাধনের জন্য "গঙ্গায় ঘোষ" বলা আবশ্যক; এইরূপ মুখ্যার্থবাধ ও মুখ্যার্থযোগ দ্বারা প্রসিদ্ধি অথবা প্রয়োজন বশতঃ মুখ্যার্থ দ্বারা অমুখ্যার্থ প্রতিপাদন করাকে লক্ষণা বলে (৮)। লক্ষণা আরোপমূলক শব্দ ব্যাপার (৯) বিশেষ এবং উহাতে ব্যবহিতরূপে প্রতীয়মান অর্থ বুঝান (১০) হয়।

বিবৃতি। (১) কুশল শব্দের মুখ্যার্থ কুশং লাতীতি কুশলঃ। কুশ কাটে যে সে কুশল (কুশ—লা+কঃ)। কিন্তু "কার্য্যে কুশল" বলিলে কুশল শব্দে কুশ কাটা লোক না বুঝাইয়া নিপুণ অর্থ বুঝায়। (২) গঙ্গায়াং ঘোষঃ (গঙ্গায় গোপপল্লী) বলিলে জলপ্রবাহের উপর ঘোষ আছে এরূপ বুঝায় না। (৩) গঙ্গা শব্দে জলপ্রবাহ বিশেষকেই বুঝায়। গঙ্গায় ঘোষ ও কর্ম্মে কুশল বলিলে কুশল ও গঙ্গা শব্দের সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত মুখ্যার্থ খাটে না, কাজেই তাহার বাধা ঘটে। (৪) কুশ কাটনের সময় একটু বুদ্ধি খাটান আবশ্যক, বিবেচনা আবশ্যক, এই বিবেচনার সম্বন্ধ বশতঃ কুশল শব্দে নিপুণ বুঝায়; (৫) "গঙ্গায় ঘোষ" এ স্থলে গঙ্গা শব্দে "জলপ্রবাহ" না বুঝাইলেও "জলসন্নিহিত" এরূপ অর্থ বুঝায়, কাজেই কুশল ও গঙ্গা এই উভয় শব্দেরই লক্ষণায় মুখ্যার্থের সঙ্গে

কিছু সম্বন্ধ থাকেই। (৬) অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রবাহরূপে যে শব্দ যে অর্থ গৌণভাবে প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছে, সেই শব্দের সেই অর্থে রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি থাকে; কুশল শব্দের নিপুণরূপ লক্ষ্যার্থটি চিরপ্রসিদ্ধ। (৭) "গঙ্গায় ঘোষ" বলিলে ঘোষ গঙ্গার পাবনত্বাদিযুক্ত, এরূপ অর্থ বুঝায়; কিন্তু "গঙ্গাতটে ঘোষ" বলিলে পাবনত্বযুক্ততা বুঝায় না। "পাবনত্বযুক্ত ঘোষ" এরূপ অর্থ বুঝান প্রয়োজন হইলে "গঙ্গাতটে ঘোষ" না বলিয়া, "গঙ্গায় ঘোষ" বলিয়া গঙ্গা শব্দের জলার্থ সঙ্কোচ করিয়া তটার্থ বুঝাইতে হইবে। ইহাকে বলে প্রয়োজনজনিত লক্ষণা। (৮) গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ জলপ্রবাহবিশেষ, কুশল শব্দের মুখ্যার্থ কুশছেদক; গঙ্গাশব্দে গঙ্গাতট ও কুশলশব্দে নিপুণ বুঝাইলে এই দুই শব্দের মুখ্যার্থের বাধ হইল এবং অমুখ্যার্থ বুঝা হইল। "কর্ম্মে কুশল ও গঙ্গায় ঘোষ" এস্থলে কুশল ও গঙ্গাশব্দে কুশকাটা মানুষ ও জলপ্রবাহ বুঝাইলে বাক্যের কোন অর্থই হয় না; কর্ম্মের সময় কুশকাটা ও জলের উপর গ্রাম থাকা অসম্ভব। লক্ষণায় মুখ্যার্থের বাধ ও মুখ্যার্থের যোগ এই দুইটিই আছে।

(৯) মুখ্যার্থের বাধা হওয়াতে লক্ষণা হইল, শব্দের কোন বাধা হয় নাই, কাজেই লক্ষণা অর্থমূলক, শব্দমূলক নহে; তথাপি অর্থগত লক্ষণাকে শব্দগতরূপে নির্দ্দেশ করিয়া শব্দে আরোপ বা কল্পনা করা হয়।

(১০) সান্তরার্থনিষ্ঠ—মুখ্যার্থের বাধ ও যোগরূপ অন্তর বা ব্যবধান জনিত অর্থনিষ্ঠ শব্দ ব্যাপারকে লক্ষণা বলে।]

সসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থে স্বসমর্পণম্,
উপাদানং লক্ষণঞ্চেত্যুক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা।১০।

অনু। নিজ শক্যার্থ সিদ্ধির জন্য অশক্যার্থরূপ অন্য অর্থ উপস্থাপন এবং অশক্যার্থের জন্য নিজের শক্যার্থ পরিত্যাগকে যথাক্রমে "উপাদান লক্ষণা" ও "লক্ষণ লক্ষণা" বলে; বিশুদ্ধলক্ষণা এইরূপে দুই প্রকারই বটে। (বৃত্তির অনুবাদে ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

বৃত্তিঃ। কুন্তাঃ প্রবিশন্তি যষ্টয়ঃ প্রবিশন্তীত্যাদৌ কুন্তাদিভিরাত্মনঃ প্রবেশসিদ্ধ্যর্থং স্বসংযোগিনঃ পুরুষা আক্ষিপ্যন্তে তত উপাদানেনেয়ং লক্ষণা।

অনুবাদ। যদি বলা হয় "কুন্তাস্ত্রগুলি প্রবেশ করিতেছে," "যষ্টিগুলি প্রবেশ করিতেছে," (ক) তবে অচেতন কুন্ত ও যষ্টি প্রভৃতির প্রবেশসিদ্ধির জন্য কুন্ত ও যষ্টিসংযুক্ত পুরুষ প্রবেশ করিতেছে এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; তদবস্থায় কুন্ত ও যষ্টি স্বকীয় শক্যার্থ সিদ্ধির জন্য কুন্ত ও যষ্টি শব্দের অশক্যার্থ কুন্ত ও যষ্টি সংযুক্ত পুরুষকে লক্ষিত করিবে; কাজেই উপাদান

(ক) সংস্কৃতে এইরূপ প্রয়োগ অনেক আছে। "কুন্ত প্রবেশ করে" অচেতন কুন্ত স্বয়ং প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই মুখ্যার্থের বাধা ও যোগ এবং প্রয়োজন বশতঃ সচেতন পুরুষরূপ অন্য অর্থ উপাত্ত বা গৃহীত হইল বলিয়া ইহা উপাদান লক্ষণা।

বা উপস্থাপন মূলক বলিয়া এই লক্ষণাকে উপাদান লক্ষণা বলা হয়।

বৃত্তিঃ। গৌরনুবন্ধ্য ইত্যাদৌ শ্রুতি সঞ্চোদিতং অনুবন্ধনং কথং মে স্যাদিতি জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, নতু শব্দে নোচ্যতে, বিশেষ্যং নাভিধাগচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তির্বিশেষণে [illegible] ন্যায়াৎ ইত্যুপাদান লক্ষণা নোদাহর্ত্তব্যা।

নহ্যত্র প্রয়োজনমস্তি নবা রূঢ়িরিয়ং ব্যক্ত্যবিনাভাবিত্বাৎ তু জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে যথা ক্রিয়তামিত্যত্র কর্ত্তা, কুর্ব্বিত্যত্র কর্ম্ম, প্রবিশ পিণ্ডীমিত্যাদৌ গৃহং ভক্ষয় [illegible]।

অনু। যজ্ঞে "গো বধ করিবে" (১) এই বেদবিহিত সমস্ত গোজাতির বধ আমি যজ্ঞ কালে কিরূপে সাধন (২) করিতে পারি, যজমান এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করেন যে, শাস্ত্র মতে গো শব্দে গোজাতি বুঝাইলেও এ স্থলে গোজাতি দ্বারা গো ব্যক্তি (গোবিশেষ) অনুমিত (৩) হইয়াছে। (ইহা বুঝিয়া যজমান গো বিশেষকে বধ করিয়া আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া বেদের আদেশ পালন করেন)। গো শব্দ দ্বারা গোজাতিটি উক্ত এবং গোব্যক্তিটি অনুমিত হইয়াছে, গো শব্দ দ্বারা গোব্যক্তি কখনও উক্ত বা সঙ্কেতিত হয় (৪) নাই, কেন না শাস্ত্রে আছে শব্দের অভিধাশক্তি বিশেষণে (গোত্বাদি জাতি) বুঝাইয়াই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বিশেষ্যকে (ব্যক্তি) বুঝাইবে দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে না (৫)। লক্ষণা হইলেও "গো হন্তব্য" এই দৃষ্টান্তকে উপাদান লক্ষণার দৃষ্টান্ত বলা উচিত নহে (৬); কারণ উপাদান লক্ষণায় প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজন (৮) আবশ্যক, এ স্থলে তাহা নাই; কিন্তু জাতি ও ব্যক্তি মধ্যে অবিনাভাব (৭) বা তা-ছাড়া-তা-না-থাকারূপ ব্যাপ্তি আছে; তজ্জন্য জাতি দ্বারা ব্যক্তি অনুমিত হয় মাত্র। যেমন,—"কৃত" হউক বলিলে "কর্ত্তা," "করুন" বলিলে "কর্ম্ম", "প্রবেশ কর" বলিলে "গৃহ" "পিণ্ডীকে" বলিলে "ভোজন কর" ক্রিয়া অনুমিত হয়। (৯)

বিবৃতি। (১) *গৌরনুবন্ধ্যো...অগ্নিষোমীয় ইত্যাদি বেদবাক্যে যজ্ঞে গো বধ করিবে এরূপ বিধি আছে। এই বিধি যজমানের অবশ্য পালনীয়। (২) শব্দের শক্তি জাতিতে, ব্যক্তিতে নহে; শব্দ দ্বারা জাতি বুঝায়, ইহা বুঝান হইয়াছে; তদবস্থায় যজমানকে গো শব্দের অর্থানুসারে বেদের আদেশে সমগ্র গোজাতির বধ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা অসম্ভব; ইহা আলোচনা করিয়া যজমান গো শব্দে গোজাতিরূপ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া এবং গো শব্দে গো ব্যক্তি (গোবিশেষ) অনুমান করিয়া গোবিশেষ বধ করিয়াই কার্য্য সম্পাদন করেন। (৩) জাতি দ্বারা কিরূপে ব্যক্তির অনুমান হয় তাহা ৭ম ফুটনোটে দ্রষ্টব্য। (৪) শব্দের অর্থ জাতি, ব্যক্তি নহে। পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। (৫) জাতিকে (ধর্ম্ম বা) বিশেষণ বলে; ব্যক্তিকে বিশেষ্য বলে; জাতিরূপ বিশেষণ বা ধর্ম্ম যুক্ত না

হইলে ব্যক্তি অর্থশূন্য বা প্রাণহীন থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বুঝান গিয়াছে। শব্দের অর্থ জাতি বা বিশেষণ, কিন্তু ব্যক্তি বা বিশেষ্য নহে; কাজেই বিশেষণ বা জাতি বুঝাইলেই, শব্দের শক্তি বা কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তৎপর সেই শব্দ অশক্ত হইয়া পড়ে, তদবস্থায় বিশেষ্যকে বা ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবারও ক্ষমতা তাহার থাকে না, বিশেষ্যকে বুঝাইবে কিরূপে? অতএব গো শব্দ কেবল গোজাতিকেই বুঝায়, অনুমান দ্বারা গো ব্যক্তিকে বুঝিতে হয়। (৬) মণ্ডন মিশ্র শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বেদান্তী হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মী বা মীমাংসাদর্শনের মতাবলম্বী ছিলেন; তদবস্থায় তিনি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে "গো বধ করিবে" এই বেদবাক্য উপাদান লক্ষণা। মম্মটাচার্য্য তাহার কথা খণ্ডন করিলেন। (৭) অবিনাভাব—তা-ছাড়া তা-না-থাকা অথবা ব্যাপ্তি। অগ্নি ছাড়া ধূম থাকে না, এই জন্য ধূমে অগ্নির ব্যাপ্তি আছে। জাতি ছাড়া ব্যক্তি থাকে না, কাজেই জাতি ও ব্যক্তিতে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি আছে। কাজেই জাতি দ্বারা ব্যক্তি অনুমিত হয়। (৯,) যেমন বাক্যে ক্রিয়া ও কর্ম্মাদির আক্ষেপ হয়, সেইরূপ জাতিদ্বারা ব্যক্তি আক্ষিপ্ত হয়। কর্ত্তা ও ক্রিয়াদির আক্ষেপকে মহাভাষ্যকার বাক্যৈকদেশ প্রয়োগ বলে। (৮) "কুন্ত সকল প্রবেশ করে" এই উপাদান লক্ষণামূলক বাক্যে মনুষ্যের বাহুল্য জ্ঞাপনরূপ আবশ্যকতা আছে; কিন্তু গোজাতি দ্বারা গো ব্যক্তি বুঝাইবার তাদৃশ কোন প্রয়োজন নাই; কুশলাদি শব্দ যেমন নিপুণাদিরূপ অর্থে বহুকাল যাবৎ প্রসিদ্ধ, গো শব্দ সেরূপ গোজাতি ভিন্ন অন্য অর্থে প্রসিদ্ধ নহে; জাতি দ্বারা ব্যক্তি বোধ স্থলে প্রয়োজন বা প্রসিদ্ধি থাকে না; কাজেই উহা উপাদান লক্ষণা নহে। অর্থাৎ মণ্ডনমিশ্রের ভ্রম হইয়াছিল।

বৃত্তিঃ। পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যত্র চ রাত্রিভোজনং ন লক্ষ্যতে শ্রুতার্থাপত্তের্বা তস্য বিষয়াৎ।

অনু। কেহ কেহ বলেন, "পীন অর্থাৎ স্থূল দেবদত্ত দিনে ভোজন করেন না" এইরূপ বাক্য ও উপাদান লক্ষণার দৃষ্টান্ত; কেন না, উক্ত বাক্যে লক্ষণাদ্বারা বুঝায় যে, দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা লক্ষণা নহে। ইহা শ্রুতার্থাপত্তি বা অর্থাপত্তির বিষয়।

বিবৃতি। কেহ কেহ বলেন "দিনে ভোজন করে না, অথচ পীন" এরূপ বাক্যে বুঝায় লোকটা রাত্রিতে ভোজন করে। নতুবা স্থূল কেন? স্থূলত্ব প্রতিপাদনরূপ প্রয়োজন ও দিবা-ভোজন-না-করা-রূপ মুখ্যার্থ-যোগ-বশতঃ উহা উপাদান লক্ষণা। বৃত্তিকার বলেন উহা লক্ষণা নহে। কোন শব্দ শ্রুত হইয়া স্বয়ং অর্থ প্রকাশে অনুপযুক্ত হইয়া শব্দান্তর কল্পনা করাইলে শ্রুতার্থাপত্তি হয়। যেমন কপাট বলিলে, "কপাট-দেও" পূরণ করিতে হয়। ইহা শ্রুতার্থাপত্তি

নামক প্রমাণের দৃষ্টান্ত। যেখানে শ্রুত বা জ্ঞাত কপাটাদি-অর্থ দেওয়া রূপ অন্য অর্থ কল্পনা করায়, তখন অর্থাপত্তি হয়। ইহাকে যথাক্রমে শব্দাধ্যাহার এবং অর্থাধ্যাহারও বলে। বৃত্তিকার বলেন, পীন দেবদত্ত দিবা ভোজন করে না বলিলে, তাহার পক্ষে যে রাত্রি ভোজন বুঝিয়া লইতে হয়, উহা লক্ষণার ফল নহে; হয় বর্ণিত শ্রুতার্থাপত্তি অথবা অর্থাপত্তির ফল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার রায়।

বীরাঙ্গনা।

(রাণা যশোবন্ত সিংহের মহিষী।)

কি বলিলি?—স্বামী মোর সমর না হ'তে শেষ,
এসেছে ফিরিয়া?
জ্যোতির্ম্ময় সমতুল, আমার শ্বশুর কুল,
বিজেতা সে কুলে আজ কলঙ্ক ভরিয়া?
শোণিতে পোষিত যাঁরা, সমরে আপনাহারা,
যাঁদের খেলার সাথী ধনুঃ অসি বাণ,
বিহীন মমতা মোহে, নিষ্কম্পনির্ব্বাতদেহে,
ডেকে নিতে পারে বুকে মৃত্যুর সন্ধান,
ত্যজি প্রেয়ঃ রণসঙ্গ, দিয়া আজ পৃষ্ঠভঙ্গ,
সে স্বামী করিছে মোর নগর প্রবেশ,
দূতি! সমর না হ'তে শেষ?

অদূরে কি উঠে অই তাঁহারি মঙ্গলধ্বনি—
ধরা বিদারণ?
অক্ষত বীরের তনু, এক ফোটা এক অণু,
হয়নি শোণিত দেহ হ'তে নিক্রামণ,
থাকিতে মুকুট শিরে, খরশাণ অসি করে,
না হ'তে আহত-বক্ষ-শোণিত-প্লাবন,
শরীরে থাকিতে প্রাণ, কুলের ত্যজিয়া মান,
রাজপুত বীর করে রণে পলায়ন?
হীন পুরুষের মত, বীরবর দেবব্রত,
স্বামী মোর করে অই নগর প্রবেশ,
দূতি! সমর না হ'তে শেষ?

বীরের ঘরণী আমি, জনম ক্ষত্রিয় কুলে,
বীরের কুমারী,
নির্ব্বাক নিস্তেজ প্রাণে, আমি কি শুনিব কানে,
পলাতক পতি মোর আসিয়াছে ফিরি?
বাহুতে থাকিতে বল, প্রজ্বলিত চিতানল,
"জহরে" কি দীক্ষা মোর হয়নি স্মরণ?
হৃদয়ের হাড় মাস, এ কি আলস্যের দাস,
ক্ষত্রিয় কুমারী আমি ডরি কি মরণ?
আর্য্যকুলবীরগণ, সবে কি ভুলিছে রণ,
নিলাজের মত করে নগর প্রবেশ,
দূতি! সমর না হ'তে শেষ?

জাগ্রত কেশরী কি গো হেয় শ্বাপদের মত
হারাবে চেতনা?
জড়ত্বের করি স্নান, সহি ঘৃণা, অপমান,
ক্ষত্র কি ভুলিবে তার কুলের সাধনা?

আমরা বীরের বংশ, হইব নির্ম্মূল ধ্বংস,
এ বক্ষ হইতে দিব রুধির চিড়িয়া,
তবু কি ভীরুর মত, সমর-অঙ্গন-স্থিত,
বীরের চরণ কভু পড়িবে টলিয়া ?

ছি! ছি! নির্জ্জীবত্ব ঘোর, বল্‌গে রাণায় মোর
ক্ষত্রধর্ম্মে অবিদিত নগর প্রবেশ,
দূতি ! সমর না হ'তে শেষ।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

সংস্কৃতশিক্ষাবিষয়ক বিষয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রবন্ধ লিখিয়া লোকের প্রশংসাভাজন হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। প্রশংসা লাভের সহিত প্রবন্ধের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের নিয়ত সম্বন্ধও নাই। কারণ পাঠকগণের চিত্ত যে ভাবে পরিণত হইয়াছে, তদনুরূপে প্রবন্ধ প্রণীত হইলে, উহা তৎকালে প্রশংসার বিষয় হয়, আবার পাঠকের চিত্তের অবস্থান্তর উপস্থিত হইলে, সেই আদৃত পূর্ব্ব প্রবন্ধকে অনাদরে উপহত হইতে দেখা যায়।

একটি উদাহরণ দ্বারাই বোধ হয় উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইবে। যথা,— একসময় এতদ্দেশীয় পণ্ডিতসমাজে কিরাতার্জ্জুনীয় অপেক্ষা শিশুপালবধ, শিশুপালবধ অপেক্ষা নৈষধচরিত উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণিত হইত। ঐ কাব্যত্রয় যথাক্রমে ভারবি, মাঘ ও নৈষধ নামে প্রসিদ্ধ। তৎকালের আভাণক এই—

"তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্ মাঘস্য নোদয়ঃ।

মাঘের অর্থাৎ শিশুপালবধ রচয়িতার উদয় না হওয়া পর্য্যন্তই ভারবির অর্থাৎ কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যপ্রণেতার প্রভা দীপ্তি পায়।

আর একটি আভাণক এই—

উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ কচ ভারবিঃ।

নৈষধ কাব্য উদিত হইলে, মাঘই বা কোথায়, ভারবিই বা কোথায়।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, ইদানীন্তন সিদ্ধান্ত এই যে, নৈষধ অপেক্ষা মাঘ এবং মাঘ অপেক্ষা ভারবি উৎকৃষ্ট।

প্রাগুক্ত কাব্যত্রয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল পাঠকের চিত্তের প্রকারান্তরে পরিণতি বা গতানুগতিকতার প্রবাহবিপর্য্যয়ে একসময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টে এবং সর্ব্বনিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টে পরিণত হইতে হইয়াছে। ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। অতএব প্রশংসাভাজন হইতে হইলে, প্রবন্ধকারদিগকে শ্রোতৃচিত্তের অনুবর্ত্তী হইতে হয়। কিন্তু শ্রোতৃচিত্তের অনুবর্ত্তী লেখকগণই বাস্তবিক প্রশংসার্হ, ইহা অন্ততঃ আমার

মত নহে। ঋষিক্ষুণ্ন পদ্ধতিও ইহা নহে। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ লোকের শ্রেয়োবাদী ছিলেন, কখনও প্রেয়োবাদীরূপে প্রশংসা লাভ করিতে অভিলাষ করিতেন না। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে শ্রোতৃচিত্তানুবর্ত্তী নূতন নূতন সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক-রূপ ব্যক্তিকরগণের নিকট তাঁহারা আত্মা-রাম সরকার হইয়া পড়িয়াছেন। আমার বিবেচনায় এইরূপ আত্মারাম সরকার হওয়াও শ্লাঘ্য; শ্রোতৃচিত্তানুবর্ত্তনে লোকহিতকর স্বাভিমতসিদ্ধান্তের ব্যত্যয় করিয়া প্রশংসা লাভ করা উচিত নহে।

ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।

প্রবন্ধলেখকরূপ অনুজীবিগণের সমাজ-রূপ প্রভুকে বঞ্চনা করা অকর্ত্তব্য। প্রকৃত-মনুসরামঃ।

ইদানীং শিক্ষিত সভ্যসমাজ মৌলিকধর্ম্মে প্রায়ই আস্থাবিহীন, তাঁহারা অনেকেই সংগ্রহের অনুবর্ত্তী। কেহ রাজা রামমোহন রায়ের, কেহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কেহ বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মসংগ্রহের অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই সকল সং-গ্রহে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই দুই চারি দশ কথা আছে। কেহ কেহ আবার এই সকল সংগ্রহের বড় ধার ধারেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্বয়-কৃত ধর্ম্মসংগ্রহ আছে। বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, বিশেষ এই যে শিষ্যের নিতান্ত অভাব।

এদেশে ধর্ম্মের ন্যায় পাঠ্য পুস্তকেও সংগ্রহেরই প্রাদুর্ভাব। মৌলিকতা বিলুপ্ত প্রায়। ইংরেজি ও বাঙ্গালা সাহিত্যেরই যখন এই দশা, তখন সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক গ্রন্থের আদর হইবে, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। এই নিমিত্ত নিম্নশ্রেণীর জন্য কত প্র-কার সংস্কৃত সংগ্রহই প্রণীত হইতেছে, তা-হার ইয়ত্তা নাই। উচ্চশ্রেণীতে কোন কোন মৌলিক গ্রন্থ পঠিত হয় বটে—কিন্তু তাহাতেও নূতন গ্রন্থকারদিগকে কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান করা হয় না। নূতন গ্রন্থের একান্ত অভাব বলিয়া এই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে—ইহা বলা সুসঙ্গত মনে করি না। বিবেচনাপূর্ব্বক "বাসুদেব বিজয়" "সতীপরি-ণয়" প্রভৃতির অংশ বিশেষকে মধ্যে মধ্যে পাঠ্য করিলে, ছাত্রদিগের সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাঘাত হয়—এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে ঐসকল গ্রন্থের প্রণেতৃগণকে উৎসাহ প্রদান করিলে ক্রমে সংস্কৃত রচনার উৎকর্ষ সাধিত হইত, তাহার সন্দেহ নাই।

বাবুরা বলেন সংস্কৃত ভাষার মৃত্যু হই-য়াছে, এইক্ষণে আর সংস্কৃত রচনার উৎকর্ষ সাধন করা অসম্ভব। এই অবস্থায় কালি-দাস ভবভূতিপ্রভৃতি মহাকবিগণের গ্রন্থ পাঠ্য করাই কর্ত্তব্য। তাহা পরিত্যাগ ক-রিয়া অপরীক্ষিত নূতন গ্রন্থ পাঠ্য করিবার প্রয়োজন কি?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তই সমালো-চনার বিষয়। সংস্কৃতভাষার মৃত্যু হইয়াছে—

ইহার অর্থ কি? ভারতবর্ষে বা বঙ্গদেশে উহার ব্যবহার বিলোপ হইয়াছে—ইহা সত্য নহে। কারণ এখনও এইদেশে অনেক-ব্যক্তিকে প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা, স্তব ও কবচ পাঠের নিমিত্ত, প্রত্যহ যতগুলি সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, বাঙ্গালা বা হিন্দি ভাষার ততগুলি বাক্য প্রয়োগকরা তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হয় না। যদি বল মাতৃভাষারূপে অস্তিত্ব বিলোপই ভাষার মৃত্যু, তবে সংস্কৃত ভাষার তদ্রূপে দেহত্যাগ হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহের গন্ধও নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু এইপ্রকার মৃত্যু তাহার রচনার উৎকর্ষ সাধনের প্রতিবন্ধক কি না? ইহাই এইক্ষণ বিচার্য্য বিষয়। পরন্তু, এই বিচার করিবার পূর্ব্বে, কোন্ সময় সংস্কৃত ভাষার এইপ্রকার তনুত্যাগ ঘটিয়াছে, তাহা অবধারণ করা আবশ্যক।

শিবধর্ম্মে গুরুর লক্ষণ লিখিত আছে,—
সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ,
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সগুরুঃ স্মৃতঃ।

যিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত বাক্যদ্বারা কিংবা দেশভাষাদি উপায়ে শিষ্যকে অনুরূপ উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাকে গুরু বলে। এই সময়ে প্রাকৃতভাষা ও দেশভাষাদ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ পাইত, ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই প্রাচীন কালেই সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষারূপ কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাটক রচনার প্রণালী ও দ্বিজ কুমার ও কুমারীগণের শিক্ষা বিধির বৈষম্যদ্বারা অনায়াসে অনুমিত হয় যে, দ্বিজমহিলাগণের মধ্যেই প্রথম প্রাকৃত ভাষার প্রাদুর্ভাব হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, শিবধর্ম্মের সময় নির্দ্দেশ করা দুষ্কর।

কিন্তু রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক নিবন্ধকারগণ উহার বচন-প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা ইহার প্রাচীনত্ব অনায়াসে অনুমিত হয়।

মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন নাটক। উহার তৃতীয় অঙ্কে বিদূষক বলিতেছেন,—

মমদাব দুবেহিং জেব্ব হস্সং জাঅদি। ইত্থিআএ সক্কঅং পঠন্তীএ, মনুস্সেণ অকাঅলীং গা অন্তেণ। ইত্থিআদাব সক্কঅং পঠন্তী দিন্নণবনস্সাবিঅ গিট্টী অহি অং সুসুআ অদি।

আমার দুই কারণে হাস আসে। প্রথম কারণ স্ত্রীলোকে সংস্কৃত পাঠ করে। দ্বিতীয় কারণ পুরুষ কাকলী গানকরে। প্রথমবৎসা-ধেনু নূতন নাসিকারজ্জু প্রদান করিলে যে প্রকার শব্দ করে, স্ত্রীলোকের সংস্কৃত পাঠও তদ্রূপ অনুভূত হয়। উল্লিখিত নাটকাংশ-দর্শনে প্রতীয়মান হয় মৃচ্ছকটিক নাটক যখন প্রণীত হইয়াছে, তখন সংস্কৃত ভাষার প্রাগুক্ত দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকের সময় যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করা দুরূহ হইলেও, ইহা যে অতি প্রাচীন নাটক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রণেতা শর্ব্ববর্ম্মা অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। তাহার সময়ে পাণিনি

ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষ প্রামাণ্য লাভ করিয়াছিলেন না। শর্ব্ববর্ম্মা অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ, করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এই প্রকারে কারকের নির্দ্দেশ করিয়া "তেষাং পরমু ভয়প্রাপ্তৌ"(২।৪ ১৬) যুগপৎ উভয় কারক প্রাপ্ত হইলে পরকারকের বিধান করিয়াছেন। পাণিনি "করণ" কারকের পর অধিকরণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পরকারকের বিভক্তি বিধায়ক কোন সূত্রও প্রণয়ন করেন নাই। ভুজ ধাতুর উত্তর লিট্ করিলে পাণিনির মতে "বভুজে" পদ হয়। শর্ব্ববর্ম্মা—"ভুজঃস্বরাৎস্বরে দ্বিঃ। ৪। ৮। ১০" এই বিশেষ সূত্র বিধানদ্বারা "বভূজ্জে" পদ সাধন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দুর্গাসিংহ "আদ্যব্যাকরণমতমেতৎ" বলিয়া "বভূজ্জে" পদের সমর্থন করিয়াছেন। এই আদ্য ব্যাকরণ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কবিগণ শার্ব্ববর্ম্মিক পদ ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা পাণিনির অনুবর্ত্তী ছিলেন না।

এইজন্য বর্দ্ধমানমহামহোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—"বিশেষঃ পাণিনেরিষ্টঃ সামান্যং শর্ব্ববর্ম্মণঃ। সামান্য মনুগৃহ্লাতি তত্রাচার্য্যপরম্পরা।" পাণিনি স্বকীয় সমাস ব্যবস্থাকে স্বয়ংই লঙ্ঘন করিয়াছেন যথা—

জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ। ১। ৪। ১০। তৎপ্রযোজকোহেতুশ্চ। ১। ৪। ৫৫।

জনিকর্ত্তুঃ তৎপ্রযোজকঃ—এইপদদ্বয়ে "তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি"। ২। ২। ১৫। সূত্রানুসারে সমাস প্রতিষিদ্ধ। মহোমহোপাধ্যায় ভর্ত্তৃহরি ব্যভিচারপূর্ণ বলিয়া পাণিনির। ২। ২। ১৫ সূত্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীর সমাস নিষেধক সূত্র শর্ব্ববর্ম্মার ব্যাকরণে নাই। "ন নির্দ্ধারণে, (২।২।১০) সূত্রদ্বারা পাণিনি উহা নিষেধ করিয়াছেন। শর্ব্ববর্ম্মার ঐরূপ সূত্র না করিবার গূঢ়কারণ বোধ হয় এই যে, পুরুষাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরঃ—ক্ষত্রিয় ইতর পুরুষ ব্যাবৃত্ত শূরত্ববিশিষ্ট এই অর্থে পুরুষক্ষত্রিয়ঃ শূরঃ এইরূপ সমাস হইতেই পারে না। কারণ, পুরুষ ও ক্ষত্রিয় পদ অসমর্থ। নরোত্তম ক্ষত্রিয়বর্য্য প্রভৃতির ন্যায় পুরুষশূরঃ ক্ষত্রিয়ঃ এইপ্রকার লৌকিক প্রয়োগ অনুমোদনীয়।

বিশেষণীভূতকালবাচক শব্দের উত্তর পাণিনি সপ্তমী বিধান করেন নাই। শর্ব্ববর্ম্মা "কাল ভাবয়োঃ সপ্তমী।" ২। ৪। ৩৪। সূত্রদ্বারা উহার বিধান করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন পাণিনি ব্যাকরণেও অভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি এই সপ্তমী বিধানের সমর্থন করিয়াছেন। যথা—অত্র চ বৈদিকক্রিয়া নিমিত্তস্য কাল বিশেষস্য শুচিতৎকালজীবিত্বেন অধিকারিবিশেষণস্যাপ্তে যা সপ্তমী সা নাধিকরণে যো জটাভিঃ সভুঙ্‌ক্তে ইতিবৎকালস্য বিশেষণত্বেন তৃতীয়া প্রাপ্তেঃ, কিন্তু কালভাবয়োঃ সপ্তমী ইত্যনেন তদ্বাধিকা পুনঃ সপ্তমী বিধীয়তে "শর দি পুষ্পন্তি সপ্তচ্ছদা" ইতিবৎ।

শুচি ও তৎকালজীবী ব্যক্তি কার্য্য করিবেক—এই বিধি অনুসারে "অমাবাস্যায়াং অমাবাস্যয়া যজেত"—ইত্যাদি বৈদিকক্রিয়ার নিমিত্ত অমাবাস্যাদিকাল কর্ত্তার বিশেষণ। উহার উত্তর অধিকরণে সপ্তমী হয় নাই যো জটাভিঃ স ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদির ন্যায় বিশেষণে তৃতীয়ার প্রাপ্তি ছিল। কালভাবয়োঃ সপ্তমী এই সূত্রানুসারে তথায় বিশেষণে সপ্তমী হইয়াছে—যেমন "শরদি পুষ্পন্তি সপ্তচ্ছদাঃ" ইহা দ্বারা দৃষ্ট হয়—শর্ব্ববর্ম্মা পাণিনির অনুবর্ত্তী ছিলেন না।

এক কাত্যায়নই পাণিনির ও কাতন্ত্রের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন। পাণিনির বার্ত্তিক ও কাতন্ত্রের কৃৎপ্রকরণ কাত্যায়নপ্রণীত। অথচ কাত্যায়ন পাণিনির সহাধ্যায়ী, ইহা কথাসরিৎসাগরে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধরভট্টাচার্য্যের ন্যায়, পাণিনি ও শর্ব্ববর্ম্মার এই প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্য ছিল যে একের বৃদ্ধদশায় অপরে যৌবন স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতেন। অথবা উভয়েই সমবয়স্ক। গ্রন্থপ্রণয়নে পাণিনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন।

এই কাত্যায়ন (বররুচির) ভার্য্যা পতিব্রতা তেজস্বিনী বিদুষী উপকোশাদেবীকে মহারাজ নন্দ ধর্ম্মভগিনী বলিয়া সম্মান করিতেন। সুতরাং নন্দরাজ্য কালে কাত্যায়ন, পাণিনি, শর্ব্ববর্ম্মা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা এতদ্দেশীয় সিদ্ধান্ত।

এত বহু দিনের কথা—কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের টীকায় শ্রীধরস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহারাজ পরীক্ষিতের পর ১৪৯৮ বৎসর গত হইলে নন্দরাজ্য প্রাদুর্ভূত হয়—যথা "বস্তুতস্তু পরীক্ষিন্নন্দয়োঃ রন্তরং দ্বাভ্যাং ন্যূনং বর্ষাণাং সার্দ্ধ সহস্রং ভবতি।

এই প্রাচীনকালেও সংস্কৃত মাতৃভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। ইহা বৃহৎকথার প্রণেতা মহাকবি গুণাঢ্য শর্ব্ববর্ম্মার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হয়। যথা,—

ষড়্‌ভির্মাসৈস্ত্বয়াদেবঃ শিক্ষিতশ্চেত্ততো
ময়া সংস্কৃতং প্রাকৃতং তদ্দেশভাষাচ সর্ব্বদা
ভাষাত্রয় মিদং ত্যক্তং যন্মনুষ্যেষু সম্ভবেৎ।

শর্ব্ববর্ম্মন্, তুমি যদি ছয় মাসে মহারাজকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে পার, তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা পরিত্যাগ করিব। মনুষ্যের ব্যবহারে এই ভাষাত্রয়ই সম্ভব।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট অনুভূত হইতেছে মহারাজ নন্দ এবং সাতবাহন প্রভৃতি প্রাচীন নৃপতিগণের সময়ও সংস্কৃত মাতৃভাষা ছিল না। তদানীন্তন নারীগণ অবস্থা বিশেষে প্রাকৃত ভাষা বা দেশভাষা ব্যবহার করিতেন। সুতরাং মাতৃভাষা নয় বলিয়া সংস্কৃতভাষাকে মৃত বলিলে বহু দিন হইল তাহার এই মৃত্যু ঘটিয়াছে। এবং উহার এই মৃতাবস্থায় লিখিত প্রবন্ধ অনুপাদেয় হইলে, পাণিনি হইতে পদ্মনাভদত্ত পর্য্যন্ত, কুমারিলভট্ট হইতে গদাধর ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত, জীমূতবাহন হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত, শূদ্রক হইতে মুরারি পর্য্যন্ত, কালিদাস হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত সমুদায় গ্রন্থকারের গ্রন্থ পরি-

ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের গৌরবও বিলক্ষণ রক্ষা পায়।

পুরাণশাস্ত্রে শ্রুত আছে বেণরাজার এবং নিমিরাজার মৃতাবস্থায় মহাত্মা পৃথু এবং জনক নামে যশোধর এবং বংশধর সুসন্তান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার মৃতাবস্থায় বহু যশস্কর গ্রন্থসন্তান প্রসূত হইয়াছে; অতএব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের এবং মহারাজা ও জমিদারগণের উৎসাহ পাইলে এখনও সুন্দর সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণীত হইতে পারে। মহর্ষিগণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ এখনও প্রতিভাহীন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার।

ছাত্রজীবনের সহিত ধর্ম্মজীবনের সম্বন্ধ

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ চারিমাস পদ্মানদীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিয়া ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থার সুন্দর চিত্র হৃদয়ে জাগিল। দেখিলাম সে দিন কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে; ধর্ম্মসরিতে চড় বাঁধিয়াছে। কল্লোলিনীর বেগ মন্দ হইয়া পড়িয়াছে; অখণ্ড স্রোত খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। সে কর্ণানন্দি কুলু কুলু মঙ্গল হুলুধ্বনিও আর নাই; সে আবেগময় উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গও নাই।

দেখিয়া এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইলাম যে সরিৎ সমভূমিতে প্রবেশ করিলে, অমনি বেগহারা হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মও তদ্রূপ সাম্যরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দগতি ও খণ্ডগতি ধারণ করিয়াছে। এখন যোগী ভোগী সমান; বৈষ্ণব লম্পট সমান। সত্য মিথ্যার সমান মর্য্যাদা; অধিকার, অনধিকারের বিচার নাই। টপ্পা আর গীতায়—ভূত আর ভগবানে—ভস্মমাখনে মাখামাখি। প্রতীচ্যের তনুতে প্রাচ্যের মুণ্ডসংযোগ ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। গৌড়ীয় প্রকৃতি ভাবে পুরুষকার প্রবেশ করিয়া নানাগত সৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

আর একটা কথা, বেলায় তরঙ্গের ন্যায়, হঠাৎ অন্তরে লাগিল, তাহা এই,—সরিদ্বরা পাষাণময় পিত্রালয়ে অতীব নির্ম্মলা ও চঞ্চলা। পতিগৃহাভিমুখে—সাগরপানে—যতই অগ্রসর, ততই মলিনা, পঙ্কিলা; সে চাঞ্চল্য থাকে না, গতির প্রখরতাও থাকে-না। অবশেষে মাধুর্য্য হারাইয়া লোণা হয়, স্থির হয়। "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ভগবান্ এই উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়া যখন যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও

স্রোতস্বতীর ন্যায় নীচ জলে পতিত হইয়া মলিনিত ও বিকৃত হইয়াছে। সাম্যের নিন্দা ও অসাম্যের স্তুতি এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে "বংশে ছিদ্র করিলে বংশী।" নিশ্ছিদ্র বংশ সুমধুর বাজে না,—অমৃত বর্ষণ করে না; সেইরূপ অসাম্য বা অনধিকারিত্বের অধিকার না থাকিলে ধর্ম্মের ধ্বনি ফোটে না, সুধার ধারাও ছুটে না। সাম্যবাদ ছাত্রজীবনের অবনতির বীজ।

ক্ষীরোদে অমৃত ছিল, মন্থন বিনা দেবগণ পান নাই, ক্ষীরে নবনী আছে মন্থন বিনা কেহ কখন পায় না। মন্থনই জীবের সাধন বা কর্ম্ম। দুগ্ধে নবনীবৎ প্রকৃতিতে পুরুষ বিরাজ করেন; দেহে আত্মা বিরাজ করেন। "কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।—কোন২ ভাগ্যবান্ মথিয়া ভখয়।"

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" অথচ দেখে না, কারণ মন্থন করিলেই সে মাধুর্য্য রসঘনের আবির্ভাব হয়।

সূর্য্যের সম্মুখে সূর্য্যকান্তমণি ধরিলে যেমন ক্রমশঃ উহা ঘন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, তদ্রূপ হৃদয়কেন্দ্র লক্ষ্য ঠিক হইলে, অন্তর্জ্যোতির মধুময় উৎস ফোটে বা ঘনমূর্ত্তি ধারণ করে। এই ঘনমূর্ত্তি শুদ্ধানুভূতি—সাকার বাচ্য। উহাই জ্ঞানীর জ্ঞানঘনামৃত, ভক্তের উজ্জলরসশ্রী। বৃক্ষের মূলে যে বীজ, ফলে ফলে সেই বীজ বিরাজ করে। বিশ্বতরুর মূলে যে বীজ—পরমাত্মা, এই বিশ্বতরুর ফলরূপী জীবে জীবে সেই বীজের—আত্মারই লীলা। সেই আত্মা—মধু, দেহ বা সংসার—মধুচক্র। বন্ধুগণ, তোমরা মধুচক্রে ভয় কর, মক্ষিকার দংশনবিষ ভয়ে সন্ত্রাসিত হইয়া পলাইতেছ; কিন্তু জান ত, উহার ভিতরে মধু আছে। উহার গর্ভে মক্ষিকা নাই, দংশনও নাই। উহার বাহির দুঃখময়, অন্তর সুখময়। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।" ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত জীবমণ্ডলী, মৌমাছির সহিত যুদ্ধ কর, ধীরতার গাণ্ডীব ধারণ কর, নিশ্চয় জয়লাভ করিয়া মধুভাণ্ডের অধিকারী হইবে। কর্ম্ম করিয়া বিষয়ের অন্তঃস্তরে ডুবিয়া যাও। "তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।"—এই গেল জীবের লক্ষ্য, সুতরাং কর্ম্ম।

এই কর্ম্ম না করাই পতনের মূলীভূত কারণ। আর কর্ম্ম করাই প্রতীকারের একমাত্র বিশুদ্ধোপায়। ছাত্রজীবন আবার ভবিষ্যজীবনের ভিত্তিস্বরূপ। আদৌ ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য পালন জীবনব্যাপি, এমন কি, অনন্তজীবনব্যাপি মঙ্গলের নিদান। ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যাবধারণ এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য—যাহার করণে উন্নতি, অকরণে অবনতি।

১। তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর লোক শুদ্ধ অর্থের জন্যই কর্ম্ম করে, তাহাদের সমস্তই নষ্ট। একশ্রেণীর লোক অর্থের জন্য কর্ম্ম করে, ধর্ম্ম মাত্র আনুষঙ্গিক; তাহাদের কর্ম্ম দুষ্ট (দূষিত)। আর এক শ্রেণীর লোক শুদ্ধ

ধর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করে, তাহাদের সমস্তই ইষ্ট। ধর্ম্মজীবনের গঠন যদি শিক্ষার সার-উদ্দেশ্য হয়, উহাই প্রকৃত শিক্ষা। বৃক্ষের গোঁড়ায় জল ঢালিলে যেমন শাখা, প্রশাখা, পত্র, ফুল, ফল সকলেরই 'বিকাশ' ঘটে, তদ্রূপ ধর্ম্মের গোঁড়ায় জল ঢালিলে উদ্দেশ্যমাত্রেরই পরিপুষ্টি হয়। ধর্ম্মই সকল উদ্দেশ্যের গোঁড়া। তুমি বিদ্যাভ্যাস কর কেন? —না, অমুক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অমুক চাকরী পাইবে, এবং ধনী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু চেয়ে দেখ, তুমি তৎপ্ররোচনায় মত্ত হইয়া, স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, সুখের মূল স্বাস্থ্যকে ডুবাইয়া দিলে; বয়ঃক্রমের অল্পতার পোষকতায় মিথ্যা নিদর্শন উপস্থিত করিলে; পরের কাগজ চুরি করিয়া কৃতকার্য্য হইলে। মুখে মাত্র শিক্ষায় প্রেম করিলে, কিন্তু বস্তুতঃ পাপকে আলিঙ্গন করিয়া চিরশান্তিসুখের ভিত্তিস্বরূপ চরিত্র কলঙ্কিত করিলে। সত্যের জন্য যে হৃদয়ের বল, তাহাকে বলি দিলে। দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া আর কত দূর অগ্রসর হইবে? হৃদয়ের বল, শারীরিক বলের বলোদ্দীপক তাহাতে বঞ্চিত হইয়া, সাহস উদ্যমে জলাঞ্জলি দিয়া, আলস্য ও নৈরাশ্যের কোলে শয়ান হইলে। কুসুমের বৃন্ত কীট-দষ্ট হইলে, দলের স্ফূর্ত্তি আর কতক্ষণ থাকে। পরীক্ষার্থী পরীক্ষ-[illegible]রা [illegible] "পরীক্ষাপাশ" তক্ষক হইয়া [illegible] নদীর [illegible] সেই বিষাচ্ছন্ন ছাত্র অবনতি[illegible]নের কোন[illegible] যায়! কারণ সে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। ঈশ্বরবিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, মধুচক্রের মধুপানে প্রণোদিত হইয়া, যে কর্ম্ম করে, সে অবশ্যই সাফল্যদেবীর পদপ্রান্তে পৌঁছিতে পারে।

২। মাতৃহারা শিশুর আর অভিভাবকশূন্য ছাত্রের দশা এক। মাতৃস্তনাবানিঃসৃতা [illegible]ধারায় আপ্লাবিত মণিকর্ণিকার ঘাট যে মাতৃক্রোড়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে শিশু প্রায়ই শিব হইতে পারেনা; বরং মোহবশে ব্যাস-কাশীতে পদার্পণ করিয়া গাধা হয়। অভিভাবকের অভাবেও ছাত্রবৃন্দ কুপথগামী হইয়া অমানুষ হয়। বাতাস লাগিলে পাকা আম যেমন বুড়্ বুড়্ পড়িয়া যায়, কোন্ বাতাসে জানি ছাত্রও মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে। ব্যয়ভার অভিভাবকের হস্তে না থাকিলে, অল্পদিনের মধ্যেই বালকগণ অমিতব্যয়ী হইয়া দাঁড়ায়। কারণ স্বাধীনতাবশে কিছু কিছু ব্যয় করিতে করিতে লোকের ব্যয়ের নেশা জন্মে; দুদিন পরে আর মাত্রা ঠিক থাকে না।

সহর বিলাসের রঙ্গভূমি, প্রলোভনের প্রদর্শনী। শাসনাভাবে কত ছাত্র কেবল মিঠাই খাইয়া ঋণের দায়ে চম্পট দিয়াছে; চুরি না করুক, চুরির দিকে মনে মনে ঝুঁকিয়াছে। এই তো জীবনের উন্নতি। পোষাকের ছটা বিকীর্ণ হইলে, তদালোকে প্রমোদকানন বিলাসভবন, মনের চক্ষে উদ্ভাসিত হয়। উহা এক বৈদ্যুতিক খেলা।

পোষাকের পারিপাট্য দর্পণের স্বচ্ছতার ন্যায়। উহাতে যুবক অতৃপ্তনয়নে ঘন ঘন

নিজমূর্ত্তি লক্ষ্য করিতে থাকে। পোষাক পরিধানে, পোষাকের যত্ন করণে, এবং "দেখি কেমন দেখায়" এই ভাবনায় বালকের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। সুযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের অভাবে অনেক বালক তদ্ভিন্ন স্বভাববিরোধিনী রীতি অবলম্বন করিয়া পৈশাচিকযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করে। কি ভীষণকাণ্ড! জঘন্য কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া আত্মবলিদানাপেক্ষা আর অবনতি কি আছে? এবংবিধ দারুণ বিষফল স্বাধীনতা তরুতেই ফলে।

৩। বস্তুতঃ ইদানীং বালকগণের স্কন্ধে যে ভূত চাপিয়াছে, সে ভূত বিতাড়িত করিতে সমর্থ এমন ওঝা দুর্ল্লভ। মন্ত্রে বিন্দুমাত্র আস্থা নাই, সে কথা দূরে থাকুক, বস্তুভেদে যে ক্রিয়াভেদ—গুণভেদ, তাহাও মানিতে কুণ্ঠিত। সুতরাং খাদ্যাখাদ্যের বিচারটা প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। বলিতে কি, স্বয়ং বিচার শক্তিই যেন নবীন সম্প্রদায়ের হৃদয়-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বালকগণ নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করিয়া,—পাঠাবস্থায় মাংস পলাণ্ডু আদির বুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া, মূলে শিক্ষার ঘানি মস্তিষ্কের বিকার ঘটাইতেছে। তরুণ তরুর মূলে কুঠারাঘাত আর কোমল মস্তিষ্কে পলাণ্ডুর ক্রিয়া সংযোগ একই কথা। এই বিষকুম্ভ পয়োমুখ দুষ্টকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত না করিলে নিস্তার নাই—মঙ্গল নাই। সাম্যরাজ্যের কথা বলা বাহুল্য। আজি কালি লঘু গুরু ভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান; বেদান্ত আর ভ্যাভাচ্যাকার সমান মর্য্যাদা। বাল্যে যাহার যাহা নাই, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে তাহার তাহা নাই। মস্তিষ্ক—দুগ্ধ, জ্ঞানগর্ভ-গ্রন্থপাঠ তাহাতে মিশ্রিসংযোগ। আণ্ডমিঠা, আধুনিক টপ্পা পাঁচালির চনাছিটা পড়িলে সব নষ্ট। কুসুমের বিকাশ ঘটিলে যেমন স্বতঃই মধু জন্মে, মস্তিষ্কের বিকাশ হইলে তদ্রূপ শিক্ষার স্রোত খোলে। সলিলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি যেমন হাবুডুবু খাইয়া সাঁতার শিখে, কঠোর সমস্যায় নিমগ্ন ব্যক্তিও তেমন উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানী হয়। সুতরাং জ্ঞানালোচনা ভিন্ন শুদ্ধ লঘু পুস্তক পাঠ করিয়া বালকেরা অধঃপাতে যাইতেছে সন্দেহ নাই। জ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত বিচারশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। সে আলোচনা কোথায়? জ্ঞানের বাকল কঠিন; তাই লোকে দাঁত বসাইতে পারে না; সুতরাং পাতল গ্রন্থের উপর এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এরূপ গ্রন্থ একদমে পাঁচ খানা পাঠ করা যায়। যে সকল পত্রিকার অঙ্গে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি—ফুলেলার অপরূপচিত্র, শার্ট কোটের কুহক-মন্ত্রতরঙ্গ, বৈদ্যুতিক কলমের, বৈদ্যুতিক অঙ্গুরীয়ের ঝিলিমিলি—সেই সকল পত্রিকার মন্ত্রপূত কটাক্ষবাণে বালকগণ কি স্থির থাকিতে পারে? মুহূর্ত্তে মেষ মহিষ হইতেছে; শান্ত দান্ত বালকগণ অল্পদিনেই সুরুচির টানে বিলাসী ও অপব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে। শুদ্ধ তাহাও নয়, তাহারা এই ধুমধামে আকৃষ্ট হইয়া, বাল্যা কর্ম্ম দুষ্ট ড়িয়া বাকলে জড়িতেছে। লোক শুদ্ধ

পত্রিকাপাঠে তাহাদের রুচির এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, এখন আর মূলগ্রন্থের প্রতি টান নাই, শ্রদ্ধা নাই। এক সের খাটি দুগ্ধ সহজে পান করা যায়,—উদরেও ধরে, কিন্তু তিন সের জলে তাহা ডাইলিউট করিলে আর সেই দুগ্ধ পান করিয়া উঠা যায় না। চব্বিশ ঘণ্টা, বসিয়া হাজার পাতা উল্টাইয়া যাহা শিখিলাম (যদি শিখিয়া থাকি), একমুহূর্ত্তে তাহা ঘনাকারে গ্রাস করিতে পারিতাম। এই যে ভূরি ভূরি বটতলার গ্রন্থ, সে সব খুলিয়া দেখ, দেখিবে পুরাণ শাস্ত্রাদির দুই চারিটি শ্লোক লইয়াই উহাদের সৃষ্টি। জলের বাষ্পত্ববৎ উহা ভাষায় আয়তন লাভ করিয়াছে। গুণের ভাগ অধিক হইলে যেমন দোষের ভাগ কমে, তদ্রূপ জ্ঞানের ভাগ অধিক থাকিলে, ভাষার আয়তন কমে। অতএব যে গ্রন্থ ঘন, যাহার দৈর্ঘ্য কম, পরিসর অধিক, এরূপ গ্রন্থে ছাত্র ... সৌভাগ্য। পত্রিকা পাঠ যে অমঙ্গলের নিদান একথা বলি না। গুণের ভাগ সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিতে হইলে এইমাত্র বলা যাউক, "বালক বালিকাগণ, গ্রন্থ পড়, পত্রিকা দেখ। গ্রন্থে গ্রহের স্থান, পত্রিকায় উপগ্রহের স্থান দাও।"

৫। "পাক কর, খাও", সুধু তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না। পরিপাক না হইলে সমস্তই বিফল, বরং রোগ জন্মে। "দীনে ... য়াছ, এখনও তোমার হৃদ... র্থাৎ তোমার হৃদয়ে এমন ... নাই, যাহার উত্তেজনায়

নদীর ...
নের কোন

তুমি দীনে দান না করিয়া স্থির থাকিতে পার না। ভাষাগত শিক্ষানুযায়ি কার্য্য-পরিণতি না ঘটিলে, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাই নয়। জীবন কর্ম্মক্ষেত্র; মন, প্রাণ, দেহ কর্ম্মোপযোগি গঠিত হওয়াই শিক্ষার পরিণাম। শিক্ষা আর জমি চষা এক কথা। ইট গাঁথিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করার নাম শিক্ষা। যদি বস্তুবিশেষের নির্ম্মাণ না হয়, তবে শিক্ষা বাতাস মাত্র। "এক কান দিয়ে ঢুকে অপর কান দিয়ে বেরয়।" যিনি শিক্ষক আচরণে শিক্ষা দিবেন, যিনি ছাত্র, শিক্ষা পাইয়া আচরণ করিবেন। ছাত্রবৃন্দ অতীব অনুকরণপ্রিয়। দৃষ্টান্ত এক সংক্রামক রোগ বিশেষ। অতএব সদ্দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্তে যত হয়, মৌখিক শিক্ষায় তত ফল ফলে না। সুতরাং ছাত্রের সৎশিক্ষা শিক্ষকের কার্য্যকলাপের উপর সমধিক নির্ভর করে। "যে গাছের পাতা খায়, সেই রঙ্ ধরে।"

৬। যে শিক্ষায় সত্ত্বগুণের উদ্রেক না হয়, সে শিক্ষা কাঁচা। আধুনিক সময়ে যাহাদিগকে আমরা শিক্ষিত বলি তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কুৎসিত আচরণঘটিত জঘন্য মোকদ্দমার দায়ে ঠেকিয়া ঘোর বিপ্লব ঘটাইতেছে; এবং জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছে। ইহা কি বিকৃত ছাত্রজীবনের পরিণাম নয়? ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত গ্রন্থ হইয়াছে যে, সাগর ভরিয়া ফেলা যায়। পূর্ব্বকার লোকের এত গ্রন্থ স্বপ্নেও নয়নগোচর হয় নাই। ইদানীং আমরা ২০ বৎসর বয়সে

সহস্র গ্রন্থ পড়িয়া ফেলে। তবু কিন্তু ঠিক হইয়া চলিতে পারে না। প্রতি পদে পদ-স্খলন ঘটে। ইহার হেতু কি গ্রন্থবাহুল্য নয়? "অনেক রান্ধনীর ঝোল নষ্ট।" সহস্র পণ্ডিত সহস্র গ্রন্থে মুখ ছাপাইয়া উপদেশ দেন। বহুল গ্রন্থাধ্যয়নে চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মে। শিক্ষা কাঁচা থাকে। ঘাস খড় দিয়া মস্তিষ্করূপ গোলাঘর ভরিলে, সার শস্যের স্থান কোথায়, সার শস্য সংগ্রহের অবসর বা কোথায়? ছাত্রগণ পত্রিকার সংবাদ পাঠের জন্য এত লালায়িত থাকে যে, তাহারা সর্ব্বদা শুক্র শনি ইত্যাদি বার গণনা করে, পত্রিকা খুঁজিয়া ঘরে ঘরে বাসায় বাসায় বিচরণ করে, এমন কি চিত্তোদ্বেগের উৎকট দংশনে, কচির ঘন বিতাড়নে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া ডাককর্ম্মচারীর আসন টলায়। এবংবিধ চাঞ্চল্যের কোলে সত্ব স্থান পায় না। দুই চারি খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিশেষকে আশ্রয় করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য জন্মে, এবং সেই স্থৈর্য্যের কুক্ষি হইতে সত্বগুণ প্রসূত হয়। লোকের অবিদিত নয়, টোলের ছাত্র মিতভাষী, স্কুলের ছাত্র বহুভাষী; টোলের ছাত্র ধীর, স্কুলের ছাত্র অধীর; টোলের ছাত্র নিষ্ঠাবান্, সুতরাং সুস্থ, স্কুলের ছাত্র নিষ্ঠাহীন সুতরাং অপেক্ষাকৃত অসুস্থ। মেঘবারির সহিত নদীর যেরূপ সম্বন্ধ, সত্বের সহিত সুখের তদ্বিধ সম্বন্ধ। সত্বরূপ মেঘের সঞ্চার করা শিক্ষার সারোদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আদ্যোপান্ত বজায় থাকিলে শিক্ষা সফল, কারণ তাহাতে সুখের সরিৎ ভরিয়া তরঙ্গ ধরে। সেবা হইতে বিনয়, বিনয় হইতে সত্ব অঙ্কুরিত হয়। শিক্ষার পরিচারিকা সেবার অভাবে, ছাত্রের শিক্ষা মাটি হয়। কারণ সে বিনয় লাভে বঞ্চিত। টোলে গুরুসেবার প্রথা সুন্দর প্রচলিত আছে, স্কুলে ততদূর না হউক, তাহার একটু ছায়াও নাই। গুণের সমাজে বিনয় মুকুট স্বরূপ, ফুলবাগানের গোলাপ স্বরূপ। ছাত্রগণের ভাগ্যে বিনয়ের প্রসাদ মিলে না। বিনয়াভাবে তাহারা শিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও অশিক্ষিত হইয়া থাকে। সাগর মন্থনে অমৃত লাভ করিয়া দেবগণ অমর হইয়াছেন, শিক্ষকে প্রীত করিয়া ছাত্রবৃন্দ কান্তিমান্ হইতে পারে, কিন্তু উহার বিপরীত ঘটনা দেখিয়া আমাদের প্রাণ শুকায়। Tit for tat measure for measure বর্ত্তমান সময়ে অনেক ঘটিতেছে।

৭। "বিদ্যাচঞ্চলং, কিং [illegible] যৌবনায়ুঃ" (মণিরত্নমালা)। [illegible] কি?—[illegible] যৌবন এবং আয়ু। আবার Time is the staff life is made of" জীবন অস্থায়ি, সেই জীবন আবার সময়ের সমষ্টি। জীবন সময়ের সমষ্টি, আবার "Early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise" এই উপদেশ গুলি ভুলিয়া ছাত্রগণ অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রার কোলে ঢলিয়া থাকে। উষাকে কামধেনু বলিলেও উহার [illegible] না। উষার প্রকৃতি মধুর [illegible] কর্ম্ম দুষ্ট আভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত লোক শুদ্ধ

সম্পৃক্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হয়। এই হইল বহির্জগতের কথা। ভিতরের কিরূপ অবস্থা, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি; আমাদের বাড়ীর বাগানে যেমন ফুল ফোটে, মস্তিষ্করূপ সরোবরেও একটি সহস্রদল কমল ফোটে। তাহা হইতে আনন্দমধু অল্পাধিক বিন্দু বিন্দু ক্ষরিতে থাকে। সাধারণ ভাষায় এই কথা বলা যাউক যে, প্রভাতে মন প্রফুল্ল হয়। সুতরাং উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল হয়। এই স্নিগ্ধ মধুর সময়ে কর্ম্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন করিলে, অল্পায়াসে অধিক লাভ হয়। সময়ও দীর্ঘ হয়। চন্দ্রে যেমন সুধা থাকে, দুগ্ধে যেমন মাধুর্য্য থাকে, প্রাভাতিক সমীরণেও তেমন অমৃত থাকে। গঙ্গা যেমন পাপ নাশ করে, অগ্নি যেমন স্বর্ণ শোধিত করে, প্রাভাতিক বায়ুও তেমন রোগ নাশ করে। পৃথিবীতে এমন উৎকৃষ্ট সালসা নাই

হাতে ঘুমাইয়া অনেকেই
এমনি কৌপীন
উন্নতির আকাঙ্ক্ষা
জন্মেছিনু ধনিগৃহে হা
প্রত্যুষে
বড় যতনের ধন
জলস্পর্শ ও বায়ু সেবন
বিধেয়। সকালে উঠিতে হইলে, সকালে শয়ান হওয়াও উচিত; নচেৎ নিদ্রার ঋণ শোধে অপারক হইয়া অসুস্থ হইবে।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।
গীতা।

নদীর কোন ভাগ স্রোতশূন্য নয়, জীবনের কোন অংশও যোগবিবর্জ্জিত নয়। ছাত্র জীবন যোগসাধনার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। সুতরাং মিতনিদ্র, মিতাহারী না হইলে অধ্যয়নরূপ তপস্যায় সিদ্ধ হওয়া যায় না। ছাত্রজীবনের অবশ্যম্ভাবী উন্নতি কুক্কুটরবে নির্ভর করে।

৮। "আশে! তুমি পরকাল,——
তুমি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য,—কৃপণের উপবাস",
মৎপ্রণীত "হৃদশ্রু।"

এহেন অনন্ত শক্তিশালিনী আশা কাহার নাই?—বিশ্বাস যাহার নাই। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস, (স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ) স্বধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, সে সতত নৈরাশ্যতরঙ্গে আহত ও নিস্পন্দ। যাহার লক্ষ্য নাই, তাহার পথও নাই। সে আকাশে সূতাশূন্য ঘুড়ীর ন্যায়। শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে, একাগ্রতাই প্রধান উপায়। কেন্দ্রস্থ না হইলে মন স্থির হয় না। মলিন বসন রজক গৃহে পাঠাইতে হয়। অধ্যয়নজনিত স্বেদবিন্দুর সহিত নবযৌবনের চাপল্যে যে মলা লাগে, তাহা ধৌত করা আবশ্যক। এ মলা উপাসনায় বিধৌত হয়। উপাসনার সহজ ও প্রকৃষ্ট প্রবর্ত্তপ্রণালীর নাম সংকীর্ত্তন। শীতান্তে মলয়ানিলের ন্যায়, শ্রান্তের পক্ষে সংকীর্ত্তন বসন্ত আনে। নৈরাশ্যের বরফ গলে; প্রাণ, মন, কুসুমের ন্যায় ফোটে। দৈনন্দিন অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক উপাসনা থাকা আবশ্যকীয়। অন্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করিতে অসমর্থ; উপাসনাহীন ব্যক্তিও জীবনের প্রকৃত মধুরিমা চাখিতে পারে না। উপাসনার

রসাভিষেক ব্যতিরেকে নবযুবক নবযৌবনেই সংসারতাপে শুকাইয়া যায়। বাল্যস্ফূর্ত্তি সে তাপে অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয়। ছাত্রজীবনে সূত্রপাত না হইলে, আশা নাই। সকালে না হইলে বিকালের কি বিশ্বাস? পঠদ্দশায় এই সব নিরূপিত কর্ম্ম সাধন করিলে, জীবনের উন্নতির অন্তরায় অল্প থাকে। "যে ছা উড়ে, বাসায় কড়কড় করে।" ছাত্রগণের জন্য সর্ব্বত্র পৃথক্ উপাসনা-মন্দির থাকা আবশ্যক।

৯। পূর্ব্বপুরুষের পদবী অনুসরণ আমাদের উৎকৃষ্ট গতি। শাস্ত্রে যে বিশ্বাস, উহাই আমাদের প্রাণ। ইহাকেই প্রকৃত দৈন্য বলা যায়। সূর্য্যোদয়ে যেমন দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, দৈন্যোদয়ে তেমন অশেষ গুণ উদ্দীপিত হয়। ভক্ত বলিলেন,—"প্রভো! এমন বস্তু কি আছে, যাহা তোমার নাই, যেন উপহার দিতে পারি?" প্রভু বলিলেন, "দৈন্য" (তেঞি করতলে আগুলিয়া) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শিশুশিক্ষা বলে—

"পিতামাতা গুরুজনে, সেবা কর কায় মনে।" আমাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, কি দেখি?—দেখি, অন্য কথা দূরে থাকুক, শিশুশিক্ষার উপদেশের একটি বর্ণমাত্রের অর্থোপলব্ধি করিতে পারি নাই;—পিতা মাতা কি বস্তু, বুঝি না; গুরু কি জানি না; সেবা কি, কিম্বিধা, ধারণা নাই। "কায় মনে"র প্রকৃতি জানি না। ক-জ্ঞান নাই, হাজার হাজার গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া বিদ্বান্‌বাচ্যে নাম কলাইলাম। আধপয়সার একটু কাগজের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। তবু সব মাটি। ছাত্র জীবন ভরিয়া যদি শিশুশিক্ষার এই গাঢ়োপদেশের আবৃত্তি করিতাম, ও তদনুযায়ি কার্য্য করিতাম, বোধ হয় পতনের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তবে বোধহয় প্রকৃত শিক্ষিত নবযৌবনায়ুঃ জীবনের স্বভাব-সুকুমার [illegible] নৃত্য করি[illegible] যৌবন এবং আয়ু। আবার Time is the staff life is made of" জীবন অস্থায়ি, সেই জীবন আবার সময়ের সমষ্টি। জীবন সময়ের সমষ্টি, আবার "Early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise" এই উপদেশ গুলি ভুলিয়া ছাত্রগণ অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রার কোলে ঢলিয়া থাকে। উষাকে কামধেনু বলিলেও উহার [illegible] না। উষার প্রকৃতি মধুর [illegible]দর কর্ম্ম সুষ্ঠু আভার দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত [illegible] লোক [illegible]

"তৃণাদপি সুনীচের ছাত্র মিতভাষী, স্কুলের ছাত্র বহুভাষী; টোলের ছাত্র ধীর, স্কুলের ছাত্র অধীর; টোলের ছাত্র নিষ্ঠাবান্, সুতরাং সুস্থ, স্কুলের ছাত্র নিষ্ঠাহীন সুতরাং অপেক্ষাকৃত অসুস্থ। মেঘবারির সহিত নদীর যেরূপ সম্বন্ধ, সত্ত্বের সহিত সুখের তদ্বিধ সম্বন্ধ। সত্ত্বরূপ মেঘের সঞ্চার করা শিক্ষার সারোদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আদ্যোপান্ত বজায় থাকিলে শিক্ষা সকল, কারণ তাহাতে সুখের সরিৎ ভরিয়া তরঙ্গ ধরে।

কে বলিবে বাহি, শান্ত স্তব্ধ নীরবতা,
কোন দূর দেশ হ'তে অপূর্ব মূর্চ্ছনা ওই
আনে কার অন্তরের ব্যাকুল বারতা?

সুখ নাই, সঙ্গ নাই—একা আছি বসে,
শান্তিহীন গৃহত্যাগী জীবজগতের!
হায়! ঘুরিলাম কত গিরি-রাজ্য-দেশ,
অনল নির্ব্বাণ কই হ'ল হৃদয়ের?
অনল! শিহর কেন? সত্যই অনল
জ্বলিতেছে হেথা সদা দাবাগ্নির মত!
তোমারি মতন নারী—কিন্তু দেবী এক—
জ্বালিয়াছে, তারি স্মৃতি দংশিছে সতত।
শুনিতে চেয়েছ আমি কি হেতু সন্ন্যাসী,
তাই লিখিতেছি শুধু অশ্রুজল—দীর্ঘশ্বাস,
দীন, শূন্যহৃদয়ের মর্ম্মপীড়া রাশি;—

নহি আমি চিরকাল সংসার বিরাগী
এমনি কৌপীনধারী নিস্পৃহ সন্ন্যাসী;
জন্মেছিনু ধনিগৃহে হাস্যমুখরিত
বড় যতনের ধন হ'য়ে, ভবে আসি'।
না হ'তে শৈশব পূর্ণ, জ্ঞানের উন্মেষ,
হারাইনু পিতামাতা, বিত্ত, ভাগ্যহীন;
নাই তাঁরা এ জগতে হেরিনু কাঁদিয়া
জনক জননী শব্দ বুঝিনু যে দিন!
'কে আমি? কোথায়?' প্রশ্ন ভাবি সচকিত
প্রথম চাহিনু যবে আপনার চতুর্দ্দিকে—
হেরিলাম পরগৃহে পরান্ন পালিত!

সুখসমৃদ্ধির স্বর্গ, শান্তির আগার
চিরশ্যামা-বঙ্গভূমি-হৃদিমধ্যখানে,—
মৃদুকলগীতিকণ্ঠা তটিনী বেষ্টিতা;
সদা মুখরিতা বনপক্ষী শিশুগানে;
বাল্যের, বিমল-হর্ষ উৎফুল্ল-প্রাঙ্গণ,
যৌবনের, প্রেমধ্যান-নিভৃত-মন্দির;
বার্দ্ধক্যের যোগ্য শেষ শান্তি নিকেতন,
পল্লী এক - ছিল স্থান এই প্রবাসীর।
কাটায়েছি আশৈশব প্রথম যৌবন—
জীবন-বসন্তকাল—যে মধুকানন ছায়ে,
যত কেন দূরে রহি, রহে তথা মন।

নিত্য মনে হয়—সেই গৃহ আমাদের,
বিস্তৃত গগনচুম্বী প্রাসাদ ধবল
পল্লীধনাঢ্যের, স্বচ্ছ-সরোবরতীরে;
মনঃসরস্তীরে দেবহস্তী অচঞ্চল!
সেই সুবিস্তীর্ণ, নীল—সুনীল প্রান্তর,
তার পার্শ্বে দূরে বক্র নদীরৌপ্যরেখা;
অর্দ্ধ ছায়াপথঘেরা গগনার্দ্ধভাগ
মানবের মেদিনীতে যায় যেন দেখা!
সেই কক্ষ, সদাফুল্ল উপবনাবৃত,
রাখিয়া এসেছি যেথা কোমল,শিশিরসিক্ত
একটি কোরক ক্ষুদ্র, পীড়িত, দলিত!

মিলেছিনু মোরা যুগ্ম কমল সুন্দর
এক প্রবাহিনীবক্ষে পবিত্র, নির্ম্মল;
সে তথা পড়িয়াছিল দেবহস্তচ্যুতা,
আমায় ফেলিয়াছিল ঝটিকা প্রবল!
জননি গো, স্নেহসুধামন্দাকিনী ধারা!
কেন দিলে তব বুকে স্থান এ অধমে?
শতগুণে ভাল, হেন জীবনের চেয়ে,
হ'তো নাকি মৃত্যু বাল্যশৈশব-সঙ্গমে?
শুধু স্নেহগুণে তুমি নহ পূজ্যা মম;

যে সদা হৃদয়ে মোর, তব হৃদয়ের রক্তে
হইয়াছে, পুণ্যবতি, তাহার জনম।

ভুলে গেছি, কাটায়েছি কেমনে কৈশোর,
চাঁদিনী যামিনীগুলি শুধু মনে আছে;
মনে আছে—একসঙ্গে মোরা দুই জনে
শুনিতাম উপকথা পাচিকার কাছে।
'বনে গেল রাজপুত্র, আসিল ফিরিয়া
দেবকন্যা-সমা রূপে রাজকন্যা নিয়া;
আর একজন, নবরূপে ভুলাইয়া
এসেছিল দেববালা বিবাহ করিয়া!'
শুনিত সে একমনে হরষ-বিভোরা;
উভয়ের পানে দোঁহে চাহিতাম মাঝেমাঝে
ভবিষ্য-স্বপন-স্বর্গ গড়িতাম মোরা।

মনে আছে, বলিত সে বৃদ্ধা কত দিন—
"কি সুন্দর হয় মণি! যদি তোরা দুটি"
(মণি আদরের নাম মৃণালিনী হ'তে)
"পত্নীপতিরূপে রোস্ এই গৃহে ফুটি!"
আমার মুখের পানে চাহিত সরলা
অমনি তুলিয়া দুটি আয়ত নয়ন;
কি সুধা বর্ষিত প্রাণে, কহিব কেমনে,
হিয়া মাঝে কি উল্লাস-বিদ্যুৎ-স্পন্দন!
মনে হ'তো আমাদেরি অনন্ত ভুবন;
এখনও দুখশোক আসে নি জগতে যেন
প্রথম দম্পতি সুখী আমরা দুজন!

মনে পড়ে, কত দিন পূর্ণিমা নিশায়
চন্দ্রসুধাবৃষ্টি মাঝে, অনুপমা বালা
তুলিত কুসুমরাশি; স্তবকে স্তবকে
বনলতিকার বেড়ি', গাঁথিত সে মালা।
ঘনদূর্ব্বাদল'পরে আলসে শুইয়া,
চাহি' দীর্ঘিকার পানে, গাহিতাম গান;
সে আসি পশ্চাতে মোর কহিত হাসিয়া—
"সঙ্গীতের পুরস্কার করিনু প্রদান!"
দুলিত এ কণ্ঠে তার মাল্য যতনের,
ভাবিতাম যেন মোরে পরাইল নিজহাতে
মূর্ত্তিমতী ভালবাসা তার হৃদয়ের!

সুদূর নগর হ'তে মাসেকের তরে
আসিতাম গেহে যবে পাঠ-অবকাশে,
মনে পড়ে—সর্ব্ব অগ্রে, প্রবেশি ভবনে,
হেরিতাম প্রফুল্লিতা তায় মম পাশে।
মনে পড়ে, প্রতি দিন পাঠাগারে বসি',
শুনা'তাম পড়ি' তায় কত উপন্যাস;
প্রবাস-কবিতারাশি উপহার রূপে
দিলে, কত করিত সে আনন্দ প্রকাশ!
অবকাশ-শেষে পুনঃ বিদেশ-উদ্দেশে
যাইতাম যবে, তারি কাতর-নয়নজল,
দীর্ঘশ্বাস বিদায়িত মোরে সর্ব্ব শেষে!

প্রথম যৌবনে, পরে, একই রজনী,
এই দুই লাজবদ্ধ গুপ্ত হৃদয়ের
পরিচয়, বিনিময়, বিষম বিচ্ছেদ,—
তিন অঙ্ক অভিনয় করিল প্রেমের!
দোঁহার মিলন সুখ দিয়াছিল মোরে
অর্দ্ধচন্দ্রললাটিনী যে যামিনী আসি'
অন্ধকারময়ীরূপে সেই নিশিথিনী—
করেছিল অভাগায় নিরাশ সন্ন্যাসী!
অদৃষ্টের চক্র মোর আবর্ত্তন কালে,

ক্ষণিক প্রথম সুখ দেখাইয়া একবার,
লয়ে গেছে পুনঃ যবনিকা-অন্তরালে।

শুনিনু একদা, মম হৃদয়ের নিধি,
কৈশোরের সহচরী, যৌবন সঙ্গিনী,
হইবে গো অপরের পর্য্যঙ্কভাগিনী
চির আকাঙ্ক্ষিতা মোর প্রিয়া মৃণালিনী।
স্তব্ধ, বজ্রাহত মত শুনিনু শ্রবণে—
উপেক্ষিয়া জননীর শত অনুরোধ,
ধনজনগর্ব্বদৃপ্ত পল্লীভূমিপতি
দিবেন বিবাহ তার অন্য জন সনে।
স্বজন-সমৃদ্ধিহীন পরপদাশ্রিত
দিলে এ ভিক্ষুক হস্তে একমাত্র রত্ন তাঁর,
হইবে ঐশ্বর্য্যযশঃ নিন্দাকলঙ্কিত!

টুটি', গেল, সেই দিন, দুইহিয়া-বাঁধ;
উভয় নয়ন অশ্রু মিলিল সে দিন।
তেমনি আবেগ ভরে না কেঁদেছে যেবা
কারো আলিঙ্গনবদ্ধ, সেই সুখহীন!
দুই জনে বাপীতটে করিনু শপথ,
অপর কাহারো কেহ হব না জীবনে;
তুলিল সে কত ফুল, গাঁথিল মালিকা,
মাল্য বিনিময় হ'ল সেই উপবনে।
হেরিল গগনে শুধু চন্দ্র, তারাগণে,
লোক-চক্ষু-অন্তরালে মোদের উদ্বাহকার্য্য
মোরাই করিনু শেষ সেই শুভক্ষণে।

শারদ সপ্তমীনিশি জ্যোৎস্নাকিরিটিনী
আলোকিল—ঊর্দ্ধে,নীল নভশ্চন্দ্রাতপে,
স্বরগ-গবাক্ষতলে, ফুটন্ত তারকা;
নিম্নে, ফুলফুল্ল স্নিগ্ধ শ্যামলা মেদিনী
কত পুষ্প গুচ্ছে গুচ্ছে, কুঞ্চিত কুন্তলে,
(তরাঙ্গত কৃষ্ণমেঘে জ্যোতিষ্কখচিত!
পুষ্পিত উরসে, আধলুণ্ঠিত অঞ্চলে,
শুভ্র অম্বরের তার ভাররাশিমত।
শান্তির অমিয়ভাতি আকর্ণ নয়নে;
কপোলে, ললাটে চূর্ণ কুন্তল শোভিত,
শুধু সরলতামাখা পবিত্রতাসনে—
ক্ষীরনিধিবারি সনে সুধা অবিকৃত!
বনদেবী—প্রেমমূর্ত্তি ত্রিদিবাপহৃতা,
চুমিনু তৃষিত-চিত, কুসুমশোভিতা।

"মণি—মণি—মৃণালিনি!" গম্ভীর বিকৃত স্বর
শুনিনু চমকি' ত্রস্ত;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—
বৃদ্ধ পিতা রুদ্ধরোষ　কম্পান্বিত কলেবর
প্রতি ক্রুদ্ধ ধমনীর　ঘোররক্ত রাগরেখা
চন্দ্রালোকে স্পষ্টতর
সে শ্বেত বদন'পর,
চিরিলে পঞ্জর মোর এখনো যাইবে দেখা!
নির্দ্দয় স্বপনে হেরি এখনও রাত্রি শেষে
মাঝে মাঝে, রোষদীপ্ত
তেমনি বৃদ্ধের ছায়া,
তেমনি উদ্ধত, ক্ষিপ্ত, উচ্ছৃঙ্খল-শুভ্রবেশে।

নির্ব্বাক, স্তম্ভিত, স্থির
রহিলাম ক্ষণকাল;
পরে পড়িলাম লুটি, পালক-চরণ-তলে।
কাঁদিয়া কহিনু—"মণি
করে নাই কোন দোষ।"

করি'পদাঘাত মোরে সক্রোধে, বিষমবলে,
কহিলা—"শৃগাল, ধূর্ত্ত,
পালিত কেশরী গৃহে,
করেছিস সিংহশিশু বিপথগামিনী,
এই পুরস্কার তার,
অদ্য হ'তে মমগৃহ
তো'সম্মুখে অর্গলিত দিবসযামিনী।"

অসার কন্যার কর রোষে আকর্ষিয়া,
লইয়া চলিল পিতা ভবনাভিমুখে ;
একাকী,ব্যথিত, ভীত রহিনু দাঁড়া'য়ে—
হৃদয় ফাটিতেছিল তীব্র মনোদুখে !
তাদের গমন পথে চাহিনু বারেক,
পাইলাম বাহ্যজ্ঞান যুবে পুনরায়,—
নিবিড় আঁধারে শূন্য কুঞ্জতল পথ
হেরিনু লুণ্ঠিত দূরে; হায়! সে কোথায় ?

এই কি গো পরিণাম ? কি দোষ আমার ?
অন্যায় কি ধনজনহীন ভিক্ষুকের
সুখ আশা, ভালবাসা, হৃদয়-অর্পণ ?
নিঠুর নিয়ম কি এ, হায়, এ বিশ্বের ?
ভালবাসা দোষরূপে গণ্য যে জগতে,
নাহি কেন যায়, তাহা অতলে ডুবিয়া ?
নরকের অন্ধগর্ভ কর নি পূরণ
কেন আজো, জগদীশ! সে জগত দিয়া ?

ডুবিল মলিন চন্দ্র গগনের কোলে
সকল ধরণী ঢাকি' ঘোর অন্ধকারে ;
ততোধিক অন্ধকার মানসে আমার।
যে চন্দ্রিমা গেছে রাখি' কোথা পাব তারে
অনিল মর্ম্মরি' কাঁদি, গেল কোথা চলি ;
তারি অন্তরের ওকি কাতর ক্রন্দন ?
শূন্য—তমোময় ওই সম্মুখে প্রান্তর,
ওকি তারি মসীময় ভগ্ন শূন্য মন ?

লক্ষ্যভ্রষ্ট পিণ্ডমত বিশ্বকেন্দ্রচ্যুত,
ছুটিনু আবেগ ভরে যথা গেল মন ;
গেলাম প্রান্তর শেষে, নদী পরপারে—
জানি না গো কত শীঘ্র করি সন্তরণ !
সেই হ'তে ছাড়িলাম মানবের গৃহ ;
করি' বাসস্থান বন, পর্ব্বত-কন্দর
কাটাইনু, বৃথা শান্তিলাভাশায়, এক—
যেন শতযুগ দীর্ঘ—অস্থির বৎসর।

গিরিঝরিণীবারি নির্ম্মল, শীতল
নারিল নিবা'তে দগ্ধহিয়াবহ্নিরাশি ;
কত পূর্ণিমার চন্দ্র আসি গেল ফিরি'
এ শুষ্ক অধরে নারি ফুটাইতে হাসি !
সাধুমুখে শুনি' নিত্য ধর্ম্মতত্ত্ব কথা,
কতবার চাহিয়াছি বলিদান দিতে
এ হৃদয়, কিন্তু হায় ! মলিন—সুন্দর
একখানি ক্ষুদ্র মুখ নারিনু ভুলিতে।

তাই ফিরিতেছি, ভদ্রে ! হবে কি বলিতে
কোথায় ? কাহার তরে ? বারেক দেখিতে
সেই—সেই মুখখানি করুণকোমল।
দেখিতে সে চন্দ্রে মোর,নহে দেখা দিতে।
দূরে নিরজনে রহি' গুপ্ত, অলক্ষিত,
কেমন সে আছে মোর,আসিব দেখিয়া।
নাহি যদি পাই দেখা ? কি চিন্তা ভীষণ !
আর ফিরিবনা ল'য়ে শূন্য, দীর্ণ হিয়া !

এই, দয়াবতি ! মোর জীবন-কাহিনী।
তারপরে কি ঘটেছে, সবি জানো তুমি ;
হৃদয়ের দেবী মম বিরাজে যথায়
যাইতেছিলাম আমি সেই তীর্থভূমি—
পথমাঝে, তোমাদের এই তীর্থস্থানে,
এ নগরে সুরধুনী যমুনা চুম্বিত,
হইনু পীড়িত ; তুমি সেবা পথ্য দানে
রক্ষিলে পরাণ মম তুচ্ছ, উপেক্ষিত !

তার পর কি লিখিব ? অপরাহ্ণে আজি
পাইনু পত্রিকা তব উপাধান তলে।
নাহি জানিতাম, এক অভাগিনী বিনা
কোনো পতঙ্গিনী আর চাহে এ অনলে !
কি দিব ? হৃদয় ? হায় ! আছে কি তা মোর
চাহ যদি কারো কাছে হারাণো রতন,
উপহাস মাত্র সে যে ! অপহৃত হৃদি
হৃদয়বিহীন দিতে পারে কি কখন ?
লিপিশেষ—ক্ষমিওগো অপরাধ মম,
রও সুখে ভুলি এই

নির্ম্মম অধম।

শেষলিপি

দিন যায়, দিন আসে, পুনঃ যায় চলি'
মিশিতে অতীতে ; নিত্য জীবন মরণ
স্বধর্ম্ম তাদের এই। গিয়াছে সম্মুখে
কত, আর কতগুলি আসিছে পশ্চাতে.
নরনারী করে কি গণনা ? বহি' আনে
নব সুখবার্ত্তা কিম্বা বেদনা নবীন
সময়সাগরস্রোতে যে তরঙ্গমালা,—
বেলা ভূমি কোলে শুষ্কফেণ-চিহ্ন মত,
তাহাদেরি স্মৃতি রহে মানসফলকে
অঙ্কিত জীবন-ভোর ! এ মম জীবনে
কতদিন গেছে চলি', কিন্তু কই তার
আসে না ত সবগুলি আজি স্মৃতিপথে ?
হাসিয়াছি সুখে কবে, মর্ম্মযাতনায়
কবে কাঁদিয়াছি ক্ষোভে, সেইদিনগুলি
শুধু স্তরে স্তরে আছে গাঁথা বক্ষোমাঝে !
আজি আসিয়াছে মোর এমনি দিবস,
রহিত যদ্যপি প্রাণ, স্মরিতাম তবে
পাপিনী জনমে এই অকাল দুর্দ্দিন
কি বিষাদ দিনরূপে, হায়, আমরণ !
কি ছিনু প্রভাতে আজি ? শান্তহাস্যময়ী-
আশাবাণীপুলকিতা ! না হ'তে অতীত
তৃতীয় প্রহর নিশা, কি আমি এখন ?
আশাহীনা প্রত্যাখ্যাতা—স্বকরে ছিঁড়িয়া
আপনার হৃৎপিণ্ড যতনরক্ষিত,
তপ্তরক্তসম-অশ্রুবারিধারাসনে,
বসিয়াছি চিরতরে দিতে বিসর্জ্জন !

আজি শেষদিনে মোর, কোন্ সম্বোধনে
সম্বোধিব, প্রিয়তম ! প্রিয়তম বিনা
তোমায় হৃদয়রত্ন ! আজি শেষ দিনে,
পাসরি' শরম প্রাণ, হ'য়ে আত্মহারা
খুলি যদি হিয়া-দ্বার ক্ষমিও দাসীরে !
'স্নেহময়ি', 'দয়াবতি', 'বিদেশবাসিনি'
এই কি তোমার মোরে যোগ্য সম্বোধন ?
আজিও কি, হা অদৃষ্ট ! চিন নি আমায়
হে প্রেমিক বিরহি সন্ন্যাসি ! উনমত্ত
স্বনাভিকস্তূরীঘ্রাণে, ওহে মৃগবর !
হেরনি কি কোন দিন চাহিয়া পশ্চাতে—

ও তব সৌন্দর্য্যমুগ্ধা, বদ্ধা প্রেমডোরে,
ফিরিতেছি সাথে সাথে আমি কুরঙ্গিণী ?

নিদাঘমধ্যাহ্নে সেই, তরুচ্ছায়াহীন
বিন্ধ্যাচলচূড়ে, "ধীর" আছে কি স্মরণে,
তৃষ্ণায় কাতর তব বিশুষ্ক, মলিন
ওষ্ঠপ্রান্তে ধরেছিল ভীলকন্যা এক
স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ-উৎসবারি-পূর্ণ-পত্রপুট ?
আছে কি স্মরণে, পূত প্রভাসের তটে—
প্রতি নব প্রাতঃকালে যোগা'ত আনিয়া
অযাচিত, খাদ্য কত মহারাষ্ট্রবালা ?
হিন্দুর-পরমতীর্থ-গোমুখী গুহায়
ছিলে যবে,কেবা নিত্য,পড়ে না কি মনে,
অলক্ষিত, যেত রাখি' বনফলমূল
সুখাস্বাদ ? জ্বালামুখী-গিরিবনপাশে
হয়েছিলা পরিশ্রান্ত, পথভ্রান্ত যবে
প্রদোষে, আছে কি মনে, অবগুণ্ঠাবৃত
একখানি নারীমুখ দিয়াছিল বলি',
তোমায়, প্রকৃত পথ, বিশ্রামের স্থান ?
ধরাতল-দেবোদ্যান-কাশ্মীর-প্রবাসে,
গেছ না কি ভুলি, সেই বণিক-বালকে
সেবাপর, গৃহহীন হে অনিন্দ্যরূপ ?
আমি সে—আমি সে, প্রভু, পর্ব্বতচারিণী
ভীলকন্যা ; আমিই সে মহারাষ্ট্রনারী
প্রতিদিন দর্শনলোলুপা ; অলক্ষিতা
গোমুখীবাসিনী ; গিরিপথনির্দ্দেশিনী
সে অবগুণ্ঠিতা ; মুগ্ধা বালকরূপিণী
আমিই, আরাধ্যদেব,কাশ্মীরে সেবিকা !

মনে নাই কতদিন, হ'ল বর্ষপ্রায়,—
পল্লীর নিতম্বশোভা (রজত মেখলা
দীপ্তিমতী !) নির্ম্মল-তটিনী-বক্ষোমাঝে
তৃপ্তা অবগাহি, এক আরক্ত উষায়,
উঠিতে ছিলাম যবে সৈকত-পুলিনে
মন্দপদে,—বিমোহিতা, হেরিনু তোমায়
বটবৃক্ষমূলশায়ী ! চাহি', চাহি' চাহি',
না মিটিল তৃষা ; চারি আঁখি-সম্মিলনে
লজ্জিতা, ফিরা'নু মুখ কত যে আয়াসে
কব তা কেমনে ? পুনঃ আবাসের পথে
চলিনু আপনহারা, পুত্তলিকা যথা
নির্জ্জীব, সঞ্চরে যন্ত্রকৌশলচালিত।
পশিনু ভবনমধ্যে ; কিন্তু হায় বিধি !
শ্রেষ্ঠতম যতনের রতন আমার
কম-নারীহৃদয়ের—ফণিনীর মণি !—
কে লইল বল হরি, নিরদয়রূপে

অকস্মাৎ, সেই সিক্তবস্ত্রে পাগলিনী
বাহিরিনু গৃহ ছাড়ি, সমাজ, স্বজন
অবহেলি'। পিছে পিছে সেই হ'তে তব
হৃদয়সর্ব্বস্বচোর ! ফিরি নানাবেশে ;
ইচ্ছা,—তুমি প্রতিদান করিবে, সুন্দর !
প্রীতিফুল্লচিত্তে, মম সর্ব্ববিনিময়ে,
একটু মোহন-মৃদু-মধুহাসি দিয়া !
কাঁদিয়া ফিরিনু, প্রিয়, পশ্চাতে তোমা
হে নিঠুর, আজি প্রায়, পূর্ণবর্ষকাল
কতস্থানে, কাঙ্গালিনী বিমলিনা যথা
ফিরে ধনিপদে যাচি', অর্দ্ধকপর্দ্দক।
চাহিলে না, বুঝিলে না হৃদয়বেদনা—
মরমকামনা, তৃষ্ণা, এই রবহীনা
চাতকীর ; কাঁদিলাম তাই উচ্চে আজি
অপরাহ্নে—রাখিলাম উপাধান তলে

পত্রিকারূপিণী মম আত্মমনোব্যথা
সদা হৃদি-নিষ্পেষিণী ;—না বুঝিনু হায় !
মতিহীনা, পরিণাম তার ; না ভাবিনু
করিবে জলদবর, অনল বর্ষণ !

মরণের প্রান্তে বসি' এবে তব কাছে
নহি কিন্তু প্রেমপ্রত্যাশিনী ; নারী আমি
অভাগিনী, বুঝি নারীমরমবেদনা।
ঠেলেছ চরণে মোরে' ভাল—ভাল সেই ;
অপরের নিধি তুমি, হইলে আমার—
তব প্রেমাধিনী বালা ত্যজিত জীবন।
সর্ব্বত্যাগী পুণ্যবতী যে কামিনীতরে
তুমি নাথ ! হেরিয়াছে প্রথম নিশায়
আজি দাসী সে তরুণী—শীর্ণা মৃণালিনী
অশ্রুমুখী ! বুঝিয়াছি আজি, সুদর্শন !
সুধাময়ী-স্বর্গকন্যা-কবরী-কুসুম
মনোরম, পরশিতে গিয়াছিনু আমি—
তবরূপবিমোহিতা তুচ্ছ সারমেয়ী
ঘৃণিতা,—ঘৃণিত তাই এই প্রত্যাখ্যান !
হেরিলাম মুখচন্দ্র তার, কি সুন্দর
কেমনে বর্ণিব ? আমি যে রমণী, তবু
সাধ হয় মনে- বুকে তুলি' সযতনে
মুছি অশ্রু তার শত প্রণয়চুম্বনে !
কি করুণ মুখচ্ছবি ! কি ভাব মধুর !
কি দারুণ অন্তর্বহ্নি দহিছে সতত,
শুকাইছে প্রতিদিন সে দেব-কুসুম
অবনীদুর্লভ ! ! ওগো, এই কি তোমার
স্নেহ মায়া, হে পাষাণ, প্রেমভালবাসা ?
নিরুদ্দিষ্ট-প্রিয়তম-বিচ্ছেদ-কাতরা—
অর্দ্ধশুষ্ক-স্বর্ণলতা—তবরূপ ধ্যানে
কাটাইছে কাঁদি সারা নিশিদিনমান !
পিতার ভৎর্সনা রূঢ়, মাতৃ-অনুরোধ
পারেনি ফিরাতে তায় তব চিন্তা হ'তে
একটি বৎসর পূর্ণ। তব ভাবনায়
ম্লানমুখী, কাটাইছে কাঁদি দীর্ঘকাল,
রবিহীন গগনের তলে সঙ্কুচিতা
ম্লানা সূর্য্যমুখী যথা। যাও, ত্বরা করি
বাঁচাইতে ইচ্ছা যদি দিয়া দরশন
মৃতপ্রায় মৃণালিনী। যাও, ভাগ্যবান্,
বৎসরের পরে আজি, লইতে হাসিয়া
বিরহ-বিধুরা-নারী-সাদর-চুম্বন !
তোমার প্রণয়পাত্রী পিতৃগৃহদ্বার
(নহে এবে অর্গলিত !) উন্মুক্ত রয়েছে
তব তরে, করিতে; তোমায় আবাহন !
জননী তোমার তরে বিলপে সতত
ম্রিয়মাণা ; নিজে বৃদ্ধ পিতা অন্বেষিছে
ফিরা'তে তোমায়, প্রতি নগরনগরী।
যাও ফিরি,' মনোহর ! পুনঃ পুত্রভাবে
লইবে তাহারা গৃহে, বাঁচাও যাইয়া—
সঞ্জীবন-মন্ত্র তুমি !—মুমূর্ষু অবলা !
যাও ফিরি', হে বাঞ্ছিত ! প্রেমমাল্যদিয়া
বরিবে তোমায় পুনঃ তোমারি সে 'মণি'

হ'য়োনা বিস্মিত ; কিছু নহে বিস্ময়ের
এ ধরায়, বিধিসৃষ্ট জীবক্রীড়াগারে !
শুনেছিনু প্রাতঃকালে, বিগ্রহ সেবক
এই দেবমন্দিরের ব্রাহ্মণ সকল
বলিতেছিলেন—দূরবঙ্গপল্লী হ'তে
(কে জানে নিগূঢ় কোন অজ্ঞাত কারণে)
তীর্থব্যপদেশে আসি' ভূস্বামী জনৈক,

বনিতা, দুহিতা আর দাসদাসী সহ,
রয়েছেন পূর্ব্বতীর্থযাত্রীশালা মাঝে ;
বোধ হয় যেন, এই সুদূর-আগত,
গম্ভীর, অত্যল্পভাষী, বিষণ্ণ বৃদ্ধের
দেবকার্য্যমাত্রহীন পুণ্যক্ষেত্রবাস,
কি এক রহস্যপূর্ণ বিদেশ-যাপন!
হেরি নাই বহুদিন বঙ্গের রমণী
দয়াশীলা, প্রেমলজ্জাসঙ্কোচকোমলা,
মধুময়ী ; হ'ল সাধ বড় তা দেখিতে ;
আলাপিতে—পরিত্যক্তা বঙ্গবালা আমি!
—মম আপনার বঙ্গললনা সহিত।
তাই, সন্ধ্যাকালে ধরি' সন্ন্যাসিনীবেশ,
(জান তুমি এ অভাগী বিভিন্নবেশিনী!)
পশিলাম সে ভবনে পুলকিতা হয়ে,
অবারিতা ; গৃহকর্ত্রী পরম যতনে
বসাইলা মৃগাজিন পাতি কক্ষতলে
হেরি' সন্ন্যাসিনী। তথা হেরিনু, সুধীর!
মলিনা চন্দ্রমা এক শয়ন-শায়িতা,
রুগ্না, শীর্ণা, বিষাদিনী ; বুঝিয়াছি শেষে
তব সে অমিয়ময়ী! বলিলা কাঁদিয়া
জননী সকল কথা, অপূর্ব্ব আখ্যান!
শুনিলাম মাতৃমুখে বাল্যপ্রেম কথা
তনয়ার ; শুনিলাম কেন নিরুদ্দেশ
যুবক প্রণয়পাত্র অপমানাহত ;
শুনিলাম ব্যর্থচেষ্টা হইয়াছে কত
সমর্পিতে অন্য করে সে ম্লান-নলিনী
স্পৃহণীয়া ; শুনিলাম তাই সন্ধানিছে
কন্যাগতপ্রাণ পিতা, প্রেম-আশাহীন
নবীন সে গৃহত্যাগী আত্মজাজীবন
শুনি' জিজ্ঞাসিনু আমি—"কি নাম তাহার
কিবা রূপ, অবয়ব? বিশেষত্ব কিছু
আছে কি তাহায়, যায় চিনিবে অপর?
কি—বলিব কি হইনু শুনিয়া উত্তর,
হে প্রাণেশ! কক্ষভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র মাঝে
কে হানিল মোর, ওগো, অকাল-কুলিশ?
কে নির্দ্দয় বিদারিয়া হৃদিমধ্য মোর
শেলাঘাতে, যাহা ছিল লইল সকলি
অপহরি'? চিনিলাম—আমারি দেবতা
তুমি—তুমি, প্রাণ, সেই মৃণালিনীপ্রাণ!
বাণবিদ্ধা কপোতীর মত, রুদ্ধশ্বাসে
আসিনু ছুটিয়া হেথা ; পাইনু আসিয়া
তোমার স্বহস্তলিপি,—ঘুচিল সকল
অমূল, কল্পনাজাত, সাদৃশ্যে সন্দেহ!

*

বিদায়! বিদায়! প্রভু, জনমের মত!
প্রণমে চরণে দাসী, এই শেষবার!
যামিনী বিগতপ্রায় ; বাতায়ন-পথে
পশিল প্রকোষ্ঠ মাঝে উষার আলোক
জীবনের দীপ মম করিতে নির্ব্বাণ
চিরতরে! পাইও না বৃথা মনস্তাপ
অন্তিম-অবস্থা মম স্মরি' কভু মনে।
বাস-হীন বনফুল চেয়েছিনু আমি
পদ্মিনীবল্লভ চারু দীপ্ত-রবিপানে
অবিশুদ্ধ মনে, তাই, দহিলা তপন!—
আপন করম-ফল ভুগিনু আপনি
দুর্ভাগিণী! রেখো শুধু এ প্রার্থনাটুকু,—
হইবে যখন সুখী ভবিষ্যজীবনে,
যদি কভু পড়ে মনে এই পাপিনীরে,
অমনি ভুলিও স্মৃতি চুমি' পত্নীতব,
মুছি' ফেলো মন হতে এই দগ্ধমুখ!

চলিনু, চলিনু, নাথ! ক্ষম শেষবার
ঘোর অপরাধ মোর! নারকিণী আমি,
চুমিনু প্রথম—শেষ—ও মধু অধর
সুপবিত্র, (নিদ্রাগত তুমি নেত্রসুখ!)
তব অগোচরে, আজি, চোরের মতন,
—জন্মসাধ পূর্ণ মোর মরিলাম সুখে।
মৃণালিনি! ভাগ্যবতি! সাধ্বি! প্রেমময়ি!
হারাণো রতন তোর হেরি পথমাঝে
অরক্ষিত, দীনা আমি, করেছিনু লোভ
অনুচিত, নাশিলাম তাই পাপরাশি
আপন জীবন দিয়া। কর্ গো গ্রহণ
হাসি, সুহাসিনি! মোর,—তোর কণ্ঠমণি
সুদুর্লভ; করিলাম আজি রাত্রিশেষে
কৌস্তভ-গঞ্জন এক রতন-অর্পণ!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বৈদিক বাঙ্গালা ও বিধুমুখী ছন্দ।

সংস্কৃত ভাষার তিনটি মূর্ত্তি আছে। উহার এক মূর্ত্তির নাম বৈদিক সংস্কৃত, আর এক মূর্ত্তির নাম লৌকিক সংস্কৃত, তৃতীয় মূর্ত্তির নাম প্রাকৃত। এই প্রবন্ধে প্রাকৃতের কথা বিশেষ কহিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি, নমুনা প্রদর্শনের জন্য, এখানে দুই একটি শব্দের উল্লেখ করিব। যথা,—আমরা বাঙ্গালায় বলি "মহাশয়, শুনুন"। এই দুইটি [illegible] সংস্কৃতে অনূদিত হইলে, বাক্য হয়—[illegible]ণোতু আর্য্যঃ";—প্রাকৃতে হয় "সুনাদু [illegible]জ্জো"। সংস্কৃতে বলে "আলিখিতঃ আর্য্যপুত্রঃ"; প্রাকৃতে বলে "আলিহিদো অজ্জউত্তো"। এস্থলে দৃষ্ট হইবে যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়েই বিভক্তি ঠিক রহিল; কেবল প্রকৃতি অথবা মেয়েলি উচ্চারণের মধুর মহিমায় শব্দের মূর্ত্তি বর্ণে বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

কিন্তু বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের পরস্পর পার্থক্য আর এক প্রকার। বৈদিক সংস্কৃত কতকটা এলোমেলো অথবা উচ্ছৃঙ্খল; লৌকিক সংস্কৃত সুমার্জ্জিত, সুশাসিত ও সুদৃঢ়শৃঙ্খলবদ্ধ। বৈদিক সংস্কৃত অনেক স্থলেই ব্যাকরণের দোহাই মানে না,—ব্যাকরণের ছাঁদন দড়ী ও বাঁধন দড়ী গলায় গাঁথিয়া, শিষ্ট বালকের মত সংযত রহিতে ভালবাসে না; লৌকিক সংস্কৃত সর্ব্বতোভাবে ব্যাকরণের অধীন। বৈয়াকরণ-গুরু ভগবান্ পাণিনি বৈদিক সংস্কৃতকেও ব্যাকরণের শাসনাধীন রাখিবার জন্য অসংখ্য সূত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল

সূত্রের অধিকাংশই এক কথার অনন্তবার আবৃত্তি মাত্র। তাঁহার বৈদিক সূত্রনিচয়ের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ সূত্র আছে, তাহা দুইটি শব্দে রচিত। শব্দ দুইটি এই,——

"বহুলং ছন্দসি"—অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় এমনও হয়, অমনও হয়;—ইহাও হয়, উহাও হয়; অথবা কখনও হয়, কখনও না হয়। সূত্র রচনা সম্পর্কে ইহার অধিক আর এলো-মেলো কথা কি হইতে পারে? মনীষিগণের অগ্রগণ্য মহাচতুর বোপদেব গোস্বামী তদীয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে পাণিনির মত বহু শত বৈদিক সূত্র যোজনা করেন নাই; কিন্তু অতি চতুরতার সহিত একটি সূত্রেই কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। সেই সূত্রটিও পাণিনির উপরিধৃত সূত্রের অনুবাদ মাত্র। যথা—"বহুলং ব্রহ্মণি"। ইহারও অর্থ এই—বৈদিক ভাষায় এমনও হয়, অমনও হয়; ইহাও হয়, উহাও হয়;—অথবা কখনও হয়, কখনও না হয়। প্রাকৃতের ন্যায় বৈদিকেরও একটুকু নমুনা দেখাইব।

ইহা সকলেই জানেন যে, উপসর্গের সহিত শব্দ রচনায়, আগে থাকে উপসর্গ, তার পরে থাকে ক্রিয়াপদ অথবা কৃদন্তপদ। যথা,—"প্রসরণ", "অনুগমন"; অথবা "প্রসন্ন", "প্রফুল্ল", "অনুগত" ও "আশ্রিত"। উপসর্গ যে এইরূপে ক্রিয়াপদের আগে বসিবে, তাহার জন্য পাণিনির সূত্র রহিয়াছে,—"তে প্রাগ্‌ধাতোঃ",অর্থাৎ তাহারা ক্রিয়াবাচি প্রকৃতির আগে বসিবে। পাণিনি ইহার অব্যবহিত পরেই আবার সূত্র করিলেন, "ছন্দসি পরেঽপি"; অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় তাহারা কখনও আগে বসিবে, কখনও বা পরে বসিবে। যেন ইহাতেও তৃপ্তি নাই,—সেই এলোমেলো ভাষার উচ্ছৃঙ্খলা হইতে নিষ্কৃতি নাই; অতএব আবার সূত্র হইল,—"ব্যবহিতাশ্চ"; অর্থাৎ তাহারা লেখকের ইচ্ছানুসারে আগেও বসিবে,পরেও বসিবে, এবং কখনও কখনও আর একটি শব্দকে মধ্যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত রাখিয়া ব্যবহিত অবস্থায়ও বসিবে। ইহার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন হইতেছে। "বীরবরো হনুমান্ হয়মুখং রাক্ষসং মুষ্টিনা নিহন্তি;"—বীরবর হনুমান্ হয়মুখ নামক রাক্ষসকে মুষ্টির আঘাতে নিহত করিতেছেন। বৈদিক ভাষায় "নিহন্তির" স্থলে, অনায়াসে লেখা যাইতে পারে "হন্তি নি মুষ্টিনা", অথবা ইহাও লেখা যাইতে পারে "নি মুষ্টিনা হন্তি", কিংবা "হন্তি মুষ্টিনা নি"!

এইরূপ সূত্রপ্রয়োগের সার অর্থ একপ্রকার এইরূপ সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কালি কলমে লিখিয়া যাও, তাহাই বৈদিক সংস্কৃতের রীতি অনুসারে বিশুদ্ধ বস্তু হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা ভাষা লইয়া পরিশ্রম করেন, এবং উহার গঠন প্রণালী লইয়া বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পাইয়াছেন যে, সংস্কৃতের ন্যায়, এই অল্প সময়ের মধ্যে, উহারও তিনটি মূর্ত্তি পরিস্ফুটরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে,

সেই তিনটি মূর্ত্তির মধ্যে একটির নাম বৈদিক বাঙ্গালা, আর একটির নাম প্রাকৃত বাঙ্গালা এবং তৃতীয়টির নাম লৌকিক বাঙ্গালা।

প্রাকৃত বাঙ্গালার সমধিক পরিচয় দিতে হইবে না। কচি খুকী যখন আদরে ফুলিয়া,—মায়ের গলায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া, আদর ও আবদারের কথা কহিতে থাকে,তখন যে বাঙ্গালা আপনা হইতে তাহার ঠোঁটে ফোটে, তাহারই নাম প্রাকৃত বাঙ্গালা। সুন্দরীরা যখন, সমানবয়স্কাদিগের সঙ্গে বসিয়া, মনের সুখসোহাগে, কিংবা রস-রঙ্গের প্রেমবিরাগে পাঁচপ্রকারের মধুর কথার অবতারণা করেন, তখন যে বাঙ্গালা তাঁহাদিগের মুখ-পদ্ম হইতে প্রভাত-শিশিরের মত বিন্দু বিন্দু নিঃসৃত হইতে রহে, তাহারই নাম প্রাকৃত বাঙ্গালা। পুরাতনদিগের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র,এবং অধুনাতন লেখকদিগের মধ্যে জলধর বাবু প্রভৃতি দুই এক জনে, প্রাকৃত বাঙ্গালায় সমগ্র গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসীর হইয়াছেন। কিন্তু পারেন নাই। আমি নিম্নে প্রাকৃত বাঙ্গালার দুইটি কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিব। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, কবিতাদ্বয়ের পোণে ষোল আনা শব্দই দেশের প্রাকৃত।

(১)

"কলিকাটা ঝাপ্টা দোলা চলে না লো আর,
ওলো তায় ভোলে না ভাতার।
সীঁতের বেঁধে রাঙা ফিতে এলিয়ে দিবি চুল,
চুলে পরবি গোলাপ ফুল।
মাথাঘসা মেশা তেল মান ছিল ভারি,
তার নাই এখন জারি
ঘষে কেশ পমেটমে ছড়ায়ে সুবাস,
হেসে বেঁসে যাবি পতির পাশ।
খাড়ু পঁইছে ঢেঁড়ি ঝুম্‌কো শাঁখা নথে সেজে
এখন ঠাঁই পাবি নি শেজে।
বডি পরে বুকে বুরুচ হাতে চাঁদির চুড়ি,
তবে ত ভাতার পাবি ছুঁড়ী।
মুখে মেখে পাউডার ব্লুম্ দিলে ঠোঁটে,
পতি আসবে আপনি কোটে।
বিবিয়ানা সেজে গুজে বাড়াবি সোহাগ,
করে ধরে করবি অনুরাগ।
মিষ্টি হাসি দৃষ্টি ফাঁসি চখে ফুল-বাণ,
ভাতার রাখবে কোথা প্রাণ।"

(২)

"আয় ভাই খেলা ঘর পেতে খেলা করি,
হাতা,বেড়ী, হাঁড়ী,কুঁড়ী, পুজা হবে আন্ মুড়ী,
মাকে ব'লে আনাজের খোসা আন্ 'নরি'—
ধূলো আন্ ভাত্ হবে, যা না ভাই "হরি"!
খোলার কুচির মাছ—বাছ ভাল ক'রে—
ভাঙা বঁটি নেই ধার, সারিয়েছি কতবার,
দেখিস্ কাটে না. হাত—বাছ ধ'রে ধ'রে,
আঁস হেথা—বাট্‌না বাটিস্ গিয়ে স'রে।"

বৈদিক বাঙ্গালা আর এক প্রকারের বস্তু। উহা কানে শুনিবার সময়, সময়ে সময়ে, বৈদিক সংস্কৃতের ন্যায় সজল-জলদ-নিঃস্বনবৎ সুমধুর ও গভীর; অথচ উহার গাঁথনি বড়ই উচ্ছৃঙ্খল, বড়ই এলোমেলো। উহাতেও, আর্ষপ্রয়োগের ন্যায়, ইহাও হয়, উহাও হয়. এবং যাহা লৌকিক বাঙ্গা-

লাভ কখনও না হয়, উহাতে তাহাও অতি সহজে সংসিদ্ধ হয়। আমি এইস্থানে উহারও একটুকু নমুনা দেখাইব,—

সীতা রামচন্দ্রের বর্ত্তুলাকার বাহুলতিকার উপর মাথাটি রাখিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত। রাম এক এক বার তাঁহার সেই মনোমোহিনী মুখখানি নয়ন ভরিয়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, হা, আমি কি পাপিষ্ঠ! আমি কেমন করিয়া, আমার এই হৃদয়হারিণী জনকে বনবাসে দিব,—কেমন করিয়া ইঁহার মর্ম্মঘাতিনী বিরহসন্তাপ সহ্য করিব? সীতাচরিত্রের অমৃতমধুর মহত্বতা, এবং সীতার স্বাভাবিক প্রীতির গাম্ভীর্য্যতা যখন আমি স্মরণ করি, তখন আমার এই চিত্ত আপনা হইতেই উদ্বেল হইয়া উঠে। আকাশের ঐ যে নয়ন-বিনোদিনী শশী পীযুষবর্ষিণী আকার ধারণ করিয়া সংসার মোহিত করিতেছে, উহাও সীতার চারু-বিকসিতা চন্দ্রমুখের নিকট নিষ্প্রভা, ইত্যাদি।

উপরিধৃত বাক্যটিতে "মনোমোহিনী মুখখানি","হৃদয়হারিণী জন" ও "পীযুষবর্ষিণী আকার" প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণ গুলির অপূর্ব্ব বিন্যাস সাধারণ পাঠকের নিকট একটুকু বিচিত্র বোধ হইতে পারে। কিন্তু, যাঁহারা বৈদিক ব্যাকরণ পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা কোন অংশেও বিচিত্র বোধ হইবে না। কারণ, তাঁহারা যদি সর্ব্বজনপূজ্য পাণিনির অনুকরণে সামান্য একটি সূত্র রচনা করিয়া লন, তাহা হইলে সেই সূত্র, সেণ্টপলের বর্ণিত Charity অর্থাৎ উদারতার ন্যায়, সকল উচ্ছৃঙ্খলা আবরিয়া লইবে।

সূত্রটি কি?—"বৈদিকে লিঙ্গব্যত্যয়ঃ"—অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় পুংলিঙ্গের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে পুংলিঙ্গবোধক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপ আর কএকটি সূত্র রচনা করিয়া লইলেই, সর্ব্বপ্রকার বৈদিক বাঙ্গালার সকল প্রয়োজন সংসাধিত হয় না কি? কিন্তু, তাদৃশ নূতন সূত্রের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য, না যাহাতে বৈদিক বাঙ্গালা ক্রমে সম্মার্জ্জিত হইয়া সুবিশুদ্ধ লৌকিক বাঙ্গালায় পরিণত হয়, তৎপক্ষে বিশেষরূপে যত্নপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়? প্রশ্ন সহজ নহে। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অবশ্যই অতি বড় কঠিন। কেন না, যাঁহারা বঙ্গে সুলেখক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের লেখাই বৈদিক রীতিমতে বিভূষিত অথবা বিলক্ষিত।

আধুনিক বাঙ্গালাভাষার বিধুমুখী ছন্দ গদ্য ও পদ্য উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি। কাহারও মুখে এরূপ প্রশ্ন ফুটিতে পারে যে, গদ্যেও কি ছন্দ আছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞ লেখকমাত্রই বলিবেন—"আছে"। কাদম্বরীর গদ্যে এক ছন্দ, দশকুমারের গদ্যে আর এক ছন্দ। এইরূপ আবার ইংরেজীতেও ম্যাকলের লেখায় এক ছন্দ, কার্লাইল, এমার্সন ও রাসকিন্ প্রভৃতির লেখায় পৃথক্ পৃথক্ নূতন ছন্দ। আজিকালিকার বাঙ্গালায়ও ভাববিকাশ, শব্দবিন্যাস ও শব্দ-

গ্রন্থনের অভিনব বৈচিত্র্য হেতু বিধুমুখী ছন্দ নামে একটি অভিনব ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃতে নাই, প্রাকৃতে নাই; এ দেশের উর্দ্দু এবং ইউরোপের ইংরেজী, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষায়ও নাই। বাঙ্গালায় এইরূপ ছন্দের লেখা পড়িবার সময় স্বভাবতঃই বঙ্গের বাল্যোত্তীর্ণা বিরহ-শীর্ণা বিধুমুখীদিগের কথা মনে পড়ে বলিয়া, ইহা "বিধুমুখী ছন্দ" নামে অভিহিত হইতে পারে। পাঠককে বিধুমুখীছন্দেরও একটুকু নমুনা দিতে হইবে কি? ইহার প্রবর্ত্তক "রাই আমাদের—রাই আমাদের" প্রভৃতি পদাবলী রচয়িতা বদন অধিকারী, পোষ্টা তদীয় শিষ্য বিশ্রুতনামা গোবিন্দ, প্রচারক মনোহরসহি-গাথক গোস্বামিসম্প্রদায়, প্রশ্লেষক এখনকার প্রসিদ্ধ সমাজসমালোচক আনন্দনির্ঝর-নটকবি অমৃত লাল বসু। আমি প্রিয়বন্ধু অমৃতলালের লেখা হইতে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ বিধুমুখী ছন্দের আদর্শ দেখাইব। অমৃতলালের কিশোরী কহিতেছেন,——

"আমার ঘুম কোথায়—প্রাণনাথ এখনও বাইরে,—প্রেমিক বাবুরাম এখনও ছাপাখানায়—কাল কাগজ বেরোবার দিন। হঠাৎ কি যেন এক অদেখা, অশোনা, অজানা, অচেনা, অচাঁকা, অশোঁকা, অছোঁয়া, অশোয়া প্রেমবিহ্বলতা আমার হৃদয় চমকাইয়া দিল,—প্রাণের তার বেসুরা হইয়া গেল, বাহার গাইতে গাইতে বেহাগ আসিল, আমি উঠিলাম। এই বাসন্তি-বল্লরীবৎ জমেবাম্বিত-জোছনা-প্রতিম, ঘনীভূত বিজলীতুল্য, বাচের পানসীর মত কুসুম-সুকুমার তনুখানি কুসুম-শয্যা হইতে তুলিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, বাটা হইতে একটি চন্দ্রবালা লইয়া মুখে দিলাম। অর্গল খুলিতে মণিবন্ধে সিতোপল-বলয় রুণু ঝুনু করিয়া উঠিল; সিনীবালী নিশার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া একবার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, কাঞ্চীপদ কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু এ হৃদয়ের সিতিমা সে অন্ধকারকে গ্রাহ্য করিল না। ধীরে বাহির হইলাম, ধীরে ধীরে সিড়ি নামিতে লাগিলাম; ধীরে —উলাঙ্গিনী ধীরে—"।

এই সময়ে কায়া, রেণু, সুবাসা ও সুভুরু প্রভৃতি সুন্দরীরা কিশোরীর কথায় পোষকতা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিতে লাগিল,——

কায়া। যেন উঁচু নীচুতে পা পড়ে না, ধীরে—
রেণু। কাঁদা যেন পায়ে লাগে না, ধীরে—
সুবাসা। হোচট্ যেন খেও না কো, ধীরে—
এলা। যেন মুখ থুব্‌ড়ে পড়ো নাকো, ধীরে—
সকলে। ... ... ধীরে—
সুভুরু। যেন ইঁদুর বিড়াল মাড়িও না, ধীরে—
কুহারা। পিছ্‌লে যেন জমী নিও না, ধীরে—
সকলে। পাড়ায় যেন সাড়া পায় না, ধীরে—
——উলাঙ্গিনী ধীরে।"

পরিশেষে কিশোরী বাক্যের পরিসমাপ্তি করিলেন,—"ধীরে প্রাঙ্গণ পার হইলাম, ধীরে চৌবাচ্ছার পুলিনে গিয়া বসিলাম। চৌবাচ্ছা তখন বসুমতী-তল-বাহিনী, কলনল-বিহারিণী জলরাশিতে পরিপূর্ণ—টলটলায়মান। সলিল-রাশি স্থির

—ধীর—প্রশান্ত; বীচিশূন্য—আঁটিহীন—বেদানা।”

বর্ত্তমান কালের কালোচিত পৌরুষী প্রতিভার দিনে, বাঙ্গালাভাষার এইরূপ শক্তিনাশক, সামর্থ্যবিঘাতক ও অবসাদবর্দ্ধক এলায়িত মূর্ত্তি সাহিত্যের মঙ্গলজনক কি না, তাহাও বিচক্ষণ সাহিত্যিকদিগের বিচারসাপেক্ষ। পূর্ব্বেই কহিয়াছি বঙ্গীয় লিপিপদ্ধতির এই বড় সোহাগের বিধুমুখী ছন্দ বাঙ্গালি ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন জাতির কোনরূপ সাহিত্যে, সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত কস্মিন্ কালেও, প্রবেশপথ পায় নাই। এই বিশেষত্বে বাঙ্গালির গৌরব, না অগৌরব?—সম্মান না অসম্মান? বিধুমুখী ছন্দও, বৈদিক বাঙ্গালার ন্যায়, যুগযুগান্তরের তরে বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গলগ্ন হইয়া রহিবে কি?

জ্ঞানানন্দ শর্ম্মা।

কে গায়?

গভীর রজনী ভাগে
কেহ কোথা নাহি জাগে,
সুনিদ্রার ক্রোড়ে

রাখিয়া অবশ কায়
লভিছে বিশ্রাম তায়
সবে ঘুম ঘোরে;

হায়রে প্রকৃতি সতী
নীরব, গভীর অতি,
বোধ হয় কেহ

মদ-নদী উপবন
করিতেছে বিচরণ
অলক্ষিত দেহ;

আত্ম-চিন্তা উঠে মনে,
নীরব প্রকৃতি সনে
মিশা'য়ে হৃদয়

গাইয়া আশার গান
নিরাশায় আশা দান
করি মনে লয়।

ভাবনা-তরঙ্গে মোর
হৃদয় ডুবিল ঘোর,
নীরবে বসিয়া

মানব জীবন কেন?
কেন সুখ দুঃখ হেন?
দেখিনু ভাবিয়া;

হেন কালে অবনীর
নিস্তব্ধতা সুগভীর
ভেদিয়া যেমন,

কোমল সঙ্গীত স্বর
কাঁপাইয়া চরাচর
পশিল শ্রবণ;

নির্জীব প্রতিমা মত
সে সঙ্গীত ক্রমাগত
করিনু শ্রবণ,

মধুরে গাইছে গীত
সে সঙ্গীত স্বপ্নাতীত
অবশিল মন।

গাইছে,—"কুচিন্তাজলে
ডুবাইয়ে প্রতিপলে
অমূল্য জীবন

তুমি কেন কর ক্ষয় ?—
কি হইবে ফলোদয়,
না কর চিন্তন।

জগতের হিতে রত
রহ তুমি অবিরত,
হৃদয়ে তোমার

আনন্দ-তরঙ্গ কত
ধীরে ধীরে ক্রমাগত
বহিবে অপার"।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বসাক।

যক্ষ ও দক্ষ গিরি।

প্রথম প্রস্তাব।

পুরাণ-প্রসিদ্ধা দক্ষ ও যক্ষগিরিমালা দর্শনাভিলাষে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, আমরা পঞ্চনদ-প্রধৌত পবিত্র পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অম্বালা নাম্নী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন নিদাঘের কৈশোরাবস্থা; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম প্রান্তরের সাধারণ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে কুসুমাকরের শোভাময় ও সুখময় প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রভাতের প্রাণশীতল সুবিমল সমীরণের সুমধুর হিল্লোলের সহিত নানাজাতীয় সদ্যোজাত প্রসূনপুঞ্জের সুগন্ধি অণুসমূহ সম্মিশ্রিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছিল; অভ্রভেদী, অত্যুচ্চ, অপূর্ব্ব শোভাময় তরুবরসমূহের নিম্নতর শাখায় নবপল্লবরাশির মধ্যে বিমানবিহারী বিবিধ সুকণ্ঠ বিহঙ্গবর্গ সুমধুর কূজনে পথিকবৃন্দের পথশ্রান্তি বিদূরণ করিতেছিল এবং উচ্চতর শাখায় কুসুমকুলের কোমল কোরক ও কোমল পত্রাবলীর উপরে বৈদূর্য্যমণিদ্যুতি-তুচ্ছকারিণী অপূর্ব্ব কিরণমালায়, দিনমণি দেব, ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে প্রকাশমান হইতেছিলেন। আমরা সূর্য্যদেবের অনুপম উদয়োন্মুখ অবস্থা দর্শন এবং পূর্ণানন্দে পূর্ণব্রহ্মের পদারবিন্দ স্মরণ করিতে করিতে, অম্বালা নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। বীরাধিক বীর, দানবীরাধিক দাতা এবং

ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় শ্রীমৎ অম্বাসিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অম্বালা নগরীতে বর্ত্তমান কালে দর্শনোপযোগি বিশেষ কোন পদার্থ বর্ত্তমান নাই। তথাপি, নানা কারণে বাধ্য-হইয়া, আমরা এখানে তিন দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম।

চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে, আমরা যখন গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম, তখন অকস্মাৎ একজন পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীনবয়স্ক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হওয়ায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় গমন করিতেছেন?" আমরা কহিলাম, "যক্ষ ও দক্ষ গিরি দেখিতে যাইতেছি।" অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার বন্ধু কহিলেন "অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনারা যাহা দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, পঞ্জাব প্রদেশে তাহার অস্তিত্ব নাই। যক্ষ ও দক্ষ গিরি নামে কোনও পর্ব্বত বা পদার্থ পঞ্জাবে আছে, এরূপ কথা কখনও আমরা শ্রবণ করি নাই।" আমরা বলিলাম, "ভারতীয় ভূগোল শাস্ত্রের সহিত হতভাগ্য ভারতবাসীর এতাদৃশ বিপরীত সম্বন্ধ অনেকদিবস হইতে বর্ত্তমান আছে। ভারতের ভূগোলে ভারতবাসীর মধ্যে অনেকের যে অত্যন্ত অল্প অধিকার আছে, তাহাও ভ্রান্তি, বৈদেশিক কুসংস্কার এবং অজ্ঞানকালিমায় এবপ্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, সেই সামান্য জ্ঞানও, নগণ্য বলিয়া, অগ্রাহ্য। যে দেশে কলিকাতার নাম ক্যাল্‌কট্টা, বর্দ্ধমানের নাম বড্‌ডোয়ান, ইষ্টকাপুরীর নাম এটাওয়া, দলিপপুরীর নাম ডেল্‌হি, পবিত্রতীর্থ শিখাবতী ধামের নাম এক্ষণে কর্ণেলগঞ্জ, সে দেশে পুরাপ্রসিদ্ধ দক্ষ ও যক্ষ গিরির অস্তিত্বের কথা আরব্যোপন্যাসের অলীক উপন্যাস হইতেও অলীকতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহা ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!! যাহা হউক, আমরা প্রত্যাগমন করিয়া আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার সময়ে আপনাকে ঐ দুইটি স্থানের বিবরণ জানাইব।" আমাদের পঞ্জাব প্রদেশস্থ বন্ধুর ন্যায় অনেক বাঙ্গালী পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"কৈ! আমরাও এরূপ গিরিমালার অস্তিত্বের কথা ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই।" পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা কহিতে পারি, অজ্ঞাত বিষয়ের আবিষ্কার এবং অপরিচিত ও অনালোচিত বিষয়ের পরিচয় দান ও আলোচনা করিবা জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। সুতর দক্ষ ও যক্ষ গিরিতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইতে হইলে এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুত আবশ্যক, তাহা পাঠকের থাকা আবশ্যক কোন্ কোন্ পন্থার অনুসরণ করিয়া দক্ষ ও যক্ষ গিরিমালাভিমুখে অগ্রসর হইতে হ আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাও বর্ণনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি; মূলবিষয়ের বিবরণস পথের এবং পথপ্রান্তস্থ স্থান নিচয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করাও আবশ্য বলিয়া বিবেচনা করি।

"দক্ষ" ও "যক্ষ" এই নামদ্বয় পুরাণ-পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। দক্ষ-কন্যাকে যোগীশ্বর মহাদেব লোকশিক্ষার জন্য সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং দক্ষ মহারাজ মহোদয় ভগবান্ শিবের শ্বশুর। দক্ষযজ্ঞের বিবরণ, দক্ষ যজ্ঞে "সতী"র প্রাণ পরিত্যাগ, নারদের নিমন্ত্রণ-প্রভৃতি পৌরাণিক কথা, হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। যক্ষ মহারাজা ধনাধিপতি, ইঁহার অপর নাম, কুবের। "শেষনাগ" (অনন্ত নামক সর্প) ইঁহার ধনভাণ্ডারের প্রহরী; ভূগর্ভ এই বিরাট ভাণ্ডারের স্থান· এই জন্য মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত ধন দৃষ্ট হইলে, সে কালের ধর্ম্মভীরু হিন্দু পুরুষেরা ইহাকে "যক্ষের ধন" বলিয়া সহসা গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না, বরং সঙ্কুচিত হইয়া অপরাধ জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধি পালন করিতেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ শ্লোকে, একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে, সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এবং ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে যক্ষের উল্লেখ দেখা যায়।

আমরা "কাল্‌কা" (কালিকা) ষ্টেশনের টিকেট লইয়া অম্বালা নগরীর রেলওয়ে ষ্টেশনে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলাম। অম্বালা হইতে কাল্‌কা (Kalka) তিন ঘণ্টার পথ। পথিমধ্যস্থিত সমুদয় রেলওয়ে-ষ্টেশনগুলি হিন্দু দেবদেবীর নামানুসারে প্রখ্যাত। প্রথম ষ্টেশন "ধূলকুট", পার্ব্বত্য দেবতার নাম; এই দেবমন্দির রেলওয়ে বর্ত্ম পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার উপরে অদ্যাপি বর্ত্তমান। দ্বিতীয় ষ্টেশন "লালড়ু"র প্রকৃত নাম লল্লাটেশ্বর। এখানকার পুরাতন উপাসনালয়ের ভগ্নরাশি সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান আছে। তৃতীয় ষ্টেশন "ঘর্ঘর", ইহা ঘর্ঘর নামক নদ তটে অবস্থিত এবং তথায় ঘর্ঘ দেবতার মন্দিরও বর্ত্তমান। চতুর্থ ষ্টেশন "চণ্ডিগড়", ইহা চণ্ডীদেবীর নাম ও প্রভাবের পরিচায়ক। এই পর্ব্বত এক সময়ে হিন্দু রাজাদিগের সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। ইহার পরিষ্কার চিহ্ন এখনও পথিক এবং পরিব্রাজকগণ-কর্ত্তৃক, বিশেষতঃ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পুরুষদিগের দ্বারা পরিষ্কাররূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালিকা "কাল্‌কা ষ্টেশন" নামে পরিচিত। এখানে অতীব প্রাচীন কালের কালিকা-মন্দির ও কালিকা মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেবীর নামে এই নগরী প্রসিদ্ধ।

কাল্‌কা অতি সুন্দর স্থান। উৎকৃষ্ট জল বায়ুর জন্য যেমন ইহা বাসের যোগ্য, চতুর্দ্দিকস্থ নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্যও ইহা মনোহর হইতে মনোহর। ইহার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, অনুপম প্রাকৃতিক শোভায় মন-প্রাণ মোহিত হইয়া পড়ে। এক একটা স্থান এমত মনোহর, এমত শোভাময়, এমত অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ যে, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অত্যদ্ভুত ও অপার সামর্থ্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপ্রমেয় বুদ্ধি, অচিন্তনীয় কৌশল, অনধিগম্য শিল্পচাতুরী, এবং অপরিমিত প্রেম ও করুণার বিষয় ভাবিতে

ভাবিতে মনে হয়, সেই অনবদ্য অব্যয় অনাদি পুরুষেশ্বর না জানি সৌন্দর্য্য হইতেও কত সুন্দর!

"এই বিশ্ব মাঝে
যেখানে যা সাজে
সাজায়ে রেখেছ গুণমণি!"

সমগ্র বিশ্বসংসারের সৌন্দর্য্যরাশি একত্র করিলেও বুঝি বা সেই অনন্ত সুন্দরের অপার সৌন্দর্য্য অংশতও পরিস্ফুট হয় না।

কাল্কা নগরী পর্ব্বতোপরে অবস্থিত। নগরীর উপরেও পর্ব্বত এবং পর্ব্বতের উপরেও লোকালয়। পর্ব্বতের উপরেও অগণ্য পর্ব্বতমালা যেন মেখলার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া আকাশকে চুম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কালিকা নগরীর উচ্চতা দুই সহস্র ফিট; এই নগরী কলিকাতা হইতে প্রায় ছয় শত ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী এবং এখান হইতে সিমলা শৈল ত্রিশ ক্রোশের অধিক অন্তর নহে। নগরীতে প্রায় সার্দ্ধচারি সহস্র হিন্দু, দুই সহস্র মুসলমান এবং তিন শত খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন। দুই ক্রোশ দূরে, পাতিয়ালাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত ও অধিকৃত "পিন্জোর্" নামে যে মনোহর উদ্যান আছে, তাহা এখানকার প্রাকৃতিক শোভার তুলনায় নগণ্য হইলেও দেখিবার যোগ্য। এই ভয়ানক উষ্ণ ও ভয়ানক শীতল প্রদেশে ফলে, ফুলে, গাছে ও লতায় যত সৌন্দর্য্য থাকা সম্ভব, "পিন্জোর্" উদ্যানে তাহার অল্পতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ দেশে শৈত্য এবং উষ্ণতা (অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতু এবং শীত ঋতু) এতদুভয়েরই প্রবল প্রভাব দেখা যায়। মাঘের বিক্রমে যেমন বাঘ মরে, তেমন জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মে মনুষ্যেরা "ত্রাহি মধুসূদন" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু উভয় ঋতুতেই অধিবাসীরা সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করিয়া থাকে। যে পর্ব্বতের উপর দিয়া শিরোলা ও কশুলী সেনানিবাস যাইবার পথ আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই পাদদেশে কাল্কা নগরী অবস্থিত। অম্বালা হইতে কাল্কা এবং কাল্কা হইতে সিমলা প্রভৃতি স্থান সমূহ পাতিয়ালা এবং কতিপয় দেশীয় নরপতিদিগের অধিকারে অবস্থিত ছিল; বিক্রমী বৃটিশসিংহ ক্রমে ক্রমে এই সমুদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন। শিক্ষা বা সভ্যতা বিস্তার করা অথবা কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতির উন্নতি বিধানের অভিপ্রায়ে ইংরাজ বাহাদুর কাল্কা অধিকার করেন নাই; এতদঞ্চলে সেনানিবাস স্থাপন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কাল্কা একণে সেনানিবাসের একটা প্রধান স্থান। ইহার অনতিদূরে পাঁচ ছয়টা সেনানিবাস আছে, তদ্ভিন্ন সিমলা ও তাহার পার্শ্বে অনেক সেনা বাস করিয়া থাকে। এই সমুদয় সেনার প্রধান "আড্ডা" কাল্কানগরী। এখান হইতে তাহাদের খাদ্যের ও ব্যবহারের জন্য পশু, পক্ষী, বস্ত্র, শস্য, মাংস, মৎস্য, সুরা, ডিম্ব, ফল, মূল ইত্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহা ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের ও সেনা এবং

সৈনিক পুরুষদিগের প্রধান বিশ্রাম স্থান। সিমলা যাইতে হইলে প্রথমে কাল্‌কা যাইতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই।

কাল্‌কার যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই পর্ব্বতমালা ও নিবিড় অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকিবে। কাননের সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতোপরিস্থিত বর্ত্ম সমূহের বিচিত্রতা, পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য, ঝরণার নির্ম্মল জলপতনের শ্রুতি মধুর শব্দ, পক্ষিগণের সুমধুর কাকলীলহরী, ময়ূরময়ূরীর নৃত্য, হরিণশিশুর কৌতুককর ক্রীড়া, পার্ব্বতীয় পুরুষ ও রমণীদিগের দৈহিক সৌন্দর্য্য, তদ্ভিন্ন সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তকালের অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক শোভা প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিলে কাল্‌কাকে সৌন্দর্য্যের অন্যতম আকর বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কাল্‌কা-নগরীর কালীমন্দির অতি সুন্দর স্থানে প্রতিষ্ঠিত। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের প্রদেশে এবং ঝরণা ও অরণ্যের পার্শ্বে প্রাচীন কাল হইতে এই মন্দির দৃষ্ট হইতেছে। অসংখ্যাসংখ্য তাপসবর এ স্থানে তপস্যা করিয়া পুণ্য প্রভাবে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কাল্‌কার কালীমূর্ত্তি এবং বাঙ্গালা দেশস্থ মন্দিরের কালীমূর্ত্তি একই রূপ; পূজা-পদ্ধতি একই প্রকার; কিন্তু বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশে শক্তির শক্তিস্বরূপিণী মহাকালীর পূজা করিয়া এতদ্দেশবাসী লোকেরা বিগত-ভী, সাহসী, সবল, উৎসাহী, স্বার্থত্যাগী, দীর্ঘাকার ও দীর্ঘজীবী হইয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক পরিণামে পরমধামাভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়; কিন্তু বঙ্গের লক্ষ্মী-শ্রীভ্রষ্ট পুরুষেরা কালীপূজাকে এমন একটা তামাসার ব্যাপার বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছে যে, কালীপূজা অর্থে মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, বলিদান, প্রবৃত্তিপুঞ্জের ক্রীড়া, বিলাস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য মায়ের কৃপা হয় না, মহাশক্তির এক কণা শক্তি লাভও ঘটে না, সুতরাং বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, দরিদ্রতা এবং আন্তরিক মলিনতা দূরীভূত হয় না। বাঙ্গালীর ভক্তি কৈ? প্রকৃত ভক্তের যে অমিত ও অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে, মৃৎপিণ্ড সুবর্ণখণ্ড হইতে পারে, অন্ধজন বিশ্বসংসার-দর্শক হইতে পারে, পাষাণ-পাপী বিগতকলুষ হইয়া সর্ব্ব গুণে গুণাকর হইতে পারে এবং যে ভক্তিবলে "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং", ইত্যাদি অসম্ভব সম্ভবপর হয়। বাঙ্গালীর সে ভক্তি কৈ? যোগশাস্ত্রে, ভক্তিরস-প্রধান ভাগবতে, পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, জ্ঞান-সমুদ্র তন্ত্রশাস্ত্রপ্রভৃতি সকল স্থানে ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন "আমাকে (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্তির এক ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের নাম ভক্তি।"

ভক্তিহীন আমি ব্রাহ্মণেরও নই।
ভক্তি থাকিলে আমি চণ্ডালেরও হই॥

অপার জ্ঞান-বারিধিতুল্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রের সমুদয় তাৎপর্য্য ইহার প্রথম ও শেষ এই দুই শ্লোকে সংক্ষিপ্ত ভাবে অভি-

ব্যক্ত আছে, তাহাই ভক্তির ফল। ঐ দুই শ্লোকের গূঢ়ার্থ অতীব মনোহর।

আমরা কাল্‌কা নগরীতে ক্রমশঃ পর্ব্বতোপরে আরোহণ করিয়া, বুদ্ধিমান্, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যত্ন ও অজস্র অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত সুপ্রসর ও বিচিত্র পার্ব্বতীয় বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া, দক্ষগিরি অভিমুখে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমাগত পর্ব্বত ও অরণ্য ভেদ করিয়া,প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম পূর্ব্বক আমরা যে স্থানে অশ্বতর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম, তাহার নাম দক্ষগিরি। এই পথের কিয়দংশ আমাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই আশ্চর্য্য পার্ব্বত্যপথ ইংরাজের অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পথের বিশেষত্ব এই যে, এমন নিবিড় অরণ্যের পার্শ্ব দিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি কোথাও একটি পাতা দেখিলাম না; সমুদয় পথ অতীব পরিচ্ছন্ন এবং এত পরিষ্কার যে, একটা আলপিন পড়িয়া গেলে, তাহাও সহজে খুঁজিয়া লওয়া যায়। পথের ধারে ধারে বন হইতে অসংখ্য কুসুমের সুগন্ধে এবং অগণ্য বিহঙ্গের মধুর রবে আমরা মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। এই বনের ভিতর লোকালয় আছে, ইহারা পার্ব্বতীয় লোক। আমরা যেখানে অবতরণ করিলাম, তাহার[illegible] সার্দ্ধ ছয় সহস্র ফিট। এখানে যে ইউরোপীয় সেনা-নিবা[illegible] আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র নগর হইতে প্রা[illegible] এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমা[illegible] কালে লোক-সংখ্যা পঞ্চসহস্রের অধি[illegible] নহে। ইংরাজীতে ইহার নাম "ডক্‌সাই (Dokshai)। বঙ্গদেশ ব্যতীত আর স[illegible]দয় স্থানে "ক্ষ" এই অক্ষর "ক্স" এইরূ[illegible] উচ্চারিত হইয়া থাকে, তদ্যথা—কক্ষ, কক্স রক্ষা, রক্সা; মোক্ষ, মোক্স; দক্ষ, দক্স ইত্যাদি। ইংরাজি ভাষায় "দ" ড বলি[illegible] উচ্চারিত হয়। এই পর্ব্বত পুরাণ-প্রসি[illegible] দক্ষ মহারাজের জন্মস্থান, ইহা হিমাল[illegible]র্গত; এই স্থানেই শিবের বিবাহ [illegible] ছিল। ইহারই নাম দক্ষগিরি। (ক্র[illegible]

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

"উপর-নীচের মিলন কথা।"

ভাণ্ডার নামক মাসিক পত্রে, উপরিধৃত শিরোনামে, অতি সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক উদার, উৎকর্ষপ্রিয়, সমাজহিতৈষী ও সূক্ষ্ম-দর্শি-সমাজ-সমালোচক। তাঁহার প্রবন্ধের সারমর্ম্ম এই যে, যাঁহারা সমাজের উপরিস্থ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা যদি প্রীতিশ্রদ্ধা অথবা সৌজন্যের অনুরোধে সমাজের নীচস্থ-দিগের সহিত সম্মিলিত হন, তাহা হইলে সেই সম্মিলিত-সমাজ সজীব-শক্তির ন্যায় দেশের মঙ্গল সাধন করিবে;—যাহারা আজি সমাজের নিম্নতর ভূমিতে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা যদি উপরিস্থ-দিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই ঐ মিলনেই তাহারা মনুষ্যত্বলাভের মঙ্গল্য পথে নূতন আলোক পাইয়া সমাজের সামর্থ্যবৃদ্ধির কা-[illegible] হইবে। প্রবন্ধের কথাগুলি বড়ই মিষ্ট, কিন্তু নামটি তেমন মিষ্ট নহে। নামটি আমার নিকট ভাল লাগে নাই। নামের সহিত প্রকৃত তত্ত্বেরও সামঞ্জস্য নাই।

মানবসমাজ, পৃথিবীর কোন দেশেই, উপর আর নীচ, অথবা উপরিস্থ ও নীচস্থ, এইরূপ দুটি মাত্র স্তরে বিভক্ত নহে। পর্ব্বতের বিশাল তনু যেমন ভূতাত্ত্বিকের চক্ষে বহুস্তরে বিভক্ত, সমাজের বিশাল বপুও সেইরূপ নৃতাত্ত্বিকের চক্ষে বহু শত সুস্পষ্ট স্তরে বিভক্ত। সুতরাং "উপর" আর "নীচ" অথবা উপরিস্থ ও নীচস্থের রেখা নির্দ্দেশ করিব কি প্রণালীতে?

যাঁহারা সাধারণতঃ ইংরেজীতে সমাজের Upper Ten অর্থাৎ উপরিস্থ দশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারাই কি প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের "উপর" অথবা উত্তমাঙ্গ? যদি সত্যের আলোকবর্ত্তিকা লইয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবে যে, যাঁহারা উপরিস্থ সামাজিক নামে শিঙা বাজাইয়া তরিয়া যাইতেছেন, তাঁহা-দিগের সহিত মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদই বরং বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বাঘের প্রখর নখর ও খরতর দন্ত লইয়া নিরন্তরই দুঃস্থদুর্ব্বলের বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক রক্ত শুষিতেছেন; কেহ ভল্লুকের মত পরের নাকের উপর কামড় দিয়া, তাদৃশ বিকট-মুখেও হিঃহিঃ শব্দে হাসিতেছেন। কাহারও মুখখানি মধুরস্নিগ্ধ স্মিত-রেখায় শোভিত থাকিলেও হৃদয়টি সাপের সংহার-বিষে সতত পূর্ণ; কেহ আবার আপনার স্বভাবগুণে সর্ব্বাংশে ছাগকুক্কুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও প্রভাব-গুণে সামাজিকদিগের অগ্রগণ্য। কেহ বাহিরে দেবতাটির মত শুভ্রাম্বরে বিভূষিত ও শান্তশিষ্ট সুপুরুষ, অথচ ভিতরে সেই সত্য-

যুগের অঘাসুর; কেহ বা ভীরুতা প্রভৃতি বিবিধ কারণে অসুর হইতে না পারিয়া, প্রকৃতির অন্যবিধ প্রবর্ত্তনায় পিশাচ।

ইহাদিগকে যদি উপরিস্থ বলিব, তাহা হইলে সমাজে নীচস্থ কে? উপরিস্থ দলের মধ্যে উপরে থাকিবার লোক না আছেন এমন নহে। মানুষ যখন সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হয়, তখন সে যত দুঃখে,—যত ক্লেশে জর্জ্জর রহুক না কেন, তাহার তাপিত প্রাণ কিছুকালের তরে শীতল না হইয়া যায় না। ইহা মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, এই পাপদগ্ধ পৃথিবী, সকল দেশে ও সকল সময়ে তাদৃশ সমৃদ্ধ সাধুর পদধূলি লাভে কৃতার্থ হয় না। সমাজে যদি উল্লিখিতপ্রকার "প্রাকৃত আভিজাত" অথবা স্বভাবসিদ্ধ উপরিস্থের সংখ্যা বেসী থাকিত, তাহা হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই লোক-ভয়ঙ্কর ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লব, শত-পর্ব্বত-বিদারি ভূমিকম্পের গর-গর গর্জ্জনে সহসা উদগীর্ণ হইয়া, পৃথিবীকে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল কম্পিত রাখিত না;—রুষের বহুলক্ষ শস্ত্ররক্ষিত সুবিশাল সাম্রাজ্য আজি তরঙ্গক্ষুব্ধ জীর্ণ তরীর ন্যায় প্রলয়-সমুদ্রে ডুবু ডুবু হইত না;—এবং ইংলণ্ডের পুণ্যলক্ষ্মী রাজ-রাজেশ্বরী আয়ুষ্মতী আলেকজেন্দ্রিয়ারও আজি স্বদেশস্থ দুঃখিদিগের সাহায্যে দুঃখিনীর ন্যায় ভিক্ষা চাহিবার কারণ ঘটিত না।

পক্ষান্তরে, যাহারা সমাজের "নীচ" অথবা নীচস্থ সংজ্ঞ বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত, তাহাদিগের মধ্যে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই তাহাদিগের কেহই কম্‌ৎটের সমাজবিজ্ঞান পড়ে নাই, তথাপি তাহারা, প্রাণের স্বাভাবিক সামাজিকতায়, পরের সুখশান্তি লইয়াই প্রায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত কেহই বেদবেদান্তের কোন কথা জানে না তথাপি, যাহাকে আমরা অভিমানের অতি মাত্র উচ্ছ্বাসে অতি বড় দুরস্থ 'পর' বলিয় ঘৃণা করি, তাহাকে তাহারা রোগে ঔষ শোকে সান্ত্বনা, ক্ষুধায় একমুষ্টি অন্ন, অথ তৃষ্ণায় এক আঁজল জল যোগাইয়া, আন উৎফুল্ল হয়, এবং ঐ পরকেই আপন জ বলিয়া প্রাণে জড়াইয়া রাখিতে চেষ্টাইরূপে বস্তুতঃ এই শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক কম আছে, যাহারা পুরাণ না পড়িয়া; দক্ষ আতিথেয়ী, এবং আধুনিক শিক্ষারলিয় মাত্র না জানিয়াও চিত্ত ও চরিত্রের অন লভ্য প্রাকৃতসম্পদে দয়াধর্ম্ম পরায়ণ দেবতু পুরুষ।

তাই জিজ্ঞাসা করি, সমাজের "উপর" লিলে কাহাকে বুঝিব, আর "নীচ" বলিলে বা কাহাকে নীচ বলিয়া জানিব? কথ তৌলাইয়া দেখিলে ভাল হয় না কি? ি তর-স্তর-স্থিত-শ্রমজীবীরা যখন আমাদি পথে উঠিবে,—আমাদিগের শিক্ষায় শিি হইয়া অভিমানে মাথা তুলিবে, এবং আ দিগের অনুসরণে আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব অপূ সভ্যতার স্বাদ পাইবে, তখন ইহারা উ কৃত না অপকৃত হইবে, সে বড় কা সমস্যা।

শ্রীজ্ঞানানন্দ শর্ম্মা

অন্তিম দর্শন

অথবা

অনন্তযাত্রার বিদায়গ্রহণ। *

(৩)

...গুন হইতে দক্ষিণপশ্চিমকোণে, প্রায় ...াশী মাইল দূরে,—অতি সুন্দর একটি ...মুদ্র-শাখার উপকূলে, সুপরিচিত সাউদাম্-...ন নগর; এবং নগরের উপকণ্ঠে আর্চার্জ ...জ্ (Archer's Lodge) নামক সুরম্য ভদ্র...দিগের...তন। উল্লিখিত লজ্ অথবা নিকেতনে ...সেই ...ড নামক সম্রান্তবংশীয় ভদ্রলোকেরা ...দেশেকরিতেন।

...সময়ে সদাশয় পুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-...আর্চার লজের অধিপতি বলিয়া ইংল-...র সামাজিকদিগের নিকট পরিচিত ছি-...তাঁহার নাম জেম্‌স্ ওয়েল্ড। ওয়েল্ড-...রা ধর্ম্মে রোমান ক্যাথলিক। জেমস্ ...র অগ্রজ, প্রথম বয়সেই, ক্যাথলিক ...য়ের ধর্ম্মযাজকতা অবলম্বন করিয়া, ... কার্ডিনাল ওয়েল্ড নামে প্রসিদ্ধ হন। ...কে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, ...ন ক্যাথলিকদিগের মধ্যে, পোপের ...ত্তি পদবীই কার্ডিনাল। সুতরাং, যে বংশে এক জন কার্ডিনালের পদ প্রাপ্ত হন, সে বংশের সকল কথা লইয়াই দেশের সর্ব্বত্র নানারূপ আলোচনা হইয়া থাকে।

জেম্‌স্ ওয়েল্ডের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতবিদ্য ফিলিপ ওয়েল্ডের কথা লইয়া দেশে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। সেই কথাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

মিষ্টার জেম্‌স্ ওয়েল্ড, বড় দরের ভূস্বামী না হইলেও, ভূস্বামিসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কেন না, ইংলণ্ডীয় ভূস্বামিসম্প্রদায়ের ইতিহাসে † তদীয় বংশাবলীরও ইতিবৃত্ত গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সাতাইশ বছর বয়সের সময়, লর্ড পিটরের কন্যা মাননীয়া জুলিয়ানার সহিত পরিণীত হন।

পতিপরায়ণা জুলিয়ানার গর্ভে জেমস্ ওয়েল্ডের ক্রমে তিন পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ

* অন্তিমদর্শন নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ বিগত মাঘ মাসের ও ... প্রবন্ধ বিগত ভাদ্রমাসের বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে।

† Burke's "Landed Gentry," Vol. II. art, "Weld of Lulworth Castle"

ফিলিপ ও কন্যার মধ্যে দ্বিতীয়া কন্যা ক্যাথারিণের সহিতই এই প্রবন্ধের সম্পর্ক।

ফিলিপ কনিষ্ঠ হইলেও রূপে ও গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতেই প্রাইভেট টিউটারের নিকট লেখাপড়া করিয়াছে। কিন্তু ঐ বয়সেই সে এত শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে, প্রতিবেশিমণ্ডলীতে পণ্ডিত বালক বলিয়া তাহার একটা প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে। প্রতিপত্তির বিশেষ কারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা। বালক ফিলিপ প্রতিদিনই প্রাতে, অপরাহ্নে, এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে, নিভৃতে বসিয়া জানুপাতসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে; পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন ও শিক্ষকের নিকট সকল সময়েই প্রণতবৎ রহে, এবং বাড়ীর আশে পাশে যে সকল দীন-দুঃস্থ বালক-বালিকা বাস করিত, তাহাদিগকেও হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। এহেন সুকৃতী, সুচরিত্র, পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রের প্রতি পিতামাতার প্রাণ কিরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

পিতা জেমস ওয়েল্ড, পুত্রের উচ্চতর শিক্ষাভিলাষে, ফিলিপকে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হার্টফর্ড-শায়ারের অন্তর্গত ওয়েয়ার নামক নগরের নিকটস্থিত সেণ্ট-এডমণ্ড কলেজে প্রেরণ করিলেন, এবং সেখানকার শিক্ষকেরাও ফিলিপের অলোক-সাধারণ চিত্ত ও চরিত্রের পরিচয় পাইয়া অচিরেই তাহার প্রতি বিশেষরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। ফিলিপ পনর বৎসরের বালক; কিন্তু যাহাদিগের বয়স বিশ বৎসর পার হইয়াছে, তাহারাও তাহার উপদেশ গ্রহণের জন্য লাল[illegible] বালকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশং[illegible]

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্র[illegible] বৎসর পার হইয়া গেল; ফিলি[illegible] কালেই উচ্চ শিক্ষিত যুবা বলিয়া [illegible] নাই যশস্বী হইল। পিতা, মাতা [illegible] ভগিনিদিগের কি আনন্দ! এ সময়ে [illegible] দিন অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এ[illegible] মিষ্টার জেমস্ ওয়েল্ড কন্যা ক্যাথারি[illegible] সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহিরে হাঁটিয়া বে[illegible] তেছেন। তখন বেলা প্রহরেক অ[illegible] আকাশে প্রখর রৌদ্র; কিন্তু সেই [illegible] বড় মিষ্ট। ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরা ম[illegible] এপ্রিলের অপরাহ্নে তাদৃশ সুখসেব্য [illegible] পাদচারণা করিয়া প্রীতি লাভ করেন।

মিষ্টার ওয়েল্ড বৃদ্ধ হইলেও শরীরে [illegible] তিনি পাদচারণা করিতে করিতে ক্রমে [illegible] রের একটা পরিচিত চৌরাস্তায় উ[illegible] হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। [illegible] থারিণও, যেন নগরের প্রকৃত শোভা দে[illegible] অভিলাষেই, চারি দিকে তাকাইতে [illegible] ক্যাথারিণ অকস্মাৎ আকুল কণ্ঠে ব[illegible] উঠিল "বাবা, দেখেছেন, বাবা, দেখো[illegible] ঐ ত ফিলিপ?"* জেমস্ ওয়েল্ডও [illegible] গাৎই ফিরিয়া দেখিলেন এবং বলিয়া [illegible] লেন, "হাঁ, তাই ত বটে, এ ত ফিলি[illegible] কিন্তু ফিলিপ এরূপ নিশ্চল প্রশান্ত ম[illegible] ওখানে দাঁড়াইয়া কেন? আর [illegible]

* "Look there, Papa, ther[illegible] Philip."

একটি কথাও কহিতেছে না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেছে, ইহাই বা কেন? ফিলিপের পার্শ্বে ঐ যে আর একটি দেবমূর্ত্তি যুবা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঐটিই বা কে?"

বৃদ্ধ ওয়েন্ড ও তাঁহার কন্যা ক্যাথারিণ ভীত-বিস্মিত-স্তম্ভিতবৎ ধীরে ধীরে ফিলিপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে ক্রমেই কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া, উৎকণ্ঠা ও আকুলতায় আত্মহারার মত হইলেন। ফিলিপ্ এবং তাহার সহচর এখন আর তাঁহাদিগের নিকট হইতে দুই তিন হাতের অধিক দূরবর্ত্তী নহে; অথচ ফিলিপ, পূর্ব্বের মত, দৌড়িয়া বৃদ্ধের কাছে আসিতেছে না,—তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে এবং বাবা বলিয়াও তাঁহাকে সম্ভাষণ [illegible]তেছে না। তবে তিনি এ কি দেখিতে[illegible]? কিন্তু ইহা ত চক্ষের ধাঁধাঁও হইতে [illegible]না; কারণ তিনিও দেখিতেছেন, [illegible]রিণও দেখিতেছে। দুই জনেই ধাঁধাঁ [illegible]তেছেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। [illegible] হইলে, এই দৃশ্য কি?

[illegible]দ্ধের ইচ্ছা, তিনি কাছে যাইয়া এই [illegible]ক্ষদৃষ্ট পুত্রমূর্ত্তিকে বুকে জড়াইয়া আলি[illegible] করেন। কিন্তু এখন আর তাঁহার [illegible]রিতেছে না। তাঁহার হৃদয়ে ঘোরতর [illegible]ন্মিয়াছে, এবং সে সংশয় তাঁহাকে [illegible]রিয়া তুলিতেছে। দুঃখ এই, তাঁহার [illegible]য়ও বহুক্ষণ রহিল না। তিনি [illegible]তিন চারি মিনিট কাল তাকাইয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ঐ তিন চারি মিনিট শেষ হইতে না হইতেই ফিলিপ ও তাহার সহচরের শুভ্রসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার ও ক্যাথারিণের নিস্পন্দ চক্ষের সম্মুখে সহসা আকাশে মিশিয়া গেল; তিনি মাথায় হাত দিয়া রাজপথেই বসিয়া পড়িলেন। ক্যাথারিণ তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া, নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিতে দিতে বাড়ীতে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, তিনি বাড়ীতে যাইয়াও কোনরূপ সান্ত্বনা পাইলেন না।

রাত্রিটা কোনরূপ কাটিয়া গেল। তার পর দিন অপরাহ্নে, সেণ্ট-এডমণ্ড কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ("The very Reverend Dr. Cox") অতিমাত্র ভক্তিভাজন ডক্টর কক্স্ ফিলিপের পিতাকে সুস্থির করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং যাইয়া আর্চার লজে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বৃদ্ধ ওয়েন্ড আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন,—"মহাশয়, আপনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাহা আর কহিতে হইবে না। আমি সকলই জানি। ফিলিপ আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি আমার কন্যা ক্যাথারিণকে লইয়া কল্য চৌরাস্তায় হাঁটিতেছিলাম, সেখানে আমরা দুই জনেই দিবসের সুস্পষ্ট আলোকে, ফিলিপকে চক্ষে দেখিয়াছি।" *

*"Yesterday I was walking with my daughter Katharine on the

বৃদ্ধ ইহার পর ফিলিপ ও তাহার সহচর দেব-পুরুষের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া বলিলেন। পণ্ডিতবর কক্‌স্‌ আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া কিরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ফিলিপ কিরূপে অকস্মাৎ ঊর্দ্ধধামের অধিবাসী হইয়াছে, তাহা জেম্‌স্‌ ওয়েল্ড জানিতেন না। সে দুঃখের কাহিনী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে জানাইলেন। প্রধান অধ্যক্ষ ডক্টর কক্‌স্‌ বলিলেন,—

"গত কল্য ১৬ই এপ্রিল কলেজ বন্ধ ছিল। কলেজের সমস্ত বালকই বন্ধ উপলক্ষে (Ware) ওয়েয়ার নগরের নদীতে যাইয়া নৌকা বাহিবার ক্রীড়াকৌতুকে দিনপাত করিয়াছিল। ফিলিপ ওয়েল্ডও সেই আমোদে যার-পর-নাই উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিল। সে যে নৌকায় ছিল, তাহা নদীর বাঁকে অনেক বার "বাইচালি" করার পর, সঙ্গের মাষ্টার বাড়ীতে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ফিলিপ আর এক বার "বাইচালির" জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, সকল বালকই উৎসাহের সহিত দাঁড় টানিতে লাগিল, এবং নৌকা তীরের মত ছুটিল। কিন্তু নৌকা যখন গন্তব্য স্থানে পঁহুচিয়া বড় জোরে ধাক্কা খাইল, তখন সে ধাক্কায় আর কাহারও কিছু হইল না, অথচ নিয়তির নেত্রলক্ষিত পিতৃবৎসল ফিলিপ সেই ধাক্কাতেই নদীর গভীর জলে নিপতিত হইয়া, দেখিতে না দেখিতে, দেহমুক্ত হইল।"

ডক্টর কক্‌স্‌ কহিতেছেন আর অশ্রু মোচন করিতেছেন। বৃদ্ধ ওয়েল্ড এবং তদীয় পরিবারস্থ সকলেই সেই কাহিনী শুনিয়া নয়নজলে ভাসিতেছেন। যখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে সকলের চিত্তই অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিল, তখন প্রশ্ন হইল যে ফিলিপের সঙ্গে যে আর একটি দিব্যমূর্ত্তি যুব জেম্‌স্‌ ওয়েল্ড এবং তাঁহার কন্যাকে দর্শন দান করিয়াছেন, তিনি কে? ...... র

সে দিন এই বিস্ময়ব্যঞ্জক প্রশ্নের সিদ্ধা[illegible] রূপ মীমাংসা হইল না। কিন্তু কথিত ঘটনার কএক সপ্তাহ প[illegible] ওয়েল্ড, ল্যাঙ্কেশায়ারের অন্তর্গত ([illegible] Hurst) ষ্টোনি হার্ষ্ট নামক স্থানের [illegible]লিক গির্জ্জায় নিয়মিত উপাসনার পর, সেই মূর্ত্তিটির একখানি প্রতিকৃতি দে[illegible] পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি গি[illegible] যাজকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া [illegible]লেন যে, যাঁহার প্রতিকৃতি ঐ রূপ [illegible] যোগ্য স্থানে বিলম্বিত রহিয়াছে, তাঁহার (Stanislaus Kostka) ষ্টানিশ[illegible] কষ্‌কা। তিনি পোলেণ্ডের একটি আ[illegible] যুবা; অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময়েই [illegible]

turnpike road in broad daylight, and Philip appeared to us both. He was standing on the causeway with another young man in a black robe by his side. My daughter was the first to perceive him."

হইয়াছেন ; এবং ঐ বয়সেই ঈশ্বরপরায়ণতা এবং চরিত্রের অলোকসামান্য পবিত্রতায় সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যে অতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রণোদনে ক্যাথলিকদিগের মধ্যে (Saint) সেণ্ট উপাধি পাইয়াছেন।

এ দেশের প্রাচীন হিন্দুরা যেমন ঋষিতাপসদিগের পূজা করেন, রোমান ক্যাথলিকেরাও সেইরূপ ঋষিপ্রতিম সাধুদিগের পূজা করিয়া থাকেন। ষ্টেমস্ ওয়েল্ড স্বগৃহে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র প্রতিভান্বিত ফিলিপ-ওয়েল্ড ষ্টানিশলেয়সের ভক্ত * ছিল ; এবং ঈশ্বরের উপাসনার পর প্রতিদিনই ষ্টানিশলেয়সকে স্মরণ করিয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিত। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কৃপালুচিত্ত ষ্টানিশলেয়স চরম সময়ে ফিলিপের সঙ্গী হইয়াছিলেন ; এবং তাহার পিতাকেও প্রীতিপূর্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া, পারলৌকিক জীবনের প্রেমবন্ধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ জানিবার অবসর দিয়াছিলেন।

পরলোক ত প্রত্যক্ষ সত্য! কিন্তু আমরা এ প্রত্যক্ষকে কত কাল—হা! আর কত কাল অপ্রত্যক্ষ অলীক বস্তুজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া আত্মবঞ্চনা করিব ?

সংক্ষিপ্ত সমালোচন ।

"বর্ত্তমান ভারত, স্বামী বিবেকা-[নন্দ প্রণ]ীত প্রবন্ধ, মূল্য চারি আনা। স্বর্গগত [বি]বেকানন্দের এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া [...] পথে অনেক নূতন আলোক পাই-[...] বিবেকানন্দ প্রতিভার জ্বলন্ত বহ্নি [...]ইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সু-[...] তাঁহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা সর্ব্ব লেখাতেই প্রতিভার মুদ্রা পরিলক্ষিত [থা]কে। ইহা বলা বাহুল্য যে, "বর্ত্তমান ভারত" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরকাল পরিরক্ষিত রহিবে।

২। "সন্তান-শিক্ষা, কথোপকথনে নীতি-বিষয়ক উপদেশ, ডাক্তার শ্রীরামলাল সরকার প্রণীত মূল্য ১।০ আনা।"—এই পুস্তকখানি ডিমাই অক্টেভো ২৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ; ইহার মুদ্রণ সুন্দর ; ইহাতে জ্ঞাতব্য কথা অনেক আছে। বঙ্গীয় কুলবালারা, একটি সপ্তাহ কাল উপন্যাস পাঠ বন্ধ করিয়া, এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের উপকার হইবে। পুস্তকের বক্ত্রী মাতা জ্ঞানবালা, শ্রোতা পুত্র সুধীরকুমার। গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে এবং

[* "...]S. Stanislaus Kostka, one of [the g]reatest saints of the Jesuit [order,] and the one whom Philip [had c]hosen for his patron saint at [his co]nfirmation."

মুখ-শ্রুত কথোপকথন-চ্ছলে, বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে, শিক্ষা দিতে যত্ন পাইয়াছেন। তাঁহার যত্ন ও শ্রম সফল হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সরল, কিন্তু সকল স্থলে Idiomatic অর্থাৎ বাগ্‌নিয়মের শাসনানুগত নহে। কোন কোন অংশ পরিহারযোগ্য। নিম্নে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, বোধ হয়, তাহাতেই আমাদিগের কথা প্রমাণিত হইবে। যথা, জ্ঞানবালার উক্তিতে, ১২২ পৃষ্ঠায়,—

"দেখ, কথা বলিতে না পারিলেও চক্ষের মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার মনে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে কি না।"

"মুখের চেহারা" উর্দ্দুর অর্থ সঙ্গত না হইলেও বাঙ্গালায় কতকটা প্রচলিত আছে, "চক্ষের চেহারা" প্রচলিত আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ। এখানে হয় "চক্ষের ও মুখের অবস্থা" অথবা "চক্ষের ও মুখের ভাব" বলিলেই কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

৩। "যুগধর্ম্ম, শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল্, শাস্ত্রী, বাচস্পতি, উকীল হাইকোর্ট, রাজবাড়ী—জেলা ফরিদপুর; মূল্য দেড় টাকা মাত্র।"—গ্রন্থকার প্রগাঢ় বৈষ্ণব, অথচ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার-তত্ত্ব শাস্ত্রসাহায্যে প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকে বহুশাস্ত্র-সমালোচনার পরিচয় আছে। তবে, পুস্তকের সকল কথা সর্ব্বসম্প্রদায়ি হিন্দুর হৃদ্য হইবে কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয়। সর্ব্বসম্প্রদায়ি হিন্দুর মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণস্বরূপের তিনটি পৃথক্ প্রতিকৃতি। গ্রন্থকারের মতে শিব ও ব্রহ্মা নিম্নশ্রেণিস্থ দেব-পুরুষ, এবং সুতরাংই পরম পুরুষের উপাসক মাত্র। এই কথা ভঙ্গীক্রমে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার বৈষ্ণব-কবি প্রেমদাসের কতিপয় পংক্তি অবতরণিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। পংক্তি কয়টি এই,——

"ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচয়ে
বাজাইয়া করতালি॥ দর্শ
হাসিয়া কান্দিয়া প্রেমে গড়াগ
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকে
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥"

যে ব্রহ্মা এখন বঙ্গদেশের ত বৈষ্ণবসাহিত্যে এইরূপ অবস্থায় হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মাই, পনর শত দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, কবি কালি স্তুতিতে আর এক প্রকারে বর্ণিত ছিলেন। কবি কালিদাস বিপন্ন দিগের মুখে ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন,—

"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলা
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥
যদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ ত্বয়া।

অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবস্তস্য গীয়সে ॥

*   *   *   *   *   *

জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥

যাহা হউক, গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতার একটুকু বেসী পরিচয় থাকিলেও গ্রন্থকার যে সূক্ষ্মার্থ-দর্শি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪। "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিত, শ্রীজানকী-নাথ পাল, বি,এল, শাস্ত্রী—প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা।"—৫। "শ্রীরূপ-সনাতন (জীবনী-শিক্ষা), শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল, ব্রাচস্পতি ; হাইকোর্টের উকীল, রাজবাড়ী ; দা ৸০ বার আনা মাত্র।"

বৈষ্ণবের চক্ষে নিত্যানন্দচরিত এক রূপ-সনাতন আর এক বস্তু। কারণ, নন্দ উপাস্য, রূপ-সনাতন উপাসনার ক। এই তিনের জীবনচরিত বৈষ্ণব বৈষ্ণব সকলেরই আলোচ্য সামগ্রী। জানকী বাবু এই দুই খানি গ্রন্থ করিয়া শিক্ষার্থি সাধারণের উপকার ছেন। তাঁহার ভাষা কোনও স্থানে কোন স্থানে, সম্ভবতঃ দ্রুতকারিতা-আইন-আদালতের বাঙ্গালা রচনার একটুকু বিরূপ। আমরা এখানে ধ রচনারই একটুকু নিদর্শন ম,——

রচনা,—"পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ পিঞ্জর হইয়া যেমন স্বাধীন ভাবে গ-ও হইয়া উড়িয়া বেড়ায়, প্রভু দও সেইরূপ গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া খোলা প্রাণে নিজানন্দে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

আদালতী রীতি,—"শ্রীদশমে বর্ণিত আছে পাপভারাক্রান্তা ধরণী খিন্না ও অশ্রু-মুখী হইয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন 'করিলে' ব্রহ্মা, পৃথ্বী, দেববৃন্দ ও ভগবান্ ত্রিলোচন-সহ ক্ষীরসমুদ্রধারে গমন করিয়া পুরুষ সূক্ত দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের স্তব 'করিলে' ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন, এবং অমরগণকে তদনুরূপ কার্য্য করিতে বলিলেন।"

উপরিধৃত উভয়বিধ রচনায় কত পার্থক্য, তাহা বিচক্ষণ পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থ দু'খানি যদি আগাগোড়া প্রথম প্যারাটির ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে, খুবই ভাল হইত। আমরা গ্রন্থকারের যুক্তি, বিচার ও বিষয়বিন্যাস সম্পর্কে কিছু বলিব না; কারণ, অবতার-তত্ত্ব আমাদিগের প্রাণ-প্রিয় সত্য হইলেও, উহা তাঁহার চিত্তে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদিগের চিত্তে সে ভাবে প্রতি-ভাত হয় নাই।

৬। "ইন্দ্র-বাসর বা অর্জ্জুন-উর্ব্বশী ; রামধনু ও বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী রচ-য়িতা শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত, কোডর্মা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ চারি আনা।" —বাবু সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ বিজ্ঞানশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি এই পুস্তকে বিজ্ঞানের অ-নেক কঠোর তত্ত্ব কবিতার আবরণে আচ্ছাদন করিয়া পাঠককে উপহার দিয়া-

ছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য কি পরিমাণ সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠকের বিচার্য্য। আমরা নিম্নে এই বিজ্ঞানগর্ভা কবিতার একটুকু নমুনা দেখাইব,——

"ধরিত্রী প্রেমের বল, করিয়া ধারণ।
ছোট বড় যত দ্রব্যে, করে আকর্ষণ॥
ঘৃতের প্রেমের বল, কতই প্রবল।
দ্রবময় হয়ে যায়, পাইলে অনল॥
চুম্বক প্রণয়ী দোঁহে, প্রেমের কারণ।
একত্র হইলে চাহে গাঢ় আলিঙ্গন॥
চপলা চঞ্চলা সদা, প্রেমের বিকারে।
চেষ্টা আলিঙ্গন, তার বাসনা অন্তরে॥
পুরুষ রমণী দোঁহে, করিয়া সৃজন।
প্রেম-আকর্ষণ বল, বিধি-নিয়োজন॥
কোথা সেই প্রেমবল, কহ প্রাণধন।
কেবা হ'রে নিল তাহা কিসের কারণ?
শুনেছি তাড়িতে, যদি বেড়ী পায়ে লয়।
প্রেম আকর্ষণ তার সব লোপ হয়।"

৭। "রত্নমালা প্রথমখণ্ড; অর্থাৎ রাজনীতি; শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ২৷৷০ টাকা।" গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, তিনি "মনু, অত্রি, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক মহর্ষিদিগের শাস্ত্রসংহিতা পুস্তক এবং মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণ ও মহামুনি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতাদি হিন্দু-শাস্ত্ররূপ" আকর হইতে "রাজনীতিবিষয়ক কতকগুলি সদুপদেশপূর্ণ রত্ন সংকলন করিয়া, সাধারণের সুবিধার্থে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই রত্নমালা প্রথমখণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত" করিলেন। ঈদৃক্ পুস্তকে আদ্যোপান্ত সকল স্থলেই জ্ঞাতব্য কথা অনেক থাকাই সম্ভব। এই পুস্তকেও তাহা আছে। গ্রন্থকারের কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত;—এক ভাগের নাম অনুবাদ, আর এক ভাগের নাম সংকলন। সংকলন কার্য্যে তাঁহার যেরূপ নিপুণতার পরিচয় আছে, অনুবাদের সকল স্থলে ঠিক্ সেইরূপ নিপুণতার পরিচয় নাই। কিন্তু অনুবাদ সর্ব্বত্রই তাঁহার কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেন না, তিনি যে সকল পুস্তক হইতে বিষয় সংকলন করিয়াছে তাহার সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা চিরে ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায়, বহুকাল হয়, অনু হইয়াছে। অনুবাদ তাঁহার হউক বা হউক, গ্রন্থের সংকলন কার্য্যেই তাঁ প্রচুর পরিশ্রম হইয়াছে। সুতরাং তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

৮। "জ্ঞান-তরঙ্গিণী, ঢাকা লা" গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধানশি শ্রীরুদ্রনাথ ব্যাকরণ-সিদ্ধান্ত প্রণীত; জেলার অন্তর্গত নান্নার গ্রাম হইতে পুত্র শ্রীষোড়শীমোহন শর্ম্মা আচার্য্য প্রকাশিত; মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র আমরা এই পুস্তকের কএকটি কবিতা য়াছি। কোন কোন কবিতা পাঠে এ প্রীতি লাভ করিয়াছি; কোন কবিতার অর্থবোধ করিতে অসমর্থ হ দুঃখিত হইয়াছি।

চতুর্থ খণ্ড] অগ্রহায়ণ। ১৩১২ সন। [৮ম সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৮

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ আনা।

প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা।

নিম্ন প্রদেশ
বা
(ব) দ্বীপ।

একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে মিশর; উভয়ই মানবীয় সভ্যতার আদিগুরু বা প্রথম-প্রবর্ত্তক। সর্ব্বপ্রথম আর্য্যপ্রতিভা ভারতে পরিস্ফুরিত হয়। এই প্রতিভার আলোকে মনুষ্যত্বের গতিপথ দেখিতে পাইয়া, পশুভাবাপন্ন বনেচর বর্ব্বরেরাও, "আমরা মানুষ" এই বলিয়া, আত্মপরিচয় দানে সাহসী হইয়া উঠে। ভারতে পরিস্ফুরিত আর্য্যপ্রতিভারই একটি আলোক-রেখা, কি সূত্রে ঠিক্ করিয়া বলিবার উপায় নাই, শত পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, বহু-সমুদ্র ও মরুপ্রান্তর পার হইয়া, প্রাচীন মিশরের অঙ্গে যাইয়া লাগিয়াছিল। মিশর সেই রশ্মিটুকুকে আপনার মিশরীয় দীপাধারে, মিশরীয় উপকরণে প্রজ্বলিত রাখিয়া, উহার সুখ-স্বাস্থ্যকর মধুর হিল্লোলে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন পাশ্চাত্য জগতের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। গ্রীস ও রোম প্রভৃতি অন্তেবাসীরূপে মিশরের উপাসনা করিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার জনয়িতৃ ও হর্ত্তৃ, কর্ত্তৃ, বিধাতৃরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

ভারতীয় আর্য্যসমৃদ্ধি ও মিশরদেশীয় মৈশর-বৈভব, উভয়েরই প্রথম সম্বল ও আদি বীজ কৃষি। কৃষির আশ্রয়েই, আর্য্যজাতি ভারতে আর্য্যরীতি, আর্য্যভাব, আর্য্যশক্তি ও আর্য্য গৌরবের বিস্তার করেন। কৃষির প্রয়োজনে, এবং কৃষি হইতেই ক্রমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নানামূর্ত্তিতে বিকশিত এবং শিল্প ও বাণিজ্য অনন্ত শাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক্ষণ এ দেশে কৃষকের এক নাম চাষা।—চাষা ঘৃণ্য ও অপাংক্তেয়। কিন্তু পুরাতন সময়ে, চাষের মত পুণ্যজনক পবিত্র অনুষ্ঠান, আর কিছু ছিল কি না, সন্দেহ। এই হেতুই ভারতের বলদেব হলধর; এবং হলধর ভগবানের অবতাররূপে সম্পূজিত। এই হেতুই, ভারতের প্রাচীন রাজ-রাজর্ষিগণ স্বহস্তে হল চলনা করিয়াও, রাজকীয় গৌরবে নিত্যসংবর্দ্ধিত ও পুরাতন সিদ্ধ পুরুষরূপে চিরসম্মানিত।

প্রাচীন মিশরও, ভারতের ন্যায়, প্রধানতঃ কৃষির আশ্রয়েই, পুরাতন জগতে, পৃথিবীর এক অংশে মানবীয় সভ্যতার আদর্শস্থানীয় হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি স্বর্ণপ্রসবিনী, অসংখ্য পুণ্যপয়স্বিনী, আর মিশরের একমাত্র নীলনদ। নীলনদের সলিল-প্রবাহ আবেসেনিয়ার পর্ব্বত-কন্দর হইতে, বহু-যত্নে, স্বাস্থ্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির প্ররোহ আহরিয়া লইয়া, মিশরকে উপহার দিবার নিমিত্তই যেন মিশরের পথে সাগর-সঙ্গমে যাত্রা করিয়াছিল

মিশরের যেখানে নীল নদের জল, সেইখানেই সম্পদশ্রীর বিজয়কল্লোল।

ভারতে যেমন নদীমাতৃক বঙ্গদেশ, মিশরে তেমন ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী সলিল-সিক্ত নিম্নপ্রদেশ। এই নিম্নপ্রদেশে অবতরণ করিয়াই গিরিশিখরলঙ্ঘী, মরুবিহারী নীলনদ ক-এক শাখায় বিভক্ত হইয়া, ভূমধ্যসাগরে অবগাহন করিয়াছে। বঙ্গদেশ যেমন শস্যসম্পদে ভারতের গোলাঘররূপে পরিচিত, মিশরে নিম্নপ্রদেশও তেমন মিশরের শস্যাগাররূপে সম্মানিত। প্রাচীন মিশরের নিম্নপ্রদেশ সংক্রান্ত দুটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মিশরের সর্ব্বোত্তর প্রদেশের নাম নিম্ন মিশর। নিম্ন মিশরের আকৃতি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ন্যায় ত্রিকোণ। গ্রীক্ বর্ণমালায় একটি ত্রিকোণাকৃতি অক্ষর আছে। ইউরোপীয়েরা এই অক্ষরের নাম অনুসারে এই প্রদেশের নাম রাখিয়াছেন ডেল্‌টা (Delta)। কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালায়ও ত্রিকোণাকৃতি অক্ষর আছে; সে অক্ষর ব। সুতরাং বাঙ্গালায় ইহাকে মিশরের (ব) দ্বীপ বলা হইয়া থাকে। এই (ব) দ্বীপরূপী ত্রিভুজের ভূমি বা পাদদেশে ভূমধ্যসাগর তরঙ্গভঙ্গে গর্জ্জন করিতেছে;—আর দুই ভুজ বা বাহুমূলে, নীলনদের দুইটি শাখা, যেন সেই গর্জ্জন-ধ্বনিতে মেঘমল্লার-বিধুনিত নীরদধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া, আকুলপ্রাণে নৃত্য করিতে করিতে, সেই সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গঙ্গার সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ সাগর-সঙ্গম একটি; নীলনদের দুটি। গঙ্গা,সাগরসঙ্গমের পুণ্যতীর্থে ঝাঁপ দিয়া, সগরবংশের ভস্মরাশি হইতে মূর্ত্তিমান্ দেবদেহের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলেন। নীলনদ তাহা করে নাই, সে আপনার সঞ্জীবন-স্পর্শে মরুর কঙ্করে কুসুম-উদ্যান ফলাইয়া এবং নিদাঘ-দগ্ধ-পাষাণের বুকে সুখসমৃদ্ধ সোনার অট্টালিকা গড়াইয়া, সাগরগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। নীলনদের সঙ্গমস্থলে পুরাণের দিব্য শ্রুতি বৈকুণ্ঠযাত্রী বিমানে দেবদুন্দুভি শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইতিহাস, তাহার দূরবীক্ষণে অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া, দেশদেশান্তর হইতে সমাগত বাণিজ্য পোতের বীচিবিকম্পিত জীবশুমালা দেখিতে পাইয়া, প্রাচীন মিশরের বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই।

নীলনদের এক সঙ্গম স্থানের নাম পেলুশিয়ান (Pelusian) আর একটির নাম কেনোপিক্ (Canopic)। নীলনদের দুই মুখে প্রাচীন সময়ে দুটি নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি পেলুশিয়াম্ আর একটি কেনোপাস্। এই দুই নগরের নাম হইতেই সাগরসঙ্গম দুটিরও ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। নীল নদের প্রধান ধারা দুটির মধ্যে, (ব) দ্বীপের অঙ্গে, আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু মূল প্রবাহ যে, প্রধানতঃ ঐ দুই পথেই, সাগরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে,—পার্ব্বত্য প্রদেশের অবিরাম উত্থান ও পতনক্লেশ, মরুপর্য্যটনের অসহনীয় শ্রান্তি প্রশমিত করিয়া লইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

'সজল শস্যশ্যামল' এই (ব) দ্বীপেই কমলার পদ্মাসন। (ব) দ্বীপের কৃষি অতুলনীয়। (ব) দ্বীপই মিশরে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও শস্য-সম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ স্থান। পুরাতন কালে এই প্রদেশে পেলুশিয়াম্, কেনাপাস্, টে-নিস্, সেইস্, নোক্রেটিস্ হিরাক্লিওপোলিস ও হিলিওপোলিস্ এই কএকটি প্রধান নগর ছিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া ভূমধ্য সাগরের তটে অবস্থিত। নিকোপোলিস্ও এই প্রদেশেরই অন্য একটি প্রসিদ্ধ নগর। কিন্তু এই উভয়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পেলুশিয়াম্ ও কেনোপাস্ অধুনা ডেমি-য়েটা ও রসেটা নামে পরিচিত। এই দুইটি মিশরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বাণিজ্য বন্দর। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অভ্যুদয় ঘটিলে এ দুই অব-শেষে অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

(ব) দ্বীপস্থিত টেনিস্ প্রদেশ প্রাচীন মিশরের একটি বিশেষরূপ গণনীয় স্থান। এই প্রদেশই ইজ্‌রেলাইটস্ বা ইহুদিগণ বাস করিত। ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌দিগের এই স্থানে আগমন, অবস্থান ও নির্গমন বিষয়ক বিস্ময়কর অদ্ভুত কাহিনী একদিকে যেমন মিশরীয় প্রাচীন ইতিহাসের একটা স্মরণীয় অধ্যায়, তেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেরও একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

নিম্ন মিশর বা (ব) দ্বীপ অতি পুরাতন কালে আরব ও ফিনিসিয়া দেশীয় মেষরক্ষক দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। এই দস্যু নৃপতিগণ ইতিহাসে মিশরের রাখালরাজা নামে কীর্ত্তিত। মিশরীয় ভাষায় ইহাদিগকে হিক্কস্ বলিত। বাইবেলে মিশরের রাখাল রাজগণ "ফেরেও" নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই "ফেরেও" নাম হইতেই মিশ-রের সমস্ত প্রাচীন রাজগণই "ফেরেও" নামে আখ্যাত হইয়া আসিয়াছেন।

নিম্ন মিশর বা (ব) দ্বীপ, ২৬০ দুই শত ষাট বৎসর কাল রাখালরাজাদিগের অধীন ছিল। অবশেষে, মিশরীয় প্রদেশান্তরের এক পরাক্রান্ত রাজ্যেশ্বর, নৃপতি এমোসিস্ রাখালরাজাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া (ব) দ্বীপ অধি-কার করিয়া লন। (ব) দ্বীপ মিশরের রাজা-দিগের অধিকারভুক্ত হইবার অনেক কাল পরে, ইস্‌মেলিটের বণিক্‌গণ একটি ইহুদি যুবককে নিম্ন মিশরে লইয়া আইসেন; এবং উহাকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান। এই যুবকই বাইবেল ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জোজেফ।

জোজেফ্ মিশরে ক্রীতদাস,—সুতরাং মনুষ্য-সমাজে অপাংক্তেয় ও অবস্তুরূপে বিপন্ন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার সহায়। তাঁহার অন্তরাত্মা দৈবী প্রতিভা বা দিব্য দৃষ্টিতে আলোকিত ছিল। দাসত্বের লাঞ্ছনে সে আলোক-আচ্ছাদিত রহিল না। তিনি দিব্য জ্ঞানবলে, মানবদৃষ্ট দৈব প্রেরিত স্বপ্ন বিশেষের তাৎপর্য্যব্যাখ্যানে সমর্থ ছিলেন। মিশররাজ একদিন এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিয়া, সেই স্বপ্নের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটনার্থ অধীর হইয়া উঠিলেন। পণ্ডিতবর্গ আহূত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যায় রাজার তৃপ্তি হইল না। অবশেষে স্বপ্নব্যাখার ক্ষমতা দাস জোজেফের আছে, শুনিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা

হইল। জোজেফ্ স্বপ্নের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে তাহাই সংঘটিত হইল। জোজেফ্ ইহার পরে আর নির্ব্বর্ণ দাস রহিলেন না। রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র ও ক্রমে আত্ম-প্রতিভাবলে, মিশরের সর্ব্বপ্রধান রাজ-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

জোজেফ, মিশরের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিরূপে, আপনার অসাধারণ বুদ্ধি, ও দূরদর্শিনী দৈব-দৃষ্টির প্রসাদে মিশরকে ক্রমান্বয়ে সাতবার ভীষণ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করেন। এই হেতু জোজেফের যশ দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার আদর,প্রতিপত্তি ও প্রভাব অপরিসীম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। জোজেফের পিতা জেকব জোজেফের আগ্রহে ও অনুরোধে সপরিবারে মিশরে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। ইহাঁরাই মিশরের ইজ্‌রেলাইট্‌স্। টেনিস্ প্রদেশ ইহাঁদিগের উপনিবেশ। মিশরের ইহুদিপল্লী বা টেনিসের দিকে জোজেফের গুণে সমগ্র মিশরের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌দিগের এই সম্ভ্রম ও সৌভাগ্য কিন্তু চিরদিন অক্ষুন্ন রহে না। মিশর রাজগণের স্মৃতিতে, যত কাল, জোজেফের কীর্ত্তিকলাপ জাগরূক ছিল, তত কাল, ইঁহারা দেশের এক অসাধারণ শক্তিরূপে আদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু কালে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ক্রমে মিশর রাজগণ জোজেফ ও তৎকৃত উপকার বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। জোজেফের স্মৃতিটিকে সজীব রাখিতে পারে, এমন কোন কৃতী সন্তানও আর জোজেফের বংশে অভ্যুত্থান করিল না। সুতরাং, ক্রমে অনাদর ও অবহেলা এবং অবশেষে অত্যাচার ও উৎপীড়ন আসিয়া জোজেফের ঋণ শোধ করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইল! রাজা ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌দিগের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ইহুদিগণ সর্ব্বতোভাবে দাস শ্রেণীতে পরিণত হইল। তাহারা একবারে পশুবৎ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজকীয় (Task master) বা কর্ম্ম-দারোগাগণ ইহাদিগকে বেত্রহস্তে কর্ম্ম ক্ষেত্রে পরিচালনা করিত। মিশরের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রচণ্ড রৌদ্রে, অষ্টপ্রহর, ইহাদিগকে ইষ্টক নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতে হইত। এইরূপে ইহুদিগণ মিশরে অশেষ বিশেষে উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইতে থাকিলে মহাত্মা মোজেস্ ইহাদিগের উদ্ধারকামনায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

মোজেস্ একজন ভগবদ্ভক্ত সিদ্ধ পুরুষ। তিনি যোগবলে, বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা দ্বারা মিশররাজকে, বিস্মিত, ভীত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এই উপায়ে অবশেষে তিনি ইজ্‌রেলাইট্‌স্ বা ইহুদিদিগকে মিশররাজের করালগ্রাস ও নিষ্ঠুর শৃঙ্খল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। মিশররাজ নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই অমন প্রয়োজনীয় দাসশ্রেণীকে মুক্তিদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

মোজেসের প্রসাদে মুক্তিলাভ করিয়া ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌গণ ভীষণ দাসত্বের কারাগার,—টেনিস্ হইতে বহির্গত হইয়া দেশান্তর অভিমুখে যাত্রা করিল। মোজেস্ তাহাদিগের পথপ্রদর্শক। একদিকে দাসত্বের দুর্ব্বিষহ কঠোর নির্য্যাতন, অন্যদিকে টেনিসের শস্যশ্যামল

উর্ব্বর দৃশ্য। দাসত্বের কাঠিন্য অপেক্ষাও যেন টেনিসের সচ্ছল জীবন তাহাদিগের মনের উপর অধিকতর কার্য্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের প্রাণটা কিছুতেই টেনিস ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না; শরীরটা মাত্র, মোজেসের অনুরোধে ও ভয়ে বাধ্য হইয়া, তৎপ্রদর্শিত পথে, তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইল। দুঃসহ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও, এই কারণে, তাহারা বিন্দুমাত্র আনন্দ অনুভব করিল না। পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গ পিঞ্জর-মুক্ত হইলে, উন্মুক্ত গগনের অসীম বিস্তার দেখিয়া যেমন ত্রস্ত, ব্যস্ত ও ভীত হইয়া পড়ে এবং কোন্ পথে আবার সেই পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত অসুবিধার হাতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠে; কিরূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ পাইবে, ভবিষ্যতে তাহাদের কি ঘটিবে, ইহা চিন্তা করিয়া ইহুদিদিগের হৃদয় মনও তেমনই অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা টেনিসের প্রফুল্ল প্রান্তরের পানে লোলুপনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অশ্রুসিক্তগণ্ডে দাসত্বের শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিয়া, মোজেসের সঙ্গে সঙ্গে, অনিচ্ছায় দেশান্তর অভিমুখে প্রস্থানপর হইল।

তাহারা অনেক কষ্টে লোহিত সাগরের তটে যাইয়া উপস্থিত হইল। লোহিত সাগর পার হইতে হইবে, তদুপোযোগি জাহাজ বা তরি কোথায়? কিন্তু তাহারা দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, লোহিত-সাগরের কিয়দংশে জল নাই। প্রকৃতির কি বিচিত্র বিধানে, না জানি, কাহার কি অমোঘ আজ্ঞায় লোহিত সাগর আপনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌দিগের জন্য পথ খুলিয়া দিয়া, যেন তাহাদিগেরই আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল! ইহা দেখিয়া ভক্তিমান্ মোজেসের চক্ষে জল আসিল। মোজেস্ সমস্ত ইজ্‌রেলাইট্‌স্ দিগের সহিত জানুপাত করিয়া, এই বিচিত্র নৈসর্গিক ঘটনার জন্য, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শত শত বার প্রণাম করিলেন এবং সাগর-বক্ষস্থিত ঐ নির্জ্জল ও বিশুষ্ক পথে নির্ব্বিঘ্নে লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া সকলকে লইয়া আরব দেশে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে মিশররাজ এমন প্রয়োজনীয় দাস-জাতিকে চিরদিনের তরে মুক্তিদান করিয়া নিশ্চিন্ত রহিতে পারেন নাই। ফেরেও স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত সহ তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌গণ সাগর পার হইলেই, মিশররাজ সসৈন্যে লোহিত সাগরের তটে আসিয়া পঁহুচিলেন। ফেরেও, লোহিত সাগরের মধ্যদিয়া, সীমন্তিনীর যত্নরচিত সীমন্তের ন্যায়, জলশূন্য বিচিত্র পথ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ইজ্‌রেলাইট্‌স্‌দিগের পশ্চাৎ অনুসরণে এই অদ্ভুত সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সাগর বুঝি বা তাঁহারই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে ভীত হইয়া, তাঁহার জন্য পথ খুলিয়া রাখিয়াছে, এই-রূপ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়াও তাঁহার ন্যায়, তোষামোদমুগ্ধ অন্ধ নৃপতির পক্ষে অসম্ভব কথা নহে। তিনি সারথিকে ঐ সমুদ্র পথে রথ চালাইয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ফেরেও

যখন সৈন্যসামন্ত'সহ সাগরের মধ্যপথে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন না জানি, আবার কাহার কি আদেশ বা বিচিত্র বিধানে, সাগর-বারি প্রলয় হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া আসিয়া সেই শুষ্কপথ প্লাবিত করিয়া ফেলিল! ফেরেও সসৈন্যে, চিরকালের তরে, লোহিত সাগরের কুক্ষিগত হইয়া রহিলেন! ঈশ্বরনিষ্ঠ বিশ্বাসী ভক্তেরা, এই বিস্ময়কর ঘটনায় দুর্জ্জেয় ভগবৎ শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া সবিস্ময় ভক্তিতে মস্তক অবনত করিলেন; আর অলৌকিকে অবিশ্বাসী বিস্মিত ঐতিহাসিক জল-বায়ুর গতি, প্রকৃতি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের তত্ত্ব অনুসন্ধানদ্বারা এই ঘটনার নৈসর্গিক হেতু নির্দ্দেশে যত্নবান্ হইলেন। এ স্থলে সেই সকল তত্ত্বের আলোচনা, অনাবশ্যক। সুতরাং আমরা সে বৃথা প্রয়াসে শক্তিক্ষয় করিলাম না।

প্রাচীন মিশরে, ভারতের ন্যায়, দেবদেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত ছিল। শুধু মিশরে কেন, মিশরের অনুকরণে, পুরাতন রোম ও গ্রীসও ঘোরতর দেবোপাসক হইয়া উঠিয়াছিল। তবে কথা এই,—ভারতের দেবদেবী এবং মিশর ও গ্রীস প্রভৃতির দেবদেবী একশ্রে র পদার্থ নহে। কিন্তু মিশর ও গ্রীস প্রভৃতির দেবদেবী প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত। গ্রীসে যাঁহার নাম মিনর্ভা দেবী, মিশরে তাঁহারই নাম আইসিস্। নিম্ন মিশর স্থিত সেইস্ (Sais) নগরে, আইসিস্ দেবীর এক প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। এই মন্দিরের প্রসাদে, এক সময়ে, সেইস্ নগর, মিশরের কিয়দংশে এক অতি পবিত্র তীর্থস্থানরূপে প্রখ্যাত ও সম্মানিত হইয়া উঠে। সেইস্ নগরস্থ আইসিস্ বা মিনর্ভা দেবীর মন্দিরে প্রস্তর ফলকে যে লেখা খোদিত ছিল, তাহার মূল তাৎপর্য্য এইরূপ,—"যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, যাহা বর্ত্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, তৎসমস্তই আমি। আমার আবরণ উদ্‌ঘাটন অর্থাৎ তত্ত্বরহস্য উদ্ভেদ, কোন মরণধর্ম্মী মানবেরই আয়ত্ত বা সাধ্য নহে।"

(ব) দ্বীপের প্রচীন নগর নোক্রেটিস্ ও হিরাক্লিওপোলিস্ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু হিলিওপোলিস্ সম্বন্ধে বলিবার কথা আছে। এই নগর প্রাচীন সময়ে মিশর দেশে ভাস্কর-ভবন বা সূর্য্যনগরী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। হিলিওপোলিস্ নগরে সূর্য্যদেবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকাহেতু ইহার এইরূপ নামকরণ হয়। এইখানকার সূর্য্যমন্দির আয়তন ও শোভা-সৌভাগ্যে পুরাকালে একটা দর্শনীয় কীর্ত্তিরূপে পরিগণিত ছিল।

সূর্য্য দেবের প্রকৃত মন্দির অনন্তবিস্তৃত ব্যোম। সূর্য্য দেবের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে তুল্যরূপে পরিব্যাপ্ত, মিশরের হিলিওপোলিসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, বিশেষভাবে তাঁহার আবির্ভাব হইত, এমন কথা নহে। তথাপি হিলিওপোলিসের এক সুরম্য প্রাসাদ সূর্য্য দেবের অধিষ্ঠান স্থান রূপে পূজিত হইত। এই মন্দিরে সূর্য্যদেবের কোন কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত একটি বৃষভ এস্থানে সূর্য্যদেবের প্রতিনিধিরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়া দৈনিক পূজা প্রাপ্ত হইত। মিশরের এক এক প্রদেশে এক এক জাতীয় পশু পক্ষী

দেবতারূপে পরিগণিত ছিল। বহু অন্বেষণে উপযুক্ত লক্ষণবিশিষ্ট বৃষভ সংগ্রহ করিয়া মহা সমারোহে এই মন্দিরে উহাকে প্রতিষ্ঠা করা হইত। এই দেবরূপী বৃষভের মৃত্যু হইলে, দেব-সিংহাসন বেসী দিন শূন্য থাকিতে পারিত না। দেশের লোকে উন্মাদের মত আকুলপ্রাণে বৃষভের অন্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। অন্য একটি সুলক্ষণাক্রান্ত বৃষভ না পাওয়া পর্য্যন্ত দেশে কাহারও শান্তি ছিল না। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে প্রকটিত করিবার বাসনা রহিল। মন্দিরে প্রতিদিন এই বৃষভের যথারীতি পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বৃষভরূপী দেব-দর্শনে কৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

শুধু ভাস্কর ভবনই হিলিওপোলিসের সম্পদ্ নহে, ইহা ছাড়া হিলিওপোলিস্ আরও বিবিধ কারুকার্য্যখচিত বহুসংখ্যক দেব-মন্দিরে অলঙ্কৃত ছিল। পারস্যরাজ কেম্বিসেস্ একবার এই নগর আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। কেম্বিসেসের কালাপাহাড়ী ক্রোধ বা দানবীয় রোষে নগরের সমস্ত দেবমন্দির ভস্মীভূত ও প্রাসাদমালা চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। কেম্বিস্ এই নগরস্থিত মূল্যবান্ মনুমেণ্ট বা স্মৃতিস্তম্ভগুলিকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি হইতে যে সকল অবিলিস্ক * অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল, ঐ সকলের কতেক এখনও বর্ত্তমান আছে; এবং কতেক বহু অর্থব্যয়ে রোমে নীত হইয়া, এখনও রোম নগরের অন্যতর আভরণ রূপে শোভা পাইতেছে।

হিলিওপোলিসের ভাস্করমন্দির সম্বন্ধে, প্রাচীন সময়ে, একটি অতি অদ্ভুত কাহিনী কথিত হইত। কাহিনীটি ফিনিক্স নামক বিহঙ্গমের। ভারতীয় পুরাণে যেমন খগেন্দ্র গরুড়, মিশরীয় পুরাতন জনশ্রুতিতে তেমন খগরাজ ফিনিক্স (Phoenix)। ত্রিলোক-বিজয়ী গরুড় মানুষের গর্ভে জন্মধারণ করিয়াও মানুষ নহে,—বিহঙ্গ; এবং বিহঙ্গ হইয়াও গজ-কচ্ছপগ্রাসী বিরাট্ বিগ্রহ। ইন্দ্রের বজ্র তাহার পালক ভেদ করিতে অসমর্থ, বিষ্ণুর চক্রও তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াই কৃতার্থ। মিশরীয় ফিনিক্সে গরুড়ের সে গুরুত্ব বা গৌরবের এক কণিকাও লক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু ফিনিক্স অন্য প্রকারে এমনই অদ্ভুত জীব যে, উহা পৌরাণিক কল্পনারই সর্ব্বথা উপযুক্ত। যাহা হউক, প্রাচীনেরা বড় গলায়, এই ফিনিক্সের কথা কহিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা বলিয়াছেন,—পৃথিবীতে এক সময়ে একটি ভিন্ন দুটি ফিনিক্স বর্ত্তমান থাকিত না। ফিনিক্সের জন্মস্থান,—আরব দেশ। একটি ফিনিক্স জন্মিয়া পাঁচ কিংবা ছয়শত বৎসর জীবিত রহিত। ইহার আকৃতি উৎক্রোশ বা কুরর পক্ষীর মত। মাথার উপরে নানাবর্ণ-বিচিত্রিত, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, একটি অতি সুন্দর চূড়া ছিল। গলদেশে সোনার গলবন্ধ অর্থাৎ গলার পালক স্বর্ণবর্ণ। অবশিষ্ট

* অবিলিস্ক—সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্মশীর্ষ সুদীর্ঘ প্রস্তরময় স্তম্ভ। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল ও কারুকার্য্য এমনই বিচিত্র ও বিস্ময়কর যে, উহা বস্তুতই আধুনিক শিল্পচাতুরীর সম্পূর্ণ অনধিগম্য ও অবুধ্য।

শরীর বেগুনী রঙের পালকে আবৃত ছিল। পুচ্ছদেশ শ্বেত ও রক্ত পালকে রঞ্জিত। চক্ষু দুটি, দুটি প্রভাতী তারার ন্যায় ঝল মল করিত। ফিনিক্স কখনও আরবের কখনও আফ্রিকার মরুভূমির উপরে, কখনও সাগরবক্ষে, কখনও বা আফ্রিকার শ্যামল প্রান্তরে আহার অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইত। ইহার আহার গজ কচ্ছপ বা বাসুকির বংশ নাগ না হইলেও, সাধারণ পক্ষীর ন্যায় ছিল না। এই অদ্ভুত জীব, জীবজগতের সমস্ত স্বাভাবিক ভোগে বঞ্চিত রহিয়াও আপনার আনন্দে আপনি, অর্দ্ধসহস্র বৎসর জীবিত থাকিত ;—এক পাঁচশত বৎসর অন্তে পুনরায় নূতন কায়ায় নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আর পাঁচ শত বৎসর কাল বায়ুপথে বিচরণ করিবার সুযোগ করিয়া লইত। ইহার প্রণয়িনী ছিল না, স্নেহাস্পদ সন্তান সন্ততি, এমন কি, সজাতীয় পক্ষীও দ্বিতীয় আর একটি ছিল না। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি যেমন অদ্ভুত, জন্ম ও মৃত্যুও ততোধিক অদ্ভুত, বিস্ময়কর ও বিচিত্র।

বৃদ্ধ বয়সে, ফিনিক্স যখন বুঝিতে পাইত যে, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, তখন সে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অতি যত্নের সহিত কোন উচ্চ তরুশাখায় বা পর্ব্বত শৃঙ্গে, কুলায় নির্ম্মাণ করিত। এই কুলায় নির্ম্মাণের উপকরণ ছিল কাষ্ঠখণ্ড ও বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য। ফিনিক্সের কুলায়ের সৌরভে দিগ্‌বলয় আমোদিত হইত। কুলায় নির্ম্মিত হইলে, ফিনিক্স উহার ভিতরে যাইয়া শয়ন করিত ; এবং ঐ শয়ান অবস্থায়ই মরিয়া যাইত। মৃত ফিনিক্সের অস্থি ও মজ্জা হইতে প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র কীট বহির্গত হইয়া আসিত। এই কীটই ভাবী ফিনিক্সের প্ররোহ। কীটটি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আর একটা ফিনিক্সের মূর্ত্তিতে কুলায় হইতে উড়িয়া বাহির হইত।

নবজাত ফিনিক্সের পরবর্ত্তী সুদীর্ঘজীবনের প্রথম কার্য্য পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এই উদ্দেশ্যে সে ডিম্বাকৃতি একটি গোলক নির্ম্মাণ করিত। গোলকটিকে নানাবিধ সুরভি পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া সে উহার অঙ্গে একটি ছিদ্র প্রস্তুত করিয়া লইত এবং সেই ছিদ্রপথে পিতার দেহ ডিম্বের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা ঐছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলিত। আয়তনে ও ওজনে এই পরিমাণ বড় করা হইত, যেন সে উহা অনায়াসে বহন করিয়া দূর দূরান্তরে উড়িয়া যাইতে পারে। নবীন ফিনিক্স তাহার পিতার অথবা তাহারই পুরাতন দেহের পঞ্জরপূর্ণ এই কফিন বা শবাধার কাঁধে লইয়া, হিলিওপোলিসের ভাস্কর-মন্দির অভিমুখে উড়িয়া যাইত ; এবং সেখানকার মন্দিরস্থিত পবিত্র অনলকুণ্ডে উহা নিক্ষেপ করিয়া ভস্মশেষ করিয়া তথা হইতে অন্যত্র আহার অন্বেষণে প্রস্থানপর হইত। এইরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, পরবর্ত্তী পাঁচশত বৎসর কালে তাহার আহার অন্বেষণ ও বিশ্রাম ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য থাকিত না।

প্রাচীনেরা এই বিচিত্র বিহঙ্গ ঘটিত সমস্ত অদ্ভুত কথাই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যবৎ বিশ্বাস করিতেন। সরলবিশ্বাসী প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগেরও অনেকেই, মোটের উপর, এবিষয়ে প্রাচীনলোক

দিগের সাক্ষ্য মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, অধিকতর সত্য-প্রিয়তার অনুরোধে, সকল বিষয়েই সন্দেহ ও সংশয়ের আশ্রয় লইয়া, সাবধানে কথা কহিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারা ফিনিক্স সংক্রান্ত কোন কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, ফিনিক্সকে উহার সমস্ত কাহিনী সহ কল্পনার বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জীবজগতে পুরাতন কালে, ফিনিক্সরূপী কোন বিহঙ্গের অস্তিত্ব থাকিয়াই থাকুক, অথবা উহা সর্ব্বতোভাবেই প্রাচীনদিগের কল্পনাপ্রসূত এক নূতন রকমের বিচিত্র পদার্থই হউক, সকল ঐতিহাসিক মিলিয়া একসঙ্গে উহাকে কল্পনা বলিয়া ঢেঁড়েরা পিটিলেও ফিনিক্স সহজে উড়িয়া যাইবার বস্তু নহে। ফিনিক্স দেশব্যাপিনী, যুগযুগান্তবাহিনী জনশ্রুতি, জাতীয় সংস্কার ও সাহিত্যের সহিত এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, কোন ইতিহাসই মিশরের ফিনিক্স কাহিনীকে একবারে অবস্তুরূপে অবহেলায় ফেলিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই; উহাকে কল্পনা নামে সত্যের নিঘণ্ট হইতে নিষ্কাশিত করিয়াও, উহার সম্বন্ধে দুটি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই প্রদেশের অতি পুরাতন নগর সম্বন্ধে বলিবার যোগ্য আর বেসী কোন কথা নাই। এক্ষণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক নগর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক নগরের পানে তাকাইলে সর্ব্বাগ্রেই সাগরতরঙ্গবিধৌত, পোতমালাবিলম্বিত, উন্নতশীর্ষ আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে; এবং সে দৃষ্টি আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া ছাড়িয়া, অন্য কোন দিকেই আর সরিয়া যাইতে উৎসুক হইবে না।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরী ভূমধ্য সাগরের তটদেশে অবস্থিত। ম্যাসিডোনিয়ার দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডার মিশর জয় করিয়া নিজ নামে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনত্বের হিসাবে, এই নগর অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা, প্রতাপ প্রতিপত্তি ও শক্তি সমৃদ্ধিতে মিশরের প্রায় সমস্ত পুরাতন প্রসিদ্ধ নগরকেই হীনপ্রভ করিয়া তুলিয়াছিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া মিশরের পুরাতন রাজধানী কায়রোনগর হইতে চারি দিনের পথ দূরবর্ত্তী। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার এই গৌরবের মূল কারণ—বাণিজ্য।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই, সমস্ত প্রাচ্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। প্রাচ্য প্রদেশের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য, লোহিত সাগরের পশ্চিম তটবর্ত্তী পর্টাস্‌মরিস্‌ নামক এক নগরে সমানীত হইয়া, উষ্ট্রপৃষ্ঠে কফ্‌ট নামক থিবেইসের এক উপনগরে বাহিত হইত; এবং সেই স্থান হইতে, জলপথে নীলনদ দিয়া নৌকাযোগে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার চলিয়া যাইত। তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানের প্রসিদ্ধ সওদাগরগণ আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা আপন আপন প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনানুরূপ ঐ সকল জিনিষ ক্রয় করিয়া দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়া দিতেন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী",—বাণিজ্যের প্রসাদে অচিরেই আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ারূপিণী মর্ত্ত্য-অলকায় লক্ষ্মীর

শুভাগমন ও অধিষ্ঠান হইল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার নিকটে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। দ্বীপের নাম-ফেরস্ (Pharos)। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার উপকূল সমীপে, বহুসংখ্যক বিপজ্জনক মগ্নচর ও পাহাড়াদি ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকা হেতু, এই স্থানে, নৈশ অন্ধকারে, বাণিজ্যপোত সমূহ নিরন্তর বিপদাপন্ন হইত। ফেরস্‌দ্বীপে লুব্ধ-স্বভাব, রাক্ষসপ্রকৃতি কতকগুলি বন্য বর্ব্বর বাস করিত। এইরূপ বিপন্ন জাহাজ পাইলে আর কথা ছিল না, উহারা দলে দলে ঐ জাহাজের উপর আপতিত হইয়া, সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া যাইত; এবং যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাহা-কেই হত্যা করিয়া ফেলিত। এই মারাত্মক অসুবিধা নিরাকরণার্থ, ফেরস্‌দ্বীপে ফেরস্ টাওয়ার নামে একটি অত্যুচ্চ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ দুর্গের শিরোভাগে, সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া একটা সমুজ্জ্বল অনলকুণ্ড প্রজ্ব-লিত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ অনল-প্রভায়, সমুদ্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত থাকিত। সুতরাং, রাত্রি কালে জাহাজের যাতায়াতে কো-নই অসুবিধা হইত না। ঈদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্কল্পেই, প্রাচীন কালে টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস্ বহু অর্থব্যয়ে পর্ব্বতোপম উন্নত একটা পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া স্থানান্তরে সমুদ্র সন্নিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাইপ্রাসের এই পিত্তল প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীর সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ সপ্ত-কীর্ত্তির অন্যতর।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার শোভা ও সম্পদ্, বিস্তৃত বাণিজ্যে; এবং শক্তি ও সামর্থ্য, রাজকীয় অধি-কার ও অনুগ্রহলাভে। আলেক্‌জাণ্ডার কর্তৃক মিশর বিজিত হইবার পর হইতেই ক্রমে মিশরে গ্রীক্ আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। গ্রীস্ ও মাসিডোনিয়ার বহুলোক আসিয়া আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় উপনিবিষ্ট হয়। মিশর মাসিডোনিয়ার অধীন দীর্ঘকাল রহিল না সত্য, কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা টলেমির বংশধরেরাই মিশর রাজসিংহাসনের স্থায়ী অধিকারী হইয়া বসিলেন। সুতরাং, মিশরীর আদি অধিবাসী অপেক্ষাও উপনিবিষ্ট গ্রীক ও মাসিডোনীয় দিগের আধিপত্য সমধিক মাত্রায় বাড়িয়া পড়িল। মিশরের রাজা নির্ব্বা-চন ও রাজকীয় প্রধান প্রধান ব্যবস্থা আলেক্-জেণ্ড্রিয়ার মতানুসারে চলিতে লাগিল। কাল-ক্রমে এই প্রভুত্ব ও প্রভাব এত দূর বাড়িয়া উঠিল যে, অবশেষে মিশরের রাজা ও প্রজা উভয়ই সর্ব্বতোভাবে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার মুখ-প্রেক্ষী হইতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। এইহেতু আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া প্রথমে রাজধানীরূপে কল্পিত না হইয়া থাকিলেও, রাজধানীর গৌরবে গৌরবান্বিত এবং পরিশেষে মিশরের অন্যতর রাজধানীতেই পরিণত হইয়াছিল।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া শুধু বাণিজ্য-সম্ভূত ধন-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও রাজকীয় শক্তিতে শক্তিশালী এমন নহে, উহা শিল্পাদি বিবিধ কলাবিদ্যা, বিদ্যাবল এবং জ্ঞানগরিমায়ও অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় শিল্প ও দর্শনাদির যথারীতি অনুশীলন ও চর্চ্চা হইত। এখানকার মিউজিয়াম নামক সুরম্য অট্টালিকা দর্শনীয় বস্তু। প্রতিবৎসর, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই মিউজিয়ামে (Muse-

um) নানাদিগ্‌দেশীয় অগ্রগণ্য সাহিত্যিক ও নানাতত্ত্বদর্শী প্রগাঢ় পণ্ডিতবর্গ সমবেত হইতেন। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার এই বিদগ্ধ সভা বা পণ্ডিত-সমিতি সাধারণের অর্থে পরিরক্ষিত ছিল। এখানকার প্রকাণ্ড লাইব্রেরী বা গ্রন্থনিবাস পৃথিবীখ্যাত। এই পরিমাণ ও এইরূপ দুর্ল্লভ গ্রন্থ পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থাগারে কখনও সংগৃহীত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। টলেমি ফিলাডেল্‌ফাসের যত্ন ও আগ্রহেই এই পুস্তকালয়ের অত্যধিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। তিনিই ইহার অধিকাংশ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তদীয় উত্তরাধিকারিবর্গও ক্রমে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করাইয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থনিবাসে সাত লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল।

মিশরের ইহা চিরন্তন বিধি-লিপি যে, পৃথিবীতে যে জাতি যখন, অভ্যুত্থিত হইবে, সেই জাতিই মিশরের উপর একবার আধিপত্য বিস্তার না করিয়া ছাড়িবে না। মাসিডোনিয়া ও গ্রীস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইয়া পড়িলে, যেই রোম জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিল, মিশরও অমনি "নম স্তভ্যং" বলিয়া রোমের চরণে প্রণিপাত করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। রোমান বীর জুলিয়াস্ সীজার মিশরে উপস্থিত হইলে, গ্রীক্‌বহুলা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার প্রতিকূলতা করিয়াছিল। সীজার যখন আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অধিবাসীদিগের প্রতিকূলতায় একান্ত বিপন্ন, তখন তাঁহার অসাবধানতায় আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থনিবাসের ব্রুচিয়ন (Bruchion) নামকএক বৃহৎ অংশ ভস্মীভূত হইয়া যায়। সীজার তাঁহার রণতরির একটা বহর, পাছে উহা শত্রু-হস্তে নিপতিত হয়, এই আশঙ্কায়, পোড়াইয়া ফেলিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে তটস্থিত গ্রন্থালয় রক্ষা করিয়া যেন এই অনল-ক্রিয়ার উদ্যোগ করা হয়, এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলা হয় নাই। অসতর্ক অগ্নি রণতরি ভস্মে পরিণত করিতে করিতে ধক্ ধক্ জ্বলন্ত জিহ্বা গ্রন্থালয়ের দিকে প্রসারিত করিয়া চারি লক্ষ গ্রন্থ ভস্মশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল!

যেখানে শক্তিসাধনায় সিদ্ধি ফলে, সেইখানেই উন্নতি ও সমৃদ্ধি যাইয়া বিধাতার বর স্বরূপ তাহার অঙ্গে দুর্ল্লভ অলঙ্কার যোজনা করিয়া দেয়। কিন্তু এই সমৃদ্ধি যেখানে পূর্ণাবয়বে ফুটিয়া পড়ে, সেখানে প্রায়শঃই আলস্য ও বিলাসিতা আসিয়া কর্ম্মশক্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। কর্ম্মনিষ্ঠতা আলস্যের মোদক মোহে শিথিলগ্রন্থি হইয়া সুখশয্যায় ঢলিয়া পড়ে। আর বিলাসিতা মধুমাখা হাসির সহিত ভুবনভুলান কটাক্ষের প্রক্ষেপ দিয়া, মৃদু বীজনে সেই মোহনিদ্রার পোষকতা করিতে প্রবৃত্ত হয়। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া উন্নতির উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইলেই উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলস্যের মনোমদ মোদক ধীরে ধীরে উহার মাদকরসের সঞ্চার করিয়া দিল। সম্পদ্‌লক্ষ্মীর কমলাসনে শেষে বিলাসিতা আসীন হইয়া, পূজার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া উঠিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার যুগযুগান্ত-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের এক বৃহৎ অংশ

ভস্মীভূত হইবার পর হইতেই, পৃথিবীর পণ্ডিত সম্প্রদায় ও সাহিত্যিকবর্গ আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় সমবেত হওয়া অনাবশ্যক মনে করিলেন। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসীও সাহিত্যিক সমিতির পরিপোষণার্থ অর্থব্যয়ে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া আনিল।—অর্থ, সাহিত্যের পরিবর্ত্তে, আমোদের বিনোদপদে গড়াইয়া পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাসাদে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অর্থে অপ্রতুল নাই। রাশীকৃত অর্থ বিলাসিতার চিত্ততর্পণে উড়িয়া যাইতে লাগিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার আমোদ, প্রমোদ ও বিলাসিতা, বিলাসীজগতে ক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপমার সামগ্রী হইয়া পড়িল। যখন রোমের এণ্টনী ও মিশরের জগদ্‌বিখ্যাতা কুহকিনী রাণী যষ্ঠ ক্লিওপেট্রা যুগল মূর্ত্তিতে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াকেই তাঁহাদিগের প্রিয়রাজধানী করিয়া লইলেন; তখন অবিরামবাহী আমোদ, উৎসব ও লীলাতরঙ্গে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই সময়েই এখানকার বিলাসিতা চরম সীমায় যাইয়া ঠেকিয়াছিল। যেখানে বিলাসিতার উন্মাদ উচ্ছ্বাস্‌ সেইখানেই অধঃপাতের অগাধ অধোগতি। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার ক্রমে পতন হইল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া এখনও (ব) দ্বীপের উপকূলে এক প্রধান বাণিজ্য নগররূপে সম্মানিত আছে বটে, কিন্তু সেই কালের সেই প্রতাপ, প্রতিপত্তি ও সেই সম্পদ্‌শ্রী এখন আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ইহার কারণ উর্ব্বর (ব) দ্বীপের অনুর্ব্বরতা নহে,—(ব) দ্বীপ বাসীর কর্ম্মবিমুখতা ও আলস্য। এখনও (ব) দ্বীপ নীলনদের প্লাবনজলে বর্ষে বর্ষে তেমনই স্নাত, পূত ও রসার্দ্র হইয়া কৃষির অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু ধূলি, মাটীহইতে সোনা ফলাইতে সিদ্ধহস্ত সে কৃষাণ-কুল এখন নির্ম্মূল; মিশরের সেই কর্ম্মবীরগণ এখন অতীতের অন্ধকার-কক্ষে লুক্কায়িত; সে অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব এখন আলস্যের মদিরামোহে তন্দ্রাভিভূত ও মোহিত।

শ্রী——

ক ও যক্ষাগার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা দক্ষ গিরির নিকটে ও দূরে মহাদেবের প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি, হরগৌরীর মন্দির, কৈলাসকুণ্ড, দক্ষ মহারাজার প্রাসাদ ও উপাসনালয়, ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, পর্ব্বত ও অরণ্যের সৌন্দর্য্য, "সতী'র ক্রীড়ানিলয়, শিবের বিবাহ স্থান, নারদের নিবাস কুটীর, যজ্ঞভূমি, কএকটা সরোবর ও দুইটা সুবৃহৎ কূপ, প্রভৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় কালকা নগরীতে প্রত্যাগমন করিলাম। কালকা হইতে সিমলা

শৈল প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সিমলা না যাইলে যক্ষগিরি দর্শন করা যায় না, সুতরাং আমরা সিমলা শৈলাভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলাম। লর্ড কার্জ্জনের শাসন কালের পূর্ব্বে কালকা হইতে সিমলা যাইতে হইলে অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, ডণ্ডি রিক্শা, কিম্বা টোঁগা নাম্নী গাড়ীর সহায়তা অবলম্বন করিতে, অথবা পদব্রজে এই দুর্গম ও ভীষণ পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিতে হইত। লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে কালকা হইতে সিমলা শৈল পর্য্যন্ত অতি সুন্দর রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা কখনও কালকা—সিমলা—রেলপথে পরিব্রজন করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে কেবল লেখনীদ্বারা এই অত্যাশ্চর্য্য লৌহবর্ত্মের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অনন্যসাধারণ কৌশল এবং অদ্ভুত কৌতুকের সহস্রাংশের একাংশও অভিব্যক্ত করা কঠিন হইতে কঠিনতর। পূর্ত্তকার্য্যের পরাকাষ্ঠা কি প্রকার হইতে পারে, জীবশ্রেষ্ঠ মানবের বুদ্ধির প্রসারণ কত উচ্চ সীমায় পৌছিতে পারে, ইউরোপীয় পুরুষের দেবদুর্ল্লভ মস্তিষ্ক কি প্রকার অদ্ভুত পদার্থপুঞ্জে বিনির্ম্মিত, ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যা চরমসীমায় উপনীত হইয়া কি প্রকার অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে, যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, কালকা—সিমলা-রেলওয়ে শকটে পথিকরূপে আরোহণ করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই রেলওয়ে লাইন দর্শন করেন নাই, ভারতবর্ষের একটা প্রধান আশ্চর্য্য পদার্থ তাঁহাদের দেখিতে বাকি রহিয়া গেল। ইহা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড কার্জ্জনের একটা মহা মহিম্নী কীর্ত্তি এবং ইংরাজ জাতির অপার বুদ্ধি, অমিত সাহস, বিশিষ্ট ধৈর্য্য, অখণ্ড অধ্যবসায়, অবর্ণনীয় পরিশ্রমপরায়ণতা, প্রকৃষ্ট প্রতিভা এবং অপরিমিত সামর্থ্যের অতি উৎকৃষ্ট ও প্রখ্যাত প্রমাণ। এই রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করিতে ইংরেজ পুরুষ জলের ন্যায় অকাতরে রাশি রাশি রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন; ইহা নির্ম্মাণ করিতে কত অসংখ্য লোককে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী পুরুষপুঙ্গবকে মস্তিষ্ক বিচালিত করিতে হইয়াছে, কত নরনারীকে প্রাণ দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইয়াছে, কত কষ্ট—কত যত্ন—কত সাবধানতা স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং কত অভ্রভেদী অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, অথবা ভেদ করিয়া কিংবা ধরাশায়ী করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। আগ্রার জগদ্বিখ্যাত "তাজমহল" দেখিয়াও এমন অদ্ভুত কৌতুকের উদয় হয় না। আমি আগ্রা নগরীতে অবস্থান কালে শতবারাধিক তাজমহল দেখিয়া আমাদের দেশের পুরাতন ভাস্করবৃন্দের যত প্রশংসা করিতে না পারিয়াছি, কালকা—সিমলা লাইনে ভ্রমণ করিয়া তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ভাবে এবং নিরপেক্ষতা সহকারে ইংরাজের বুদ্ধিমত্তার

প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। দার্জ্জিলিং—হিমালয়—রেলওয়ে লাইন ইহার নিকট তুচ্ছ। সমুদয় পৃথিবীতে কালকা-সিমলা রেলওয়ে লাইনের মত লৌহবর্ত্ম দুই একটা আছে কি না, সন্দেহ।

কালকা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত নয় ঘণ্টার পথ। যে সকল ষ্টেশন লৌহবর্ত্মের উপরে অবস্থিত, তাহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ; তন্মধ্যে—কালকা, ধর্ম্মপুর, কুমারহাটি, বরোঘ শোলোন, শোলোনচুয়াই, কন্দঘাট, কাম্নু, কথলীঘাট, তারাদেবী, জতুঘ, নিদাঘশৈল (Summer Hills) এবং সিমলা। অম্বালা হইতে কালকা পর্য্যন্ত যেমন সমুদয় ষ্টেশন গুলি হিন্দু দেবদেবীর নামে আখ্যাত, কালকা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সমুদয় ষ্টেশনগুলি তদ্রূপ দেবদেবীর নামে পরিচিত। ইহাদের অধিকাংশ পার্ব্বতীয় হিন্দুলোকদিগের দেবতাগণের নাম। পঞ্জাবের ষোল আনার মধ্যে প্রায় বার আনা হরগৌরীর উপাসক। অম্বালা হইতে কালকা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ঘোরতর তান্ত্রিক এবং দেবী পূজায় অনুরক্ত। শিখেরাও শিবের অত্যন্ত ভক্ত; শিখগুরু নানক শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কালকা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত এবং তাহার পরে তিব্বতের সীমার প্রথমাংশ পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় হিন্দুর বসতি। এই সকল জাতি তান্ত্রিক, কেহ কেহ সৌর ও গাণপত্য। বদরিকাশ্রম, গঙ্গোত্রি, যমুনোত্রি প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীর বাস। পার্ব্বতীয় জাতিদিগের মধ্যে সূর্য্য ও গণেশের পূজা কত বর্ষ হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিবার বিষয় বটে।

ইংরাজি ১৯০০ অব্দের এপ্রেল মাসে কালকা-সিমলা-রেলওয়ের সূত্রপাত হয় এবং ১৯০৩ অব্দের নবেম্বর মাসের নবম দিবসে ইহাতে বাষ্পীয় শকট চলিতে আরম্ভ করে। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ হিমালয়-গিরিমালার প্রায় একশত চারিটা স্থান তোপের দ্বারা ভেদ করিয়া ঘোর অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথের ভিতর দিয়া বাষ্পীয় শকট পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমুদয় লাইনে একশত চারিটা সুবৃহৎ সুড়ঙ্গ (Tunnels) আছে। তদ্ভিন্ন আরও বহু স্থানে ছোট বড় পার্ব্বতীয় সুড়ঙ্গ পথ ও খিলান অতিক্রমে করিতে হয়। কালকা হইতে ধর্ম্মপুর নামক প্রথম ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলগাড়ী ক্রমে ক্রমে পাহাড়োপরে আরোহণ করিয়া প্রায় পঞ্চসহস্র ফিট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; এইরূপে সিমলা পর্য্যন্ত ক্রমাগত পাহাড়ের উপরে, কখনও ঊর্দ্ধ হইতে নীচে, আবার নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে, কখনও এক পাহাড়কে দুইবার বা তিন বার পরিবেষ্টন করিতে করিতে অষ্ট সহস্র ফিট পর্য্যন্ত পর্ব্বতের উপরে গাড়ীকে ধীরে ধীরে চালাইয়া লইতে হয়। এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার যোগ্য; এমত অপূর্ব্ব কৌতুক ভারতে আর নাই। ষ্টেশনসমূহ পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত; সুড়ঙ্গসমূহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ; কোন কোন সুড়ঙ্গের ভিতর পার্ব্বতীয় জলপ্রপাত, ক্ষুদ্র সলিলোৎস, নির্ঝরপ্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। সুড়ঙ্গ দিয়া

যাইবার সময়, শকটাভ্যন্তরে উজ্জ্বল সৌদামিনীআলোক জ্বলিতে থাকে, কিন্তু তথাপি এত অন্ধকার বোধ হয় যে, কোলের মানুষকে দেখা যায় না। বরোঘ নামক সুড়ঙ্গ পথ (Tunnel) ৩৭৬০ ফিট দীর্ঘ, ইহার ভিতর দিয়া রেলগাড়ি যাইবার সময় আভ্যন্তরিক সমুদয় স্থান ইঞ্জিনের ধূমরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়; সুড়ঙ্গের সম্মুখস্থ ও পশ্চাত দুই দিক খোলা আছে, এইজন্য অল্প বায়ু সঞ্চারিত হইতে পায়; ঊর্দ্ধ, নিম্ন ও অপর দুই পার্শ্ব একেবারে বন্ধ। সুড়ঙ্গের ছাদ অনন্ত গিরিমালা ভিন্ন কিছুই নহে। পথিকেরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিবার সময় পায় না; "ত্রাহি মধুসূদন" করিতে করিতে এই সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। ভিতরে ঝরণার শীতল জলের শৈত্যানুভব হওয়ায় এবং বিশেষতঃ উচ্চ পর্ব্বতের গাত্র স্বভাবতঃ সুশীতল থাকায় পথিকেরা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হয়েন, নতুবা এই সকল সুড়ঙ্গ দিয়া যাতায়াত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

এইরূপে ১০৮টা সুড়ঙ্গ পার হইতে হয়। ভাবিয়া দেখ, ব্যাপারটা কি? আরও কৌতুকের বিষয় এই যে, এক এক স্থানে এমন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া বাষ্পীয় শকট চালাইতে হয় যে, গাড়ী চলিবার সময় বোধ হয় যেন ইহা নিমেষ মধ্যে নিম্নে পতিত হইয়া যাইবে। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি হইতে নিম্নদেশে যখন গাড়ী নামে এবং নিম্নস্থ পাহাড় হইতে আবার অতি ঊর্দ্ধে গাড়ী যখন উঠে, তখন পথিকেরা বিবেচনা করেন, মৃত্যু অতি সন্নিকট। বস্তুতঃ এই সকল পাহাড় হইতে গাড়ী নিম্নে পড়িয়া গেলে, গাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। গাড়ীতে চড়িয়া নিম্নের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলে কেবল ধূমরাশি ভিন্ন পৃথিবীর একটি জিনিষও লক্ষ্য করা যায় না।

ধর্ম্মপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কশৌলি ছাউনীতে যাইতে হয় গমনাগমনের সুন্দর পথ আছে। সবাতু নামক আর একটা প্রখ্যাত সেনানিবাসেও এই স্থান হইতে গমন করা যায়। শোলোন নামক ষ্টেশনে ইউরোপীয় সেনা থাকে এবং মদিরা প্রস্তুত করিবার কএকটা বিলাতী কুঠি ও কারখানা এখানে প্রতিষ্ঠিত। স্থানে স্থানে ডাকবংগলো ও বিশ্রামাগার (খানা খানা) আছে। পর্ব্বতসমূহের অনেক স্থলে পার্ব্বতীয় লোকদিগের কুটীর দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, কএকটা স্থানে সাধক মহাপুরুষেরা গুপ্তভাবে অবস্থান করেন।

আমরা যখন সিমলা অভিমুখে গমন করিতেছিলাম, তখন দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্ম। প্রখর জৈষ্ঠমাস। আমরা একেবারে প্রবল গ্রীষ্মহইতে প্রবল শৈত্যময় প্রদেশে গমন করিতেছিলাম। কুরুক্ষেত্র, অম্বালা কর্ণাল, পাণিপথ প্রভৃতি স্থানে ভীষণ গ্রীষ্মের নির্দ্দয় প্রকোপে আমাদের দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল। কালকায় আসিয়া কিঞ্চিৎ শৈত্য অনুভব করিলাম। কালকা হইতে শোলোন ষ্টেশন পর্য্যন্ত আরও একটু শৈত্য অনুভূত হইল। শোলোন হইতে যখন

তারাদেবী নাম্নী ষ্টেশনভূমিতে গাড়ী পৌঁছিল, তখন প্রবল শীতে (মাঘমাসের ন্যায়) থর থর করিয়া আমরা কাঁপিতে লাগিলাম। অদূরে পর্ব্বতোপরে তারাদেবীর সুবৃহৎ ও উচ্চ মন্দির এবং স্তম্ভাদি নয়ন-পথে পতিত হইল। তারাদেবী ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ী যখন সিমলা ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যাকাল; কুজ্ঝটিকায় সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণা; যেন অনন্ত হিমসাগরের জলে আমাদিগকে কোন অদৃষ্ট পুরুষ আনিয়া পৌঁছাইল। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে যে দুর্ব্বিষহ ও ভয়ানক শীত, তাহা পাঠকের নিকটে সহজে বর্ণনা করা যায় না। বার মাসই এখানে এরূপ দুর্দ্দান্ত শীত, কোয়াসা, বরফরাশি এবং বৃষ্টি। এই জন্যই ইহা সাহেবদিগের নিদাঘাবাস। সিমলা হইতে যক্ষগিরি অভিমুখে প্রয়াণ করিবার পূর্ব্বে, আমি এ স্থলে সংক্ষেপে সিমলা শৈলের কিছু বর্ণনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর বৎসরের প্রায় অধিকাংশ কাল সিমলা শৈলে বাস করেন। পশ্চিম হিমালয় গিরির উপরে সিমলা নগরী অবস্থিতা; ইহার উচ্চতা প্রায় নয় সহস্র ফিট। লোক সংখ্যা ষোড়শ সহস্র মাত্র। ৮১ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া সিমলা নগরীর পরিমাণ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গুর্খা সমরের অব্যবহিত পরে ইহা ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। ১৮১৯ অব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট রশ নামক সেনাপতি কর্ত্তৃক এখানে সর্ব্বপ্রথম বিলাতী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮২৭ অব্দে গবর্ণরজেনেরল লর্ড আমহার্ষ্ট কর্ত্তৃক এই স্থান সর্ব্ব প্রথম নিদাঘাবাসরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পর্ব্বতের সমুদয় স্থল শ্যামল তৃণ, লতা ও বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ; শৈত্যাধিক্য বলিয়া প্রকৃতি শ্যামলা থাকেন; প্রবল হিমানীতেও এই স্থান শ্যামলত্ব বিহীন হয় না; এই শ্যামল শব্দের অপভ্রংশ শিমলা। ইহা পার্ব্বতীয় শব্দ। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, শ্যামলা নাম্নী দেবীর নামানুকরণে শিমলা শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গালীদিগের কালীমন্দিরে, ব্রহ্মচারী নারায়ণচৈতন্য এবং পুরোহিত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ আমাকে শিমলা বা শ্যামলাদেবীর এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিয়াছিলেন, ইহাই প্রাচীন কালের ঐ দেবী। যাহা হউক, শিমলার সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। আমি অনেক বৎসর পূর্ব্বে আর একবার শিমলা গিয়াছিলাম; এবারে দেখিলাম, সে শিমলা আর নাই, এখন ইহা ইন্দ্রপুরী রূপে পরিণতা। শিমলা নগরী চারিভাগে বিভক্তা। ছোট শিমলা, বড় শিমলা, লক্কড় বাজার এবং বয়লোগঞ্জ। প্রথমস্থানে পঞ্জাবের ছোট লাটের নিদাঘ নিলয়; দ্বিতীয় স্থানে স্বদেশীয় লোকের বসতি; তৃতীয় স্থানে জঙ্গীলাট এবং চতুর্থ স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর অবস্থান করেন। বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় সপ্তশত। ইঁহাদের কালীবাড়ী, হরিসভা, বিদ্যালয় প্রভৃতি বঙ্গবাসীর গৌরবের নিদর্শন। দুই এক জন বাঙ্গালীর এখানে ভূসম্পত্তিও

আছে। সিমলা শৈলের বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া আমি প্রবন্ধের আয়তন বর্দ্ধন করিতে আকাঙ্খা করি না, স্থূলতঃ কয়েকটা কথা এক্ষণে লিখিয়া রাখা আবশ্যক বিবেচনা করি। সিমলা শৈল, শ্বেতকায় প্রভুদিগের ব্যবহারের জন্যই আবাসরূপে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং এখানে নেটিব-বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে। কালা আদ্‌মীকে প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম দিয়া যাইতে দেখিলেও সাহেবেরা বিরক্ত হয়েন। মলিন বস্ত্রে অথবা রজনীকালে ভ্রমণ করা এখানে নিষিদ্ধ। কালা আদ্‌মীর গমনাগমন জন্য একটা প্রকাণ্ড সুরঙ্গ পথ প্রস্তুত হইতেছে, অতঃপর সেই পথ দিয়া "গোলাম নেটিব" লোক গতায়াত করিবে। শুভ্রচর্ম্ম প্রভুরা প্রকাশ্য ও পরিষ্কার রাজবর্ত্ম দিয়া গমনাগমন করিতে থাকিবেন। সিমলায় তিনখানা মাত্র অশ্বযান চলে; একখানি পঞ্জাবের ছোট লাটের, একখানি জঙ্গীলাটের এবং একখানি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের। তদ্ভিন্ন আর কাহারও অশ্বযান চালাইবার হুকুম নাই। অশ্বপৃষ্ঠে পদব্রজে অথবা ক্ষুদ্র চেয়ারের মত রিক্‌শা নাম্নী গাড়িতে অপরাপর লোকে গমনাগমন করিতে পারেন। রিকৃশা গাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। সিমলা শৈলে "কেলু" নামক এক প্রকার বৃক্ষ দেখা যায়, ইহার কতকটা ঝাউগাছের মত। অগণ্য সংখ্যায় এই গাছ সিমলা শৈলকে ব্যাপিয়া আছে। এই বৃক্ষকে কাটিবার হুকুম নাই। নিজের গৃহমধ্যস্থিত কেলু বৃক্ষকেও কেহ কাটিতে পারে না, কর্ত্তন করিলে শাস্তি হয়। শুনিয়াছি, এই গাছ এখানকার স্বাস্থ্যরক্ষক এবং শোভার উৎপাদক। সিমলা শৈল অত্যন্ত শীতল; এমন হাড়-ভাঙ্গা শীত অন্যত্র প্রায় দেখি না। জ্যৈষ্ঠ মাসেও সমস্ত দেহ (আপাদ মস্তক) অতীব উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া দুইখানা লেপ মুড়িয়া শয়ন করিলেও শীত যায় না। পেশোয়ার বা ইংলণ্ডের শীত হইতেও সিমলার শীত, সময়ে সময়ে, অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে। আমি শীতকালে কাবুল, কান্দাহার এবং ইংলণ্ডে ছিলাম; দেখিয়াছি, এক বোতল নারিকেল তৈল কাবুলে ৪ মিনিটে, পেশোয়ারে সার্দ্ধ তিন মিনিটে এবং শিমলায় তিন মিনিটে জমিয়া গিয়াছে।

আমরা আমাদের স্থান হইতে যক্ষগিরি অভিমুখে গমন করিলাম। তখন শিপি স্থানে একটা বৃহতী মেলা হইতেছিল, তাহাও সুবিধা মত দেখিয়া লইলাম। যক্ষগিরির ইংরেজি নাম জেকো মাউণ্ট্ (Jako Mount); হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহা ক্ক্‌শা নামে পরিচিত। যক্ষ শব্দের ইহা অপভ্রংশ। পশ্চিমে ক্ষ অক্ষর "ক্ষ" রূপে উচ্চারিত হয়। যক্ষগিরি পশ্চিম হিমালয়ে অবস্থিত, ইহারই এক অংশ সিমলা। ইহার দ্রাঘিমা ৭৭ডিগ্রি, লঘিমা ২১ডিগ্রি। উচ্চতা প্রায় ৯সহস্র ফিট। যক্ষগিরির পূর্ব্ব দিকে সিমলা নগরী অবস্থিতা। এখানকার শোভা অত্যন্ত মনোহারিণী। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক। এখান হইতে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান

(গোমুখী বা গঙ্গোত্রি) ত্রয়োদশ দিবসের পথ; বদরিকাশ্রম একাদশ দিবসে যাওয়া যায়। পার্ব্বতীয় লোকেরা যক্ষগিরিকে তাহাদের ভাষায় "জক্ তিবা" বলিয়া পরিপরিচয় দেয়। জক্ অর্থে যক্ষ, তিবা অর্থে পর্ব্বত। এই তিবা শব্দ হইতে তিব্বত শব্দের উৎপত্তি। আমরা যক্ষ পাহাড়ের অনেক স্থান দর্শন ও ভ্রমণ করিয়াছিলাম। ভাল ভাল স্থান দেখিতে গেলে পর্ব্বতের আরও উপরে উঠিতে হয়। পদব্রজে গেলে কষ্ট হইয়া থাকে "রিক্‌শা" নাম্নী মানুষটানা গাড়িতে সহজে যাওয়া যায়।

প্রবন্ধের উপসংহারে একটা সুখের কথা মনোমধ্যে উদিত হইল। বঙ্গদেশের বহির্ভাগে যে সকল বাঙ্গালী ভ্রমণ করিতে গমন করেন, নানাকারণে নানাপ্রকার অসুবিধা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। আহারের ও অবস্থানের অসুবিধা সংসারী বাঙ্গালীর পক্ষে সর্ব্বত্র যথেষ্ট। পশ্চিমের অনেক স্থানে বাঙ্গালী "ডালভাত" পান না। টাকা এবং লোকবল থাকিলেও নানাকারণে নানাস্থানে অনেকপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আমাদের ন্যায় গৈরিক বসনধারী অনিকেতনী ও অবিবাহিত পরিব্রাজকগণের নানাকারণে নানাসুবিধা আছে বটে, এবং অসুবিধা হইলেও, আমরা তাহা সহিয়া লইতে অভ্যস্ত; কিন্তু নিয়মাবদ্ধ সংসারীর পক্ষে অথবা অভ্যাসের দাসস্বরূপ গৃহী লোকের পক্ষে এরূপ সহ্যগুণ খুব কম। এমতাবস্থায়, বঙ্গদেশের বহির্ভাগে, যে সকল বাঙ্গালী মহাত্মা তাঁহাদের বাসাবাটীতে আগন্তুকদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাঁহাদিগের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সোদরোপম যত্ন স্বীকার করেন, যাঁহাদের গৃহদ্বার আদর্শ হিন্দুগৃহের ন্যায় অতিথির আহার ও অবস্থানের জন্য উন্মুক্ত থাকে, যাঁহারা দুঃখের, বিপদের ও অসুবিধার সময় অতিথি সেবা করেন, সেই সকল সদাশয় বঙ্গবাসীভ্রাতার নাম বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকা উচিত। মিরটের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, জয়পুরের মন্ত্রিবর বাবু সংসারচন্দ্র সেন, দিল্লীর স্বনামধন্য চিকিৎসক বাবু হেমচন্দ্র সেন, লক্ষ্ণৌ নগরীর রায় বাহাদুর রাখালদাস চক্রবর্ত্তী, বাঁকিপুরের বাবু পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ও মথুরানাথ সিংহ, অমৃতসহরের ধনবান্ সওদাগর বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক (বসু), লুধিয়ানার রায় বরদাকান্ত লাহিড়ি বাহাদুর, সাহেবগঞ্জের বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জামুই মহকুমার ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার বাবু দীনবন্ধু গাঙ্গুলী, আলিগড়ের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুণানগরীর বাঙ্গালী বিদ্যার্থীগণ, আগ্রার মহাপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অমূল্যরঞ্জন বসাক, অম্বালার রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ, খাণ্ডোয়ার প্রখ্যাত উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ঢোলপুরের বাবু উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, কালকার বাবু হংসেশ্বর সিংহ, হাট্রাশ ষ্টেশনের বাবু অটলবিহারী নন্দী, গয়ার বাবু ইন্দ্রনাথ উকিল ইত্যাদি অন্নদাতাদিগের বাসাবাটী এবং তদ্ভিন্ন নানাস্থানে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী, ভ্রমণকারী বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ সহায়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কর্ণ কে?

কর্ণ ও কবিত্বের সম্বন্ধ কি?

এই মহিমময় উচ্চতম চরিত্রের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত কর। ভারতের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যলাভই এই প্রলয় সমরের কেন্দ্রভূমি। কর্ণ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ—তাঁহার প্রণম্য—যুধিষ্ঠির—তাঁহার দাস—বৃকোদর, সব্যসাচী প্রভৃতি বীর-ধুরন্ধর তাঁহার আজ্ঞাবহ অনুজীবী। মুহূর্ত্ত-পরিচয়েই তিনিই ভারতের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। লোভেই কুরু-পাণ্ডবের নিখিল ক্ষত্রিয়গ্রাসী দারুণ সমর—রাজ্যলালসাই সেই অনলের একমাত্র হবিঃ। বিবেচনা করিলে, পরিচয় দিলে, কর্ণই সেই মহাসমরের মৌলিক লক্ষ্যস্বরূপ ছিলেন—যুদ্ধে পাণ্ডব-বিজয় তাঁহারই শিরোদেশে রাজ-মুকুট সংস্থাপন করিত—সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্যের অক্ষুণ্ন একাধিপত্য—অক্ষয়ধন-বৈভব—অতুল রাজসম্পদ্—অনন্ত ভোগৈশ্বর্য্য—মহাবীর কর্ণ-চরণেই অসংশয় লুটিয়া পড়িত। মহাবীর সেই অজেয়—দুরাসদ লোভ অবলীলাক্রমে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন—মহাপ্রাণতার সর্ব্বাতিসারী অবনী-অর্চ্চনীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—রাজ্য-সম্পদ্ অভোগ্য বা পশুসেব্য বলিয়া, কর্ত্তব্যের দৃঢ়ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া,—আপনার অটুট গৌরবোজ্জ্বল কর্ত্তব্য-ধর্ম্মের অবিনশ্বর জয়শ্রী-পতাকা জগতে সগৌরবে উড্ডীয়মান করিয়াছেন—তাই বলি, এই দেবোপম চরিত্রের তুলনা নাই। যে মহাবীর মহাসমরে গৌরবোল্লাসে অসংখ্য অরি-শোণিতে স্বীয় ভুজ রঞ্জিত করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বা অল্পমাত্র দ্বিধাও হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না, সর্ব্বাভিভাবিনী জিগীষায় উন্মাদিত হইয়া, অকাতরে সমরানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হয়েন না, জাগতিক যাবতীয় দুঃখ দুর্দ্দশার ভীষণ প্রচণ্ডাভিঘাতেও যিনি হিমাচলের ন্যায় অটল, অচল, ও অভ্রভঙ্গ রহেন, তিনিও লোভের দুর্জ্জয় শাসনের নিকট অনেক সময়েই নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় মস্তক অবনত করেন! তাদৃশ আঘাতে শোচনীয়রূপে অস্থির ও আকুল হইয়া পড়েন!! বসুন্ধরার লোক-ইতিহাস তাদৃক্ কলঙ্কময় উদাহরণে বিদূষিত হইয়া, চিরতরে অপ্রতিবিধেয়রূপে, মানবজাতির অগৌরব-কাহিনী, শশিদিবাকরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত, বিঘোষিত করিবে। কিন্তু, মহাবীর কর্ণ, লোকোত্তর বিক্রমের সহিত, সেই সুদুর্জ্জয় দুঃশাসন লোভের শিরোদেশে সদর্পে পদাঘাত করিলেন! জগতীতলে এতাদৃক্ অবদান-গৌরব ইতিহাসের প্রতিপত্র অক্ষয়রূপে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে। যে সকল অনন্য-সুলভ উজ্জ্বলধর্ম্মের অশ্লথভিত্তির উপর মনুষ্যগৌরব-বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে শারীর-ধর্ম্মের পূর্ণানুশীলন ও সর্ব্বথা অপরিহার্য্যরূপে এক অতি প্রধানভাবে

স্বীকৃত ও পরিগৃহীত। যাঁহারা ধর্ম্মসংরক্ষণের পবিত্র প্রেরণায়, কর্ত্তব্য জ্ঞানের দুর্লঙ্ঘ্য অনুশাসনে কিংবা মৈত্রীর সর্ব্বগরীয়সী প্রেরণায় স্বার্থোৎসর্গের অতিভর পুণ্যনামে, বীরত্বের মহাপূজায়, আপনাদিগকে চরিতার্থ ও সন্তৃপ্ত মনে করেন, মনুষ্যজাতি চিরকাল তাঁহাদের পুণ্য নামোচ্চারণে কৃতার্থ হইবে। মহামনাঃ কর্ণের সেই বীরত্বগৌরব-লীলার পরিচ্ছেদ বা পরিসংখ্যা নাই। কিন্তু, শারীরবীর মানবজাতির আরাধ্য হইলেও, তাদৃশ উচ্চ প্রাণ মানস-বীর অনন্ত কালই অধিকতর নমস্য। কেন না, উন্নতির ক্রমোৎকর্ষে মানসধর্ম্মের উচ্চতর স্থাননিবেশ। সেই জন্যই ত বলিতেছি, মহাবীর কর্ণ ভুজবীর্য্যে ভারতীয় শূরশ্রেষ্ঠগণের একতম উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন বলিয়াই কেবল আমরা তাঁহার পবিত্র চরণাম্বুজে নতজানু হইতেছি না; অনন্যসাধারণ মানসিক বীর্য্যানলই তাঁহাকে নশ্বর জগতে চিরকালের জন্য সমুদ্ভাসিত করিয়াছে। অহো! সত্যসত্যই এতাদৃক্ বীরত্বের তুলনাস্থল অতি সুলভ হইলে, মনুষ্যের প্রাণদায়িনী সান্ত্বনা পাইবার অনেক কারণই পরিলক্ষিত হইত! কিন্তু পার্থিব নিয়মচক্র সর্ব্বদা সেইরূপ ঋজুপথে গতিশীল হইবে, এরূপ আশা, শিশুর বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয় ব্যতিরেকে, কুত্রাপি স্থান লাভ করিতে একান্তই অসমর্থ।

শূরপ্রদীপ একিলিস্, মহাবীর হেক্‌টার, প্রাতঃস্মরণীয় হারকুইলিস্, নরসিংহ উইলিসিস্ প্রভৃতি মহাভাগগণ লৌকিক ইতিহাসের উজ্জ্বলতম রত্ন! সেই সকল মহাপ্রাণগণের অসংখ্য অবদান-পরম্পরা ঐতিহাসিকের অতি বড় প্রিয় বস্তু। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ডাভিঘাতে বসুন্ধরা কতবার বিদলিত ও বিচূর্ণ হইয়াছে, কতবার কত বিচিত্র অনন্ত দৃশ্যময় নাটকের অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু, সেই সব পুরুষ-পুঙ্গবগণের অসংখ্য পুণ্যকাহিনী এখনও সগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া মনুষ্যজাতির অক্ষয়গৌরব সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে।

বোধ হয়, একিলিসের ভুবন-দুর্লভ বীরত্বতেজ কর্ণ-প্রভার বড়ই মলিন ভাব ধারণ করে; ইতিহাসবিশ্রুত হেক্‌টারের অপূর্ব্ব শারীর বিক্রম, এই মহাপ্রাণের অত্যূর্দ্ধ মহত্ত্বের নিকট, মস্তক অবনত করে; হারকিউলিসের অগণ্য সমুজ্জ্বল বীরবৃত্তান্ত, এই মহাবীরের গৌরব মহিমায়, বড়ই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। মহাভাগ উইলিসিসের চিরস্মরণীয় শূরত্ব-কীর্ত্তিও, এই মহাপ্রভাবকর্ণের অনন্ত স্রোতোময় বিচিত্র জীবন-সমুদ্রে, কোথায় অলক্ষ্যপথে ভাসিয়া যায়!! তাই কহিতেছি, এই উচ্চজীবন সাংসারিক ইতিহাসে একেবারেই অনুপম, এবং সত্যসত্যই এই মহিমোদ্ভাসিত দেবদুর্লভ চরিত্রের পরমপুণ্য ইতিবৃত্ত মানবজাতির অক্ষয় অনন্তগৌরব।

দশদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া, ক্ষত্রিয়সিংহ শান্তনুনন্দন, অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক, কুরুক্ষেত্র মহাপ্রাঙ্গণে শরশয্যায় শয়ান হইলেন। দুর্য্যোধন পিতামহের এবম্বিধ অভাবনীয় শোকাবহ পতনে বড়ই মর্ম্মাহত ও হতাশ্বাস হইলেন। মহাবীর কর্ণ ও তদীয় নিসর্গসিদ্ধ প্রাণসম্মোহন মধুর ও তেজঃপূর্ণ

আশ্বাসবাক্যে কুরুপতিকে সমাশ্বস্ত করিলেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মনস্বিতার সহিত, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্য, তাঁহার প্রাণবন্ধু দুর্য্যোধনকে সমুৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন রোগে মহৌষধির ন্যায়, তাঁহার প্রয়োজনানুকারি আশ্বাসবাক্য সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং আশার নবীন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার যুদ্ধব্রত সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শস্ত্রাচার্য্য আচার্য্যবীর্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনিও পাণ্ডবের, বিশেষতঃ পার্থের, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রিয়ার্থী ছিলেন। স্নেহে অশ্বত্থামাও পার্থের বহুপশ্চাতে পড়িয়া ছিলেন। সেই পুত্রাধিক প্রিয়তর শিষ্যের প্রতিপক্ষস্বরূপে সমরে অবতীর্ণ হইয়া, স্বোপদিষ্ট অস্ত্রশিক্ষার সমুচিত পরীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য, সেই ভীষণ সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ডবেগে বীরত্বাভিনয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু, আচার্য্যও ফাল্গুনির প্রতি তদীয় সহজ অগাধ স্নেহ সেই ভীষণক্ষেত্রেও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনিও পিতামহের ন্যায়, স্নেহের প্রবল শাসনাধীন হইয়া, পাণ্ডবের হিতেচ্ছা-প্রণোদনায়, কর্ত্তব্যসাধনে অনেক ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন। মহাবীর কর্ণ আচার্য্যবীরের অধীন হইয়া পাণ্ডববাহিনী মহাবেগে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। এই মহাসমরে আর একটি ভয়ঙ্কর কলঙ্করাহু এই দীপ্যমান চরিত্র চন্দ্রমা গ্রাস করিয়াছে। সে কলঙ্ক কুরুক্ষেত্রকলঙ্ক—মহাভারতের মহাকলঙ্ক—সেই ভীষণ কলঙ্কে ভারতযোদ্ধৃগণ একেবারে অপ্রক্ষালনীয়রূপে কলঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু, এই ক্ষেত্রেও মহাত্মা কর্ণের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। অনেক বার কহিয়াছি এবং এখনও বলি, কর্ণ সর্ব্বদাই পরতন্ত্র,—তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কখনও ছিল না, এই সময়েও ছিল না। দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়াছেন—তদানীন্তন যাবতীয় যুদ্ধব্যাপারে অস্ত্রগুরুরই সর্ব্বতোমুখ গৌরব ও প্রভুত্ব—মহাবীর কর্ণ পরতন্ত্র হইয়া—পরাধীন হইয়া—সেই কলঙ্কাভিনয়ে কিরূপে কোন্ আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারেন? একে দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষার প্রবল তাড়না—তাহাতে আবার আচার্য্যের দুরতিক্রম ও কঠোর আদেশ—সামরিক নিয়মের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুশাসন—যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন বিধি—সেনাপতির অরোধনীয় আজ্ঞা,—কর্ণ কি করিতে পারেন? অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন—কর্ণ পার্থের জ্যেষ্ঠ সহোদর—আর্জ্জুনি কর্ণেরই রক্তমাংস—অভিমন্যু তাঁহারই আত্মজ—তাঁহারই দ্বিতীয় প্রাণ—কর্ণ কি নিসর্গসুলভ যাবতীয় কুসুম-কোমল বৃত্তিতে একেবারেই বঞ্চিত ছিলেন? তিনি কি রক্তমাংসের একেবারে সম্পর্কশূন্য ছিলেন? এই দেব-চরিত্র কি পাশব বা পৈশাচভাবে কখনও বিদূষিত হইয়া, পৃথিবীতে অপবাদের তমোময়ী মূর্ত্তির ভয়াবহ বিকট চিত্র প্রদান করিয়াছেন? কর্ণ কি করিবেন? দোষ—সমগ্রদোষ—আর্জ্জুনিবিনাশ কলঙ্ক—নিখিল দোষ—অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণের; তৎকালীন কুরুক্ষেত্রের সেনাপতি—সেই শোচনীয় অভিনয়ের প্রধানতম অভিনেতা—দ্রোণই এই দারুণ কলঙ্কভার বহন করিবেন। তাহাতে মহাবীর কর্ণ কোনওক্রমেই মুখরভাবে সেই দুর্নিবার কলঙ্কের

অপবিত্র ভার বহন করিতে পারেন না। কেন না, তিনি স্বাধীনতা শূন্য—অস্বতন্ত্র—দুর্য্যোধনের অনুজীবী—আচার্য্যের বশবর্ত্তী—তিনি দ্রোণ-নিদেশ কিরূপে উপেক্ষা করিবেন? তাঁহার সম্মুখে, কর্ণ কি বলিয়া, কিরূপে, সেনাপতি আচার্য্যের তাদৃক্ বিগর্হিত কার্য্যের অন্যথাচরণ করিবেন? তাই, কর্ণ আচার্য্যের পক্ষানুবর্ত্তী হইয়া,—স্নেহ মমতা ভুলিয়া—কলঙ্কের দারুণ ভার মস্তকে আরোপণ করিয়া, প্রাণ-প্রতিম-অর্জ্জুন-নন্দনের বিনাশ সাধনে প্রয়াসপর হইয়াছেন। আচার্য্যের প্ররোচনা—দুর্য্যোধনের উত্তেজনা—কর্ণের পরতন্ত্রতা—কর্ণের দোষ কিছুই নাই—যদি থাকে, তাহা অবস্থার দোষ—তাঁহার কি? আচার্য্যই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া—নিয়মের চিরন্তন-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া—স্নেহ মমতা নির্দ্দয় ও নির্ম্মমভাবে জলাঞ্জলি দিয়া, ঘোরতর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; এবং ভারতের কুরুক্ষেত্র সমর-ভূমিকে ভীষণ কলঙ্ক-পঙ্কে কলুষিত করিয়াছেন! আচার্য্য তাদৃশ কলঙ্ক ভারাক্রান্ত মস্তকে ততোহধিক কলঙ্কের অপবিত্র ভার যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনের শিরোদেশে নিক্ষেপ করিয়া তদীয় চিরশত্রু দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই ভীষণ অকীর্ত্তি কাহিনী অনন্তকাল অনন্ত পথে পরিকীর্ত্তিত হইবে।

দুর্য্যোধন হতাশ হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের নিষ্ঠুর নিধনে তিনি একেবারে অবসন্ন হইলেন। সাক্ষাৎ বীরসূর্য্য পিতামহ, কৃতান্তোপম আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, একে একে সকলেই, তাঁহাকে অনাথ ও অশরণ করিয়া, দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সবেগে ও সোৎসাহে অগ্রসর হইলেন। তিনি হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রীতি সম্ভার লইয়া, আশার আশ্বাসময়ী কথা কহিয়া, আকুলভাবাপন্ন কুরুপতির প্রভূত চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মসূর্য্য অস্তমিত; দ্রোণ-চন্দ্রও রাহুগ্রস্ত; কৌরববংশের অবলম্বন একেবারে ছিন্ন হইয়াছে। কর্ণ হিতৈষণার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া, পাণ্ডবধ্বংসে কৃতোদ্যম হইলেন। দুর্য্যোধন আশ্বস্ত হইলেন; আবার নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত হইলেন, আবার পাণ্ডবক্ষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেনাপতি-পদে বরিত হইলেন। এইবার মহারথ কর্ণ সেই বিপুল সমর-সাগরের কর্ণধার হইলেন। প্রবল বিক্রমে প্রাণাধিক পাণ্ডববিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। কর্ণ এই প্রলয়-যুদ্ধের যে চরমফল না বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। সেইজন্য সেই জীবনমরণের ঘোরতর সমস্যার সময়, মহাবীর কর্ণ রমণীরত্ন পদ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বুদ্ধিমতী পদ্মা ভবিষ্যৎ ফলানুচিন্তন করিয়া কর্ণকে সবিশেষ বুঝাইলেন। কর্ণ কর্ত্তব্যের কথা কহিলেন। পদ্মা মহারথ কর্ণের ভার্য্যা। যে অলৌকিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির পুণ্যমন্দাকিনী-প্রবাহ কর্ণ-ধমনীতে সহস্রপথে সঞ্চারিত ছিল, সেই পবিত্র প্রবাহ কি পদ্মাকে পরিশোধিত করে নাই? তথাপি স্নেহাবেগে সতী স্বামীকে আপনার দুঃখের কথা কহিলেন। কর্ণ স্থির। পদ্মাও বুঝিলেন সূর্য্য গগন-ভ্রষ্ট হইলেও স্বামী কর্ত্তব্যবুদ্ধির চিরন্তনপথ কদাপি অতিক্রম করিবেন না। পদ্মা হাহাকার করিবেন, পদ্মা বেশ বুঝিলেন। পদ্মা কাঁদিবেন, তাহাও জানিলেন।

কিন্তু, স্বামী কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া,ভীষণ প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইবেন, এই সংসারে কর্ণ-পত্নী পদ্মার অধিকতর দুঃখ আর কি আছে ? তাই, কর্ত্তব্য-জ্ঞানময়ী পদ্মা সব বিস্মৃত হইলেন। আপনার সুখ দুঃখের কথা ভুলিলেন ; আপনাকে ভুলিলেন। নিজের অসহ্য দুঃখভার সম্বরণ করিলেন। প্রাণাধিক প্রাণারাধ্য স্বামীকে কাল-সমরে বিদায় দিলেন। কর্ণপত্নী পদ্মার ইহা অবশ্যই অতি মহান্ স্বার্থোৎসর্গ—কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মহত্তম বিগ্রহের নিকট আপনার সুখদুঃখ, সবই বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

মহাপ্রভাব কর্ণ অনিবার্য্যবেগে কর্ত্তব্যের মহীয়সী প্রণোদনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ প্রাঙ্গনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহারথ পার্থও আপনার প্রবল অরি কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। একে চিরজিঘাংসা, তাহাতে প্রাণাধিক অভিমন্যুর বিনাশ—কর্ণের সাহায্য ও সহযোগিতা—অর্জ্জুন দুর্জ্জয়বেগে কর্ণের শোণিতপিপাসু হইয়া ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহার প্রতিরোধে কৃতোদ্যম হইলেন।

জ্ঞান-বিগ্রহ বাসুদেব অর্জ্জুনের সারথিরূপে ভারতীয় এই ভয়াবহ সমস্যাপূর্ণ রণাভিনয়ের সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। এবম্বিধ প্রলয়-সময় নানারঙ্গময় ভূপৃষ্ঠে বা বহুদৃশ্যময় পার্থিব ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ। নিখিলতত্ত্বদর্শী বাসুদেব মহাবীর কর্ণকে চিনিতেন ও প্রীতি-মধুর-হৃদয়ে তাঁহাকে সমাদর করিতেন। কর্ণও হৃদয়ের কি এক অনির্ব্বচনীয় অনিরোধনীয় মহাকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা করিয়া অভূতপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। অচ্যুতের যে সর্ব্বমঙ্গল্যা রসময়ী প্রীতি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে চিরকাল চরিতার্থ করিয়াছে, কর্ণও সেই অমিয়াস্বাদে ধন্য হইয়াছেন—প্রীতির যে বহুবিলাস-বিচিত্র উচ্ছ্বাস আজীবন পাণ্ডবগণকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে, মহাত্মা কর্ণও সেই ভুবন-প্রাণ পবিত্র প্রবাহে উদ্‌বেল হইয়াছেন। যে মধুময় অগ্রজ সম্বোধন, হৃদয়ের অক্ষয় লোভ-নীয় রত্ন আর মস্তকের অমূল্য ও অতুল মণি-বোধে, পার্থিব দুর্গতির ভয়াবহ নিদারুণ অত্যাচারেও, ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির আপনাকে অনুপম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী জ্ঞান করিয়া কি এক অবর্ণ-নীয় আনন্দনীরে অবগাহন করিয়াছেন, ভুবন-দুর্লভ সেই প্রাণময় আহ্বানে মহৌজাঃ কর্ণও আত্মাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। বাসুদেব সম-দর্শী,গুণগ্রাহী, জ্ঞানময়—প্রীতির পুণ্যবিগ্রহ—প্রেমের পবিত্র অনন্ত উৎস—কর্ণের হৃদয়ও বাসুদেব-পথাভিসারি—বাসুদেবেরই আদরাভি-লাষি—সেইজন্যই নিসর্গ নিয়মে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞানানুগামিনী প্রীতিভক্তির পুণ্যকুসুমোপহার সমর্পণে চিরদিনই আত্মায় পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

হায়! যুধিষ্ঠির এবম্বিধ অপার্থিব ধনের প্রকৃত মূল্য তাঁহার জীবনে কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই!—যদি করিতেন—তাহা হইলে, একটি বারও বোধ হয়, এমন মহাপ্রাণের শ্রীচরণ পাদপচ্ছায়ার সুখাশ্রয়ে, আপনাকে সহস্ররূপে কৃতার্থ ও সুখী করিতে পারিতেন!—একটিবারও তেমন—মহাবীরকে পীযূষ-মধুর অগ্রজ সম্বোধনে নিজকে চরিতার্থ করিতেন। কিন্তু, বিধাতার অব্যর্থ শাসনে বা অমোঘ নিয়মে, যুধিষ্ঠির সেই পরমসুখে একে-

বারে বঞ্চিত হইয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের ভাগ্যবিড়ম্বনা, তাই জীবনে এক দিনও সেই নরসিংহের পুণ্যচরণে মস্তক অবনত করিয়া, সেই অতুল-সুখ-মাধুর্য্য অনুভব করিতে সর্ব্বতোভাবেই অসমর্থ হইয়াছেন। আর, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রহবৈগুণ্য, আমরা সেই অনুপম প্রীতিভাবের উজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শি চিত্র দেখিয়া প্রাণের দারুণ পিপাসা মিটাইতে পারিলাম না।। কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বশুভাবহসম্মিলন ভারতীয় বিষাদময় ইতিহাসচিত্রকে কি এক বিচিত্র ও অচিন্তিত ভাবে সুখশোভায় সমলঙ্কৃত করিত, তাহাও সর্ব্বতোভাবেই কল্পনার অতীত। তাই দুর্ব্বহবিষাদব্যাকুল হৃদয়ে কহি, দুর্ভাগ্য যুধিষ্ঠির—দুর্ভাগ্য সমগ্র হিন্দুজাতি—দুর্ভাগ্য বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র—দুর্ভাগ্য বলিয়াই সেই লোকোত্তর চরিত্রগৌরবের অবোধ্য রহস্যোদ্ভেদে যুধিষ্ঠির একেবারেই বঞ্চিত রহিয়াছেন; এবং সহস্র যুগান্তের সুদূর ব্যবধিতে আমরাও সেই জগন্মঙ্গল্য মহাফলে অতি শোচনীয়রূপে বঞ্চিত রহিয়াছি!! (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিমোহন বসাক।

অভিশাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আঘাতের প্রথম বেগ সহ্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ; সেই প্রথম বেগ সংবরণ হইলে পুনরায় সব সহিয়া যায়, মনের ভিতরের সব গোলমালের নিবৃত্তি হইয়া আবার স্থিরতা উপস্থিত হয়। রায় মহাশয় চলিয়া যাওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যদ্যপি তাঁহার এই পরিবর্ত্তনটি সাধিত হইত, তাহা হইলে হয়ত বা শচীকান্তবাবু মনের দুঃখে ও কষ্টে নিজ সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী যাইতেন না। কিন্তু হায়! বিধাতার ইচ্ছা এরূপ ছিল না। ছোট বাবুর বাটি ত্যাগের সহিত সত্যেনের মানসিক পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ নিকট। সময়ে সময়ে একটি সামান্য ঘটনাতে মানবের মনের ভাব যে পরিমাণে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেয়, হয়ত সহস্র উপদেশ, তিরস্কার বা শাসনে তাহা হয় না। আর সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা একটি সামান্য ঘটনা নহে, অতএব এ পরিবর্ত্তনে বিচিত্রতা কি আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ সংসারের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ পিতৃব্যের বিরহে ম্রিয়মাণ হইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। খাতাপত্র নিজে ভাদারক করিতে লাগিলেন। যে সকল বাকি খাজানা

পড়িয়াছিল, তাহা আদায়ের জন্য কড়া হুকুম দিলেন। যে সকল প্রজা নিজ জমার অতিরিক্ত জমি দখল করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। প্রথম বিচারাসনে বসিয়া অদূরদর্শী দাম্ভিক বিচারপতি যেমন বিবিধ অবিচার ও পীড়নে লোক সকলকে বিব্রত করিয়া তোলে, সেইরূপ সত্যেন্দ্রনাথ, নিজ হস্তে সকল ভার গ্রহণ করিয়াই, নায়েব গোমস্তা, কারকুন, মুহুরী প্রভৃতি আমলাবর্গকে নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তিনি জানেন, কর্ম্মচারিবৃন্দ যদ্যপি নিজ প্রভুর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট প্রভুর গুরুত্বের লাঘব হইয়া থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি একেবারে নানাবিধ আদেশ প্রদানের ইহাও একটি কারণ।

যে সত্যেন্দ্রনাথ সংসার ও বিষয় কর্ম্মের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, নিজ ইচ্ছামত, এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন, তাঁহার এবম্বিধ পরিবর্ত্তনে সকলেই একেবারে বিস্মিত হইলেন, হিতাকাঙ্ক্ষিগণ সন্তুষ্টও হইলেন। অমরনাথ বন্ধুবরের ঈদৃশ ভাব দর্শনে অন্তরে সুখী হইলেন। কথায়, তর্কে বুঝাইয়া যখন তিনি সত্যেনকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না, যখন বুঝিলেন তাঁহাকে বুঝাইতে বা বলিতে গেলে ক্রমে বিরক্ত হন, যখন দেখিলেন সত্যেন তাঁহাকে লুকাইয়া দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তিনি উপায়হীন হইয়া, আর সত্যেনের অভিলাষের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে বা কোন কার্য্য করিতে বিরত হইলেন। যতদিন মনে মনে মিল থাকে, ততদিন ঘনিষ্ঠতা ও মিশামিশি অধিক থাকে, তাহা না থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও মিশামিশি, হৃদয় মধ্যে একটি নূতন যাতনার বীজ রোপণ করিয়া, কমিয়া যায়। কিন্তু অন্তরের ভিতরের যে আকর্ষণ থাকে তাহার হ্রাস হইতে সময় অধিক লাগে। সত্যেন পথভ্রষ্ট হইয়া, যখন হইতে অমরকে সুখের অন্তরায় মনে করিতে লাগিলেন, অমরও যখন হইতে বুঝিলেন তাহা হতেই প্রকৃতই সত্যেনের কোন উপকার দর্শিবে না, অথচ ক্রমেই বন্ধুর অপ্রিয় হইতে হইবে, তখন হইতে তিনি সত্যেনের নিকট পূর্ব্ববৎ যাওয়া আসা বা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহা কমাইতে লাগিলেন। ইহাতে অমর যে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, সত্যেনের তদ্রূপ হয় নাই। যাহা গুরু তাহাই সর্ব্বনিম্নে থাকে, যাহা লঘু, তাহা উপরে ভাসে; যদ্যপি স্থান না থাকে, তবে লঘু পদার্থই উথলিয়া পড়িয়া যায়। লৌহ ভারিবস্তু, তাহাও পারদে ভাসে, কিন্তু স্বর্ণ নিম্নে থাকে। অমরের বন্ধুপ্রেম কখনই সামান্য সামগ্রী নহে, কিন্তু তাহাও মালতীর রূপজ-মোহের তুলনায় লঘু হইয়াছিল। সেই কারণে সত্যেন অমরের সহিত ঘনিষ্ঠতার লাঘব হওয়াতে, বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন নাই। এক্ষণে সে মোহ যত কমিতে লাগিল, পুনরায় পূর্ব্ববিস্মৃত সমুদয়ই মনে আসিতে লাগিল। এক্ষণে প্রাণের হিরণকে আবার দেখিলেন, হৃদয়ের বন্ধু অমরকে আবার পাইলেন।

অপরাধী সত্যেন্দ্রনাথ অমরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও পিপাসিতা হিরণ্ময়ীকে প্রেম

বারি প্রদান করিয়া, নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। বুদ্ধিমতী হিরণ্ময়ী অনেকগুলি কষ্টের মধ্যেও এক অনির্ব্বচনীয় অজানিতপূর্ব্ব নূতন সুখামৃত আস্বাদনে, কত যাতনা ভুলিয়া গেলেন। নারীদেহে দেবতার অংশ আছে, পতিব্রতা রমণী স্বামীর ভালবাসা পাইলে, তাঁহার পূর্ব্বকৃত নির্য্যাতন সব ভুলিয়া যায়, সংসারের অপর সকল জ্বালাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। পতিপ্রেমই তাঁহাদের কামনার শ্রেষ্ঠ-সামগ্রী।

হিরণ্ময়ী পতিহৃদয় লাভ করিয়া প্রকৃতই নূতন জীবনে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যাহা হইতে তাঁহার এই নূতন অধিকার লাভ ঘটিয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহার কএকটি নূতন যন্ত্রনা উপস্থিত হইয়াছে। শচিকান্ত বাবুর স্ত্রী রায় পরিবারের গৃহকর্ত্রীর যাওয়ার পর হইতে তাঁহার সংসারে সচ্ছন্দে থাকার পক্ষে কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে। রায়-অন্তঃপুরভুক্তা দূর সম্পর্কীয়া কএকটি রমণী তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বাক্য যন্ত্রনা দ্বারা কষ্ট দেন, তাঁহারা পূর্ব্বেও সময়ে সময়ে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের খুড়িমাতা থাকাতেও বড় অধিক পারিতেন না। হিরণ্ময়ী আলাদা থাকেন, আলাদা ভোজন করেন, আলাদা শয়ন করেন, তিনি বাটীর অপর রমণীবৃন্দের সংশ্রবেই থাকেন না। যাহা কিছু গৃহিণীত্ব করিতে হয়, তাহা ঠাকুরমা বা পিসীমাতাই করিয়া থাকেন, তথাপি কেহ কেহ গৃহিণী বলিয়া ঠাট্টা করেন। হিরণ, অধিকাংশ যুবতীদের ন্যায়, সদা রহস্য বিদ্রূপ ভালবাসেন না. নির্দ্দিষ্ট সঙ্গিনী সহবাসে, শান্ত কথোপকথনের পক্ষপাতিনী। কাহারও কোন মন্তব্যের উত্তর দিতে পারেন না; সামান্য দাসীকেও তাহার কোন দোষের কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ অনুভব করেন। হিরণ্ময়ীর মনে হয়, ঠাকুরমাই তাঁহাকে অধিক স্নেহ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের অন্তরায়।

নিদাঘের প্রদীপ্ত ভাস্করদেব অস্ত গিয়াছেন, অথচ সন্ধ্যা হয় নাই; সেই সময়টিতে প্রকৃতি দেবীকে যেমন বর্ণনাতীত মনোরম দেখায়। ঝঞ্ঝাবাতক্লিষ্টহৃদয় সত্যেন্দ্রনাথ হিরণের প্রেমময় মুখখানি তেমনই বর্ণনাতীত মনোরম দেখিলেন। দেখিলেন সে শান্তির আধার প্রতিমা সরলতার সমষ্টিমাত্র, যেন ত্রিভুবনের যাবতীয় কোমল ও স্নিগ্ধকর সামগ্রী সে কুসুম-সুকোমল দেহের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সত্যেন্দ্র অনুভব করিলেন সে রূপ দাহিকাশক্তি-বিবর্জ্জিত, রৌদ্রপ্রখরতাবিহীন, শান্ত, সুবিমল, সুশীতল-চাঁদনী যামিনীর কোমলতা সদৃশ। মালতী-বিরহের প্রথম বেগে সত্যেন মনে করিয়াছিলেন, বুঝি তাহার অভাবে এ সংসারক্ষেত্র মরুভূমি-প্রায় অনুমিত হইবে। অদৃষ্টলিপি অন্যরূপ, তাহা হইল না; তিনি সম্মুখে এক নিরুপম পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলেন; সংসারের আকর্ষণ প্রবলতর হইল, অন্তরে সুধাস্রোত পুনঃ প্রবাহিত হইল। সেই স্রোতে সত্যেন্দ্র গা ভাসাইয়া দিলেন।

যাহা স্বাভাবিক, তাহা সম্পাদিত হইবেই। প্রেমিক দম্পতির প্রেমের আঁটাআঁটি হইতে

কতক্ষণ? যে প্রেমকল্পতরু ক্ষুদ্রাকারে অঙ্কুরিত হইয়া, এতদিন মৃত্তিকাগ্রোথিত থাকিয়া প্রচ্ছন্নাবস্থায় ছিল, তাহাই এক্ষণে পল্লবিত হইয়া মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইল। আবার সেই অন্তঃশূন্য, অর্থশূন্য কত কথা, কত আদর, কত সোহাগ, কত মান, অভিমান—সব ফিরিয়া আসিল। দম্পতিহৃদয়ের এই অভিমান নামক পদার্থটিকে আমরা বড়ই প্রয়োজনীয় মনে করি, ইহা একটা সুলক্ষণ ইহার অভাব হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের প্রণয়কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে; পূর্ণিমার চাঁদে রাহুর দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মানুষ নিজ অবহেলায় সুখ সময় হারাইলে, পরে অনুতাপ করিয়া থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ নিজ অবহেলায় এত দিন যে সুখ হারাইয়াছিলেন, এক্ষণে মনের ভিতর সে জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়। এখন তিনি, সময়ে সময়ে, নিজ অপরাধের কথা মনে করিয়া বড়ই কাতর হইয়া থাকেন। পিতৃসদৃশ পিতৃব্য তাঁহারই জন্য মনোদুঃখে তীর্থবাসী হইলেন, তাঁহার অপার স্নেহের প্রতিদানে, তাঁহাকে মানসিক ক্লেশ দান করিয়াছেন, এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, তাহার ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিছু দিন হইল খুল্লতাতকে বাটীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি লেখেন,—"নাতী, নাত্‌নী হউক তাহার পর বাটী যাইয়া সব দেখিয়া আসিব।" সত্যেন্দ্র সেই অবধি আর আসিবার কথা বড় লেখেন না।

সংসারপালনে অনভ্যস্ত সত্যেন্দ্রনাথ একেবারে সকল ভার মস্তকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শচিকান্ত বাবুর যাওয়ার পর প্রথমে যে ভাবে সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, এখন আর তাহা নাই। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, হিরণ্ময়ীর প্রণয়পীযূষ পানে, অপর যাবতীয় বিষয়ই তাঁহার নিকট নীরস বোধ হইতে লাগিল। তিনি সংসারিক বিষয় দেখিবার ভার অনেকটা অপরের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, কিন্তু এখনও জমিদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম নিজে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজ সংসারের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে একটু বিরক্তি ছিল, এক্ষণে সেই সংসারের সকলের মন সন্তুষ্ট রাখিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হইল। আর এই বহু আত্মীয়পূর্ণ বাটীতে থাকিয়া হিরণকে লইয়া সুখের পূর্ণতা সাধন পক্ষেও তাঁহার সন্দেহ হইল। সত্যেন কলিকাতায় থাকিয়া, ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার মতি, গতি, পছন্দ সব আধুনিক ভাবের। কোলাহল, কোন্দল, হিংসা, দ্বেষ, অপ্রীতি প্রভৃতি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের নিত্যদৃশ্য বিষয়গুলি তাঁহার চক্ষের বড়ই অপ্রীতিকর। তিনি দেখিলেন, এ সংসারে থাকিয়া তাঁহার কৈশোরকল্পিত সকল সাধ পূর্ণ হইবার পক্ষে অনেক ব্যবধান।

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ।

নূতন সাধের সংসার।

কালের মহিমা অপার। মানব অন্তঃকরণে এমন কি শোক, তাপ, বিরহবেদনা উপস্থিত হইতে পারে, যাহা সময়রূপ মহৌষধির দ্বারা

উপশমিত না হয়। তবে কখনও দশ দিন, আর কখনও দশ বৎসর লাগে। সত্যেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, অভাগিনী বিধবা বালার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন; সে প্রেমরাশি, অল্পে অল্পে, শরতের মেঘ মালার ন্যায়, তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া অন্য আধার অবলম্বন করিয়াছে। আর কালধর্ম্মে এক্ষণে শচিকান্ত বাবুর বিরহ জনিত ক্লেশেরও অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার হৃদয়ে নূতন সুখ—নূতন আশার উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বহুপূর্ব্ব হইতেই সত্যেন্দ্রনাথের মনে মনে বাসনা ছিল যে, বিবাহ হইলে, ভার্য্যাকে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রকারে শিক্ষিতা করিয়া, উভয়ে সংসার মহাসাগরের শত শত ভীষণ তরঙ্গ ও প্রবল বাত্যার মধ্যদিয়া জীবনতরী ধীরে ধীরে ভাসাইয়া লইয়া যাইবেন। যৌবনরাজ্যে পদার্পণের সহিত যথাকালে সত্যেন মনোমত পত্নী লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার অন্তর মালতী-মোহ-আবরণে আবৃত থাকায় বিবাহিত জীবনের পূর্ব্বচিন্তিত কোন বাসনা পূর্ণ করিবার কথা মনে ছিল না। এক্ষণে সে মোহের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মানস-কাননের কামনাকলিকাগুলি যেন একে একে বিকসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এখন সত্যেন তাঁহার কৈশোর-কল্পিত বাসনাকামনাগুলি পূর্ণ হইবার পক্ষে যেন একটি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। সেটি বোধ হয় তাঁহার হিরন্ময়ীর দেবীত্ব। হিরণের স্বাভাবিক কোমলতা ও মাধুর্য্য তাঁহার চক্ষে জগৎকে মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিল। নূতন জীবনে প্রবেশের পথটি তাঁহার নিকট বড়ই সৌন্দর্য্যময় বলিয়া বোধ হইল।

সত্যেন্দ্রনাথের কোন সময়েই অর্থের বিশেষ অভাব ছিল না; এক্ষণে আবার সমস্ত বিষয় তাঁহারই অধিকারে আসিয়াছে, তিনি অবিলম্বেই একটি নয়নাভিরাম প্রমোদ ভবন নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

সত্যেন কল্পনারাজ্যের একটি বিশিষ্ট প্রজা। তিনি এতদিন ধরিয়া কল্পনানগরে সুখশান্তিপূর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, কোথাও রবিকিরণে কৃত্রিম ফোয়ারার উৎস ছুটাইতেছিলেন, কোথাও চন্দ্রালোকে তরল কৌমুদীস্রোত বহাইতেছিলেন; এক্ষণে তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার সুযোগ দেখিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁহার খুল্লতাতের আম্র, লিচু, কাঁঠাল, জাম, সেফালি, বক, চাঁপা, মল্লিকাপূর্ণ সখের উদ্যানটির মধ্যে একটি সুন্দর মনোলোভা বিলাসভবন প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে উদ্যান-মধ্যস্থ অপ্রয়োজনীয় অট্টালিকা সমীপবর্ত্তী বৃহৎ তরুরাজি কাটাইয়া ফেলিলেন, তৎস্থানে নানাবিধ ফুলের গাছ ও ক্রোটন, বিলাতি কচু প্রভৃতি রোপণ করাইলেন। বাটীর চতুর্দ্দিকে একটি অনতি-প্রশস্ত দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন, তাহাতে প্রস্তর-সোপান ও উপরে যাতায়াত-উপযোগি একটি লৌহসেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। বৃহৎ সরোবরের জীর্ণপ্রায় ঘাটটির সংস্কার করাইলেন। [illegible], কৃত্রিম পাহাড়, প্রশস্ত পথ, প্রস্তরমূর্ত্তি, জলের ফোয়ারা; অর্কীটে সুন্দর সুন্দর বিদেশীয় লতা-

গুল্মের বিচিত্র সংগ্রহ, দীর্ঘিকায় মনোরম ক্ষুদ্র বোট, এবং উদ্যানে সইপ্রেস, ব্রাউনিয়া অরোকেরিয়া হইতে কামিনী, যুথিকা ইত্যাদির কিছুই বাকি রাখিলেন না; আর আবাস মধ্যে কৌচ, কেদারা, টেবিল, দর্পণ, চিত্র প্রভৃতি দ্বারা পাশ্চাত্যভাবে সজ্জিত করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ অবশেষে এই বিলাস কাননের "শান্তি-কানন" নাম দিয়া এক খণ্ড শ্বেত প্রস্তর গেটের একধারে লাগাইয়া দিলেন।

মানবকল্পনায় প্রকৃতি হইতে যে সকল সৌন্দর্য্য কল্পনা করা যাইতে পারে, সত্যেন প্রায় তাহার সকলই "শান্তি-কাননে" একে একে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যে অমরনাথ তাঁহার একমাত্র সহায়। সত্যেন এক্ষণে সকল বিষয় ছাড়িয়া এই নব-নির্ম্মিত উদ্যান ভবনের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য সম্পাদনেই সমধিক মনোযোগ স্থাপন করিয়াছেন। যৌবনে প্রথম পদার্পণের সহিত যখন তাঁহার বাসনা-কামনাগুলি উন্মেষিত হইতেছিল, তখন হইতে তিনি মনে মনে যে সখের পোষণ করিতেছিলেন, এইক্ষণে তাঁহার কিয়দংশ পূর্ণ হইল। এই বিলাসকাননের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন, অশিক্ষিত সামান্য পল্লীবাসিগণ ফোয়ারায় জল উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, আর যাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত, তাহারা অশিক্ষিত দলকে বলিল, কলিকাতায় ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ফোয়ারা তাহারা দেখিয়াছে, সেখানে এইপ্রকার অট্টালিকা শত শত আছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ নয়নবিমোহন সুন্দর বাটি সমগ্র বর্দ্ধমান জেলার মধ্যেও বিরল।

সত্যেন্দ্রনাথ শুভদিনে হিরণ্ময়ীকে নূতন বাটিতে আনিলেন। পরিজনের মধ্যে ঠাকুরমাতা ও একজন দাসীকে আনিলেন। অবশিষ্ট দাস,দাসী, পাচিকা, দ্বারবান স্বতন্ত্র নিযুক্ত করিলেন। পুরাতন বাটির যে বিষয় যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহা ঠিক রহিল। সত্যেন প্রতিদিন পূর্ব্বের ন্যায় কাছারী বাটিতে যাইয়া, যথোচিত বিষয় কার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, পুরাতন বাটিতেও প্রায় প্রতিদিন একবার করিয়া তত্ত্বাবধান করেন। এক্ষণে এই বাটীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা ঠাকুরমা ও হিরণের অভাবে আপনাদিগকে নিতান্ত স্বাধীন বলিয়া মনে করেন। যে কয়জন আত্মীয়া আছেন, সকলেই আপনাকে সকলের উপর মনে করিয়া, গৃহিণীত্ব করিতে অগ্রসর হন; তাহার ফলে আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সকল কথাই প্রায় কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তিনি এ সকলের জন্য কোন প্রতিকারের চেষ্টা করেন না, যাহাতে কাহারও আহার পরিচ্ছদের কোন কষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এদিকে হিরণ এক্ষণে নূতন সংসারের নূতন গৃহিণীর পদাভিষিক্তা হইয়াছেন। তিনি গৃহকর্ত্রীর আসনে বসিতে ইচ্ছা না করিলেও, দাস দাসীগণ তাঁহাকেই উক্ত সম্বোধনে অভিহিত করিয়া থাকে। যদিও হিরণ্ময়ী ঠাকুরমার সম্মান রক্ষার্থে নবীন সংসারের ভারার্পণ তাঁহাকেই করিয়াছেন, তথাপি হিরণই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। এতদিন সঙ্গিনীর অভাবজনিত হিরণ্ময়ীর যে অসুবিধা বোধ হইত,

এক্ষণে আর তাহা বোধ হয় না, সত্যেন্দ্রনাথ এখন সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে অধিকাংশ কালই হিরণ্ময়ীর সহিত অতিবাহিত করেন। তিনি হিরণকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া উদ্যানে বেড়াইতে যান, কখনও বা বোটে লইয়া গিয়া, উহা চালনা করিতে শিখান, কখনও বা একটী গান গাওয়াইবার জন্য বিশেষ জিদ্ ধরেন। হিরণ এই সকল অনুরোধে বড়ই বিপদে পড়েন; স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য না করিলে, পাছে তিনি দুঃখিত হন এই কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সকল কার্য্যে বড়ই লজ্জা করে। হিরণ শৈশব হইতেই বড় শান্ত, তাহার শান্তভাবই বেশ ভাল লাগে। শান্তগৃহে, পতির বুকে মাথা রাখিয়া শান্ত প্রেমালাপে নিমগ্ন থাকিয়া, তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিতেই ভাল লাগে। সে শান্তশীলা, প্রেমভাবাবিজড়িত কাতর সম্ভাষণে, প্রেমালস আকুলিত কাতর আলিঙ্গনে হৃদয়স্বামীকে ভুলাইতে জানেন না। আপন হৃদয়ের সুখদুঃখ অপরকে জনাইতে জানেন না, এমন কি অনেক সময় আপনি বুঝিতে পারেন না। স্বামীসোহাগিনী সুন্দরী কিসে স্বামীর মনোমত থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবেন, কেবল ইহাই চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা—অন্য কামনা নাই; আর যে রমণী পতির ভালবাসা পাইয়াছেন, তাঁহার আর বিশেষ অন্য কামনা কি থাকিতে পারে।

হিরণ্ময়ী স্বামীর প্রেমে নিমগ্ন থাকিয়া সংসারের অন্য বিষয় দেখিতে ভুলেন না। যেমন আলোকচিত্র-প্রণয়ন-যন্ত্র ক্যামেরা, সম্মুখের আদর্শ ভিন্ন পার্শ্বস্থিত পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণে বিরত থাকে না, সেইরূপ হিরণ স্বামীর অসীম ভালবাসালাভে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিলেও, তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন জীবনের একমাত্র ব্রত হইলেও, সংসারের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ই যথাকর্ত্তব্য দেখিতে কখনও বিরত থাকেন না। বরং সত্যেন, যতই দিন যাইতে লাগিল, পত্নীর বিমল প্রেমলাভে ততই বিভোর হইয়া, অন্য বিষয় সকল দেখিতে অবহেলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে সত্যেন ও হিরণ নূতন সাধের সংসার পাতাইয়া জীবনের একটি নূতন সুখের অঙ্কের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

আদর্শহিন্দুস্ত্রীচরিত্র।

এই বিভিন্নরুচি ও মতবিরোধী ভূমণ্ডলে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে হিন্দু-সমাজই যে প্রায় সর্ব্বাংশে শীর্ষস্থানীয়, তাহা অনেক মহাত্মাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, শাস্ত্রীয় বিচারের সূক্ষ্মতা ও অকাট্যতা, ব্যবহারিক পদ্ধতির অকপটতা ও বিশুদ্ধতা, উপদেশের সুনীতি ও সদিচ্ছা, উদ্যমোৎসাহের তেজঃ ও উচ্ছ্বাস এবং যত্ন-চেষ্টার আদর ও আস্থা—এ সকল আদর্শ গুণগ্রাম আমাদের হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ পূর্ণ-মাত্রায় বিকাশমান, সেরূপ অন্য কোনও ধর্ম্মে আছে কি না সন্দেহ। প্রগাঢ়ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের প্রসাদবলই হিন্দু-গণের এত উৎকর্ষগৌরবের আদি কারণ; তাঁহারা আপনাদের স্বাভাবিক বিশ্বপ্রেমি-কতাগুণে প্রণোদিত হইয়া, বিশ্বেরই মঙ্গ-লার্থ, নিঃস্বার্থভাবে, এই রম্য ভারতোদ্যানে যে সকল মহান্ শাস্ত্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, সামান্যমাত্র যত্ন ও মনোযোগ করিলেও, যে কোন সুবুদ্ধি ব্যক্তি তাহা হইতে অমৃতস্বাদ জীবনজুড়ান সুফল লাভ করিতে পারেন। বাস্তবিক, সেই জ্ঞান-সিন্ধু সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ সংসারে স্ত্রী-জাতিকেই পারিবারিক সুখশান্তিরক্ষার স্বা-ভাবিক সুপ্রশস্ত ভিত্তি জানিয়া, তাঁহাদের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থেই, অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের ন্যায়, রমণীচরিত্রের নির্ম্মলতা-সাধনবিষয়ক বহুবিধ নীতিগর্ভ উপদেশ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রাখিয়াছেন; কোথাও কোথাও বা এই বহুমূল্য রত্নরাজি প্রয়োজন বোধে প্রকাশ্যভাবেই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া, উহার পবিত্র জ্যোতিঃতে আমাদি-গকে যুগপৎ বিস্মিত, প্রবুদ্ধ ও আনন্দিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধারণ শাস্ত্রোপ-দেশই বিলক্ষণ মূল্যবান, তাহার উপর আ-বার আমাদের আদর্শস্ত্রীচরিত্রের পবিত্র-গুণাবলীর অতীব প্রয়োজনীয় ও জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব সংযোজিত হওয়াতে, উহা যে কত-দূর মূল্যবত্তর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনু-মেয়। বস্তুতঃ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ আমাদের হিন্দুরমণীচরি-ত্রের আদর্শের সঙ্গে কখনই কোনওক্রমে তুল্য হইতে পারে না। বলিতে কি, আমা-দের আদর্শে যে সকল পবিত্র ও স্বর্গীয় গুণের সমাবেশ, অপরাপর সুসভ্যম্মন্য অনেক জাতিতে হয়ত তাহার অনেকগুলির ধারণা পর্য্যন্তও নাই। আমাদের অনেক সাধারণ চরিত্রের রমণী, তাঁহাদের উচ্চচরিত্রের মলি-নাকুল হইতেও, অনেকাংশে সমধিক প্রশং-সার্হ। তাই বলি, হিন্দুসতীচরিত্র অমূল্য রত্ন, অতুল্যধন; উহা পবিত্র হইতেও পবি-ত্রতর, উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর,—উহা

সুন্দর হইতেও সুন্দরতর এবং প্রিয় হইতেও প্রিয়তর; উহা সম্পদে সুখ, উহা সন্তোষে শান্তি, উহা বুদ্ধিতে বিদ্যা, উহা সোনায় সোহাগা এবং উহা মণিতে কাঞ্চন। ভাষায় এমন প্রকাশিকাশক্তিধর ও অর্থবান্ কোনও শব্দ নাই যে তদ্দ্বারা পতির প্রতি হিন্দুসতীর আন্তরিক ভাব সম্যক্ ব্যক্ত করা যাইতে পারে। সে, ভাব অতীব পবিত্র ও স্বর্গীয়; লোকসামান্যে তাহার ধারণাই সম্ভবে না। হিন্দুসতী সেই নির্ম্মল, বিশুদ্ধভাবে চিরদিনই গভীর-নিমগ্না ও আত্মবিস্মৃতা; এই জ্বালাযন্ত্রণাপীড়িত কর্কশ ও শুষ্ক সংসারমরুতে তিনিই নবতৃণাদিশোভিত সুস্নিগ্ধ উৎসাদিসিঞ্চিত একমাত্র মাধুরীময়ী উর্ব্বরাভূমি! তিনিই এই কদাচারক্লিষ্ট পাপ তাপময় ধরাধামে পবিত্রতাময়ী শান্তিবিধাত্রী একমাত্র স্বর্গীয়া দেবী! স্বীয় স্বাভাবিক কোমল হৃদয়ের দয়াগুণবশে, হতভাগ্য মর্ত্ত্য ভবনের দুঃখ যাতনা দর্শনে আর কিছুতেই স্ববাসে স্থির না থাকিতে পারিয়া, অমরভবনের দেবী, যেন বাধ্য হইয়া, হিন্দুসতীস্বরূপে অশান্তির লীলাস্থল এই দগ্ধ নরলোকে অবতীর্ণা ও আবির্ভূতা হইয়াছেন! প্রকৃত পক্ষে, আদর্শ হিন্দুরমণীর হৃদয় যদ্রূপ সর্ব্বাংশে স্বর্গীয়ভাবে সমাচ্ছন্ন, তাহা ভাবিতে গেলেও সুরুচিপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই মনপ্রাণ একরূপ অনির্ব্বচনীয় পবিত্র আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

প্রথমতঃ, উদ্বাহবন্ধন বিষয়েই হিন্দুসতীর যেরূপ খাঁটি, উচ্চ ধারণা, তাহাতে যেন স্বতঃই আমাদের মনে এমন একটি ভাবের উদয় হয় যে, জগদীশ্বর স্বয়ংই তাঁহার দিব্য হৃদয়াসনে আসীন থাকিয়া অবোধ মানবজাতিতে চৈতন্য সঞ্চার হেতু,তাঁহারই লৌকিক চরিত্রের কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া, দম্পতিসম্বন্ধের সুপবিত্র গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ,তদ্বিষয়ক স্বীয় গুপ্ত অভিপ্রায় ঘোষণা করিতেছেন। হিন্দুসতীর ধ্রুব বিশ্বাস—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার অন্তরাত্মা পতির অন্তরাত্মার সহিত মিশিয়া একবারে এক হইয়া গেল। বহিঃশরীরদ্বয় অবশ্য জাগতিক নিয়মাধীনে ঐরূপ মিশিয়া এক হইবার নয়, কিন্তু তাহা না হইলেও, একীভূত বলিষ্ঠ অন্তরাত্মার সুদুঃসহ চাপ ও সঙ্ঘাতে তাহারা অবিশ্রান্তই নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সংহিত হইয়া এতদূর প্রপীড়িত ও অস্থির থাকে যে, তন্নিমিত্ত দুর্ভাগ্যদের সেই মলিন মুখশ্রীদর্শনে স্পষ্টই যেন প্রতীতি হয় যে, তাহারা বুঝি ঐ অত্যাচার ও প্রপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাদের চতুর স্রষ্টার নিকট কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছে যে, হয় তিনি তাহাদের এই যাতনাময় অস্তিত্ব একবারে বিলোপ করুন, আর না হয় তাহাদের মহান্ প্রপীড়কের সঙ্গে সম্যক্ মিশাইয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করুন; যেহেতু, তাহারা সংসর্গগুণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের এই প্রপীড়ক দূরবাসী অথবা হিংস্রক শত্রু নহে, কিন্তু মহান্ হিতৈষী আত্মীয়; আর তাহার এই "প্রপীড়ন" ও "অত্যাচার"

সংজ্ঞক ব্যবহারে অসদ্ভাবের ন্যূন গন্ধও নাই, বরং সদিচ্ছা ও মহত্বই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান; উহা শত্রুরূপী পরিজন-মিত্রের সংশোধনার্থ তীব্র ভর্ৎসনামাত্র। যাহাহউক, এইরূপে আদর্শহিন্দুস্ত্রী দাম্পত্যসম্বন্ধকে এতই ঘনিষ্ঠমিশ্রিত ও একীভূত মনে করেন যে, "তুমি", "আমি" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে, এমন কি, ভাষাতেও স্বামীকে স্ত্রী হইতে কি স্ত্রীকে স্বামী হইতে পৃথক্ নির্দ্দেশ করা তাঁহার পক্ষে সবিশেষ মনঃপীড়ার কারণ; তবে, এই সামান্য মর্ত্ত্যভবনে তাঁহাদের ঐরূপ পারস্পরিক নির্দ্দেশ উপায়ান্তরে অসাধ্য এবং তদ্ধেতু তাঁহাদের তাদৃশ শাব্দিক বিশ্লেষণ সর্ব্বথা অপরিহার্য্য বলিয়াই যেন তিনি, প্রয়োজনবশে মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়া, লৌকিক পদ্ধতিক্রমে, একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও, একীভূত প্রিয়তম পদার্থকে ভাষায় বিভিন্ন প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন! কিন্তু, পাঠক! আমরা স্থূল বাহ্যজগতের স্থূলবুদ্ধি প্রাণী; আমাদের ভাগ্যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক প্রস্তাব আর কতক্ষণ শোভা পায়? অনুপযুক্তবোধে বিধাতাই আমাদিগকে সে গৌরবান্বিত সুযোগ ও শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; তবে, এস, এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্থূলশক্তি বৈষয়িক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই পবিত্র প্রসঙ্গের ভিতর কতটুকু প্রবেশ করিতে পারি, তাহাই একবার দেখি।

আমাদের এই পতিপ্রাণা হিন্দুসতীর পতিই সর্ব্বস্ব; পতিই তাঁহার যাবতীয় বিষয়ের কেন্দ্রীভূত; পতিই তাঁহার জ্ঞান, পতিই তাঁহার ধ্যান—রূপগুণ—বিদ্যাবুদ্ধি—মান ও অভিমান; এবং পতিই তাঁহার ধর্ম্ম, পতিই তাঁহার কর্ম্ম। বাস্তবিক, পাতিব্রত্যে তিনি এতই একাগ্রমনাঃ যে এমন কি স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্তও তাঁহার চিন্তয়িতব্য বলিয়া ধরেন না; কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মকর যেরূপ তাঁহার কর্ত্তব্যকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহার প্রভুর বিষয় একবারও মনে আনেন না, পতিব্রতা হিন্দু রমণীও সেইরূপ পতিচিন্তা ও পতিসেবাকেই জীবনের সারব্রত মনে করেন এবং ঈশ্বরচিন্তাকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরেন; অপিচ, ঐ কর্ত্তব্যবান্ কর্ম্মচারী যেমন জানেন যে, তাঁহার এক কর্ত্তব্যসাধন ঠিক থাকিলে সবই ঠিক থাকিবে, হিন্দুসতীরও তদ্রূপ বিশ্বাস যে, তাঁহার সকলই একমাত্র পবিত্র পাতিব্রত্যের উপর নির্ভর করে। ফলতঃ, তিনি পতি ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই জানেন না ও চাহেন না। কেবল নিষ্কাম, নিঃস্বার্থভাবে মনের সাধে স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিলেই যেন আনন্দে অধীরা হন ও আপনাকে ধন্যা মনে করেন। এ স্থলে স্বভাবতঃই খ্যাতনামা সঙ্গীত-রচয়িতা মহাত্মা শ্রীধরকথকের * এই প্রসিদ্ধ সুন্দর গানটির ভাব মনে পড়ে—

* এই গানটি অনেকে নিধুবাবুর রচিত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু সে ধারণা ভুল; যেহেতু শ্রীধর কথকের স্বহস্ত লিখিত সঙ্গীত পুস্তকেই (অবশ্য কতকটা পরিবর্ত্তিত আ-

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে!
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর
জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি,—দেখ্‌তে বড়
ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,—দেখা দিতে
আসিনে॥"

অবশ্য সঙ্গীতটির সকল অংশই আমাদের মহতী নায়িকার উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না; কিন্তু, তথাপি ইহার স্থূল বাহ্যিক অবয়ব ও দীন পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিয়া, ভিতরের দিকে একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ইহার অভ্যন্তরে অসাধারণ মহত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই গানের যে অংশটুকু আমাকে বিশেষভাবে ভাববিমোহিত করিয়াছে, সেটুকু উহার দ্বিতীয় পংক্তি—"আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।" বোধ হয়, এই ভাবুক কবির উচ্চভাবাত্মক এই মনোমোহকর শব্দবিন্যাসটুকু পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অনেকেই আমার মত ফল না পাইয়া থাকিতে পারেন নাই। অহো! কি সুন্দর মহান্ ভাব! এত সুন্দর, এত মহান্ যে এটুকু আমাদের পবিত্রচরিত্রা হিন্দুসতীর উপরও বেশ খাটিতে পারে। আমাদের আদর্শ হিন্দুরমণীর হৃদয়েও এই ভাবই বটে। তবে কি না, উহা ভাষায় প্রকাশ করাটা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ; যদিও এই মহোচ্চভাবে তাঁহার হৃদয় বিলক্ষণ গৌরবান্বিত, তথাপি তিনি উহা নিয়া গল্প করিতে বসাটা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত ও তরলমতিত্বব্যঞ্জক বলিয়া মনে করেন। দাতার দান, কৃপণের কার্পণ্য, সরলের সারল্য, কুটিলের কুটিলতা, দয়ালুর দয়ালুতা, ও হিংসুকের হিংসাই যেমন ইহাদের নিজ নিজ স্বভাব, হিন্দুসতীরও তেমন পতিপরায়ণতাই স্বভাব। হিন্দুসতী কিছুই তাঁহার "নিজের" বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহার "নিজকে" তিনি সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে পতির চরণে সমর্পণ করেন; তিনি কিছুরই ধার ধারেন না,—ধারিতে যাওয়াই তাঁহার স্বভাবের সম্যক্ প্রতিকূল। তিনি যেন মহাকবি মিল্টনের সেই মহাকাব্য "She for him and he for God" অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়া লইয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত ও অভ্রান্ত মনে করেন। বাস্তবিক, স্ত্রীজাতির শরীরের স্বাভাবিক গঠন ও আকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাহারা সর্ব্বথা দুর্ব্বল ও কোমল এবং তন্নিবন্ধনই এ কথা সহজেই অনুমেয় ও স্বীকার্য্য যে, তাহারা কেবল রক্ষণীয় পদার্থ, এমন কি রক্ষকতার ধারণা পর্য্যন্তও তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। আমাদের সুবিবেকী হিন্দুশাস্ত্রকারগণও প্রাচীন আর্য্যমণ্ডলীও রমণীকুলের পরিচ্ছদ ও গাত্রালঙ্কারের ব্যবহার ও নির্ম্মাণ-গত যথাযোগ্য প্রণালী নির্দ্দেশ ও প্রবর্ত্তন করিয়া, "এই বিষয় আমাদিগকে প্রকারান্তরে অনে-

---

কারে।) ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।—দুর্গাদাস লাহিড়ীকৃত "বাঙ্গালীর গান"।

কটা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ, ইহা যে একটা নিতান্ত জটিল বিষয়, তাহাও কিছু নহে; সামান্য চিন্তামাত্রেই বেশ বুঝা যায় যে, স্ত্রীর বশ্যতাই স্বাভাবিক এবং তজ্জন্যই উহা পুরুষের পক্ষে সংসারে একটি স্বর্গীয় আনন্দ ও সুখের বিষয়। কিন্তু হায়! কি আশ্চর্য্য! তথাপি আধুনিক কোনও কোনও জাতি ও সম্প্রদায়ে স্ত্রীস্বাধীনতা বেশ পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কোন কোন সুসভ্যা বিদুষী মহিলার ভিতর স্ত্রীত্ব ভাবের একেবারেই অভাব। তাঁহাদের মনে যেন এই সভ্যোচিত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, যতটা পুরুষত্ব ও স্বাধীনতা হাত করিয়া নিতে পারা যায়, ততই তাঁহাদের পক্ষে বাহাদুরী ও গৌরবের বিষয়। হায়! প্রভুর উপর সেবকের প্রভুত্ব যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও ধৃষ্টতাব্যঞ্জক, সেই সরল নৈসর্গিক ধারণাও ইহাঁদের নাই। লৌকিকভাবে স্বামীস্ত্রীতে সাম্যসম্বন্ধই বটে, কিন্তু পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকৃতি বিচার করিয়া, জগদীশ্বর যে স্ত্রীকে স্বামীর সেবিকা-স্থানীয়া হইয়া থাকিতেই অভিপ্রায় ও আদেশ করিয়াছেন, সে পবিত্র রহস্য তাঁহারা তাঁহার ভাবময়ী সৃষ্টিতে দেখিতে পান না। অবশ্য এ সকল ভ্রান্তি ও দোষ তাঁহাদের নিজের নহে,—যখন তাঁহারা কর্ত্তাদের প্রভুত্ব প্রশ্রয়ের অধিকারিণী, তাঁহাদের প্রশ্রয়ই যখন তাঁহাদের আশ্রয় স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যখন কর্ত্তাদের অবসরকালের তরল দাম্পত্যোচিত লীলাখেলাই তাঁহাদের কর্ত্তব্যব্যাপৃতির গম্ভীর কাজের চিন্তায় পরিণত হইয়াছে, তখন আর সুযোগপ্রিয় কর্ত্রীরা এই সাধা সুযোগ পায় ঠেলিয়া, আপনাদিগকে "জন্মদুঃখিনী" বলিয়া কাঁদিতে বসিবেন কেন? বাস্তবিক, এ সকল বড়ই বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয়। তাঁহারা কি ভ্রমেও একবার এই স্থূল কথাটা ভাবিয়া দেখেন না যে, স্বাভাবিক ছাড়িয়া অস্বাভাবিক ধরাটা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের মহতী ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া আমাদের সামান্য উদ্ভ্রান্ত লালসা ক্রমে চলিলে, আর কতদূর সুশৃঙ্খলা ও সুফলের সম্ভাবনা। এ গুলি প্রকৃত কি বিকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক, তাহা সুবুদ্ধি পাঠকেরই বিবেচ্য। যাহাহউক, এ সকল কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের দেবীনায়িকার একবারে চক্ষুঃশূল; যেস্থানে এতাদৃশ বিকট অস্বাভাবিকতার রাজত্ব, তিনি সেই স্থান হইতে অসংখ্য যোজন দূরে বাস করেন এবং অত্যুৎকট ঘৃণাবশতঃ সে দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। তিনি মনে করেন যে, অগ্নি ও জলে যতখানি প্রভেদ সেই "সুসভ্যা বিদুষী রমণী" অভিহিত অদ্ভুত পদার্থ ও তাঁহাতে ততোহধিক পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বস্তুতঃ, সাধকপ্রবর যেমন তাঁহার নিজের মনকে অটলবিশ্বাসে ও মহোল্লাসে ভগবানের ইচ্ছার স্রোতে ঢালিয়া দিয়া অলীক বিষয় চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পান, হিন্দুসতীও তেমন জীবনসর্ব্বস্ব পতিকে তাঁহার একমাত্র আশ্রা-

বিক অনন্তশক্তি পরমারাধ্য প্রভু জ্ঞান করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে, তাঁহারই স্বেচ্ছা প্ররোচিত অবাধ কর্ত্তৃত্বে আপনার শরীর, মন ও বাক্‌শক্তি সকলই মহানন্দে সমর্পণ করেন এবং এইরূপে সংসারের নানা জটিলতা হইতে শান্তিলাভ করিয়া, তাঁহার মঙ্গলনিদান পরমাশ্রয় ভর্ত্তৃদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবে মোহিতা হন। জগতের যে কোন কার্য্যে কি মনের যে কোন ভাবে বা ধারণায় তাঁহার পতির বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্টি জন্মে বা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, তিনি কদাচ সেরূপ কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা সেরূপ ভাব, ধারণা, বিশ্বাস কি সংস্কার কখনও মনে আনেন না। অপর পক্ষে, যাহাতে পতির অণুমাত্রও মনস্তুষ্টি সাধিত হইতে পারে, তিনি প্রাণপণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। স্থূল কথা, তিনি যেন ঠিক স্বামীর "মন বুঝিয়া" চলেন। কিন্তু, তাই বলিয়া একবারে সঙ্গত, অসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া যে-সে স্থলে—পতির সদসৎ সকল প্রস্তাবেই—কখনও অন্ধ-সম্মতি প্রদান করেন না; যেহেতু তিনি বেশ জানেন যে, তাঁহারা সর্ব্বথাই একাত্মা; একের অমঙ্গল হইলে,উহা অপরেও অবশ্য বর্ত্তিবেই বর্ত্তিবে; এবং এই জন্যই ভর্ত্তার কোনও প্রস্তাব অযৌক্তিক হইলে কিংবা তাঁহার কোনও ধারণা বা বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ হইলে, তিনি প্রথমতঃ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার স্বভাবোচিত বিনীত-মধুর ও সলজ্জ ভাবে তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাসের অতিদার্ঢ্য কি অনুচ্ছেদ্যতাহেতু যথাক্রমে আরও অধিক ভ্রান্তি বা স্বৈরিতা জন্মিতে দেখিলে, প্রারব্ধ মহতী চেষ্টার ক্রমিক অনুবৃত্তিতে অব্যবহিত অশুভফলের আশঙ্কা করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে এমনই বিশুদ্ধচাতুরীমূলক সন্তোষের সহিত বিরত হন যে, তাহাতে তাঁহার প্রভুর মনে কোনওরূপ অশান্তি বা মালিন্য আসিতে পারে না; এবং এইরূপ পতিকে তাঁহার ঐ ভ্রান্তি বা স্বৈরিতাসম্ভাব্য অমঙ্গল হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাঁহার রক্ষা ও নির্ব্বিঘ্নতার জন্য সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিপদভঞ্জন ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন। এস্থলে, পাঠক হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, হিন্দু-সতী এখানে কেন আবার তাঁহার "নিজের ঈশ্বর" ছাড়িয়া "জগদীশ্বরের" চিন্তা প্রয়োজনীয় মনে করিলেন? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, সেটা সংসর্গপ্রভাব ও অবস্থাপূজ্যত্বের ফলমাত্র। মনে কর, তোমার ভার্য্যা একটী আদর্শ রমণীরত্ন; কিন্তু তুমি যদি, ভাই, আমার মত সুবোধ গুণধর স্বামী হও, তবে সে বৈসাদৃশ্যেরও একটা প্রতিকার হওয়া চাই; সে প্রতিকার ত তোমা হইতে হইবেই না; এদিকে আবার সেরূপ একটা কিছু না হইলেও তোমাদের—না—তোমার অমঙ্গলের আশঙ্কায় সতী দুর্ব্বিষহ অন্তর্ব্যথায় একবারে অধীরা হইয়া পড়েন; অতএব, তাঁহার

নিজ হইতেই প্রতিকারের চেষ্টা করিতে যাইয়া, তোমারই পরিকল্পিত ভাগ্যবিপর্য্যয় নিবন্ধন, বহির্জ্জগতের কোনও প্রথিতযশাঃ পবিত্রাত্মা শক্তিমান্ মহাপুরুষের নিকট উপায়বিধানার্থ শরণ লইতে বাধ্য হন্। সুতরাং, ভাবিয়া দেখ,—"সতীর" পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, তাঁহার ভক্তি ও আশ্রয় স্থল—তোমারও ঠিক্ সেই পরিমাণে "সৎ" হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দেখিবে সতী বাস্তবিকই পতিছাড়া আর কিছুই জানেন না; এমন কি, জগদীশ্বরের চিন্তা পর্য্যন্তও তাঁহার পক্ষে সম্যক্ নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন। যাহা হউক, হিন্দুসতী কখনও স্বামীর দোষ বা ক্রুটি ধরেন না—না—ধরার চিন্তাও কখন তাঁহার মনে উদিত হয় না; যেহেতু উহা সম্পূর্ণই তাঁহার প্রকৃতির বহির্ভূত। স্বামী পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি নির্ধন বুদ্ধিমান্ কি নির্ব্বুদ্ধি, সুরূপ কি কুরূপ, সচ্চরিত্র কি দুশ্চরিত্র, এ সকল বিচার করিতে যাওয়াও তিনি তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা ও সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ করেন। পতি যেরূপই হউন না কেন, তিনি তাহা কিছুমাত্র না ধরিয়া ও চিন্তা না করিয়া, কেবল তাঁহার সেবাশুশ্রূষারূপ স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনেই সর্ব্বদা ব্যাপৃতা থাকেন। এই স্বামীসেবা কর্ত্তব্যে আবার তাঁহার এতই ঐকান্তিক অনুরক্তি যে, উহার যথাযথ সম্পাদন হইতে, ঘটনাক্রমে, ক্ষণকালের জন্যও বিরত থাকিতে হইলে, তাঁহার মন নিতান্তই ধৈর্য্যচ্যুত ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে—এমন কি, অধিক বিলম্বে, তাঁহার জীবনধারণই একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। পুরাকালে আমাদের যে সহমরণ ও অনুসরণ প্রথা ছিল এবং এখনও যাহার দুই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যে সতীর পতিভক্তির কিরূপ পরাকাষ্ঠা সূচনা করে, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে। এইরূপ সহমরণ ও অনুসরণ সতীমাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ; তবে কোন সতীকে পতির মৃত্যুর পরেও তাঁহার শান্তিলাভের ঐ প্রকৃষ্ট উপায়ের আশ্রয় লইতে না দেখিতে পাওয়া গেলে, সে স্থলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, আত্মীয়জনের অনিচ্ছা ও অসম্মতি কিংবা লজ্জা প্রভৃতি লৌকিক প্রতিবন্ধই তাহার মূল কারণ। আহা! তখন তাঁহার জীবনধারণ যে কি বিষম যন্ত্রণা ও অশান্তির বিষয়, তাহার উপযুক্ত উপমান কি সংসারে কিছু আছে? বন্যবিহঙ্গশিশু সুখময় মাতৃক্রোড় হইতে প্রসহ্যগৃহীত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া যেরূপ যাতনা ভোগ করে, তাহাও সে সতীবিধবার হৃদয়দাহিকা মর্ম্মজ্বালার নিকট অতীব সামান্য ও তুচ্ছ। যদিও তিনি বাধ্য হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই, তথাপি এখন তাঁহার জীবন যে মৃত্যু হইতেও অনেক অধিক যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অন্যান্য কোন কোন ধর্ম্মে মৃত পতির স্মৃতি পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিয়া, বিধবা স্ত্রীদের পুনর্ব্বিবাহিত

হইয়া নূতন দাম্পত্য সুখসম্ভোগের যে সামাজিক সুযোগ ও উপায় রহিয়াছে, হিন্দুধর্ম্মে সেরূপ কিছুরই ব্যবস্থাবিধান নাই দেখিয়া, তিনি সুরুচিসম্পন্ন পবিত্রচরিত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ বিশুদ্ধাচার ধর্ম্মসম্প্রদায়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া, কতই বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন। আর এই সকল চিন্তাসূত্রক্রমে মুসলমান প্রভৃতি জাতিতে বিবাহিতা রমণীদের পতির মৃত্যুর পরে পুরুষান্তরের পুনঃ পরিণীতা হওয়ার রীতিটা নিতান্তই পৈশাচিক ও ঘৃণার্হ মনে করিয়া তৎপ্রতি বিদ্বেষের ভাবে অভিভূতা হন। এমন কি, উহার—না—ওরূপ কিছুর ধারণামতেও মহাপাতক বলিয়া তাঁহার চিরদৃঢ়বিশ্বাস।

আদর্শ হিন্দুস্ত্রী বহুবিধ অপার্থিব গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃতা; তিনি শান্তির প্রস্রবণ, আনন্দের উৎস, সন্তোষের হ্রদ, দয়ার সিন্ধু উদারতার মহাসিন্ধু এবং প্রীতির তরঙ্গিনী। তাঁহার সুশীলতাবারির সুশীতলধারাবর্ষণে কেবল যে তাঁহার ক্ষণজন্মা ভাগ্যধর পতিই দিব্য শান্তিসুস্নিগ্ধতা লাভ করেন, তাহা নহে; উহার সুখসংস্পর্শে নিকটবর্ত্তী পূতচরিত্র জনমণ্ডলীও ধন্য হয়েন। হিন্দুসতী সর্ব্বপ্রযত্নতঃ পরমগুরু স্বামীর সেবাশুশ্রূষা সমাপনান্তে যতটুকু অবসর পান, স্বভাবতঃ অন্তরে সর্ব্বদাই প্রভুধ্যানমগ্না থাকিলেও, তাহা আবার অতিথিসৎকার, ভিক্ষুতুষ্টি, প্রতিবেশিবর্গের উপকার প্রভৃতি মহৎ কার্য্যে বাহ্যতঃ বর্ত্তন করিয়া, একরূপ অবর্ণনীয় স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করেন। পরোপকারবৃত্তিই যেন তাঁহার হৃদয়ের মূল উপাদান। নিজের সুখশান্তির দিকে একবারও ফিরিয়া চাহেন না, কিসে পরের সুখ-বিধান হইবে, কিসে পরের মনস্তুষ্টি হইবে, কিসে পরের শান্তিলাভ হইবে, কিসে পরে সাংসারিক দুঃখযন্ত্রণা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে, ঐ অবসর কালে তিনি কেবল এই সকল স্বর্গীয় চিন্তায়ই আকুল থাকেন এবং প্রতিবিধানার্থ যাহা কিছু করিতে পারেন, তাহাই প্রাণপণে সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। দুঃখিতের চক্ষে অশ্রু দর্শন মাত্র তাঁহার নিজের চক্ষেও অশ্রুসঞ্চার হয়। অন্নক্লিষ্টের হাহাকারধ্বনি তাঁহার কোমল শরীরের শিরায় শিরায় প্রতিধ্বনিত হইয়া হৃদয় প্রদেশে দুর্ব্বার প্রতিঘাত করে। তিনি দরিদ্রের মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তাব্যঞ্জক ম্লানমুখ দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও কাতর হইয়া তাহার সাহায্যার্থ হস্তপ্রসারণ করেন; ভয়াতুরকে অভয়দানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ উৎসাহে নাচিয়া উঠে। আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দানার্থ, স্বীয়শক্তি ও অবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজকে বিপদাপন্ন করিতেও কুণ্ঠিতা হন না। বাস্তবিক, তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তি ও সদনুষ্ঠান স্পৃহা এতই বলবতী যে, মহাকবি গোল্ডস্মিথ্ যেমন "Deserted Village" নামে তাঁহার সুমধুর কবিতাপুস্তিকায় "Village Preacher" এর

আদর্শচরিত্র বর্ণনাকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, সে মহাত্মার কোনও দোষ থাকিলে, তাহাও কেবল "ধর্ম্মের দিকেই হেলান" ছিল ("Even his fault leaned to virtue's side"), আমরা ত তেমন সেই ঐশ্রিক ভাব আমাদের দেবী নায়িকার উপর খাটাইয়া বলিতে পারি যে, "দোষ" শব্দটা ত তাঁহার চরিত্রবর্ণনার ভাষায় আদৌ আসিতে পারে না, তবে সামান্য মানবজাতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার প্রণালীক্রমে কখনও তাঁহাতে দোষ বা ত্রুটি দৃষ্ট হইলে, তাহাও তাঁহার অতি প্রবলা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরই ফল মাত্র। অবিবেচনাসিদ্ধ, অপরিমিত ও অবিশ্রান্ত দান দ্বারা দাতৃবরের সর্ব্বস্বান্ত হওয়া যে দোষ, আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত আশ্রয় প্রদান দ্বারা শরণ্য শার্দ্দূলের বিপজ্জালে জড়িত হওয়া যেরূপ দোষ, তাহার সে দোষও ঠিক তদ্রূপ।

হিন্দু সতীর লজ্জাগুণ বড়ই মাধুরীপূর্ণ; উহাতে এমনই চিত্তবিনোদিনী কোমলতা, নম্রতা, মৃদুতা, কমনীয়তা ইত্যাদি দৈতস্ গুণাবলী এমনই সুন্দর ভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, তাহাতে বোধ হয় যে মূর্ত্তিমতী লজ্জাই যেন তাঁহার ভাগ্যবান্ পতির গৃহে বিরাজ করিতেছেন, এবং দিব্য স্ত্রীত্ব ভাবই বুঝি তাঁহার দৈহিক কান্তি ও জ্যোতির স্থানাধিকার করিয়া মর্ত্ত্যধামে ঐ স্বর্গীয় সুদৃশ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। বাস্তবিক সতীর ঐ গুণরত্ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, তাঁহাকে যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখায়, সেরূপ সুন্দর কিছু মানব-মন কল্পনায়ও ধরিতে পারে না। ক্রোধ বলিয়া যে মহারিপু আমাদের অনেক পরিবারে অকারণে নানা অনর্থপাত করে, আদর্শ হিন্দুস্ত্রী উহা কাহাকে বলে, তাহাও জানেন না; তবে, উহার উপযুক্ত প্রয়োগের স্থল বিশেষ অধর্ম্মবিদ্বেষবশে ও হৃদয়ের পাবিত্র্যগুণে, কখনও কখনও, তাঁহা হইতে এই দুরন্ত মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ সংরম্ভপ্রকাশ সম্পূর্ণ প্রয়োজনপ্রণোদিত, অপরিহার্য্য, সমীচীন ও সুযুক্তিসঙ্গতই বটে। কিন্তু, এতদ্ব্যতীত অপর সকল স্থলেই তিনি ক্রোধকে ঐকান্তিক ঘৃণার চক্ষে দেখেন, অপরের সর্ব্ববিধ ভ্রান্তি, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা বা দুষ্কৃতিই তিনি অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়া লন; এবং যেহেতু তিনি স্পষ্টই দেখেন যে, ঐ ভ্রান্তি ইত্যাদি ধরিলেই শান্তিভঙ্গ এবং ছাড়িয়া দিলেই শান্তিরক্ষা, সেই হেতুই তিনি ঐসকল অশান্তির কারণ কদাচ মনে আনেন না বা চিন্তা করেন না, বরং ওগুলি মন হইতে একেবারে সুদূরপরাহত করিয়া ফেলেন। তিনি মনে করেন যে, একটু সন্তোষ ও গাম্ভীর্য্য সহকারে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেই যখন ঐ সকল অনর্থ অতি সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে, আর বৃথা অসন্তোষের বশবর্ত্তি হইয়া তারল্য প্রকাশপূর্ব্বক ওসব চর্চ্চা করিলেই যখন উহা হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে নানারূপ ঘোর অমঙ্গল সংঘটিত হয়, তখন নিজে একটু কষ্ট ও হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক মঙ্গলাধার শান্তিরক্ষা

না করিয়া অথবা তরলমতিত্ব দ্বারা অতি তুচ্ছ কারণ হইতে শান্তিভঙ্গরূপ গুরুতর অনর্থ ঘটান নিতান্তই বাতুলতাব্যঞ্জক। আমাদের এই দেবী—নারী—সহিষ্ণুতা-মহারত্নের অনন্ত খনি; নিজের শত দুঃখ-ক্লেশ হইলেও তাহা অকাতরে উপেক্ষা করিয়া, তিনি মহতী শক্তির প্রভাবে পরিবারস্থ সকলের শান্তিবিধান করেন; তিনি জানেন যে, প্রায় যাবতীয় পারিবারিক সুখ-শান্তিই স্ত্রীলোকদের এই মহান্ গুণের উপর নির্ভর করে; যে পরিবারের স্ত্রীলোক যত বেশী সহিষ্ণু, সে পরিবারের সুখশান্তিও তত বেশী। তিনি আরও জানেন যে, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতিই মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের প্রকৃত লক্ষণ এবং ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি নিতান্ত জঘন্য পৈশাচিক। এই জন্যই তিনি দুর্ব্বিসহ দুঃখযাতনা সহ্য করিয়াও, একান্ত আগ্রহ ও আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত গুণমালা হৃদয়ে ধারণ করেন এবং শেষোক্ত দোষরাজিকে কখনও তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণে প্রবেশ লাভ করিতে দেন না।

পরিবারভুক্ত সকলের প্রতিই তাঁহার ব্যবহার এরূপ নির্ম্মল, পরিমার্জ্জিত ও সুবিবেকসম্মত যে, তাঁহারা অতীব সৌভাগ্যবশতঃ এতাদৃশ কমলাকল্প ললনারত্নের পবিত্র সুখ-সংসর্গে অবস্থাপিত হইয়াছেন বলিয়া, পরমকারুণিক জগদীশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুব্যক্তিকে পিতামাতা প্রভৃতির ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও সেবা শুশ্রূষা করেন এবং দেবর, ভর্ত্তৃপুত্র ননন্দা ইত্যাদি কল্যাণীয়দিগকে স্বানুজ সহোদর, সহোদরা ইত্যাদির স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। আর, প্রতিবেশিগণের সহিত তিনি এরূপ সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া চলেন যে, তাহাতে তাঁহারা তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও আপ্যায়িত হয়েন এবং সর্ব্বদাই এই এক স্বর্গীয় ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে যে, তাঁহাদের বাসগৃহ বিভিন্ন হইলেও, পারস্পরিক ব্যবহারে অন্তঃকরণ কখনও সেরূপ নহে।

সত্যধর্ম্মনিষ্ঠার চিরপুরস্কারক ভগবানের মঙ্গলেচ্ছাক্রমেই প্রকৃত হিন্দুসতী কখনও কোনওরূপ বিপদগ্রস্তা বা মর্য্যাদাভ্রষ্টা হয়েন না; তাঁহার চরিত্রের পবিত্র তেজে সংসারের যাবতীয় প্রাণীই এরূপ বিমোহিত যে, কখনও তাঁহার কোনও প্রকার বিপদাপত্তি বা মর্য্যাদাভ্রংশের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখিলেই, পার্শ্ববর্ত্তি যে কোন জীব তাঁহাকে যথাশক্তি সাহায্যদানে ধন্য হইতে অবিলম্বে বদ্ধপরিকর হয়। এই মর্ত্ত্যবাসে এমন কোন পাষণ্ড বা দুর্ব্বৃত্তই নাই, যে এই দেবীমানবীকে চিনিতে না পারিয়া, অপব্যবহারে উদ্যত হইয়াও অবশেষে তাঁহার অধৃষ্য সতীত্বতেজোবলে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাগল্‌ভ্যচ্যাবিত, চৈতন্যপ্রাপিত, অতীব লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া, দেবলোকের দেবীজ্ঞানে তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত না হয়! বস্তুতঃ, যাহার মনে যেরূপ প্রবল কুভাবই থাকুক না কেন, হিন্দু সতী তাঁহার আদর্শচরিত্র-

বলে তাহা ঝটিতি বাঁকাইয়া স্বপ্রিয় পবিত্রতায় পরিণত করিতে পারেন। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাস্কর-প্রবর মাইকেল এঞ্জেলো যেমন সকলপ্রকার কঠিন প্রস্তরেই অনায়াসে স্বেচ্ছামত নানাভঙ্গীর মূর্ত্তি খোদিত করিতে পারিতেন, অথবা ভাষাপ্রভু মহাকবি মিল্টন যেরূপ মনের সকলপ্রকার দুষ্প্রকাশ্য জটিল ভাবই অতীব তেজস্বিনী ভাষায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেন, আমাদের আদর্শ হিন্দুস্ত্রীও তদ্রূপ, আপনার পবিত্র পাতিব্রত্যপ্রভাবে সর্ব্বশ্রেণীর পাপাত্মারই পাপপ্রবৃত্তি অবলীলাক্রমে সমূলে উৎপাটন করিয়া, তাহাদের চৈতন্যচক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক স্বকীয় স্বর্গীয় স্বভাবের তেজঃ ও জ্যোতিঃতে তাহাদের চির তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ক্ষেত্রও ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়া ফেলেন! আবার কোনও কোনও স্থলে দুর্ব্বৃত্তেরা সতীর সুতীক্ষ্ণ পুণ্যতেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাতে একবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। পাঠক, প্রাতঃস্মরণীয়া সতী দময়ন্তীর প্রস্তাব স্মরণ করিয়া দেখ। নিবিড় অরণ্যমাঝে যখন পতি মহারাজ নল এই রমণীরত্নকে একাকিনী নিদ্রিতাবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যান, তাহার অল্পক্ষণ পরেই বনবিহারী এক দুর্ব্বৃত্ত ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে একবারে আত্মহারা হইয়া দেবীর নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করে। তখন তিনি সেই অজ্ঞান পাষণ্ডের প্রতি কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই সে তাঁহার পবিত্রতাবহ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। হিন্দুসতী আপনার পবিত্র পাতিব্রত্যবলে এইরূপ অনেক অসাধ্য সাধন করিয়া জনসাধারণকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেন। তিনি তাঁহার পরা শক্তি সতীত্ব বলেই সংসারের সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন; এমন কি, সেই সুপবিত্র মহাশক্তিবলে নিয়তি পর্য্যন্তও খণ্ডন করিতে পারেন। আমাদের মহাসতী সাবিত্রীই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার পতি সত্যবানের অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, ঐশিক নিয়মানুসারে তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য যখন যমরাজ আসিয়া সতীকে পতি ছাড়িয়া দিতে বলেন, তখন এই দেবী তাঁহা হইতে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলপ্রসূ বরপ্রাপ্ত হইয়াও, পতির মৃত্যুখণ্ডনরূপ মহামঙ্গল লাভ না করা পর্য্যন্ত, সেই প্রস্থানোন্মুখ মৃত্যুদেবের পশ্চাদ্ধাবন হইতে কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হন নাই। অবশেষে, এই সুগৃহীতনাম্নী রমণীকুলগৌরব সাবিত্রী সাধ্বীজনোচিত বিলক্ষণ সচ্চাতুর্য্য সহকারে, তাঁহা হইতে সত্যবানের ঔরসে তাঁহার শত পুত্র জন্মের বর প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ তূর্ণপ্রস্থানার্থ ব্যগ্রতা ও চাঞ্চল্যবশতঃ—চিন্তা না করিয়াই, "তথাস্তু" বলিয়া সত্যবানের মৃতদেহ লইয়া পুনঃ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যবানের অভাবে তাঁহার ঔরসে তাঁহার প্রার্থিত শত পুত্রজন্মের স্বাভাবিক অসম্ভবতার বিষয় তাঁহাকে বলিবামাত্রই, তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং গত্যন্তর না

দেখিয়া সত্যবানকে তৎক্ষণাৎ সতীর নিকট রাখিয়া চলিয়া যান। এইরূপে প্রভূত প্রভাবশালী বিধির বিধানও সতীর সতীত্ব-বলের নিকট অনন্যোপায় হইয়া ম্লানমুখে পরাভব স্বীকার করিল। সাধ্বী হিন্দুরমণী যতই কেন দুস্তর বিপদসাগরে পতিত হউন না, প্রিয়তম পতি হইতে যতই কেন দীর্ঘ-কালের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকিতে বাধ্য হউন না, দৈবক্রমে মহাপরাক্রান্ত দুর্ব্বৃত্তবিশেষের হস্তে পড়িয়া যতই কেন পাপ-প্রলোভিত, লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত হউন না, স্বীয় কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মানুরোধে জীবনে যতই কেন তাঁহার সুখবিলাসবর্জ্জন ও দুঃখক্লেশ স্বীকার করিতে হউক না, কিছুতেই তাঁহার মন পবিত্র ভর্তৃ-নিদিধ্যাসন * হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হয় না; যাবতীয় বাধাবিঘ্ন ও দুঃখ-যন্ত্রণা তৃণতুল্যজ্ঞান করিয়া, প্রাণপণে পরমা-রাধ্য স্বামীর ইচ্ছা ও প্রয়োজন সাধনপূর্ব্বক, অবিচলিত চিত্তে কেবল তাঁহার মঙ্গলকাম-নারূপ জীবনের মহাব্রতেই কালাতিপাত করেন। জনকদুহিতা লক্ষ্মীরূপিণী বৈদেহী প্রভু রামচন্দ্রের জন্য, তাবৎ জীবন ব্যা-পিয়াই, অম্লানবদনে কতই না কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। পবিত্র পতিসেবাব্রত উদ্‌যা-পনার্থ তাঁহার জীবনের দুঃখের পরিমাণ এতই অত্যধিক হইয়াছিল যে, অদ্যাপি প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে তাহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া তাঁহার পবিত্র নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ যে, যতদিন জগতে পাতিব্রত্যের আদর ও মর্য্যাদা থাকিবে, ততদিনই এই ভর্তৃপর-মার আদর্শচরিত্র মানবহৃদয়কে পাবিত্র্যগুণে আনন্দিত ও বিমোহিত করিবে। অনেক সময় আমার মনে হয়, সতীত্বরত্ন এইরূপ অমূল্য এবং তাহার পবিত্র তেজ নিয়তির নিকটও এইরূপ অপ্রতিহত দেখিয়া, তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য ও গৌরব এই মর্ত্ত্যভবনে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই বুঝি ব্রহ্মা-ণ্ডের আদ্যাশক্তিস্বরূপা আমাদের হিন্দুধর্ম্মা-শ্রিতা ভগবতী পার্ব্বতী স্বয়ংই নারীজাতির অসীম গৌরববাচক অতীব পবিত্র এই "সতী" আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। অপিচ, তিনি যে কেবল এই সুমহৎ নাম ধারণ করিয়াই যথেষ্ট করিয়াছেন বলিয়া সন্তুষ্টা ছিলেন, এমত নহে; এই আখ্যার পূর্ণমহিমারক্ষার্থ এবং স্বকীয় প্রকৃতিগুণহেতু তাঁহার সেই লৌকিক জীবনে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এমনই অত্যুচ্চ আদর্শচরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাই যেন বোধ হয় যে, তিনি স্ফুটভাষায় না হউক, জীবনের কার্য্যাবলীতে প্রকারা-ন্তরে, এই অবনীমণ্ডলের যাবতীয় রমণীকে আগ্রহাতিশয্য সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি ও তদ্ধেতু সম্যক নিরুপায় দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত এই সুপ্রশস্ত স্বাভাবিক নারীজীবনমার্গ তাহাদের জন্যই সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত করিলেন; তাহারা

* নিদিধ্যাসন—একতান-মনে অবিশ্রান্ত ধ্যান।

যেন সকলেই সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায়ই, অবহিতচিত্তে এই পথেই চলে, তাহা হইলে আর তাহাদের কখনও কোনও অমঙ্গল ঘটিবে না। যাহাহউক, এই মহাদেবী আপনার সর্ব্বজনীন এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কতই না লৌকিক লীলা দেখাইয়াছেন! তিনি স্বামীসেবার্থে রাজদুহিতা হইয়াও পর্ণকুটীরবাসিনী হন! পতির সেই প্রিয় মাদক খাদ্য প্রস্তুত করিতে করিতেই বা কোমল হস্তে কত ব্যথা সহ্য করেন! ফলতঃ, তিনি ভর্ত্তার সেবাশুশ্রূষায় ঐকান্তিক আগ্রহ, সহিষ্ণুতা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া যেন স্ত্রীজাতিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সংসারে স্বামীর তুল্য আদর ও যত্নের ধন আর তাহাদের কিছুই নাই; এবং তিনি লোকের চক্ষে হাজার কুক্রিয়াসক্ত ও বিকৃতমস্তিষ্কাদি হইলেও, স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদাই পরমারাধ্য পরমগুরু। আবার, সেই দুরন্ত অভিশাপদ্বারা পিতার সুন্দর মনুষ্যবদন বিকট অজমুখে পরিবর্ত্তিত করিয়া যেন অতি তেজের সহিত ও বিশদভাবে রমণীগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছেন যে, স্বামিসম্বন্ধ এমনই ঘনিষ্ঠ যে, অবস্থাবিশেষে, এমন কি, নিজের পিতা পর্য্যন্তও তাঁহার নিকট সামান্য পশুর ন্যায় অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র হইতে পারেন।

যাহা হউক, আদর্শ হিন্দুরমণীরচরিত্র এইরূপ অতি উচ্চ ভাবাপন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন, অপ্রতিহত-তেজোযুক্ত, অসাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধিসমন্বিত ও পরমপবিত্র যে, উহার বিভিন্ন উপাদান সমূহ এক একটি করিয়া, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা স্ফুটরূপে বুঝিতে পারি যে, উহা সর্ব্বাংশেই স্বর্গীয় পদার্থ। এখন শুধু বুঝিয়া বুদ্ধিমান্, জানিয়া জ্ঞানী মাত্র হইলে কি হইবে?—চাই আসল কাজ। এই কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল কর্ম্মেরই আদর। অতএব, "শান্তিশতক" প্রণেতা মহাকবি শিহ্লনের—

"নমস্যামো দেবান্নন্নু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তং কর্ম্মৈক ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"

এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া মহাত্মা কর্ম্মদেবকেই একমাত্র উপাস্য ধরিয়া আমাদের প্রত্যেক রমণীকেই এই "স্বর্গীয় পদার্থ" লাভ করিতে হইবে। আর তাঁহাদের পবিত্র সম্ভ্রম ও মর্য্যাদারক্ষার্থ এবং আপনাদের ধর্ম্মোৎকর্ষলাভহেতুও আমাদের প্রত্যেক পুরুষেরও ঐরূপ স্বর্গীয়চরিত্রগঠন করিয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে, আমরা কালক্রমে দেখিতে পাইব যে, আমাদের ভাগ্যবতী রমণীগণ সকলেই দেবীকুলে পরিগণিতা হইয়া এই শোকতাপদুঃখময় ধরাধামকে চিরসুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গধাম করিয়া তুলিয়াছেন। অহো! পাঠক! ভাব দেখি, দুঃখিনী ভারতভূমি কি এখনও এমন সুখের আশা বুকে ধরিতে পারে!

শ্রীমোহিনীমোহন আচার্য্য।
নারায়, ঢাকা।

সাগর-সঙ্গমে।

(মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে।)

পায় কি গো, হেন শান্তি মুহূর্ত্তের তরে
মানব-জীবন,
চাঁদের মধুর হাসি,—মধুর জোছনারাশি,
হৃদয়ে ধরিয়া আহা! সাগর যেমন,
পবিত্র শান্তির প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ!!

সুনীল আকাশে হাসে সুবিনোদ হাসি
চারু শশধর,
চন্দ্র-কর নীল নীরে, হাসে আধ' ধীরে ধীরে,
প্রশান্তসাগর-বক্ষে শান্তির আকর;
কি মধুর! কি প্রশান্ত! কেমন সুন্দর!!

অধীর চাঁদের হাসি হেরিয়া সঘনে
প্রশান্ত সাগর,
কি এক পুলকভরে, আধ' ভাঙ্গা থরে থরে,
সাজায়ে তরঙ্গগুলি, হৃদয় আবরি,
সুখের স্বপনে যেন উঠিছে শিহরি!

বেলাভূমে বালুরাশি ঝিকি মিকি জ্বলে
চাঁদের কিরণে,
যেন রে তারকাকুল, সুবিমল বিভারাশি
প্রকাশিতে না পারিয়া, নীলাকাশ ছাড়ি,
অভিমানে ভূমে পড়ি যায় গড়াগড়ি!

তীরে শোভে তরুরাজি, পাতায় পাতায়
চাঁদের কিরণ,
তরল রজত-রাশি, উজলিছে যেন হাসি;
কি মহান্ সুপ্রশান্ত গম্ভীর অটবী,
প্রকৃতির চারু চিত্র—সুমোহন ছবি!

মানসমোহিনী, এই শান্তিময়ী শোভা
অতুল জগতে;
শান্তির এ সুষমায়, জীবন ভরিয়া যায়;
মরি কি প্রশান্ত ভাব ভুবনমোহন,
সিন্ধু-বক্ষে প্রতিবিম্ব সুন্দর কেমন!

এ দিকে জাহ্নবী সতী সুর-শৈবলিনী,
অবিরাম স্রোতে,
তরঙ্গের তালে তালে নাচি নাচি কুতুহলে'
মিশাইছে প্রেমভরে প্রফুল্লিত মন
সাগরজীবনে আহা! নিজের জীবন!

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশি, দুইটি হৃদয়
এক হ'য়ে যায়,
একই ইচ্ছা দুই মনে, এক ভাবে দুই জনে,
একই সুখের স্বপ্নে অসীম উল্লাসে,
নিশীথ-জগত-সনে নিরবধি হাসে!

একই আশার আশে, দুইটি হৃদয়
মিলি পরস্পরে,
প্রেমের আবেশে ঘোর, এক ভাবে হ'য়ে ভোর,
একই নির্দ্দিষ্ট যেন অপার্থিব ধন,
লভিবারে সমুৎসুক দুইটি জীবন!

হৃদয়ে হৃদয়ে আহা! মিশেছে এমন কোরে,
চেনা নাহি যায়।
সাগর জাহ্নবীময়, জাহ্নবী সাগরময়,
সে অপূর্ব্ব মিলন অতুল তুলনায়,
একসূত্রে গাঁথা যেন দুইটি হৃদয়!

দুইটি হৃদয় আহা! গাইছে একই গান
মানস-মোহন,
অতিধীরে—অতিধীরে, চাঁদিমা-চকিত নীরে,
উঠিছে উন্মাদ-কর কুল কুল তান,
প্রেমের জলন্ত দৃশ্য মরি কি মহান্!!

শান্তির সুষমা-হারে, সেজেছ সুন্দর
ওগো জল-নিধি,
জাহ্নবীর সুখ-সঙ্গে, দিনরাত কতরঙ্গে
পবিত্রপ্রণয়ে মজি সুখের স্বপনে,
হাসিতেছ খেলিতেছ আপনার মনে।

বিশাল হৃদয় তব অসীম গভীর,
শেষ নাই তার,
দিক্-অন্ত পাইবারে, চলিয়াছে একাকারে,
কূল না পাইয়া শেষে হইয়া নিরাশ,
চুমিতেছে নীল জলে সুনীল আকাশ।

এত সুখে সুখী তুমি, অত যে গভীর হৃদি,
অত যে বিশাল,
আদি নাই—অন্ত নাই, অনন্ত যেদিকে চাই,
তবুও সে সুখরাশি স্থান না পাইয়া,
উঠিছে তরঙ্গাকারে মৃদু উচ্ছসিয়া!

ধন্য হে বারিধি, তুমি সদাশান্তিময়
এ বিপুল ভবে।
জীবশ্রেষ্ঠ বলি নরে, কত অভিমান করে,
প্রতারিত হয় তারা বৃথা গরিমায়,
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র নর তব তুলনায়।

হোতে পারে শ্রেষ্ঠ তারা বিদ্যাবুদ্ধিবলে,
জ্ঞানের চর্চ্চায়,
কিন্তু যে অনন্ত প্রেমে, শান্তির বিলাসভ্রমে,
সতত নিমগ্ন তুমি যে সুখ চিন্তায়,
যে সুখ-সঙ্গীতে তব শান্তিময় কায়!

যে মোহন ভাবে ভোর জাহ্নবী-বিলাসি,
তোমার হৃদয়,—
শোক নাই, দুঃখ নাই, বিষাদ-ভাবনা নাই,
পাইত মানব যদি কণামাত্র তার,
মানিতাম সুমহত্ত্ব নর-গরিমার।

বড় সাধ যায় সিন্ধু, শোক তাপ আদি
বিষাদ-যাতনা,
ভুলিয়া সংসার খেলা, ভুলিয়া ভবের জ্বালা,
জাহ্নবী জীবন সহ, ক্ষুদ্র এ জীবন
মিশাই মুহূর্ত্ত তরে তোমার মতন।

ওই নীলাকাশতলে, চাঁদের হাসির কোলে,—
শান্তির শয়নে
শুইয়া, প্রশান্ত স্থির, প্রেমময়ী জাহ্নবীর
পবিত্র প্রেমের ধারা হৃদয়েতে ধরিয়া,
গাই কুল কুল গান মন প্রাণ ভরিয়া!

অভাগা দীনের প্রাণে, ওগো পরমেশ—
পতিত-পাবন,
দেও দেব, দয়া করি—যাতনায় জলে মরি—
নন্দনের পরিমল দেবেন্দ্ররঞ্জন,
অনন্ত প্রেমের শান্তি সিন্ধুর মতন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র।

ব্রহ্মার মুহূর্ত।

হিন্দুশাস্ত্র জগৎপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা। উহার দুইটি দিক্ আছে। আজিকালিকার ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ দুইটি দিকের দুইটি সুন্দর নাম সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিধানে এক দিকের নাম (Esoteric) ইসোটারিক, আর এক দিকের নাম (Exoteric) এগ্‌জোটারিক। এই দুইটি শব্দকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে "অন্তস্তত্ত্ব" ও "বহিস্তত্ত্ব" অথবা "রহস্যজ্ঞান" ও "প্রকাশ্যজ্ঞান" এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যাঁহারা বহিস্তত্ত্ব অথবা প্রকাশ্য জ্ঞান লইয়া ব্যাপৃত, তাঁহাদিগের নিকট হিন্দুশাস্ত্র এক বস্তু; যাঁহারা উহার অন্তস্তত্ত্বের রসাস্বাদে অধিকারী হইয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাদিগের নিকট আর এক বস্তু। হিন্দুশাস্ত্রের যে কথা লইয়া আলোচনা করিবে, সেই কথাতেই অন্তস্তত্ত্ব ও বহিস্তত্ত্বের পার্থক্যমূলক জ্ঞান বিষয়ে বহু শিক্ষা পাইবে। আমরা একটি সামান্য কথা হইতে ইহার নিদর্শন দিব।

সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নভোমণ্ডলের দুইটি আশ্চর্য্য দৃশ্য। কোন্ বৎসরের কোন্ মাসে, কোন্ দিন, কোন্ ক্ষণে, পৃথিবীর কোন্ স্থানে, সূর্য্য অথবা চন্দ্রের কিরূপ গ্রহণ মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়া কতক্ষণ স্থায়ি থাকিবে, তাহা জ্যোতির্ব্বিদেরা ইদানীং বহু পূর্ব্বেই গণনাদ্বারা অবধারণ করিতে পারেন; এবং তাঁহারা সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া, স্থানবিশেষে বিশেষরূপে গ্রহণ দর্শনের অভিলাষে, দূরবর্ত্তি দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা তাদৃশ সময়ে কি করিয়া থাকেন? সকলেই জানেন, হিন্দুমাত্রই সেই সময়ে হয় জপতপে উপবিষ্ট রহেন, না হয় গঙ্গাজলে কিংবা অন্য কোন পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন; এবং যাঁহারা জপতপে অদীক্ষিত এবং তীর্থস্নানে অনিচ্ছু, তাঁহারা দীনদরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া আত্মপ্রীত হন।

গ্রহণসময়ে হিন্দুদিগের উল্লিখিতরূপ ধ্যানধ্যানের আনন্দ দেখিয়া বিদেশী পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই বিচিত্র ভ্রমে নিপতিত হন। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা গ্রহণতত্ত্বের প্রকৃত বিজ্ঞান বিষয়ে কিছুই জানিতেন না; তাই তাঁহারা এরূপ দানাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং এখনকার বৃদ্ধ হিন্দু,

* ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত—ব্রহ্মণো মুহূর্ত্তঃ, সতু একমনুস্থিতিকালঃ।
দৈবিকানাং যুগানাং তু সহস্রং ব্রহ্মণো দিনং
মন্বন্তরং তথৈবৈকং তস্য ভাগ শ্চতুর্দশ।

তাঁহাদিগের ব্যবস্থা অনুসারে, ঘরের অর্থ পরের হাতে বিলাইয়া দিয়া, ধর্ম্মের নামে বিড়ম্বিত হইতেছেন।

কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। যাঁহারা প্রকৃত কথায় প্রবিষ্ট, তাঁহারা জানেন যে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অধুনাতন সভ্য দেশসমূহ যে সময়ে বন-ভূমি অথবা বনচর মনুষ্যের নিবাস-ভূমি বলিয়া তদানীন্তন সভ্য জগতের ত্রিসীমায়ও স্থান পায় নাই, ভারতবর্ষের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা, সে সময়েও, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের সমস্ত কথা, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও স্থিতি গণনা দ্বারা সম্যক্ অবগত ছিলেন, এবং বৎসরের কোন্ দিন, কোন্ ক্ষণে, কোথায়—কিরূপে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের অপরূপ দৃশ্য মনুষ্যের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবে, সুশিক্ষিত শিষ্যকে তাহার গণনাসূত্র সুন্দররূপে শিখাইয়াছিলেন। তবে, তাঁহাদিগের শিক্ষাদান প্রণালীতে চিরকালই এক বৈচিত্র্য ছিল। সে বৈচিত্র্য এই, —তাঁহারা মনুষ্যমাত্রকেই অধিকার-ভেদে শিক্ষা দিতেন; এবং যে কথায় যে অনধিকারী, তাহাকে তাহার অন্তস্তত্ত্ব বুঝাইতে যত্নপর না হইয়া, অন্যপ্রকারে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত রাখিতেন।

যাহাদিগের 'ক' অক্ষর জ্ঞান নাই, তাহারা গ্রহণতত্ত্ব বুঝিতে পারে কি? ইংলণ্ডের যে শ্রেণিস্থ শ্রমজীবিরা (The Rough) রাফ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালায় যাহাদিগকে সাধারণতঃ "চাষা'রে চোঁয়াড়" বলে, তাহারা কখনও দূরবীক্ষণ চক্ষে দিয়া গ্রহণের ক্রম-বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে কি? তাহারা তাহাও পারে নাই, অথচ ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের মত গ্রহণের ধর্ম্মানুষ্ঠানটুকুও শিক্ষা করে নাই। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের দুই প্রকার শিক্ষাদান-পদ্ধতি দেশের মঙ্গলজনক কি না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ব্রহ্মার মুহূর্ত্তও হিন্দুশাস্ত্রের ঐ প্রকার একটি রহস্যতত্ত্ব। উহার প্রকাশ্য অর্থ পুরাণে, এবং অপ্রকাশ্য অথবা মর্ম্মরহস্য অতি গভীর যোগ-বিজ্ঞানে। এদেশের ইদানীন্তন বালকেরা "ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত" এ শব্দটা কানেও কখন শুনিতে পায় কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। কে তাহাদিগকে প্রাচীন হিন্দুর এ সকল তাত্ত্বিক শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্য যত্নপর হইবে? কিন্তু আমরা যখন বালক ছিলাম,—অর্থাৎ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, আমরা যখন বঙ্গীয় বৃদ্ধদিগের পাদ-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া নানা কথা শিক্ষা করিতাম, তখন "ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত" এই শব্দটিও আমরা অহরহই কানে শুনিতে পাইতাম। শুনিতাম ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে নরের ষাটিহাজার দিন। ইহার এই অর্থ যে, নরলোকে যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া যায়,—পুরাতন রাজ্যসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া নূতন রাজ্য ও নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হয়,—পৃথিবীতে যাহা কিছু পুরাতন ছিল, তাহা বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন ব্রহ্মলোকে একটা মুহূর্ত্ত লয় পায় এবং আর একটা মুহূর্ত্তের অভ্যুদয় হয়।

এস্থলে এইক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কালের এরূপ কষ্টকল্পনার মধ্যে কণিকা-প্রমাণ প্রকৃত সত্যও পাওয়া যাইতে পারে কি?

অধ্যাত্মবাদীরা বলেন—পারে। তাঁহাদিগের কথার সহিত পুরাতন হিন্দুশাস্ত্রের অন্তস্তত্ত্ব নিহিত অমূল্য সত্যের কিরূপ সামঞ্জস্য আছে, "ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত"প্রসঙ্গে তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইব। পাঠক জ্ঞাত আছেন যে, অধ্যাত্মবাদীরা পরলোককে ইহলোকের মত চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত পদের গ্রাহ্য প্রাকৃত জগৎ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং পরলোকবাসী পুণ্যাত্মারা ছায়ামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যকে সময়ে সময়ে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা তাঁহারা দেববাণী জ্ঞানে যত্নের সহিত সংকলিত করিয়া রাখেন।

উল্লিখিতরূপ উপদেশের মধ্যে অসংখ্য অতি আশ্চর্য্য তত্ত্বকথা আছে। তাহারই একটি কথা এই যে, মনুষ্যজগতের কালমান ও উর্দ্ধতন ধামস্থিত দেব-লোকের কালমান এক নহে। শুধু এই হেতুই দেবতারা সহিষ্ণু, আমরা অসহিষ্ণু। আমরা যখন পৃথিবীতে দেখিতে পাই যে, একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ সন্নিহিত দুর্ব্বল রাজার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিতেছে, অথবা ধন-সমৃদ্ধ দুর্দ্দান্ত পুরুষ, সত্যকে অসত্য ও দিনকে রাত্রি করিয়া, আত্মপর সকলেরই সুখ-সম্মানের উপরে স্বার্থপরতার গাড়ী চালাইয়া যাইতেছে, তখন আমরা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করি আর পুনঃ পুনঃই ঐ এক কথা বলি—হা ভগবান্, তুমি কোথায়! হা ভগবান্, তুমি কোথায়! এইরূপ দুঃখ কষ্টের সময়ে এবং পৃথিবীর অনাচার, অবিচার ও অত্যাচার দর্শনে আমরা সর্ব্বত্রই হৃদয়ে কম্পিত হই, এবং আমাদিগের বিশ্বাসের ভিত্তি তরঙ্গপ্রহত তট-ভিত্তির ন্যায় ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া প্রাণে শিহরিয়া উঠি। কিন্তু দেবতারা উপদেশ করেন—মনুষ্য, তুমি ভীত কিংবা কুণ্ঠিত হইও না, এবং ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে বিশ্বাস হারাইও না;—পৃথিবীতে আজি যাহা অবিচার মনে করিতেছ, ব্রহ্মার মুহূর্ত্তমানে তাহা সুবিচারে পরিণত হইবে, পৃথিবীর সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত দুর্জ্জন কালের সেই পূর্ণমানে সর্ব্বতোভাবে শাসিত ও সংশোধিত হইয়া সুজনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে।

ইতিহাস আর কিছুই নহে,—ব্রহ্মার মুহূর্ত্তমানের ক্রম প্রকাশের নাম ইতিহাস। ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহাই প্রত্যক্ষ সত্যরূপে মনুষ্যের দৃঢ়বদ্ধ হয় যে, এই মানবজাতি ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান-বঞ্চিত বিপন্ন জীব নহে। কেন না, ইতিহাসের সমস্ত কথাই কার্য্যকারণবদ্ধ কর্ম্মফলের কাহিনীমাত্র। তবে এক পুরুষের কার্য্য যে সাত পুরুষ পরে কর্ম্মফলে পরিণত হয়, তাহার একমাত্র কারণ মনুষ্যলোকের কালমানের সহিত ব্রহ্মার মুহূর্ত্তমিত কালের পরিমাণ-পার্থক্য। হিন্দু ঋষিরা ইহা বুঝিতেন বলিয়া সকল সময়েই দেবতাদিগের মত ধীর, স্থির ও সহিষ্ণু রহিতেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রচিত্রাবলী।

(১)

কলঙ্কভঞ্জন।

কিছুদিন হইল ৺ দাশরথি রায়ের পাঁচালি পড়িতে পড়িতে "কলঙ্কভঞ্জন" পালাটা শেষ করিয়া ফেলিলাম। তার পর এই বিষয়টি লইয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে একটি সুন্দর ভাবের উদয় হইল। তৎপ্রণোদিত হইয়া আমি দেখিলাম যে, আমরা অনেক সময় যে সমস্ত বিষয় আপাত-দৃষ্টিতে নগণ্য বলিয়া হতাদর করিয়া থাকি, প্রণিধান পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, তাহা হইতেই অনেক গূঢ় তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় এবং তৎকালে এই নব ভাবের চমৎকারিত্বেও মনোহারিত্বে হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া পড়ে। আমি ভক্তিরসধারাপূত বৈষ্ণব ধর্ম্মসংক্রান্ত সাহিত্যের যতই আলোচনা করিতেছি, ততই তন্নিহিত মধুর তত্ত্বের রসাস্বাদ দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি। বাহ্য দৃষ্টিতে যে তত্ত্ব যাঁহার নিকট যতই কেন বিসদৃশরূপে প্রতিভাত হউক না কেন, যদি প্রকৃত জিজ্ঞাসুর ন্যায় অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সেই তত্ত্বের অন্তরালে পরমপবিত্র প্রেমভক্তি-প্রবাহ, অন্তঃসলিলা ফল্গুস্রোতের ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হইয়া, ভক্ত সাধকের হৃদয়ে অনাবিল শান্তিধারা বর্ষণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইবেন।

আমি বৈষ্ণবসাহিত্যতত্ত্বাবলীর কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাদ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, ক্রমে ক্রমে তাহা পাঠক বর্গকে জ্ঞাপন করিবার বাসনায় অদ্য "কলঙ্কভঞ্জন" অবলম্বন করিয়া আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

'কলঙ্কভঞ্জনের' উপাখ্যানের সহিত সকলেই বোধহয় পরিচিত আছেন। বিশেষতঃ দাশরথির কল্যাণে বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে ইহা অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আজকাল নব্য নাটক-যাত্রার তুমুল কোলাহলে পাঁচালী বিপন্ন অবস্থায় মৃতপ্রায় হইয়া দিন পাত করিতেছে; সুতরাং আরও কয়েক বৎসর পর,এই সদ্য পরিচিত উপাখ্যানও যে অপরিচিত হইয়াপড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করা অন্যায় নহে।

ব্রজসুন্দরী শ্রীমতী রাধা শ্রীনন্দ-নন্দন পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে সমর্পিতপ্রাণা; কৃষ্ণই তাঁহার ধ্যান, কৃষ্ণই তাঁহার জ্ঞান; শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, কৃষ্ণচিন্তা তাঁহাকে কখন ত্যাগ করে না।

"না জানি কেমন মধু শ্যাম নামে আছে গো
পরাণ ছাড়িতে নাহি পারে।"

শ্রীরাধার হৃদয়-মুকুরে সেই অনুপম নব জলদবরণ শ্যামরূপের এমনই প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে যে, তিনি সর্ব্বদা মানস-নয়নে সে প্রতি-

বিম্ব "নিরখি নিরখি অনুদিন * * নহি তিরপিত ভেল।"

গগনমণ্ডলের জলধর-পটলে সে শ্যামরূপের মোহিনী মূর্ত্তি প্রতিভাত, কাল যমুনাজলে সে মাধুরী প্রতিবিম্বিত, শ্যামল-বন-কুঞ্জে সে বিশ্ব-বিমোহন রূপ চিত্রিত!

শ্যামসুন্দরের মোহনবংশীরবে শ্রীরাধা উন্মাদিনী হইয়া "কুল-মান লাজ-ভয়" সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বংশীবদন সম্ভাষণে ছুটিয়া বাহির হন! এদিকে লোকদৃষ্টিতে তিনি কুল-বধূ, গৃহস্থের কন্যা, গৃহস্থের পত্নী। তাঁহার এইরূপ অবৈধ আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাতে শালীনতার অভাব আরোপ করিত; গৃহে গুরুজন-গঞ্জনা তাঁহাকে অবিরত পীড়িত করিত, শ্বাশুড়ী-ননদ জটিলাকুটিলার তীব্র বাক্য-বিষবাণ সর্ব্বদা তাঁহার মর্ম্মচ্ছেদ করিত; কিন্তু তথাপি তিনি সে শ্যাম নাম ভুলিতে পারেন নাই—সে মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হন নাই অথবা ইচ্ছাই করেন নাই! তিনি মনে মনে স্বীয় আরাধ্য দেবতা শ্যামসুন্দরকে বলিয়াছেন,—

"বঁধুহে, তুয়াপানে চায়্যা শতদুঃখ পায়্যা
সেও ভাবি মহাসুখ।
কিন্তু তুয়া ছাড়া হয়্যা অমরা পাইয়া
সে মোর বিষম দুখ।
বঁধু, তুয়া যদি পাই সাথে
তবে কলঙ্ক-জঞ্জাল চন্দন বলিয়া
তুলিয়া লইব মাথে।"

যে একবার হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাসে, দৃঢ় বলে ভগবচ্চরণচ্ছায়ায় স্থানলাভ করিয়াছে, শত কশাঘাত, সহস্র নিন্দা, লক্ষ লক্ষ কঠিন লোমহর্ষকর শাস্তিবিধানেই কি তাহাহইতে তাহাকে বিচ্যুত করা সম্ভব? দৃঢ়বিশ্বাসী, পাপাশয় অত্যাচারীর প্রতাপবলে, অগ্নিকুণ্ডে হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, উদ্যতকুঠার ঘাতকের দিকে প্রীতিপূর্ণ নয়নে দৃষ্টি করিতে করিতে তাহার নৃশংস আঘাত স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, অবিশ্বাসী বিচারকের অভিপ্রায় অনুসারে নির্ব্বিকারভাবে বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে ধারণপূর্ব্বক, ধীরে ধীরে, তীব্র বিষ গলাধঃকরণ করিয়াছেন, ক্লেশদ আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ ছায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই—অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণা তাঁহার বিশ্বাস-হিমাচলকে টলাইতে পারে নাই—ব্রজপুরীর জনসাধারণের বাক্‌যন্ত্রণায় কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধা নিষ্কলঙ্ক শিরে "কলঙ্ক পশরা" বহন করিয়াও, তাঁহার শ্যামসুন্দরকে ভুলিতে পারেন নাই। বলুক লোকে 'কলঙ্কিনী', বলুক লোকে অভিসারিকা, তিনি তো জানেন যে তিনি কোন্ কলঙ্কে কলঙ্কিনী, অন্তর্দ্দর্শী সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার প্রাণ-প্রিয় ভগবান্ শ্যামসুন্দর তো জ্ঞাত আছেন কোথায় তাঁহার কলঙ্ক, কি জন্য তাঁহার অভিসার। সেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহা ভাবিয়াই তিনি হৃষ্টা, তুষ্টা এবং সর্ব্বংসহা; তাই শত অত্যাচার জর্জ্জরিত হইয়াও, তিনি প্রেমোৎফুল্লা, স্মেরাননা, তদ্গতচিত্তা। কিন্তু ভক্তাধীন ভগবানের হৃদয়ে ভক্তের ক্লেশ বড় বিষম বাজিয়া থাকে। শ্রীরাধার—তাঁহার প্রিয়সেবিকা প্রেমময়ী শ্রীরাধার এই অন্যায় কলঙ্ক তাঁহার

সহ্য হইল না; বিশেষতঃ শ্রীরাধা তৎপদার্পিত-হৃদয়া হইয়া এই সব কলঙ্কগঞ্জনা একান্তই উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছেন; তাঁহারই উপর ইহার বিচারের ভার সমর্পণ করিয়া তিনি নির্ব্বিকার অবস্থায় কৃষ্ণগুণগানে ও তৎপ্রেমামৃত পানে কালযাপন করিতেছেন, তখন তিনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তিনি দেখিতেছেন শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর মদনমোহন শ্রীরাধারমণ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র ভেদ নাই, যাহারা অহর্নিশ তাঁহাকে বাক্যযন্ত্রণায় পীড়িত করিতেছে, যে সকল সঙ্কীর্ণমনাঃ নীচাশয় নারীজীবনের হেয়তম কলঙ্ককালিমায় চরিত্র-ধবলতা মলিন করিয়া জনসমাজে তাঁহাকে ঘৃণ্যা করিয়া তুলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে নাই, তিনি তাহাদের প্রতি, ভ্রমক্রমেও, কোন দিন রুষ্টা অথবা বিরক্তা হন নাই; কখনও তাঁহাদের অমঙ্গল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই; কারণ এসব লোকচর্চ্চাতে তিনি দুঃখিতা নহেন, ক্ষুব্ধা নহেন;—তিনি পাপপুণ্যের ও সুখদুঃখের অতীত। কিসের কুল, কিসের মান,—কিসের সুখ, কিসের দুঃখ,—সব তিনি সেই প্রাণারামে সমর্পণ করিয়া অহরহ গাইতেছেন:—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ-মন-আদি তোমায় সঁপেছি
কুল-শীল-লাজ-মান!
অখিলের নাথ, তুমিহে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন!
গোঁপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন।
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
পরিতে গলায় সুখ!
সতী কি অসতী তোমাতে বিদিত,
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্যময়
তোমার চরণ খানি।

আহা কি মধুর ভাব, কি আত্মনির্ভর, কি আত্মবিসর্জ্জন!

এ হেন মহাভাবসিদ্ধা শ্রীরাধার কলঙ্ককালি অপনোদনের জন্য শ্রীভগবান্ এক বিচিত্র লীলার অবতারণা করিলেন,—তাহাই "কলঙ্কভঞ্জন।"

নন্দদুলাল যশোদানয়নাঞ্জন জন-মানসরঞ্জন বাল-গোপাল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অস্থির হইয়া পড়িলেন! "কি হোলো"—"কি হোলো" বলিয়া নন্দরাণী ছুটিয়া আসিয়া বক্ষের রত্ন বক্ষে ধারণ করিলেন—মুখ-কমল স্নেহচুম্বন দ্বারা উন্নমিত করিলেন। কিন্তু হায়, একি সর্ব্বনাশ! এযে সোনার কমল ঢলিয়া পড়িতেছে—ঊর্দ্ধ দৃষ্টি পলকহীন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসার, সে সোনার শ্যাম অঙ্গ শ্যামিকা-কালিকা লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। আস্তে ব্যস্তে নন্দরাণী ক্ষীর-সর-নবনীত আনিয়া প্রাণগোপালের মুখ-বিবরে প্রদান

করিলেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! তাহা মুখ হইতে পড়িয়া গেল, আকুল প্রাণে যশোমতী নীলমণি-ধনকে বাপধন বলিয়া শতবার আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহার "মাখনচোর" মা ব'লে সুধাইল না! বিপদ্ গণনা করিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"কি হোলো, কি হেলো, দিদি রোহিণী।"

সে মর্ম্মভেদী চীৎকারে রোহিণী দিদি ছুটিয়া আসিলেন, গৃহের পরিজনবর্গ ছুটিয়া আসিল, গোপরাজ নন্দ উপস্থিত হইলেন, প্রতি-বেশিবর্গ উর্দ্ধশ্বাসে নন্দভবনে সমবেত হইল—নন্দালয়ে ক্রমে ব্রজপুরীর প্রতিষ্ঠা হইল; কারণ নন্দদুলাল যে ব্রজদুলাল! ব্রজের নরনারী, বালক-বালিকা, পশুপক্ষী কে ব্রজের গোপালকে প্রাণ-গোপাল মনে করে না? রাখাল বালকগণ "ভাই রাখালরাজ" "ভাই রাখালরাজ" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল! তাহাদের ক্রন্দনে গাভীবৎস হম্বারবে গগণবিদীর্ণ করিতে লাগিল—ব্রজপুরীর নরনারীর হাহাকারে হৃদয়বেদনা অশ্রুধারায় গলিয়া পড়িতে লাগিল! কি সর্ব্বনাশ!

ব্রজের চিকিৎসককুল অশেষবিধ ঔষধ, মুষ্টিযোগ, অনুপান, সহপান, আসব মোদক, চূর্ণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া নিস্ফলতার হতা-শ্বাসে করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন উপায় কি?

ইত্যবসরে ব্রজধামে ভগবল্লীলায় এক নবীন চিকিৎসকের আবির্ভাব হইল। কিবা মনোহর কান্তবপুঃ, কিবা শ্যামলোজ্জ্বলা রূপমাধুরী, কিবা বঙ্কিমভ্রূযুগশোভিত সুদর্শন আয়ত নেত্র-যুগল, কি বা মনোমোহিনী মুখকান্তি! যে দেখিল সেই মুহূর্ত্তকাল নিস্পন্দ হইয়া তাকাইয়া রহিল, নয়ন ফিরিল না। সকলে যখন প্রশ্ন করিয়া জ্ঞাত হইল যে, এই নব-নীরদ-নিন্দিতকান্তি দিব্য পুরুষ 'নিদান' ব্যবসায়ী,—স্বয়ং 'বৈদ্যনাথ' পর্য্যন্ত ইঁহার গুণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন,—'চতুর্মুখ আদি তাঁহারই সৃষ্ট, তখন তাঁহার দ্বারা গোপালকে দেখাইবার ইচ্ছা সকলেরই মনে যুগপৎ উদিত হইল। বৈদ্যরাজ সকলের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গোপালের রোগোপশম কর-নার্থে নন্দভবনে প্রবেশ করিলেন।

যখন তিনি সেই জনসংঘ ভেদ করিয়া, যেখানে মা যশোদা নীলমনির অচেতন দেহ-লতিকা ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া দীননেত্রে উপবিষ্টা আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বৈদ্যরাজরূপে পরিচিত হইলেন, তখন যুগপৎ সকলের চক্ষু এই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আগ্রহ ও বিস্ময়প্রভাবে স্থির হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর পার্শ্বো-পবিষ্টা শ্রীরাধার বাম নয়ন পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। কে এ বৈদ্যরাজ! মা যশোদা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহার গোপাল ভ্রমে দেশ-কাল-পাত্র বিচারশূন্যা হইয়া "আয় বাপ, বুকে আয় আমার নীলমণিধন" বলিয়া স্নেহের বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলেন,—কিন্তু পরক্ষণেই, ক্রোড়স্থ অচেতন গোপালের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হওয়াতে, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন! এ কি স্বপ্ন!—না মায়া!—না মতি-ভ্রম! উভয়ের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য এমনই যে, তাহা বিস্ময়কর!

শ্রীরাধা বৈদ্যরাজকে দেখিবামাত্রই মনে

মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কে এই বৈদ্যরাজ? ইঁহাকে দেখিয়া যে আমার মন কেমন হইয়া গেল! কে যেন আজ অন্তরের মধ্যে মঙ্গলরাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে! ইনি যিনিই হউন, ইহা দ্বারা মঙ্গল হইবে।" শ্রীরাধা তাঁহার শ্যামসুন্দরের অচেতন সংবাদ শ্রবণ করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য সকলের আগমনের সঙ্গে কি তাঁহার আগমনের কোন প্রভেদ নাই? অবশ্য আছে। তাঁহার প্রাণের ধন শ্যামসুন্দরের আবার অমঙ্গল কি? যিনি সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল, তাঁর আবার কিসের অমঙ্গল? তবে ভক্ত শ্রীরাধা মনে মনে স্থির করিলেন, "নিশ্চয়ই ইহার অন্তরালে কোন লীলার উদ্দেশ্য আছে। অতএব সেই লীলার বিকাশ দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁর তত্রাগমন। অন্যের দৃষ্টি ও তাঁহার দৃষ্টি এক নহে। তাঁহার দৃষ্টিতে তিনি শ্যামসুন্দরের ফুল্লারবিন্দ মুখমণ্ডল চির দীপ্ত হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিতই দেখিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন।

এ দিকে বৈদ্যরাজ, শ্রীরাধার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যথোচিত বিনয় সহকারে মা যশোমতীকে সান্ত্বনা দান করিয়া, গোপালের নাড়ী পরীক্ষানন্তর, রোগ নির্ণয়ে সাফল্য প্রদর্শন হইতে রোগের ঔষধ নির্ব্বাচন ও ব্যবস্থা পর্য্যন্ত, যেরূপ ক্ষিপ্রতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহাতে উপস্থিত জন-মণ্ডলীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল।

ঔষধের অন্যান্য উপকরণের সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তবে সেই ঔষধ পেষণপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া পান করাইবার জন্য যে জলের প্রয়োজন, তাহা লইয়াই আমাদের সম্বন্ধ বৈদ্যরাজ ব্যবস্থা করিলেন যে, ঔষধের উপযোগি জল সহস্র ছিদ্র সমন্বিত কুম্ভে করিয়া যমুনা হইতে আনয়ন করিতে হইবে।

একি বিষম ব্যবস্থা!—সমবেত জনমণ্ডলী শিহরিয়া উঠিল; মা যশোদা কম্পিতা হইলেন —একি অসম্ভব ব্যবস্থা বৈদ্যরাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু বৈদ্যরাজ যেন সকলের মনোভাব নিমেষ মধ্যে অবগত হইয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"বিষম ব্যবস্থা নহে, অসম্ভব কথা নহে, বাতুলের প্রলাপও নহে; ইহা বিধিসঙ্গত ও সুব্যবস্থা। সহস্রধার সমন্বিত কুম্ভে বারি আনয়ন অসম্ভব নহে। তবে আনেত্রী নির্ব্বাচন করা চাই। এই বিপুল জনতার মধ্যে কি একজনও সার্থকনাম্নী সতী নাই? নিশ্চয়ই আছেন এবং তাঁহা দ্বারাই এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।"

ঠিক কথা! সতীরমণী সামান্যা নহেন! যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ হইতে পারে, অভ্রভেদী হিমাচল ধূলিকণায় পরিণত হইতে পারে, ত্রিভুবনে প্রলয় সংঘটন হইতে পারে,—সংসারমরুতে নন্দনপারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া জগজ্জনকে সুবাসে মোহিত করিতে পারে, প্রেমমন্দাকিনীর অনাবিলধারায় পাপতাপক্লিষ্ট মানবমণ্ডলী স্নাত হইয়া সুখ-শান্তির পবিত্র ক্রোড়ে অবিরাম বিশ্রাম করিতে পারে,—তাঁহার পক্ষে ছিদ্রপূর্ণ কুম্ভে সলিল আনয়ন করা তো তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ কথা। অগ্নি যাঁহার তেজোগর্ব্বের নিকট অবনত হইয়া স্বীয় জ্বালাময়ী শিখা দ্বারা তদীয় অঙ্গরাগ পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক

জগতে সতীচারিত্র্যচন্দ্রিকার অমলধবল জ্যোতি-মহিমা কীর্ত্তন করেন,—ব্রহ্মাদিদেবগণ আজ্ঞাবহ সন্তানের ন্যায় যাঁহার গরিমার নিকট সতত প্রণত, সেই মহাশক্তি সতীর অসাধ্য কি আছে।

বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা শ্রবণে মা যশোদা নিজেই "ব্রজের জীবনের জীবনস্বরূপ ছিদ্রকলসী জীবন" আনয়নার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু বৈদ্যরাজ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "মা, আপনার আনীত জলে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না; আপনি ক্ষান্ত হউন। অন্য কোনও রমণী নির্ব্বাচন করুন।"

নিরুপায় হইয়া তখন মা যশোদা সমবেত রমণীমণ্ডলীর নিকট কাতরে নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। জটিলাকুটিলা মাতাকন্যা উভয়েই বড় গর্ব্বিনী। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্যা, অসমীক্ষ্যকারিণী তাহারাই বড় দর্পে অগ্রসর হইল। কিন্তু দর্পহারী ভগবানের লীলা! অচিরাৎ অকৃতকার্য্যা হইয়া লজ্জা ও অভিমানে নতমুখী হইয়া কবিরাজের প্রতি এইরূপ অসম্ভব ব্যবস্থার জন্য অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভগবানের অনন্ত অসীম সৃষ্টির কণাতুল্য মানব যখন স্বীয় আত্মাভিমানদৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিস্মরণপূর্ব্বক 'অহংকর্ত্তা' এই মোহমুগ্ধ ভাব-প্রণোদনায় এ সংসারে অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত ধরাকে ক্ষুদ্র সরার তুল্য মনে করে—যখন সেই অনন্তজ্ঞানময় অসীম-শক্তিধরের প্রসাদলব্ধ তুচ্ছ জ্ঞান এবং ততোধিক তুচ্ছ শক্তির অপপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহারই অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আকাঙ্ক্ষা করে, যেকালে প্রেয়-মোহ-মদিরোন্মত্ত মানব শ্রেয়ঃ ভুলিয়া আত্মাদরেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া, স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান সহস্রপ্রকারে জনসমাজে প্রচারিত করিতে অতিমাত্র উৎসুক হয়, তখন তাহার এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। এ সংসারের নরনারীর মধ্যে জটিলাকুটিলার সংখ্যা বিরল নহে। ঐ যে অভ্রভেদী সৌধশিখর সমাসীন ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে স্বীয় ধ্বনি প্রতিধ্বনি পরিবৃত হইয়া বিরাজমান দেখিতে পাইতেছি, অথবা ঐ যে লক্ষমুদ্রাদানশীল মহানুভবের কীর্ত্তিকলাপ রাজপুরুষলেখনীবিঘোষিত হইয়া, জনগণের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে, অথবা ঐ যে দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তার অন্যায় পীড়নে শত সহস্র অক্ষম নিরাশ্রয় প্রজামণ্ডলীর আর্ত্তধ্বনি দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে, অনুসন্ধান করুন, ইহাদের মধ্যে জটিলাকুটিলার অসদ্ভাব হইবে না। এ সংসার জটিলাকুটিলারই লীলাক্ষেত্র। আর এখানে তাহাদেরই প্রতিপত্তি।

সংসারে মানুষ আত্মক্ষমতার এতই ভ্রান্ত বিশ্বাসী যে, এই ক্ষমতার উপরেও যে কাহারও ক্ষমতা কার্য্যকরী হইতে পারে অথবা অন্য কোনও উচ্চশক্তির সাহায্য এবং করুণার প্রার্থী তাহাকে হইতে হয়, ইহা সে বিশ্বাসই করে না। সে যে সহস্র চেষ্টাতেও সেই বিশ্বনিয়ন্তার গণ্ডীর বহির্ভূত হইতে পারে না,—হইতে গেলেই যে পদে পদে স্খলন ও পতন অবশ্যম্ভাবি, মোহের ছলনে ভুলিয়া তাহা সে বুঝিতেই চাহে না। কিন্তু যতই প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যে সে অগ্রসর

হইতে থাকে, যতই সে বুঝিতে পারে যে এ-সংসারে সে কর্ত্তা নহে, সে কেবল সেই বিশ্ব-রাজ-প্রদত্ত শক্তির প্রত্যেক কণা তাঁহারই কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আসিয়াছে, প্রতি পদে তাহাকে তাঁহারই শরণ লইয়া,—তাঁহারই করুণা-কণা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, ততই তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান চলিয়া যায়, ততই সে আমাকে এ বিশ্বসংসারের তুলনায় ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্রতর বলিয়া অনুভব করিতে থাকে,—ততই সে ভগবৎকরুণা ব্যতীত আত্মক্ষমতা যে কিছুই নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে থাকে, আর প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে গাইতে থাকে।

"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'!" জটিলাকুটিলা এই আত্মকর্ত্তৃত্বাভিমানেরই প্রতিমূর্ত্তি; তাই তাহাদের এই লাঞ্ছনা।

জটিলা কুটিলাকে অবলম্বন করিয়াই স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ লিখিত হইতে পারে; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর এবং পাঠক সজ্জনের বিরক্তি বৃদ্ধির ভয়ে, তাহা হইতে বিরত হইলাম।

জটিলাকুটিলার দশা দেখিয়া সমবেত রমণী-মণ্ডলী কেহই আর এ অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

তখন মা যশোদা চক্ষে আঁধার দেখিলেন! গোপালের জীবন তো রক্ষা হয় না! ব্যাকুল-ভাবে বৈদ্যরাজকে বলিলেন, "এখন উপায়!" ধীরভাবে বৈদ্যরাজ বলিলেন—আছে মা, উপায় আছে। প্রকৃত নিষ্ঠাবতী সতীর কি এই ব্রজধামে এতই অভাব হইয়াছে? মা যশোদা পুনরায় সমস্ত রমণীগণের পানে তাঁহার কাতর দৃষ্টি-পাত করিলেন; কিন্তু সবই নিস্পন্দ—নিস্তব্ধ। অনেককে তিনি অনুরোধ করিলেন, তাঁহারা সকলেই সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রাণগোপালের জীবন রক্ষায় কি তবে ব্রজ-বাসীর উৎসাহ নাই? তাহা নহে, তবে জটিলা কুটিলার দশা দৃষ্টি করিয়া বৈদ্যরাজের ব্যবস্থার উপর তাঁহাদের বিশেষরূপই সন্দেহ হইয়াছে; যাহা অসম্ভব, তাহাতে সাহস প্রদর্শন করিতে গিয়া বৃথা কেন অপদস্থ হইবেন, এই জন্যই তাঁহারা উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না।

মা যশোদা পুনরায় বৈদ্যরাজের দিকে তাকাইলেন; বৈদ্যরাজ স্মিতমুখে বলিলেন, "তবে আমিই গণনাপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাবে ডাকিয়া তিনি বলিলেন :—

"এক সতী বসতি করে এই ব্রজ মণ্ডলে;
চিন্তে নারে লোকে তারে ডাকে সকলে
রাধা ব'লে।"

রাধানাম্নী যে অলোকসামান্যা রমণী আছেন, তাঁহাতে সতীধর্ম্মতেজঃ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তিনিই এ কার্য্যে সমর্থা।"

বৈদ্যের ব্যবস্থায় লোকে যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিল, এখন লোক নির্ব্বাচনী শক্তি দেখিয়া ততোহধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়াই অনেকের প্রতীতি জন্মিল; ব্রজমণ্ডলে 'কলঙ্কিনী' বলিয়া যাহাকে প্রত্যহ জটিলাকুটিলার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, সেই রাধা ছিদ্রকুম্ভে বারি আনয়ন করিবে, জটিলাকুটিলার রসনা এ উদ্ভট প্রস্তাবে কিরূপ বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অনেকে এস্থলে আপত্তি তুলিতে পারেন যে, রাধা তথায় উপস্থিত থাকিয়াও যশোদার কাতরতায় এ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে উদ্যোগিনী হন নাই কেন? তাহার কারণ আছে। প্রকৃত সাধুগণের 'জাহির' হইবার প্রবৃত্তি বড়ই কম থাকে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন "প্রকৃত সাধু ব্যক্তি মশারির মধ্যে লেপমুড়ি দিয়া স্বীয় ভজন সাধন করিতেছেন,লোকে ভাবিতেছে—ব্যাটা এত বেলা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে,—ঐ ভাল।" সুতরাং একান্ত অনুরুদ্ধ না হইলে, লীলা অথবা কোন অমানুষিকী শক্তির পরিচয় দিতে তাঁহারা একান্তই অনিচ্ছুক। বুজরুকী দেখান বুজরুকের কার্য্য। আজ যদি তাঁহার পরম দেবতা কৃষ্ণধনের এ অবস্থা না হইয়া, অন্য কাহারও হইত এবং তিনি বুঝিতেন যে, এরূপ ব্যবস্থানুযায়ি না হইলে ঐ ব্যক্তির জীবনান্ত ঘটিবে, তাহা হইলে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্তও হইতে পারিতেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি আগাগোড়া লীলা বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস; সুতরাং তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তদ্গত চিত্তে কেবল বিশ্ব-নটের এ নব নাট্যের অঙ্কগর্ভাঙ্কাভিনয়ই সাগ্রহে দেখিতেছিলেন, এমন সময় কবিরাজের নির্দ্দেশ মতে মা যশোদার কাতর অনুরোধ তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইল। তখন তিনি আর কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন? প্রশান্তভাবে ছিদ্রকুম্ভ লইয়া তিনি বারি আনয়নার্থে সখী সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। সমবেতা প্রাকৃতা রমণীমণ্ডলীর বিদ্রূপকটাক্ষ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না! জটিলা কুটিলার বাক্যবাণ তাঁহার ধৈর্য্যকে টলাইতে পারিল না। তিনি মা যশোদার এ অনুরোধ ভগবন্নির্দেশস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে কেবল বলিতে লাগিলেন, "হে বিপদভঞ্জন, লজ্জানিবারণ ভক্তবৎসল শ্রীমধুসূদন, তুমি জান আমি এ ছিদ্র কুম্ভে বারি আনয়নে সক্ষম কি না,—তুমিই জান আমি মনে প্রাণে তোমাকে ডাকিতে সক্ষম কি না,—তুমিই জান এ হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি তোমার অভিমুখী কি না,—তুমিই জান, প্রভো, আজ যে গুরুভার আমার উপরে সমর্পণ করিতেছ, আমি ক্ষুদ্রা নগণ্যা রমণী তাহা বহনের উপযুক্তা কি না। ছিদ্রকুম্ভে বারি আনয়ন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু, প্রভো, তোমার পক্ষে তো তাহা অতি তুচ্ছ! যে তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এ জগতে, প্রতি পলে, পলে সংঘটিত হইতেছে, যে তোমার অঙ্গুলিহেলনে তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যে ধূলিকণায় মিশিয়া যাইতেছে, যে তোমার কৃপাকণালাভে

"অন্ধ চক্ষু পায় খঞ্জে হেঁটে যায়
বোবায় গীত গায় বধির শুনে হে।
আবার শুষ্ক তরুচয় মঞ্জরিত হয়
ফল ফুলে কি বা শোভিত হয়।"

যে তোমার প্রসাদে ক্ষুদ্র সূচিচ্ছিদ্র পথে করির গমনাগমন সম্ভব, সেই তোমার পক্ষে ছিদ্র কুম্ভে সলিল-স্থিতি একটা বেসী কথা কি? আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বুঝি না,—কেবল জানি—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

আমার মানও নাই,—অপমানও নাই - সবই তোমার। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হউক।"

শ্রীরাধা ঈদৃশী ভাবনা করিতে করিতে, কালিন্দী-তটে উপনীত হইলেন; ধীরে ধীরে জলে অবতরণ পূর্ব্বক, তাঁহার সেই চিরারাধ্য শ্যামসুন্দরকে স্মরণ করিয়া 'জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়' রবে কলসী পূর্ণ করিলেন,—দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তের পূর্ণহৃদয়বলে কলসী উত্তোলিত হইল।

"জয় শ্রীরাধার জয়", "জয় শ্রীরাধার জয়" ধ্বনিতে যমুনাপুলিন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণ পুলকিত অন্তরে করতালি দিতে দিতে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন—

'জয় শ্রীরাধার জয়।'

সহস্রধার কলসী পূর্ণই রহিয়াছে! বিন্দুমাত্র জলও তাহা হইতে পড়ে নাই।

'জয় শ্রীরাধার জয়!"

সখীগণ আনন্দোন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন -

"জয় শ্রীরাধার জয়।"

ভক্তবৎসল ভগবানের করুণালীলা দেখিয়া শ্রীরাধা প্রেমবিহ্বল অন্তরে উদ্বেল হইয়া মনে মনে সহস্রবার বলিলেন "জয় প্রভু, তোমার জয়।" অমনি সখীগণের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া কুম্ভকক্ষা শ্রীরাধা সখীগণের সমীপে আসিয়া বলিলেন; ছি! ছি! ছি! সখী, তোরা কি বলিতেছিস্? কার জয় তোরা গাহিতেছিস্?—রাধার জয়? ছি, ছি, ছি! তোরা কি ভ্রান্তই হইয়াছিস্। প্রাণভরে মুক্তকণ্ঠে গা' সখি—

"সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!"

যাঁর ইচ্ছায় এ সংসারের জয় পরাজয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, তাঁর জয় গা' সখী, তাঁর জয় গা!

সখীগণ প্রবুদ্ধা হইলেন, তাঁহারা শ্রীরাধার তিরস্কারের সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া দ্বিগুণ আনন্দে প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাধার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাইয়া উঠিলেন—

"জয় ভক্তের ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!"

সে জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, যমুনাপুলিন মুখরিত হইল, বন উপবন হইতে গীত হইল—

"জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়।"

পশুপক্ষী বৃক্ষলতা গাইয়া উঠিল,

জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!

যমুনা আনন্দকলতানে নাচিয়া নাচিয়া গাইতে লাগিল—

"জয় ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!"

সে ধ্বনি নন্দপুরীতে প্রবেশ করিয়া সকলের কাণে কাণে বলিতে লাগিল—

"জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!"

সমবেত জনমণ্ডলী চমকিত হইল,—বিস্মিত হইল; পরক্ষণেই সেই বিশাল জনসংঘ হইতে মহানাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল—

"জয় শ্রীরাধা সুন্দরীর জয়"—"জয় সতী শিরোমণি শ্রীরাধাসুন্দরীর জয়!" শ্রীরাধা সচ্ছিদ্র পূর্ণকুম্ভ কক্ষে সখীগণ সমভিব্যাহারে নতমুখী হইয়া নন্দপুরীতে প্রবেশ করিতেছেন, ব্রজবাসী জয়ধ্বনিতে তাঁহারই সম্বর্দ্ধনা করিলেন,—সখীগণ প্রতিধ্বনি করিলেন—

"জয় শ্যামসুন্দরের জয়, জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়!" উভয় জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল—"জয় রাধা কৃষ্ণের জয়!" স্বর্গে দেবদূতগণ মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে লাগিলেন—

"জয় রাধাকৃষ্ণের জয়।"

গোপাল সুস্থ হইয়াছেন, বৈদ্যরাজ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন; ব্রজের গোপগোপী বিস্ময়বিহ্বল-হৃদয়ে আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ভগবানের লীলারহস্য বুঝিতে পারিল—দ্বিগুণ উৎসাহে লক্ষকণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হইল—

"জয় রাধাকৃষ্ণের জয়।"

ভক্তশিরোমণি কৃষ্ণপদার্পিতপ্রাণা শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন হইল; লোকে বুঝিতে পারিল শ্রীরাধা সামান্যা নহেন। জটিলাকুটিলার দর্প চূর্ণ হইল। বৈষ্ণব কবি এই লীলাপ্রসঙ্গে জগৎকে চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক প্রদর্শন করিলেন, "এ সংসারে ভগবদ্ভক্তের রক্ষার জন্য শ্রীভগবানের মঙ্গল হস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত; নির্ভরশীল ভক্ত কখনও ভগবৎ করুণালাভে বঞ্চিত হন না। ভগবানে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া, অহংজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া, তদীয় করুণা-প্রার্থী হইয়া, একনিষ্ঠভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে, মানুষ আপাতদুষ্কর কার্য্যও অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, আত্মাভিমানী স্বয়ংসিদ্ধ অহমিকাপরায়ণ ব্যক্তিরা সংসারে সফলকাম হইতে পারে না; আর ভক্ত অমানুষিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও, সংকল্প হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কেবল গাইয়া থাকেন—

জয় শ্রীভক্তবৎসল ভগবানের জয়!

আমরা প্রস্তাব শেষ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি "কলঙ্কভঞ্জন," কি হয় অবজ্ঞাত হইবার যোগ্য? যদিও ক্ষীণশক্তি ও হীনজ্ঞান ক্ষুদ্র আমার হস্তে ইহার সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও উদ্ভাসিত হয় নাই, তথাপি জিজ্ঞাসা করি, এ উপাখ্যান লোকশিক্ষার উপযোগি কি না—ইহা দ্বারা—ইহার মর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা সমাজের হিত না অহিতের সম্ভাবনা? আমাদের সজ্জন পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে কি একজনও এ উপাখ্যান পাঠের পর এই ক্ষুদ্র লেখকের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আনন্দাপ্লুতহৃদয়ে বলিতে পারেন না "ধন্য বৈষ্ণব কবি! যে তোমার ভক্তিনির্ঝরিণী হইতে ঈদৃশী প্রেম-রস-পূর্ণা কথা স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইয়াছে! কেহই কি নির্ভরশীলতার সহিত আবেগপূর্ণ অন্তরে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সেই বিশ্বপতির শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে বলিতে পারেন না,—

"জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়!
জয় তদ্‌গতচিত্ত ভক্ত শিরোমণির জয়!"?

আসুন তবে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হইয়া, এক মনে, এক প্রাণে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া, নিষ্ঠার সহিত গাইতে থাকি—

জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়!
জয় জয় দীনবন্ধু ভক্তের অভয়!
জয় জয় বিঘ্নহারী ভবের কাণ্ডারী!
কাঙ্গালের সখা জয়, জয় দর্পহারী!
করুণানিধান প্রভু জয় বিশ্বময়!
বিশ্বময় হোক সদা তব জয় জয়!"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শব্দবিচার। *

(১)

"কোনও" না "কোন।"

ভাষার সম্পদ্ বস্তুবোধক, বিষয়জ্ঞাপক, ও ভাব প্রকাশক শব্দের সমুচিত বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষা, ইংরেজী ও ফরাশী প্রভৃতি রাজভাষার ন্যায়, শিল্প, বিজ্ঞান ও দর্শনাদি শাস্ত্রের শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধিশালিনী না হইলেও, নিত্যব্যব-হার্য্য সাধারণ শব্দসম্পদে দরিদ্রা নহে। কিন্তু ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এই ক্রম-বৃদ্ধি-শীলা স্বভাব-সুন্দর সচ্ছলা ভাষা যাঁহাদিগের প্রাণাধিক পূজ্য বস্তু, তাঁহারা, অন্যপ্রকারে অতি বিচক্ষণ লোক হইয়াও, উহার শব্দপ্রয়োগে, সকল সময়ে, আশার অনুরূপ সাবধান নহেন।

সাবধানতার অভাব অনেকপ্রকার। (১ম)—এক অর্থের শব্দকে আর এক অর্থে ব্যবহার করা ; যথা—"নিধুবন," "অপর্য্যাপ্ত," "রহস্য," "প্রশস্ত," সমূহ ও "কথঞ্চিৎ" প্রভৃতি শব্দের অপপ্রয়োগ। অপপ্রয়োগের কথাই আগে কহিব।

"নিধুবন" শব্দ, সংস্কৃতসাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হইতে, কালিদাস, ভারবি, জয়দেব ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কবিসম্প্রদায়ের সুপরিচিত কম-মনোহর রচনায় চিরকাল কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা শব্দার্থবিজ্ঞ সুশিক্ষিত পাঠকমাত্রই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা দশ জনের কাছে বিশিষ্ট সম্মান পাইয়াছেন, এবং যাঁহারা ভক্তিরসের গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা পুর-সুন্দরীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাও, "তাল-বন", "তমাল বন", "ভাণ্ডীর বন" ও 'নিকুঞ্জবন' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে শ্রুতিমনোহর "নিধুবন" শব্দ মনঃকল্পিত অর্থে চালাইয়া আসিতেছেন। শব্দের প্রকৃত অর্থ বিষয়ে এই পরিমাণ অস-তর্কতা জাতীয় সাহিত্যের মঙ্গলজনক কি ?

"পর্য্যাপ্ত" শব্দের চির প্রচলিত অর্থ "প্রচুর" —"যথেষ্ট"। উহার আর দুই একটা অপ্রচলিত অর্থ থাকিলেও, উল্লিখিত "প্রচুর" অর্থই সাহিত্যে পরিগৃহীত। "পর্য্যাপ্ত" এই শব্দটি, বোধ হয়, মহাকবি কালিদাসের বড়ই

* "উড়িষ্যাচিত্র"-রচয়িতা প্রথিতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, "বাঙ্গলভাষা" নামক সাহিত্যপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রভৃতি কতিপয় সাহিত্যসুহৃত্তের বহু দিনের আগ্রহে "শব্দবিচার" নামক ক্রম-প্রকাশ্য প্রবন্ধমালা অবতারিত হইল। যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্য লইয়া ব্যাপৃত, তাঁহারা দয়া করিয়া এই প্রবন্ধগুলির সমস্ত কথা প্রসঙ্গে একটুকু আলোচনা করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রীতিকর ছিল, এবং তিনি উহাকে ঐ এক 'প্রচুর' অর্থেই পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন'। যথা কুমারসম্ভবের তৃতীয় অধ্যায়ে,—

"পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরংপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।"

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ে গৌরীর বর্ণনায়,—

"পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।"

কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যের কোন কোন মহারথ ব্যক্তি স্বকীয় রচনার নৈপুণ্য ও মধুরতায় দেশে বিদেশে বিখ্যাত হইয়াও, "পর্য্যাপ্ত" অর্থে, পুনঃ পুনঃই, "অপর্য্যাপ্ত" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—"কেমন ভাই, তোমার তৃপ্তি হইয়াছে?—অপর্য্যাপ্ত"। "যাদবের অর্থ বিত্ত কেমন আছে?—অপর্য্যাপ্ত।" পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, আমি মূল লেখা হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ, যাঁহার রসময়ী লেখায় এই দোষ প্রদর্শন করিতেছি, তিনি নাট্যসাহিত্যে প্রতিভার বিগ্রহ ছিলেন; এবং তাঁহার পবিত্র স্মৃতিকে আমি অদ্যাপি প্রাণপ্রিয় বন্ধু জ্ঞানে প্রীতির সহিত পূজা করি।

"রহস্য" শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ—গূঢ়তত্ত্ব,—গুপ্ত কথা, অথবা গোপনে যাহা সংঘটিত হয়। শব্দটি এই অর্থেই, ভবভূতি ও ভারবিপ্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যিকের লেখায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা ভবভূতির উত্তরচরিতে,—

"পুরো বা পশ্চাদ্বা তদিদমবিপর্য্যাসিতরসং।
রহস্যং সাধুনামনুপধিবিশুদ্ধং বিজয়তে॥"

আমি এ স্থলে দুইটি পংক্তিমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ পাঠকদিগের মধ্যে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দুই শত পংক্তি উদ্ধৃত করিতে পারেন। কিন্তু "রহস্য" শব্দের ঐ সরস "হস্য" ভাগটুকু আধুনিক বাঙ্গালায় কিরূপে ইহার একটা অভিনব হাস্যজনক অর্থ ঘটাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

প্রকৃতিবাদ নামক অভিধানের সংকলনকারীরা সাহিত্যে গুরুস্থানীয়। তাঁহারাও "রহস্য" শব্দের বিবিধ অর্থের সহিত পরিহাস ও কৌতুক শব্দকে উহার প্রতিরূপ শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং প্রমাণার্থ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। যথা প্রকৃতবাদে,—রহস্য শব্দের অর্থে,—

"অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

কিন্তু, এ স্থলে নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতিবাদরচয়িতা মূল শ্লোকের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, প্রকৃত পাঠ তাহা নহে। মূল শ্লোকে "রহস্য" পদ নাই,—আছে "রসস্য" পদ, এবং তাহাই অর্থসঙ্গত এবং স্বারসিক ব্যবস্থার অনুগত। মূল শ্লোকটি এইরূপ,—

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥"

বহুদিন হয়, এই শ্লোকটির প্রকৃত পাঠ পরিগ্রহের উদ্দেশে তিন চারি খানি উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহ মিলাইয়া দেখিয়াছিলাম। তখন দেখিয়াছিলাম, সকল পুস্তকেই এক পাঠ,—

সকল পুস্তকেই "রসস্থ" পদ আছে, কোন পুস্তকেই "রহস্য" পদ নাই। পাঠের ঐ রূপ একতা দর্শনে নিঃশঙ্ক হইয়া বান্ধবের প্রয়োজনার্থ আমি কবিতাটির অনুবাদ করিয়াছিলাম। সে অনুবাদ এই,—

যত দুখ আছে বিধি দাও তাহা সহিব,
মরমে পুড়িব তবু মুখে নাহি কহিব ;—
অরসিকে রসালাপ এ যে এক যাতনা,
ললাটে লিখ' না মোর, লিখ' না হে, লিখ' না ॥

পাঠক ইহাতে দেখিতেছেন যে, "রহস্য" শব্দের এরূপ অর্থান্তর-সংঘটন, প্রকৃতিবাদের নামমাহাত্ম্যেও, সমর্থিত হয় না।

"প্রশস্ত" শব্দের অর্থান্তর-সংঘটনও সর্ব্বতোভাবে দোষাবহ। উহার একটি মাত্র অর্থ আছে, সে অর্থ—"প্রশংসনীয়" অথবা "শ্রেষ্ঠ"। যথা মনুসংহিতায়,—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি"।

অর্থাৎ দ্বিজাতির পক্ষে, সবর্ণা রমণীই প্রশস্তা। কিন্তু বাঙ্গালায় "প্রশস্ত" বলিলে এখন বুঝায় "বিস্তৃত" অথবা "বিস্তার-যুক্ত"। ইহা কিরূপে ঘটিয়াছে, পাঠক তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? আমি যত-দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস যে, "প্রস্থ" শব্দের শ্রুতিভ্রমেই প্রস্থবিশিষ্ট অর্থে এই নূতন "প্রশস্ত" শব্দের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে, এবং প্রথম লেখকের আকস্মিক ভ্রম সমস্ত সাহিত্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যথা,——

"দৈর্ঘ্যে * প্রস্থে সমানঞ্চ ন কুর্য্যান্মন্দিরং বুধঃ।"

এখানে অনেকে কুণ্ঠিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "প্রশস্ত" শব্দের এই অর্থ পরিত্যাগ করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যিকেরা কিরূপে রূপ-বর্ণনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যখন উপন্যাস লিখিতে গেলে, নিশ্চয়ই নায়কের কথা লিখিতে হয়, এবং নায়কের কথা লিখিতে গেলে, নিশ্চয়ই তাহার ললাট ও বক্ষঃস্থলের বিস্তৃতি বর্ণনা না করিলে চলে না, তখন "প্রশস্ত" শব্দের পরিহার হইলে, প্রাণরক্ষার উপায় কি? আমি এস্থলে প্রত্যুত্তরে বিনয়ের সহিত বলিব যে "পরিসর" শব্দ, বহুকাল হইতেই, "বিস্তৃত" ও "বিস্তার" এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। শব্দসুখ-বিলাসী সরস-মধুর সুবিখ্যাত কবি বঙ্গীয় জয়দেব শব্দটিরে এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মহাজন কবিরাও "পরিসর" শব্দকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছেন। জয়দেবের পংক্তি দুইটি উদ্ধৃত করিতে সাহস পাইলাম না। পাঠক সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

"সমূহ" শব্দের চির প্রচলিত অর্থ—সমুদায়, —রাশি—সম্যক্ তর্ক। শাব্দিক-শিরোমণি অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—

"সমূহ-নিবহ-ব্যূহ সন্দোহ-বিসর-ব্রজাঃ।
স্তোমৌঘ-নিকরব্রাত-বার-সঙ্ঘাত-সঞ্চয়াঃ ॥
সমুদায়ঃ সমুদয়ঃ সমবায়শ্চয়ো গণঃ।
স্ত্রিয়াস্তু সংহতি বৃন্দং নিকুরম্বং কদম্বকম্ ॥"

---

* আমি এই পংক্তিটি প্রকৃতিবাদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু প্রকৃতিবাদে আছে "দীর্ঘে"। "দীর্ঘে" পদটি সুসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে আমার সংশয় আছে।

টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"কদম্বান্তং দ্বাবিংশতিঃ সমূহে।"

অর্থাৎ "সমূহ" হইতে "কদম্ব" পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি শব্দ বহুত্ববোধক বিশেষ্য শব্দ। যথা, মনুষ্যসমূহ, দোষ-সমূহ, অথবা নক্ষত্রসমূহ, গুণসমূহ। 'সমূহ' শব্দের এই প্রকারের ব্যবহার সহস্র বাক্যদ্বারা সমর্থিত রহিয়াছে। কিন্তু, ইদানীং কতিপয় বিজ্ঞ লেখক এই শব্দটিকে "সম্প্রতি" অর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে, সম্প্রতি তাহার এমন না করিয়া অমন করা কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থলে, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে, "সমূহ আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে," "সমূহ তাহার এমন না করিয়া অমন করা কর্ত্তব্য", এইরূপ লিখিয়া ফেলিতেছেন। শব্দার্থের প্রবাহকে একদিক্ হইতে আর একদিকে এইরূপ সবলে টানিয়া লওয়া সুসঙ্গত কি না, তাহা বিজ্ঞ সাহিত্যিকদিগের বিচার্য্য।

"কথঞ্চিৎ" পদের একমাত্র অর্থ—কোন প্রকারে,—কোন উপায়ে—কোন সুযোগে, —কোন রূপে। এই অর্থ ব্যাকরণসিদ্ধ, এই অর্থ চিরকালীন-ব্যবহারসিদ্ধ, এবং এই অর্থই কাব্যসাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেই সাধু ভাষাকে অধিকতর সাধু করিতে যাইয়া, "কথঞ্চিৎ" পদটিকে "কিঞ্চিৎ" অথবা "কিছু" অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। ইহা নিতান্তই দূষ্য। সাধারণ লোকের লেখায়ও এই প্রকার দৃষ্টিকটু দোষের পরিহার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা অসাধারণ-পদ প্রতিপত্তিশালী,—দেশের বহুলোক যাঁহাদিগের লেখা পড়িয়া ভাষা শিক্ষা করে, তাঁহাদিগের দায়িতা কিরূপ গুরুতর, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

(২য়)—শব্দার্থের বৈপরীত্য যেমন অসাবধানতার এক পরিচয়, বর্ণবিন্যাসের উচ্ছৃঙ্খলতাও তেমনই উহার আর এক পরিচয়। যথা, "ধ্বংস" শব্দ চিরকাল দন্ত্য সকারান্ত; ইদানীং অনেকে উহাকে, গায়ের জোরে, তালব্যান্ত প্রয়োগ করিয়া, "ধ্বস্ত" ও "বিধ্বস্ত" প্রভৃতি শব্দের বেলায় কিরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহা ভাবিয়া বিপন্ন হইতেছেন। "কোন" লিখিতে একটি "ও" কার যোগ করিয়া লওয়াও ঐরূপ অসাবধানতা অথবা ইচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তপ্রিয়তারই বিশিষ্ট নিদর্শন।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "কোন" লিখিতে ঐরূপ একটা "ও" কার যোগ দিয়া 'কোনও' করা হয় কেন, তাহা হইলে, অনেকেই প্রত্যুত্তরে বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় 'ফল', 'জল', 'কল', 'ছল' এবং 'ঘট', 'পট' ও 'শঠ', 'মঠ', প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দেরই অন্ত্য 'অ' কার উচ্চারিত হয় না বলিয়া, সেই উচ্চারণের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে, 'কোন' না লিখিয়া 'কোনও' লিখা হয়; সুতরাং ইহা সঙ্গত।

কিন্তু, যদি একটুকু প্রবিষ্ট হইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে পরিলক্ষিত হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষার অকারান্ত শব্দের মধ্যে বহু শব্দেরই অন্ত্য 'অ' কার উচ্চারিত হইয়া থাকে; সুতরাং অন্ত্য 'অ'কারের উচ্চারণ বিধানের জন্য ঐরূপ 'ও'কার যোগ কোন প্রকারেই সঙ্গত

নহে। যে সকল শব্দের অন্ত্য 'অ'কার অবশ্যই উচ্চারিত হইবে, আমি দিক্‌প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি —

(১) যুক্তাক্ষর-সম্বলিত দ্বিস্বর শব্দ মাত্রেরই অন্ত্য 'অ'কার উচ্চার্য্য। যথা, 'স্পষ্ট', 'নষ্ট', 'কষ্ট', 'দুষ্ট', 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্ম', 'মর্ম্ম', 'চর্ম্ম'; 'স্পর্শ', 'হর্ষ'; 'নৃত্য', 'বাদ্য' প্রভৃতি।

(২) যে সকল শব্দ যুক্তাক্ষর-সম্বলিত নহে, তন্মধ্যে 'চির', 'নব', 'স্বন' 'ভব,' এবং 'ছোট', 'খাট', 'এগার,' 'বার,' 'পনর', 'ষোল', "ভাল" প্রভৃতি শব্দেরও অন্ত্য 'অ'কার অবশ্যই উচ্চারণ করিতে হয়।

(৩) যে সকল অকারান্ত শব্দের উপধা স্থলে 'ত' 'য়' 'ড়', 'ঢ়' ও 'হ' থাকে, তন্নিচয়ের অন্ত্য 'অ'কারও উচ্চারণ না করিয়া উপায় নাই। যথা 'ত'কারোপধ,—অত, এত, যত, তত, কত, শত, খত, মত, হত, গত, নত, রত, সতত, অমৃত। 'য'কারোপধ*—রমণীয়, গোপনীয়, স্বর্গীয়, বঙ্গীয়; দেয়, নেয়,§ গেয়, পেয়। 'ড়'কারোপধ,‡—দড়, বড়,। 'ঢ়'কারোপধ—গাঢ়, দৃঢ়। 'হ'কারোপধ,—স্নেহ, দেহ, মোহ, লৌহ, বরাহ, বিরহ, কটাহ, কলহ, বিবাহ, নির্ব্বাহ, মাতামহ, পিতামহ।

এইরূপ পর্য্যালোচনায় দৃষ্ট হইবে যে, যে সকল দ্বিস্বর শব্দের উপধা স্থলে 'ন'-কার আছে, তাহার অন্ত্য 'অ'কার সকল সময়েই ভাষার অপরিহার্য্য গতিতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা,—যেন, মেন, হেন, কেন। বাঙ্গালায় এ সকল শব্দের প্রয়োগ অনন্ত; সুতরাং বাক্য সংকলন করিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আমি তথাপি দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত করিব।

(১) "ওহে দেখ' যেন অন্তকালে না হই বঞ্চিত"।

(২) "তুমি মেন, বড়ই নির্লজ্জ।"

(৩) "হেন পুত্র যার ঘরে, সবে তারে ভয় করে"
"এ হেন সুখের কালে * * * "।

আমরা "কেন" শব্দের বাক্য সংকলন করিলাম না। কেন করিলাম না, তাহা পাঠককে বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ স্থলে সম্মাননার সহিত জিজ্ঞাসা করিব যে, যেন, হেন, কেন, মেন প্রভৃতি নকারোপধ দ্বিস্বর শব্দ মাত্রেরই যখন অন্ত্য 'অ'কার উচ্চারিত হইয়া থাকে, তখন দ্বিস্বর ও ন-কারোপধ 'কোন' শব্দের অন্ত্য 'অ'কার উচ্চারিত হইবে না কেন? আর, যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, "কোন" শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হইবে, তাহা হইলে উহার সঙ্গে আবার একটা 'ও'কার যোগ করিয়া দিতে যাইব কার কোন্ প্রয়োজনে? যদি 'কোন' লিখিতে 'ও'কার যোগ করিয়া 'কোনও' শব্দের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে 'কেন' লিখিতেও নিশ্চয়ই একটা 'ও'কার যোগ করিয়া 'কেনও' লিখা একান্তই আবশ্যক হইয়া উঠে না কি।

---

* ভয়, লয়, সংশয়, আশয় প্রভৃতি কতিপয় শব্দ বর্জ্জিত।

§ এই সকল পদ যখন বাঙ্গালায় ক্রিয়া পদ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন অন্ত্য 'অ'কার উচ্চারিত হয় না।

‡ 'হাড়,' মাড়, পাড়, প্রভৃতি কতিপয় শব্দ বর্জ্জিত।

যাঁহারা সংস্কৃতরীতির ভক্ত উপাসক, তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, সংস্কৃতে 'কোঽপি' বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা বুঝাইবার জন্যই বাঙ্গালায় 'কোনও'। 'কোনও' পদের 'ও'কারটি ঐ 'অপির' অনুবাদ। এ উত্তম কথা। তবে, এস্থলে এই জিজ্ঞাস্য যে, যেখানে সংস্কৃতের সেই 'অপি' প্রয়োগের প্রয়োজন না থাকে, সেখানে অর্থাৎ কশ্চিৎ পদের অনুবাদেও কি বাঙ্গালায় ঐ 'ও'-কার দিতে হইবে? কথাটা যাদব ও মাধবের কথোপকথনে বুঝাইতে যত্ন পাইব।

যাদব কহিতেছেন,—মহাশয়, এ কথা কে বলিল?

মাধব প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—কশ্চিৎ অর্থাৎ 'কোন' সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহিয়াছেন।

যাদব নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—'কোনও' ব্যক্তি নহে। 'কোনও' ভদ্রলোকের মুখে এমন কথা সম্ভবে না।

এখানে দৃষ্ট হইবে যে, যে স্থলে (Emphasis) অর্থাতিশয্য দ্যোতন করা আবশ্যক, সেখানেই 'কোন' শব্দের সঙ্গে 'ও' কার যোগ করিয়া "কোনও" পদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে তাদৃশ Emphasis অর্থাৎ অর্থাতিশয্যের প্রয়োজন নাই, সেখানে বিনা কারণে 'ও' কার যোগ করিয়া 'কোন' স্থলে 'কোনও' লেখা কদাপি বিচারসম্মত নহে।

বাঙ্গালির বাঙ্গালা ভাষা বিশেষ একটা গৌরবের বস্তু। বঙ্গের সমস্ত সুকৃতিসন্তান দেশের এই দুর্লভ সম্পত্তির সম্মানরক্ষায় সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নশীল হইলে, জাতীয় গৌরব অনেক বাড়িবে।

কণিকা।

ভুল।

আসিবার কালে তুমি দিয়েছিলে মোরে।
বাঁধিয়া হৃদয়খানি কি জানি কি সুরে;
সে কি আছে? পথে পথে হয়ে গেছে ভুল,
বিদেশে আসিয়া হায় হয়েছি আকুল!

প্রকৃতি।

শরৎ, বসন্ত, বর্ষা—কত সন্ধ্যা ভোরে,
যখনি দেখিতে চাই দেখি শুধু তোরে
—কল্যাণী জননী মোর—স্নেহ করুণার
মন্দাকিনী স্রোতোধারা,—অমিয় আধার।
নয়নে সুনীল নভঃ, মুখে ভাসে হাসি;
চরণনলিন নিয়ে কুসুমের রাশি।

প্রকৃতি পুরুষ।

প্রাণারাম প্রেমময়—কেন ডাকে নর
দেখেছে কি কেউ কভু কেমন ঈশ্বর?
প্রকৃতি করিছে তোরে কতই যতন,—
মা মা বলে কেঁদে ওরে উঠিবে যখন,
দেখিবে জননী তোরে লইয়াছে বুকে;
কোথা তোর বিশ্বপতি মত্ত কোন সুখে!
জননীর পূজা কর বিশ্ববাসী নর,
সে থাকুক বিশ্ব নিয়ে ব্যস্ত নিরন্তর।
বিশ্ব জননীর কোলে শুয়ে থেকো তুমি
দেখিও অন্তরে তাঁর প্রিয়তম স্বামী।

শ্রীআদিনাথ দাস।

চতুর্থ খণ্ড] পৌষ ও মাঘ। ১৩১২ সন। [৯ম, ১০ম সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

৯।১০

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

পৌষ ও মাঘ মাসের বান্ধব প্রকাশিত হইল। ফাল্গুন ও চৈত্রের সংখ্যা যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই বাহির হইবে। গ্রাহকবর্গের কৃপা ও সহানুভূতিই বান্ধবের একমাত্র সম্বল। ভরসা করি আমরা তাহাতে বঞ্চিত হইব না। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ১৩১২ সনের বার্ষিক মূল্য দেন নাই, তাঁহারা শীঘ্র নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৴০	৩।৴০
ষাণ্মাসিক	২৲	৶০	২৶০

পশ্চাদ্দেয়।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৪৲	।৴০	৪।৴০
ষাণ্মাসিক	২॥০	৶০	২॥৶০

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারি-সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হয় না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। গ্রাহক-নম্বর ব্যতিরেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যেও বড় অসুবিধা ঘটে। [illegible] গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে কিংবা মূল্য প্রেরণ করিবার সময় দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না। নূতন গ্রাহকেরা "নূতন" এই শব্দের উল্লেখ করিবেন।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

☞ কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

বান্ধব-কুটীর,—ঢাকা।
১৩১১ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ
বি, এ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

দার্শনিক মতের সমন্বয়।

[১০]

আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,সাংখ্য লৌকিক ঈশ্বর স্বীকার না করাতে কোন দোষের বিষয় হয় নাই। বস্তুতঃ বেদান্তের ঈশ্বর ও সাংখ্যের পুরুষ- ভেদ অতি সামান্যই। আমরা আরো দেখিয়াছি যে, সাংখ্য যে প্রকৃতিকে স্বাধীন-সত্বাবতী বলিয়াছেন, তাহা কথার কথা মাত্র এবং তাহার অর্থ এরূপ নহে যে, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতত্বে প্রকৃতির পুরুষ-নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব আছে। সাংখ্যের ঈশ্বরস্বীকার বিষয়ে যে কএকটী যুক্তি আছে, তন্মধ্যে আমরা দুইটি যুক্তির আলোচনা করিয়াছি; অদ্য অন্য যুক্তিদ্বয়ের আলোচনা করিয়া, বেদান্ত ও সাংখ্যের মৌলিক একতা আরো দৃঢ়তর-রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাংখ্যের সেই পুর্ব্বোদ্ধৃত বিখ্যাত সপ্তদশ কারিকায় পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ আমরা আর একটি যুক্তি দেখিতে পাই। সেটি এই—"সংঘাত পরার্থত্বাৎ"। যাহা সংহত পদার্থ, তাহা পরের প্রয়োজন সাধন করে। প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যগুলি সংহত পদার্থ; সুতরাং ইহারা ইহাদের অপেক্ষা ভিন্ন পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে, অতএব পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এ কথার সহিতও বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। অদ্বয়বাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করও এই যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে "মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে" আমরা এই কথাই দেখিতে পাই। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি .....আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি"—ইত্যাদি স্থলে, জড়ের ক্রিয়াসমূহ চেতনের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্যই অবস্থিত, এই তত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদান্তেরও যুক্তি এইরূপ। আমরা এতদ্-দ্বারা ইহাই পাইতেছি যে, জড়বর্গের প্রবৃত্তি, নিজের প্রয়োজনের জন্য হইতে পারে না। পুরুষচৈতন্যের প্রয়োজন উদ্দেশেই জড়বর্গের প্রবৃত্তি। "ঘটাদিবদচেতনস্যৈবার্থিত্বাভাবাৎ ন স্বার্থাঃ প্রবৃত্তয়ঃ, অতএবার্থিত্বেনাত্মা সিধ্যতি" (আনন্দগিরি)। পাঠক এ বিষয়ে শঙ্করের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় দেখুন্:—"পাণি-পাদাদয়ঃ জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাবনিমিত্ত স্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয় সদ্ভাবে লিঙ্গানি" (গীতাভাষ্য, ১৩।১৩) আনন্দগিরি ভাষ্যের এইরূপ অর্থ করিতেছেন:—"জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণঃ শক্তিসন্নিধিমাত্রেন প্রবর্ত্তনসামর্থ্যাৎ তৎসত্বং নিমিত্তী-কৃত্য স্বকার্য্যবন্তো ভবন্তি পাণ্যাদয়ঃ"। অর্থাৎ জড় ও ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি স্বার্থজন্য হইতে পারে না; ইহারা আত্মারই প্রয়োজন

সাধনোদ্দেশে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্যও ত এই কথাই বলিয়াছেন। "পুরুষার্থং করণোদ্ভবঃ" (সাংখ্যদর্শন, ২।৩৬)। সাংখ্যমতে এই "পুরুষার্থ" কি? এই পুরুষার্থ কথাটি দ্বারা আমরা আর একটি চমৎকার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব। সাংখ্যের পুরুষ উদাসীন, নিষ্ক্রিয় এবং সাংখ্য ঈশ্বরও স্বীকার করেন নাই। অথচ বলিতেছেন প্রকৃতির ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া "পুরুষার্থের" জন্য হইয়া থাকে। ভোগ ও অপবর্গই পুরুষার্থ। পুরুষ, প্রকৃতিকে ভোগ করিবে, এবং পুরুষ এইরূপ ভোগানন্তর প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই জড়প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়। পাঠক! কথাটি অনুধাবন করিয়া দেখুন্। পুরুষ আপনার ভোগের জন্যই প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্টিক্রিয়ায় নিযুক্ত, সাংখ্যের ইহাই কি অভিপ্রায় নহে? যদি ইহাই হইল, তবে আর প্রকৃতির স্বাধীনতা কি থাকিল? এই কথা ভাবিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষু, সাংখ্যদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ের ৫৫ ও ৫৬ সূত্রের টীকা করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "সূত্রদ্বয়মিদং ব্যাখ্যায় পারবশ্যমপি প্রতিপাদয়তি"। অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি স্বাধীন হইতে পারিতেছে না। বাস্তবিক পক্ষে, প্রকৃতিকে স্বাধীনা বলিবার অন্যরূপ কারণ আছে। বেদান্ত ত প্রকৃতিশক্তিকে আত্মারই নিতান্ত অধীন শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চৈতন্য-নিরপেক্ষ সত্ত্বা বা স্বাধীনতা কাহারই নাই। শঙ্কর বারম্বার বলিয়াছেন যে, "আমরা সাংখ্যদিগের ন্যায় প্রকৃতির স্বাধীন সত্ত্বা স্বীকার করি না"। তবে কি বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের বিরোধ ঘটিল? না, কোনই বিরোধ নাই। বেদান্ত ও প্রকৃতিকে একভাবে স্বাধীন না বলিয়া পারেন নাই। পাঠক জানেন, পঞ্চদশীর গ্রন্থকার শঙ্করাচার্য্যেরই পদানুসরণকারী শিষ্য। সেই পঞ্চদশীও, প্রকৃতির স্বাধীনতা একেবারে উড়াইতে পারেন নাই। "অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতেবিনাচিতিং। স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাৎ অসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ" (পঞ্চদশী, ৫। ৩২)। অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মার অন্যথাভাব ঘটায় বলিয়া প্রকৃতি বা মায়াশক্তিকে স্বাধীনাও বলা হয়।

জ্ঞাতা ভিন্ন, জ্ঞেয়ের প্রতীতি বা স্ফূর্ত্তি কদাপি সম্ভব নহে; জ্ঞাতার জ্ঞানেই জ্ঞেয় প্রকাশিত হয়। কিন্তু তথাপি জ্ঞেয়ের পার্থক্য তিরোভূত হয় না। উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা থাকিবেই। যদি এই ভিন্নতা না থাকে, তবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়। জড় ও চেতন তখন এক হইয়া পড়ে। চেতন ও জড় উভয়ই পরস্পর সম্বন্ধদ্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া উহারা সর্ব্বতোভাবে এক বা অভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, সাংখ্য প্রকৃতির স্বাধীনসত্ত্বার কথা বলিয়াছেন। জড় ও অজড়ের পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াই জ্ঞান; কিন্তু তাই বলিয়া উহারা এক বা অভিন্ন নহে। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যা-

য়ের দ্বিতীয় পদেও উহাদিগকে 'অভিন্ন' বলা হয় নাই, কিন্তু "অনন্য" বলা হইয়াছে। পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যেও প্রকৃতির এইরূপ স্বাধীনতার কথাই আমরা দেখিতে পাই—

"তদেতৎ দৃশ্যং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য......অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নং অন্যস্বরূপেন প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং"।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মূলতঃ সাংখ্য ও বেদান্তে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তিস্বরূপ পুরুষচৈতন্য, বিচিত্র জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তির অভিব্যক্তির জন্যই, ক্রমোন্নতপ্রণালীক্রমে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ কথা বেদান্তেরও যেমন প্রতিপাদ্য, সাংখ্যেরও তদ্রূপ প্রতিপাদ্য। পুরুষচৈতন্য এক হইয়াও অনেক, অনেক হইয়াও এক। চৈতন্যের স্বরূপই এই। যাহা অনেক, তাহা সেই একেরই অভিব্যক্তি; অথচ তাহা একত্বের দিকেই অগ্রসর।

আমরা উপরে পাতঞ্জলের ব্যাস-ভাষ্যের যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই ভাষ্যাংশটি বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, একটি কথা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। ইহা দ্বারা, প্রকৃতির কার্য্যোন্মুখ প্রবৃত্তি যে পুরুষ হইতেই প্রাপ্ত, এ কথা বিশদ হইবে। এই ভাষ্যে, "অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নং পুরুষস্য" এই বাক্যটি এবং "স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং" এই বাক্যটি,—এই দুইটি বাক্যদ্বারাই আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। প্রকৃতি, পুরুষের অনুভবকর্ম্ম। এ কথার অর্থ এই যে, পুরুষ বিষয়ী এবং প্রকৃতি তাহার বিষয়। পুরুষ কর্ত্তা, প্রকৃতি তাহার কর্ম্মস্থানীয়। কেবল তাহাই নহে। পুরুষ যদি জ্ঞানস্বরূপ হন, তবে প্রকৃতি সেই জ্ঞানের জ্ঞেয়। আত্মার যত প্রকার অনুভব হয়, সমস্তই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রকৃতির যত কিছু পরিবর্ত্তন, তৎসমস্তই যদি পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিস্থানীয় হইল, তবে প্রকৃতি যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া যায়, এ কথা নিতান্তই অর্থশূন্য হইল না কি? তার পর, পুরুষের উপলব্ধি প্রভৃতি প্রয়োজন সাধনের জন্যই, যদি প্রকৃতির প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা হয়, তাহাহইলে "পরার্থ" শব্দদ্বারাই ত প্রকৃতি যে পুরুষ হইতেই প্রবৃত্তিশক্তি পাইয়াছে, এ কথা আসিয়া পড়ে। "পুরুষস্য দর্শনার্থং........উভয়োর্য্যোগঃ"—এই কারিকাটিও এ কথা প্রমাণ করিতেছে। 'দর্শন' অর্থ 'জ্ঞান'। পুরুষ অপরিণামী, অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ। এই অপরিণামী পুরুষের, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়? পুরুষের জ্ঞানে, জ্ঞেয়াকারে এ জগৎ অবস্থিত। এই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানগুলি, পুরুষে কিরূপে আসিল? ইহারই কারণ অনুসন্ধানের জন্য, প্রকৃতি বলিয়া একটি সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রকৃতির কোনরূপ স্বাধীনতা আসে না। অথচ জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা অভিন্নও হইতে পারে না। সুতরাং একভাবে

প্রকৃতির স্বতন্ত্রতাও সিদ্ধ হয়। এই জন্যই ব্যাস-ভাষ্যে "স্বতন্ত্রমপি পরতন্ত্রং" বলা হইয়াছে। পুরুষের প্রতিমুহূর্ত্তে যে ভিন্ন ভিন্ন বোধ জন্মিতেছে, তখন বোধস্বরূপ পুরুষের অখণ্ড বোধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে না। পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দর্শনাদি ক্রিয়ার সময়ে, তাঁহার মূল কর্তৃত্বশক্তির হানি হইতেছে না। চৈতন্যের স্বরূপই এইরূপ। তিনি এক, অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞাতা। অথচ, সেই জ্ঞাতার বক্ষে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান আসিতেছে ও যাইতেছে। তিনি এক, অখণ্ড, কর্ত্তা। অথচ, কর্ত্তার উপরে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে। উভয়ের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; অথচ উভয়ে এক বা অভিন্ন নহে। খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি, সেই এক, অখণ্ড, নিত্য জ্ঞান ও কর্ত্তার সংবাদ আনিয়া দেয়। আবার সেই নিত্য তত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, এই সকল অনিত্য, খণ্ড জ্ঞান ও ক্রিয়া না থাকিলে চলে না। ইহাই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব। ইহাই বেদান্তের নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ। ব্রহ্মচৈতন্য এক হইয়াও বহু; আবার বহু হইয়াও এক। যাহা বহু, তাহা সেই একেরই অভিব্যক্তি, এবং সেই একেরই স্বরূপ বুঝাইবার জন্য নিত্যকাল পরিণামী। সেই এককে যেমন লোপ করিতে পার না, তদ্রূপ এই বহুরও বিলোপসাধন অসম্ভব। সুতরাং এক ও বহু,—পুরুষ ও বিকারময়ী প্রকৃতি,—উভয়েই অঙ্গাঙ্গিরূপে সম্পৃক্ত। কেহই কাহাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন নহে। কাহারই অন্য-নিরপেক্ষ সত্তা নাই। মহাজ্ঞানী কপিল এ মহাতত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। বেদান্তও এ কথা স্বীকার না করিয়া পারেন না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতি যে পুরুষকে ছাড়িয়া দিয়া, স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিয়া যাইবেন, সাংখ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা হইতে পারে না। দোষ সাংখ্যের নহে; দোষ আমাদের। আমরাই সাংখ্যের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ। সাংখ্য জড়বিজ্ঞানবাদী। কিন্তু তাঁহার জড়বিজ্ঞান আধুনিক জড়বিজ্ঞান নহে। এখন যেমন জড়বিজ্ঞানবিদেরা, জড়াণুর স্পন্দনে ও জ্ঞানে (Consciousness) কোন প্রকার সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; সাংখ্য সেরূপ ভ্রম করেন নাই। সাংখ্য সেই প্রাচীন কালেও বুঝিয়াছিলেন যে, উভয়ের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য। এক অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ধন্য মহর্ষি কপিল!

কিন্তু এ স্থলে একটি গুরুতর কথা আসিয়া পড়িতেছে। বেদান্তে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় শব্দে অভিহিত করিয়াছে; অথচ এই বিচিত্র জগতের জন্মহেতু তিনিই। সাংখ্যের পুরুষ ও উদাসীন এবং নির্গুণ;—অথচ আমরা যেভাবে সাংখ্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিলাম, তাহাতে সেই নিষ্ক্রিয়-উদাসীন পুরুষ হইতেই প্রকৃতি প্রবৃত্তির বীজ পাইয়াছে। এ সকল কথা কিরূপে সম্ভব হয়। যিনি ক্রিয়াবর্জ্জিত, তাঁহা হইতে ক্রিয়া আসিল কি প্রকারে? এই বিরোধ দেখিতে পাইয়াই কি বৌদ্ধদর্শন, সেই মূল

নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া কেবল এই জাগতিক পরিবর্ত্তনের কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন? এ সকল বিরোধের মীমাংসা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু বিষয়টি বড় জটিল। আমরা বারান্তরে ইহার তাৎপর্য্য উদ্ধার করিতে যত্নশীল হইব।

ক্রমশঃ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্-এ,।

কবিতা।

হৃদয়-বিজনে জাগে দিবা নিশি
একটি মধুর মুখ!
কল্পনা-নয়নে হেরিলে তাহারে,
প্রাণের ভিতরে কত কি যে করে,
ভেদিয়া অনন্ত মহাদুঃখ-রাশি
উপজে বিমল সুখ!
সন্তাপবিনাশি সে মধুর হাসি
স্মৃতি-পথে আসে যবে,
ভাবনা ভুলিয়া, ভাবেতে গলিয়া,
হৃদয়-উচ্ছ্বাসে উঠি গো মাতিয়া,
আশার মোহন-রবে!
যেই দিকে চাই, সেই দিকে দেখি,—
একটি মুরতি মধুর সম
নাচিতেছে যেন নয়নের পরে,
উলটি পালটি হৃদয় মম।
অমিয় মাখান সেই সে নামটি
কেমন মধুর আহা!
প্রাণের গভীর ভাব-যন্ত্র-মাঝে,
সদাই বাজিছে তাহা
শয়নে স্বপনে দিবস রজনী,
হৃদয়মাঝারে, সেই মুখখানি
মহাপ্রভাময় উজ্জ্বল অক্ষরে,
অঙ্কিত র'য়েছে মোর;
সারাটি জগত উন্মাদিত প্রাণে
চেয়ে আছে সদা সেই মুখ পানে,
ভাবের আলোকে অন্ধ হোয়ে যেন
অধীর উল্লাসে ঘোর!
নিশা অবসানে, উষার পরশে
শিহরিয়া উঠি, স্বপন-আবেশে
শুনি, ধীরে ধীরে গাইছে কে যেন
সেই সে মধুর নাম!
চেতনার সাথে সে সুখ-স্বপন
ভেঙ্গে যায় যবে, সে নাম তখন
হৃদে জাগে অবিরাম!
ঘুম ভেঙ্গে যায়, শয্যা হোতে উঠি,
আধমুদা মোর ধীর আঁখি দুটি
দেখিবারে পায়, নাচিয়া নাচিয়া
উষার অফুট আলোক ভেদিয়া,
হৃদয়ে বাহিরে করে ছুটাছুটি
সেই—সেই ছবিখানি!

কিসের সে ছবি পাই না ভাবিয়া,
বিহ্বল হৃদয়ে থাকি গো চাহিয়া,
মুখেতে সরে না বাণী !
ভালবাসা মোর হৃদয় টুটিয়া
যেতে চায় যেন ছুটিয়া ছুটিয়া !
অমনি হৃদয় কাঁদিয়া উঠে,
কুসুম-কাননে যাই গো ছুটে,
অধীরা হইয়া তুলি আনমনে
একটি গোলাপ কলি,
চারু দলগুলি ফুটাইয়া দিয়ে
চেয়ে থাকি আমি ভাবে ভোর হোয়ে ;
ভাবেতে বিভোর নয়ন নড়ে না,
স্থির অবিচল পলক পড়ে না,
থাকি থাকি থাকি তার মাঝে দেখি
সেই—সেই ছবিখানি !
হৃদয়ের মাঝে ভাবের গেহে,
স্থির অবিচল মানব-দেহে,
কে যেন হায়রে, রেখেছে আঁকিয়া
সেই—সেই ছবি খানি !
হৃদয় অমনি কাঁদিয়া উঠে,
দূর বন-মাঝে যাই গো ছুটে
সাধের বালিকা—গোলাপ কলিকা
চরণেতে দেই দলি !
শ্রান্ত এ মাথাটি রাখি ধীরে ধীরে
বকুলের মূলে কুসুমের স্তরে,
এক মনে শুনি, কোকিলেরা সবে
মাতিয়া উল্লাসে, সুমধুর রবে
গাইতেছে অবিরাম—
সেই—সেই—সেই নাম !
বড় সাধ যায়, বিরলে বসিয়া
হেরি সেই মুখখানি ;
শুনি সে মুখের সুধাবিজড়িত
একটি মধুর বাণী।
হৃদয়ের ধন অমূল্য রতন
লুকাইয়া রাখি করিয়া যতন
প্রাণের গভীর স্থানে,
দিবস রজনী নিরজন স্থানে
নিরখি একাকী অতি সাবধানে
প্রেম-পিপাসিত প্রাণে।
হৃদয়-রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে,
স্থাপি' সে প্রতিমা অতি সঙ্গোপনে,
প্রেম-পুষ্প দিয়া, পূজা করি সদা
ভালবাসা উপহারে !
বিঘোর আঁধার বিজন কাননে,
অমা-নিশীথের সমীরণ সনে
বড় সাধ যায়, সে নামের গাথা
প্রাণ ভ'রে গাইবারে !

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র।

অভিশাপ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মালতী।

সায়ংকালে শান্তপ্রবাহিনী ভাগীরথীকূলে সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র বারাণসী নগরী বড় মনোরম রূপ ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যের দিগন্ত বিস্তারিত সোনার কিরণ অনেকক্ষণ হইল দেবালয় সমূহের উচ্চচূড়ার শীর্ষ ভাগ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে একটি একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতেছে। নদীর পরপারের বৃক্ষশ্রেণী এক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কেবল নদীবক্ষে স্থানে স্থানে কয়েকখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, গগনে সুধাংশু উদিল। কাশীর শতদেবালয় হইতে সহসা এক সঙ্গে শত শঙ্খঘণ্টার গভীর নিনাদ সায়ংকালীন পূজা ঘোষণা করিতে লাগিল। নৈশ সমীরণ হিল্লোলে সে পবিত্র নিনাদ ভাসিয়া ভাসিয়া ধীরে সেই নৈশ-গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। বহুদেশ হইতে আগত অসংখ্য যাত্রীদল মন্দির মধ্যে সমবেত হইয়া স্থির তদ্গত চিত্তে আরতি দর্শন করিয়া যেন নিজ নিজ জীবন সার্থক বোধ করিল। আরতি শেষে ভজনগীত আরম্ভ হইল, এ গীত বড় মধুর; বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে সমস্বরে একেবারে গাহিতে লাগিল। এই সুললিত সঙ্গীত-ধ্বনি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতকে ধন্য করিয়া শূন্যে মিশিয়া যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। দর্শক ও শ্রোতৃগণ বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বিশ্বেশ্বরের সুবিশাল পুরী আবার নিস্তব্ধ হইল।

দূরে দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, বিশ্বেশ্বরের মন্দির নীরব। এক গৈরিকবসন-পরিহিত অজাতশ্মশ্রু সন্ন্যাসীবেশী যুক্তকরে কাশীনাথের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া এই নবীন সন্ন্যাসী বিশ্বেশ্বরের উপাসনা করিলেন, তৎপরে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি কাতর ও মৃদুভাবে দেবাদিদেবকে মনে মনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমার মনস্কামনা কি পূর্ণ হইবে না?" যামিনীর নিস্তব্ধতায় উপাসকের এই করুণ প্রার্থনা মিশিয়া গেল। এই ব্রহ্মচারীবেশী কে এবং ইহার কামনা কি, তাহা, কে বলিতে পারে? তৎপরে উপাসক গাত্রোত্থান পুরঃসর একাকী জনহীন পথের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক মঠের রুদ্ধ দ্বার সমীপে গমন করতঃ আস্তে আস্তে ডাকিলেন.—"ত্রৈলোক্যনাথ"!

ভিতর হইতে উত্তর হইল—"কে আপনি, শতানন্দ"?

সন্ন্যাসী।—তাহাই বটে, গুরুজি আসিয়াছেন?

ত্রৈলোক্য। তিনি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, আজ অতি প্রত্যুষে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আখড়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাবৎ না আসেন, তাবৎ আপনাকে বারাণসী ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া, আপনাকে ইহা বলিবার জন্য প্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসী।—কবে ফিরিবেন, কোথায় গিয়াছেন?

ত্রৈলোক্য।—পঞ্চকোটের পাহাড় হইয়া কল্যাণেশ্বরীর মন্দির পর্য্যন্ত যাইবেন, কবে ফিরিতে পারিবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার ফিরিতে অন্ততঃ একপক্ষ কাল লাগিবে।

"একপক্ষ! বাবা বিশ্বেশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হউক।"—সন্ন্যাসী আপন মনে এই কথা বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বাবার মন্দিরের অল্প দূরে এক সুদৃশ্য ক্ষুদ্র বাটীর দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—"হরিচরণ"! কোন উত্তর না পাইয়া ধীরে ধীরে কপাটে টুকি মারিলেন এবং পুনরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"হরিচরণ!"

এইবার হরিচরণ বলিল,—"কে এত রাত্রে, ঠাকুর আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসীবেশী বলিলেন,—"হাঁ, তুমি একবার দ্বার খোলো।"

দ্বার খুলিয়া হরিচরণ বলিল,—"ঠাকুর এত রাত্রে আবার ফির্‌লেন কোথা থেকে।"

"অদ্য কার্য্যের কিছুই হইল না, সেই জন্য ফিরিয়া আসিলাম।"

যৎকালে ভৃত্য হরিচরণ ও সন্ন্যাসীর মধ্যে এই কথোপকথন হইতেছে, অপর প্রকোষ্ঠ হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন,—"যোগেশ্বর এসেছ? রাত্রি আর অধিক নাই, শয়ন কর।" যে ব্যক্তি বলিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বোধ হয় তাঁহার বয়ক্রম অধিক হইয়াছে।

এই শতানন্দ ও যোগেশ্বর নামধারী নবীন সন্ন্যাসী আমাদের পরিচিত মালতী। সেই রজনী শেষে মালতী পুরুষবেশ ধারণপূর্ব্বক একাকী মাণিকনগরের গৃহ হইতে বাহির হইয়া কাশীতে আগমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া মালতী সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া প্রথমে কয়েক দিবস কাশীর ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ে তাঁহার শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর অনেক অন্বেষণ করিলেন। তাঁহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে সে আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি যোগেশ্বর নাম ধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বেশে সাধুজন সহবাসে দেবারাধনায় কালাতিপাত করিবেন স্থির করিলেন। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিয়া পরদুঃখমোচন দ্বারা লোকনাথেরকার্য্যে পাপ-জীবনের অবসান করিবেন, মনে মনে এই মহান্ ব্রত অবলম্বন করিলেন।

বাটীর মধ্যে মালতী প্রবেশ করিলে পর, ভৃত্যের সহিত কথা কহিবার কালে, যে ব্যক্তি কক্ষান্তর হইতে যোগেশ্বরকে শয়ন করিতে বলিলেন, তিনি মাণিকনগরের জমিদার শচীকান্ত রায়। রায় মহাশয় বারাণসী ধামে আসিয়া, দীন দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইয়া, দেব দরশনে, সাধুজনের সহিত আলাপনে, পরমানন্দে

দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার দান ধ্যানের কথা অনেকেই জানিতে পারিলেন। মালতী শচীকান্ত বাবুর নাম পূর্ব্বেই বিদিত ছিলেন; তাঁহার তীর্থবাসে আসিবার কথাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি শচীকান্ত বাবুর সহিত কোন সুযোগে আলাপ করিলেন। তাঁহার নাম যোগেশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তিনি সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত, এ কথাও জানাইলেন। রায় মহাশয় যোগেশ্বরের কমনীয় কান্তি, শুদ্ধ চিত্ত, এবং তাঁহাকে সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণসন্তান দেখিয়া, বিশেষতঃ সত্যেনের বন্ধু শুনিয়া, বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। মালতীর প্রার্থনায় তিনি নিজ বাসস্থানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গৃহ তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। মালতী প্রায় অধিকাংশ দিবসই এই স্থানে থাকেন। অদ্য তাঁহার বাটী আসিবার কথা ছিল না, সেই জন্য পরিচারক হরিচরণ এরূপ ভাবে প্রশ্ন করিল। তাঁহার গৈরিক বসন ধারণ, মস্তকে জটা প্রভৃতি পরিবর্ত্তন দেখিয়া হরিচরণ তাঁহাকে ইদানীং ঠাকুর বলিয়া থাকে। মালতী প্রায় প্রতিদিনই গভীর নিশীথে উপাসনা করিয়া ফিরিয়া আসেন। যে দিন না আসেন, সে দিন ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আশ্রমে রাত্রি যাপন করেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দস্বামী কাশীতে বাস করিতেছিলেন। উন্নতমনা মালতীর মাধুর্য্যময়ী শান্তপ্রকৃতি দেখিয়া ও পবিত্র মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, শিবভক্ত পরম শৈব ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁহাকে বড় স্নেহ করেন। তিনি শাস্ত্রীয় নানাবিধ উপদেশদ্বারা মালতীর ধর্ম্মলিপ্সা ক্রমশঃ উত্তেজিত করিতে যত্নবান্। যে নিষ্কামধর্ম্মের মূল আত্মসংযম, শৈব-শাস্ত্রজ্ঞ এখন মালতীকে তাহাই শিখাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রয়োজন বশতঃ কয়েক দিবস স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, অদ্য আসিবার কথা ছিল, সেই কারণে মালতী উপাসনানন্তর গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার বাসনায় মঠে গিয়াছিলেন।

স্বামীজি শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের তীর্থ-সমূহ পর্য্যটন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এই সময়ে অনেকেই চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে যাইয়া থাকেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই চন্দ্রনাথ যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু পুনরায় পঞ্চকোট পাহাড় যাতায়াতে তাহা হইল না। সেই কারণ আখড়ার শিষ্যবৃন্দকে তাঁহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। সেবক ত্রৈলোক্যনাথ অদ্য শতানন্দকে প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিল। মালতী প্রভুর নিকট হইতেই এই শতানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মালতীর পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের মোহনমূর্ত্তি এখনও তাহার হৃদয়ে তেমনই আঁকা রহিয়াছে; তেমনই দিবারাত্রি তাঁহার ধ্যানই মনে জাগে, তাঁহারই মঙ্গল কামনায় বিশ্বেশ্বরের চরণে ভক্তিবিল্বদল অর্পণ করেন; কিন্তু ইচ্ছাময়ী ভবানীর কি অপার স্নেহ খেলা! মালতীর আজি সে দুর্দ্দমনীয় পিপাসা কৈ? সে হৃদয়সর্ব্বস্বকে দেখিবার প্রবল লালসা কৈ? সে আত্মহারা বুকভরা প্রেম কৈ? আজি সে প্রেম বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বেশ্বরের চরণে নিহিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সহচরী সমাগমে।

"ঠাকুরঝি, তোমার ভাই এক্ কথা! এখনও বুঝি আর টিপ্ পরবার বয়েস আছে? লোকে দেখলে বল্‌বে কি? বেনেদের মতন বুড়ো বয়সে আবার টিপ্ পরা তিলক কাটা! আমি ভাই মুছে ফেলি. বরং তোমায় একটি টিপ্ পরিয়ে দি।"

"না বৌ দিদি, তুলে ফেলবে; ও আমার দিব্যি। লোকে যে যা বলে বলুক, দাদা ত ভালবাসবে। আমি কতদিনের পর আজ মাথা বেঁধে দিলুম, অমন কপালে একটি টিপ্ পরিয়ে দেবো না?"

শান্তিকাননের শান্তিপূর্ণ ভবনের একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে হিরণ, শৈলজা ও লীলা বসিয়া আছেন। লীলাবতী অনেক দিনের পর আজ কয়েক দিন হইল দাদার নূতন বাটী, নূতন উদ্যান দেখিতে একবার পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। এবার আসিয়া অবধি সত্যেন্দ্রনাথের নব নির্ম্মিত আবাসেই বাস করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সত্যেন নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে যখন ভোজ ও নাচ তামাসা দিয়া আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, বিনোদলাল তখন আসিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রকন্যাগণের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন লীলা তখন আসিতে পারেন নাই। শৈলজা এক্ষণে সংসার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত হিরণের কাছে অতি অল্পই আসিয়া থাকেন, লীলা আসিয়াছেন শুনিয়া অদ্য অনেক দিনের পর শৈলজা হিরণের নিকট আসিয়াছেন।

লীলা ইচ্ছা করিয়া আজি ভ্রাতৃজায়ার বেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া সাধ করিয়া একটি টিপ্ পরাইয়া দিলেন। হিরণ উহা মুছিয়া ফেলিতে চাহিলে, লীলা তাহা করিতে দিলেন না, মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন,—"অমন কপালে একটি টিপ্ পরিয়ে দোবো না?"

শৈলজা লীলার কথায় সায় দিয়া বলিলেন,—"না ভাই বেশ দেখিয়েছে,' ঠাকুরঝি না হলে এমন টুকটুকে বৌকে সাজিয়ে দেয় কে? আমরা কুৎসিত মানুষ, কুৎসিতকে সাজাতে পারি।"

হিরণ উত্তর দিলেন,—"তা বল্‌বে বৈ কি ভাই, তুমি কুৎসিৎ না হ'লে আর ঠাকুরপো ঐ চরণে বিকিয়ে আছে!"

"বলি হাঁ ভাই নাত বৌ, আজ কি গল্প খেয়েই থাকবে না কি? আজ আর জল টল খাবে না? এখন নাত্‌বৌও ডুমুরের ফুল হয়েছে, ওকে জল খাওয়াও, নাত্‌নীকে খাওয়াও।" ঠাকুরমা দুই খানি ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবি হস্তে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই কথা বলিলেন।

হিরণ।—ঠাকুরমা, আমি কথা কহিতে কহিতে সত্যই জল খাবার কথা বল্‌তে ভুলেছিলুম্।

লীলা হিরণের কথা শেষ না হইতেই বলিলেন,—"আচ্ছা, ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করি। ঠাকুরমা, বৌ দিদিকে টিপটি পরে কেমন মানিয়েছে বল ত?"

ঠাকুরমা।—বাঃ! বেশ মানিয়েছে, অমন কপালে যদি না মানাবে, তবে আর কোথায় মানাবে।

"অলকা তিলকা সব্বাই পরে,
কপালের গুণে টিপ ঝল্‌মল্‌ করে।"

শৈলজা।—ঠাকুরমার মতন কেউ ছড়া কাট্‌তে পারবে না। ঠাকুরমা, আমায় কতকগুলো ছড়া শিখিয়ে দিবে?

ঠাকুরমা।—তোমাদের কি ভাই আমরা শিখাতে পারি। তোমরা হচ্চ বিদ্যাধরী, আর আমরা মুখ্যু সুখ্যু সেকালের মানুষ। এখন জল খাও, আমি আর একখানা রেকাবি নিয়ে আসি।

ঠাকুরমা, লীলা ও শৈলজার সম্মুখে হর্ম্ম্যতলে, ফলমিষ্টান্নপূর্ণ পাত্র দুইখানি রাখিয়া হিরণের জন্য জলখাবার আনিতে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, তিন জনে একত্রে জলযোগ করিলেন। তৎপরে হিরন্ময়ী ননদিনী ও শৈলজাকে উদ্যানে তাঁহার যত্নপালিত সখের ফুলগাছগুলি, চৌবাচ্চায় পীত, লোহিত, কৃষ্ণ নানা বর্ণের নানা অবয়বের ক্ষুদ্রবৃহৎ চীনদেশীয় মৎস্যগুলি দেখাইতে লইয়া গেলেন।

সন্ধ্যাসমাগমে সেই শান্তিকাননের সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহারি। চারিদিকের অসমশীর্ষ ঘন পাদপশ্রেণীর শিরোভাগ অস্তাচলগামী দিনমণির সম্মোহন ম্লানদ্যুতি বিভাসিত হইয়া উদ্যানের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। বিহঙ্গকুল সারাদিন আহারান্বেষণের পর উড়িয়া আসিয়া, একে একে, ঐ সকল পাদপাশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। মরাল ও হংসগণ হিংসাদ্বেষবিরহিত নির্ভীক ভাবে দলবদ্ধ হইয়া আমোদরের স্বচ্ছ সলিলের স্থিরতা নষ্ট করিয়া সন্তরণ দিতেছে, কখনও বা ক্ষণে ক্ষণে উন্নত মস্তক জলমগ্ন করিয়া শৈবাল ও ক্ষুদ্র জলকীট ভক্ষণ করিতেছে। জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্ব হরিৎ বর্ণের শষ্পসমাচ্ছন্ন, তাহারই পার্শ্বে বিবিধ জাতীয়, দেশীয় ও বিদেশীয় ফুলের গাছে, কল্পনাতীত বিবিধ বর্ণের ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। জলের ভিতরে ও চারিধারে ঐ ফুল শোভিতেছে, মরাল-সন্তরণে ও বায়ুহিল্লোল-আন্দোলনে কুসুমগুলি সময়ে সময়ে নাচিতেছে। যেমন দেহজ অপেক্ষা তৎপুত্র অধিক আদরের হয়, সেইরূপ বাস্তব পুষ্পগুলির অপেক্ষা বুঝি বা এই প্রতিবিম্বগুলি অধিক নয়ন-বিমোহন দেখাইতেছে। উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে কেয়াফুলের তীব্রমধুর সৌরভ মৃদু পবন-সঞ্চালনে ঐ সকল নয়নরঞ্জন কুটজ, গোলাপ, জাতী, যূথিকা, মল্লিকা প্রভৃতি কুসুমের কোমলমধুর গন্ধকে ঢাকিয়া, নিজ অস্তিত্ব বিঘোষিত করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য সমষ্টি বুঝি আজি এই কামিনীকুসুমত্রয়ের অসীম সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। প্রকৃতই আজি ইহাদের আগমনে "শান্তিকানন" যেন সমধিক সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে। সহসা দেখিলে মনে হয়, বুঝি ইহা অমরধামের নন্দনকানন।

হিরন্ময়ী কখনও কখনও এই উদ্যানে আসেন বলিয়া, সত্যেন্দ্রনাথের বিনানুমতিতে ইহাতে অপরের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। হিরণ একে একে লতামণ্ডপ, বৃক্ষবাটিকা, ফোয়ারায় মুক্তাসদৃশ জলবিন্দু পড়িতেছে এবং তাহারই জলে মাছগুলি খেলা করিতেছে, সরোবরে শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে; এই সকল দেখা-

হইয়া দীর্ঘিকা সমীপে গমন করিলেন। তৎপরে নৌকারোহণে অনভ্যস্তা ভীতা শৈলজা ও লীলাকে অনেক বলিয়া তীরসংলগ্ন বোটে উঠাইলেন। হিরণ স্বামীর নিকট হইতে অল্প অল্প বোট চালনা শিখিয়াছিলেন, অদ্য একটু চালাইবার ইচ্ছা হইলেও, সঙ্গিনীদ্বয়ের ভীতি বশতঃ পারিলেন না। হংসগুলি হিরণের সম্বোধনে তাঁহাদের নিকট আসিয়া ডাকিতে ডাকিতে খেলা করিতে লাগিল, আর নৌকার উপরে যুবতীগণ, ক্ষণকালের জন্য সংসার চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, যৌবনসুলভ সরল সরস কথোপকথনে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। জলমধ্যে তাঁহাদের প্রতিবিম্বগুলি কাঁপিতেছে। এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় শান্তি, তৃপ্তি ও সুখ, এই তিন ভগ্নী মূর্ত্তি ধরিয়া অমরধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্পনাময় স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যৎকালে ইহারা শান্তিপূর্ণ চিত্তে আপন আপন মনের কথা ব্যক্ত করিয়া আপনাদের বর্ত্তমান সুখের সীমা করিতে পারিতেছেন না, তখন আর একটি মানব বিরলে বসিয়া নয়নের দ্বারা যে সুধাপান করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। এই ভাগ্যবান্ সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন দ্বিতল প্রকোষ্ঠের বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া দূর হইতে ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। গোধূলির অল্পালোকের জন্য যখন তখন হস্তস্থিত ক্ষুদ্র বাইনকুলারটির সাহায্যে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া একবারও প্রাণের হিরণকে ভিন্ন অপরকে সুন্দরী দেখেন নাই। তাঁহার সমীরণ-আন্দোলিত, ললাটলম্বিত চূর্ণকুন্তলদাম, কোমল-ধীর অঙ্গসঞ্চালন দেখিয়া তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল হিরণ বোট্ চালনায়, অথবা সন্তরণে বিশেষ পটু নয়, যদি দৈবক্রমে পড়িয়া যায়! সত্যেন উঠিয়া গৃহান্তর হইতে একটি ক্লারিওনেট্ লইয়া ছাদে উঠিলেন এবং আলিসার পার্শ্বে প্র শান্তভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই মোহন বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন।

ক্লারিওনেটের মোহন রবে কানন পরিপূর্ণ হইল। সে স্বর রমণীদের কর্ণে প্রবেশ করিল, সকলেই বাটীর দিকে চাহিলেন, প্রথমে কেহ সত্যেনকে দেখিতে পাইলেন না। হিরণ এ সুর শুনিবা মাত্র চিনিলেন, ইহা তাঁহার বিশেষ পরিচিত সুর। লীলা তখন ছাদের পার্শ্বে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া দাদাকে চিনিলেন। সকলেই লজ্জাবনত মুখে ধীরে বোট্ হইতে অবতরণ করিয়া বাটী আসিলেন। শৈলজা, সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া লীলাবতী ও হিরণ্ময়ীর নিকট বিদায় লইয়া বাটী গেলেন। লীলা ছোট ছেলেটিকে অনেকক্ষণ দেখেন নাই, তাহাকে দেখিতে গেলেন। আর হিরণ?—হিরণ কোথায় যাইবে? প্রাণনাথ ঘরে আছেন বুঝিয়া তথায় যাইলেন। সত্যেন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"হিরণ! বোটে চাপ্‌তে, বাগানে বেড়াতে না তোমার লজ্জা করে?"

"সে তোমার সঙ্গে। তুমি অমন করে লুকিয়ে দেখ কেন? তোমার ভারি অন্যায়।"—হিরণ হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া

সত্যেনের নিকট যাইলেন। সত্যেন হিরণের মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া বলিলেন,—"এবার থেকে টম্‌টমে করে নিয়ে বেড়াব, দেখা যাবে কেমন লজ্জা করে!"

"আচ্ছা, মাথার কাপড় না খুলে কি কথা কওয়া হয় না?"

"হয়,হিরণ, হয়। তোমার ঐ কাল চুলগুলি কানের পাশে দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিনাজপুর গমন।

দিনে দিনে মিলিয়া সপ্তাহ,সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিয়া মাস, আর মাসে মাসে মিলিয়া বৎসর হয়; সময় এইরূপে যেন নিজ কর্ত্তব্য লক্ষ্য করিয়া আপন পথে অগ্রসর হয়। সত্যেন্দ্রনাথের নবীন সংসার পাতিবার পর প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শান্তিকাননের অট্টালিকার মধ্যে কোন সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক রমা আপন শিশু কন্যা লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। দেড় বৎসরের শিশু হেলিয়া দুলিয়া, চলিয়া চলিয়া, আধ আধ কথা কহিতে কহিতে ঘরের এধার ওধার করিতেছে,কোনটা টানিতেছে, কোনটা ফেলিতেছে, কোনটা আনিয়া মাতার নিকট দিতেছে; কোনটা উচ্চ স্থান হইতে পাড়িয়া দিবার জন্য জননীকে বলিতেছে; আর মাতা হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে, তাহার অভিলাষ মত কার্য্য করিতেছেন, কখনও মৃদু মন্দ ভৎসনাও করিতেছেন। এমন সময় গৃহদ্বারের বিপরীত দিকস্থ দেওয়ালে সংবদ্ধ বৃহৎ মুকুর মধ্যে একটি পুরুষমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মাতা ব্যস্ততার সহিত অসংযত পরিধেয় যথা বিন্যস্ত করিয়া মাথার কাপড় তুলিয়া দিলেন। কন্যা মাতার এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া একটা নূতন খেলা পাইল। সে মাথার কাপড় টানিয়া খুলিয়া দিল, মাতা আবার তুলিয়া দিলেন। শিশু পুনঃ পুনঃ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, মাতা বাম করে নিজ কণ্ঠদেশের উভয় পার্শ্বের বস্ত্র ধরিয়া, দক্ষিণ কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কন্যার দুই গালে দুইটি ছোট রকমের কিল মারিল, কন্যাও শোধ দিতে ছাড়িল না। তখন সেই যুবক শিশুর নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"খুব মার, খুব মার।" কন্যা সাহস পাইয়া পিতার আদেশ পালনে সমধিক যত্নবান্ হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া ভার্য্যা ও কন্যার এবম্বিধ ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে মনোমধ্যে কতই আনন্দানুভব করিতেছিলেন। পত্নীর কৈশোর চাপল্য ও সারল্যের সহিত প্রগাঢ় মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের একত্র সংমিশ্রণের অপূর্ব্ব কমনীয়তা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। দুই বৎসর হইল হিরণ্ময়ী এই কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন। ইহার নাম হইয়াছে মাধুরী। হিরণ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মাধুরী, যা—ওকে মার্‌গে যা।"

কন্যা হাত তুলিয়া বাবাকে মারিতে উদ্যত হইলে, সত্যেন শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। হিরণ বলিলেন,—"আজ এ সময় যে এখানে? বাহিরে কেহ আসে নি বুঝি?"

"কেন, এ সময় আস্‌তে নাই কি?"

"আস্‌তে থাকবে না কেন, কৈ একদিনও ত এমন সময় আমার মনে পড়ে না।"

"কেন ভাই ও কথা বল, এ নফর মহারাজের কাছে কখন হাজির নাই?"

"না, না, তামাসা রাখ, কি দরকার এখন বল দেখি?"

"দরকার এই হুজুরের কাজে কিছু দিনের ছুটী প্রার্থনা আছে।"

"না, অমন কর যদি, তবে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।"

"জো হুকুম।"

হিরণ কপট ক্রোধ-ভাবে মুখ কিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সত্যেন হাত ধরিয়া বলিলেন,—"না ভাই সত্যি, দিন কতকের জন্য একবার মহলে যেতে হবে, নেহাৎ না গেলে নয়, শীঘ্র যাব।"

"কোথাকার মহলে?"

"কমলচকে।"

"কবে যাবে?"

"শীঘ্র না গেলে চলবে না, বোধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব।"

"আসবে কবে?"

"যত শীঘ্র, পারি, বোধ হয় পনর দিনের কমে আর আসতে পারব না!"

"এতদিন আমি কেমন করে থাকব, বেঃ-যন্ত্রা কি আর কেউ গেলে হবে না?"

"না ভাই, অনেকদিন থেকে নায়েব একবার যাবার জন্য লিখচে, আমি যাব যাবই করি, যাওয়া হয় না। আজ খবর এসেছে একটা ব্যবস্থা না করলে, আর প্রজার কোন মতেই শাসন হয় না। সেখানকার প্রজারা ভারী বদমাইস্, একবার না গেলে এখান থেকে কিছু করতে পারব না।"

"যাবে, আর বাধা দোবো না, কিন্তু ফিরে আস্‌তে যেন বেসী দিন দেরী না হয়।" হিরণ্ময়ী দুঃখের সহিত এই কথা বলিলেন।

জমিদার সত্যেন্দ্রনাথের নাম এখন চারিদিকেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নানা সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, গ্রামের ও নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহের প্রধান পথগুলি বাঁধাইয়া দিয়া ইংরেজি স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়া, অপরিষ্কার পুষ্করিণীর সংস্কার করাইয়া দিয়া, তাঁহাদের পুরাতন অতিথিশালার অতিথি ভোজনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, পিতৃপুরুষের নাম ও যশ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় এক্ষণে অন্যান্য পল্লী সমূহের তুলনায় মাণিকনগর অনেক শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। শচীকান্তবাবু যাইবার কালে ঐ কমলচকের জমিদারীর কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। সত্যেন তথায় যাইবার জন্য অনেকবার মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যাওয়া হয় নাই।

কমলচক দিনাজপুরের মধ্যে। এই লাটটি বৃহৎ; বার্ষিক মুনাফা আদায় হইলে আট হাজার টাকা। ইহার প্রজাগণ বড়ই দুর্দ্দমনীয়। স্বর্গীয় রমাকান্ত বাবু, অনেক কাঠিন্য অবলম্বন করিয়াও তাহাদের শাসন করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি কমলচকের সীমান্তের প্রজাবর্গ খাজানা আদায়কারী গোমস্তাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া

দাঙ্গা করিতে প্রস্তুত। অদ্যকার সংবাদে সত্যেন্দ্রনাথ অবগত হইলেন যে, নায়েব অনুমান করিয়াছেন তাহাদের পশ্চাতে অন্য কোন জমিদার আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রজাদিগের শাসনকল্পে দুই দিন পরে দ্বারবান, ভৃত্য প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দিনাজপুরে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সতীশের নিরাশা ও ক্রোধ।

মানবের মনে অনেকগুলি ভাব, আছে, লোকে তাহার প্রায় সকল গুলিকেই ভালবাসা অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু সকলগুলিই প্রকৃত ভালবাসা নহে। আমরা চিত্তের যে অবস্থা উপস্থিত হইলে, অপরের সুখের জন্য পুণ্য বা ধর্ম্মসঞ্চয়লালসাবিবর্জ্জিত অন্তরে অর্থাৎ নিষ্কাম নিস্বার্থ ভাবে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলিতে পারা যায়। এই ভালবাসার পরিণাম আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন যে চিত্তচাঞ্চল্যকে লোকে ভালবাসা বলিয়া থাকে, তাহা এক এক প্রকার মোহ মাত্র। মোহ ক্ষণিক, প্রেম অনন্ত কালের জন্য।

সতীশচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী বাল্যকালে যখন একত্রে খেলা করিত, কথা কহিত, উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া এক অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিত, তখন পাড়ার কেহ কেহ বলিত "দুটিতে কেমন ভাব, কেমন ভালবাসা!" কোন কোন নারী সতীশের মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত,—"সতীশের মা, ঐটিকে তোমার বৌ কোরো।" প্রকৃতই তখন তাহাদের মনে, উভয়ের প্রতি উভয়ের, একটি বিশেষ ভাব জন্মিয়াছিল, সেটি চিত্তচাঞ্চল্য নহে। কারণ সে বয়সে, বিশেষতঃ হিরণের ন্যায় বালিকার চিত্তচাঞ্চল্য বা মোহ সম্ভবে না। তখন সেই অপরিপুষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন বালকবালিকা দুটির যে ভাব দেখিয়া সকলে ভালবাসা বলিত, তাহা প্রকৃত ভালবাসা নহে। তবে পরিণামে তাহা যে ভালবাসায় পরিণত না হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যেমন অপরিপক্ক কুষ্মাণ্ডলতার জন্মকালের অব্যবহিত পরেই যে পুষ্পোদ্গম হয়, তাহা দেখিয়া লতা কিপ্রকার ফলবতী হইবে, তাহা বুঝা যায় না, সেইরূপ কোমল স্বভাবাপন্ন অপরিপক্ক বালকবালিকার শৈশব প্রণয় দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ ঠিক করা যায় না। তবে, অনেক স্থলেই সে প্রণয়টি পরে প্রকৃত ভালবাসায় পরিণত হইয়া থাকে।

মোট কথা সতীশচন্দ্রের ভালবাসায় আমাদের একটু সন্দেহ আছে। কারণ, সতীশ যখন হিরণ্ময়ী লাভে বিফলমনোরথ হইয়া, হতাশের কঠিন করস্পর্শে নিতান্ত কাতর হইয়া, দুর্জ্জয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যেনের সর্ব্বনাশ সাধন দ্বারা পরোক্ষভাবে হিরণের সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন তাঁহার যে প্রকৃত ভালবাসা আছে, একথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ভালবাসাই হউক, আর যাহাই হউক, এখনও সে ভাবটি তাঁহার মন হইতে তিরোভূত হয় নাই, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি-

সম এখনও তাহা মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকাইত আছে।

এখন সতীশ,কিছুদিন হইল, মাণিকনগরের পোষ্ট আফিসে বদলী হইয়াছেন। এই পোষ্ট আফিসটি পাঁচ সাত ক্রোশের মধ্যে সকলগুলির অপেক্ষা বড়। এক্ষণে তাঁহার বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা ছয়টাকা মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কয় বৎসর আরও কিছু বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল; হয় নাই তাঁহার নিজ দোষেই।

সত্যেন্দ্রনাথ মহল পরিদর্শনে গিয়াছেন, এ সংবাদ যথাকালেই সতীশের কর্ণগোচর হইল। ইদানীং এখানে আসিয়া অবধি নানাসূত্রে প্রায়ই হিরণের স্মৃতি তাঁহার মনে উদয় হয়, আর আপন মনে পুর্ব্বকার সে সুখের দিন গুলি চিন্তা করেন। শোক, দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি কালেই উপশম হইয়া থাকে। সতীশের সে দুর্দ্দমনীয় প্রতিশোধ-বাসনা কালে অনেক প্রশমিত হইয়াছে। বিবাহের পর হিরন্ময়ীর সহিত সতীশচন্দ্রের কুসুমহাটীতে একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা ইচ্ছায় নহে, সতীশ তাঁহাদের বাটীতে আর ঢুকিতেন না। হিরণের বিবাহের দুই বৎসর পরে সতীশ একদিন বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথ পার্শ্বের জানালা হইতে হিরণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বাভাবিক কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"সতীশ দাদা ভাল আছ?" আজি সত্যেন্দ্রনাথের দিনাজপুর গমনের সংবাদের সহিত তাঁহার অনেক দিনের সুপ্ত স্মৃতি পুনরায় জাগরিত হইল। একে একে কতদিনের কত কথা মনে আসিতে লাগিল। সেই বাতায়ন হইতে হিরণের অমিয়মাখা সরল সম্বোধনের কথা মনে পড়িল। বালিকার সে কোমল আঁখি দুটি, সে বিমল মুখখানি, সে মোহময় স্বর, সব মানসে উদিত হইতে লাগিল। বাল্যকালের সহস্র স্মৃতি, অফুরাণ তরঙ্গমালার ন্যায়, একটির পর একটি আসিয়া, হৃদয় আন্দোলিত ও ব্যথিত করিতে লাগিল। সতীশ শত বৃশ্চিক-দংশনতুল্য যাতনা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। একাকী পোষ্ট আফিসের চালাঘরে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদন করিয়া, অনেক চিন্তার পর মনে বড় সাধ হইল, "আর একবার সে প্রেমময়ীকে দেখিতে পাই না, আর একবার সে সুধামাখা কথা শুনিতে পাই না।"

একদিন, দুই দিন, তিন দিন গেল; সতীশ সে সাধ ফিরাইতে পারিলেন না। ক্রমে সাধ হইতে চেষ্টা, চেষ্টা হইতে আশা হইল। তিনি শান্তিকাননের কোন দাসীর সন্ধান লইয়া, অনেক আশা বুকে ধরিয়া, তাহার দ্বারা গোপনে হিরণকে তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জানাইলেন। বলিয়া দিলেন সে সাক্ষাৎকার বাটীর অপরের অজ্ঞাতে হইলেই ভাল হয়। পরিচারিকা সতীশচন্দ্রকে হিরন্ময়ীর কথা একটু রঞ্জিত করিয়া বিজ্ঞাপিত করিল।

সতীশচন্দ্রের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হিরণ আনন্দিত মনে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবেন। তিনি এক্ষণে যে সৌভাগ্যবানেরই অঙ্কলক্ষ্মী হউন, শৈশবের সে ভালবাসা কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। স্বামীর প্রণয়ে

হৃদয় পূর্ণ থাকিলেও, তাঁহার নামে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিবে, সতীশের এরূপ আশা করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রকৃতই হিরণ্ময়ীর দাসীর কথা শ্রবণ করিয়া, সতীশের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। হিরণ সে ছেলেবেলাকার কথা অনেক ভুলিয়াছিলেন, অদ্য আবার অনেক কথা মনে পড়িল। কিছুকাল এইসকল পুরাতন বিষয় আলোচনা করিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেটি নিজের জন্য কি সতীশের জন্য, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। হিরণ্ময়ী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা করিবার অনিচ্ছা জানাইলেন।

যাহাতে যত আশা স্থাপন করা যায়, তাহা না পূর্ণ হইলে, তত ক্লেশ পাইতে হয়। সতীশ বড় আঘাত পাইলেন। তিনি ভাবিলেন শৈশব ভালবাসার পরিবর্ত্তে এই উপেক্ষা। প্রকৃতপক্ষে হিরণ কোন উপেক্ষার কথা কহেন নাই। শতবর্ষের বৃক্ষকে কাঠুরিয়া একদিনের কুঠারাঘাতে যেমন ভূতলশায়ী করিয়া ফেলে, সতীশ এক দিনের ভ্রমে তেমনি বহুদিনের ভালবাসা অন্তর হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। সত্যেন ও হিরণ্ময়ীর প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসা বাসনা উজ্জ্বলরূপে পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সতীশচন্দ্র সে বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিশোধ ইচ্ছায় তাঁহার দেহ-মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

কর্ণ কে ?

কর্ণ ও কবিত্বের সম্বন্ধ কি ?

বিজ্ঞানদৃপ্ত ইদানীন্তন জগতে এবং জড়-প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলা স্বেচ্ছাচারিণী তন্ময়ী উপাসনার দিনে, অচাক্ষুষ ও অতীন্দ্রিয় অতি অভ্রান্ত মহাসত্যেও মনুষ্যপ্রাণ কি যেন কি এক বিড়ম্বনায়, তাদৃশ এক প্রতিষ্ঠ বিশ্বাস সংস্থাপনে যার-পর-নাই কুণ্ঠিত। মনুষ্য সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-চক্রের অতিতর শ্লথ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, অপ্রাকৃত মহোচ্চ সত্যে সন্দিহান হইবে, তাহা সর্ব্বথা নিসর্গসিদ্ধ, অতএব অপ্রতিবিধেয়। কিন্তু, প্রাকৃতিক নিয়মেরই সুচারু ও সর্ব্বশুভপ্রদ প্রবাহে, অতি ভাগ্যোজ্জ্বল—মহাপুরুষ প্রবরগণ, দেশকাল পরিচ্ছিন্ন বিকার-বিদূষিত ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞান সবেগে ও সবলে অতিক্রমপূর্ব্বক, মহা-বিজ্ঞানের চরণ-সেবায়, আত্মাকে চরিতার্থ করেন। মহাকবি মহর্ষি বেদব্যাস, কর্ণ ও পার্থ সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাকৃত ও ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে, তাহা অবস্থাপেক্ষী ও নিয়ম-প্রতিহত বিশ্বাসের সর্ব্বথা অন্তর্ভুক্ত বলিয়া

পরিগণিত হইতে পারে না। যুদ্ধকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতিদূরবর্ত্তি দেবতাগণের সাক্ষাৎকার ও প্রয়োজনানুবন্ধি সামরিক অনুগ্রহ প্রদর্শন, অসাধারণ, হইলেও, কোন ক্রমেই অলীক ও অস্বাভাবিক বলিয়া সর্ব্বথা বিশ্বাসের সীমাচক্রের বহির্গত নহে। জ্ঞানোৎকর্ষে—বিশ্বাসচক্রও যথেচ্ছ সম্প্রসারিত ও প্রবর্দ্ধিত হইলে, অনন্তজ্ঞানে অনন্তবিশ্বাসে অনন্ততত্ত্বের পরমোপলব্ধি স্থির সিদ্ধান্ত। কর্ণার্জ্জুনের তাদৃশ অবনীদুর্ল্লভ ঘটনাবলী দৈবানুকম্পায় অপ্রাকৃত জ্ঞানাশ্রয়ে—স্বতঃসিদ্ধ ধ্রুবসত্য বলিয়া অবশ্যই উপপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

ট্রয় ইতিহাস-প্রকীর্ত্তিত হেক্টার ও গ্রীক-ইতিবৃত্ত-বিশ্রুত অবিনশ্বর একিলিস্ প্রভৃতিও দৈবানুগ্রহে সর্ব্বদাই চরিতার্থ, প্রদীপ্ত ও মহীয়ান্ ছিলেন। এই সকল নিগূঢ় মহাসত্য নিরবচ্ছিন্ন উৎকট কল্পনার ঘোরান্ধকার অথবা অসত্যের কল্মষ-কলুষিত বিকট চিত্রে বিকৃত, বুদ্ধির শোচনীয় বিকারাবৃত মনুষ্য দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে সচেষ্ট রহিলেও, বিজ্ঞানমহিমোজ্জ্বল মনুষ্য এই সমস্ত অভ্রান্ত প্রতিপাদিত মহাসত্যে চিরকাল বিশ্বাসের পূত-পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণে পরিতৃপ্ত রহিবে, সন্দেহের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবহৃদয় সেই আশার সম্মোহন মধুর সঙ্গীতে চিরকালই প্রবুদ্ধ থাকিবে।

কুরুক্ষেত্রের জীবক্ষয়কর লোমহর্ষণ মহাসমর জগতের বৈচিত্র্য-বিলসিত ইতিহাসের এক অতি প্রধান পর্ব্ব। তাদৃশী গরীয়সী মহীয়সী ঘটনায় মনুষ্যজ্ঞানের অগম্য দেবতাগণ কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট রহিবেন, তাহা কদাপি অসম্ভব ও অলীক বলিয়া অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব ভ্রমসঙ্কুল যুক্তিতর্কের অতীত; দৈবানুগ্রহে মনুষ্যসহজ জ্ঞানের মাঙ্গলিক স্ফুরণে ইন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ মহাতত্ত্ব উপলব্ধ করিয়া থাকেন। কর্ণ অসাধারণ মানব; পার্থ মনুষ্যজাতির অনন্ত অক্ষয় গৌরব। তাঁহারা স্ব স্ব আপেক্ষিক ও স্বগরিমায় সাধারণ জনমণ্ডলীর বড় অধিক দূরস্থিত, এবং আপনাদের অপ্রাকৃত জ্ঞানপ্রভাবে দেবতাগণের প্রভূতরূপে নিকটবর্ত্তী, অতএব অনুগৃহীত বা নিগৃহীত। যাহা হউক, ত্রিকালদর্শী মহাত্মা বেদব্যাসের বিশ্ববিমোহিনী বর্ণনায় কর্ণ জগতের প্রাণস্বরূপ মহাতেজঃ সূর্য্যদেবের এবং পার্থ সুরেশ্বর ইন্দ্রের অনুগৃহীত।

যিনি একবিংশতিবার বসুন্ধরা নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া স্বকীয় অক্ষুন্ন তেজোগরিমার পরিতর্পণ করিয়াছিলেন, সেই অরাতিনিসূদন বীরশ্রেষ্ঠ ভার্গব যাঁহাকে অস্ত্রদানে কৃতার্থ, সেই শূরসিংহ দুরাসদপ্রভাব কর্ণ আর্য্যজাতির অখণ্ড গৌরব, যাঁহার বীরত্ববহ্নি কৌরবগণকে সতত সন্ত্রাসিত করিয়াছে; যাঁহার অক্ষত প্রভাব দুর্য্যোধনের একমাত্র কালানল স্বরূপ ছিল; যাঁহার অনুপম শূরত্বকীর্ত্তি কুরুক্ষেত্রের যোধমণ্ডলীকে বিত্রাসিত করিয়াছে; যাঁহার অলৌকিক বীরত্বোপাসনা বীরত্বধর্ম্মের পবিত্র লীলাক্ষেত্র ভারতভূমির অনন্ত গৌরব, যাঁহার অসংখ্য পুণ্য অবদানরাজি আজ সহস্র সহস্র যুগাতিপাতেও অধোগত ও সর্ব্ববিধ বিকারগ্রস্ত হিন্দুজাতির অতুল প্রাণানন্দ স্বরূপ, যাঁহার ভুবনাতিশায়ি ক্ষত্রপরাক্রমের

অক্ষয়কীর্ত্তিকাহিনী লোকইতিহাসে দ্বিতীয় বার উদাহৃত হয় নাই, এবং ভারতের অনন্ত অমৃত-নির্ঝর মহর্ষি বেদব্যাস যাঁহার চরিত্র চিত্রণে আপনার হৃদয়-নিহিত অগাধ ভাবরাশি গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় অজস্র নির্গত করিয়াছেন, মহাভারতের মহাকাশের কেন্দ্রস্বরূপ ও বীররস-সার সেই মনুষ্যকুলতিলক পার্থ একমাত্র তাঁহা-কেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিধ্বংসনে বিধিপূর্ব্বক যত্ন করিয়াছেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, কর্ণ বীরত্বলীলার ভুবনোজ্জ্বল মহত্তম আদর্শ। পার্থের গাণ্ডীব-ধনুঃ, কর্ণের বিজয় শরাসন; অর্জ্জুন ইন্দ্রের অনুগৃহীত; কর্ণ সূর্য্যের আশ্রিত; ধনঞ্জয় বীরত্বের অপরিচ্ছিন্ন মহাসমুদ্র; কর্ণ ক্ষত্রধর্ম্মের অটুট অখণ্ড আশ্রয়।

কর্ণ ভাস্বর মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড! অর্জ্জুনের কি শক্তি সেই দুর্ব্বার পরাক্রম মহাবীরকে তাদৃশ দারুণ রণে অনায়াসে অভিভূত করেন? পার্থ বাসুদেব-সহায়, কর্ণ জানিতেন। কৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডব অবধ্য, মহাভুজ কর্ণ তাহা সম্যক্ বুঝিলেন। আরও বুঝিলেন, অর্জ্জুন কে? কিন্তু, দুর্ভাগ্য পার্থ কর্ণকে চিনিলেন না। বীর-সিংহ তথাপি অটুট ও অটল; পাণ্ডব-বিনাশে কৃত-নিশ্চয়—অর্জ্জুনের—স্নেহের পরম পাত্র অর্জ্জুনের—দুর্য্যোধনের হিতৈষণার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সেই প্রাণপ্রতিম অর্জ্জুনের শোণিত-লোলুপ! রোমহর্ষকর প্রলয় যুদ্ধ চলিতে লাগিল—যুদ্ধফল অনিশ্চিত—উভয়েই জিঘাংসু ব্যাঘ্র—উভয়েই দুর্ব্বার—দুই জীবনই ঘোরতর সংশয়াপন্ন—সর্ব্বদর্শী বাসুদেব মানস-নেত্রে সবই জানিয়াছেন—কর্ণের পরিণামও স্থির করিয়াছেন। পাণ্ডবানীকিনী বিদ্রাবিত ও বিপাটিত হইতে লাগিল। পিতামহ ভীষ্ম অথবা অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের ন্যায়, তিনি সহজ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, সনাতন কর্ত্তব্য-মার্গ হইতে ক্ষণতরেও বিচ্যুত হইলেন না। প্রাণপণে জীব-নের চরম মুহূর্ত্তপর্য্যন্ত প্রভুকার্য্যে নিয়োজিত রহি-লেন। কর্ত্তব্যের মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। অলঙ্ঘ্য অদৃষ্ট নিয়ম-চক্রে আত্মোৎসর্গ দ্বারা কর্ত্তব্যের —ধর্ম্মের মহত্তম ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। এই অতি সঙ্কুল সময়ে আর এক প্রধান ও প্রয়োজনীয় ঘটনার বিবৃতি, বিষয়ের গুরুত্ব তুলনায়, অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হয়। প্রাণ-পরিত্যাগেও, দুর্য্যোধনের প্রিয় চিকীর্ষু মহাত্মা কর্ণ যখন দুর্ব্বার বেগে পাণ্ডব সেনানীকে বি-ধ্বস্ত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন; যখন কর্ণের দেবদত্ত অক্ষয় কবচ পাণ্ডবগণকে অভি-ভূত ও হতাশ করিতে লাগিল; যখন কুরু-পতি দুর্য্যোধনের বিজয় লাভ যার-পর-নাই নি-শ্চিত বলিয়া প্রতীত হইল; তখন দানশক্তির হিরণ্যবিগ্রহোপম মহাভাগ কর্ণ দৈববিড়ম্বনায় আপনার শক্তির পাদ-পীঠ-স্বরূপ অক্ষয় কবচ দ্বিজরূপি অতিথিকে প্রদান করিলেন। শত সহস্র নিষেধ ও প্রতিকূল বচন সত্ত্বেও, সত্য-ধর্ম্মের অখণ্ড পদসেবায় অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। ফলতঃ, এই ভুবনোজ্জ্বল চরিত্রের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই তাঁহার দ্বিতীয় উদাহরণ অবলোকিত হয় না। সমগ্র মহাভারত মহাকাব্যে এতাদৃশ সত্য ও ধর্ম্মের নিয়ত চরণোপাসক, প্রতিজ্ঞা পরিপাল-

নের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মনুষ্যোপযোগিনী মহাবৃত্তির অতুল ও অখণ্ড পুণ্য আশ্রয় আর পরিকীর্ত্তিত হয় নাই। ভোগ-বিমুগ্ধ মনুষ্য কিরূপে সেই দেবচরিত্রের পরিসঙ্খ্যা ও পরিগণনা করিবে? এবং কিরূপেইবা অধোগত হতভাগ্য আমরা তাদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য চরিত্রের পরিচ্ছেদ ও ইয়ত্তা করিয়া হৃদয়-পরিতর্পণ লাভ করিবে?

বীর-চূড়ামণি বীরত্বের উজ্জ্বলতম গৌরব-মুকুট শিরোদেশে সংস্থাপন করিয়া—কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অক্ষুণ্ণ বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া—বিনশ্বর জগতে স্বর্গীয় ও অবিনশ্বর নামের সুধাসিঞ্চনপূর্ব্বক—অক্ষয় ও অনন্ত রাজ্যে গমন করিলেন। এই স্থানেই এই অনন্ত ভাব-বিলসিত জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য—এই স্থানেই এই অনুপম দেব-চরিত্রের উপসংহার এবং এই স্থলেই এই অনন্ত কার্য্যময় জীবনের পরিসমাপ্তি!!

মহাকবি বেদব্যাস এইরূপে এই বিশ্ব-বিমোহন চরিত্রের স্বর্গীয় আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। এই অনন্ত কর্ম্মময় জীবনের এক এক দৃশ্যে মহাকবি আদর্শ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে আদর্শের সুখ-স্পর্শে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হয়—আশা, আশ্বাস ও উৎসাহে প্রাণ নৃত্য করে—ইহার পবিত্র হিল্লোল রুগ্ন দেহে ঔষধপ্রলেপ—দগ্ধ জীবনে পীযূষ নির্য্যাস—নৈরাশ্যের ভৈরবী ছায়ায় আশার মৃদুমধুর প্রাণদ আলোক! আদর্শ-চিন্তা বা সৌন্দর্য্যানুভূতিই মনুষ্যের জীবন-সূত্র—যাবতীয় মানব-ক্রিয়ার আদিভিত্তি—আদর্শ ও সৌন্দর্য্যশূন্য জীবন হলাহলময় দগ্ধমরুভূমি—অধঃপাতের পাপ-কূপ—বিকট ও বিরূপ—আদর্শকল্পনা বা সৌন্দর্য্যানুচিন্তন ব্যতিরেকে কদাপি মহত্ত্বের বিকাশ হয় না—মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না—আত্মোন্নতির উন্মেষ হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য কি? পরিপূর্ণতাই কি ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়? পরিপূর্ণতা কাহাকে বলে? কিরূপেই বা ইহা সাধিত হয়? আপনাকে আদর্শের অনুরূপ বা সদৃশ করাই পরিপূর্ণতা—সেই আনুরূপ্য বা সাদৃশ্যই জীবনধারণের এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য। এক অপ্রমেয় অখণ্ড সৌন্দর্য্য বিশ্বের ধারণ-সূত্র-রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন—সেই অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য্যই চরম আদর্শ, সেই আদর্শের নিরন্তর অনুধ্যান দ্বারা সারূপ্যলাভই পরিপূর্ণতা—তাহাই জীবনের মৌলিক তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় মর্ম্ম। কবি প্রাণের আবেগে—আশার প্রবল উচ্ছ্বাসে—সেই সৌন্দর্য্যোদ্ভাবনে বা আদর্শাবিষ্করণে ধ্যানস্থ যোগীর ন্যায় সতত নিরত। সেই জন্যই কবি মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম উপদেষ্টা। মহাকবি বেদব্যাস মহাপ্রাণ কর্ণকে সেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ এবং মহত্ত্বের পূর্ণ ও পবিত্র বিগ্রহরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সেই জন্যই সেই অনুপম আদর্শ-সৌন্দর্য্যস্রষ্টা মহাকবি, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও, লোক-গুরু বলিয়া ভারতের গৃহে গৃহে সম্পূজিত; এবং বোধ হয়, জ্ঞানোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, একদিন তাঁহার পবিত্র নাম জগতের সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইবে, এ আশা

একেবারে দুর্ব্বল নহে। কর্ণ কর্ত্তব্যের মহত্তম আদর্শ—সেইজন্য কর্ণচরিত্রও চরম আদর্শ, চরম সৌন্দর্য্য—সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ আদর্শ—মানব জাতির প্রাণারাধ্য। কর্ণ চরিত্রের প্রত্যেক ভাগ তন্ন তন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ কর—আদর্শ সৌন্দর্য্যের—আদর্শ মহত্বেরই প্রাণপরিতোষি এক নিরবচ্ছিন্ন বিলাসভঙ্গী দেখিতে পাইবে! মহাকবি অনন্ত ভাবোর্ম্মিসমন্বিত এই অতি পুণ্যচরিত্রে আপনার মহত্বের অনন্ত সুষমা লইয়া প্রত্যেক অংশেই আদর্শ সৌন্দর্য্যের দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই জন্য এই চরিত্র এত উচ্চ—এত অদ্ভুত—এত প্রাণস্পর্শি—এবং সেই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস মহাকবি এবং প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি সহযোগে আমাদের নিত্য নমস্য।

ভারত-সন্তান! একবার মোহনিদ্রা অপনোদিত হইতে দাও—একবার উর্দ্ধদিকে নেত্রপাত কর—একবার আপনাদের ঘোরতর অধোগতি অবলোকন কর—একবার সেই অতীত আদর্শের সুবর্ণ দেব-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন কর। এই পুণ্যভুমি কর্ণের জননী—কর্ণেরই জীবন-লীলা-ক্ষেত্র। কর্ণ মাতৃমুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—কর্ণ জননীর যোগ্য সন্তান—কর্ণ-গৌরবে জননী চিরাভিমানিনী। তোমরা হৃত-গৌরব ও হীন-তেজাঃ স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে ভুলিয়াছ; ক্রূর কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে শতধা নিষ্পেষিত করিতেছ—পৈশাচ ব্যবহারে তাঁহাকে কাঁদাইতেছ—তিনি ধূলিধূসরা ক্ষীণাঙ্গা—করুণকণ্ঠে রোরুদ্যমানা—এইরূপ প্রাণভেদি দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া, কিরূপে ও কোন্ প্রাণে, অশ্রু সম্বরণ করিয়া আছ!! তোমরা ত্রিশকোটি সন্তান মহীয়সী মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। জননীর দুঃখ কি? তোমরা ত্রিশকোটী সন্তান—কর্ণ তোমাদেরই আদর্শ—বেদব্যাস তোমাদেরই মহাকবি। মাকে সান্ত্বনা কর, কেন না কর্ণ তোমাদের আদর্শ—মাকে আশ্বাস প্রদান কর—কেননা, বেদব্যাস তোমাদের কবি—মা'র অশ্রু দূর কর, কেননা তোমরা ত্রিশকোটী সন্তান। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে কর্ণ তোমাদের, বেদব্যাসও তোমাদের—তাই বলিতেছিলাম কর্ণ ও কবিত্বের সম্বন্ধ কি?

শ্রীশশিমোহন বসাক এম্, এ।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা ভাষা

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের নিম্নতন শ্রেণীগুলিতে (পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত) যে অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি (কিণ্ডারগার্টেন বিধান) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী হইতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা নামতঃ আরব্ধ হয়, সুতরাং বাঙ্গালা নিম্ন শিক্ষার পথ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইলেও প্রকৃত পক্ষে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ আশানুরূপ সাধিত হইতেছে না।

মূল সংস্কৃত ভাষার ভালরূপ জ্ঞান জন্মিলে সংস্কৃতের কন্যারূপিণী বঙ্গভাষায় অধিকার লাভ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত, তাহাতে ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা সুদূরপরাহত। সত্য কথা বলিতে কি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই দেব নাগর অক্ষরের সহিত ও তত্রত্য কৃতী সন্তানগণের পরিচয় সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান বিধি ব্যবস্থা ও তথাকার শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া, আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছি যে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিধাতৃপুরুষেরা ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠের নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন নাই; আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা "নাম্‌কোয়াস্তে" সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই নিষ্প্রয়োজন দুর্ব্বহ বোঝাটা ছাত্রগণের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতেছেন! শিক্ষার্থি-গণ সংস্কৃত শিক্ষায় সমস্ত উৎসাহ ও শ্রম অনর্থক পণ্ড না করিয়া যদি বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় সেই শক্তি প্রয়োগ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ও জন্মভূমির কল্যাণ প্রভূত পরিমাণে সম্পাদিত হইবে।

জাতীয় অভ্যুত্থান ব্যতিরেকে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন যেরূপ অসম্ভব, পক্ষান্তরে তদ্রূপ জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন জাতিই উচ্চ অভ্যুদয়ের উচ্চ গ্রামে অধিরূঢ় হইতে পারে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন কোন দেশ বা জাতি পূর্ণ উদ্যমে ও অদম্য উৎসাহে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তখনই সেই দেশ বা জাতির ভাষাও চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ জাতির বিজয় নিশান যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সগৌরবে উচ্ছ্রিত হয়, তখনই ইংলণ্ডের ভাষার ভাণ্ডার সেক্সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতির মহার্ঘ কাব্যসম্পদে অলঙ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সময়েই সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডার কাদম্বরী, উত্তরচরিত, শকুন্তলা প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট কাব্যের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল! বর্ত্তমান যুগেও যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দিব্যালোকে নিদ্রিত বঙ্গদেশ নবজাগরণে চক্ষু পুনরুন্মিলিত করিতে প্রথম প্রয়াস পায়, তখনই বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, অক্ষয়চন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতি ক্ষণজন্মা কোকিলকুলের অমৃতনিষ্যন্দী মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ মুখরিত হয়। কালে উন্নতির নূতনত্ব ঘুচিয়া যায়, তখন উৎসাহ উদ্যমও শিথিল হইয়া পড়ে, কাজেই সেক্সপীয়র ও কালিদাসের পৌনঃপুনিক অভ্যুত্থান নয়নগোচর হয় না। হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের পদরেণু স্পর্শেও বঙ্গভূমি পুনরায় পবিত্র হইবে কি না জানি না। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতীয় জীবন যেমন তদনুরূপ উন্নত করিতে হইবে, জাতীয় জীব-

নকে, আশানুরূপ সুগঠিত করিতে বাসনা থাকিলে, ভাষারও উৎকর্ষ সাধনের প্রতি তদ্রূপ প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই স্থলে আন্তরিক দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, জাতীয় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অমার্জ্জনীয় অনাদর ও পদে পদে নির্দ্দয় ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী জাতি উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে বাসনা করিতেছেন, কিন্তু জাতীয় ভাষা সম্যক্ উন্নত না হইলে, বাঙ্গালী জাতির নিরাভরণ মস্তক সফলতার বরমাল্যে কদাচ ভূষিত হইবে না। সুতরাং সকলেরই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া প্রাণপণে জাতীয় গৌরববর্দ্ধনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে একটা জাতির উন্নত ভাষায় পরিণত করিতে হইলে,আধুনিক ভাষাসেবিগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা জ্ঞানের অন্যায় অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমাদের মতে সাহিত্যলেখক মাত্রেরই একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রীতিমত অধ্যয়ন করা উচিত। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা যে উৎকৃষ্ট বঙ্গসাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ সাহায্যকারিণী, বিদ্যাসাগর,কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির বাঙ্গালা রচনা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যিকগণ বাঙ্গালা ভাষাটাকে বোধ হয় একটা "বেওয়ারিস" বস্তুর মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন,—বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় কোনরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই, অনুগ্রহ করিয়া যে যাহা লিখি, তাহাই বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট রচনা। এই কারণেই বোধ হয় যাইতেছে। ইহা বস্তুতঃই বড় দুঃখজনক। সকল ভাষার রচনারই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধিব্যবস্থা আছে, ভাষাগত দোষগুণেরও তিরস্কার পুরস্কার যথেষ্ট রহিয়াছে, এইসকল নাই শুধু বাঙ্গালায়। ইংরেজী ভাষার প্রবীণ পণ্ডিতও সন্দিগ্ধস্থলে অভিধানাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন না, ব্যাকরণের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ বলিয়া, সংস্কৃত সাহিত্যিকমণ্ডলীকে সকলেই নিন্দা করেন। কিন্তু বঙ্গভাষার উপাসক সম্প্রদায় কিছুরই ধার ধারেন না। তাঁহারা আজন্ম স্বাধীন। এই স্বেচ্ছাচারিতার বিষময়ী পরিণতি বাঙ্গলার পদে পদে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কৃতী সন্তানের রচনার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

একজন প্রবীণ লেখক লিখিতেছেন,—"মনুষ্যমনের স্বাভাবিক অলসপ্রিয়তা"। অলসপ্রিয়তার অর্থ বুঝিলাম না। অলসতা বা আলস্যপ্রিয়তা লিখিলেই ত এই পূতিগন্ধটুকু বাহির হইত না। এই সাহিত্যরথীও সাধারণ লেখকের ন্যায় 'পরিত্যজ্য', 'পর্য্যটক' প্রভৃতি বহু অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক লেখকগণ এই সকল শব্দে আকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে এত কুণ্ঠিত কেন বুঝি না। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী লিখিতেছেন, "কৃত কৃতার্থ হইব"। 'কৃত' শব্দটির প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন কেন? "কৃত" শব্দটিকে দুইবার নিমন্ত্রণ

স্থলে লিখিয়াছেন,—(বিশ্বামিত্র) "অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল"। মহামহোপাধ্যায়ের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও যদি সমানকর্তৃকতায় বোধ না থাকে, তবে আর আমাদের ন্যায় রাম শ্যামের দোষ কি ? এখন আমরাও এই শাস্ত্রীর নিকট সাহিত্যসেবায় দীক্ষিত হইয়া লিখিব,— "রাম" ভাত খাইয়া শ্যাম বাড়ী গেল "শাস্ত্রী কৃপা করিয়া ভাষার মাথায় বজ্র পড়িল" ইত্যাদি।

আর একজন নব্য সাহিত্যিকের রচনা দেখুন,—"ঘন ঘন উন্নতি দ্বারা সততার পুরস্কার দিতে আপত্তি কি ? তবে 'সাধুতার' পরিবর্তে অশুদ্ধ 'সততা' শব্দটি ভাষাসেবিদিগকে পুরস্কার দেওয়াটা লেখকের উচিত হয় নাই। অন্য একজন সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন,— "ইহার উদার স্বভাব ও মহান্ চরিত্র ব্যক্তিমাত্রেরই অনুকরণীয়"। এই স্থলে 'চরিত্র' এই ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যটার বিশেষণ 'মহান্' শব্দে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ সমীচীন হয় নাই। বিশেষ্য বিশেষণে এক লিঙ্গ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ দোষাবহ নহে, ভাষায় উহার যথেষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—"সুন্দর বালিকা" "অসীম বিদ্যা" ইত্যাদি।

কিন্তু "মহান্ বিশ্বের তুচ্ছ ধূলিপটল হইতে" ইত্যাদি স্থলে 'বিশ্ব' নপুংসকটির 'মহান্' রূপ পুরুষের সাজ আমাদের একেবারে ভাল লাগে না। ক্লীবের মুখে গোঁপ বস্তুতঃই একটা বিষদৃশ দৃশ্য। সাহিত্যবাজারে এই ব্যাপার সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। লোকালয়ের নপুংসকেরা স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিরই পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে, উহাদের স্বতন্ত্র কোন পরিচ্ছদ নাই ; কিন্তু সাহিত্যজগতে নপুংসকদের এতদিন একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহারা ক্লীব চিহ্নই ধারণ করিত, আজ কাল কাল-মাহাত্ম্যেই হউক অথবা মানবসমাজের দেখাদেখিই হউক, বাঙ্গালায় উহারা স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া স্ত্রীপুরুষের পোষাক গ্রহণ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। নপুংসকের পুংচিহ্ন ধারণ প্রদর্শন করিয়াছি,—সম্প্রতি স্ত্রীচিহ্ন গ্রহণেরও দুই একটি নমুনা দিতেছি ;— "কিন্তু ০ ০ * বাবুর ন্যায় অল্পবয়সী যুবকের এতাদৃশী জ্ঞান এত কঠোরতা * * *,"বক্তিয়ারের উক্তি শুনিয়া মেহেরবানীর হাস্যময়ী মুখ মলিন হইয়া আসিল" ইত্যাদি দেখুন,—'জ্ঞান' নপুংসকটি"এতাদৃশী"রূপ কেমন সুন্দর স্ত্রীচিহ্ন ধারণ করিয়াছে, এবং নপুংসক 'মুখ' স্ত্রীরূপিণী 'হাস্য' মোহন সাজে সজ্জিত হইয়া বসিয়াছে। এই প্রকার "অহেতুকী প্রেমের প্রতিই দৃষ্টি নিপতিত হয়"—আচ্ছা, প্রেম যদি 'অহেতুকী' হইতে পারিল, তবে ধর্ম্মপ্রাণ মাধব বাবু সতী সাধ্বী হইতে পারিবে না কেন ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ।

প্রথম প্রস্তাব।

আর্য্যহিন্দুর শাশ্বত শাস্ত্রমালাকে যদি একটি সুবৃহৎ বৃত্তাকারে বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে যাঁহার চিরপবিত্র শ্রীমুখ কমল হইতে জ্ঞানগুরু ভগবৎগীতা গ্রন্থের সনাতন ধর্ম্মনীতি সমুহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই বেদব্যাসারাধিত অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই মহাবৃত্তের কেন্দ্রস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। যাঁহার শ্রীপদগিরি হইতে জ্ঞান-গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে ও পৃথ্বিগুরু আর্য্যজাতিকে বিগতকল্মষ করিয়া এক অতি অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক আনন্দে উৎফুল্ল রাখিয়াছিল তিনি নরাকারে ভগবান; তিনি ত্রিগুণাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর হইয়াও "কর্ম্মমানব"। শ্রীকৃষ্ণ নামে এবং স্থূলদেহধারী রূপে তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম। যাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ নিঃসৃত জ্ঞানমধু পানের জন্য ধর্ম্মকল্পদ্রুম স্বয়ং যুধিষ্ঠির উৎসুক, যে দেবদুর্ল্লভ মধু আস্বাদন করিয়া ভাগবতের ঋষিকুল প্রমত্ত, যিনি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরিবরকে নিমেষমধ্যে শূন্যে উত্তোলন করিয়াছিলেন, যিনি মহাভারতে একমূর্ত্তিতে—ভাগবতে দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে—ভগবতগীতায় তৃতীয় মূর্ত্তিতে—প্রাদুর্ভূত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছিলেন, যে অসীম শক্তিমান বিরাট পুরুষ নন্দঘোষের ঘরে কৃষ্ণ এবং আয়ান ঘোষের ঘরে কালী, তিনি মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের সম্পূর্ণ আদর্শ। বীরাধিক বীর, ধার্ম্মিকাধিক ধাম্মিক এবং তপস্বী হইতেও তপস্বী শ্রীমৎ অর্জ্জুনের যিনি প্রণম্য, জ্ঞানভাণ্ডার ব্যাসদেবের যিনি আরাধ্য, ভাগবতের ঋষির যিনি ভগবান, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যিনি উপদেশক, সঞ্জয়ের শরীর যাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতে করিতে রোমাঞ্চিত, শক্তি ও প্রেম রূপিনী শ্রীমতী রাধিকার যিনি প্রাণসখা, মহাভারতশাস্ত্র যাঁহার স্তুতিবাদে গৌরবান্বিত, অত্যাচারের অধর্ম্মের দমন করিয়া ন্যায়ও ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপনের জন্য যিনি কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতির নিহন্তা, বিশ্বনাশোৎপাদক সুবিশাল কুরুক্ষেত্রের বিশ্বব্যাপী সমর সুযোগে যিনি বিশ্বকারণমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া মানবের উপদেশক ও ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া গণ্য, যিনি শ্যামসলিলা যমুনাতটে মনোমোহন "শ্যাম" রূপে কৃষ্ণ এবং পূণ্যতোয়া সরযূতটে সীতার প্রাণসখা "রঘুপতি" রামরূপে বিরাজিত, কৈলাসে যিনি দেবাদিদেব মহাদেব এবং গীতায় যিনি অক্ষয় অমর ও অনবদ্য পরমেশ্বর, যিনি নরদেহধারী "কৃষ্ণ" হইয়াও স্বয়ং পরাৎপর পরমব্রহ্ম। আমি সেই গুণাতীত, জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত

অজর, অমর, অপ্রমেয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সভক্তি প্রণাম করি। সেই সর্ব্বযুগাধিপতি নিষ্কলঙ্ক অনাদিপুরুষ আমাদের ইহকালের ও পরকালের একমাত্র শাশ্বত সহায়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রবর সেই বিরাট পুরুষের স্তব করিতে গিয়াছেন—

"যং শৈব্যাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং যো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্য নাথো কৃষ্ণঃ॥"

সমগ্রপৃথিবীর সমগ্রজ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ ভগবান বেদব্যাস, গীতামাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

১। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃতা॥

২। সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

৩। সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

৪। যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥

এখন ভাবিয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের মুখারবিন্দ নিঃসৃত শ্রীমৎভগবৎ গীতাশাস্ত্র আমাদের কিরূপ আদর্শগ্রন্থ। এখন ভাবিয়া দেখ আমাদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিরূপ আদর্শ। বিস্ময়, বিষাদ ও লজ্জার বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ পুরুষকে আমরা চিনিলাম না। মণিকার না হইলে কি মণি চিনা যায়? অধঃপতিত ভারত, এমন মহান্ আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে অসম্পূর্ণ বিদেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে অগ্রসর; ভারত এই জন্যই অন্ধকার হইতে অন্ধকারতর অবস্থায় উপনীত হইতেছে। জনৈক প্রেমিক বাঙ্গালী কবি, শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা তটে দাঁড়াইয়া সাশ্রুলোচনে গায়িছিলেন

"এই কি সেই যমুনা? শ্যামযমুনা প্রবাহিনী?
যার বিশাল তটে, রূপের হাটে, বিকাত কান্তমণি?"

বঙ্গীয় সাহিত্য সরোবরের শারদীয় সরোজস্বরূপ ভক্তাধিক ভক্ত অমর দাশরথী রায় নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেন—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর হে কমলাপতি।
আমার প্রবৃত্তি হবে যমুনানদী, ভক্তি হবেন রাধা সতী॥"

পুনরায় বলি, আর্য্য হিন্দু! যদি তুমি অধঃপতনের গভীরতম নরকে উপনীত হইতে ইচ্ছা না কর তাহাহইলে ভ্রমাত্মিকা

বুদ্ধি কর্তৃক পরিচালিতা হইয়া এই সম্পূর্ণ আদর্শকে পরিত্যাগ করিও না, ইহাঁর ঐশী-কৃপায় ইঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা কর। কিন্তু এই ঐশী পুরুষকে বোধগম্য করা দূরে থাকুক, তোমরা আজি কালি জয়ডঙ্কা বাজাইয়া কহিতে আরম্ভ করিয়াছ "শ্রীকৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি আদৌ বর্ত্তমান ছিল না, ইহা কবি কল্পনা মাত্র।"

ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পাদ্রী লেখক দিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তোমরা প্রথমে কহিয়াছিলে, "শ্রীকৃষ্ণ অতীব কলঙ্কিত পুরুষ, তাহার চরিত্র অতিশয় জঘন্য ছিল।"—এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছ "শ্রীকৃষ্ণ নামে আদৌ কেহই ছিল না। ভালকথা বটে! পাদ্রী প্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উপরিউক্ত দুইটি কথার একটিও আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। যাহাহউক, বর্ত্তমান প্রস্তাবে কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে; শ্রীকৃষ্ণ নামে যে স্থূলদেহধারী (অর্থাৎ মানবদেহধারী) ব্যক্তি বাস্তবিক বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ কবিকল্পনা নহে; ইনি বাস্তবিক মানবাকারে, স্থূল দেহে, কোটি কোটি মনুষ্য সম্মুখে, এই মর্ত্তধামে, আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যথাশক্তি তাহাই প্রমাণ করিতে আরম্ভ করি।

পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা অবতার বাদের বিরোধী অথবা ভগবানকর্তৃক মানব দেহ ধারণ সম্বন্ধে সন্দিহান, কিম্বা স্পষ্টতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ঈশ্বর অথবা অবতার অথবা আদর্শ বা সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত, তাঁহাদের নিকটে আমি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব, অবতারত্ব, সম্পূর্ণত্ব অথবা একাধারে দেবত্ব দেবত্ব ও অন্যাধারে মানবত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি-নাই! শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে কবিকল্পনা নহে অর্থাৎ নরদেহে স্থূলশরীরে) শ্রীকৃষ্ণ যে বাস্তবিক বর্ত্তমান ছিলেন তাহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের শরীর লইয়া এক্ষণে কথা উপস্থিত; তাঁহার Personality লইয়াই প্রসঙ্গ উত্থিত; সুতরাং রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদময় শরীরী শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব প্রতিপাদন জন্য লেখনি ধারণ করিয়াছি। আমার উদ্দিষ্ট বিষয়েকে সাব্যস্থ করিবায় জন্য অগণ্য প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও আমি আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ দিয়া মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

প্রমাণ।

১ম। জগদ্বিখ্যাত কুরুপাণ্ডবীয় সমরে যত লোক একত্রিত হইয়াছিল, সভ্য ও অসভ্য জগতের ইতিহাসে বর্ণিত আর কোন যুদ্ধে এত লোক কখন একত্র হয় নাই। ছৃষ্টিসৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত এত বড় আহব আর কখন কেহ শ্রবণ বা পাঠ করে নাই।

পৃথিবীর সমুদয় প্রধান বীর, প্রধান সারথী, অস্ত্রধারী, তেজস্বী অশ্ব, রণমত্ত হস্তি, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত, সমরকুশল যোদ্ধা,

বিক্রমী রাজা, সুচতুর শিল্পী, মন্ত্রণাদাতা, প্রাজ্ঞদর্শক, প্রাচবিবেকী বিচারক প্রভৃতি এই মহাযুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা একত্র হইয়াছিল। ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তি ১০৯৩৫০ পদাতি-সৈনিক, ৫০,০০০ শতঘ্নীধারী সেনা, ২৫,০০০ তরবারীধারী সেনা, দশসহস্র ধনুর্দ্ধারী বীর, পঞ্চদশসহস্র পঞ্চশত পঞ্চজন (সেনাধিপতি) প্রধান বীর এবং অষ্টাদশ সহস্র দ্রুতপদ যুবক সেনাপুরুষ, অর্থাৎ সমুদয়ে ৫৫০,২৫০ প্রাণী সমবেত হইলে এক অক্ষৌহিনী হয়। এমন অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা কুরুক্ষেত্রের বিশ্ববিখ্যাত সমরে সমবেত হইয়াছিল।* শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রক্তমাংসমেদময় মনুষ্য শরীরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা এবং পৃথিবীর প্রধান, প্রধান রাজা, যোদ্ধা, বীর, পণ্ডিত, যোগী, সাধু, সারথী এবং দর্শকের সম্মুখে দৃষ্টমান ছিলেন। অন্য স্থানের কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল কুরুক্ষেত্রের কথা লইয়াই আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে প্রায় এক কোটি প্রাণী সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টমান ছিলেন। এই এক কোটি প্রাণীর মধ্যে পৃথিবীর সভ্য মানব সমাজের অলঙ্কারসমূহ সমূহ বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, যোগীবর অর্জ্জুণ, সমরকুশল ভীম, সত্যবাদী নকুল ও সহদেব, মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবলী কাশীনরেশ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরপুঙ্গব শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, প্রবল বীর্য্য সম্পন্ন উত্তমৌজা, সপ্তরথী সমতুল্য অভিমন্যু, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভুরিশ্রবা, জয়দ্রথ, দ্রুপদ প্রভৃতি তথায় একত্র হইয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে কি? ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্থূল শরীরকে (মানবীয় দেহকে) দর্শন করিয়াছিলেন। কাহারও ব্যক্তিত্ব (Personality) প্রমাণ করিতে হইলে, ইহাই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও প্রবলতর প্রমাণ, আর কাহারও সম্বন্ধে, পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাস দিতে সক্ষম হয় নাই। সনাতন হিন্দুর সৌভাগ্য বলে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রবলতম প্রমাণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, পৃথিবীর আর কাহারও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তদপেক্ষা সুন্দরতর প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

২য়।—খৃষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি এক্ষণে ধরাধামে জীবিত নাই। তথাপি খৃষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন। যে উপায়ে খৃষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদের অস্তিত্ব প্রমাণীত হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব তদপেক্ষা লক্ষগুণ সুন্দরতররূপে প্রমাণিত হয়। খৃষ্ট বুদ্ধ ও মহম্মদের মানব-

* অভিধানে ও গীতার টীকায় অনেকে অক্ষৌহিনী শব্দের অর্থ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।—লেখক।

শরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রয়োজিত হয় বা হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় মহা প্রবল প্রমাণের নিকট তাহা সামান্য বা নগন্য, অথচ কৃষ্ণকে কবিকল্পনা বলিবার অধিকার তুমি গ্রহণ কর কেন? কি নিবুর্দ্ধিতা! কি ভয়ানক ভ্রম! যাহা হউক, রোমকদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, "মাত্র একব্যক্তির সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়া হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইতে পারে।" মনে কর, লর্ড রিপণ অথবা সার হেনরী কটন কিম্বা পণ্ডিত প্রবর ও সাধুপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় এক জন লোক যদি কহেন—"শ্যামাচরণ বসু, অঘোরনাথ পালিতকে হত্যা করিয়াছে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি" তাহা হইলে কেবল এই এক সাক্ষীর কথায় নির্ভর করিয়া, বিচারক মহাশয় আইন মতে শ্যাম বসুর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় আদালতের নজীরাবলী হইতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, বেদব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ, কৃপ, সঞ্জয়, মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, শিখণ্ডি, দ্রোণাচার্য্য, নরপুঙ্গব শৈব্য প্রভৃতি লর্ড রিপণ, সার হেনরি কটন, বিদ্যাসাগর বা কেশব সেন হইতে কত কোটি শ্রেষ্ঠতর? প্রথম প্রমাণে দেখাইয়াছি—সাক্ষী সংখ্যা; এখন দেখাইলাম—সাক্ষ্যদাতার গুণ, মর্য্যাদা ও চরিত্র। Quality and quantity এতদুভয়ই শ্রীকৃষ্ণের স্থূলশরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ। সাক্ষ্য বিষয়ক আইন অনুসারে সাক্ষীর সংখ্যা এবং সাক্ষ্যদাতাগণের গুণ, মর্য্যাদা ও চরিত্র, বিচারক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব (Personality) সম্বন্ধে ইহা অকাট্য প্রমাণ।

তৃতীয়।—মহাভারত, ভাগবত, ভগবৎগীতা প্রভৃতি অগণ্যশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে; তাঁহার মুখ, পদ, পরিচ্ছদ, হস্ত, কর্ণ, মাথার চূড়া, গলার মোহণ মালা, হাতের বাঁশি, কণ্ঠের স্বর, বাঁশীর স্বর, দেহের বর্ণ, পরিচ্ছেদের ভাব, ওষ্ঠের রং, দন্তের সংখ্যা প্রভৃতি পর্য্যন্ত বিবৃত আছে। পুত্তলিকারও অবশ্য এপ্রকার বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু পুত্তলিকা কথা কহেনা, চলেনা, দেখেনা, খেলেনা, হাসেনা এবং শ্রবণ করেনা। শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, চলন, দৃষ্টি, শ্রবণ, কণ্ঠস্বর এমন কি বহুপ্রকার ক্রিয়া কলাপ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ধার্ম্মিকপ্রবর মহামতি জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় স্বয়ং কহিয়াছেন "আমি শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ নিঃসৃত অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিমোহিত ও পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতেছি।" তিনি রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বিশিষ্টভাবে কহিয়াছেন "যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং" (গীতা ১৮ অ। ৭৫ শ্লোক) অর্জ্জুন কহিতেছেন" হে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)! আপনার প্রসাদে আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে। আপনার মুখনিসৃত উপদেশমালা শ্রবণে আমি আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করিয়াছি।" গীতা। ১৮ অ। ৭৩ শ্লো।) এস্থলে

শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বাক্য নিঃসরণের প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহা হইলেই বুঝা গেল শ্রীকৃষ্ণ কবিকল্পণা নহেন। এরূপ প্রমাণ অগণ্য সংখ্যায় বর্ত্তমান আছে। "কৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন"—সঞ্জয়ের ইহাই সাক্ষ্য। কৃষ্ণ যদি কল্পণার কৃষ্ণ হইতেন তাহাহইলে তাঁহার শ্রবণ, দর্শন, চলন, স্পর্শন, কথোপকথন প্রভৃতি কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

চতুর্থ প্রমাণ।—শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি বেদব্যাস এবং বেদব্যাস সমতুল্য ঋষিবর ও মহিষীবরগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, লালন, পালন, লীলা, ক্রিয়া কলাপ, রাজ্যশাসন, যুদ্ধসাজ, ধর্ম্মোপদেশ, মৃত্যু বা অন্তর্দ্ধাণের বিবরণ, জীবনচরিত্র লেখকদিগের ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান রাশিকে একত্র করিলে যাহা হয়, বেদব্যাসের জ্ঞান তাহা অপেক্ষা অধিকতর ছিল। বেদব্যাস এবং অন্যান্য জগৎপূজ্য ঋষিগণ কি এমনই নির্ব্বোধ, এমনই পাগল এবং এমনই অসার লোক ছিল যে একটা কবি-কল্পনার মূর্ত্তির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিবরণ লিখিয়া অমূল্য জীবনকে বৃথায় যাপিত করিয়া গিয়াছেন? কল্পনায় কি এত সূক্ষ্ম বর্ণনা সম্ভবে? বৈদিক শাস্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। বেদ হইতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিম্বা নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ পর্য্যন্ত, সকলেই কি নির্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া একটা কল্পণার ভজন, পূজন, কীর্ত্তণ, প্রশংসা, চরিত্র বর্ণণ, লীলার ব্যাখ্যা, ইতিহাস লিখন প্রভৃতি মহাপ্রেমময় অথচ গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন? কল্পনায় কি এসকল সম্ভবপর হয়?

পঞ্চম।—গ্রীশ দেশের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, পদার্থ না থাকিলে যেমন তাহার ছায়া হয়না, আদর্শ না থাকিলে তাহার কল্পনাও হয়না। স্বীকার করিতে হইবে সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নামে নর দেহধারী মূর্ত্তি ছিলেন অথবা তৎসমতুল্য মনুষ্য বর্ত্তমান ছিলেন, নতুবা কল্পনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? মানব মাত্রেই সসীমবুদ্ধি ও সসীম মানসবিশিষ্ট প্রাণী; সসীম বুদ্ধিতে অসীম বুদ্ধি সম্পন্ন কৃষ্ণের কল্পণা হয়না ও হইতে পারেনা। যদিহয়, তাহাহইলে যিনি কল্পণাকারী,তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ সমতুল্য, তাহাহইলেই স্বীকার করিতে হইতেছে যেখানে আদর্শ নাই সেখানে আদি মত্ব নাই। আদিমত্ব বা আদর্শ না থাকিলে সসীমবুদ্ধি মানবের মনে উত্তাদন শক্তিও উপজিতে পারে না, বিশেষতঃ ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহা কদাপি সম্ভব নয়। একখানা ইংরাজি গ্রন্থে একজন সুলেখক Utopian Government (ইউটোপীয়ান গবর্ণমেণ্টের) কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, এই ইংরাজি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আদর্শ রাজ্য।" গ্রন্থকর্ত্তার জীবনচরিত আলোচনা করিলে জানা যায়, ইনি হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং সেই আদর্শানুসারে Utopian form of Government এর কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কল্পনা কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পৃথিবীতে

উপরি উক্ত লেখকের কল্পিত আদর্শ রাজ্য সম্ভবে না। এমন আদর্শ রাজও মর্ত্তধামে সম্ভবে না। এইজন্য সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক রাজ্য ও রাজা অসম্পূর্ণ আদর্শ। যাহা কল্পিত তাহা ঠিক কখন কার্য্যে আইসে না, আসিলেও পূর্ণভাবে আসিতে পারে না, ইহাই সংসারের নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ যদি কবি কল্পনা হইত, তাহাহইলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি, কার্য্য, জীবন প্রভৃতি কখনই সম্পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ হইত না, কারণ কল্পনা কখনও পূর্ণ আদর্শ হইতে পারে না; পৃথিবীর ইতিহাস, মানবের জীবন, শাস্ত্র, যুক্তি এবং ধর্ম্মজগত ইহার অমর সাক্ষী। ইহা বিজ্ঞানের কথা সুতরাং সদত অকাট্য সত্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক শরিরী; কবি কল্পনা নহে।*

ষষ্ঠ।—শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, বংশাবলী, মৃত্যু বা অন্তর্দ্ধানের বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে আছে। আদিপুরুষ হইতে যদুবংশের ধ্বংস পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষ ও রমনীর নাম ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ হইতে সম্ভূত। বংশের সমুদয় ইতিবৃত্ত এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পুরুষের কার্য্যাদির বিবরণ উল্লিখিত আছে। কবিকল্পিত পুরুষের পক্ষে এরূপ বর্ণনা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যেখানে বিবাহ করেন, সে সকল স্থান, বংশ ও নগর বা গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। কল্পিত মূর্ত্তি কি বিবাহ করে? শ্রীকৃষ্ণ যদি কল্পিত মূর্ত্তি হইত তাহা হইলে তাঁহার শ্বশুরালয়, শ্বশুর বংশ, বিবাহের স্থান, স্ত্রী ও আত্মীয়ের বিবরণ, বিবাহ ক্রিয়া, জন্ম, মরণ, লীলা ইত্যাদি সমুদয়ই কল্পিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা নহে। ঐ সমুদয় বংশ, স্থান, কীর্ত্তির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কল্পিতমূর্ত্তির পক্ষে কি ইহা সম্ভবপর?

সপ্তম।—শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতাশাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার শ্লোক সংখ্যা সপ্ত শত। এই জগদ্বিখ্যাত শাস্ত্রের আদ্যান্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখারবিন্দ নিঃসৃত মধুর বাক্যাবলীতে পরিপূর্ণ। বেদব্যাস ঐ সুমধুর বাক্যাবলীর সংগ্রাহক, সঞ্জয় উহার কথক, সমগ্র জগত উহার পাঠক, শঙ্করাচার্য্য—শ্রীধরস্বামী-আনন্দগিরি প্রভৃতি ইহার টীকাকার, আচার্য্য মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইহার অনুবাদক,* আচার্য্য ওয়েবর, সোপেনহর, প্রভৃতি ইহার প্রশংসক এবং মহা ধার্ম্মিক

* অনেকে কহিতে পারেন, সসীমবুদ্ধি বিশিষ্ট মানব অসীমশক্তি বিশিষ্ট পরমেশ্বরের কেমনে কল্পনা করিতে সমর্থ হইল? উত্তর এই, সসীম মানব অদ্যাপি সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানকে চিনিতে বা জানিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবেনা ইহা ধ্রুব সত্য। ভগবানের সম্পূর্ণ বর্ণনা, সসীম মনুষ্যদ্বারা এখনও হয় নাই। যাঁহারা ভগবানকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা সসীমবুদ্ধির লোক ছিলেন না। আর এক কথা এই ভগবান স্বয়ং তাঁহার, আদর্শ, ঋষিগণকে দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং কেবল কল্পনায় ঈশ্বরের বর্ণনার উৎপত্তি হয় নাই।—লেখক।

* শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতা শাস্ত্র পৃথিবীর ২৪টী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে।—লেখক।

যোগী ও সন্ন্যাসীবৃন্দের ইহা জ্ঞাননিধি। যদি কৃষ্ণ কবি-কল্পনা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভাগবত, সমগ্র মহাভারত, সমগ্র ভাগবৎ-গীতা, সমগ্র পৌরাণিক শাস্ত্র, গীতগোবিন্দ এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য কেবল কল্পনা কুহকে পরিপূর্ণ বলিতে হয়!! এই হিসাবে বাইবেল কোরাণ এবং জেন্দাবস্তা প্রভৃতি জগতের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র কেন কল্পনা-কুহক না হইবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নয়; কৃষ্ণ চরিত্র কবি-কল্পনা নহে এবং হইতে পারে না; কৃষ্ণচরিত্র যদি কল্পনা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একটা ধর্ম্মশাস্ত্রও কবি কল্পনা হইতে বাদ যায় না, একটা ধর্ম্মও তাহা হইলে কল্পনা রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হয় না; তাহা হইলে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, জিহুদেব, অর্হৎ, মুসা প্রভৃতি কোথায় থাকেন? তাহা হইলে সাক্ষ্য বিষয়ক আইন মালা (EVidence Act) এবং তৎসঙ্গে আদালত, বিচারক, ন্যায় বিচার যুক্তি ও বিবেককে জলে ফেলিয়া দিতে হয়।

অষ্টম। কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সখা ছিলেন না। কৌরবদিগের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে উত্তেজিত করা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণের শত্রু; কৌরবেরা কৃষ্ণকে তাঁহাদের শত্রুর প্রধান সহায় বলিয়া জানিতেন। সুতরাং কৌরবেরা কৃষ্ণকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। এই শত্রুরাই শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। কৌরবেরা এবং কুরুকুল পক্ষীয় পণ্ডিতেরা লক্ষাধিক বার কহিয়াছেন "আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়াছি, তাঁহার কূট মন্ত্রণা জানিয়াছি, তাঁহাকে পাণ্ডব প্রাসাদে যাইতে দেখিয়াছি" ইত্যাদি গীতায় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "তাহার পরে কৃষ্ণ কি কহিলেন? তদনন্তর কৃষ্ণ কি করিলেন?" ইত্যাদি। শত্রু পক্ষ হইতে ইহা শ্রীকৃষ্ণের শারিরীক অস্তিত্বের (নরদেহে বর্ত্তমান থাকার) অকাট্য, অখণ্ড, অনবদ্য, অমর প্রমাণ।

নবম।—জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৈরী। এই শত্রুরাও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি কথাও কহেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদেরই ইতিহাস লেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন। কল্পিত মূর্ত্তির সহিত অস্ত্র ও সেনা এবং সারথী লইয়া, বীরসাজে, কেমনে সমর সম্ভবে? এই রাজাধিরাজেরা, এই বীরেরা কি শিশু ছিলেন? তাঁহারা এত বড় যোদ্ধা ও বিক্রমী নরপতি হইয়া একটা কবি-কল্পনার মূর্ত্তির সহিত কি লড়াই করিতে গিয়াছিলেন? প্রকৃত কথা এই, "সম্ভবত্যো বাক্যস্থে বাক্য ভেদো নজায়তে।" অর্থাৎ জৈমিনি ঋষি লিখিয়া গিয়াছেন যাহা সত্য বা সম্ভব তাহাতে বাক্যভেদ চলে না। কৃষ্ণের নরদেহে বর্ত্তমান থাকার কথা জীবন্ত সত্য, ইহার উপরে তর্ক চলেনা। অবিবেকী পুরুষেরাই কূটতর্ক দ্বারা জগতের সমুদয় জাগন্ত সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে কিন্তু পরিণামে তাহা-

রাই পরাজিত হইয়া পৃথিবীতে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ইতিহাস ইহার অমর সাক্ষী। জগৎপূজ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কবিকল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা আর বালকের দ্বারা গিরিরাজ হিমালয়কে ধরাশায়ী করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উদ্যম করা একই কথা। (ক্রমশঃ) *

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও মধুর ভজন।

"এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা!
প্রলাপ করিল প্রভু শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষাইল।
সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)!

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের এই উপদেশ বাণী শিরোধার্য্য করিয়া আমরা শ্রীচৈতন্যাষ্টকের অষ্টম শ্লোক লইয়া অদ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই শ্লোকটি বিশাখা সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি। সখীগণ শ্রীমতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন "যখন শ্রীকৃষ্ণ তোতোমার প্রতি উদাসীন হইলেন তখন তুমিও কৃষ্ণকে উপেক্ষা কর।" ইহা শুনিয়া শ্রীমতির নির্ম্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব উদিত হইল। তাঁহার হৃদয়ে এককালে হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয়, উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্র, জল্প, প্রজল্প প্রভৃতি ভাব সকল উদিত হইল।

এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি যে শ্লোক পড়িল
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল॥

তথাহি।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্ম্মাহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ (১)

এই শ্লোকটি অতীব উপাদেয়। এতদ্‌সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—

ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে এই শ্লোক গণি॥

আমায় আলিঙ্গন করত আত্মসাৎ করুণ অথবা অদর্শনে আমায় মর্ম্মব্যথা দিউন।

* প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অন্যান্য প্রমাণ এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের কথা প্রস্তাবান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম —লেখক।

(১) পদ্যাবলীতে শ্রীরাধার বিলাপ প্রকরণে ৩৩১ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবোক্ত শ্লোক।

সেই লম্পট যেরূপ ইচ্ছা আমায় তাহাই করুণ, আমার তাহাই প্রিয়, কারণ আমি তাঁহার পাদরতা দাসী ও তিনি আমার প্রাণনাথ অপর কেহই নহেন (অর্থাৎ তিনি প্রাণনাথ ভিন্ন কেহ নহেন)।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পায় পার ॥

এই শ্লোকটি মহাপ্রভু শ্রীমতীর ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন। জগতে গোপীভাবের সমান ভাব নাই, গোপীপ্রেম সমান প্রেম নাই।

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥

গোপীভাব প্রাপ্ত না হইলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

লম্পটঃ—বসহুখরাশি, বহুবল্লভীবত।

যথা তথা বিদধাতু :—যেরূপ ইচ্ছা আমার তাহাই করুন। অথবা, অন্য বল্লভীর সহিত বিহার করুন। এইরূপ অর্থকরায় কেহ কেহ এই শ্লোকে কাব্যরসের দোষ আশঙ্কা করিতে পারেন, তাহা পরিহারার্থ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীদশমের ৪৭ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে শ্রীউদ্ধব ব্রজগোপিকাগণের মহাভাব দেখিয়া মনে করিলেন ভগবানের কৃপালাভ করিতে হইলে জাতি, আচার, জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, একান্ত ভজনই প্রয়োজন, এই জন্য বলিলেন,—

ক্কেমা স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচার দুষ্টাঃ
কৃষ্ণে কচৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরো নু ভজতোহবিদুষোহপি
সাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ।

এই সমস্ত বনচরী (বুনানী), ব্যভিচার দুষ্টা (পতি ত্যাগ করিয়া যার বুদ্ধিতে ভগবানের সহিত সঙ্গতা), অবোধ স্ত্রীলোক গুলিই বা কোথায়, আর পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মহাভাবই (যাহা নারদাদী সর্ব্বভক্তদুর্ল্লভ), বা কোথায় ? উভয়ের মহদন্তর। অহো! বুঝিলাম, একান্ত ভজনকারী (দারাপুত্র কুলশীল পতিগেহ প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানে একান্ত অনুরক্ত) অজ্ঞ হইলেও ভগবান্ তাহাকে কৃপা করিয়া স্বপ্রেমরসাস্বাদ প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন গুণ না জানিয়াও ঔষধের রাজা অমৃত সেবন করিলে সর্ব্বব্যাধির শান্তি হয় তদ্রূপ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয় ছেনঃ—ব্যভিচারদুষ্টা স্ত্রীলোক তিন প্রকার, যথা, (১) যে পতি ও উপপতি উভয়ের সহিত রমণ করে। সে লোকাচার শাস্ত্রানুসারে নিন্দনীয়া হইলেও একপুরুষ মাত্র তাহার প্রীতিবাহুল্য থাকায় সে রসশাস্ত্রানুসারে প্রশংসনীয়া। (৩) যে স্বীয় পতিকে ত্যাগ করিয়া উপপতি বুদ্ধিতে ভগবানের সহিত রমণ করে, সে অজ্ঞ লোকের নিকট নিন্দনীয়া হইলেও অভিজ্ঞ লোকের নিকট প্রশংসনীয় এবং লোকাচার, শাস্ত্রানুসারে পরম পূজনীয়।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে "লম্পট" বলিয়াছেন।

যখন শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের বা বহু ভক্তের মন যোগাইতে হয় তখন তাঁহার লাম্পট্য ভিন্ন উপায় উপায় কি? কারণ তিনি সকলেরই। আমরা সমুদয় মনুষ্যগণ প্রকৃতি —তাঁহার পত্নী। প্রতি আত্মায় তিনি রমণ করেন তজ্জন্যই তিনি আত্মারাম।

"প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ"। (শ্রীপদশমে ২৯। ৪২)।

গোপাঙ্গনাগণের প্রতি হাস্য করিয়া ও সদয় হইয়া আত্মারাম রমণ করিয়াছিলেন।

তিনি পরমপুরুষ, সুতরাং আমাদের পতি।

একদা মীরাবাই বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে রূপ গোস্বামী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃতি সম্ভাষণ করেন না। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র জগৎ পতি, তিনিই একমাত্র পুরুষ, আমরা সকলেই প্রকৃতি। এই কথা মীরাবাই ভঙ্গীক্রমে শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণবিনে॥
(ভক্তমাল ২২ মালা)।

ভগবান্‌কে নানাকার্য্য করিতে হয়। সমস্ত জীব সমান সিদ্ধাবস্থ নহে। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ যখন শ্রীরামচন্দ্রকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন যে তাঁহারা স্ত্রী হইয়া গোকুলে উদ্ভব হইলে তাঁহাকে ভোগ করিতে পারিবেন। তিনি সেই কথা মত সিদ্ধদেহ প্রাপ্তা গোপাঙ্গনাগণকে বংশী স্বরে মোহিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। যাজ্ঞিক পত্নীগণ সিদ্ধদেহ প্রাপ্তা ছিলেন না, এই জন্য তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুভার্য্যারত, কিন্তু আমরা ধন, জন, পতি, পুত্র, কুল, মান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান প্রভৃতি উপপতি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই ভজনা করিব, কারণ তিনিই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ।

ব্রজললনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দিয়া সুখী হইতেন:—

"বন্ধু তোমার গরবে, গরবিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটী চরণ,
সদা লৈয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণ,
প্রিয়-তম করিমানি॥
নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চাঁদা।
জ্ঞান দাসে কয়, তোমারি পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥"

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে গোপীভাব প্রাপ্ত না হইলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ রাধাভাবে ভাবিত হইয়া ললিতাসখী (স্বরূপ দামোদর) এবং বিশাখা সখীর (রামানন্দ রায়) সহিত

উক্ত শ্লোক আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীমতীর ভাব গ্রহণ করা জীবের সাধ্য নাই। শ্রীমতীর অষ্ট প্রধানা সখীর ভাব অনুকরণ করাও যে সে অধিকারীর কার্য্য নহে। নারায়ণের অঙ্কস্থা লক্ষ্মী ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহিপায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)।

(এই দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদশমে আছে)

গোপীর আনুগত্যে কিরূপে ভজন করিতে হয়?

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥" (ঐ)

পাঠকগণের সুবিধার্থ ব্রজলীলার ও চৈতন্য-লীলায় কতক সখীগণের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। শ্রীচৈতন্যই মহাভাবময়ী শ্রীরাধা।

"গৌর দেহ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুতবিনা তেঁহো না স্পর্শে-অন্য জন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

ব্রজলীলা	শ্রীচৈতন্যলীলা।
অষ্ট প্রধানা সখী——	অষ্ট প্রধান মহান্ত।
১। ললিতা——	স্বরূপ দামোদর।
২। বিশাখা——	রামানন্দ রায়।
৩। চিত্রা——	শিবানন্দ সেন।
৪। চম্পকলতা——	রামানন্দ বসু।
৬। ইন্দুরেখা——	গোবিন্দানন্দ।
৭। রঙ্গদেবী——	গোবিন্দ দাস।
৮। সুদেবী——	বাসুদেব ঘোষ।
অষ্ট মঞ্জরী	অষ্ট গোস্বামী।
১। রূপমঞ্জরী——	শ্রীরূপ গোস্বামী।
২। লবঙ্গ মঞ্জরী——	শ্রীসনাতন গোস্বামী।
৩। রস মঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী
৪। রতি মঞ্জরী—	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী
৫। গুণ মঞ্জরী—	শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।
৬। মঞ্জুলালী মঞ্জরী—	শ্রীলোকনাথ গোস্বামী
৭। বিলাস মঞ্জরী——	শ্রীজীব গোস্বামী।
৮। প্রেম মঞ্জরী——	শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী।

উক্ত প্রধানা অষ্ট সখীর প্রত্যেকের অনুগতা আট জন উপসখী অর্থাৎ চৌষট্টি জন উপসখী আছেন।

ব্রজলীলা।

১। ললিতাসখীর উপসখী

রত্নপ্রভা, রত্নকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা।
সুমুখী চ, ধনিষ্ঠা চ, কলহংসী, কলাপিনী॥

চৈতন্যলীলা।

১। স্বরূপ দামোদরের অনুগত। বাম-ভাগের নামের যথাক্রমে আচার্য্যরত্ন, রত্নগর্ভ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, গোবিন্দ গরুড়, মুকুন্দ দত্ত, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর।

২। বিশাখা সখীর।

মাধবী, মালতী,চন্দ্ররেখিকা গুঞ্জরী তথা। হরিণী, চপলাচৈব, সুরভী চ, শুভাননা।

৩। চিত্রা সখীর যুথ।

রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী, সুগন্ধিকা। কামিলা, কামনাগরী, নাগরিকা চ নাগরী॥

৪। চম্পক লতার।

কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা। চন্দ্রিকা, চন্দ্রতিলকা, পদ্মাক্ষী চ সুমন্দিরা।

৫। তুঙ্গ বিদ্যার।

মঞ্জুমেধা সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা। তনুমধ্যা, মধুস্পন্না, গুণচূড়া বরাঙ্গদা॥

শ্রীচৈতন্য লীলা।

ব্রজলীলা।

৬। ইন্দুরেখার তুঙ্গভদ্রা, রসতুঙ্গা, রঙ্গবাটী সুসঙ্গদা। চিত্ররেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মোদনী, মদনাগণা॥

৭। রঙ্গদেবীর।

কলকণ্ঠী, শশীকলা, কমলা, মধুরেন্দিরা। কন্দর্প সুন্দরী কাম লতিকা প্রেমমঞ্জরী।

৮। সুদেবীর।

কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা। হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী, মনোহরা॥

২। যথাক্রমে।

মাধবাচার্য্য, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্র, বাসুদেব দত্ত, নন্দনাচার্য্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর, সুবুদ্ধি মিশ্র।

৩। যথ ক্রমে।

শ্রীরাম পণ্ডিত, জগন্নাথ দাস, জগদীশ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ, রামমুকুন্দ, মুকুন্দানন্দ, পুরন্দরাচার্য্য,নারায়ণ বাচস্পতি।

৪। যথাক্রমে।

মধুপণ্ডিত, মকরধ্বজকর, দ্বিজ রঘুনাথ, বিষ্ণুদাস, পুরন্দর মিত্র, গোবিন্দাচার্য্য, পরমানন্দগুপ্ত, বলরাম দাস।

৫। যথাক্রমে।

মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, গোবিন্দ ঠাকুর, কবিকর্ণপুর, শ্রীকান্ত ঠাকুর, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীচৈতন্যলীলা।

৬। যথাক্রমে।

পরমানন্দগুপ্ত, বল্লভ ঠাকুর, জগদীশ পণ্ডিত, বনমালী দাস, শ্রীকর পণ্ডিত, শ্রীনাথ মিশ্র, লক্ষ্মণাচার্য্য, পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

৭। যথাক্রমে।

কাশী মিশ্র, শিখিমাহাতি কালিদাস, শ্রীমান্ পণ্ডিত, কবিচন্দ্র ঠাকুর, হিরণ্যগর্ভ, জগন্নাথ সেন, দ্বিজপীতাম্বর।

৮। বাসুদেব ঘোষের যথাক্রমে।

রাঘব পণ্ডিত, রুদ্র পণ্ডিত, মকরধ্বজ পণ্ডিত, কংসারি সেন, জীবপণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস, কবিচন্দ্র আচার্য্য।

মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাবের অন্তই নাই।

"যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতার্থ্য)।

ব্রজ গোপিকাগণের প্রাধান্যের কারণ এই যে তাঁহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন। সংসারের নিয়ম এই যে লোকে নিজের স্বার্থের জন্য পরস্পরকে ভালবাসে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তৎপত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিয়াছিলেন।

"সহোবাচ ন বা অয়ে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।"

(বৃহদারণ্য কোপনিষদি)।

অয়ে মৈত্রিয়ি! পত্নী, পতিকে সুখী করিবার জন্য পতিকে ভালবাসে না, আত্ম-সুখের জন্য পতিকে ভালবাসে।

কিন্তু বেদের এই সিদ্ধান্ত ব্রজাঙ্গনাগণের দ্বারা ভ্রান্ত সপ্রমাণিত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরী গণের প্রণয়ের গাঢ়তা দুর্ব্বিগাহ্য।

"বুঝি না প্রণয়ের রীতি,
বেদ বিধি ছাড়া নীতি।"

ব্রজাঙ্গনা গণের নিজ সুখ বাঞ্ছা কিছু ছিল না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখোদ্দেশে সমুদয় কার্য্য করিতেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কহিয়াছিলেন—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

(শ্রীভাগবত ১০। ৩১। ১৯)।

হে প্রিয়! তোমার যে চরণপদ্ম আমাদের কঠিন স্তনের উপর আস্তে আস্তে রাখিতে ভীত হইতাম, কারণ তোমার পাদপদ্মে পাছে ক্লেশ বোধ হয়, সেই পদদ্বারা তুমি যে কঙ্করপূর্ণ অরণ্যে ভ্রমণ কর, তাহাতে কি আমাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগে না? কারণ তুমি আমাদের জীবন।

"নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গেত ব্যবহার॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

উপরে বলা হইল যে বেদের সিদ্ধান্ত ব্রজগোপিকাগণের নিকট ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। তবে ব্রজ গোপিকারা কি শ্রুতিগণের বাহিরে? তাহা নহে।

শ্রুতিগণ ব্রজগোপীকারূপে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

"সমস্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদো হ খিলাঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্য মমমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ॥
তপাংসি শ্রদ্ধায়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে।

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

সম্যক্ প্রকারে সূক্ষ্মদর্শিনী সমুদায় উপনিষদ্ গোপীগণের পরমসৌভাগ্য দর্শন

করিয়া ও বিস্মিত হইয়া এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া প্রেমবতী হইয়া ব্রজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সাধারণ গোপীদিগের ভাব শ্রুতি নির্দ্ধারিত হইল। (শ্রুতিগণের প্রার্থনা শ্রীভাগবতের শ্রীদশমে দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য পুরাণেও এই বিষয় বর্ণিত আছে।

পদ্মপুরাণে আছেঃ—

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপ কন্যকাঃ।
দেব কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন॥"

হে রাজেন্দ্র। গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই শ্রুতি চতুষ্টয়। কেহবা দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ, সাধনা বলে শ্রীহরির বরে গোকুলে গোপকন্যারূপে অবতীর্ণা, কেহ বা দেবকন্যাগণ, স্বরূপতঃ কেহই মানুষী নহেন॥

বৃহদ্বামন পুরাণে আছেঃ—

"কন্দর্প কোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসিনঃ।
কামিনীভাব মাসদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য সংশয়ঃ॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাহ জনিমস্তথা॥"

পুরাকালে নিখিল মন্ত্রশক্তি স্বরূপিনী চতুষ্টয় শ্রুতি স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে শ্রীভগবান্ নারায়ণের ভুবনমোহন মধুর মূর্ত্তিদর্শনে কামকাতর বিমুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে ভগবন্। কন্দর্পকোটিলাবণ্য সম্পন্ন তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদের মন সকল কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া অসংশয় কামক্ষুব্ধ হইয়াছে, তোমার লোক—অর্থাৎ নিত্যধাম গোলোক বাসিনী নিত্যচিন্ময়ী গোপিকাগণ যেমন তোমাকে রমণজ্ঞানে ভজনা করেন, আমাদিগেরও সেইরূপ তোমাকে ভজনা করিতে ঐকান্তিক হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে আছেঃ—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্য বাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥"

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিসকল সুন্দর বপু শ্রীহরি রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার স্ত্রী হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কামের দ্বারা হরিকে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

(রাসলীলার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মল্লিখিত যুগধর্ম্মের ২২২—২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তাত্ত্বিক সভার সভ্যগণ কর্তৃক সপ্রমাণিত হইতেছে যে একই মানব ভিন্ন ভিন্ন জন্মে কখনও পুরুষ ও কখনও স্ত্রী হইতেছেন। পৃথিবীর ও মানব জাতির আদিম ইতিহাস এখনও গুপ্তবিদ্যাভাণ্ডারে রক্ষিত হইতেছে এবং পুরাণেও পওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবীর আদি অবস্থায় পুংস্ত্রীদের পার্থক্য ছিল না। তখন জনন ক্রিয়ার কামভাবও ছিল না।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে "লম্পট" বলিয়াছেন বহু বল্লভীর মন যোগাইতে হইলে তাঁহাকে "লম্পট" না হইয়া উপায় নাই। প্রধান প্রধান সাধক মাত্রই শ্রীকৃষ্ণকে এই বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সহিত ত্রিহুতের রঘুনাথ উপাধ্যায়ের যে কথোপকথন হয় তাহাও মহাপ্রভু উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন "তোমার উপাস্য ভগবান্ কে ?" উপাধ্যায় মহাশয় উত্তর করেন -

"কং প্রতি কথয়িতুমীশে সংপ্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি তনয়া কুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম॥

আমি এ কথা কাহাকেই বা কহিব, কহিলেও সম্প্রতি কেই বা বিশ্বাস করিবে ? আমার ভগবান্ যমুনাতীর কুঞ্জে ছোট ছোট গোপবধূগণের বিট (লম্পট)

সন্ন্যাসী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (লীলাশুক) ব্যাজস্তুতি স্থলে বলিয়াছেন——

"অদ্বৈতবীতি পাথকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হটেন কেনাপি ববং সঠেন দাসীকৃত গোপবধূ বিটেন॥"

আমরা সন্ন্যাসিগণ ঘোর অদ্বৈতবাদী এবং শ্রেষ্ঠ আত্মারাম ভগবানের নিকট আমাদের কিছুই বাঞ্ছিত নাই। তথাপি শ্রীকৃষ্ণরূপ কোন শঠ, গোপবধূ-লম্পট বল পূর্ব্বক আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেশে ধরিয়া তাঁহার নিজদাস করিয়াছেন।

"গান মধ্যে কোন্ গানে জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেম কেলি সেই গীতের মর্ম্ম॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠপ্রাণে ?
রাধাকৃষ্ণে প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত)।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে হইলে সমুদয় মায়াবন্ধন ছেদন প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরমভক্ত সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীউদ্ধব বলিয়া ছিলেন—"আমার এই প্রার্থনা যে আমি যেন গোপীগণের চরণরেণু সেবিত বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতা ওষধির কোন একটা হই। যেহেতু ইহাঁরা দুস্ত্যজ স্বজন এবং কুলধর্ম্মাদি মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়া ছিলেন। (শ্রীদশমে)

মনুষ্যের অষ্টাপাশ, পাশবদ্ধ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই॥

"লজ্জা ঘৃণা ভয়ং মানং জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমম্।
কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

গোপাঙ্গনাগণ সমুদয় পাশ ছেদন করিয়াছিলেন, একলজ্জা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহাও বস্ত্রহরণ কালে ছেদন করিয়া দিয়া দিলেন। তন্ময়ত্ব না হইলে, আমিত্ব না ঘুঁচিলে, শ্রীকৃষ্ণকে কোনরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গোপবালিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাওয়ার জন্য একমাস কাল ব্রত ধারণ করিয়া কাত্যায়নীকে পূজা করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণপ্রেমলাভের বর লইয়াছিলেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের লজ্জা ছেদন করিয়া ব্রতফলপ্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন।

ব্রজকুমারীগণের প্রার্থনা এই ছিল যে—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

ব্রজাঙ্গনাগণের কোন কাম ছিল না, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বস্ত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন।

"ন মথ্যাবেশিত ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে
ভর্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায়
নেশতে॥"

যে সকল ব্যক্তির চিত্ত আবেশিত হয় তাহাদের কাম বিষয় ভোগার্থ কল্পিত হয় না। কারণ যবাদি বীজ ভর্জিত, হইলে তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না।

এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছিলেন

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণ পাদার বিন্দে
নব নব রস ধামন্যু দ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

যে অবধি আমার চিত্ত প্রতিক্ষণ নব নবায়মান রসধাম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই অবধি নারী-সঙ্গম স্মৃতিপথে উদিত হইলে মুখবিকার ও সাতিশয় নিষ্ঠীবন উপস্থিত হয়।

গোপাঙ্গনাগণের কাম ছিল না, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে প্রেম ছিল। স্বর্ণ ও লৌহে যে প্রভেদ, কাম ও প্রেমে তত প্রভেদ। কামে নিজ সুখেচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সুখবাঞ্ছা করিয়া থাকেন। তাহাতে নিজের সুখেচ্ছা নাই।

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈশে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)।

কামও প্রেমের পার্থক্য—

অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ (ঐ)।

ব্রজললনাগণের কাম গন্ধও ছিল না—

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥ (ঐ)।

তাঁহারা কৃষ্ণকে সুখ দিয়া সুখী হইবেন—

আত্মসুখ দুঃখে গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥ (ঐ)
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ (ঐ)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী বি, এল্।

প্রাচীন মিশর।

কৃষি ও শিল্প।

প্রাচীন মিশর, প্রায় সর্ব্ববিষয়েই, পাশ্চাত্য-জগতের আদর্শ স্বরূপ ছিল। মিশরে সঞ্চিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের অমৃত কমণ্ডলু হইতে বিন্দুমাত্রলাভে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত, পৃথিবীর জ্ঞানপিপাসুগণ, যেমন একদিকে, মিশরের উপাসনা করিতেন; নর-শোণিতপ্লাবিনী, নৃমুণ্ডমালিনী ভীষণা রাজ-নীতির কঠোরকরে মিশর কোন্ মন্ত্রবলে, বরাভয়ের প্রাণদ-মাধুরী ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই গূঢ়মন্ত্রে দীক্ষা লাভের নিমিত্ত যেমন রাজনৈতিকবৃন্দ মিশরের দ্বারস্থ হইয়া সফল-মনোরথ হইতেন; তেমন, অন্যদিকে, কৃষি ও শিল্পবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যও, পৃথিবীর একার্দ্ধ, অনুগত শিষ্যের ন্যায় উৎসুক নয়নে, মিশরের পানে তাকাইয়া থাকিত। বস্তুতঃ প্রাচীন সময়ে, মানব-জগতের বিকাশ ও উন্নতিকল্পে, মিশর যাহা করিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই।

গ্রীসের জগদ্বিখ্যাত কবি হোমার, অভিনব অমর-সঙ্গীতে তান ধরিবার নিমিত্তই বুঝি বা মিশরে যাইয়া, মিশরীয় ত্রিতন্ত্রীর সহিত তদীয় ভুবনমোহিনী বীণায় সুর বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ ও প্লেটো প্রভৃতি প্রধান প্রধান দার্শনিক এবং লাইকারগাস্ ও সোলনাদি অদ্বিতীয়নামা পুরাতন ব্যবস্থাপক বা রাজনৈতিক পণ্ডিত, নিজ নিজ অবাপনা পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে, মিশরের টোলে পাঠ লওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। শব্দের প্রবাহে মনোমাদিনী-উদ্দীপনার তরঙ্গ তুলিতে হইবে, বক্তাগনের আগ্রহে মিশরের শরণ লইয়াছেন। লেখক লেখনী করে লইয়া, মধু-লুব্ধ মধুকরের ন্যায়, মিশরের কমল-কাননে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অন্যদিকে আবার কৃষাণ, লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মনের আনন্দে মিশরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণ মাথা পাতিয়া লইতে ধাবিত হইয়াছে। চিত্রকর চিত্র, স্থপতি স্থাপত্য, তাঁতী তাঁত ও কর্ম্মকার তাহার কারুকৌশল, বলিতে কি, প্রাচীন পৃথিবীর প্রায়সর্ব্বশ্রেণীস্থ শিল্পকরই আপন আপন শিল্পচাতুর্য্যে উৎকর্ষ বিধানার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে মিশরেরই মুখাপেক্ষা করিয়াছে।

প্রাচীন মিশরের এই পৃথ্বীবিশ্রুত গৌরব ও অদ্বিতীয় মহিমার আদি নিদান ও প্রধান উপকরণ কৃষি ও শিল্প। মিশরীয় প্রাচীন কৃষি ও শিল্পবিষয়ে যৎসামান্য আলোচনাই অদ্যকার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৃষি ও শিল্পের কথা বলিতে হইলে, অগ্রে কৃষিজীবী কৃষাণ, পশুপালক রাখাল ও কারুনিপুণ শিল্পীর অবস্থা পর্য্যালোচনা আবশ্যক। কৃষি ও শিল্প—সৃষ্টি; কৃষাণ, রাখাল ও শিল্পী উহার স্রষ্টা। কর্ম্মের উৎকর্ষ চিরদিনই কর্ত্তার কৃতিত্ব-সাপেক্ষ। মিশর, যে সময়ে, কৃষি ও শিল্প

বিষয়ে পৃথিবীর আদর্শরূপে সম্মানিত, সে সময়ে অবশ্যই মিশরের কৃষক, পশুপালক ও শিল্পকরগণও কৃতিত্ব ও কর্ম্ম-কৌশলে তদানীন্তন পৃথিবীতে অদ্বিতীয়রূপে পরিগণিত ছিল।

কৃষি ও শিল্পের তাদৃক্ স্ফূর্ত্তি ও উৎকর্ষ লাভের মূল হেতু, মিশরের তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা। অন্যান্য দেশের ন্যায়, মিশরীয় সমাজেও, ধর্ম্মযাজক, যোদ্ধৃসম্প্রদায় ও বিদ্বৎসমাজের আসন শীর্ষ স্থানে এবং কৃষক, পশুপালক ও শিল্পজীবীর স্থান নিম্নতর স্তরে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু অন্য দেশের সহিত মিশরীয় ব্যবস্থার পার্থক্য এই যে, মিশরে কৃষক প্রভৃতি নিম্নস্তরে অবস্থিত হইলেও সামাজিক, আদর, সম্মান ও আবদারে বঞ্চিত ছিল না। ভারতে ঋষি-যুগে কৃষি যেরূপ সম্মানের চক্ষে পরিলক্ষিত হইত, মিশরেও কৃষির প্রায় তেমনই সম্মান ও গৌরব ছিল। মিশরের দুই একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ ভিন্ন, অন্য সর্ব্বত্রই, রাখালেরা, ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট ব্রজরাখালের ন্যায়, মিশরীয় সমাজে সসম্ভ্রমে সংবর্দ্ধিত হইত। শিল্পী সমাজিক সম্মানে এই দুই শ্রেণীর সমকক্ষ না হইলেও, ভারতীয় তাঁতী, কামার, কুমার ও ছুতার প্রভৃতির ন্যায়, অপাংক্তেয় বা অবজ্ঞেয় ছিল না। তাহারা, সমাজের এক দেশে, যথোচিত আদর, গৌরব ও সম্মানে, আপ্যায়িত, প্রীত ও পরিতুষ্ট রহিবার প্রচুর সুযোগ প্রাপ্ত হইত। কৃষাণ, রাখাল ও শিল্পিগণ, আপন আপন কেন্দ্রে, আর্থিক লাভ, গুণের পুরস্কার ও সগৌরব সম্ভ্রমে এতদূর পরিতৃপ্ত থাকিতে, পারিত যে, উচ্চতর ব্যবসায়ের আশ্রয়ে সমাজের উচ্চতর সোপানে অনধিকার প্রবেশের প্রবৃত্তি প্রায়শঃ তাহাদিগের মনে উদিত হইত না। কাহারও প্রাণে কদাচিৎ ঈদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষার উদয় হইলেও, সামাজিক বন্ধন ও ব্যবস্থা, ইহার এতদূর প্রতিকূল ছিল যে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া পড়িত।

প্রাচীন মিশরবাসী জানিত যে, তাহারা নোয়ার পুত্র,—শ্যাম বা হেমের সন্তান। অবস্থাচক্রে যে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকুক না কেন, সকলেই এক আদি পুরুষের বংশধর। এই স্মৃতি সর্ব্বদাই তাহাদিগের মনে প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ সত্যবৎ প্রতিভাত ছিল। সুতরাং সিংহাসনারূঢ় সম্রাটও কুটীরবাসী কাঙ্গালকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না; বরং এই হিসাবে, তাহাকে আপনার তুল্য জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বদাই সম্মানের আদরে আপ্যায়িত রাখিতেন। এই হেতুই, প্রাচীন মিশরে কোন ব্যবসায় ঘৃণ্য বা অবজ্ঞার বস্তুরূপে অবহেলিত হইতে পারিত না। যাহা দেশ ও সমাজের জন্য প্রয়ো যতই নীচ হউক না কেন, সে ব্যবসায়কে ঘৃণার চক্ষে দেখা, তদানীন্তন মিশরীয় রাজবিধি অনুসারে অপরাধরূপে পরিগণিত ছিল।

ব্যবসায় গুণগত; জাতি ব্যবসায়গত। মানুষ আপন আপন প্রবৃত্তি, শক্তি ও গুণ অনুসারে, এক এক প্রকার কর্ম্মের অনুসরণে জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছে, এবং সেই কর্ম্মই কালে এক এক শ্রেণীর ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। পিতা যে ব্যবসায় অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, পুত্রও স্বভাবতঃ

সেই ব্যবসায়ের আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত মনে করিয়াছে। এইরূপে এক এক ব্যবসায়ে জনসংখ্যা বেশী হইয়া পড়িলে, সেই এক ব্যবসায়ী জনসমূহ একটা জাতি বা সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকার বিভিন্ন জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সকলেরই মূল, বোধ হয়, এই ব্যবসাগত পার্থক্য। বস্তুতঃ জাতিভেদের প্রকৃত অর্থ ব্যবসায়ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মিশরেও এইরূপে ব্যবসাগত এক প্রকার জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কৃষাণ পুরুষানুক্রমে কৃষাণ, কর্ম্মকার পুরুষানুক্রমেই কর্ম্মকার। কৃষাণের সন্তান কৃষাণ ও কর্ম্মকারের পুত্র কর্ম্মকার ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিত না। এতৎ সম্পর্কে মিশরে সামাজিক বন্ধনের যেরূপ দৃঢ়তা ছিল, ভারতেও, অতি প্রাচীন সময়ে, ততটা আঁটাআঁটি ছিল বলিয়া মনে লয় না। সেই উন্নতির দিনে,—মিশরের সেই ঋষিযুগে, কোন ক্ষত্রিয় সন্তানের সাধ্য ছিল না যে, সে সাধনাবলে বিশ্বামিত্র ঋষি হয়, অথবা কোন ব্রাহ্মণসন্তান দ্রোণাচার্য্যরূপে শরাসনকরে সমর-প্রাঙ্গণে ক্ষত্রিয়বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। মিশরে সামাজিক বন্ধন ও রাজকীয় ব্যবস্থার অমোঘ বিধানে, এক এক ব্যবসায়ে, এক এক সম্প্রদায়, পুরুষানুক্রমে সীমাবদ্ধ রহিত। অধুনা ভারতবর্ষে, ব্যবসায় জাতির গণ্ডীতে একেবারেই অবরুদ্ধ নহে। ভারতে তাঁতী, কর্ম্মকার ও ছুতার প্রভৃতি, আপন আপন পৈতৃক ব্যবসায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া কখন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কখন উকীল, কখন ডাক্তার এবং কখন বা হাকিমরূপে সম্ভ্রান্ত পদবীতে সমারূঢ় হইতেছে; আর তাহাদিগের পরিত্যক্ত উপকরণ বা যন্ত্র সমূহের অঙ্গে Mechanic বা Technical বিদ্যালয়ের মার্কা লাগাইয়া ব্রাহ্মণসন্তানও অম্লানবদনে সেই চিরনিষিদ্ধ শিল্পের আশ্রয়ে জীবিকার পথ করিয়া লইতেছেন। তবে কথা এই যে, এই ব্যবসায়-পরিবর্ত্তনে জাতীয়তার পরিবর্ত্তন বা জাতীয় মর্য্যাদার কোনরূপ হানি ঘটিতেছে না। কায়স্থ-চূড়ামণি বংশমর্য্যাদায় হীনতা প্রাপ্ত না হইয়াও, কলমের হাতে তাঁতীর তাঁত ধরিয়া বসিতেছেন, তাঁতীও আবার তাঁত ছাড়িয়া দিয়া, বংশমর্য্যাদায় একইঞ্চি উপরে উঠিতে না পারিলেও কায়স্থের গদিতে আরূঢ় হইয়া, আলবালায় তামাক টানিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। আইন ইহার প্রতিকূল নহে, সমাজ অংশতঃ প্রতিকূল হইলেও, সমাজের নিষেধ এখন তত গ্রাহ্য নহে। কিন্তু মিশরে এইরূপ স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবসায়-নির্ব্বাচন, আইনতঃ নিষিদ্ধ; সুতরাং দণ্ডার্হ অপরাধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ, মিশরের এই অবস্থাকেই, মিশরীয় কৃষি ও শিল্পের অত্যধিক উন্নতি ও উৎকর্ষের মূল নিদানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যবসায়ীর বংশে যাহার জন্ম, তাহাকে সেই ব্যবসায় লইয়াই জীবন কাটাইতে হইত। পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া কাহারও এক তিল ডানে বা বাঁয়ে হেলিবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং, সকলেই শৈশবাবধি নিজ নিজ ব্যবসায় শিক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করিত।

ভগবানের ব্যবস্থা, মনুষ্যকৃত জাতিবিচার বা ব্যবসায়ভেদের মুখাপেক্ষা করিতে জানে না। মিশরীয় কৃষক ও শিল্পব্যবসায়ীদিগের নিম্ন বংশেও, সময় সময়, বিধাতার বিধানে প্রকৃত প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটিত। কিন্তু সে প্রতিভা, অন্যপথে পরিচালিত হইতে না পারিয়া, পূর্ণ-শক্তিতে আত্ম পৈতৃকব্যবসায়েই নিয়োজিত রহিতে বাধ্য হইত। সেই পৈতৃক ব্যবসায় যতই নীচ হউক না কেন, উহাতে সামাজিক সম্মান, সম্ভ্রম বা অর্থের অপ্রতুল ছিল না। সুতরাং প্রতিভা পৈতৃক ব্যবসায়েই, আকাঙ্ক্ষার চরম-তৃপ্তির পথ দেখিতে পাইয়া, আন্তরিক উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত উহাতেই লাগিয়া থাকিতে ভালবাসিত। ক্রমিক উন্নতি ও উৎকর্ষ এই অবস্থারই অবশ্যম্ভাবি ফল। বস্তুতঃ, ঈদৃশ সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা, এবং যে যে ব্যবসায়ীই হউক না কেন, শ্যাম বা হেমের বংশধররূপে, সকলেই তুল্যরূপে সম্মানার্হ, এই সর্ব্বজননিষ্ঠ সংস্কার ও উদারতা, এই দুই কারণেই, প্রাচীন মিশরে, সর্ব্ববিধ শিল্প ও কৃষিই চরম উৎকর্ষে যাইয়া পঁহুছিয়াছিল।

মিশরের সেই সৌভাগ্যযুগে, সেই সুদিনে, শিল্প, কৃষি ও পশুপালন তত্ত্বে কত দিক দিয়া কতরূপ অভিনব আবিষ্কার ও কর্ম্মপ্রণালীতে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনদ্বারা মিশরে শিল্পাদির উন্নতি, বাণিজ্যের সুবিধা ও সুলভ জীবনোপায়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকলের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে মাত্র একটির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পক্ষিণী প্রসূত ডিম্বের উপর কিছুদিন অহোরাত্র উপবিষ্ট রহিয়া ডিম্বে তা দিয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে কতিপয় দিবস এইরূপে কষ্ট করিলে, ডিম ফোটে এবং উহা হইতে ছানা বহির্গত হয়। পক্ষিণী এই কর্ম্মে একস্থানে বহুসময় ব্যাপিয়া আবদ্ধ ও অপ্রচুর আহারে অর্দ্ধভুক্ত থাকিতে থাকিতে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে।

মিশরবাসী কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইবার এক বিচিত্র কৌশল আবিষ্কার করিয়া, গৃহ-পালিত মুরগীদিগকে ডিমে তা দিবার ক্লেশ হইতে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি দান করিয়াছিলেন। অণ্ড প্রসবের পর মুরগীরা স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত; আর যথাসময়ে চুল্লীর দ্বার দিয়া তাহাদিগের প্রসূত ডিম্ব হইতে সুস্থ ও সবলকায় ছানা গুলি সারি বাঁধিয়া বাহির হইয়া আসিত, এবং স্বভাবের প্রণোদনায় তাহাদিগের সঙ্গে যুটিয়া শৈশব-উল্লাসে আহার অন্বেষণে বিচরণ করিত।

মিশরবাসী একপ্রকার চুল্লী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ চুল্লীতে হাজার হাজার ডিম সাজাইয়া রাখা যাইত। চুল্লীস্থিত ডিমগুলিতে এমন কৌশলে কৃত্রিম উপায়ে তা দেওয়া হইত যে, মুরগী ডিম্বের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া তা দিতে থাকিলে, যে পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ার কথা, উহাতে তাহা অপেক্ষা একবিন্দুও বেসী বা কম উত্তাপের উদ্ভব হইতে পারিত না। সুতরাং, এই প্রণালীতে উৎপাদিত ছানা গুলিকে স্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন ছানা অপেক্ষা, কোন অংশেই

ক্ষীণশক্তি বা নিস্তেজ হইতে দেখা যায় নাই।

মিশরে চির নিদাঘ বিরাজমান। সুতরাং সে দেশের উত্তাপ স্বভাবতঃই বড় প্রখর। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত নিদাঘের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত একটু কম অনুভূত হয়। এই কারণে, এই কয়মাসই ডিম ফুটাইবার উপযুক্ত সময়রূপে গণ্য ছিল। এই সময়ে, প্রায় তিন লক্ষ ডিম সংগৃহীত ও চুল্লীতে সজ্জিত করা হইত। চুল্লীটিকে, উত্তাপ দিয়া ঠিক্ করিয়া লইতে দশ দিন সময় লাগিত এবং আর দশদিনে ডিম ফুটিত। সকল গুলি ডিম হইতেই ছানা বাহির হইত না, কতকগুলি অবশ্যই নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু নষ্ট ডিমের সংখ্যা খুব কম; যে গুলি ফুটিত, তাহাতেই প্রচুর লাভ দাঁড়াইত।

ডিম ফুটিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে, অনেকে তামাসা দেখিতে যাইতেন। সে দৃশ্য বস্তুতই বড় কৌতুহল-উদ্দীপক ও আমোদ-জনক। ডিম ফুটিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইত যে, হঠাৎ একটি ডিম্বের একদিক ছুটিয়া গেল এবং সেই স্থান দিয়া ছানার কচি ঠোঁট টুকু মাত্র বাহির হইয়া পড়িল। সেই সময়েই হয়ত তাহারই পার্শ্বে আর একটি ডিম হইতে ছানা গলা বড়াইয়া দিল; কোন ডিম হইতে ছানার অর্দ্ধেক শরীর বাহির হইয়া আসিল; কোনটি হইতে বা ছানাটি সর্ব্বাবয়বে বহির্গত হইয়া আধ অবশদেহে দৌড়িয়া গিয়া আর একটা অস্ফুট ডিম্বের উপর ছুটিয়া পড়িল। এক সময়ে, প্রায় একই সঙ্গে, এই ব্যাপার ঘটিত। ডিম ফুটিবার দিন, বহুলোক চুল্লীর পার্শ্বে সমবেত হইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন।

শিল্পী অপেক্ষাও মিশরে কৃষক ও রাখালের আদর বেশী ছিল। ইহার কারণ এই যে, মিশরের সমস্ত সমৃদ্ধি ও উন্নতিই কৃষির প্রসাদাৎ এবং কৃষক ও রাখালের প্রসাদেই কৃষি। নীলনদের বার্ষিক প্লাবনবারি দেশান্তর হইতে সার আনিয়া মিশরের ভূমিতে ঢালিয়া দিয়া যাইত; এবং মিশরের কৃতী কৃষক ও রাখালেরা, বর্ষে বর্ষে, অক্লান্ত শ্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, যাদু-করের ন্যায়, সেই সাররূপী পলল বা পঙ্ক হইতে সোনা ফলাইয়া লইত। কৃষকের শ্রমলব্ধ সামগ্রীর উপর কারিকরি করিয়া অথবা তদুৎপন্ন অর্থকে কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র বস্তুতে পরিণত করিয়া লইয়া শিল্পী পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; বণিক্ সম্প্রদায়ও আবার এই উভয়ের মুখপ্রেক্ষী রূপে তাহাদিগের উৎপাদিত বস্তুদ্বারা আপন পসরা সাজাইয়া দেশ দেশান্তরের বিপণি অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই, বোধ হয়, প্রাচীন মিশরে নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, কৃষক ও রাখালের অগ্র আসন চির নির্দ্দিষ্ট, ও কৃষির গৌরব চির-অক্ষুন্ন ছিল।

যাহাদিগের এক নাম চাষা বা মূর্খ, আর এক নাম গো-রাখা রাখাল বা বর্ব্বর; যাহারা সমাজের নিম্নতম স্তরে অভাব ও অবজ্ঞার লাঞ্ছনে চির-লাঞ্ছিত রহিয়া, অসহ্য কায়ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করে; যাহারা চৈত্রের রৌদ্রে দগ্ধ ও শ্রাবণের ধারায় অবিশ্রান্ত আর্দ্র হইয়াও, আপনাদিগের জীর্ণ কুটীরে এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না;

গ্রাম্য পাটোয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজা জমীদার পর্য্যন্ত, সকলেই যাহাদিগের শোণিত শোষণে নিত্য অভ্যস্ত; একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, সেই নির্ঘৃণ, নিরন্ন, শ্রমক্লিষ্ট ও উৎপীড়িত চাষা এবং রাখালেরাই সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে, দেশের ও দশের অন্নদাতা বা অন্নসংহর্ত্তা।

যদি কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে, দেশের কৃষক ও কৃষি এবং রাখাল ও পশুপাল সর্ব্বতোভাবে রূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাহাহইলে, সমাজশরীর তিলার্দ্ধ কালও দণ্ডায়মান রহিতে সমর্থ হইবে না। তাহা হইলে, ঐ যে মার্জ্জিতরুচি, সজ্জিতবপু ভদ্রসম্প্রদায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, সমাজের আভরণ রূপে শোভা পাইতেছেন, এই আভরণের চমক চক্ষের পলকে, চিরকালের তরে নিবিয়া যাইবে;—লেখকের লেখনী অচল, বক্তার রসনা স্তম্ভিত, প্রচারকের ভেরী নীরব, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ধর্ম্মাবতারের শক্তিসিংহাসন সংক্ষোভিত,এমন কি,রাজরাজেশ্বরের অমোঘ শাসনযন্ত্রও মুহূর্ত্তেকে বিকল হইয়া পড়িবে! প্রাসাদবিলাসী ধনী কখন ভারাক্রান্ত জীবনের বোঝা অন্যের স্কন্ধে চাপাইয়া, অষ্টপ্রহর আলস্যের শয্যায় নয়ন মুদিয়া শয়ান রহিতেছেন, কখন বা আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, বিলাসের ঘূর্ণপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহার ঐ সুসজ্জিত প্রাসাদ,বিলাসের অশেষবিধ মনোমোহন দ্রব্য সম্ভার; রাজভোগ্য অশন বসনের নিত্যনূতন পারিপাট্য এবং অকর্ম্মে অপব্যয়ের জন্য উন্মুক্ত ভাণ্ডার, সমস্তই কৃষক ও রাখালের স্বেদবিন্দুসিক্ত অক্লান্ত শ্রম ও প্রাণান্তকর অধ্যবসায়েরই ফল। অথচ সেই কৃষক ও রাখাল প্রায় সকল দেশেই বিড়ম্বিত এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর সামাজিক সাজের পুতুল পিণ্ডীভূত আলস্য বা অকর্ম্মণ্য মাংসপিণ্ডগুলি মূল্যবান্ বসনভূষণে বিভূষিত ও পূজার পুষ্পাঞ্জলিতে নিত্য সংবর্দ্ধিত! মানবসমাজের এইঅবিচার পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ন্যূনাধিক মাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

এ অংশে প্রাচীন মিশরের অবস্থা অন্যরূপ। এতৎসম্বন্ধে মিশরীয় পুরাতন সামাজিক নীতি ও রাজকীয় ব্যবস্থা উভয়ই সভ্যজগতের চিরআদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। সামাজিক বন্ধনে মিশর কৃষক প্রভৃতির আসন নিম্নস্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াও, প্রীতি, আদর ও সম্মানের কুসুমসজ্জায় উহা এমনই সুরভিত ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল যে, জন্মসম্বন্ধে আজীবন ঐ আসনেই মাথা রাখিতে বাধ্য, হইয়াও মিশরীয় কৃষক প্রভৃতি আপনাদিগকে অবমানিত, লাঞ্ছিত বা অবহেলিত মনে করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা সকলেই এক শ্যাম বা হেমের বংশধর এই বিশ্বাসে উন্নত শ্রেণীর প্রতি তাকাইয়া ঈর্য্যান্বিত হইত না, উন্নত শ্রেণীও ঐ বিশ্বাসের বশেই তাহাদিগের পানে তাচ্ছিল্যের ভাবে ভ্রূসঙ্কোচন করিতে একবারেই অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহারা বুঝিতেন কৃষক ও রাখাল সম্প্রদায়ই তাঁহাদিগের অবলম্ব, আশ্রয় ও বল; কৃষক ও রাখালেরাও জানিত, উন্নত শ্রেণীই তাহাদিগের রক্ষক, অভিভাবক ও সহায়।

শুধু সামাজিক বন্ধনই যে মিশরে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল এমন নহে; রাজার পালনী নীতি, রাজপুরুষের মন্ত্রণাপদ্ধতি, এবং রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার অনুশাসন-প্রণালী সমস্তই প্রধানতঃ দেশের কৃষি ও শিল্পের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিত্য নিয়মিত ও পরিচালিত হইত। কৃষি ও গৃহপালিত পশুপাল, জাতীয় ধনের অক্ষয় প্রস্রবণ রূপে পরিগণিত ছিল। দেশের শাসন-যন্ত্র এক চক্ষে নীল নদের বার্ষিক প্লাবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার অণুমাত্র আশঙ্কা অনুভূত হইলেই, প্রতিকার-কল্পে সাধনার শক্তিশালী হস্ত বাড়াইয়া দিত, আর একচক্ষে কৃষক, রাখাল ও শিল্পীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহায্যের করুণ কর প্রতিনিয়ত প্রসারিত করিয়া রাখিত। যে দেশের রাজা, ও প্রজা এবং সামাজিক ও রাজকীয় ব্যবস্থার সম্মিলিত লক্ষ্য সাধারণের হিত, সে দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সর্ব্বাবয়বে সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক।

কোন দেশেই, রাজা প্রজাসাধারণ, বিশেষতঃ কৃষককুলের প্রতি, নিষ্ঠুর বা নৃশংস ব্যবহার করিতে ভালবাসেন না। ইহা কোন স্থানেরই স্বভাব-অনুমোদিত রাজপ্রকৃতি নহে। যদি কোথাও ইহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে, ইহাকে রাজ-প্রকৃতির অস্বাভাবিক বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু রাজার মনোগত ভাব, এ অংশে অতীব উদার ও মহান্ হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে উহার ক্রীড়া নানা কারণে, নিতান্তই মন্দীভূত হইয়া পড়ে। রাজকর্ম্মচারিদিগের স্বার্থপরতা ও লোভের দায়ে, অনেক সময়, কৃষককুল উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। প্রাচীন মিশরের ন্যায় রাজ্যে অনুকূল বিধিব্যবস্থার অমন আঁটাআঁটি সত্ত্বেও, এরূপ ঘটনা একবারে সংঘটিত না হইত, এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে, মিশর রাজ্যের কোন স্মরণীয় নৃপতির একটি উক্তি প্রকটিত হইতেছে। মিশরীয় কোন প্রদেশের জনৈক শাসনকর্ত্তা সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ, এবং এই উপায়ে বিশেষ অনুগ্রহভাজন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, কৃষককুলকে শোষণ করিয়া নিয়মিত রাজকর অপেক্ষা অনেক বেসী আদায় করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ঐ সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। সম্রাট্ উহা দেখিয়া প্রীত হইলেন না, বরং ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং যার-পর-নাই বিষণ্ণভাবে কহিলেন—"আমি আমার চির-রক্ষণীয় মেষপাল হইতে উহার পশম কয়গাছ মাত্র ছাটিয়া আনিতে চাহি বটে, নিষ্ঠুর কসাইর মত উহাদিগের চর্ম্ম উত্তোলন কদাপি আমার অভিপ্রেত নহে।" অন্য দেশের তুলনায় মিশরের কৃষক এ অংশে বস্তুতই একদিন বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ছিল।

মিশরীয় কৃষি ও শিল্পজাত পদার্থ নিচয়ের কথা এপর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। কৃষিশূন্য কৃষক ও শিল্পশূন্য শিল্পী, কৃষ্ণবিহীন কীর্ত্তনের ন্যায়, নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চিৎকর। অতএব এস্থলে পুরাতন মিশরের কৃষি ও শিল্পজাত

কতিপয় অতি দুর্ল্লভ সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইতেছে।

মিশরের এক অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ পেপিরাস্ (Papyrus)। এই উদ্ভিদের মূল হইতে অসংখ্য ডাঁট নির্গত হয়। ডাঁটগুলি ত্রিভুজাকৃতি ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় সাত হাত লম্বা। মিশরবাসী পেপিরাসের বাকল দিয়া সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এক্ষণ পথে পরিত্যক্ত অকর্ম্মণ্য ছেড়া নেকড়া কুড়াইয়া আনিয়া কারিকরেরা অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতেছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে কাগজের আদি প্রবর্ত্তনা যে মিশরের পেপিরাস্ হইতে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই হেতুই, বোধ হয়, ইংরেজীতে কাগজের নাম পেপার।

ভারতবর্ষে, প্রাচীন সময়ে, কাগজের, প্রচলন ছিল না। লিখন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার পরে, আর্য্যেরা, বিশুষ্ক তালপাতায় বাঁশের কলম দিয়া লিখিতেন। এখনও টোলে ও পূজামণ্ডপে তালপত্রে লিখিত পুঁথি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মিশরীয়েরাও আগে তালপাতায় লিখিতেন। তালপাতার পরে, গাছের বাকল লিখন-উপকরণে পরিণত হয়। বাকলের পরে টেবিলের উপরিভাগ মোমদ্বারা উত্তমরূপে মণ্ডিত করিয়া লইয়া, উহার উপরে লিখিবার প্রদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ষ্টিলাস্ নামক একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র দ্বারা উক্ত মোমের উপর অক্ষর অঙ্কিত করা হইত। ষ্টিলাসের এক প্রান্ত এই পরিমাণ থেঁত রাখা হইত যে, উহা দ্বারা, আবশ্যক হইলে, লিখিত অক্ষর অনায়াসে পুছিয়া ফেলান যাইত। ইহার পরে পেপিরাসের বাকল দিয়া পেপার বা কাগজ প্রস্তুত করা হয়।

কেহ কেহ বলেন, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ানগর-প্রতিষ্ঠাতা দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডার সর্ব্বপ্রথম পেপিরাসের বাকল দিয়া কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। পেপিরাসের পেপার বা কাগজ, আলেক্‌জাণ্ডারের অনেক পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তবে আলেক্‌জাণ্ডারের যত্নে ও উৎসাহে বহু পরিমাণে যে উহার পারিপাট্য ও শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত এবং উহার ব্যবহার ব্যাপকরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা সকল ঐতিহাসিকেরই স্বীকার্য্য। মিশরবাসী পেপিরাসের বাকল দিয়া জাহাজের পাল, দড়ী, এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার-উপযোগি বস্ত্র ও চাদর ইত্যাদিও প্রস্তুত করিতেন। বহুকাল পরে, পার্চ্চমেণ্ট, পেপার বা কাগজের স্থলবর্ত্তী হয়। কিন্তু অসুলভতা নিবন্ধন, তত বিস্তৃতভাবে পার্চ্চমেণ্টের প্রচলন হইতে পারে নাই।

মিশরের আর এক কৃষি মসিনা। মসিনার সূত্র দ্বারা মিশরীয় শিল্পীরা অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিত। তাহারা, মসিনা হইতে অতিশয় সূক্ষ্মসূত্র বাহির করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। মসিনা সূত্র এত দূর সূক্ষ্ম হইতে পারিত যে, অতি তীক্ষ্ণ চক্ষুও সহজে তাহা দেখিতে সমর্থ হইত না। মিশরের ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীর প্রসিদ্ধ লোকেরা, এই মসিনা-নির্ম্মিত বস্ত্রই বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিতেন। মিশরের মসিনা-বস্ত্র দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইয়া বাণিজ্যের

পথে প্রচুর পরিমাণে অর্থাগমের উপায় করিয়াছিল।

মিশরে বিসাস্ নামে আরও একপ্রকারের মসিনা উৎপন্ন হইত। কিন্তু ইহা তত প্রচুর পরিমাণে জন্মিত না। বিসাসের সূত্র অধিকতর সূক্ষ্ম ও দৃঢ় এবং মহার্ঘ দুর্লভ বস্তুরূপে সম্মানিত ছিল। বিসাস-নির্ম্মিত সূত্রগুলিকে বেগুণি রঙে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা অতি উপাদেয় বস্ত্র প্রস্তুত করা হইত। এইবস্ত্রের মূল্য এত বেশী যে, বড় বড় ধনী লোক ভিন্ন, অন্য কাহারও ইহা ক্রয় করিবার সাধ্য ছিল না। বিলাসিনী মহিলাদিগের নিকট বিসাস-বস্ত্র বড়ই আদরের সামগ্রীরূপে পরিগৃহীত হইত। মিশরের পৃথ্বীপ্রসিদ্ধা বিলাসিনী রাণী ক্লিওপেট্রা যখন মূর্ত্তিমতী রতিদেবী সাজিয়া, রোমান বীর এণ্টনীর সহিত সাক্ষাৎকার কামনায়, সুসজ্জিত বিলাস-তরীতে শুভযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তদীয় তরীতে এই বিসাস-তন্তু-নির্ম্মিত বেগুণি রঙের পাল উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

পুষ্পজগতে, পদ্মের সহিত আর কোন্ পুষ্পের তুলনা হইতে পারে, জানি না। ভারতীয় কল্পনায় পদ্ম বস্তুতই বড় উচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চন্দ্র ও পদ্ম, সৃষ্ট জগতের এই দুটি সুন্দর পদার্থকে সরাইয়া রাখিলে, ভারতের কাব্যকুঞ্জ একবারেই অন্ধকারে ডুবিয়া যায়; কবির ত্রিতন্ত্রী বেসুরে বাজিয়া উঠে। 'কমল মুখ', 'কমল আঁখি', 'করপদ্ম' ও 'পদারবিন্দ', এই সমস্তপদ, এক দিকে যেমন স্নেহ ও প্রেমের গীতে তান যোগাইতেছে, তেমন আর একদিকে, ভক্তির স্তোত্রে সুর যোজনা করিয়া নিরন্তরই ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে পদ্মের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। পদ্মের মাহাত্ম্য আরও উচ্চতর। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী আপনার রাঙা টুক টুক পা দুখানি রাখিবেন, পদ্ম তাঁহার উপযুক্ত পাদপীঠ। মা বীণাপাণি ভক্তের পূজামণ্ডপে অধিষ্ঠিতা হইবেন, প্রস্ফুট পদ্ম তাঁহার আসন। এমন কি জগৎস্রষ্টা বিধাতা জগতের সৃষ্টি প্রয়োজনে আবির্ভূত হইবেন, পদ্ম তাঁহার আকর ও আশ্রয়। পদ্ম হইতে আবির্ভূত, এই হেতু তাঁহার একনাম পদ্মযোনি। ভারতীয় কল্পনায় ভঙ্গিক্রমে পদ্ম অনাদিরও আদি বস্তুরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে।

মিশরীয় কল্পনায় পদ্মের এই পরিমাণ মাহাত্ম্য প্রকটিত হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহা না হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন মিশরে, অন্য প্রকারে, পদ্ম বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থরূপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত হইত। পদ্মের গোটা লোকের এক অতি উপাদেয় খাদ্য ছিল। পদ্মের গোটা দ্বারা উত্তম রুটি প্রস্তুত হইত। এইরুটি যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর; লোকে প্রীতির সহিত ইহা ভোজন করিত। মিশরে পদ্মের গোটা এক সম্প্রদায় লোকের জীবন ধারণের উপযোগি প্রধান শস্যস্বরূপ ছিল; তাহারা, এই হেতু, মিশরের পদ্মভুক্ জাতি নামে পরিচিত। পদ্মভুক্ সম্প্রদায় যে শ্রেণীর পদ্মবীজ ভোজন করিত, উহার স্বাদ এমন মধুর ও প্রীতিকর যে, কবি হোমার উহার প্রশংসা

করিতে যাইয়া কহিয়াছেন যে, এই পদ্ম-বীজের আস্বাদ পাইলে, বিদেশী ব্যক্তি তাঁহার স্বদেশস্থ সর্ব্ব- প্রকার মিষ্ট বস্তুর স্বাদ ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হন।।

মিশরের কলাই ও ফল জগৎপ্রসিদ্ধ। মিশরে কলাই ও নানাবিধফল এই পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং ঐ সকলের এতদূর পুষ্টিকারিতা ছিল যে, অন্য আহার্য্য ব্যতিরেকে, শুধু ঐ সকলের উপর নির্ভর করিয়াই, দেশের সকল লোক প্রাণ ধারণে সমর্থ ছিল। তথাকার ফুটি, তরবুজ, পলাণ্ডু ও রসুন প্রভৃতি প্রকার, অবয়ব ও স্বাদে আদর্শ-স্থানীয়।

মিশরের অন্যতর উপাদেয় খাদ্য মৎস্য ও মাংস। এ দুটিও, কৃষির ন্যায়, মিশরের অমৃত-প্রবাহ নীলনদেরই প্রসাদলব্ধ সম্পদ্। ঐ অমৃত প্রবাহে যে মৎস্য সমূহ উৎপন্ন হইত, অথবা উহার জলে বিচরণ করিবার সুযোগ পাইত, বিশেষত্বে সে গুলিও অন্য স্থানের তুলনায় চিহ্নিত বস্তুরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। নীল নদের মৎস্য দেখিতে যেমন হৃষ্ট, পুষ্ট, সুন্দর, আস্বাদেও তেমনই উপাদেয়। নীল নদের গুণে একদিকে উৎপন্ন হইত শস্য, অন্যদিকে জন্মিত তৃণ, শষ্প ও ঘাস ইত্যাদি। তৃণভোজী পশুপাল, পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্ত হইয়া, যার-পর-নাই, হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। আমিষ ভোজীর পক্ষে মিশরের মৎস্য ও মাংস ভুলিবার বস্তু নহে।

কিন্তু মিশরের প্রধান শস্য সম্পদের সহিত তুলনায় এ সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মিশরের আর্থিক বৈভব ও অপার সমৃদ্ধির মূল নিদান উহার অপরিমিত শস্যরাশি। পৃথ্বী ব্যাপক ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়েও, মিশর আপনার উদ্বৃত্ত শস্যরাজী দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জাতিনিবহের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। রোম ও কনষ্টাণ্টিনোপল পৃথিবীর এই দুইটি প্রসিদ্ধ পুরাতন রাজধানী মিশরীয় শস্যে পরিপুষ্ট রহিয়াই, একদিন অর্দ্ধ পৃথিবীর উপরে আপনার প্রভুশক্তি পরিচালনা করিয়াছিল। কিন্তু এহেন শস্যবহুলা কমলার প্রিয় নিকেতনরূপিণী মিশরভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল-গ্রাস হইতে চির অব্যাহত রহিতে পারে নাই। অন্নপূর্ণার রন্ধনশালায়ও, সময় সময়, অনশনে লোকের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

প্রধানতঃ, জড়প্রকৃতির অন্ধ করুণার উপরই, মিশরের সুদিন কুদিন নির্ভর করিত। নীলনদের জল ভিন্ন সাহারার পুচ্ছলগ্ন মিশরের অন্য কোন সম্বল বা অবলম্ব নাই। নীলনদ বৎসরে একবার প্লাবন-বেগে উচ্ছলিয়া না উঠিলে, মিশরের তাপ-দগ্ধ কঙ্করে তৃণেরও অঙ্কুর উদ্গাম হইত না। আবেসেনিয়ার পর্ব্বতে, যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ না হইত, সে বৎসর নীলনদ আপনার সঙ্কীর্ণ খাতে আপনি লুকাইয়া থাকিত, প্লাবনপ্রবাহ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিত না। সমগ্র মিশর ব্যাপিয়া, "হা অন্ন হা অন্ন",—হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইত। অক্লান্তকর্ম্মা মিশরবাসী প্রকৃতির এই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে আত্মরক্ষার জন্য, নানাবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। মরিস্ হ্রদ ইহার একটি বিশদ দৃষ্টান্ত। কিন্তু সে সকল সত্ত্বেও, এক এক-বার দুর্ভিক্ষের

বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া মিশরের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিত।

অতি প্রাচীন সময়ে, মহাত্মা জোজেফ্ যখন সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী বা প্রধানতম কর্ম্মসচিবরূপে মিশর সাম্রাজ্যের কর্ণধার, তখন ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর কাল, নীলনদে বর্ষাগম ঘটে নাই, মিশর ভূমিতে,এই সাতবৎসর কাল,শস্যের ফসল দূরের কথা, তৃণ গাছি পর্য্যন্তও জন্মিতে পারে নাই। মিশরের উদ্ভিদ-জগৎ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দূরদর্শী জোজেফ্, পূর্ব্ব-উৎপন্ন শস্যরাশি ভাবি দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় এই পরিমাণ সঞ্চিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, এই সপ্তবৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষে মিশরের একটি লোকও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই; অথবা কেহই অল্পাহারে জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন বা কোন প্রকারে বিপন্ন হইতে পারে নাই। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তি,দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অন্যান্য স্থানও, এই দুঃসময়ে, মিশরের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। জোজেফের এই পুণ্যকীর্ত্তি, প্রজাপালনী নীতির একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে পুরাতন ইতিহাসের বক্ষে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

জোজেফের পরেও, এক এক সময়ে, অজন্মাহেতু মিশরে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী উচ্চশিক্ষিত বড় বড় রাজপুরুষদিগের অভিমানদৃপ্ত গর্ব্বিত ব্যবস্থা, জোজেফের সেই দূরদর্শিনী নীতির অনুসরণে সুদিনের সঞ্চিত শস্যে দুর্দ্দিনে দেশ রক্ষার পথ করিয়া, নীল নদের চির অভ্যস্ত ভাব-বিপর্য্যয় ও অনিয়তত্বের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় নাই। মিশরকে শেষে পেটের দায়ে, বিপন্ন ভিক্ষুর বেশে, করঙ্গকরে লইয়া, অন্যের দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইতে হইয়াছে।

মিশর যখন কালবশে ও ভাগ্যদোষে পরপদানত ও পরায়ত্ত, তখনও উহার মনে এইরূপ একটা গর্ব্বের ভাব নিত্য জাগরূক ছিল যে, বিজিত হইলেও, সে বিজেতার অন্নদাতা ও পরিপোষ্টা। এই গর্ব্ব নিতান্তই ভিত্তিশূন্য অমূলক ভাব নহে। মিশর শস্য উৎপাদন-কামনায়, কোন কালেও, চাতকের ন্যায়, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চলন্ত মেঘের পানে তাকাইয়া থাকে না; বরুণ দেবের কৃপা ও অরুণ দেবের করুণাকণা লাভের প্রত্যাশায়ও সে কখনও অর্ঘ্য করে লইয়া পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হয় না। তাহার বিধাতৃবিহিত বক্ষবিলম্বি কণ্ঠমালা,—নীলনদ আপনি উছলিয়া উঠিয়া, বর্ষে বর্ষে, যেন আপনার সুখশীতল সঞ্জীবন-স্পর্শে মিশরের গোলাঘর শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যায়, এবং সেই শস্যে মিশর অনায়াসে আত্মজীবিকার উপায় করিয়া লইয়া, তদানীন্তন পৃথিবীর বহুজনাকীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী দ্বয়েরও অন্ন সংস্থান করিয়া লয়। মিশরের গর্ব্ব, তাই বলিতে ছিলাম, একবারে ভিত্তিবিহীন অমূলক কথা নহে।

বিধিবিপাকে মিশরের এই সৌভাগ্য চির অক্ষুন্ন রহে নাই। মিশর যখন স্বাধীন, তখনও যেমন সময় সময় তাহাদের অত আদরের নীলনদ একবারে তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিত; পরাধীনতার সময়েও নীলনদের তেমনই ভাববিপর্য্যায় ঘটিত। বর্ষা নীরবে চলিয়া যাইত, নীলনদের বক্ষে বার্ষিক বানের

একটি তরঙ্গও খেলিত না। সুতরাং, ভীষণ দুর্ভিক্ষ মিশরকে গ্রাস করিয়া বসিত; এবং তাহার গর্ব্বিত মস্তককে পরপাদতলে বিলুণ্ঠিত করাইয়া, যেন চির-পোষিত গর্ব্বেরই একএকবার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িত।

রোমের গৌরব-ডঙ্কায় যখন সমগ্র পৃথিবী নিনাদিত, সিজার যখন রোম সাম্রাজ্যের কর্ণধার, তখন অন্যান্য বহুরাজ্যের ন্যায়, মিশরও রাজরাজেশ্বর রোমেরই পদানত। কিন্তু পদানত হইলেও, মিশর একাংশে মস্তক উন্নত রাখিয়া, যেন একটু অনুগ্রহের ভাবে, রোমের রাজদরবারে, আপনার উদ্বৃত্ত শস্য সম্পদ্ উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিত। কালবশে একবার মিশরে ঘোরতর অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। মিশর আত্মরক্ষণে অসমর্থ হইয়া সিজারের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া পড়িল। মিশরের বিপদ্‌বার্ত্তা রোমে পহুঁচিবার পরে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইল না, সিজার মিশর অভিমুখে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করিলেন। মিশরের কষ্ট দূর হইল, এবং তাহার অন্তর্নিহিত বৃথা গর্ব্ব ও অহঙ্কারও একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

উদার-চেতা অভিমানী সিজার এই রাজোচিত উচ্চ আশয়িক উদার অনুষ্ঠান দ্বারা এক দিকে মিশরকে বুঝাইলেন যে, মিশর না হইলে রোমের দিন চলে না, মিশরের এই গর্ব্ব নিতান্তই অমূলক ও অসার;—মিশর সর্ব্বতোভাবেই রোমের রক্ষণাধীন অনুজীবী বা পদানত দাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং অন্যদিকে, পৃথিবীর নিকট রাজোচিত কর্ত্তব্যের এই একটা মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া দিলেন যে, প্রজার শোণিত শোষণরূপ রাক্ষসী নীতির নাম রাজধর্ম্ম নহে, রক্ষণ ও পোষণই যথার্থ রাজধর্ম্ম ও উহাতেই রাজকীয় শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মহত্ত্বের প্রকৃত পরিচয়। মিশরের শস্যে রোমের নিত্য অন্নসংস্থান হইত; রোম জলোকার ন্যায় মিশরের শোণিত শোষণ করিয়া আপনি পুরিপুষ্ট রহিত। অথচ সেই রোমই আবার বিপদ্‌কালে আপনার কুবের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া, মিশরের সর্ব্বাঙ্গীণ রক্ষাবিধানে সহস্রেক হস্ত প্রসারণ করিত। রোমের এই মহত্ত্ব ও সম্রাট-উচিত উদারনীতি মিশর ভুলিয়া থাকিলেও, ইতিহাস কখনও ভুলিয়া যাইবে না। ইতিহাস জলদক্ষরে ইহা আপন বক্ষে অঙ্কিত রাখিয়া, পৃথিবীর নৃপতি সমূহ এবং রোমীয়দিগের ন্যায় রাজপদাধিষ্ঠিত জাতিনিবহকে রাজধর্ম্মের উদারতত্ত্বে উপদেশ প্রদান করিবে।

মিশরের এই প্রাচীন তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ইহাই দেখা যায় যে, মানবজাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের পক্ষে শুধু প্রকৃতি অনুকূল থাকিলেই হইল না, সদয় প্রকৃতির আশ্রয়ে, মানবীয় শ্রমনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়েরও যথোপযুক্ত বিকাশ হওয়া আবশ্যক। ইহার পরে স্বদেশীয় অথবা বিদেশীয় হউক, রাজশক্তিরও জনসাধারণের মঙ্গলকামনায়, সেই প্রকৃতিকে যথাশক্তি নিয়মিত রাখিতে প্রতিনিয়ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। ভাগ্যক্রমে প্রাচীন মিশরে এই সমস্তই সাধারণের উন্নতি ও জাতীয় সমৃদ্ধি সাধনের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। প্রকৃতি মুক্তহস্তা, জনসাধারণ অধ্যবসায়ী ও অক্লান্তকর্ম্মা, এবং

রাজাও, মিশরের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা এই উভয় অবস্থায়ই, মিশরের রক্ষাবিধান ও উন্নতিকল্পে দৃঢ়ব্রত ও প্রকৃতি পুঞ্জের সহিত সমানধর্ম্মা। এই হেতুই, প্রাচীন কালের মিশরে, অমন অসাধারণ উন্নতি ও অনন্যসম্ভাবিত অভ্যুত্থান সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল।

শ্রীঃ——

দৈব ও পুরুষকার।

শিল্পচতুর জগদীশ্বর মানবজীবনকে এমনই বৈচিত্র্যে জড়িত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিতে গেলে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহা তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্রতম অংশ! তিনি ইহার ভিতর এরূপ সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ চাতুর্য্য নিহিত রাখিয়াছেন যে, মানবের সামান্য দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অবিশ্রান্ত ঘূর্ণামান থাকিয়াও তাহা হইতে তাঁহার গুপ্ত মঙ্গলাভিপ্রায় বিন্দুমাত্রও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না; বরং যতই ঐরূপ চেষ্টিত হইতে থাকে, ততই অধিকতর সন্দিগ্ধতা, সমস্যা ও প্রমাদাদিতে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে একবারে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে! আবার কখন কখন বা তাহাতে ইহার দুর্দ্দশার একশেষ প্রকৃতিচ্যুতি পর্য্যন্তও হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক, তখন স্থূল জড়জ্ঞানগর্ব্বিত এই মানবমস্তিষ্কের অবস্থাদর্শনে, স্বতঃই যেন এই প্রতীতি হয় যে, ঐশশক্তি বুঝি ক্ষুদ্র মানবশক্তির এইরূপ অসম্ভব ধৃষ্টতা ও অনধিকারচর্চ্চা দেখিয়া, একান্ত অজ্ঞানবোধে, অবজ্ঞাভরে তাহাকে উপহাস করিতেছে। পাঠক! অদ্য আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, মনুষ্যজীবনের এই বৈচিত্র্যসজ্ঞ তাহাতে যেরূপ আন্দোলিত ও উদ্‌ঘাটিত হয়, এ সংসারের আর কিছুতে সেরূপ হয় কি না জানি না।

ভগবানের এই গভীর রহস্যময়ী সৃষ্টির প্রধানতম বৈচিত্র্য মানবের মন। এই অসংখ্য, অদ্ভুত গুণ ও শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুইটি ধর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ, বায়বীয় পদার্থের ন্যায়, অতি সহজে ও যদৃচ্ছাক্রমে, উহা সর্ব্বতোভাবেই নমিত, বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, উহা যাহাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই ঠিক তদ্রূপ দেখিতে পায়। উভয় সম্বন্ধের সূক্ষ্ম সমালোচনায় এই অনুমান হয় যে, এই দ্বিতীয় ধর্ম্ম যেন উহার নিজেরই সৃষ্ট, এবং আপনার স্বাভাবিক অহমিকাবশে, প্রথমোক্ত ধর্ম্মকে বাহ্যপদার্থের মধ্যেও নিহিত করিবার প্রয়াস পাইতে পাইতেই, এই কৃত্রিম ধর্ম্মকে স্বীয় প্রকৃতিভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যাহা হউক, আবার এই শেষোক্ত ধর্ম্ম চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অবস্থাসমূহে প্রতিভাত হইয়াই মানবের ধারণা ও বিশ্বাস গঠিত

করে; এক্ষণে, এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন লোক এক সময়ে, একই অবস্থামণ্ডলে, রহিতে পারে না—অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়ই পরিবৃত থাকিবে; এই প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃই আমরা দেখি যে, সকলের মত ও বিশ্বাসাদি একরূপ নহে,—পৃথক্ পৃথক্; এবং অবস্থানুসারে, কোথাও কোথাও বা উহা একবারে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বা বিপরীত। এইজন্যই, এ সংসারের সকল বিষয়ই ইচ্ছানুরূপে সর্ব্বভাবে বিবেচিত হইতে পারে ও অনেক স্থলে হইয়াও থাকে। ইহাতে বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় যেরূপ নিগূঢ় ও জটিল, তাহাতে উহাও যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হইবে, সেটা আর কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। বাস্তবিক, এ বিষয়টি এতই বিভিন্ন প্রণালীতে বিবেচিত ও আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে যে, তাহাদের সকলগুলিকেই অন্তর্নিহিত রাখিয়া কোন এক সাধারণভাবে উহার পর্য্যালোচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। তবে, ইহা নিশ্চিত যে সূক্ষ্মযুক্তি সহকারে বিচার করিয়া চলিলে, সকল প্রণালীতেই এক সত্যসিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। এই নিমিত্তই আমরা, অপরিহার্য্য প্রয়োজন বোধে, আমাদের প্রস্তাব প্রধানতঃ দুই ভাবে বিবেচনা ও আলোচনা করিব; প্রথমতঃ মানবকল্পনায় উহা কিরূপ বিকৃত ও দুর্মীমাংস্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই বিষয় দেখাইব, দ্বিতীয়তঃ,উহা প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কিরূপ বস্তু, তাহাই বিচার্য্য; এবং অবশেষে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বের অন্তঃস্থ সারাৎসার রহস্যজ্ঞানের উদ্‌ঘাটন বিষয়ে, মানববুদ্ধি যে অতি গর্ব্বিত ও চঞ্চলভাবে চালিত হইয়া কেবল ভ্রান্তির পথই পরিষ্কার করে, কিন্তু, স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে, সরল ও নৈসর্গিক ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে যে এই জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে প্রভূত অমূল্য অন্তস্তত্ত্ব বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহারই কতকটা আভাষ দিতে প্রয়াস পাইব।

বাস্তবিক, এই দৈব ও পুরুষকারের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, এবং কিরূপেই বা উহাদের যথার্থ আপেক্ষিক প্রাধান্যনির্ণয়—না—সম্বন্ধাবরণোন্মোচন হইতে পারে, সে কথা বড়ই জটিল;—এই মানববুদ্ধির যেমন দুষ্প্রবেশ্য, আবার কার্য্যক্ষেত্রে তেমনই অতি প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় সভ্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই ইহা আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ স্থলেই ইহার প্রকৃত সন্তোষজনক সুসিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না! কোথাও বা কেবল বিরুদ্ধমতেরই সংঘর্ষ, আবার কোথাও বা এই মহাপ্রশ্ন অমীমাংসিতব্য ঘোষিত হইয়া একবারে অমীমাংসিতই রহিয়াছে! তবে, মত-প্রকাশক গ্রন্থকার-মহোদয়গণের অনুকূলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিষয়টি নিতান্ত দুর্ব্বোধ, এবং উহার অঙ্গীভূত বিবেচ্য শাখাদ্বয়ের পার্থক্যলক্ষণ অতীব সূক্ষ্ম বলিয়া, আমরা জনসাধারণে উহার তথ্যপরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া, একবারে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের উপরই দোষারোপ করিয়া থাকি।

কিন্তু, আমাদের ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে,তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ভ্রমাত্মক নাও হইতে পারে। তবে,তাঁহাদের একটুকু দৃশ্যমান দোষ ধরা যায় বটে,—সে দোষ তাঁহাদের ভাষায়। যেহেতু, দৈব ও পুরুষকারের গুণগত প্রভেদাংশ এতই সঙ্কীর্ণ যে, অবয়ব ও গুণের প্রশস্ত পার্থক্যে সেটুকু সময় সময় একবারে আবৃত ও অদৃশ্য হইয়া পড়ে; এবং আমাদের স্থূলদৃষ্টি তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অবয়ব ও গুণের গুরুবৈষম্যই ভুলিয়া যাইয়া, কখনও একেই দুই, আবার, কখনও বা দুইয়েই এক জ্ঞান করে! উভয়ের এই গুণগত প্রভেদাংশও অবয়ব ও গুণের বৈষম্য সেই মহাত্মাদের মনে চিন্তিত থাকিতে পারে, কিন্তু, সেইটুকু ভাষায় প্রকাশ করিয়া না বলাতেই এত গোল বাঁধিয়াছে। কেবল আমাদের শাস্ত্রের অতি প্রাচীন কালের একটী মাত্র শ্লোকে এই প্রহেলিকাভঞ্জনের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়;—উহা যথাস্থানে উল্লেখ ও আলোচনা করা হইবে। কিন্তু, অপরাপর সকল স্থলেই উহাদের উভয়ের পারস্পরিক প্রকৃত সম্বন্ধ কিছুই একবারে দৃঢ়রূপে নির্ণীত বা আলোচিত হয় নাই; শুধু একটিকেই, স্বতন্ত্ররূপে ধরিয়া, একবারে পূর্ণমাত্রায় নিন্দা বা বন্দনা করা হইয়াছে, এবং অপরটি, যেন সম্যক্ বিরুদ্ধ বা বিপরীত পদার্থ অনুমিত হইয়া, তদনুসারে বিপরীত ভাবেই এরূপ সবলে সমাক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহাতে আপাততঃ প্রতীতি হয় যে, মৌলিক একতার বিষয়ে বুঝি সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের আদৌ কোনও ধারণাই ছিল না! কএকটি সুবিখ্যাত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া, এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করা যাইতেছে।

কে না জানে যে——

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"।

এই প্রবাদভূত শ্লোকটিতে "পুরুষকার"কে কিরূপ বন্দনা এবং দৈবাবলম্বনকে কাপুরুষের লক্ষণ বলিয়া কিরূপ নিন্দা করা হইয়াছে! আবার,—

"শশিদিবাকরয়োর্গ্রহ পীড়নম্।
গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্॥
মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাম্।
বিধিরহো! বলবানিতি মে মতিঃ।"

এই দৃষ্টান্তসার শ্লোকে গ্রন্থকার কেমন সর্ব্বান্তঃকরণে দৈবের প্রভাব-স্তুতি ও পুরুষকারের দৌর্ব্বল্য শোচনা করিয়াছেন। মহাজ্ঞানী শিহ্লন মিশ্রের শান্তিশতকের সেই

"নমস্যামো দেবান্নমু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তং কর্ম্মৈক
ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ
প্রভবতি॥"

মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কর্ম্মের একবারে একচ্ছত্রত্ব ও সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু, "আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা

দিগন্তম্" শীর্ষক শ্লোকে কবি জীবের দৈবাধীনতা পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। পুনশ্চ, সুপবিত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার কর্ম্মযোগের সেই "কর্ম্মণ্যেবাধিকারোহস্তি মা ফলেষু কদাচন" শ্লোকাংশটি যেন আমাদিগকে ভারবাহী নির্ব্বোধ গর্দ্দভের ন্যায় ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ নিষ্কাম থাকিয়া, কেবল কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়ারই সার শিক্ষা দেয়। পরমাদৃত, উচ্চাসীন ইংরেজী ভাষার সাহিত্য-শাস্ত্রেও কুত্রাপি ইহার বিশদ মীমাংসা দেখা যায় না; এতদ্বিষয়ক প্রায় সকল প্রসঙ্গই কেবল তর্ক সমস্যাদিতে পরিপূর্ণ; "Irony of fate" "Man is the architect of his own fortune" ইত্যাদি বিরুদ্ধবাদি সামান্য প্রবাদবাক্যেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে যে কোন জাতির যে কোন গ্রন্থাদি পরীক্ষা করা যায়, কাহাদেরই ভিতর কোথাও এই গূঢ় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইহা আমাদের কতদূর বোধগম্য, অভ্রান্তমীমাংসিকা যুক্তির সাহায্যে, এক্ষণে তাহাই একবার দেখিতে হইবে।

আমরা সাধারণতঃ জানি—যাহা কিছু দৈব-লক্ষণায়—ইচ্ছাময় ভগবান্, লৌকিক ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই, নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা একবারেই আমাদের নিজেদের আয়ত্ত নহে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ ঘটিয়া পড়ে, তাহাই "দৈব" বা "অদৃষ্ট"; আর আমাদের স্বকীয় চেষ্টাই "পুরুষকার" বা "কর্ম্ম"। এস্থলে এই "কর্ম্ম" শব্দের সম্বন্ধে এইটুকু বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে, উহার শাস্ত্রীয় ভাষা প্রয়োগ বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া অনুমিত হয়, যেহেতু দৈব ও পুরুষকার এই উভয় বাহ্যিক বিপরীত অর্থেই উহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মের এই ভাষাপ্রয়োগ হইতে এক মূল্যবান্ অন্তস্তত্ত্ব বাহির করা যাইতে পারে—দৈব ও পুরুষকার বাহ্যতঃ ও লৌকিক ধারণায় পরস্পর বিপরীত পদার্থ বলিয়া বোধ হইলেও, মৌলিকভাবে উহারা একই পদার্থ; তবে উহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য কেবল কাল ও পাত্রতাঘটিত। এবিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত বুঝাইয়া বলা হইবে। যাহা হউক, আমরা কিন্তু এই "কর্ম্ম" শব্দ সুবিধাবোধে, এখানকার মত কেবল "পুরুষকার"—না—বরং পুরুষকারের প্রধানাঙ্গস্বরূপে ব্যবহার করিব।

এক্ষণে, দৈব ও পুরুষকারের পূর্ব্বোক্তরূপ লৌকিক সংজ্ঞায় বাহ্যতঃ স্পষ্টই এরূপ একটা ধারণা হয় যে, এতদুভয়ে পরস্পর বৈপরীত্য সম্বন্ধ এবং উহারা সম্পূর্ণই বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র; কিন্তু, স্থূলবিষয়জ্ঞানানুমিত এই দুই বাস্তবিক দুই নহে—মূলতঃ এক; তবে যে উহারা কেবল কাল ও পাত্রভেদে পৃথক্ দেখায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এস্থলে, একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, উহাদের এই বহির্দ্দৃশ্যমান বৈপরীত্যসম্বন্ধ অবয়বগত মাত্র প্রকৃতি বা গুণগত নহে; যেহেতু, ঐশিক ভাবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামাত্রই তাঁহার ইচ্ছা-

প্রসূত ধরিয়াই, দৈবকে আমরা "দৈব" বা "অদৃষ্ট" সংজ্ঞা দিয়া একটা "অবয়বী বিষয়" বা "গুণধারী পদার্থ" জ্ঞান করিয়া থাকি; আবার, লৌকিক ভাবে, তাহাকেই—সেই একই পদার্থকে—আমাদের আত্মশক্তি-চালনা সাপেক্ষ বলিয়া "পুরুষকার" ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া, অবয়বহীন একটা গুণমাত্র ধরিয়া থাকি। কাল ও পাত্র যে উহার বাহ্যিক আকৃতি একবারে বিপরীত করিয়া ফেলে, সেটুকু আমরা লক্ষ্য না করিয়াই ভ্রান্তিতে পড়ি এবং এই ভ্রান্তিই আমাদের বুদ্ধি প্রতিহত করিয়া এত গোলযোগ ঘটায়। যাহা হউক "দৈব" ও "পুরুষকার" সংজ্ঞিত এই অদ্ভুত পদার্থদ্বয়ের কেশাগ্রসূক্ষ্ম গুণগত পার্থক্যের সঙ্কীর্ণতাপ্রদর্শন ও উহাদের মৌলিক একতার স্ফুটতর উপপাদনই এক্ষণে আমাদের বিবেচ্য।

এজগতের ঘটনা ও অবস্থা সমূহ এমনই ভাবজটিল ও সংখ্যাবহুল যে, নানাশক্তি-বিভূষিত এই মানব-মন যথাসাধ্য অবহিত থাকিয়াও কিছুতেই সর্ব্বদিকে অপ্রমাদে চলিতে পারে না! আমাদের বুদ্ধি যতই কেন তীক্ষ্ণ হউক না, বিদ্যা যতই কেন গভীর হউক না, জ্ঞান যতই কেন বিস্তৃত হউক না, অভিজ্ঞতা যতই কেন দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না, এখানে ভ্রান্তির হাত হইতে আর কাহারও অব্যাহতি নাই; সকলকেই ভ্রমে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতে হইবে! বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার এইরূপ ভাবজটিলতা ও সংখ্যাবাহুল্য এবং মানব-মনের আপেক্ষিক দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে যেন ইহাই প্রতীতি হয় যে, ভ্রান্তি মানবের স্বভাবোচিত হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে! এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" ইত্যাদি জ্ঞানগর্ভ বাক্যে মানবের উপর ভ্রান্তির অব্যাহত প্রভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যাহাহউক পরমেশ্বরের এমনই বিচিত্র সৃষ্টি-রহস্য যে, আমাদের এইরূপ ভ্রান্তিবহুলতার স্বাভাবিক সম্ভাবনা থাকা সত্বেও, সংসারের কিছুর উপরই দোষারোপ করার উপায় নাই। প্রতি ক্ষেত্রেই, সামান্যমাত্র চিন্তায়, যাবতীয় দোষই স্বকৃত বা স্বকীয় স্বীকার করিয়া অনুতাপ ও আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়! যাহারা আপনাদের দুঃখযন্ত্রণার জন্য "অদৃষ্ট" বা "বিধাতার" উপর দোষ চাঁপায়, তাহারা নিতান্তই মূর্খ ও চিন্তাহীন; তাহারা এটুকু ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখে না যে, জীবনের কোনও ঘটনা বা অবস্থার জন্যই, আপনাকে কোনক্রমেই নির্দ্দোষ বা অভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। বাস্তবিকই পাঠক! তোমার তাবৎ অতীত জীবনই ভাবিয়া দেখ দেখি; কোন্ ঘটনায় বা কোন্ অবস্থায় তুমি নিজকে দোষী দেখিতে না পাও? পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক একটি করিয়া সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত অবস্থাই ভাবিয়া দেখ, অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, উহাদের কোনটিতে নিজকে নির্দ্দোষ বলা যায় না, বরং উহাতে স্বীয় দোষ খুঁজিতে গেলে, ক্রমে এতই বাহির হইতে থাকে যে, তাহাতে অচিন্তিতপূর্ব্ব আত্মব্রীড়ায় সাতিশয় সঙ্কুচিত হইতে হয়।

তখন, সুধী জন, সেই স্বীয় দোষ হেতু আপনার স্বাভাবিক প্রাপ্ত দণ্ডকে অপরাধের যথোচিত প্রায়শ্চিত্তজ্ঞানে, সানুগ্রহে ঐ দোষ হইতে মোচিত ও ভ্রান্তি হইতে প্রবোধিত হইলেন বলিয়া, নিরতিশয় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাভরে সেই পরমকারুণিক মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন! যাহাহউক, এইরূপে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বাহ্যজগৎ ও মানব-মন এমনই ভাবে কল্পিত ও সম্পর্কিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে যে, উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ অতীব বিস্ময়াবহ; উহারা একতঃ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত, এবং অপরতঃ প্রেমাত্মিক সহানুভূতিপূর্ণ, একভাবে, উভয়েই উভয়ের বিপক্ষ; আবার, অন্যভাবে, পরস্পর পরস্পরের সপক্ষ! যেহেতু, সৃষ্টিরহস্য এমনই বিচিত্র যে, তাহার গূঢ় নিয়মাধীনে অশেষ-ধন-রত্ন-সুশোভিত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ধীর, স্থির, ও গম্ভীর থাকিয়া সমধিক প্রভাবসহকারে স্বীয় তুলনায় নিতান্ত স্বল্পবিত্ত, বৃথাভিমানী ও চঞ্চল মানব-মনকে এই অনন্ত নৈসর্গিক সংগ্রামে চিরকালই লজ্জিত করিবে, আবার যথার্থ হিতৈষিতা ও সহানুভূতি হৃদয়ে রাখিয়া, এই দুর্ব্বল প্রতিপক্ষেরই সাহায্য ও উপকারার্থ আপনার আদর্শ ব্যবহার দ্বারা তাহার সম্মুখে নানাবিধ উপদেশরত্নাবলী বিস্তার করিয়া ধরিবে! এখন সে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিগুণে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইবে, কি জড়তাহেতু তাহাতে একবারে উদাসীন থাকিয়া মারা যাইবে, সে কথা সে-ই জানে। এক্ষণ, এইরূপে বাহ্যবস্তুর সহিত মানবের সম্বন্ধবিচার রাখিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, বাহ্যতঃ, প্রকৃতি মানবের সর্ব্ববিষয়েই ঔদাসীন্যব্রত পালন করেন বটে, কিন্তু অন্তরে, তাহার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, সর্ব্বক্ষেত্রেই, দয়াতিশয্যপ্রযুক্ত তাহার যথোচিত মঙ্গলোপায় নীরবে ও নিস্তব্ধে কেবল তাহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখেন; কিন্তু স্বীয় ব্রতভঙ্গের আশঙ্কায়, তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া একবারে প্রকাশ্যভাবে কদাপি তাহাকে উহা দেখান না বা মুখে ফুটিয়াও কিছু বলেন না। ইহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, মানবের যাবতীয় বিষয়ই কেবল তাহার নিজের উপরই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে; তবে, যথাসাধ্য অবধান ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক চলিতে পারিলে, কত পরমহিতাকাঙ্ক্ষী এই বহির্জ্জগৎ হইতে অনেক অমূল্য উপদেশরত্ন লাভ করিয়া কতক শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে; কিন্তু, এই শান্তিসুখ পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত ও উপভোগ করা ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব; যেহেতু, তাহার যাবতীয় স্বাভাবিক শক্তি ও গুণাবলীর মধ্যে যে "বুদ্ধি" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সারভূত, তাহাও এই জাগতিক প্রভাবের তুলনায় অতীব তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর! যাহাহউক, উহার যেটুকু তাহার ক্ষমতায়, স্বয়ং অসংখ্য স্বকৃত দোষে দূষিত বলিয়া, সেটুকুও আবার পূর্ণমানে উপভোগে অসমর্থ! হায়! এই ত গর্ব্বিত মানবের অবস্থা! এ অবস্থায় মস্তক এত উন্নত! ধিক্!

নির্লজ্জ, কপট মানব! তোমায় শতধিক্! কিন্তু, ইহা নিশ্চিত ও স্বতঃসিদ্ধ যে, সত্যনিষ্ঠ মহাশক্তি প্রকৃতি দেবী যখন একভাবে মনুষ্যকে প্রকাশ্যে কোনও সাহায্য করিবেন না। আর নিজেও যখন নানাগুণে বিভূষিত—ক্ষীণবুদ্ধি, চিন্তাহীন, চঞ্চল ও দুর্ব্বল, তখন সে, আত্মদোষবশে, যতই উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হইবে, তাহার নিকৃষ্ট অবস্থা দিন দিন ততই নিকৃষ্টতর হইতে থাকিবে! কারণ, সেই বাহ্যজগৎই, আবার প্রকারান্তরে, যথাসম্ভব সূক্ষ্মতম ন্যায় সহকারে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ঠিক সমান প্রতিঘাতে, ফলবিধান করিবে। প্রকৃতির এই ফলবিধায়িত্রী নীতিই এই কর্ম্মক্ষেত্রের মূলমন্ত্র। ইহা অলঙ্ঘ্য ও অখণ্ডনীয়। এ নীতি কাহারও কোনও আপত্তি মানে না, কাহারই কোনও কথা শুনে না, অপ্রতিহতভাবে ও একাগ্রচিত্তে কেবল আপনার কর্ত্তব্যসাধনেই ব্যাপৃত থাকে। রাজাধিরাজের প্রবল প্রতাপ, ক্রোড়পতির ঐশ্বর্য্যগৌরব, দরিদ্রের পর্ণকুটীর, বিদ্বৎসিংহের অগাধ বিদ্যা, হতমূর্খের অজ্ঞানান্ধতা—কাহারই কোনও মহতী শক্তি বা করুণোদ্দীপক দুরবস্থা ইহাকে বিচলিত করিতে পারে না। এই কর্ত্তব্যকঠোর ফলনিরূপিকা নীতি জীবগণের যে কার্য্যফল নির্দ্ধারণ করে, তাহার উপযোগিতার পরিমাণ আবার বিন্দুমাত্রও ন্যূনাধিক হইতে পারে না; সে মান-নির্দ্দেশ এমনই ন্যায়ানপেত ও সূক্ষ্ম যে, কেহ তাহার কার্য্যবিশেষের অপরাপর সকলাংশই একবারে সর্ব্বোত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া, পরমাণুমিত একাংশেরও যদি নিকৃষ্ট নিষ্পাদন করে, তথাপি, তাহার পরিমাণ অতি তুচ্ছ বলিয়া, তজ্জন্য সে ইহার নিকট কিছুতেই ক্ষমার্হ হইবে না। এইরূপে, এই নীতির ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবেই অপ্রতিহত; জীবের যাবতীয় কর্ম্মফলই এইরূপ সম্যক্ অলঙ্ঘ্য; যাহা একবার করা হইয়াছে, তাহার ফল ভুগিতেই হইবে। উহা হইতে কেহরই বা কিছুরই অব্যাহতি নাই। তবে, জীব যখন সাধনোন্নতিক্রমে একবারে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইতে পারিবে, আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষায় বলিতে গেলে, যখন মহাত্মা বিশ্বনাথ কবিরাজের সেই "রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃসত্ত্বমিহোচ্যতে" তত্ত্ববাক্যের সার ভাবাবেশে, তমোগুণের আবরণ ও রজোগুণের বিক্ষেপ উভয়রূপ চাঞ্চল্যের বিকৃতি হইতেই মুক্ত হইয়া, সর্ব্বগুণাতীত নির্ব্বিকার, গম্ভীর ও ও প্রশান্ত সত্ত্বাবস্থা লাভ করিতে পারিবে, কেবল তখনই তাহার পক্ষে যাবতীয় কৃতকর্ম্মফলের খণ্ডন সম্ভবপর; কিন্তু, ইহার পূর্ব্বে—রজস্তমঃস্পৃষ্টরূপ মনের মলিন ও অবিমলাবস্থায়, কখনই সে ঐ অনন্ত, অতুল গৌরবের অধিকারী হইতে পারিবে না। যাহাহউক, ফলনিরূপিকা নীতির ক্রিয়া এইরূপ ন্যায্য ও সূক্ষ্ম বলিয়াই, জীবের যে কর্ম্ম যেরূপ সম্পন্ন, তাহার ফলও ঠিক তদ্রূপ। এই "কর্ম্ম" বা "পুরুষকারই" সংসারের মূল অবলম্বন; এবং এইজন্যই, ইহা যুক্তিতঃই "কর্ম্মক্ষেত্র" নামে অভিহিত। কর্ম্মই জীবের শক্তি, কর্ম্মই জীবের সৌন্দর্য্য,

কর্ম্মই জীবের সুখ, কর্ম্মই জীবের গৌরব—আশা—জীবন। কর্ম্মহীন জীব "জীবই" নয়, উহাকে নির্জ্জীব ধরিয়া অচেতন পদার্থের শ্রেণীমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। আবার, এ জগতে শুধু কর্ম্মেরই আদর বাক্যাদি অন্যান্য যাবতীয় শক্তি ও গুণ কেবল মূল কর্ম্মেরই সাহায্যার্থ অভিপ্রেত; এবং সেই ভাবেই—কর্ম্মানুকূল্য হেতুই, উহারা প্রয়োজনীয় ও আদরণীয়; কর্ম্মহীন জীবের ন্যায়, কর্ম্মহীন বাক্যাদি পদার্থও কিছুই নয়; অতএব মূলতঃ, কর্ম্মহীন কিছুই কিছু নয়। অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে, কর্ম্ম স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলে, সে অন্য কিছু নিষ্প্রয়োজন? যেহেতু কেবল কর্ম্মই আমাদের চরম উদ্দিষ্ট। মানব এই মহারত্ন "কর্ম্ম" বা "পুরুষকারের" পূর্ণ স্বত্বাধিকারী মহান্ প্রভু! তাহার উপর আবার "বুদ্ধি" প্রভৃতি দুর্লভ শক্তি ও গুণাদিতে সুশোভিত; অতএব, পাঠক! ভগবানের সৃষ্টিতে মানব কিরূপ উচ্চাসীন, তাহা এখানে একটু ভাবিয়া দেখ। এই প্রকাণ্ড সৃষ্টিরাজ্যে, যাবতীয় জীবের মধ্যে, সে যে রাজাধিরাজ মহারাজ চক্রবর্ত্তী! তবে, এত বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও, তাহাকে এমন জীর্ণবাস দরিদ্রবৎ দেখায় কেন?—শুধু তাহার নিজের ব্যবহার দোষে। সে কি এই মূল, সাধারণ কথাটি বোঝে না?—

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥"

অবশ্যই বোঝে। তবে তাহার এই দুর্দ্দশার কারণভূত ব্যবহার-দোষ কতক তাহার প্রকৃতিগত, আর কতক অবস্থাগতও বটে। প্রকৃতির দোষ সুখপ্রিয়তা ও তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্যাবহেলা, এবং অবস্থার দোষ—অসংখ্য বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার ঘোর জটিলতা। কিন্তু, তথাপি, তাহার প্রকৃতিগত দোষই যে অত্যন্ত অধিক এবং সেই অবস্থাগত দোষও যে আবার প্রকারান্তরে তাহারই স্বকৃত, কে তাহা সাহস করিয়া অস্বীকার করিবে? যখন সে, অলীক চাঞ্চল্য ও অভিমান ভরে, প্রথমে নিজেই আপনার বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া, অন্যের সহিত নিতান্ত অপ্রিয়, খল ব্যবহার করিয়াছে, তখন সেই ন্যায়নিষ্ঠ বলবান্ বিপক্ষ তাহাকে এরূপ দুর্দ্দশায় না ফেলিয়া ছাড়িবে কেন?—সে যে আপনা হইতেই এই দুর্দ্দশার পথ খুঁজিয়া নিয়াছে! কিন্তু এইরূপ বিকৃতচিত্ত না হইয়া, যদি সে স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে সত্য ও প্রিয় ব্যবহার করিত, তবে তাহার অবস্থা কতই উন্নত ও সুখময় হইত! তখন প্রকৃতি প্রফুল্লমনে তাহাকে কতই যত্ন, আদর, পূজা ও সেবা করিত! পাঠক! এখানে অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ যে, এসকল কথা আমাদের স্বাভাবিক কল্পনাপ্রিয়তার আবরণ সজ্জায় সজ্জিত! সাদা, খাঁটি কথা এই যে, মানবের সকল প্রকার কার্য্যফলই সেই অলঙ্ঘ্য ফল-নিরূপিকা নীতির ন্যায্য সূক্ষ্ম ক্রিয়ায়ই যথাযথ নির্ণীত হয়, এবং তদনুসারেই সে ঐ সকল নির্দ্ধারিত-কুফলের দুঃখ-

যন্ত্রণা বা সুফলের শান্তিসুখভোগে সম্পূর্ণই বাধ্য বা অধিকারী। বলা বাহুল্য, সর্ব্বত্রই অলঙ্কৃত ও কাল্পনিক কথার ভিতর হইতে এইরূপ সাদা, খাটি কথা বাহির করিয়া নেওয়াই বুদ্ধিশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সার্থক ব্যবহার। যাহা হউক, এইভাবে আমরা যখন মানবের আত্মশক্তিব্যবহার পর্য্যালোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে, তাহার সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি প্রভৃতি সকল অবস্থাই পরোক্ষভাবে তাহার নিজের উপরই নির্ভর করে—স্বশক্তিচালনাপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ অভীষ্টসাধন বিষয়েই, সে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; আবার, বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে দেখি যে, উহাদের ঘোর জটিলতায় মানবশক্তি প্রায় সর্ব্বদাই একবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়া, নিতান্তই ক্ষুদ্রতা ও দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দেয়! পুনশ্চ, যখন সেই ফলবিধায়িত্রী নীতির দিকে তাকাইয়া দেখি, তখন বুঝিতে পারি যে, উহা উভয়পক্ষের মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া, যথাসম্ভব সূক্ষ্ম সুবিচার দ্বারা, তাহাদের কর্ম্ম ও ক্রিয়াপুঞ্জের সমবায়-সম্ভূত ন্যায়মিত যথার্থ পরিণতি নিরূপণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে—মানবই বিশ্বের যাবতীয় কাণ্ডের কেন্দ্রস্থল; কি তাহার স্বকীয় কর্ত্তব্য, কি জাগতিক ঘটনাবলী, কি ন্যায়-নীতির ফল নিরূপণ, সকলই মূলতঃ তাহারই শক্তি সমূহের প্রয়োগ-প্রণালীর উপর নির্ভর করে; সকল বিষয়েই তাহারই শক্তিক্রিয়া সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় ও বিবেচনাসাপেক্ষ।

এক্ষণে, এই গূঢ়প্রসঙ্গ সাধারণতঃ যে ভাবে বিবেচিত ও আলোচিত হইয়া থাকে, এবং এখানেও ইহা প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত যে ভাবে ব্যাহৃত হইতেছে, সেই বিচিত্র সূক্ষ্মভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে, ইহাদের সকলের পারস্পরিক জটিল সম্বন্ধাবলী এই জড়, পার্থিব কোন পদার্থ দ্বারা, একমাত্র সমযোগ্য উপমায় সমাবিষ্ট করিয়া দেখান কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে; যেহেতু মনুষ্যমস্তিষ্কের স্বীয় সৃষ্টিশক্তির গৌরব ছাড়িয়া দিয়া, কড়াভাবে একবারে ঠিক বলিতে গেলে, বাহ্যজগৎ ও মানবের উল্লিখিত অদ্ভুত, মিশ্র সম্বন্ধ বিলক্ষণ মহান্ ও উচ্চই বটে, কিন্তু স্বভাব-সত্য (Real) নহে—কাল্পনিক ও পরোক্ষ প্রকৃতি। উহাদের স্বভাব-সত্য, প্রত্যক্ষ, খাঁটি সম্বন্ধের পাত্রগণও আবার কতকটা পৃথক্; উহারা পূর্ব্ববৎ ঠিক মানব, বাহ্যজগৎ ও ক্রিয়াফলনিরূপিকা নীতি নয়, কিন্তু—জীব বা প্রাণিজগৎ, জড় বা বস্তুজগৎ, ও উক্ত নীতি; অর্থাৎ এই খাঁটি, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে, মানব, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠাংশ হইলেও, এককই একটি স্বতন্ত্র পাত্র নয়; কিন্তু, ঐ সৃষ্টির স্থূল বিভাগমতে, "জীবজগৎ" পাত্রের একাঙ্গমাত্র। পূর্ব্বসম্বন্ধে যেমন বাহ্যজগৎ ও মানবে যুগপৎ সপক্ষ ও বিপক্ষভাবাত্মক এক অদ্ভুত ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ সম্বন্ধে তেমন কিছুই নাই; ইহাতে জীব-জগতের প্রতি জড়-জগতের সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কিন্তু, জড়-জগতের প্রতি জীব-জগতের গর্ব্বিত প্রভুত্বভাব। প্রথম সম্বন্ধ মানব-বুদ্ধির

স্বকল্পিত ও কূট-ভাব-পূর্ণ, এবং দ্বিতীয়টি সম্যক্ স্বাভাবিক ও সরল। দ্বিতীয়টিই আদিম, সহজ ও সৎপথ প্রদর্শক, কিন্তু প্রথমটি অনেক পরবর্ত্তী, জটিল এবং বহুশ্রম ও কষ্টে উহা হইতে মঙ্গললাভ হয়। আবার প্রথম সম্বন্ধের সাধনা মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণবুদ্ধির ও বাহ্যজগতের প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, কিন্তু, দ্বিতীয়টির সাধনা কেবল হৃদয়ের প্রেমভক্তিসাপেক্ষ। তবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রথমটি ছাড়িয়া এমন অপ্রিয় দ্বিতীয়টির প্রয়োজন ছিল কি?—খরবুদ্ধিগর্ব্বিত মানবমস্তিষ্কই তাহা জানে। আমরা চিন্তানুক্রমে পরে যথাস্থানে সে গূঢ়-ভাবের উদ্ধারচেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, এই শেষোক্ত সম্বন্ধের প্রকটনার্থ একটি সামান্য প্রত্যক্ষ উপমা দিতেছি; ইহাতে পরোক্ষ-ভাবে কোন সূক্ষ্ম সারতত্ত্ব নিহিত আছে কি না, তাহা পরে দ্রষ্টব্য। এই উপমায় একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে জীব-জগতের প্রতি জড়-জগতের সম্যক্ ঔদাসীন্য ভাব বলিয়া, পূর্ব্বসম্বন্ধের ন্যায়, এখানে জীব ও জড়-বস্তুর বিপক্ষভাবের কল্পনা থাটিবে না, কিম্বা, কার্য্যশক্তিবিরহিত বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থের ভিতরও এইরূপ বিপক্ষতা ধরা যাইতে পারিবে না; অতএব কেবল প্রাণিশ্রেণী হইতেই পক্ষনির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। Cricket খেলায় যেমন Batsman ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান খেলোয়াড়, জগদীশ্বরের এই সৃষ্টির রক্ষা ও চালনাব্যাপারেও মানব তেমনই কেন্দ্রীভূত; এই উপমার পূর্ণবিস্তার দেখাইতে গেলে, এখানে সেই ফলনিরূপিকা নীতিকে Umpire, বিভিন্ন মানব বা মানবশ্রেণীকে পক্ষদ্বয়, বাহ্যজগৎকে ক্রীড়াক্ষেত্র, অপরাপর ক্ষেত্র সম্পর্কিত মানবগণকে অন্যান্য খেলোয়াড়, এই বিশ্বস্থ যাবতীয় জড়বস্তুকে খেলাস্থানের বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জ এবং কোন এক বা একাধিক উদ্যোগী ও সুপটু মানবকে Bowler বলিতে হইবে। এক্ষণে, পাঠক! পরোক্ষ-ভাবে তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, এই দৃশ্যমান ক্ষুদ্র ক্রীড়াব্যাপারের ভিতর স্থূল-প্রত্যক্ষতার স্বভাবাতীত, আমাদের জড়-শক্তির অনায়ত্ত ও অন্তঃশক্তির ক্রিয়াগম্য কোন কিছু নিগূঢ় রহস্য নীরবে ও স্থিরভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে কি না। স্থিরচিত্তে একটু অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই, আমরা ইহার এই সকল অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে পারি—এই খেলায় Batsman ই কেন্দ্রস্থানীয় বলিয়া তাহার নিজের কর্ত্তব্যাংশের যথোচিত সম্পাদন হেতু তাহার উপরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে; আবার, দায়িত্ব সর্ব্বাধিক বলিয়া সে-ই সকলপ্রকার প্রধান ফলভোগেও সম্পূর্ণ অধিকারী ও বাধ্য। সে এমন অবস্থায় স্থাপিত যে, স্বেচ্ছানুসারে, অতি সহজে ও সর্ব্বতোভাবেই, প্রত্যাশিত ফল-লাভানুরূপ অবাধে ব্যাট্ চালনা করিতে পারে; কিন্তু, যদিও তাহার ব্যাট্ চালনা এইরূপ সম্পূর্ণ অবাধ ও কেবল স্বীয়শক্তিরই আয়ত্ত, তথাপি উহার ফলপ্রাপ্তি কখনও সেরূপ নহে; তাহার নিজের আঘাত-চালিত

বল ক্ষেত্রস্থ কোন প্রস্তর বা কাষ্ঠস্তম্ভাদিতে ঠেকিয়া, কি কোন বিপক্ষীয় খেলোয়াড়, কর্ত্তৃক Hopped হইয়া, কিম্বা আদৌ ব্যাট্ এ না লাগিয়া, Wicket এ প্রতিঘাত পাইয়া, অথবা, অন্য কোনপ্রকারে, তাহার পরাজয় বিধান করিতে পারে; তবে, যথাশক্তি সাবধান ও মনোনিবিষ্ট হইয়া খেলিলে, সম্ভাবিত ফলের আকার প্রকার বাহ্যিক ব্যাঘাতে, সাধারণতঃ অনেকটাই, স্থল-বিশেষে বা একবারে সম্পূর্ণই, অপরিবর্ত্তিত রাখিতে পারে; এবং, অবশেষে, চিন্তা-কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে, উহার গুপ্ত ও নিভৃত-তম প্রদেশে আসিয়া পড়িয়া, এই গূঢ়জ্ঞান-রূপ মহামণি অযত্নসংস্কৃত ও অনাদৃতাবস্থায়, মনোবিকার-রাহিত্যের নিম্ন ভূমিতলে নিপতিত দেখিতে পাই যে, ঐ ক্রীড়াক্ষেত্রস্থ সমস্ত খেলোয়াড়ের কার্য্য-শক্তিমূল ঐকান্তিক আন্তরিক উদ্যমোৎসাহ ও প্রভূত-সুতীক্ষ্ণ-কর্ম্মতেজঃপূর্ণ, সুযৌক্তিক সমবেত আত্মচেষ্টা মনুষ্যবৎ চৈতন্যসম্পন্ন একটিমাত্র মহতী শক্তির ন্যায় পরোক্ষভাবে কার্য্য করিয়া, সমগ্র ক্রীড়াব্যাপার যথাযথ রক্ষা ও চালনা করিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোহিনীমোহন আচার্য্য।

আরতি।

আজি—তোমার হস্তে আমার বিচার
করগো দেবি!
তৃষিত ব্যাকুল বিরস দগ্ধ
এ দীন-কবি—
শূন্য হৃদয়ে দুয়ারে তোমার,
মরমে লুটিছে শত হাহাকার
দীর্ঘ বরষ বিফল আমার,
গিয়াছে ডুবি—
বিপুল-রশ্মি, প্রভাতে সন্ধ্যা
মলিন ছবি।

ওগো—অবশ অলস পরাণ আমার
বিফল করে
ফিরায়ে দিও না অজ্ঞ বলিয়া,
জীবন তরে—
সহেছি ঝঞ্ঝা ঝটিকা ভীষণ,
তীব্র-অশনি ঘন-গরজন,
ব্যর্থ আঘাতে আজিকে জীবন
রয়েছে পড়ে,
শূন্য হৃদয়ে দাঁড়ায়ে রয়েছি
তোমারি দ্বারে।

দেবি!—প্রসাদে তোমার মূকের কণ্ঠে
মধুর বাণী,
পরশে তোমার অজ্ঞ বিপুল
জ্ঞানের খনি,
স্নেহেতে বীণার নিনাদ-মধুর,
হাসিতে সুধার ধারা সুমধুর,
শুভ্র আলোকে তিমির বিদূর—
পরশ-মণি,
এ দীন ভক্তে ফিরা'ও না আজ
হৃদয় রাণি!

প্রভাতি।

বড় সাধ গান্ গাহিবার ;
কিন্তু হায়! ভাষা নাই,
শুধু ভস্ম—শুধু ছাই—
প্রাণে শুধু হাহাকার!
কেবল করুণ সুরে
হৃদয়-বীণার তারে
জাগে মৃদু অতীত-ঝঙ্কার,
হৃদয়ে প্রকাশ যাহা
ভাষায় ফোটে না তাহা,
সুর নাই বীণায় আমার।
বোবার বাসনা গায়,
অন্ধের বাসনা চায়,
আমার বাসনা গাহিবার।

অতি ধীরে শুধু একবার—
নীরবে গাহিব গান,
তোমরা দিও না কান,
শুনিও না সঙ্গীত আমার ;
একবার শুধু গাব,
আবার নীরবে রব
মৃদু তান মিলাবে বীণার,
একবার শুধু কাঁদি
গাহিব চরণে সাধি,
'বল ওগো এ ভারত কার!
কাহার সন্তান মোরা,
এই দীন-অশ্রুধারা—
ভিখারীর এ ভূষণ কার?"

শুধাইব শুধু একবার—
আজি এ ভারত-বুকে
কাহারা সহিছে সুখে
পদাঘাত—পরপাদুকার!
আজি এ ভারতে কার
মর্ম্ম-ভেদী হাহাকার!
দীনতার দুঃখ অশ্রুধার!
আজি এ ভারতে হায়!
কাহারা পরের পায়
সাজাইছে-পূজার-সম্ভার!
বড় সাধ জানি আমি
এদের জনম ভূমি
কোন্ দেশে—কি জাতি তাহার?

শুধাইব শুধু একবার—
কেন সহে এত করি
সারা নিশি দিন ধরি
অনুদিন বহে অশ্রুধার?
এরা কি জীয়ন্তে মরা,
এরা কি আপন হারা,
প্রাণহীন—এতই অসার?
এদের কি কেহ নাই—

সহায় সম্বল ভাই—
বেদনায় নাহি প্রতিকার ?
অযুত-বরষ ধ'রে
ইহারা এমন করে
করিবে কি শুধু হাহাকার ?

শুধাইব শুধু একবার—
কাহার সন্তান এরা
এমন জীয়ন্তে মরা ?
সঞ্জীবতা প্রাণে নাহি আর !
বংশের মর্য্যাদা ছাই !
ওদের কি কিছু নাই,
বহে না কি শোণিত শিরার ?
ওদের কি হৃদি তলে
অনন্ত-অনল জ্বলে,
জ্বালাময় শত হাহাকার !
তাহারা কি সুখ পায়
জানিতে বাসনা হয়,
পর-পদে কি যে সুধা-ধার !

শুধাইব শুধু একবার—
এরা কি ভারত বাসী
একদিন যারা হাসি
ক'রেছিল মহিমা প্রচার ?
একদিন বীরবেশে
ফিরেছিল দেশে দেশে,
ক'রেছিল ভারত আমার !
একদিন অসিকরে
স্বদেশ রক্ষার তরে
দিয়েছিল প্রাণ আপনার !

পুলকে অযুত-ভক্ত
মাখিয়া শত্রুর-রক্ত
কি উন্মাদ—সমরে দুর্ব্বার !

শুধাইব শুধু একবার—
কাহারা সুসভ্য বলি
বিজয়-পতাকা তুলি
ক'রেছিল অসির ঝঙ্কার ?
একদিন স্নেহ-ভরে
তনয়ে আপন করে
সাজাইত মাতা আপনার !
স্বদেশ রক্ষার তরে
দিত তনয়ের করে
ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ তরবার !
রণ-রঙ্গে অসিকরা,
সেই দেশবাসী এরা
সতী সাধ্বী বীর-ললনার !!

শুধাইব শুধু একবার—
যে জাতি স্বদেশ লাগি
দিতে পারে প্রাণ ত্যাগি
হাসিমুখে— নয়ন-আসার
বিন্দুমাত্র নাহি ফেলে,
তপত শোণিত চলে
ধমনীতে—বীরের ঝঙ্কার—
হৃদয়ের তন্ত্রী ধরি
পরাণ উন্মাদ করি
জেগে উঠে শুধু বার বার,—
তাহারা কি এই জাতি
নীরব নিস্তেজ অতি
প্রাণময় শত হাহাকার !

শুধাইব শুধু একবার—
আজি সে চিতোর কোথা?
কোথা সেই বীর-গাথা—
কোথা সেই বিক্রম আত্মার?
শুধাইব শুধু আমি
প্রতাপের জন্ম-ভূমি
কোন্ দেশে—তোরা কোথাকার?
সে দেশ কি এই দেশ?
তবে কেন হীন বেশ!
প্রাণে আর নাহিক ঝঙ্কার?
তেমন হৃদয় কই?
তেমন সাহস কই?
কোথা সেই একতার হার?

শুধাইব আর একবার—
তোদের এমন করি
কে সাজাল আজি হরি
ধন জন,—বেশ দীনতার?
কে দিল রতন লয়ে
পদধূলি বিনিময়ে
বুকভরা এত হাহাকার?
দাসত্বের হেয় ফাঁসি
কি সাধে পরিলি হাসি?
নিলি যাচি দুঃখ অশ্রুধার!
কত বল ধরে তারা
বারেক জাগিয়া তোরা
দেখ দেখি ধরি তরবার!

এই শেষ আর একবার—
চুপি চুপি কানে কানে
বলিব বারেক প্রাণে
কর দেখি বলের সঞ্চার,
একবার জাতি ভুলি
উঠ দেখি সবে মিলি—
ফেলে দিয়ে পূজার সম্ভার,
শত্রুর শোণিত দিয়া
দৃঢ় করি বাঁধ হিয়া,
আয়োজন কর সাধনার,
কাঁপাইয়া মহী-ব্যোম
'হর হর—বম্ বম্'
ধর দেখি প্রাণের ঝঙ্কার!

এই শেষ—নাহি কিছু আর—
গলা নাই তবু গাই,
শুধু ভস্ম—শুধু ছাই,
নিজে শুনি গান আপনার,
এ মোর প্রাণের গান,
তোমরা দিও না কান,
সত্য মোর বড় আপনার!
ভাষা আছে ভাব নাই,
ভাব আছে ভাষা নাই,
তবু সাধ গান গাহিবার;
কিন্তু কেবা শোনে গান—
ভারতে কি আছে প্রাণ?—
তবু গাই লাগি আপনার!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

প্রতিজ্ঞা।

যেই দিন জনম লভিনু
বড় মোর কাঁদিল পরাণ ?
কিন্তু একি! জগত হাসিল
দুখে মম, তীব্র প্রতিদান।

একদিন পাষাণ-পরাণে
প্রতিশোধ লইব তাহার,
হাসিমুখে চলে যাব রাখি
ধরাবুকে শত হাহাকার!

অবোধ।

ভাল নাকি বাসি নাই
তাহারে পরাণ ভরি,
তারে নাকি ডাকি নাই
কখনো আদর করি,

বুঝাতে যে নাহি ভাষা
প্রাণে তারে ভালবাসি,
মুখের আদর—ছি! ছি!
তাই নাকি এত বেসী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

কাব্যপ্রকাশঃ।

২য় উল্লাস।

বৃত্তিঃ। গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র তটস্য ঘোষাধিকরণত্বসিদ্ধয়ে গঙ্গাশব্দঃ স্বার্থমর্পয়তী-ত্যেবমাদৌ লক্ষণেনৈষা লক্ষণা। উভয়রূপা চেয়ং শুদ্ধা উপচারেণামিশ্রিতত্বাৎ।

অনু। "গঙ্গায় ঘোষ" এইস্থলে তটকে ঘোষের অধিকরণ কারক করিয়া দেওয়ার জন্য (১) গঙ্গাশব্দ জলপ্রবাহরূপ নিজ অর্থ পরিত্যাগ করে, কাজেই ঈদৃশ স্থলে লক্ষণদ্বারা (অর্থাৎ স্বকীয়ার্থ পরিত্যাগদ্বারা) লক্ষণা হইয়া থাকে, অতএব ইহাকে লক্ষণ-লক্ষণা বলে। উপাদান-

(১) গঙ্গাশব্দে জল-প্রবাহ-বিশেষকে বুঝায়; জল-প্রবাহের উপর গ্রাম থাকিতে পারে না; অর্থাৎ প্রবাহ গ্রামের অধিকরণ কারক হইতে পারে না, তট অধিকরণ হইতে পারে। তটকে অধিকরণ করিবার জন্য "গঙ্গায় ঘোষ" এ স্থলের গঙ্গাশব্দ প্রবাহরূপ অর্থটি পরিত্যাগ করিল। ইহাই পরের জন্য নিজার্থ ত্যাগ। ইহাকে লক্ষণ-লক্ষণা বলে।

লক্ষণা ও লক্ষণ-লক্ষণা এই উভয়বিধ লক্ষণাই বিশুদ্ধ লক্ষণা; কেন না, ইহাদের সঙ্গে উপচার মিশ্রিত থাকে না।

বিবৃতি। কোন বিশেষ সাদৃশ্যবশতঃ ভিন্ন দুই বস্তুর অভেদ প্রতিপাদন করাকে উপচার বলে। যথা, লোকটা গোরু। নির্ব্বুদ্ধিতারূপ সাদৃশ্য দ্বারা মনুষ্য ও গোরুতে অভেদ জন্মান হইল। উপাদান ও লক্ষণ-লক্ষণায় এরূপ উপচার নাই।

বৃত্তিঃ। অনয়োর্লক্ষ্যস্য লক্ষকস্য চ ন ভেদরূপং তাটস্থ্যং, তটাদীনাং গঙ্গাদিশব্দৈঃ প্রতিপাদনে তত্ত্বপ্রতিপত্তৌ হি প্রতিপিপাদয়িষিত-প্রয়োজন-সম্প্রত্যয়ঃ। গঙ্গাসম্বন্ধমাত্র প্রতীতৌতু গঙ্গাতটে ঘোষ ইতি মুখ্যশব্দাভিধানা ল্লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ।

অনু। লক্ষ্য তীরাদি ও লক্ষক গঙ্গাদি, এই উভয়ের পরস্পর ভেদটি গৌণ ও বিশুদ্ধ লক্ষণার পার্থক্য প্রদর্শন করে, এরূপ নহে; অর্থাৎ শুদ্ধ লক্ষণায় লক্ষকশব্দ ও লক্ষ্যার্থে ভেদ থাকে; কিন্তু উপচার মিশ্রিত গৌণ লক্ষণায় উহাদের মধ্যে ভেদ থাকে না, ইহা বলিয়া শুদ্ধ ও গৌণী লক্ষণার প্রভেদ বুঝাইতে যাওয়া উচিত নহে; কারণ গৌণী লক্ষণার ন্যায় শুদ্ধা লক্ষণায়ও লক্ষক এবং লক্ষ্যে কার্য্যতঃ কোন ভেদ থাকে না। "গঙ্গায় ঘোষ" ইহা একটি শুদ্ধ লক্ষণা; ঈদৃশস্থলে গঙ্গাপ্রভৃতি লক্ষক শব্দ তট প্রভৃতি লক্ষ্যার্থ বুঝাইবার পর, লক্ষক গঙ্গা ও লক্ষ্য তীর মধ্যে অভেদ প্রতীতি হইলেই, অভিলষিত গঙ্গাগত শৈত্য ও পাবনত্বাদিরূপ প্রয়োজনের প্রতীতি হয়; উক্তস্থলে যদি গঙ্গা শব্দে তটরূপ অর্থ প্রতিপাদন-দ্বারা লক্ষক গঙ্গা ও লক্ষ্য তট মধ্যে প্রভেদ দেখাইতে চাহ, তবে "গঙ্গায় ঘোষ" না বলিয়া "গঙ্গাতটে ঘোষ" বলিলেই চলে এবং সে অবস্থায় লক্ষণা ও অভিধায় প্রভেদই বা থাকে কি?

বিবৃতি। "এই লোকটি গোরু" এইরূপ গৌণ লক্ষণায় লক্ষ্য লোক ও লক্ষক গোরুতে সাদৃশ্যমূলক অভেদ জ্ঞান থাকে; "গঙ্গায় ঘোষ" এই বিশুদ্ধ লক্ষণায়ও যে অভেদ থাকে না, এরূপ নহে। কাজেই লক্ষ্য ও লক্ষকের ভেদাভেদ দ্বারা শুদ্ধা ও গৌণী লক্ষণার ভেদ করা যায় না। "গঙ্গায় ঘোষ" এরূপ স্থলে গঙ্গা শব্দে, তটে গঙ্গার শৈত্যপাবনত্বাদিগুণ আছে, এরূপ বুঝান আবশ্যক, কেবল তট বুঝান আবশ্যক নহে; যদি উক্ত লক্ষণায় গঙ্গা শব্দে কেবল তট বুঝাইত, তবে লোকে, "গঙ্গায় ঘোষ" না বলিয়া, "গঙ্গা তটে ঘোষ"ই বলিত; লক্ষণা করিবার আবশ্যকতা থাকিত না; যদি লক্ষণায় "গঙ্গা শব্দে, তটে গঙ্গার শৈত্য-পাবনত্বাদি গুণ আছে, এরূপ অর্থ বুঝানের আবশ্যকতা স্বীকার কর, তবে উক্ত লক্ষণায় লক্ষক গঙ্গা ও লক্ষ্য তটে ভেদ থাকিল কৈ? কেন না, তট ও গঙ্গা অভিন্ন না হইলে, গঙ্গার শৈত্য ও পাবনত্বাদি গুণ তটে থাকিবে কিরূপে? অতএব গৌণ-লক্ষণার ন্যায় শুদ্ধ-লক্ষণায়ও লক্ষ্য এবং লক্ষকে অভেদ থাকে। অর্থাৎ "অন্যত্রান্যশব্দপ্রয়োগ স্তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং" অন্যের ধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্যই এক শব্দ অন্যার্থে প্রযুক্ত হয়। তীরে গঙ্গার শৈত্যাদি গুণ প্রাপ্তির জন্য

তীরার্থে গঙ্গা শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই পরধর্ম্ম-প্রাপ্তিকেই প্রয়োজন বলে।

সারোপাণ্যাতু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।

বৃত্তিঃ। আরোপ্যমাণ আরোপ বিষয়শ্চ যত্রানপহ্নুত-ভেদৌ সামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দিষ্টেতে সা লক্ষণা সারোপা।

অনু। যে লক্ষণায় বিষয়ী অর্থাৎ আরোপ্যমাণ বস্তু এবং বিষয় অর্থাৎ আরোপের বিষয় (যাহাতে আরোপ হয়, তাহা) এই উভয়গত ভেদ গোপন করা হয় না, অথচ উভয়ই বিশেষ্য বিশেষণভাবে এক বিভক্তিযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, সে লক্ষণাকে সারোপা লক্ষণা বলে।

বিবৃতি। গৌর্বাহীকঃ (১) (বাহীক গোরু) ইহা সারোপা লক্ষণা। "বাহীক গোরু" এই দৃষ্টান্তে গোরু হইয়াছে আরোপ্য বস্তু; বাহীক হইয়াছে আরোপের আশ্রয়; এই উভয়ের ভেদ স্পষ্ট রাখা হইয়াছে, অথচ বাহীক ও গোরু পরস্পর বিশেষ্যবিশেষণ বা এক বিভক্তিযুক্ত, কাজেই উভয়ের ঐক্যও প্রতীতি হইতেছে; ইহা সারোপা লক্ষণা। ভারতখ্যাত ভোজরাজ স্বরচিত কণ্ঠাভরণে বলিয়াছেন—বৃত্তি তিন প্রকার—মুখ্যা, গৌণী ও লক্ষণা; মম্মটাচার্য্য ভোজরাজকে কৌশলে গালি দিয়া বলিলেন, "তুমি যাহাকে গৌণীবৃত্তি বল, তাহা বস্তুতঃ লক্ষণার অবান্তরভেদ মাত্র, কাজেই শব্দের বৃত্তি দুই প্রকার—মুখ্যা ও লক্ষণা; কখনও তিন প্রকার নহে।

বিষয্যন্তঃ কৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা।

বৃত্তিঃ। বিষয়িনাঽরোপ্যমাণেনান্তঃ কৃতে নিগীর্ণে অন্যস্মিন্নারোপবিষয়ে সতি সাধ্যবসানা স্যাৎ।

অনু। আরোপ্যমাণ গো প্রভৃতি যদি আরোপের আশ্রয় বাহীকাদিকে গিলিয়া ফেলে, (অর্থাৎ আরোপ্যমাণ গবাদি শব্দই প্রযুক্ত হয়, আরোপের আশ্রয়বাচক শব্দের প্রয়োগ না হয়) তবে সে লক্ষণাকে সাধ্যবসানিকা বলে।

বিবৃতি। গৌরয়ম্ (ইনি গোরু) এস্থলে কেবল আরোপ্যমাণ গো শব্দেরই প্রয়োগ হইয়াছে; বাহীককে গো শব্দে কবলিত করিয়াছে; ইদম্ শব্দে তাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে। এস্থলে বিষয়ী ও বিষয় মধ্যে ভেদ অপ্রকাশ রাখিয়া অভেদ প্রতীতি হইয়াছে; সারোপায় ভেদ প্রকাশদ্বারা অভেদ প্রতীতি হয়। যথা গৌর্বাহীকঃ। এই দুইটি গৌণী লক্ষণায়ও মুখ্যার্থবাধ, মুখ্যার্থযোগ ও প্রয়োজনরূপ হেতুত্রয় বিদ্যমান থাকে।

ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরত স্তথা।
গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ,

বৃত্তিঃ। ইমৌ আরোপাধ্যবসানরূপৌ

(১) পঞ্চনদ বা পঞ্জাব দেশকে মদ্রদেশ ও তথাকার মনুষ্যদিগকে বাহীক বলে। মহাভারতে লিখিত আছে, বাহী ও হীক নামক পিশাচ ও পিশাচী পঞ্চনদ দেশীয় মানবগণকে সৃষ্টি করে বলিয়া, উহাদিগকে বাহীক বলে। ইহারা পূর্ব্বে অত্যন্ত জড়বুদ্ধি ও মূর্খ ছিল এবং গোরুর মত দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ করিত। এইজন্য ইহাদিগকে শাস্ত্রে গোরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সাদৃশ্যহেতু ভেদৌ গৌর্বাহীক ইত্যত্র গৌরয়-মিত্যত্র চ।

অনু। বাহীক গোরু, ঐটা গোরু, এই দুইস্থলে যথাক্রমে আরোপ ও অধ্যবসান দ্বারা সাদৃশ্যমূলক দুইটি লক্ষণা হইয়াছে, ইহাদিগকে গৌণী লক্ষণা বলে; সাদৃশ্যভিন্ন কার্য্যকারণাদি অন্য সম্বন্ধমূলেও দুই প্রকার লক্ষণা হয়, তাহাদিগকে শুদ্ধা বলে।

বৃত্তিঃ। অত্র হি স্বার্থসহচারিণো গুণা জাড্যমান্দ্যাদয়ো লক্ষ্যমাণা অপি গো শব্দস্য পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বমুপযান্তীতি কেচিৎ। স্বার্থসহচারিগুণাভেদেন পরার্থগতা গুণা এব লক্ষ্যন্তে নতু পরার্থোঽভিধীয়ত ইত্যন্যে।

অনু। [গৌর্বাহীকঃ (বাহীক গোরু) এইস্থলে যে হেতু অবলম্বন করিয়া গো শব্দ বাহীকার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই হেতু সম্বন্ধে তিনটি মত-ভেদ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।]

গৌর্বাহীকঃ এস্থলে গোত্বই গোশব্দের স্বকীয় অর্থ, এবং গো-গত জাড্য ও মূঢ়তা সেই গোত্বে সমবেত সহচারী গুণ বিশেষ; সে গুণগুলি গো শব্দ দ্বারা উক্ত না হইয়া লক্ষিত হইয়াছে। আবার সেই লক্ষিত জাড্যাদিগুণকে নিমিত্ত কল্পনা করিয়া, গোশব্দ অভিধাশক্তিদ্বারা বাহীকরূপ অর্থও প্রতিপাদন করিতেছে; ইহা কাহার কাহার মত। অন্যে বলেন, গোত্বে সমবেত জাড্যাদিগুণ ও বাহীকস্থ জাড্যাদিগুণ অভিন্ন; সেই অভিন্নতা বশতঃই গো শব্দ দ্বারা বাহীকগত জাড্যাদিগুণ লক্ষিত হয়; তৎপর সেই বাহীকগত জাড্যাদি গুণদ্বারা বাহীক অনুমিত হয়, কিন্তু গোশব্দের অভিধা শক্তিদ্বারা বাহীক উক্ত হয়, এরূপ নহে।

বিবৃতি। গৌর্বাহীকঃ—এস্থলে গো শব্দের সঙ্গে কিরূপে বাহীক শব্দের অন্বয় হইবে, ইহা বুঝা আবশ্যক। প্রথম মতানুসারে গোশব্দের বাচ্যার্থ গোত্ব, তাহাতে সমবেত জড়তা গোশব্দের লক্ষ্যার্থ; গোশব্দ, স্বগত জাড্যাদিগুণ অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ জাড্যরূপ স্বীয় লক্ষ্যার্থকে শক্যতাবচ্ছেদকে পরিণত করিয়া) অভিধা শক্তিমূলে বাহীকার্থ বুঝাইয়া, বাহীকের সঙ্গে অন্বিত হইয়াছে। কিন্তু এই মতটি ভাল নহে; কারণ, বাহীক অর্থে গো শব্দের সঙ্কেত নাই, যাহাতে যাহার সঙ্কেত নাই, তাহা কখনও তাহার অভিধাশক্তির বিষয় হইতে পারে না, কাজেই বাহীক কখনও গোশব্দের বাচ্যার্থ নহে। এই জন্য অন্যমতাবলম্বী বলেন, গোনিষ্ঠ জড়তা ও বাহীকনিষ্ঠ জড়তা একই; এইজন্য বাহীকনিষ্ঠ জড়তাই গো শব্দ দ্বারা লক্ষিত হয়, তৎপর বাহীকরূপ অর্থটি আক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে গো শব্দের সঙ্গে বাহীক শব্দের অন্বয় হয়। কিন্তু এই মতটিও দোষশূন্য নহে; কারণ গো ও বাহীক নীল ও উৎপলবৎ একধর্ম্মিবোধক শব্দ নহে, উহাদের সমানাধিকরণ্য ওরূপে ঘটিয়া উঠে না। এইজন্য ঐ দুই মতের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বৃত্তিকার নিম্নে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া তাহার সমর্থন জন্য জৈমিনিমত উত্থাপন করিতেছেন।

বৃত্তিঃ। সাধারণগুণাশ্রয়ত্বেন পরার্থ এব লক্ষ্যতে ইত্যপরে। উক্তঞ্চান্যত্র অভিধেয়াবিনাভূত প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে। লক্ষ্যমাণগুণৈ-

যোগাৎ বৃত্তেরিষ্টাতু গৌণতেতি। (১) অবিনাভাবোঽত্র সম্বন্ধমাত্রং ন তু নান্তরীয়কত্বম্ তত্ত্বে হি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যাদৌ ন লক্ষণা স্যাৎ, অবিনাভাবে চাক্ষেপে নৈব সিদ্ধের্লক্ষণায়া নোপযোগ ইত্যুক্তম্।

অনু। অপর (ন পর অপর, অর্থাৎ নিজ) মত এই, গো ও বাহীক এই উভয়ের সাধারণ গুণ জাড্যাদির আশ্রয়তারূপ সম্বন্ধদ্বারা গো-শব্দ দ্বারা বাহীকরূপ অর্থই লক্ষিত হইয়াছে। কেন না, (জৈমিনি সূত্রের) বার্ত্তিককার (কুমারিলভট্ট) স্বকৃত বার্ত্তিকে বলিয়াছেন, গঙ্গাদি শব্দের প্রবাহরূপ মুখ্যার্থ যে অবস্থায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় প্রবাহরূপ মুখ্যার্থের সঙ্গে (অবিনাভূত) সম্বন্ধবিশিষ্ট তটাদি প্রতীতির ব্যাপারকে লক্ষণা বলে এবং লক্ষ্যমাণ জাড্যাদিগুণের সঙ্গে যোগ (বা সম্বন্ধ) বশতঃ গোশব্দে যে বাহীকরূপ অর্থের বোধকতা থাকে, তাহাকে গৌণী-বৃত্তি বলে। বার্ত্তিককারোক্ত অবিনাভাবশব্দে সম্বন্ধ বুঝায়, কিন্তু ব্যাপ্তি বুঝায় না, ব্যাপ্তি বুঝাইলে "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" (মঞ্চ শব্দ করিতেছে) এ স্থলে লক্ষণা হইত না; কেন না, "মঞ্চ শব্দ করে" এ স্থলে (অচেতন মঞ্চ শব্দ করিতে পারে না, কাজেই মঞ্চস্থ বালকগণ শব্দ করে, এরূপ লক্ষ্যার্থ বোধ হইয়া থাকে) মঞ্চস্থ বালক ও মঞ্চে দৈশিক ও কালিক ব্যাপ্তি থাকে-না। যদি ব্যাপ্তি স্বীকার কর, তবে আক্ষেপ (অনুমান) দ্বারাই কার্য্য হয়, লক্ষণার উপযোগিতা থাকিবে না, ইহা পূর্ব্বেই একবার বলা গিয়াছে। অতএব গোতে বর্ত্তমান যে জাড্যাদি গুণসমূহ, তাহাদের স্বজাতীয় জাড্যাদিগুণ ইহাতে আছে, এইরূপ একটা সম্বন্ধ স্বীকার বশতঃ লক্ষণাদ্বারা গোশব্দে বাহীকরূপ অর্থ বুঝা যায় এবং তাহাতেই গো ও বাহীকে সমাসম্বন্ধ জন্মে; এই নিজ মতটিই উত্তম।

বিবৃতি। "গো বাহীক" এরূপ বলিলে কার্য্যতঃ বাহীকই গো শব্দের অর্থ হইয়া দাঁড়ায়; কি প্রণালীতে গোশব্দ নিজ অর্থের অবলম্বনে বাহীকার্থটি বুঝায়, তাহাই বৃত্তিকার বুঝাইয়া দিলেন; এখন কার্য্যকারণাদিরূপ সম্বন্ধমূলক গৌণী লক্ষণার কথা বলিতেছেন।

বৃত্তিঃ। আয়ুর্ঘৃতং আয়ুরেবেদং ইত্যাদৌচ সাদৃশ্যাদন্যৎ কার্য্যকারণভাবাদি সম্বন্ধান্তরম্। এবমাদৌচ কার্য্যকারণভাবাদি লক্ষণপূর্ব্বে আরোপাধ্যাবসানে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্ এ।

---

(১) বার্ত্তিকের পূর্ব্বশ্লোক এই—"মানান্তর বিরোধেতু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে। অভিধেয়া বিনাভূত প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে" ইত্যাদি। কাব্যপ্রকাশের "মুখ্যার্থ-বাধে তদ্‌যোগে" এই সূত্রটি ঠিক কুমারিলভট্ট কৃত বার্ত্তিকের অনুরূপ। প্রকৃত কথা এই—জৈমিনীয় দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন দর্শনশাস্ত্রের সম্রাট্—বলিতে কি, উক্ত দর্শনের উপর সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শন পাণিনির অত্যন্ত অনুগত; শাস্ত্রার্থ বুঝিতে হইলে, এই দর্শন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

চতুর্থ খণ্ড] ফাল্গুন ও চৈত্র। ১৩১২ সন। [১১শ, ১২শ সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

১১।১২

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

১৩১৩ সনের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই বাহির হইবে। গ্রাহকবর্গের কৃপা ও সহানুভূতিই বান্ধবের একমাত্র সম্বল। ভরসা করি আমরা তাহাতে, বঞ্চিত হইব না। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ১৩১২ সনের বার্ষিক মূল্য দেন নাই, তাঁহারা শীঘ্র নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৴৹	৩।৴৹
ষাণ্মাসিক	২৲	৶৹	২৶৹

পশ্চাদ্দেয়।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৪৲	।৴৹	৪।৴৹
ষাণ্মাসিক	২॥৹	৶৹	২॥৶৹

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারি-সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হয় না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। গ্রাহক-নম্বর ব্যতিরেকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনাদি কার্য্যেও বড় অসুবিধা ঘটে। সুতরাং গ্রাহকগণ পত্র লিখিতে কিংবা মূল্য প্রেরণ করিবার সময় দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না। নূতন গ্রাহকেরা "নূতন" এই শব্দের উল্লেখ করিবেন।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵৹, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

☞ কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিবেন। ব্যারিং বা ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না।

বান্ধব-কুটীর,—ঢাকা।
১৩১১ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ
বি. এ।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

দৈব ও পুরুষকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে, এই সামান্য ক্রীড়াব্যাপারের এই সকল তাত্ত্বিক লক্ষণ জগদীশ্বরের এই বিচিত্র সৃষ্টির অনন্ত আয়তনে ও যথানুপাতে ঔপমিক-ভাবে আরোপিত হইতে পারে। Batsman ই যেমন ঐখেলার মুখ্য লক্ষ্য ও সর্ব্বপ্রধান খেলোয়াড়, ভগবানের সৃষ্টিরাজ্যে কর্ম্মানুষ্ঠক মানবই তেমন কেন্দ্রপাত্র; এবং তদ্ধেতুই, তাহার স্বীয় কর্ত্তব্যের যথোচিত সাধন নিমিত্ত, উহার যাবতীয় ফলভোগেও সে-ই বিশেষভাবে সর্ব্বাধিক দায়ী ও অধিকারী; বিশ্বপতির এই অনন্তসৃষ্টিতে, সে এমনই অদ্ভুতভাবে অবস্থাপিত যে, কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে সে সর্ব্বতোভাবেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তিসম্বন্ধে, অনেক স্থলেই, বাহ্যিকঘটনা ও অবস্থারূপ ব্যাঘাতেরই প্রভাবায়ত্ত। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য ও বিবেচ্য যে মানবের যাবতীয় কার্য্যের ফলনিরূপণই কেবল অল্প কতকটা তাহার স্বকীয় শক্তির ব্যবহার প্রণালীর উপর নির্ভর করে, আর অধিকাংশ স্থলেই এই বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার প্রকৃতিসাপেক্ষ। কিন্তু এই ঘটনা ও অবস্থা আবার স্বভাবতঃ এরূপ গঠিত যে, উহারা নিজ নিজ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন থাকিয়া, কখনও কার্য্যফল নির্ণয় করিতে পারে না—ফলনিরূপণের মূলমন্ত্র উহাদের সমবায় ও কর্ম্মকর্ত্তার প্রকৃতি। বিষয়টি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনে কর, তুমি "পতন"নামক কোন একটি ঘটনার কথা শুনিলে। এক্ষণে, ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, শুধু এই "পতন" হইতে তুমি কোনও ফল নির্ণয় করিতে পারিবে না। যথার্থ ফল নিরূপণ করিতে হইলে, এই সকল কথা জানা চাই—কি বা কে পড়িয়াছে? কোথা বা কত উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়াছে? কিরূপ ভাবে পড়িয়াছে? কোথায় বা কত নিম্ন অথবা কিরূপ স্থানে পড়িয়াছে, কখন পড়িয়াছে? ইত্যাদি। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফল অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়াইবে। এখানে সূক্ষ্ম-বিবরণের ভিতর প্রবেশ না করিয়া, স্থূলতঃ দুই এক কথায় এই দেখাইতেছি যে, ঐ পতিত পদার্থ যদি কোন দ্বিতলগৃহের ছাদের উপর হইতে লম্বপ্রোথিত শাণিতাস্ত্রসমাবৃত ভূমি-পৃষ্ঠবিশেষে পড়িয়া থাকে, তবে উহা মনুষ্যাদির ন্যায় কোন ভারী ও বৃহৎ প্রাণী হইলে, ঘটনার ফল যৎপরোনাস্তি সাংঘাতিক; কিন্তু, একটা পাখীর পালক বা একটু তুলা ইত্যাদির ন্যায় অতি লঘু ও ক্ষুদ্র বস্তু হইলে, সেই পতন-ফলই আবার অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর হইবে। পুনশ্চ, ঘটনার আদি ও অন্ত উভয় সীমা-স্থানের ব্যবধান পরিমাণ যদি অতি সামান্য—দুই এক হস্ত মাত্র—হইত, তদবস্থায় আবার পূর্ব্বোক্ত উভয়রূপ পাত্রের পক্ষেই ফল প্রায় একইরূপ অধর্ত্তব্য হইত। অতএব স্পষ্টই

বুঝা যায় যে, যে স্থলে ঘটনা, অবস্থা ও পাত্র বা কর্ম্মকর্ত্তার এইরূপ সমবায় সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক, সেখানে ফলও শুভ হয়, আর উহা অমঙ্গলসূচক হইলেই ফলও তদনুসারে অশুভ হইয়া থাকে। ঘটনাদির এই সমবায় আকস্মিক বা আমাদের অতর্কিতপূর্ব্ব কিংবা অসম্ভাবিত হইলেই, উহা ইংরেজীতে "Chance" বলা হয়। এই "Chance" ও দৈব বা ইংরেজী 'Fate' এর কি পার্থক্য, তাহা সকলেরই অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা উচিত। অনেকে "Chance"কেই দৈব মনে করেন। শুধু এই কএকটি প্রভেদলক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর হইতে পারে যে, "Chance" আমাদের বর্ত্তমান জন্মের উক্তরূপ ঘটনাদির সংঘর্ষ, আর দৈব পূর্ব্বজন্মের পদার্থ, কিন্তু ইহজন্মে তাহার ক্রিয়া; "Chance" সেই ফলনিরূপিকা নীতির বাহ্যিক ব্যাঘাত সম্ভূত বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষ ফল, আর দৈব উহার জীবেচ্ছাসঞ্জাত, পূর্ব্ববর্ত্তি ও পরোক্ষ ফল; "Chance" এর প্রকৃতি ও উৎপত্তি সকলই আমাদের সহজবোধগম্য, কিন্তু দৈবের নামেই আমরা বিস্ময়বিমূঢ় হই; আবার, যথাসম্ভব যুক্তি, চিন্তা ও অবধানসহকারে চলিলে, "Chance" অনায়াসেই ব্যাহত হইতে পারে কিংবা আমরা উহার ক্রিয়াফল হইতে একবারে মুক্ত বা অনাহত থাকিতে পারি; কিন্তু দৈবের ব্যাহতি কেবল পরমার্থ সাধনাসাপেক্ষ। তবে, উহাদের উভয়ের প্রভেদ স্থলে এই বলা যাইতে পারে যে, সংসারের এই ঘটনাদির সংখ্যা ও প্রকৃতি সামান্য মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অনায়ত্ত ও অনভিভাবনীয় বলিয়াই, আমরা আপাতদৃষ্টিতে অনেক কার্য্য ও ঘটনার প্রত্যাশিত ফলের বিলক্ষণ পার্থক্য বা একবারে বৈপরীত্য দেখিয়া থাকি: কিন্তু, তাহাতেই আমাদের ন্যায়ানপেত, সূক্ষ্ম ও সত্য ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বা ভগবানের সনাতন স্বভাবে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়া কখনও উচিত নয়; স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া এই বুঝা উচিত যে, কর্ম্মকর্ত্তা জীবরূপ Batsman যে ঘটনাপ্রবাহরূপ বলকে আঘাত করিয়া চালাইয়া দিয়াছে, তাহা ক্ষেত্রস্থ প্রস্তরাদিরূপ অবস্থা ব্যাঘাতে নানাস্থলে প্রতিহত হইয়া, স্থিরস্থিতিরূপ অন্তসীমা না পাওয়া পর্য্যন্ত, মাঝখানে কোথাও প্রকৃত শেষফল নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব, মানব! অত অস্থির ও উদ্বিগ্ন কেন? এত হতাশ হইও না, বিশ্বাস হারাইও না; আজি কোন প্রবল দুর্ব্বৃত্ত তোমার উপর অকারণে পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াও একবারেই অদণ্ডিত রহিয়া গেল বলিয়া, তুমি যে মনে করিতেছ ও ঘোর আক্ষেপাবেগে অবসন্ন হইতেছ, অথবা তুমি হৃদয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল থাকিয়াও, বাহ্যিক ঘটনাচক্রে নানারূপে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইয়া যে সংসারের অবিবেকিতা নির্দ্দেশ ও সিদ্ধান্ত করিতেছ, এ সকল তোমার ঠিক ধারণা নহে —বিষম ভ্রান্তি! এ কথা নিশ্চিত জানিও যে, সেই পাষণ্ডের চালিত ঘটনাপ্রবাহের বা তোমার স্বকীয় কার্য্য প্রণালীর বল এখনও ব্যাহত ও প্রতিহত হইয়া পূর্ণরূপে বেগহীন ও স্থিরস্থিত হয় নাই—বল সম্যক্ বেগহীন ও স্থিরস্থিত না হইলে মধ্যস্থলে, কোথায় কিরূপে ফল

নিরূপিত হইতে পারে বল দেখি?—অতএব. আর একটুকু অপেক্ষা কর, বল্ থাকিতে দেও —পাপিষ্ঠের পাপকার্য্যের ভীষণ বিচারকাল আসিতে দেও আর তোমারও বিপন্ন ও লাঞ্ছিতাবস্থার বিচারের দিন আসুক, প্রথমাক্ষেত্রে, হর্ষোৎফুল্লনেত্রে দেখিতে পাইবে যে, সেই দুর্ব্বৃত্তের এমনই ঘোর দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, পাপাত্মার দারুণ অত্যাচারকালে তোমার ক্রোধিত প্রতিহিংসাবৃত্তিও তাহা আকাঙ্ক্ষা করে নাই! তখন কার্য্যতঃ দেখিবে যে মিণ্টনের সেই খাঁটি কথা—"Evil on itself shall back recoil" কতদূর খাঁটি। আর দ্বিতীয়তঃ,—তোমার সেই বিপদ ও লাঞ্ছনাসম্বন্ধে, কালবিবর্ত্তনে, চিত্তের চাঞ্চল্যাপগম ও অবসাদানুবর্ত্তি স্থৈর্য্যাবস্থায়, করুণাময়ের পরোক্ষ করুণাভূত আকস্মিক অ.বশ্যিক প্রণোদনোপদেশে, লজ্জাসঙ্কুচিতমনে বাধ্য হইয়া বুঝিতে পারিবে যে, উহা কেবল তোমার একরূপ স্বকীয় দোষের ফলমাত্র;—এ দোষ হৃদয়ের না হইলেও মস্তিষ্কের বা মনের—নির্ব্বুদ্ধিতা বা ভ্রান্তি; তখন তদ্রূপ বুঝিবে যে, নিজের বা পরের—সকলেরই অপরাধ বা দোষ, বিচারকাল উপস্থিত হওয়া মাত্রই জড়জাগতিক ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়ার ন্যায়, সূক্ষ্মতম ন্যায়ে বিচারিত হইবে। কিন্তু ঐ কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে, কখনই কিছুতে উহার প্রকৃত ফলনিরূপণ হইবে না। এ কথাটি একবারে ঠিক ও খাঁটি জানিয়া, উভয়ক্ষেত্রে দুঃখাবেগে অবসন্ন হইয়া না পড়িয়া, প্রথমস্থলে, পরের অপ্রিয় ব্যবহারেও ক্রুদ্ধ হইতে নাই, যেহেতু, প্রাকৃতিক ন্যায়নীতিতেই যথাসময়ে উহার কুফল নির্ণীত ও ভুক্ত হইবে; আর, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, স্বঘটিত বিপদাদিতেও ভগবানে বিশ্বাসহীন ও হতাশ হইবে না, কারণ নিজেই নিজের শত্রু হইয়া,—নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া, তাহার জন্য আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে বসিলে, সে কান্নায় ভাবুকের হৃদয়ে প্রথমে দুঃখবোধ না হইয়া বরং হাসিরই উদ্রেক হইয়া থাকে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ফলনিরূপিকা নীতির সেই সত্য সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারে, সকলেরই ঘটনাসংশ্লিষ্ট সর্ব্ববিধ-দুর্নির্ণেয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম দোষ বা ক্রটিও যেরূপ ফলভোগানুক্রমে যথাকালে স্থূল লোকনেত্রে পূর্ণাকারে প্রকাশ পাইবে, সেইরূপ যাবতীয় অনাদৃত, প্রচ্ছন্ন গুণ বা হৃদয়ের সদিচ্ছা ও সাধুতাও যে কালে লোক-প্রকাশিত হইয়া যথাযথ পুরস্কৃত না হইবে, কখনই সে ধারণা মনে আনিও না। অতএব, স্থূলতঃ, জীবনে সর্ব্বদাই এই সার কথা মনে রাখিয়া চলিবে যে, সেই কর্ত্তব্যকঠোর, ন্যায়ানপেত, সত্যপর ফলনিরূপিকা নীতির ক্রিয়া,বৃহৎ কি ক্ষুদ্র, স্থূল কি সূক্ষ্ম, সর্ব্বক্ষেত্রেই, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তগমনের ন্যায় চিরকালই অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত। যাহাহউক, এইরূপ যদিও জীবের কর্ম্মফল অনেকাংশেই দৈবিক ঘটনা ও অবস্থার উপর নির্ভর করে, তথাপি, তাহার অনুকূলে এটুকু অকাট্য বলিয়াই ধরা যাইতে পারে যে, যথাসম্ভব অবধান ও একাগ্রতা সহকারে, উপার্জ্জিত জ্ঞান ও স্বাভাবিক বুদ্ধি খাটাইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, তাহার অভীষ্ট-

ফল বাহ্যিক ব্যাঘাতে অতি অল্পই ব্যাহত হয়। জীবের—বিশেষতঃ জীবশ্রেষ্ঠ মানবের—এই-রূপ বিরুদ্ধাবস্থাক্রান্ত আত্মচেষ্টাই পুরুষকার। এখন আমরা স্পষ্টই দেখি যে জীব এক ভাবে—আত্মশক্তিব্যবহারে বা কর্ম্মানুষ্ঠানে—সম্পূর্ণই স্বাধীন; আবার, অপরভাবে—বাহ্যিক ব্যাঘাতে—সাধারণতঃ অনেকাংশেই অবস্থাধীন; অর্থাৎ ফলটা সর্ব্বাংশে তাহার নিজের আয়ত্ত নয়; পরন্তু, স্বীয় অসাধারণ শক্তিসমূহের স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার যখন তাহার নিজের উপরই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, তখন ফলনিরূপণ ব্যাপারে তাহার—প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ না হইলেও—যে পরোক্ষভাবে আংশিক অধিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। অতএব আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, তাহার আত্যন্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে, একবারে না হউক সহস্রাধিকবারে, এক এক দিনে না হইলেও সহস্রাধিক দিনে, একটু একটু করিয়া, ক্রমে ঈপ্সিত ফলের সর্ব্বাংশই লাভ করিতে পারে। কিন্তু, এই সুদৃঢ়সংকল্প, অক্লান্তোদ্যম,ক্রম-চালিত উচ্চ আত্মচেষ্টা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব ভিন্ন অন্য কোনও নিম্নতর জীবে কখনই সম্ভবে না; তন্নিমিত্ত, ইহার সুমহৎ ফলের ভোগাধিকারও কেবল তাহারই আয়ত্ত। তবে, এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, এই মহত্তম ফলভোগে নিম্নতর জীবের কি কোনক্রমেই কোন অধিকার নাই? যুক্তিই ইহার উত্তর দিবে, এই নিম্নতর অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিলেই কেবল তাহার পক্ষে উহা সম্ভবপর। যাহা-হউক, ইহাতেই বুঝা যায় যে, মানবের আত্ম-চেষ্টা বা পুরুষকার নানাবিধ বাহ্যিক অবস্থায় ব্যাহত হইলেও, তাহার ভিতর এমনই স্বাভাবিক মহাশক্তি নিহিত আছে যে, তদ্দ্বারা সে ইচ্ছা করিলে জগতের যাবতীয় বাধা বিঘ্নের জটিল, দুর্দ্ধর্ষপ্রভাব উপেক্ষা করিয়াও—হ্রস্ব সময়ে না হইলেও দীর্ঘকালে, ক্রমোন্নতির অন্তসীমা রজঃ ও তমোগুণে অস্পৃষ্ট সেই সত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দৈব-ব্যাহতিরূপ মহেষ্টি-সাধনও করিতে পারে। এই ত মানবের "কর্ম্ম" বা "পুরুষকার" শক্তির প্রভাব। এক্ষণে, আমাদের দেখিতে হইবে যে, এই অনন্ত সৃষ্টিতে ইহা হইতেও অধিক প্রভাবশালী কোন মহত্তরা শক্তি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের উপরই তাহার অসীম আধিপত্য বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে কি না।

তবে, প্রাসঙ্গিকতার অনুরোধে,—সেই ক্ষুদ্র ক্রীড়ার তর্কিতাবশিষ্ট সর্ব্বশেষোক্ত তাত্ত্বিক লক্ষণটি ভগবানের এই অনন্ত সৃষ্টির উপর পূর্ব্ববৎ ঔপমিকভাবে, যোগ্যানুপাতে খাটাইয়া দেখিতে হইবে যে, উহা হইতে কিরূপ গভীর অন্তস্তত্ত্ব বাহির করা যাইতে পারে। সে-ভাবে আমরা এখানে দেখিতে পাই যে, ঐ Cricket ক্রীড়াব্যাপার যেরূপ সমস্ত খেলোয়াড়ের ঐকান্তিক আন্তরিক উদ্যমোৎসাহপূর্ণ সমবেত ও একীভূত জীবশক্তিকর্ত্তৃক যথাযথ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেইরূপ ন্যায়যুক্তির অনন্ত আধার, অনন্তগুণোপেত, অনন্ত প্রভাবশালী,গূঢ় প্রকৃতিক, চৈতন্যময়ী কোন সর্ব্বব্যাপি সুমহতী কার্য্যশক্তি, স্বীয় প্রকৃতিবশে অদৃশ্য-

ভাবে অন্তরালে থাকিয়া, এই দৃশ্যমান অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি—অভ্রান্ত অবধান পূর্ব্বক যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতেছে; জড়-জগদ্‌বাসী জড়তাপ্রিয় মানব! ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই চৈতন্যচালিত চৈতন্যলক্ষিত অচিন্ত্য-কঠিন অনন্ত ব্যাপার, তোমার মত দুটু সূক্ষ্মতণ্ডুলের সুপক্ক অন্ন ও মৎস্যজাতিসার রোহিত-রঞ্জিত সুস্বাদু ব্যঞ্জন আহার এবং প্রিয়সখাদিগের সঙ্গে একটু সান্ধ্যপ্রমোদবিহার করিয়া, সুখবিলাসের পতাকা উড়াইয়া চলিলেই সাধিত হইতে পারে না; উহার যথোচিত সম্পাদন যে অপরের পক্ষে কতদূর কষ্টসাধ্য ও কিরূপ উচ্চশক্তিসাপেক্ষ, তাহা স্বয়ং সেই অভাবনীয় সম্পাদক ভিন্ন অন্য কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে কি? যাহাহউক, এক্ষণে কথা এই যে, এই অভাবনীয় সম্পাদক কি বা কে? অহো!! আর কি বা কে? যাঁহার বিচিত্র প্রকৃতিগুণে আমরা যাঁহাকে চিনিয়াও চিনি না —যিনি, কি যেন কি ভাবে বা উদ্দেশ্যে, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ও কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া, একবারে আমাদের কর্ণপার্শ্ব পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়া, উদ্‌গ্রীব হইয়া উকি মারেন, এবং ধরিতে গেলেই, নিমেষের মধ্যে কোথায় কিরূপে পলাইয়া যান, আর আমরা হতবুদ্ধি হইয়া গণ্ডোপরি হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক বৃথাই চিন্তা করিতে বসিয়া পড়ি, এই মহান্ সম্পাদক স্বয়ং সেই পরমচতুর পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে হইতে পারে? পাঠক? অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ যে, আমরা সেই জড়জাগতিক ক্ষুদ্র উপমাবিষয় হইতে এখন "অধ্যাত্ম" সংজ্ঞিত সুগভীর অন্তস্তত্ত্বে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু, এই অন্তস্তত্ত্ব সম্প্রতি আমাদের মৌলিকভাবে আলোচ্য নহে; তবে, প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন-বোধে এখানে কেবল উহার অবলম্বনভূত আদি তথ্য—ভগবানের গূঢ়প্রকৃতির কিছু আ-ভাষ দিতে প্রয়াস পাইব। এই যে উপরে বলা হইল যে, বিশ্বমণ্ডলের সমবেত ও একীভূত চৈতন্যময়ী সযুক্তিক আত্মচেষ্টাই পরমেশ্বর, প্রত্যেক যুক্তিপরায়ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন যে, একমাত্র উহাই ভগবানের প্রকৃত যৌক্তিক সংজ্ঞা; আমাদের সংস্কৃত কি বঙ্গ-ভাষায় এই সংজ্ঞাভুক্ত শব্দসজ্ঞের যুক্তার্থ-ব্যঞ্জক কোন এক বিশেষ শব্দ প্রচলিত দেখা যায় না; তবে, আমাদের এই অনির্দ্দিষ্ট, উদ্দিষ্ট শব্দটিকে "সার্ব্বৈক্য" বা "ভবৈকতা" কিংবা সোজাকথায় "সর্ব্বৈকতা" ধরা যাইতে পারে। ইংরেজী ভাষায় কিন্তু এই আদর্শ যৌক্তিক ধর্ম্মমতের একটি সুন্দর প্রাতিপদিক আছে, সেটী "Pantheism." আমাদের ভাষায় অনূদিত করিলে, উহাকে "সর্ব্বেশত্ব" বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই উভয় স্থলেই "জাগ্রৎ" বা "চৈতন্যময়" ইত্যাদিরূপ কোন শব্দকে অধ্যাহার্য্য বা উহ্য ধরিয়া নিতে হইবে। যাহাহউক,—এক্ষণে, পরমেশ্বরের উল্লিখিত যৌক্তিক সংজ্ঞার বিশদ মর্ম্মার্থ এই যে, ঐ সকল গুণসম্বলিত আত্মচেষ্টা করিলেই জগদীশ্বরের প্রকৃতি অনুসরণ করা হয়। "God helps those who hlep themselves" এই সামান্য ইংরেজি প্রবাদটি সর্ব্বপ্রথমে যে মহাত্মার অসামান্যমস্তিক হইতে উদ্ভূত

হয়, তাঁহার মনেও এই যুক্তিতত্ত্ব জাগরূক ছিল; এবং এই গূঢ়তত্ত্বাবলম্বনেই আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে, ভগবানের উপর লৌকিক বৃত্তি আরোপ করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্যের বিভিন্নরূপ সম্পাদনস্থলে অনুরূপভাবে, তাঁহাকে "প্রসন্ন," "সন্তুষ্ট," "বাম," "কুপিত," "রুষ্ট" ইত্যাদি বিধেয় বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কিন্তু, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবগণের কর্ত্তব্যসাধনও যাহা, জগদীশ্বরের "প্রসন্ন" হওয়াও তাহা; আবার, তাহাদের উহা অবহেলা করাও যাহা, তাঁহার "কুপিত" হওয়াও তাহা—যেন তাঁহার প্রকৃতি সৃষ্টিসম্পর্কে একবারে চিরস্থিরীকৃত ও অপরিবর্ত্তনীয়,—সাদাকথায় খাঁটি ও বাঁধাধরা—যেন জীবের অর্দ্ধাচ্ছ কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া তাঁহার সূক্ষ্মস্বভাব অর্দ্ধস্ফুটরূপে দৃষ্টিগোচর হয়!—যেন তিনি আমাদিগকে তাঁহার নিজের সঙ্গে একই অখণ্ডনীতিসূত্রে স্থূল, সূক্ষ্ম বিভিন্নপ্রান্তে বন্ধন করিয়া তাঁহার স্বকীয় সীমার ক্রমোত্তর সূক্ষ্মসংযোগ সূক্ষ্মপ্রণালীতে বুঝাইয়া দিয়াছেন! এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এইরূপে পরমেশ্বরের "সাষ্টৈক্য" সংজ্ঞা সত্য প্রমাণিত হইলে, আমরা যে অনেক অবস্থায় মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষব্যক্তিত্বব্যঞ্জক অসাধারণ বাহ্যিক চৈতন্য উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহার যুক্তি ও সার্থকতা কিরূপে উহাতে প্রতিপাদিত হইবে? এবং কিরূপেই বা জীবের অনুরাগ, ভক্তি প্রভৃতি চৈতন্যবৃত্তির ক্রিয়া এইরূপ ঐশিক প্রকৃতিতে আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে?—এ সকল প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞানুসারে ভগবানকে বিশ্বের এক ধরিলেও, তাঁহাকে যে তাঁহার চৈতন্যপ্রকৃতিটুকু উহ্য বুঝিয়া নিতে হইবে, সেই মূলতত্ত্বই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন! যাহাহউক, তাঁহার বুঝা উচিত যে, এই চৈতন্যই পরমেশ্বরের প্রকৃতির মূলাংশ; কিন্তু, তাঁহার চৈতন্য আমাদের চৈতন্যের মত স্থূল ও প্রত্যক্ষ নয়—উহা অতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ। আমাদের প্রশ্নকর্ত্তাকে আর এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সূক্ষ্মা সূক্ষ্মযুক্তি সহকারে, যথাসম্ভব গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতিক্ষেত্রেই তিনি অবশেষে বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা আমরা ঐরূপ মনুষ্যবৎ ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাসংঘটিত বলিয়া মনে করি, সে সকল সূক্ষ্ম ঘটনাও সেই এক ফলনিরূপিকা নীতিরই সূক্ষ্মন্যায়-পরিচালিত—যাহা কিছু যত সূক্ষ্ম—যত উচ্চ প্রত্যক্ষ চৈতন্যের ক্রিয়াব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হউক না, সকলই কেবল এই নীতিরই এক অটল-গম্ভীর ন্যায়-বিচারের ফল; তখন তিনি বুঝিবেন যে, বিশ্বের এই নীতির বিচারও যাহা, জগদীশ্বরের বিচারও তাহা—এই নীতির প্রকৃতিও যেরূপ, সেই পরম পুরুষের প্রকৃতিও ঠিক তদ্রূপ; এইরূপ, তিনি যুক্তিচিন্তার ভিতর দিয়া, নিজের অজ্ঞাতসারেই, আবার সেই "সাষ্টৈক্য" সংজ্ঞার সত্যতার আভাষ নিজেই বাহির করিয়া ফেলিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মহাতত্ত্বও অনুভব করিতে পারিবেন যে, জগন্মণ্ডলের এই সুমহতী ফলনিরূপিকা নীতি এত সূক্ষ্ম, এত খাঁটি, এত অটল-গম্ভীর বলিয়াই ভগবানও এইরূপ সত্যময়, নির্ব্বিকার অচিন্ত্য, অনন্ত; চিন্তার তরঙ্গ তাঁহাকে জাগ্রত

করিয়া আরও বুঝাইয়া দিবে সেই চতুর স্রষ্টা। এমন প্রস্তরবৎ অটল ও অভাবনীয়রূপ নির্ব্বিকার বলিয়াই আমরা—চৈতন্যবান্ মানব—আমাদের গৌরবের ধন চৈতন্যের গরিমায় অমন প্রস্তরবৎ একটা অচেতন পদার্থের উপর আমাদের মহান্ স্বভাবোচিত সেই "চৈতন্যকে" আরোপ করাটা কোন ক্রমেই যেন আমাদের মনে ধরে না; এ অবস্থায় আমাদের প্রশ্নকর্ত্তা যে সাষ্টৈক্যের সহিত "চৈতন্যময়াদিরূপ" অধ্যাহার যোজনা করিতে ভুলিয়া যাইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? এখানে এটুকুও বলা উচিত যে, আমাদের যে বিবেকান্ধ স্বতন্ত্রতাবোধ—যাহাকে শাস্ত্রীয়ভাষায় "মায়া" বা "মহামায়ার" প্রভাব বলা হইয়াছে—"আমিই বাস্তবিক সম্পূর্ণ স্বাধীন," "আমিই প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা", "আমার মত সংসারে আর কেহই নাই," "এমন মহাশক্তি মানবের উপরেও কি 'ঈশ্বর' সংজ্ঞক অপর কিছু মহত্তর থাকিবার সম্ভাবনা?" ইত্যাদিরূপ যত উন্মত্তধারণা, এ সমস্তই কেবল এই কারণপ্রসূত। এখন বল দেখি, পাঠক, মানবের এই সকল উদ্‌ভ্রান্ত আস্ফালন চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্বভাবতঃই আমাদের মনে সেই চপলমতিত্বের চপল তিরস্কার উদিত হয় কি না—"গণ্ডূষ-জলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে"। যাহাহউক, অতঃপর, আমাদের যে সকল বিশ্বাসকে "কুসংস্কার" বলা যায়,—যাহাতে যুক্তির লেশ বা স্পর্শমাত্র নাই, এই যৌক্তিক প্রসঙ্গে তেমন অন্ধ বিষয়ের উল্লেখই আমরা নিতান্ত দোষাবহ মনে করি। তবে, এক্ষণে, এই সাষ্টৈক্যের উপর জীবের অনুরাগাদি চৈতন্যবৃত্তির আরোপ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, এতৎসমুদয়ের চরমোৎকর্ষ ও সারভূত আমাদের "আত্মসমর্পণ" প্রতিপাদক পাণ্ডবগীতার এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটিতে সাষ্টৈক্যের অনুরূপ ভাব সমানুপাতে খাটাইয়া, তাহা সরল ও বিশদভাবে বুঝান যাইতেছে—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া, হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

ভগবানের সুযৌক্তিক সাষ্টৈক্য সংজ্ঞার অনুধাবনা করিলে, এখানে আমরা উপদেশ পাই—"ধর্ম্ম" আর কিছুই নহে—সেই ফলনিরূপিকা নীতির—ন্যায়বিচার, জীবের—কর্ত্তব্যসাধন; সেইরূপ, অধর্ম্ম—জীবের কর্ত্তব্যসাধনে ঔদাসীন্য—শৈথিল্য ও অবহেলা; তদনুসারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি—তাহার কর্ত্তব্যানুরাগ, অধর্ম্মনিবৃত্তি—কর্ত্তব্যসাধনে শৈথিল্য ও অবহেলার উচ্ছেদ; আর সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ—নিষ্কাম কর্ত্তব্যব্যাপৃতি—কর্ত্তব্যেরই একবারে শ্রেষ্ঠ সারাংশবোধে, ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কামনাশূন্য হইয়া—ফলের বিষয়ে ভ্রমেও একবার চিন্তা না করিয়া,—সর্ব্বতোভাবে কেবল কর্ত্তব্যসাধনেই মত্ত হইয়া থাকা।

এক্ষণে, জগদীশ্বরের এই প্রকৃত স্বভাব হইতে তৎসহ সূক্ষ্মসম্পর্কিত সর্ব্বোচ্চ মৌলিক পার্থিব তথ্য বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের যথার্থতত্ত্ব যথাযথ উদ্ধার করিয়া নিতে হইবে। তাহা হইলে, আমাদের দেখিতে হইবে—এই আলোচ্য

বিষয়ের প্রত্যক্ষ-পার্থিবাংশ ঐশিক প্রকৃতির সহিত কিরূপভাবে সম্পর্কিত, উহার পরোক্ষ-পার্থিবাংশই বা ইহার নিকট কতদূর প্রয়োজনীয় এবং উহার এই উভয়াংশের মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব অধিকতর অর্থাৎ পরমেশ্বরের মহাশক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত "পুরুষকারের" সম্বন্ধ কি? "দৈব" তাঁহার কোনরূপ স্বকীয় শক্তি কি না? এবং পুরুষকার ও দৈবের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রভাবপ্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে?

এই সকল বিষয় বুঝিতে যাইয়া, আমরা সৃষ্টির কারণানুবন্ধে ক্রমে দেখিতে পাই যে, পরমেশ্বরের মানবের প্রতি অনন্ত দয়া ও অনন্ত প্রীতি; তাঁহার সৃষ্টির সার ও সাধের অংশ মানব যাহাতে সর্ব্ব প্রকারে সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারে, শুধু সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি তাহার ভিতর নানাগুণসম্বলিত এই "পুরুষকার" মহাশক্তি নিহিত রাখিয়াছেন; এবং তাহারই বিষয়ভূত বহুধনরত্নসমন্বিত এই বাহ্যজগৎকে এত সুদৃশ্য ও সুভোগ্য করিয়াছেন! সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই, তিনি তাহাকে একাধারে নীচ ও উচ্চ জীবগত নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট বিভিন্ন দ্বিবিধ প্রকৃতি দিয়াছেন!

এখানে আবার, আর একটি কথার একটু স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজনবোধ হইতেছে। মানবমনের পূর্ব্ববর্ণিত সেই দুইটি শ্রেষ্ঠধর্ম্মের দ্বিতীয়টির বশে, এ স্থলে কেহ মনে করিতে পারেন—"এই যে বলা হইল, মানবের পুরুষকার মহাশক্তি, বাহ্যজগতের মনোজ্ঞতা এবং মানবের ভিতর উচ্চ নীচ দ্বিবিধ প্রকৃতির একযোগে সমাবেশ—এ সকল কেবল মানবের প্রতি ভগবানের অনন্ত দয়া ও প্রীতির নিদর্শন; কিন্তু, আমার কাছে এটা ঠিক বিপরীত বোধ হয়—আমি বলি, এগুলি শুধু তাঁহার খল-চাতুরীর পরিচায়ক—মানবকে তুষ্ট পরীক্ষা করিতেই—তাহাকে ফাঁদে ফেলিতেই এ সকলের সৃষ্টি; যেহেতু, স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই প্রকাণ্ড জগৎ এক বিস্তীর্ণ ফাঁদ, ইহার সৌন্দর্য্য এই ফাঁদের মধ্যস্থিত প্রলোভনদ্রব্য, দুর্ভাগ্য মানব—উদ্দিষ্ট শিকার, পুরুষকার—এই শিকারের ঐ প্রলোভন দ্রব্য গ্রহণশক্তি, উক্ত নীচ জীবোচিত প্রকৃতি—উহার অনবহিত অদম্য ভোগলালসা, আর সেই লুক্কায়িত চতুরচূড়ামণি ভগবান্—স্বকার্য্যসিদ্ধির সুযোগাপেক্ষী ব্যাধ!" এইরূপ সম্যক্ বিভিন্ন বা বিপরীত ধারণাদ্বয়ের ইংরেজী দুইটি দিব্য নাম আছে,—ভালটি Optimism, মন্দটি—Pessimism; এখন, আমাদের দেখিতে হইবে যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অভ্রান্ত ও ঠিক। একটি কথায়ই এই ঘোর সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়—যথার্থ হিংসুক শত্রু কখনও আপনার জ্ঞাতসারে তাহার প্রতিশত্রুর কোনরূপ মঙ্গলের সুযোগ খোলা রাখিয়া দেয় না—এরূপ করা মিত্রেরই লক্ষণ বলিতে হইবে; কিন্তু সেই করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহার স্বীয় পরমাত্মায় মানবের জীবাত্মার সংশ্লেষ-সম্ভাবনারূপ মানবের মহামঙ্গলের সুযোগ খোলা রাখিয়াছেন; এ অবস্থায়ও কোন্ প্রকৃতিস্থ, সুবুদ্ধি ব্যক্তি Pessimism ঘোষণা করিবার সাহস করিতে পারে? অতএব, আমরা আমাদের ঐ কাল্পনিক

Pessimist এর বিরুদ্ধে তাহার মত ঔপমিক ভাবেই, গর্ব্বিত প্রতিবাদে সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলসৃষ্টির স্বাভাবিক Optimism ঘোষণা করিতেছি—সেই করুণাময় পরমেশ্বর—আমাদের সকলের স্নেহময় পিতা ; আমরা সকলে—তাঁহার বড় আদরের ধন—ঔরস শিশুসন্তান ; এই সংসার তাঁহার রম্য উপবন; ইহার সৌন্দর্য্য—ঐ উপবনের নয়নমনতৃপ্তিকর ফলপুষ্পদাম ও নবীন শ্যামল উদ্ভিজ্জাদি ; পুরুষকার—তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে উঠিবার আমাদের শারীরিক শক্তি ; ঐ বিভিন্ন বিবিধ প্রকৃতি—ঐ উপবনের সুরম্য পদার্থাবলী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বেচ্ছানুরূপ সম্ভোগ করার ইন্দ্রিয়শক্তি মাত্র। যাহাহউক, এইরূপ প্রকৃত মঙ্গলাধার, সেই বিশ্বপতি তাঁহার এমন অনন্ত প্রীতিভাজন এই মানবের সর্ব্বথা মঙ্গল-বিধান ও কামনা করিয়া, তাহাকে কেবল এই আদেশ করেন যে, সে তাহার পুরুষকারের সাহায্যে যথাসাধ্য কল্যাণলাভ করুক ; সে যথাসম্ভব কর্ত্তব্যকঠোর হইয়া চলিলে, তাহার যাবতীয় কার্য্যফলই সেই ন্যায়সূক্ষ্ম ফলনিরূপিকা নীতির সত্যক্রিয়ার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু, তাহাও যে তাহার একভাবে উপেক্ষা করিবার শক্তি আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এদিকে, ভগবানের স্বকীয় স্বভাব আবার এইরূপ যে, এই সামান্য পার্থিব তত্ত্বাবধানে, শুধু ইচ্ছাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য এবং এইজন্যই তাঁহার এক নাম ইচ্ছাময়। আমাদের "ইচ্ছা" অভিহিত মানসিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন, সেই লৌকিক মুহূর্ত্তমিত কাল মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছা ও কার্য্যানুষ্ঠানাদি যাবতীয় ক্রিয়া ও কর্ম্মই যথাযথ সাধিত হইয়া যায় অর্থাৎ আমাদের—মানবের জড়স্থূল ধারণায়, তাঁহার ইচ্ছাদি ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদি কর্ম্ম যুগপৎ সম্পন্ন হয় বলিয়াই স্বাভাবিক প্রতীতি জন্মে। যাহাহউক, এইজন্যই আমরা আমাদের নিজভাবে এই বুঝি যে, তিনি কেবল গম্ভীর ও অটলভাবে বসিয়া আছেন ; এবং আমাদের বিকটভ্রান্তিব্যঞ্জক বাতুলোচিত কার্য্যকলাপ দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া এমন এক কৌতুকোদ্ভূত আমোদ উপভোগ করেন যে, এ সংসারে তাহার কতক আভাষ কেবল মানবশিশুর স্বাভাবিকবিবেকস্পর্শহীন অসম্বন্ধজিত অযুক্তভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ এইরূপে জড়জগতের সংস্রবে স্বয়ং কোনও বিশেষ কার্য্য না করিলেও, তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার এই সর্ব্বাদিবিধান ঘোষিত করিয়া লইয়াছেন যে, সেই ফলনিরূপিকা নীতি যেরূপ ফলনির্ণয় করিবে, তাঁহার এই সৃষ্টিচালনাব্যাপারে, তাহাই একবারে চরম নির্ণেতব্য ফলরূপে গ্রাহ্য হইবে, যেহেতু, তিনি যথাযোগ্যবোধে অপত্যবৎ প্রীতিস্নেহ করিয়া তাহাকেই তাঁহার অভ্রান্ত আত্মশক্তির লোকপালনার্থ যাবতীয় আবশ্যকাংশ সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব, স্থূলতঃ দেখা যাইতেছে যে, মানবের পুরুষকারশক্তি, সেই সুদৃঢ়সংকল্প অক্লান্তোদ্যম উচ্চতার ভাবে, এই সৃষ্টিতে সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী ; তবে উহা উপস্থিত মতে অসংখ্য প্রকার ব্যাঘাতের আয়ত্ত বটে।

অতঃপর, আমাদের দ্রষ্টব্য—প্রকৃত প্রস্তাবে দৈব কি, এবং উহার সহিত পুরুষকার কিরূপ সম্পর্কিত। আমরা যে আপাতত দৈবকে পরমেশ্বরের একটা শক্তি বলিয়া বুঝি ও ধরি, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু, আধ্যাত্মিকভাবে, এইরূপ গভীর চিন্তা করিলে, দেখিতে পাই যে, প্রকৃত কথা তাহা নহে। এখনই ত বলা হইল যে, পার্থিব ব্যাপারে কেবল "ইচ্ছা" ব্যতীত জগদীশ্বরের নিজের আর কোন কার্য্য নাই—ফলনির্ণয়াদি যাবতীয় কার্য্যের ভারই নীতি প্রভৃতির উপর ন্যস্ত; ইহাতেই বুঝা যায় যে, দৈব কি লৌকিক ক্রিয়াশীল অপর কিছুই তাঁহার স্বকীয় শক্তি হইতে পারে না—এই নানা দোষদূষিত, তুচ্ছ বহির্জগতের সম্পর্কে তাঁহার কোন নিজশক্তিপ্রয়োগেরই কিছুমাত্র যুক্তিযুক্ততা বা প্রয়োজন নাই!—এখানকার সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সকল শক্তিই নিষ্ক্রিয় ও নিদ্রিত, এইরূপেই তাঁহার সৃষ্টির লৌকিক ব্যাপার সমূহ তন্নিযুক্ত ন্যায়াদি জাগতিক শক্তিপুঞ্জেই পরিচালিত ও পরিণমিত হয়। যাহাহউক, এতদবস্থায়, এই যুক্তি ক্রমে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত দৈব কোনরূপ জাগতিক শক্তি হইবে; এক্ষণে, "জাগতিক" বলিলে জড়বস্তুগত ও জীবগত এই উভয়রূপই বুঝাইতে পারে; কিন্তু, এমন মহতী শক্তি কোনক্রমেই জড়শক্তি হইতে পারে না; তবে, উহা আদৌ কোন শক্তি হইলে, জীবশক্তি হইবে; আবার, উহা কোন নীচ জীবশক্তিও হইতে পারে না,—মানবশক্তি হইবে; কিন্তু, উহার প্রভাব যেরূপ অপ্রতিহত বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে উহা মানবের সর্ব্বোচ্চ শক্তি একমাত্র "পুরুষকার"ই হইতে পারে; এখানে ভালরূপ ভাবিয়া দেখিয়া, এই সূক্ষ্মতত্ত্বটুকু বুঝিয়া নিতে হইবে যে, উহা কখনও যথার্থ, অবিকৃত পুরুষকার হইতে পারে না; পুরুষকার চিরকালই পুরুষকার; অতএব—এই যুক্তিতে, দৈবকে পুরুষকার ভিন্ন অন্য কোন শক্তি বলিয়াবুঝা যায়; কিন্তু, এরূপ প্রভাবশালী অপর কোনও শক্তি মানবে নাই। অতএব, আমাদের ধরিতে হইবে যে উহা আদৌ কোনও স্বতন্ত্র শক্তিই নয়। এ অবস্থায়, উহাকে পুরুষকারেরই কোনরূপ গৌণসম্পর্কিত কিছু—উহার অবস্থা বা ফল—বলিতে হইবে। আবার, উহা কিছুতেই পুরুষকারের অবস্থা হইতে পারে না। যেহেতু, আমরা স্পষ্টই দেখি যে, অবস্থামাত্রই প্রস্তুত পদার্থ হইতে অবিচ্ছেদ্য—উহাকে পদার্থ হইতে পৃথক্ ধরিয়া অর্থাৎ উহার অসংশ্লেষে উহার সম্বন্ধে কখনও কোন কল্পনা করা যায় না। দৈব পুরুষকারের অবস্থাবিশেষ হইলে, পুরুষকারের ন্যায় উহাও মানব প্রকৃতি হইতেই নির্ণীত হইতে পারিত। তবে, দেখা যায়, উহা পুরুষকারের ফল। হাঁ, এই কথাই ঠিক। ফলই বটে, কিন্তু অতি দীর্ঘ অতীতকালের—আর্য্যঋষিগণের শাস্ত্রীয় কথায় বলিতে গেলে—পূর্ব্বজন্মের। এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন শ্লোকেই এ তথ্য সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে—

তৎ কর্ম্ম তদ্দৈবমিতিকথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥"

এখানে এ কথা একরূপ অনুল্লেখ্য যে এই

তত্ত্বসারাত্মক শ্লোকে "কর্ম্ম" শব্দে লক্ষণাক্রমে "কর্ম্মফল" বুঝাইতেছে। যাহাহউক, দৈব কিরূপে পুরুষকারের এইরূপ ফল, এক্ষণে তাহাই বুঝান যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের সমবেত ও একীভূত আত্মচেষ্টারূপ এক পরমপবিত্র চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই আমাদের পরমেশ্বর, অর্থাৎ তিনি এখানকার সমস্ত জীবের একবারে পূর্ণ ও চরম উন্নতাবস্থার একমাত্র বিশুদ্ধতম আশ্রয়স্থল। এদিকে আবার জীবের অবস্থা যখন চিরকালই কর্ম্মফলানুসারে পরিবর্ত্তনীয়, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, ঐরূপ পূর্ণ ও চরম অবস্থা না পাওয়া পর্য্যন্ত সে পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন ভাবে কর্ম্মফলানুসারে অবস্থাসম্পর্কে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবেই থাকিবে। আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষায় জীবের এই অবিশুদ্ধ, বন্ধনবিচ্ছিন্নাবস্থাকে "জীবত্বই" ভগবচ্চিন্নত্বকে "শিবত্ব" বা "নির্ব্বাণ" এবং তাহার এই পৌনঃপুনিক নবপরিবর্ত্তনাবলীর এক একটিকে "পুনর্জ্জন্ম" বলা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে জীবত্ব ও শিবত্বের শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ এই—"পাশবদ্ধো * ভবেজ্জীবঃ, পাশচ্ছিন্নো ভবেচ্ছিবঃ।" যাহাহউক, এক্ষণে, এইরূপ কোন এক নির্দ্দিষ্ট আবস্থিক পরিবর্ত্তন বা জন্মের কালমানের মধ্যে জীব সাধারণতঃ তাহার যাবতীয় কর্ম্মফলভোগ শেষ করিতে পারে না; যেহেতু, কর্ম্মের ফলনির্ণয় কর্ম্মের অনেক পরেই হইয়া থাকে, তাহা কারণসহ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রতিজন্মেই জীব কর্ম্মফলের কতক ভোগ করে, আর কতক তাহার অভুক্ত থাকে; তাহার এই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলই পরজন্মে আমাদের নিকট "দৈব" নামে পরিচিত হয়; এবং আমরা উহার এই প্রকৃত তথ্য না জানিয়া, ঐশিকশক্তিবোধে, উহাকে একেবারে এক অখণ্ডনীয় বিধি বলিয়া ধরিয়া থাকি। পাঠক! এখন ভাবিয়া দেখ, উহাকে "দৈব" নামটা দেওয়া ঠিক্ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না। মোটের উপর হইয়াছে বই কি? যদিও উহা পুরুষকারেরই ফলমাত্র, তথাপি, পূর্ব্বজন্মের ভুক্তাবশিষ্ট ফলস্বরূপ এত দীর্ঘকাল যাবৎ ন্যায়সূক্ষ্মফলনিরূপিকা সেই নীতির হস্তে থাকাতে, জীবের প্রত্যেক জীবনব্যাপি আবস্থিক পরিবর্ত্তনে, শুধু কালের প্রভাবে, আমরা উহাকে "দেববৎ" বা পরোক্ষ ঐশিক শক্তি ঐ নীতিবৎ অব্যর্থপ্রভাব মনে করিয়া, উহার নামমাত্রেই একবারে ভক্তিভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ি! কিন্তু মূলে যে উহা আমাদের স্বীয় শক্তি পুরুষকারেরই ফলবিশেষ ভিন্ন আর গুরুতর কিছুই নহে, তাহা ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখি না।

তবে, এক্ষণে, এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমরা এ সংসারে সময়ে সময়ে, এমন অনেক জটিল অবস্থা ও ব্যাপার দেখিতে পাই যে, তাহাতে আমাদের পুরুষকারের উপর বিশ্বাস হারাইয়া, তদপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী অন্য কোন মহাশক্তির উপর উহাদের ঐ জটি-

* অষ্টপাশ, যথা—
ঘৃণাসূয়াভয়লজ্জা জুগুপ্সা ইতি পঞ্চমঃ।
কুলংশীলং তথাজাতি রষ্টপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

লতা আরোপ করিতে সবেগে ঝুঁকিয়া পড়ি, সে সকলের মীমাংসা কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, সেরূপ বিচার্য্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ, জড়সৃষ্টিসম্বন্ধিনী ক্রিয়া বা জড়সাষ্টিক নীতি; দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যিক বা লৌকিক ঘটনা এবং তৃতীয়তঃ দৈব। ইহাদের মধ্যে জড়সাষ্টিক নীতির ব্যাঘাত লৌকিকভাবে একবারে অপরিহার্য্য; যেহেতু উহা পুরুষকার হইতে সম্যক্ পৃথক্ থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে; তবে, মানব যখন পরমার্থসাধনা দ্বারা ঐশিক প্রকৃতি লাভ করিতে পারে, কেবল তখনই উহা তাহার আয়ত্ত হয়; জীবত্ব না যাওয়া পর্য্যন্ত, ঐ নীতির ক্রিয়াফল অবস্থানুসারে ভোগ করিতে হইবেই হইবে—অবশ্য যথাসম্ভব অবহিত হইয়া চলিলে স্থলবিশেষে উহা আদৌ আমাদের উপর না-ও বর্ত্তিতে পারে। তৎপর বাহ্যিক বা লৌকিক ঘটনাই পুরুষকারের সর্ব্বাধিক উপযোগী বিষয়; যথোচিতভাবে কর্ত্তব্যব্যাপৃত থাকিলে, জীবমাত্রই উহা হইতে অতি সহজে যেচ্ছানুরূপ ফললাভ করিতে পারে। উহা আপাততঃ যতই জটিল ও দুর্ব্বোধ বলিয়া, অনুমিত হউক না কেন, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ও পূর্ণমাত্রায় স্বভাব-সত্য যে, পুরুষকারের প্রবল শক্তির নিকট, একদিন না একদিন, বেস সহজ ও সোজা হইয়া আসিয়া, বশ্যতা স্বীকার করিবেই করিবে। উহাদের বাহ্যিক জটিল ও দুর্ব্বোধ প্রকৃতি দেখিয়াই ভীত হইয়া পড়া উচিত নয়; সামান্য একটু সাহস করিয়া, অবস্থামণ্ডল ও ঘটনাসংঘর্ষমূল সেই জটিলতার বহিরাবরণ ঘুচাইয়া দেখিবে যে, উহাদের ব্যাঘাতশক্তি মহাশক্তি পুরুষকারের তুলনায় নিতান্তই ক্ষীণতেজ ও হীনবল। তবে, আমরা এখন চাঞ্চল্য ত্যাগ ও স্থৈর্য্যালবম্বন পূর্ব্বক, শান্তভাবে আমাদের সেই পরমাশ্রয়ভূত,জীবনের মহান্ হিতোপদেষ্টা "বিবেক" ও কার্য্যক্ষেত্রের মহানেত্রী "বুদ্ধি"র শরণ না লইয়া, এই মহাশক্তি পুরুষকারেরও সুযুক্তিসংযত যথাযথ ব্যবহার না করিয়া চলিলে, কিরূপে কি হইতে পারে? অতঃপর, তৃতীয়তঃ পূর্ব্বোক্তরূপ "দৈব" সংজ্ঞিত অসামান্য পদার্থটি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ভুক্তাবশিষ্ট ফলরূপবিষয়টি লৌকিক কালমানের অত্যধিক রূপ সুপ্রশস্ত ব্যবধানহেতু, মানবের দুর্ব্বল চৈতন্যশক্তি তাচ্ছিল্যভরে বিস্মৃতির অগাধজলে ডুবাইয়া দিয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে, যথাকালে ও পূর্ণশক্তিতে, তাহার উপর ক্রিয়া করে; উহার এই ক্রিয়ার কাল ও প্রকৃতি নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য; যেহেতু, আমাদের অধ্যাত্মতত্ত্ববিমূঢ়—পরমার্থে নিদ্রিত—না—মৃত মানবের—কাল-মান ও চৈতন্যস্বরূপ—অধ্যাত্মময় ভগবানের কালমানে কল্পনাতীত এবং তাহাতেই ভগবান্ কখন উহার ক্রিয়ার কোন্ অংশ কিরূপ গঠিত করেন, তাহার ধারণা কিছুতেই মানবে সম্ভবে না; তবে, সাধনাবলে, মানব ভগবৎপ্রকৃতিক হইতে পারিলে, তখন—সেভাবে সে পরমতত্ত্ব তাহার আয়ত্ত হইতে পারে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সেই সুদৃঢ়সংকল্প,অক্লান্তোদ্যম উচ্চচেষ্টার ভাবে, কিছুই পুরুষকার মহাশক্তির অসাধ্য নহে। যাহা-

হউক, এইরূপে দৈবের ক্রিয়ার কাল ও প্রকৃতি সাধারণতঃ আমাদের জ্ঞানাগম্য বলিয়া সেই সাধারণ জড়জাগতিক ভাবে উহা বুঝিতে চিন্তা করিয়া, চিন্তাযন্ত্রের অযথাবিকৃতিসাধন কখনই কর্ত্তব্য নয়; মহাশক্তি পুরুষকারের সাহায্যে, হয় এই স্থূলপ্রণালী পরিহার পূর্ব্বক, যথাশক্তি অবহিত থাকিয়া সেই আদর্শ অধ্যবসায়ের ভাবে কর্ম্মযোগে এই দৈবের ক্রিয়া ব্যবহৃত করিতে চেষ্টা করিবে, আর না হয় পরমার্থ-সাধনাবলে, সমাহিতচিত্তে, জ্ঞানযোগে উহার দুর্দ্দম প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস পাইবে। বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার জটিলতার মত, ইহারও দূরব্যবহিত গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া, কোনরূপ ভয় বা আশঙ্কাবোধ করিবে না; কিন্তু, যাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্য ও কার্য্যাবলী অভ্রান্তভাবে যথাযথ সুসম্পন্ন হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে কেবল তাহাই করিতে থাকিবে। তাহা হইলে, কালে দেখিবে ও বুঝিতে পারিবে যে—যদিও ইহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথাপি,—আমাদের মহাশক্তি—পুরুষকারের এইরূপ যথোচিত অভ্রান্ত ব্যবহারগুণের প্রবল প্রভাবহেতু, দৈবও কখন কখন আমাদের উপর ঈপ্সিতানুরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিকই যে দৈবের ক্রিয়ার পুরুষকার কর্তৃক এইরূপ একভাবে প্রতিহত হওয়ার সম্ভাবনা বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহা আমরা কার্য্যতঃ বুঝি কিরূপে?—পরমার্থসাধনায়। আবার অবশ্য "জানি কিসে" এখানকার এই বালকোচিত চিন্তাহীন প্রশ্নের স্ফুটেঙ্গিতাত্মক উত্তর হইবে—যুক্তিতে নয় ত?

যাহাহউক, এইক্ষণে, এই সকল তত্ত্ব হইতে এইরূপ সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে—পুরুষকার মহাশক্তি আমাদের স্বাভাবিক অমূল্য রত্ন; উহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া চলিলে, আমরা নিরাপদে যথেপ্সিত শান্তিসুখ লাভ ও উপভোগ করিতে সমর্থ হই; ঘটনাদির বাহ্যিক জটিল প্রকৃতি দেখিয়াই, ভীত ও হতাশ হইয়া পড়া কর্ত্তব্য নয়, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সেই মহান্ হিতোপদেষ্টা বিবেক এবং সেই মহানেত্রী বুদ্ধিশক্তির আশ্রয় লইয়া, যথাসম্ভব চিত্তৈকাগ্রতা ও অবধানসহকারে এবং প্রভূত খরতেজ উদ্যমোৎসাহে, আমাদের এই অসংখ্য কর্ত্তব্যের প্রধানতঃ সারভূত ও মূল স্থূল প্রয়োজনীয়গুলিই সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন করিয়া ঠিক্ রাখিবে; কিন্তু আবার, যাবতীয় কর্ম্মফলই যখন উপস্থিত মতে, প্রত্যক্ষ ও সাধারণভাবে অনেকটাই আমাদের অনায়ত্ত, তখন উহার সম্বন্ধে কখনও কোনরূপ চিন্তা ও কামনা না করিয়া, যে মহাশক্তির প্রভাবে ইহজন্মের কর্ম্মফল স্বেচ্ছানুসারে, অতি সহজে অনেকাংশে গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইবে, যাহার সাহায্যে তত্ত্বমূঢ় মানবের সর্ব্বোচ্চ ভক্তিভয়ভাজন সেই দৈব অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলও একবারে না হইলেও সহস্রাধিক বারে—এ জন্মে না হইলেও পরানুপরজন্মে—অবশেষে ব্যাহত ও প্রতিহত হইতে পারে, সেই পুরুষকাররূপ পরমদেবের যথাযথ সেবা ও পূজা করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিবে না—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সেই প্রধান তিন যোগ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অথবা আমাদের দেশে সম্প্রদায়বিশেষে প্রচলিত,—

"জ্ঞান যোগ, ভক্তি এই ত্রিবিধের বশে,
ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধে প্রকাশে॥"

—এই সদা, সারগর্ভ পয়ারোক্ত জ্ঞান-যোগ অর্থাৎ গীতোক্ত "কর্ম্মসন্ন্যাস" ও ভক্তি এই ত্রিবিধ উপায়ে বা পথেই আমাদের এই পরমারাধ্য গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে; আর, সর্ব্বশেষে, যিনি এই বিচিত্র বিশ্বের স্রষ্টকর্ত্তা এবং যিনি অনন্ত স্নেহে ও অনন্ত করুণায়, আমাদিগকে এমন অমূল্য পুরুষকাররত্নের অধিকার প্রদান করিয়া, সযুক্তিক এত গর্ব্বিত করিয়াছেন, জগন্মণ্ডলের সমবেত ও একীভূত সযুক্তিক পরমপূত পুরুষকাররূপী সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলেচ্ছার উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া এবং হৃদয়ে অবিশ্রান্ত তাঁহার মহিমা ও সাধুতা ধ্যান করিয়া, অনুদিন সর্ব্বথা উন্নত ও নির্ম্মল হইতে থাকিবে যেন এই উন্নতি ও নির্ম্মলতা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, অবশেষে তদীয় পূর্ণপ্রকৃতি গম্য ও গত হইলে, আমরা তাঁহাতে মনের আনন্দে আত্মসংশ্লেষ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীমোহিনীমোহন আচার্য্য।

বসন্ত-শেষে।

এবার বসন্ত দিন হ'ল যদি অবসান,
কেন তবে ফুটে ফুল কেন করে পাখী গান?
সায়াহ্নের মৃদু রবি আঁকিয়া রক্তিম ছবি
গগনের চিত্রপটে মিশে গেছে কতক্ষণ,
কেনরে এখনো তবে সন্ধ্যাকোলে সুনীরবে
রঞ্জিত জলদমালা করিতেছে বিচরণ?
যে যায় সে যায় যদি, বহে যায় নিরবধি
উদাসীন কালস্রোত মাতি মনে আপনার,
কেন তবে মনোমাঝে থেকে থেকে সদা বাজে
কত জীব জীবনের অশ্রু মাখা হাহাকার?
সমাধির অন্ধকারে ঘিরে নিল যে জনারে
স্মৃতি ব'সে একাকিনী কেন কাঁদে কাছে তার?
চেতনার পরদেশে পশিলে কি অবশেষে
ক্ষীণতম স্মৃতিরেখা পাঠাইতে পারে আর?
অদৃষ্টের চক্র হ'তে কভু পায় কি নিস্তার?
চারিদিকে সুবিজন বিশ্বব্যাপী অন্ধকার,—
চারিদিকে সীমাহীন মহাশান্তিপারাবার,
তারি মাঝে বুঝি তার মিশে গেছে চেতনার
অরুণ-আলোক-রেখা, সমুচ্ছল কল কথা;
তাই বুঝি এ আঁধারে বাজিছে হৃদয় তারে
কি জানি কিসের তরে কত শোক কত ব্যথা
বুঝি তাই অনিমেষে প্রদীপ্ত তারার দেশে
চাহিয়া ব্যাকুল দৃষ্টি কি যে সদা জাগে মনে—
স্বপন-মগন-মন থাকি ব'সে অনুক্ষণ,
ভাবি তাই অবিরল অশ্রুঝরে দুনয়নে;
কাঁপায়ে মাধবীবন বসন্তের সমীরণ
সন্‌সন্ রবে কেন কে জানে কোথায় যায়!
আজিকে তাহার মাঝে কেনরে সতত বাজে
উদাস বিষাদ-বীণা শ্রান্তক্লান্ত ক্ষীণকায়!
কে জানে কাহার কাছে কার কথা ভেসে যায়?

গেছে যদি যাক্ চলে' চাহি না কুসুমরাশি,—
দুদিনের চপলতা-পরিপূর্ণ-মৃদু হাসি;
থাক্ মোর নীরবতা অশ্রুপূর্ণ মনোব্যথা,
থাক্ মোর চিরশান্তি অমর আশ্বাস ভরা;
ঝটিকার মত্ত রণ সাগরের আস্ফালন
যাক্ চলে', থাক্ মোর চিরসুপ্ত শ্যাম ধরা।
সংসারের যত সব হাসি অশ্রু কলরব
তারি মাঝে যেন সদা বাজে এক গীতধ্বনি,
তাহারি আহ্বান গানে সুদূর অকূল পানে
ভাসি, যেন চলে ধীরে সদা হৃদয়-তরণী!
যে দিকে ফিরাই আঁখি নন্দন-সুষমা মাখি,
সকলি দাঁড়ায় যেন আবেশে জড়িত কায়!
কি জানি কিসের আশে তৃপ্তিহীন কি পিয়াসে
নয়নে জাগিয়া থাকে কোমল বিষাদ ছায়—
স্বপ্নপট আঁকি বসে' উপরে গগন গায়।
প্রকৃতির মুখে আজি কেন হেরি এত শোভা
কেনরে চৌদিকে মোর এত শান্তি, এত প্রভা?
সুদূর যমুনা তীরে আবার বাজিছে ফিরে
সংসার-সীমার শেষে শ্যামের মোহন বাঁশি?
তাই বুঝি লাগে ভালো প্রাণময় এই আলো
শান্তিময় অন্ধকার বর্ণগন্ধ গীতরাশি,
এ বিপুল নীলাকাশ স্নেহে-ভরা এ বাতাস
মোহের অঞ্জন মাখি, সদা মোর চোখে ভাসে
তাই এ শ্যামলা ধরা বিচিত্র মাধুরী ভরা,
তাই ত বিহগী গায় তাই ত কুসুম হাসে;
সারারাত্রি দিনমান শুনি সেই বংশীতান
আকুলি ব্যাকুলি প্রাণ কেবলি ছুটিতে চায়,
কারারুদ্ধ অন্ধকার কত ভাল লাগে আর?
সাধ যায় দূরনভে পাশ ভেঙ্গে উড়ে যায়!—
অজ্ঞাত চরণ তলে হৃদয় লুটাতে চায়।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

ন্যায় দর্শন

মুক্তি ও আত্মা।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোক বড় কষ্টে পতিত হইয়া, চিত্তের আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকে—'পরমেশ' আমায় ত্রাণ কর, আমাকে মুক্তি দাও। এ যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হইতেছে না। এ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে আমায় আর কত কাল রাখিবে?" কিন্তু, হায়, তাহার এরূপ আক্ষেপ ক্ষণিকমাত্র। পক্ষান্তরে, সে শত চেষ্টা করুক না কেন, তাহার অব্যাহতি নাই। সে যেন কোন কারাগারে নিগড়-সংযত। সে কত চেষ্টা করিতেছে, কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কত জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, কতপ্রকারে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতেছে,—শারীরিক বল আর কিং-বক্তব্য। কেন, মানব? তুমিই না বড় বুদ্ধিমান্? তুমিই না বড় কলাকৌশল সম্পন্ন? তবে তোমার আর ভাবনা কিসের? কিন্তু হে মানব! তুমি

যেমন অন্যের মনঃকষ্ট উৎপাদন করিতে ভ্রূক্ষেপ কর না, তুমি যেমন তোমার অনুযায়িবর্গ প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হও না, তুমি যেমন মনে করিতেছ যে, তোমার আজ্ঞাকারিগণের ভোগ-স্পৃহায় তোমার মত অধিকার নাই, তুমি যেমন তাহাদিগকে টেণ্টেলাসের মত আশা প্রদান করিতেছ,—আবার পরক্ষণেই নিরাশ করিতেছ, তুমি যেমন তাহাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে বিরুদ্ধ-আদেশ করিতেছ,—'এহি গচ্ছ, পতোত্তিষ্ঠ, বদ, মৌনং সমাচর ;—তেমন তুমি নিজেও লাঞ্ছিত হইতেছ। তুমি নিজেও বন্ধনদশাগ্রস্ত। দেখ, তুমি যে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া তোমার অনুচর দিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছ, সেই বন্ধন অপেক্ষা তোমার নিজের গাত্রশৃঙ্খল কেমন দৃঢ়তর। তোমার অনুচরবর্গকে তুমি দু'এক দিন মাত্র নিয়ন্ত্রিত রাখিতে পারিবে। কিন্তু, দেখ, তোমার গাত্রশৃঙ্খল দু'এক দিনের নহে, দু'এক বৎসরের নহে, দু'এক যুগের নহে, দু'এক জন্মেরও নহে। উহা অনাদি কাল হইতে গ্রথিত হইয়া আসিতেছে,—উহা তোমার জন্মজন্মান্তরের বাসনা-কাঠিন্য আত্মসাৎ করিয়া কেমন দৃঢ় হইয়াছে। মানব, তুমি জ্ঞানী, তুমি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী। তুমি বিজ্ঞান বলে, "যোগবলের" কার্য্য করিতে সমর্থ—তুমি বিজ্ঞান বলে, সময়ে সময়ে মৃতদেহ পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ। ঋষিগণ তোমাকে একবাক্যে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু, এক্ষণেও তোমার অনেক অভাব লক্ষিত হইতেছে। বুদ্ধির ব্যবসায় করিতে করিতে, হৃদয়ের কথা তুমি একবারে বিস্মৃত হইতেছ। তুমি তোমার মুখাপেক্ষী সমস্ত পরিবারের আশা সংহার করিয়া স্বার্থে পরিনিষ্ঠিত করিয়াছ—সকলে বিভাজ্য সুখ-সম্পদ্‌ তুমি নিজে একাকী ভোগ করিতেছ। তুমি নিজকে বড়ই ভাল বাস। কিন্তু, একবার ভাবিয়া দেখ, তথাপি তুমি সুখী কি না ; দেখিবে,—তুমি আপাততঃ শত সুখে সুখী হইয়াও তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলে তীব্রবৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতেছ—তোমার অসংখ্য সম্ভোগ সামগ্রী সত্ত্বেও সেই কষ্ট দূর হইতেছে না—তোমার কি যেন অভাব থাকিয়াই যাইতেছে। তুমি ধনের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর কি? মনে রাখিও "ধনজন কভু নাহি থাকে চিরদিন।" কবি কালিদাসও বলিয়াছেন "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ।" বিশেষতঃ ধনজন-দ্বারা লোক সুখী হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি, দেখ, যে দেহ তোমার আজন্ম সঙ্গী, তদুপরিও তোমার কর্ত্তৃত্ব নাই। সুন্দর হইতে তোমার মনে বড়ই সাধ,—হইতে পার কি? সে ত দূরের কথা,—তুমি সর্ব্বদা সুস্থ থাকিতে পার কি? দেখ, তোমার স্বাস্থ্য ক্ষণভঙ্গুর। শারীরিক স্বাস্থ্যই বা ভোগ করিলে, জরাযন্ত্রণা কখনই পরিহার করিতে পারিবে না। তোমার নিজের শরীর—তাহার উপরেও তোমার হাত নাই। সুতরাংই বলিয়াছিলাম—তুমি

পরাধীন, শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আর, ভাবিয়া দেখ, কত জন্ম জন্মান্তরেও তোমাকে এরূপ নিয়ন্ত্রিত থাকিতে হইবে।

জগতে প্রত্যেক মনুষ্যই স্বার্থপর, সমস্ত লোকই কেবল নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত। যে আমাদের স্বার্থ কি ? ব্যক্তি যাহাই করুক, সকলই স্বসুখের নিমিত্ত। প্রাতঃকালাবধি চব্বিশ ২৪ ঘণ্টা আমরা স্বসুখেই নিরত। তুমি বলিবে, অনেক কার্য্য আমরা পরহিতের জন্য করিয়া থাকি। কিন্তু, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। তুমি দরিদ্রে দয়া কর—তাহাও তোমার নিজের সুখের নিমিত্ত। অন্যের দুঃখ দেখিয়া তোমারও দুঃখ হয়। তোমার সেই দুঃখ নিবারণের জন্যই, দয়া করা। তুমি দান কর—তথাপি তুমি স্বার্থপর। দান না করিলে, তোমার মনে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট দূর করিবার জন্যই তুমি দান করিয়া থাক। যখন ভিক্ষুকের শত ক্রন্দন ধ্বনিতে তোমার অনুকম্পা ও কষ্ট না হয়, তখন তুমি সেই ভিক্ষুকের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত কর কি ? অন্যের যে কষ্ট তোমাকে স্পর্শ করে, কেবল সেই কষ্টই তুমি দূর করিতে ইচ্ছুক—নতুবা জগতের অশেষ স্থানে অশেষ লোকে দারুণ কষ্ট পাইতেছে,—কই, তৎপ্রতি ত তুমি একবারও দৃক্‌পাত কর না। এইরূপে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তুমি স্বার্থ-অন্বেষণ করিতেছ, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এরূপই করিবে—স্বার্থলিপ্সা হইতে ক্ষান্ত হইবে না। ইহার কারণ কি ? বিবেচনা কর, দেখিবে যে, এসকল স্বার্থ তোমার স্বার্থই নহে। ইহারা তোমার অদৃষ্টাধীন। লোক ইহজীবনে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। তাহার সুখদুঃখও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারী। সুতরাং কর্ম্মপাশচ্ছেদন করাই মানবের স্বার্থ। সেই পাশে জড়িত বলিয়াই মানবের এত কষ্ট। নতুবা মানুষ সচ্চিদানন্দ ;—বিশ্বময়, চিন্ময় ও আনন্দময়। কর্ম্মপাশচ্ছেদন দ্বারাই লোক সেই স্বভাবে উপনীত হয়। কিন্তু, বাহ্যসুখ অনুসন্ধানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। ইহাতে আমাদের দুঃখ একবারে দূর হইবে না। বিজ্ঞানজনিত বাহ্য ঔষধ বাহ্যরোগের উপশম করিতে পারে। কিন্তু, যে দুঃখ আমাদের মজ্জাগত, সেই দুঃখ ধ্বংস করিতে হইলে, আত্মতত্ত্ব দর্শন-সাহায্যের প্রয়োজন ; এবং পদার্থ বিদ্যা দ্বারা কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই এই ক্ষেত্রে উপাদেয় হইবে। যেহেতু, বর্ত্তমান সময়ে পদার্থ বিদ্যাচর্চ্চারই অত্যন্ত প্রাবল্য, তজ্জন্য, সর্ব্বাগ্রে আমরা গৌতম ঋষি প্রবর্ত্তিত ন্যায় শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বকই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

গৌতম বলিয়াছেন, 'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ মিথ্যা জ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্ অপবর্গঃ ১।১।২।'

কিরূপে মোক্ষ হয়। অর্থাৎ 'দুঃখ' 'জন্ম' 'প্রবৃত্তি' 'দোষ' ও 'মিথ্যাজ্ঞান' এই পঞ্চকের পর-পর পদার্থের অভাবে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পদার্থেরও অভাব হয় এবং সর্ব্বশেষে দুঃখাভাবই অপবর্গ বা মোক্ষ।

লক্ষিত হইবে যে, উক্ত পঞ্চকের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানই পরম্পরা সম্বন্ধে দুঃখের আকর। কিন্তু, জন্মই দুঃখের অব্যবহিত কারণ। রক্ত মাংসাদি দ্বারা দুঃখের বাসোপযোগি এক একটি শরীর-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাকেই জন্ম বলে; ঐরূপ শরীর ভিন্ন আমাদের দুঃখ অবস্থিতি করিতে পারে না। 'শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া, কখনই হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের দুঃখের অব্যবহিত কারণই জন্মপরিগ্রহ, এবং জন্মপরিহার ব্যতিরেকে দুঃখ সমূল বিনষ্ট করা যায় না। দুঃখের কারণ জন্ম যতকাল থাকিবে, ততকাল সেই দেহে দুঃখও উৎপন্ন হইতে থাকিবে। সুতরাং জন্মের কারণ (প্রবৃত্তি-সম্ভূত) ধর্ম্মাধর্ম্মকেও নির্ম্মূল করা আবশ্যক —যেন উক্ত প্রবৃত্তি বা চেষ্টাসম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল—সাংসারিক সুখ ও দুঃখ—ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ না করিতে হয়। সেই চেষ্টার মূল আবার রাগ-দ্বেষ। কারণ, যে যে বিষয়ে আমাদের অনুরাগ আছে, সেই সেই বিষয়েই আমরা প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, এবং যে যে বিষয়ে আমাদের বিদ্বেষ আছে, সেই সেই বিষয়ে আমরা বিদ্বেষ অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকি। সুতরাং রাগদ্বেষই পূর্ব্বপূর্ব্ব অনর্থের মূল, রাগদ্বেষেরই অন্যতম নাম দোষ। উহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, আমাদের কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হইবে না, ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হইবে না, জন্ম হইবে না এবং দুঃখও হইবে না। কিন্তু, কোন বস্তুতে আমাদের অনুরাগ বা বিদ্বেষ হয়, কেন?—তাহার কারণ মিথ্যা জ্ঞান। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলেই তদনন্তর পূর্ব্বপূর্ব্ব সমস্ত অনর্থের নিরাকরণ হইবে, এবং আমাদের অপবর্গ বা মোক্ষ হইবে।

আমরা অনেক সময়ে 'তত্ত্বজ্ঞান' 'তত্ত্বজ্ঞান' কথাটি শুনিয়া থাকি। দেখা যাউক 'তত্ত্বজ্ঞান' শব্দের অর্থ কি। 'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ 'তাহার ভাব'—'তাহার স্বভাব'। বলি 'তাহার ভাব' এ 'কাহার ভাব'? তত্ত্বজ্ঞান। 'তত্ত্বজ্ঞান'ই বা 'কাহার ভাবের জ্ঞান'? এ কি বিশ্বস্থিত যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান?—না, তাহা অসম্ভব। বিশ্বস্থিত যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাকুক, পৃথিবীর কয়টি পদার্থের জ্ঞান আমাদের আছে? কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই যে, বাহ্য পদার্থবিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এবং বৈজ্ঞানিকেরাই তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু, বিশ্বটি একটি আমলকী নহে যে, আমরা যদৃচ্ছাক্রমে উহা বিচলিত করিব। বাস্তবিক, সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অল্পমতি মানবের অসাধ্য বলিয়া, ন্যায়সূত্রকার গৌতম ঋষি 'তত্ত্ব' এই তদ্ধিতান্ত শব্দের প্রকৃতি 'তৎ' শব্দদ্বারা 'আত্মা' প্রভৃতি দ্বাদশটি পদার্থ লক্ষ্য করিয়াছেন—উহারাই 'প্রমেয়, এবং উহাদের তত্ত্বজ্ঞানই নৈয়ায়িকের তত্ত্বজ্ঞান। তথাচ গৌতম বলিয়াছেন,—

'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ১।১।৯"

কিন্তু, আমরা সংসারী। উক্ত দ্বাদশটি

মিথ্যাজ্ঞান।

পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের নানাপ্রকার মিথ্যা জ্ঞান আছে। আমরা মনে করি যে, আত্মা সুখ দুঃখাদি ভোগ করে না। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সমষ্টিই আত্মা। যে বহিরিন্দ্রিয় চরিতার্থতা আমাদের বাস্তবিক দুঃখস্বরূপ, তাহাকেই আমরা সুখ মনে করিয়া থাকি; আমরা অনিত্য দেহকে নিত্য জ্ঞান করি। এরূপ, অপরিত্রাণকে পরিত্রাণ, সভয়কে অভয়, নিন্দাকে প্রশংসা, এবং পরিহার্য্যকে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমরা কর্ম্মফল নামে কোনও পদার্থ আছে বলিয়া মনে করি না। আর মনে করি যে, এই সংসার আমাদের রাগদ্বেষজনিত নহে। প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্মবিষয়েও মনে করিয়া থাকি যে, জীবই বল, আর জন্তুই বল, সত্ত্বই বল, আর আত্মাই বল, মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, এমন কোন পদার্থই নাই। সাধারণতঃ, আমরা মনে করিয়া থাকি যে, আমাদের জন্মমৃত্যুর কোন আধ্যাত্মিক কারণ নাই। আমাদের মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর পরে নানা যোনিতে আমাদের জন্ম হইতে পারে, না-ও পারে। এমতঅবস্থায় পুনর্জন্ম হইতে পারে না। আমাদের মৃত্যুর পরে কোথায় বা থাকিবে শরীর, আর কোথায় থাকিবে কর্ম্মফল! তখন দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার অবিচ্ছিন্ন ধারারও উচ্ছেদ হইবে। পুনর্জন্মে, পুনরায় তাহাদের দেহসন্নিবেশ! তাহা কখনই হইতে পারে না—সুতরাং জীবের পুনর্জন্ম নাই। আবার অপবর্গ, কি ভয়ানক! আমাদের সকল কার্য্যের শেষ হইবে! আমরা সুখ সম্পদ্ সকল ভোগ্যে বঞ্চিত হইব! ধর্ম্মও থাকিবে না, পুণ্যও থাকিবে না। পৃথিবীর কত উৎকৃষ্ট সম্ভোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। এমতঅবস্থায়, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই অচৈতন্য মোক্ষে কোন বুদ্ধিমানের রুচি হইবে কি?

এইরূপ জ্ঞানের নামই মিথ্যাজ্ঞান, এবং মিথ্যাজ্ঞান বশতঃই আমাদের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ জন্মে, এবং এরূপ চিত্তবিকার বশতঃই লোক শারীরিক (চৌর্য, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি), মানসিক (পরদ্রোহ, পরদ্রব্যলিপ্সা, নাস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি,), এবং বাচনিক (মিথ্যা ও কর্কশবাক্য প্রভৃতি), নানাপ্রকার পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞান অন্যরূপ। তত্ত্বজ্ঞানে সুখ দুঃখাদি আত্মার বলিয়াই প্রতীত হয়, এবং শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিকে অনাত্মা বলিয়া উপলব্ধি জন্মে। দুঃখ অনিত্য, অপরিত্রাণ ভয়ঙ্কর, জুগুপ্সিত বস্তু হেয়, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান জন্মে। তখন মনে হয়,—কর্ম্মও আছে, কর্ম্মফলও আছে; সংসার রাগ-দ্বেষজনিত; জীব বা আত্মা নামে কোন একটি পদার্থ আছে, যাহা আমাদের দেহত্যাগেও থাকিবে; আমাদের জন্মমৃত্যুর কারণ আছে, কিছুই

অকারণ নহে; আমাদের সংসার অনাদি বটে, কিন্তু অপবর্গ হইলে সংসার অবসান হইবে; আত্মারই প্রবৃত্তি এবং তজ্জন্যই পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। আত্মাই ভোক্তা, সুতরাং মৃত্যুদ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা-ধারার উচ্ছেদ হয় বটে; কিন্তু, পুনর্জন্মে আত্মার সহিত উক্ত ধারার পুনরায় সন্ধি ঘটে,—দেহাদি সমভিব্যাহারে আত্মা পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হয়। সুখদুঃখাদির সমস্ত বিষয় হইতে আত্মার বিচ্ছেদকে অপবর্গ বলে। অপবর্গ হইলে, সাংসারিক অশেষ পাপ ও অশেষ ক্লেশ বিলুপ্ত হয়। এইরূপ, দুঃখের লেশমাত্রশূন্য অপবর্গে বুদ্ধিমদ্ব্যক্তির স্বতঃই রুচি জন্মে। সংসার দুঃখময়, বিষময়। মধুলিপ্ত বিষের ন্যায় সংসারে দুঃখানুসক্ত সুখও বর্জ্জনীয়। সংসার শব্দের অর্থ কেবল ইহজন্ম নহে,—উত্তরোত্তর জন্ম। দেহাদিতে জীবের আত্ম-বোধের নাম মিথ্যা জ্ঞান, তজ্জন্যই তাহার দেহাদির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাসনা, তজ্জন্যই তাহার সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, এবং সেই জন্যই তাহার দুঃখ। এই পাঁচটি ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবৃত্তির নাম সংসার। সুতরাং কেবল এ জন্মই সংসার নহে, ইহা স্মরণ করিয়া আমাদের শরীরদ্বারা দান, আর্ত্তত্রাণাদি; বাক্যদ্বারা সত্য হিত প্রিয় বেদ পাঠাদি; এবং মনোদ্বারা দয়া, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি, অনুশীলন করা উচিত, উহারাই আমাদের ধর্ম্ম।

আমরা মনে করিয়া থাকি যে, পুনর্জন্ম আমাদের বড়ই সাধের বস্তু। তাই কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে,

দুঃখ।

আমরা প্রায়ই পরজন্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি—এ জীবনে আশীর্ব্বাদ্যের যে সুখ দুষ্প্রাপ্য, আশীর্ব্বাদ্য সেই সুখ পরলোকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, আমরা এরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি। কিন্তু, কি ধনী, কি মানী—জন্ম সকলের পক্ষেই দুঃখদায়ক। সকল জীবেরই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কারণ, প্রতিকূল বেদনীয়কেই দুঃখ বলে—যে কোন প্রকারের বাধা, পীড়া বা তাপকেই গৌতম ঋষি দুঃখনামে অভিহিত করিয়াছেন।

দুঃখের অভাবকেই মুক্তি বলে। কিন্তু উহা দ্বিবিধ। জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণ-মুক্তি।

মুক্তি।

দেহত্যাগে পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়ার নাম নির্ব্বাণ-মুক্তি। পরন্তু, তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তরই জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, নিরন্তর অনুশীলনে তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান অপহৃত হইয়াছে বটে। কিন্তু, যে যে কর্ম্মফলভোগের জন্য তাঁহাকে বর্ত্তমান জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, সেই সেই কর্ম্মফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে এবং তদনন্তর তাহার নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইবে। সময়ে সময়ে জ্ঞানীদেরও রাগদ্বেষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা উৎকট নহে। বিশেষতঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মও সর্ব্বত্র রাগদ্বেষমূলক নহে। অনিচ্ছা বশতঃ গঙ্গাস্নানেও পাপক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং, কেহ কেহ উপর্যুক্ত দোষ শব্দদ্বারা রাগদ্বেষ

গ্রহণ না করিয়া মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনা গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করেন। তাঁহাদের মতে, মিথ্যাজ্ঞানের নাশে বা তত্ত্বজ্ঞান-জনিত উৎকৃষ্ট বাসনার উৎপত্তিতেই সেই মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনার নাশ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ও বিষয়-বিভাগ।

পূর্ব্বে আত্মা, শরীর প্রভৃতি যে দ্বাদশ প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উক্ত হইয়াছে, উহাদের তত্ত্বজ্ঞানই ন্যায় দর্শনের মতে তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং ব্যাকরণে যেমন গুণ, বৃদ্ধি, নদী, ঘি প্রভৃতির পারিভাষিক অর্থ আছে ন্যায়দর্শনেও তত্ত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থে কেবল উক্ত দ্বাদশটি তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ই মেয় বা জ্ঞানের বিষয় বটে; কিন্তু উহারা সকলেই প্রকৃষ্ট মেয় নহে। যে যে পদার্থ আমাদের মিথ্যা জ্ঞানের বিষয় হইয়া আমাদের সংসারের কারণ হয়, অথচ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়া মোক্ষের কারণ হয়, কেবল তাহারাই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয়, প্রকৃষ্ট মেয় বা প্রমেয়। উক্ত দ্বাদশটি পদার্থের মধ্যে, ছয়টি কারণ তত্ত্ব ও ছয়টি কার্য্য তত্ত্ব। কারণ-তত্ত্ব যথা,—আত্মতত্ত্ব, শরীর তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব (রূপরসাদি) অর্থতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব। কার্য্যতত্ত্ব ষট্‌ক এই—প্রবৃত্তিতত্ত্ব, দোষতত্ত্ব, (পুনর্জ্জন্ম বা) প্রেত্যভাবতত্ত্ব, (সুখ বা) ফলতত্ত্ব, দুঃখতত্ত্ব ও (মোক্ষ বা) অপবর্গতত্ত্ব। কিন্তু, উক্ত দ্বাদশটির মধ্যে 'আত্মা'ই প্রধান বলিয়া, আমরা সর্ব্বাগ্রে 'আত্মা'র বিষয়ে আলোচনা করিব।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা, তজ্জন্যৈব ক্রিয়া ভবেৎ।

আত্মা।

আত্মা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, সকলেরই মানসপ্রত্যক্ষ। আমরা সকলেই বলিয়া থাকি—আমি সুখী আমি দুঃখী, আমার বাড়ী, আমার ঘর; আমার জন, আমার ধন। আমি দেখি আমি শুনি। টক আমের প্রতি আমার বড়ই বিদ্বেষ,কিন্তু তদ্দর্শনে আমার রসনা লালা ক্ষরণ করে, ইত্যাদি। এ সমুদয় বাক্যে 'আমি' ও 'আমার' শব্দের লক্ষ্যই আত্মা। আত্মার ইতর-ব্যবচ্ছেদক (distinguishing characteristic) ধর্ম্ম ছয়টি—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান (১।১।১০) পূর্ব্বে, যে বস্তু দর্শন দ্বারা আমি সুখী হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই বস্তুর পুনর্দর্শনে যদ্‌হেতু তাহা গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, তাহাই আত্মা। আমার শত্রুকে দেখিলে, যদ্‌হেতু তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষভাব উদয় হয়, তাহাই আত্মা। যাহার প্রভাবে, আমি বিদ্বেষের বস্তু পরিহার করিতে চেষ্টা করি, তাহাই আত্মা। যাহার প্রভাবে, সুখকর কার্য্যে আমার সুখ এবং দুঃখকর কার্য্যে আমার দুঃখ হয়, তাহাই আত্মা। এবং কোনও বস্তু দেখিলে, যাহার প্রভাবে, আমি পূর্ব্বে 'এটা কি' এইরূপ পরামর্শ করিয়া, পশ্চাৎ উহা যথার্থ বুঝিতে পারি, তাহাই আমার আত্মা। যাহার প্রভাবে,আমি একাকী হইয়াও,ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন

বস্তু উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই আমার আত্মা। আমার অনেকার্থদর্শী এক-আত্মা আছে বলিয়াই, একই আমার, বুভুৎসা, বিমর্শ ও জ্ঞান এই ভাব ত্রয়ের আবেশ হইয়া থাকে। যাঁহারা অনেকার্থদর্শী স্থায়ী এক আত্মা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে একই বিষয়ে, একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হওয়া উচিত। বস্তুতঃ, তাহা হয় না। আমার দর্শন প্রত্যভিজ্ঞান বা স্মৃতি মৎকর্ত্তৃক স্বয়ং দৃষ্ট পদার্থেরই সম্ভবে। কোনও পদার্থ দেখিবে যজ্ঞদত্ত, আর তাহা স্মরণ করিবে দেবদত্ত, তাহা কখনই হইতে পারে না। সুতরাং 'উপপন্নম্ অন্যেব আত্মেতি'।

ইন্দ্রিয়ই আত্মা নহে,— পূর্ব্বপক্ষ

কিন্তু, ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করিলে, চলে না কি? আত্মার উপযুক্ত লক্ষণগুলি ইন্দ্রিয়েরই হইতে পারে নাকি? লোকেও ত বলে "চক্ষুর্দ্বারা দেখে, মনোদ্বারা জানে, ও বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে, এবং দেহ দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করে।" কর্ত্তাও কারণ এক হইতে পারে না কি? আপনারাও ত ইন্দ্রিয় গুলিকে সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, বরং জ্ঞানের করণ বলিয়া মানেন, মানেন ত? উহারাই চৈতন্যবিশিষ্ট,— আত্মা— এরূপ বলিনা কেন? অনর্থক একটি অধিক ধর্ম্মী আত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনারাত 'আত্মা' শব্দের নানা অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা বরং 'আত্মা' শব্দে ইন্দ্রিয়ই বুঝিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? ইন্দ্রিয় ভৌতিক হইলে সাংকর্য্য (cross division) হইত,—আমরা ত ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক * বলিয়া স্বীকার করি করি না।

উত্তর

তাহা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও আত্মা এক পদার্থ নহে। একই কাষ্ঠখণ্ড— যাহা আমি পূর্ব্বে চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া ছিলাম, তাহা এক্ষণে আমি ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিলাম,—এবং যাহা আমি পূর্ব্বে ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে আমি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেছি। এই দুইটি প্রত্যয় (Assimilation) কেবল এক বিষয়ক নহে;—উহরা এক কর্ত্তৃকও বটে,—উহাদের গ্রহণকর্ত্তাও একমাত্র আমি। যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি! চাক্ষুষ জ্ঞান ও যাহার হইল, স্পার্শনজ্ঞানও তাহারই হইল। সেই ধর্ম্মী এই উভয় ইন্দ্রিয় হইতেই পৃথক্। সেই ধর্ম্মী ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত। এবং ঐ দুইটি ইন্দ্রিয় ঐ দুইটি জ্ঞানের নিমিত্ত হইলেও, উহাদের গ্রহীতা একমাত্র আত্মা।

* নৈয়ায়িক মতে ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি হইতে পারে না, হইলে সাংকর্য্য দোষ হয়। যেমন পৃথিবীত্ব শূন্য জিহ্বায় ইন্দ্রিয়ত্ব আছে; ইন্দ্রিয়ত্বশূন্য ঘটে পৃথিবীত্ব আছে; আবার পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ত্ব ও পৃথিবীত্ব উভয়ই আছে।

যদি আপত্তি হয় যে, ঐ দুইটি জ্ঞান ঐ দুইটি ইন্দ্রিয়ের সংঘাত কর্ত্তৃক হইয়াছে,—যেমন, একজন অন্ধ ও তৎস্কন্ধারূঢ় একজন পঙ্গু, ক্রমে চলন ও দর্শন ক্রিয়া দ্বারা উভয়ে একই গমন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাও অযৌক্তিক—অন্ধ ও পঙ্গু উভয়েই সচেতন, একের কার্য্য অন্যে বুঝিতে পারে। কিন্তু এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে না। চক্ষুঃ কখনই মিষ্টান্নের রস আস্বাদন করিতে পারে না। সেই সৌভাগ্য রসনারই। এইরূপ, কোনও ইন্দ্রিয়ই নিজ গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় (object of perception) গ্রহণ করিতে পারে না। জ্ঞান গ্রহণ ব্যাপারে অচেতন কোন ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত যে কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাও অসম্ভব। আর, আত্মা ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত না হইলে, মনুষ্য উন্মত্তই হইত না—উন্মত্তের ইন্দ্রিয় গ্রাম সতেজ থাকিলেও, তন্নিমিত্ত তাহার জ্ঞান হয় না।

যদি কেহ বলেন যে, (চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি) বিষয় একবারে ব্যবস্থিত (fixed) আছে,—চক্ষু ভিন্ন দর্শন হয় না, কর্ণ ভিন্ন শ্রবণ হয় না, নাসিকা ভিন্ন গন্ধ আঘ্রাণ হয় না, সুতরাং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই চৈতন্যবিশিষ্ট এবং চক্ষুঃই দর্শন করে, কর্ণই শ্রবণ করে। তদুত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ নাসিকার ঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদন, ত্বকের স্পর্শ, এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় (province) ব্যবস্থিত আছে বলিয়াই, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানের তুলনাকারী ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত এক আত্মা অবশ্য স্বীকার্য্য। আর যদি স্বীকার করা হয় যে, ইন্দ্রিয় একটি মাত্র, এবং তাহার গ্রাহ্য বিষয়ও ব্যবস্থিত নহে, তবে আমরা বলিব যে, ঐ ইন্দ্রিয়ই আমাদের চেতন আত্মা। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয় বহু প্রকার, তাহাদের বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু আত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগ্রাহী। বিশেষতঃ বিপণিতে মোদকের রূপ দর্শনেই দর্শক আস্বাদিত পূর্ব্ব মোদকের রস ও গন্ধ অনুমান করিয়া থাকেন। এইরূপ এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর এক এক গুণ গ্রহণ করিয়া, যে এক কর্ত্তা বস্তুর সমস্ত বিষয়ক গুণ গ্রহণ করেন, তিনিই আত্মা। আমরা কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু কর্ণ কখনই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। কর্ণদ্বারা ক্রমে ক্রমে শ্রুত শব্দ গুলি হইতে যাহার প্রভাবে আমরা বর্ণ, পদ ও বাক্যের ভাব বুঝিতে পারি, তিনিই আত্মা।

এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং কোনও ইন্দ্রিয়ই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারে না বটে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়েই মনের অবারিত গতি। সকল ইন্দ্রিয়েই মনই আত্মা নহে,— ইহার প্রসর আছে।

পূর্ব্ব পক্ষ। ইহা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে বিদ্যমান হইয়াই প্রত্যেক ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান জন্মায়, মন ভিন্ন কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয়গ্রহণ সিদ্ধ হয় না। এবং যে যে হেতু দ্বারা পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় হইতে আত্মার

পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সেই হেতু যখন মনেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য, তখন মন হইতে পৃথক্ একটি আত্মা স্বীকার না করিয়া মনকেই আত্মা বলা যাইতে পারে। মনের অতিরিক্ত পৃথক্ একধর্ম্মী আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন কি?

উত্তর পক্ষ।

আমরা বলি, প্রয়োজন আছে। মন অণু। মন আছে বলিয়াই আমাদের বহু ইন্দ্রিয় দ্বারা, সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত থাকা সত্ত্বেও এককালে, বহু ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ঘৃত-ভৃষ্ট স্তনিত সুদীর্ঘ একখানি পিষ্টক ভক্ষণের সময়ে আমাদের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই বিষয় বর্ত্তমান থাকে, ইন্দ্রিয় সকলও সুপ্রসর (open) থাকে। কিন্তু, একটু বিবেচনা করিলে, দেখা যাইবে যে, একমুহূর্ত্তে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা যায় না। তাহার কারণ এই যে, মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ান্তর হইতে উহা বিযুক্ত থাকে, এবং তখন মনোবিযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান না হইয়া মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞান জন্মে। কোনও বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতে হইলে, তদুচিত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক কর্ণের সহিত মনঃসংযোগ থাকে না বলিয়াই, সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্ট ছাত্রও সময়ে সময়ে অধ্যাপকের কথা শুনিতে পায় না। এইরূপ, পাঠ অভ্যাস করিবার সময়ে, মনোযোগ না হইলে, পাঠ আয়ত্ত হইতে পারে না। মন কিরূপ দ্রুতবেগে চলিতে পারে, তাহা অকস্মাৎ বজ্রধ্বনি শুনিয়া চমৎকারের বিষয় চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়। আকস্মিক শব্দ শুনিবার জন্য, কর্ণে মনোযোগ থাকে না বলিয়াই, এ চমৎকার। তথাপি, ঐ উৎকট ধ্বনিতে মন তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়। এ বিষয় মনের লক্ষণ প্রস্তাবে বিবৃত হইবে। যাহা হউক, মনের জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলেও, জ্ঞানের অযৌগপদ্য সাধনের নিমিত্ত, কোনও করণান্তর স্বীকারের প্রয়োজন হইবে। জ্ঞানের কর্ত্তা একটি পদার্থ, এবং ইন্দ্রিয়রূপ করণ ভিন্ন পদার্থ। এই দুইটি পদার্থই স্বীকার্য্য। মনের নাম আত্মা হউক, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞাতৃ-রূপ আর একটি পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ, দুই জ্ঞান এক সময়ে হইতে পারে না বলিয়া, মনকে অণু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অপিচ, আমরা মহৎ বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি বলিয়া আত্মাকেও মহৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সমষ্টিই আত্মা নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সমষ্টিকেই প্রাণী বা আত্মা বলে। তুমি গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, অমুক হৃষ্ট পুষ্ট, এইরূপ জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদের শরীরই আত্মা, তদ্ব্যতীত আত্মা নাই।

কিন্তু, তাহা হইতে পারে না। আমার শরীরকে আমার আত্মা বলিয়া স্বী-

কার করিলে, আমার দেহত্যাগেই আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইবে। আমি প্রাণি-হিংসা করিলেও তজ্জনিত পাপ আমার দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইবে ; শারীরিক মানসিক ও বাচনিক—আমি যত প্রকারের যতদূর বিগর্হিত কার্য্য করি না কেন, মৃত্যুই আমার সকল পাপের প্রক্ষালন করিবে। আমি যদি কৃতঘ্ন হইয়া থাকি, আমি যদি প্রতারণা পূর্ব্বক পরস্ব আত্মসাৎ করিয়া থাকি—মৃত্যুই আমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিবে, মৃত্যুই সমস্ত কলুষের অবসান করিবে। মৃত্যুর পরে আমার শরীরও থাকিবেনা, পাপও থাকিবে না—এরূপ অদূরব্যাপক নিয়ম কথনই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; সুতরাং দুষ্টের শাস্তি ও শিষ্টের প্রশস্তির নিমিত্ত পরলোক অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য—নতুবা ঘোর উচ্ছৃ-ঙ্খলতার রাজ্য প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহা হইলে রাজকীয় ও সামাজিক শাস্ত্র-জাল হইতে, কূটতর্কদ্বারা যাহারা ইহলোকে রাজদণ্ড ও সমাজ-দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেছে—তাহারাই পরম সাধু বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু, পরমেশ্বরের শাসন নিশ্চিতই বড় কঠোর। মনুষ্যসমাজ পাপিগণকে ক্ষমা করিলেও, কর্ম্মফলাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ইহ জীবনে সঞ্চিত পাপপুণ্যের ফল পরজীবনে তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং পরকাল অবশ্য স্বীকার্য্য। আবার পরকাল স্বীকার করিলে, ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালব্যাপী আত্মাও স্বীকার্য্য। এই আত্মাই আমাদের ভৌতিক দেহক্ষয়ে নিত্য থাকিবে।

যদি আপত্তি হয় যে, আত্মা নিত্য, সুতরাং উহা নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত—উহা জীবকৃত পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে পারে না। এবং দেহাত্মবাদ স্বীকার করিলে, দেহ দাহে যেমন আমাদের পাতক আশ্রয় অভাবেই বিনষ্ট হয়, আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিলেও, সেইরূপ দেহদাহে নিরাশ্রয় পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এমত অবস্থায়, একটি স্বতন্ত্র আত্মা বলিলেই চলিতে পারে।

তদুত্তরে বলিব যে, আত্মা নিত্য হইলেও, প্রযত্ন ইহার একটি লক্ষণ (বা ইতর ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্ম)। ইহা আত্মার লক্ষণ প্রস্তাবেই উক্ত হইয়াছে। আমাদের চেষ্টার আশ্রয় আত্মাই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, শরীর কেবল তাহারই কৃতির আশ্রয়। সুতরাং, কৃতির আশ্রয়ীভূত শরীরের বিনাশেও, আত্মা কর্ম্মফলের সহিত বিদ্যমান থাকে। [আমাদের কোনও কার্য্য করিবার ইচ্ছা (desire) ও ইচ্ছা-পূরণানুকূল চেষ্টা (movement) এই দু'এর মধ্যবর্ত্তী চেষ্টানুকূল শারীরিক ব্যাপার (will, volition, museular exoitement) কে কৃতি বলে।] সুতরাং 'দেহেন্দ্রিয় মনোব্যতিরিক্তোঽন্যোব আত্মা' ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
রাজসাহী কলেজ।

শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে আমি শ্রীকৃষ্ণের স্থূল দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নয়টি প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। উপস্থিত দ্বিতীয় প্রস্তাবে অবশিষ্ট প্রমাণগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

দশম প্রমাণ।—দ্বারিকা, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি কএকটি স্থান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলার জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রজধাম, কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনা-রাজ্য এবং তদ্ব্যতীত আরও দুই একটি স্থান ভারতীয় ইতিহাসে কৃষ্ণের কার্য্য কলাপাদির জন্য প্রখ্যাত। বহুক্রোশ ব্যাপিয়া ব্রজধাম এবং হস্তিনা রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইতিহাসোল্লিখিত এই সমুদয় স্থান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান, লীলাস্থান, লালন পালনের গ্রাম ও গৃহ, কুরুক্ষেত্রের কীর্ত্তিমালা, যমুনানদী, মধুবন, তমালবন, কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ প্রভৃতি, গোবর্দ্ধন গিরি, কালিন্দি, দ্বারিকার রাজপাট, প্রভাস, রাসলীলার স্থল ইত্যাদি এখনও বর্ত্তমান আছে। নন্দঘোষের গৃহ, নন্দগ্রাম, বসুদেবের গৃহ, আয়াণপুর, প্রভৃতি কত গণ্য, নিদর্শন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের রাজ্য গুজরাটে বর্ত্তমান আছে। বোম্বে বরোদা-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উমরেৎ নামক ষ্টেশন হইতে ডাকোর নামক স্থানে বলরামের রাজ্যের ও রাজত্বের চিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন ইতিহাস বর্ণিত রাজ্য, রাজত্ব, আত্মীয়, কুটুম্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় অদ্যাপি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখা যাইতেছে তখন কৃষ্ণকে আর কবিকল্পনা বলিবার অধিকার কোথায়?

একাদশ—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ স্থলে স্বীয় ঐশী শক্তি (ঈশ্বরত্ব) সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন কহিয়াছিলেন।—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।
যচ্চাবহাসার্থমসৎ কৃতোসি
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু
একোথবাপ্য চ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।

এই শ্লোকে বা স্তুতি বচনে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন "সখা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ভোজন, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন, উপহাস প্রভৃতির সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ "অমিত বীর্য্য" কহিয়াছেন। এই সকল কি কল্পিতমূর্ত্তির

কার্য্য হইতে পারে? বিশ্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নরমূর্ত্তি দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন সুস্পষ্টভাবে কহিলেন—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

এস্থলে কৃষ্ণের "মানুষ রূপের" (নরদেহের) অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়ও ইহা কহিয়াছেন। সঞ্জয় কহিলেন "হে রাজন! কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইলে পর, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার সৌম্য নরদেহ দেখাইলেন।" এ স্থলে অর্জ্জুনের "অজানতা মহিমানং তবেদং" উক্তিতে মনে হইতেছে, অনেক পাঠকও এক্ষণে বলিয়া উঠিবেন "আমরাও শ্রীকৃষ্ণকে জানি নাই বা জানিতে পারি নাই, ভ্রান্ত লোকের ভ্রমাত্মিকা কথায় ভুলিয়া কৃষ্ণকে কবিকল্পনা ভাবিয়াছিলাম।"

দ্বাদশ—যুগযুগান্তর হইতে "রাধাকৃষ্ণ", "হরেকৃষ্ণ," "রামকৃষ্ণ" প্রভৃতি মধুরবাণী শ্রুতিগোচর হইতেছে। কৃষ্ণ নাম একা অসংখ্য, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুভক্তেরা রাম, হরি, রাধিকা প্রভৃতির সহিত সুমধুর কৃষ্ণনামটিকে সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীদাম, সুদাম, যশোদা, অর্জ্জুন, গোপীজন, নন্দঘোষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন মধুর নাম বা উপাধি দিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ভক্তেরা কল্পিতমূর্ত্তিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন, অনাদি, অব্যয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের নাম বা উপাধির সহিত কখন সংযোজিত করে নাই। কৃষ্ণ যদি কবিকল্পনা হইত, তাহা হইলে, হরেকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণ নাম শুনিতাম না। আর এক কথা, শ্রীমতি রাধিকা কি একটা কল্পিতমূর্ত্তির প্রেমে আবদ্ধা হইয়াছিলেন?

ত্রয়োদশ।—আমি ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি বৈদিক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণপূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে; অসংখ্য নরনারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। তৎকালে ভারতের প্রধান প্রধান বীর, যোগী, যোদ্ধা, নরপতি, পণ্ডিত, বিবেকী বিচারক প্রভৃতি কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। এখন ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক রাজা, রাণী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক পুরুষ, সন্ন্যাসী, যোগী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও ভজক। শ্রীকৃষ্ণের এত প্রভাব ছিল যে, তিনি পার্থিব লীলা সম্বরণ করিলে গভীর অন্ধকার আসিয়া ধর্ম্মজগৎকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকার যেমন অধিকতর অন্ধকারময় হয়, ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে চিন্তাশীলতা, সে স্বাধীনতা, সে উদারতা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল; দর্শনের সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধতা, সাত্বিকতার হীনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তের কেন্দ্রস্বরূপ, তাঁহার চরিত্র ও নীতিবলে ভারত উন্নত; শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পূর্ণ আদর্শ। তাঁহার জীবনে একাধারে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কল্পিতমূর্ত্তির কি এই প্রভাব হইতে পারে? যুগ যুগান্তর হইতে কল্পনার কি কেহ ভক্ত, উপাসক, প্রশংসক, গায়ক, কীর্ত্তনক এবং পূজাকারী হয়?

চতুর্দ্দশ।—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবৃন্দ মহাভারত লিখিয়া গিয়াছেন। তোমরা কি বিবেচনা কর, ইঁহারা ক্ষিপ্ত, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা নির্ব্বোধ ছিলেন? যদি তাহা বিবেচনা কর বা করিয়া থাক, তাহাহইলে তোমার সহিত আমার কথোপকথন বা বাদানুবাদের আবশ্যকতা নাই, এবং তোমাদের জন্যও এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণ কবিকল্পনা হয় তাহাহইলে সমস্ত মহাভারত কবিকল্পনা হইয়া পড়ে। ভাগবতের ন্যায় মহাভারতেও কৃষ্ণঃ কার্য্যাবলী পরিষ্কার রূপে এবং সূক্ষ্মভাবে লিখিত আছে। প্রহ্লাদ যাঁহার উপাসক তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ। ধ্রুব যাঁহার ধ্যানে মহাযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ ও অমর, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শুক, সনাতন, নারদ যাঁহার মধুর গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। এ সমুদয়ই কল্পনা না কি?

পঞ্চদশ প্রমাণ।—শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মরণ বা অন্তর্দ্ধান বর্ণিত আছে। বৃক্ষ, ব্যাধ, তীর, স্থান, সময়, কারণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। কল্পনার কি মৃত্যু আছে? এ সমুদয়ও কি কবিকল্পনা? তাহাহইলে ত পৃথিবীর সমুদয় শাস্ত্র এবং সমুদয় ইতিহাস কল্পনাতেই পরিণত হইয়া যায়! কৃষ্ণ যদি কবিকল্পনা বলিয়াই তোমাদের ধারণা হয়, বা ধারণা থাকে, তাহাহইলে কৃষ্ণচরিত্র লইয়া এত উপহাসের উৎপত্তি হয় কেন? তাহাহইলে ঐ চরিত্রকেও কেন কল্পিত চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস না কর? তাহা হইলে "কৃষ্ণের চরিত্র কলঙ্কিত ছিল" এ কথা কহিবার তোমার অধিকার কোথায়?

ষোড়শ প্রমাণ।—অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,—

১। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

২। অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

৩। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥

৪। সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামিতে হিতং।

৫। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণা ইব॥

৬। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি॥

৭। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

৮। অব্যক্তং ব্যক্তি মাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মত্তুমম্॥
মূঢ়োয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥

৯। য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিংময়ি পরাং কৃত্বামামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভুবি॥

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিতেছেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদ মিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥

এই সমুদয় শ্লোক শ্রীমৎভগবৎগীতা হইতে উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে ইহার অর্থ শ্রবণ কর। প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকে কৃষ্ণ কহিতেছেন' হে অর্জ্জুন তুমি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) একমাত্র শরণাগত হও আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় বা চিন্তা করিও না।" দ্বিতীয়োদ্ধৃত শ্লোকে কহিতেছেন" আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সমুদয় আদি, মধ্য ও অন্ত। আমাকেই সকলে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে।" তৃতীয় শ্লোকে কহিতেছেন "হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি তন্মন হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, সর্ব্বদা আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকে তুমি নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার প্রিয়পাত্র, আমি প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইহা কহিতেছি, ইহা অসত্য হইতে পারে না।"

পাঠকদিগকে আমি এখন জিজ্ঞাসা করি, বিশেষ বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিয়া, মানবের সামান্য বা সাধারণ বুদ্ধি (Common sense) অনুসারে, ইহা কি সহজেই বোধ হয় না যে, এই উক্তি বা এবম্প্রকার উক্তি কখন কল্পিত মূর্ত্তির হইতে পারে না? তাহার পরে দেখ; তিনি চতুর্থ শ্লোকে কহিতেছেন "হে অর্জ্জুন! তোমার কল্যাণের জন্য আমি যে জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।" পরবর্ত্তী শ্লোকে কহিতেছেন "আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই (কারণ আমি ঈশ্বর)। মণিসমূহ সূত্রে যেমন গাঁথা থাকে বলিয়া "মালা" হয়, সমগ্র বিশ্ব আমাতে স্থিত বা আশ্রিত বলিয়া ভবধাম তিষ্ঠিতেছে।" অন্যান্য শ্লোকের অর্থের আর প্রয়োজন দেখি না। অষ্টম শ্লোকে তিনি কহিয়াছেন "মূঢ়েরা আমাকে জানে না"; তৃতীয় শ্লোকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন "আমি প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইহা কহিতেছি, ইহা মিথ্যা হইতে পারে না।" এই সকল কথা যদি কল্পিত মূর্ত্তির কথা হয়, তাহা হইলে যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে তাহাদিগের সহিত রজক গৃহস্থিত লম্বকর্ণের বিশেষ প্রভেদ দেখি না। ইহার পরে গীতার শেষে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে সঞ্জয়ের ধ্রুববাক্য এই—"হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এতদুভয় মধ্যে যে অত্যদ্ভুত কথপোকথন হইয়াছিল তাহা আমি আপনাকে কহিলাম।" ইত্যাদি। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! আমার মানুষরূপ দেখিয়া অনেক মূর্খ আমাকে মানব বলিয়াই বিবেচনা করে।" চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কহিয়াছেন—

"এই পরম গুহ্য ও হিতকর যোগবিদ্যা আমি যাহা তোমাকে কহিলাম, তাহা পূর্ব্বে সূর্য্যকে শুনাইয়াছিলাম, সূর্য্যের নিকট মনু এবং মনুর নিকট ইক্ষ্বাকু এবং তাহার পরে উত্তরোত্তর ঋষিগণ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন।" অর্জ্জুন কহিলেন "আমি সর্ব্বপ্রকারে এক্ষণে তোমার শরণাগত হইলাম।" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "আমার এই উপদেশ সমুহ যিনি মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় হইবেন।" এই শ্লোকসমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ ও ইহার ভাব লইয়া চিন্তা করিলেই পাঠকেরা বুঝিবেন, কৃষ্ণ কবি-কল্পনা নহেন।

সপ্তদশ প্রমাণ।—মানব মাত্রেই সসীম বুদ্ধিসম্পন্ন, পরমেশ্বর ব্যতীত অসীম বুদ্ধি কাহারও নাই। সসীমবুদ্ধি বিশিষ্ট মানবের কল্পনাও সসীম হয়, সুতরাং সেই কল্পনা সম্পূর্ণ আদর্শ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র "সম্পূর্ণ আদর্শ"। তাঁহার আদর্শের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে অগণ্য অখণ্ড প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর বহুপণ্ডিত ইহার অমর সাক্ষী। * শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনা. মানব কর্ত্তৃক সম্ভবে না; এই আদর্শের পূর্ণতা দ্বারাই বুঝা যায়, ইহা মানবমনের বা মস্তিষ্কের কল্পনা নহে।

অষ্টাদশ প্রমাণ।—যুগযুগান্তর হইতে, বৈদিক শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যপর্য্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ; কেবল প্রসিদ্ধ নহে এবংপ্রকার প্রবাদ কোটি কোটি নরনারী সমাজে প্রচলিত। ইউরোপীয়, আমেরিকীয় ও ভারতবর্ষীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কহেন, অতি পুরাতন প্রবাদের মূলে অন্ততঃ কিছু সত্য বর্ত্তমান না থাকিলে, প্রবাদ কখন ক্রমান্বয়ে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রবহমান হইতে পারে না শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ সম্বন্ধে এই শাস্ত্রপ্রখ্যাত পুরাতন প্রবাদকে কেমনে উপেক্ষা করিতে পার? মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যাঁহার নামে প্রেমোন্মত্ত, পাণ্ডবেরা যাঁহার ভক্ত, অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, প্রহ্লাদ যাঁহার উপাসক, তিনি কখনও কবিকল্পনা হইতেই পারেন না।

উনবিংশ প্রমাণ।—পাঠকেরা অবগত আছেন, শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীশ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভুবনবিখ্যাত রাসলীলা সম্পন্ন করেন। যাঁহার ছবি লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া সকলকে চরম লক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে, সেই বেদবেদ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম তত্ত্বের লীলামাধুরী এই রাসলীলায় প্রকটিত হইয়াছে। অনুরাগপূর্ণ জ্ঞানাগ্নিবিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা মাহাত্ম্য রাসলীলা দ্বারা পরিষ্কার রূপে উদ্ভাসিত হয়; এই লীলায় কুরুচির আতঙ্ক নাই। রাস-অভিসার সত্য ও নিত্য। ৺ কাত্যায়নী পূজাদ্বারা পরিষ্কৃত চিত্তে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে জীবব্রহ্মের যে নিত্য রমণ হয়, রাসলীলা সেই অপার্থিব, অলৌকিক সম্মিলন। বেদে যে সকল বিষয় ইঙ্গিতে বর্ণিত, যাহার একদেশমাত্র উপনিষদে জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, সেই সকল প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত নিগূঢ় তথ্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রহস্যের ভিতর দিয়া ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে। নিগম কল্পতরু মধ্যে শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্জক ভাগবত পুরাণ অতি উপাদেয়। রাসলীলা পাঠ করিলে, পাঠকেরা দেখিবেন, লীলা স্থলে যত গোপিকা ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের সমীপে বা সম্মুখে একটি করিয়া কৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন। এ স্থলে বিবেচনা কর, মাত্র এক কৃষ্ণের কথা হইতেছে না, কৃষ্ণের শত শত নরমূর্ত্তির কথা হইতেছে। এ স্থলে

* শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ আদর্শত্বের যুক্তি ও প্রমাণ সম্বন্ধে যাঁহাদের কৌতূহল থাকে, তাঁহাদিগকে "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের ১মখণ্ড পাঠ করিতে অনুরোধ করি—লেখক।

কৃষ্ণচন্দ্রের বহুল নরমূর্ত্তির অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। যদি কৃষ্ণ কবিকল্পনা হইতেন, তাহা হইলে, গোপিকারা কি কল্পনাকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলেন? কল্পিতমূর্ত্তির প্রেমে অন্ধ হইয়া কি তাঁহারা সাংসারিক সমুদয় অনিত্য পদার্থকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন? যদি রাসলীলাও তোমাদের নবীন মতানুসারে কবিকল্পনা হয়,তাহাহইলে শ্রীকৃষ্ণকে "কলঙ্কিত পুরুষ" বলিবার অধিকার তোমার কোথায় থাকে? রাসলীলা যদি কুরুচিকর হইত, তাহাহইলে ভাগবতের, ভগবৎতুল্য মহর্ষিগণের কল্পনায় ইহা আদৌ স্পষ্ট হইতে পারিত না।

বিংশ প্রমাণ।—য়িহুদীদিগের অতি প্রাচীন ওল্ড্ টেস্টামেণ্ট গ্রন্থে, খৃষ্টানদের বাইবেলে, বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যে এবং জৈনদিগের বহু পুস্তকে আমি শ্রীকৃষ্ণের বহু উক্তি দেখাইয়া দিতে পারি। কোন কোন উক্তি সম্পূর্ণভাবে এবং কোন কোন উক্তি অসম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিধ অতি প্রাচীন শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও গ্রন্থে এই সকল উক্তি কি কল্পিত মূর্ত্তির কথা? যুগযুগান্তর হইতে কি কল্পনা লইয়াই সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ?

আর অধিক প্রমাণ দিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁহারা নিজের নয়ন দ্বয়ে দুইটি হাত রাখিয়া ছলনা করেন "আমি অন্ধ, আমি সূর্য্য বা সূর্য্যালোক দেখিতে পাই না" তাহাকে কেহ সূর্য্যালোক দেখাইতে পারে কি? যাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে কুশিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমাত্মিকা ধারণা সমূহ পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারা হয়ত তাহাদের সমস্ত জীবনেও তাহাদের এই প্রাণঘাতী ভ্রম বুঝিতে পারিবে না। পরিশেষে কেবল একটি মাত্র কথা কহিয়া আমি প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব, সম্পূর্ণ আদর্শত্ব এবং নরদেহে বর্ত্তমানের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী, তাঁহার নাম মহর্ষি বেদব্যাস। মহাভারত এবং যাবতীয় পৌরাণিক শাস্ত্রের মঙ্গলাচরণে মুনি ও ঋষিরা কহিয়াছেন "আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে নারায়ণ, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবের জয়োচ্চারণ" করিয়া নমস্কার করি।" ব্যাসদেব যে কি অপার শক্তি ও অসীমগুণসম্পন্ন, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—

নমোস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে! ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণ প্রজ্বালিতোজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

এ হেন ব্যাস দেব পুনঃ কহিয়াছেন ও লিখিয়াছেন "ভগবান্ স্বয়ং নরদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামে ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দার্শণিক মতের সমন্বয়।

[১১]

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বাধীন ক্রিয়া কথার কথা মাত্র বাস্তবিক পক্ষে, পুরুষ হইতেই প্রকৃতি আপন প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা পাইয়াছে। এ সকল কথা আমরা সাংখ্যকারিকা দ্বারাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি। 'পুরুষার্থের' জন্যই প্রকৃতির ক্রিয়া ও পরিণাম সংঘটিত হইতেছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি,তাহা আমরা বিগত সংখ্যায় দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এ বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। কিন্তু এই "পুরুষার্থ" কথাটার আর একটু বিশেষ বিবরণ দিলে বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতি বাস্তবিক পক্ষে পুরুষ হইতেই আপনার ক্রিয়াশীলতা পাইয়াছে। আমরা এস্থলে সেই কথাটারই একটা আলোচনা করিয়া দেখিতে যাইতেছি।

পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় আমরা সাংখ্যের যে সপ্তদশ কারিকা উদ্ধৃত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, পাঠক তাহা হইতে একটা কথা বুঝিয়া দেখিবেন। সাংখ্য, পুরুষের অস্তিত্ব অন্য প্রকারেও ত প্রমাণ করিতে পারিতেন। পুরুষ—নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ইত্যাদি বিশেষণ যোগে ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ (Negatively) প্রমাণ করা যাইতে পারিত। তবে কেন সাংখ্যকার অন্বয়মুখের (Positively) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তবে কেন তিনি "সংঘাত-পরার্থত্বাৎ", "অধিষ্ঠানাৎ" প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা অন্বয়ীমুখে পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন? ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই ?

যাহা "সংহত," অর্থাৎ যাহা Equilibrium তাহা কোন চেতন পুরুষেরই প্রয়োজনার্থ। প্রকৃতি সংহত পদার্থ, অতএব তাহা পুরুষের জন্যই অস্তিত্ব-বিশিষ্ট। সংহত পদার্থ, অসংহত চেতনের অস্তিত্ব সূচিত করে। এইরূপ, প্রকৃতি দৃশ্য, অতএব ইহা দ্রষ্টা পুরুষের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, অতএব তাহার ক্রিয়া বা বিকার, অবিকারী অধিষ্ঠানের সত্তা সূচিত করে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পুরুষেক, সাংখ্যকার,—প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই, প্রমাণিত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাৎপর্য্যটি এই যে, Herbert Spencer প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানবাদীরা যেমন অবিকারী সত্তা বা Noumenon কে, অজ্ঞেয় ও সর্ব্বসম্বন্ধবর্জ্জিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সাংখ্য সেরূপ করেন নাই। সাংখ্যের হৃদ্গত ভাব এই যে, প্রকৃতির অতীত হইয়াও পুরুষ, প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আমাদের যে কেবলমাত্র পরিবর্ত্তন, বিকার বা ক্রিয়াগুলিরই (Changes) জ্ঞান হয়, এরূপ নহে; বিকার-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিকারের

অন্তরালবর্ত্তি সত্তার জ্ঞানও আমরা প্রাপ্ত হই। অন্তরে ও বাহিরে যেমন আমরা প্রাকৃতিক বিকার সমূহকে দেখিতেছি, সেই বিকারগুলি উহাদের অন্তরালবর্ত্তী নিত্য অধিষ্ঠাতার সংবাদও আনিয়া দেয়। যাহা জ্ঞেয় (Object) তাহা কখনই জ্ঞাতা (Subject) হইতে পারে না। অধিকারী অধিষ্ঠাতার সত্তা ব্যতীত, বিকারের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। অবিকারী সত্তার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াই, বিকার আপন সত্তা প্রকটিত করিতে পারে। এই কথাটা বুঝাইবার জন্যই, সাংখ্যকার, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া, অন্বয়-মুখে, পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। Phenomenon এবং Neumenon উভয়ই যে পরস্পর দুশ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত, এবং আমাদের জ্ঞানে যে উহারা ঐরূপ জড়িত ভাবেই দেখা দেয়,—এই মহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই সাংখ্যের প্রকৃত অভিপ্রায়। শঙ্করাচার্য্যও এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে, বিকারমাত্রই নিত্য-শক্তির সূচনা করে। "নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ" (গীতা, ১৩।১৩—১৪)। "পাণিপাদাদয়ো জ্ঞেয়শক্তিসম্ভাবনিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়-সম্ভাবে লিঙ্গানি" (শঙ্কর-ভাষ্য)। সুপ্রসিদ্ধ সুরেশ্বরাচার্য্যও "দক্ষিণামূর্ত্তিভাষ্য-বার্ত্তিকে" এই কথাই বলিয়া দিয়াছেন (৬।১৭)। "সংঘাতপরার্থত্বাৎ" কথাটার অর্থও তাহাই। "উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্" একথাটির ইহাই তাৎপর্য্য। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে, উপাধিবানের জ্ঞানও হইয়া থাকে। উভয়েই অত্যন্ত জড়িত; নিরপেক্ষ বা নিঃসম্পর্কিত নহে। এ ভাবে দেখিতে গেলেও প্রকৃতির স্বাধীনসত্তা কথার কথা মাত্র হইয়া পড়ে। ত্রিবিধশক্তির সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ সংহত অবস্থা বা Equilibrium ই ত প্রকৃতি। এই তিন প্রকারের শক্তি, পুরুষেরই। উহা পুরুষার্থের জন্যই সংহত; উহা পুরুষেরই ভোগ ও অপবর্গের জন্য; পুরুষেরই "স্বরূপোপলব্ধির" (ব্যাসভাষ্য) জন্য। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, পুরুষের শক্তিই জগৎসৃষ্টির জন্য নিযুক্ত। "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ" —এই ত্রিশক্তি তাঁহারই; কিন্তু যাহার এই ত্রিশক্তি,—তিনি সেই শক্তির অতীত হইয়া অস্তিত্ববিশিষ্ট। সাংখ্য মহাবৈজ্ঞানিক। সেই জন্যই তিনি আমাদের জ্ঞানের বিবরণ ও বিকারের বিবরণ দিতে গিয়া, আমাদের জ্ঞানের যাহা অনিবার্য্য স্বরূপ, তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। সেই অনিবার্য্য স্বরূপ কি প্রকার? জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, কার্য্য ও কারণের, ক্রিয়া ও কর্ত্তার— একত্র সূচনা। একটি না হইলে অন্যটি হয় না; একটি থাকিলেই অন্যটি সূচিত হয়। এই পরস্পর সম্পর্কসূত্রে জড়িত বিভেদ-জ্ঞানই আমাদের জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ। পরমার্থদৃষ্টিতে হয় ত এ বিভেদ নাই। কিন্তু সাংখ্য সে কথা উত্থাপন করেন নাই। বেদান্ত সে কথা তুলিয়াছেন। বৌদ্ধ, এই বিকার গুলিরই বিবরণ দিয়াছেন, অবিকারীর কথাটা তোলেন নাই। এইটুকু মাত্র প্রভেদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে, এই যে ভেদ, অথচ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক, পাতঞ্জলদর্শন সে তত্ত্ব সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। "তস্মাদ্বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ"; "ন তৎ স্বাভাসং

দৃশ্যত্বাৎ" (পাতঞ্জল, ব্যাসভাষ্য, ৪।১৫ ও ১৯।

পুরুষের প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়াই,—ভোগ ও অপবর্গ সাধনোদ্দেশেই, প্রকৃতি ক্রমাগত পরিণত হইয়া চলিয়াছে।

"প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্ত্ততে ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যম্" এই প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। সাংখ্যকারের এই উক্তির তাৎপর্য্যটি বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এখন আমরা পাঠকের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ভিক্ষা করিব। এই প্রয়োজনটি প্রকৃতির মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, এ কথা ব্যাসভাষ্যে স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "অথৈষাং পঞ্চমং রূপং—অর্থবত্ত্বম্। ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বন্বয়িনী, গুণাস্তন্মাত্রভূতভৌতিকেষ্বিতি সর্ব্বমর্থবত্ত্বম্" (পাতঞ্জল ভাষ্য, ৩। ৪৪)। এই ভাষ্যটুকুর তাৎপর্য্য বুঝা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে,—প্রকৃতি যে বাস্তবিক পুরুষেরই শক্তিমাত্র, এবং প্রকৃতি যে ক্রিয়া করিবার প্রবৃত্তি,—পুরুষ হইতেই পাইয়াছে,—এই তত্ত্বটি আরও সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু অদ্য প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। আগামী বারে এই ভাষ্যটির বিচার করিয়া দেখা যাইবে। সাংখ্যদর্শন কিরূপ আশ্চর্য্য ভিত্তির উপরে স্থাপিত এবং বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে যে কোন বিরোধ হইতে পারে না, ইহা দেখাইবার জন্যই, এত গুলি কথার আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি, পাঠক ক্ষমা করিবেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্. এ।

শোক ও মহত্ত্ব।

শোকের পরমোৎকর্ষে মহত্ত্বের পরমানন্দলীলা। শোকের পুণ্যাশ্রু ভূমণ্ডলে পবিত্র-সলিলা সুরধুনী; কেননা, শোকের প্রধান ও প্রকৃষ্ট চিহ্ন আত্মোৎসর্গ—আত্মবিসর্জ্জন। শোকের মহীয়সী মহিমময়ী উদ্দীপনায় আত্মোন্নতির আনন্দময়ী বিলাসবিচিত্রা স্ফূর্ত্তি। মহত্ত্বই উন্নতি; কেননা, স্বার্থপরায়ণতার মোহময়ী বিকৃত তমিস্রার নিরানন্দ স্থানে, আত্মাহুতির মাঙ্গলিক আবির্ভাব, সত্যসত্যই ভোগান্ধ মানবের চিরোদ্দিষ্টা অভ্যুন্নতি। আত্মবিস্মৃতির সুশোভন ও অতি সুচারু মহাভাবই যাথার্থিক শোকের উচ্ছ্বাসিত অপ্রাকৃত নিদর্শন। যিনি মনুষ্য জীবনে মনুষ্যত্বেরই পরমপূজ্য ও অতিস্পৃহণীয় নামে, শোকের শুভ সংবিধায়িনী প্রণোদনায় বা তাহারই পরমার্থদায়িনী উপাসনায়, প্রতপ্তনিঃশ্বাসে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই, তিনি ভোগবৈভবে বরেণ্য, ক্ষমতায় সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী, পার্থিব ঐশ্বর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য, কিম্বা জ্ঞানসম্পদে পরম সমুন্নত হইলেও, তাঁহার ন্যায় হতভাগ্যের ক্লেশদুর্ব্বহ জীবনের অনর্থকরী

পরিকল্পনায়, প্রাণ কি যেন কি এক অবোধ্য অচিন্ত্য অবসাদে, পরিভূত হয়। যিনি আপনারই আসুরিক সুখভোগমোহের অতি-বিকৃত উপাসনায় পরের নামে, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার ভাগ্য ও অবস্থা পরিচিন্তনে, সত্যসত্যই চিত্ত ভীষণ আতঙ্কে জড়ীভূত হয়। মহত্ত্বের চরণসেবায়—শোকের উদ্বেল প্রেরণায়—মনুষ্য-হৃদয়ের অনিবার্য্য সার্ব্বভৌম অভ্যুদয়। যিনি যে পরিমাণে পৃথিবীতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়তর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; আত্মাহুতির মঙ্গল্য মহাকর্ষণে যিনি স্বার্থপরায়ণতার বিকট বিগ্রহ সহস্র অংশে চূর্ণ করিয়াছেন, সংসার-জীবনে যাঁহার পরমপুণ্যদেহ শোকের নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বপাবন মহানলে দগ্ধ হইয়াছে, যিনি প্রেমের প্রাণদ নামে অনুদিন হাহাকারে কালাতিপাত করিয়াছেন, এবং যাঁহার সমগ্র জীবন অযুত আঘাতে ক্ষত বিক্ষত, মনুষ্য জাতির সমবেত প্রাণ তাঁহারই স্বর্গীয় নামের পুণ্যবিগ্রহের পাদপ্রদেশে প্রীতি ভক্তির কুসুমাঞ্জলি সমর্পণে চিরসন্তৃপ্ত। তাদৃশ মহাপ্রাণ সার্থকজন্মা মহাত্মা মানবজাতির বিশ্রাম ও অ আরাম।

কবি বিষাদের সঙ্গীতে মহত্ত্বের অর্চ্চনা করেন। মহত্ত্বই কবিতার পাদপীঠ ও ধারণসূত্র। কবি-হৃদয় অনন্ত প্রেমের অখণ্ড উৎস। যে স্থানে শোকপ্রবাহ—যে স্থানে অশ্রুর বিষাদতরঙ্গ—যে স্থানে স্মৃতির পুণ্যার্চ্চনায় প্রেমের একপরায়ণা তরঙ্গগতি—কবি সেই স্থানেই বিকার-বিক্ষোভ পরিশূন্য মহাযোগী। কবি পরকীয় বিষাদের দুঃখময়ী গীতি লইয়াই সতত নিরত, দুঃখের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পার্থিব জগতের আলেখ্য প্রদানে লৌকিগুরু; এবং মহত্ত্বের অনন্ত পরিপূজায় তিনি লোকনিবাসে জগদ্‌বন্দ্য দেবতা। প্রেমেই কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। মহত্ত্ব ব্যতীত প্রেমের কল্পনা অবনীর নিকৃষ্ট অধঃপাত। মহত্ত্ব ও প্রেম এই দুই ব্যবহারিক বিভিন্ন কথার মৌলিক বৈষম্য এবং সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বথা অপ্রতিবিধেয় অনন্ত কলঙ্ক। পৃথিবীতে যে কয়জন কবি, মহত্ত্বের চরণোপাসনায়, প্রেমের সর্ব্বার্থ নামে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই সর্ব্বপ্রকারেই আত্মবিস্মৃত! পরের দুঃখে কবিহৃদয়ের সুদুর্জ্জয় পরম পবিত্র আবেগ; নয়নের অবিরল জল-ধারা; প্রেমের প্রাণময়ী তন্ময়ী এক প্রতিষ্ঠা উপাসনায় সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মাহুতি। তাহা না হইলে, অমৃতাক্ষরা কবিতার নামে জীবনিবাসে কদাপি আশা ও আশ্বাসের শেষ চিহ্নটিও বিদ্যমান রহিত না। যিনি যে পরিমাণে আত্মোৎসর্গের মহীয়সী দীক্ষায় অনুপ্রাণিত, তিনি সেই পরিমাণে মহত্ত্বের উপাসক। আত্মাহুতির নিখিলার্থা অনুপ্রাণনায় শোকের আবেগময় উচ্ছ্বাসে, কবিতার আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠা; এবং কবির প্রাণাভিরামা মঙ্গলময়ী গীতি।

উচ্ছ্বসিত ইন্দ্রিয়া বেগ বা সাময়িক অতি

প্রচণ্ড হৃদয়াভিঘাত কদাপি শোক-শব্দ-বাচ্য নহে। উহা মানস-বিকারেরই অধম নিদর্শন। সাময়িক আবেগে যাহার ক্ষণিক স্ফুরণ, কালাতিবর্ত্তনে যাহা বিলুপ্ত, দূরত্বে যাহা বিকৃত, অদর্শনে যাহা ম্লান ও পরিক্ষীণ; যাহাতে আবেগ আছে প্রাণ নাই; উচ্ছ্বাস আছে, ভাব নাই; বিনাশ আছে, গতি নাই; নাম আছে, সত্তা নাই, তাদৃশ অতি শোচনীয় অস্পৃহণীয় প্রাকৃত জনের জঘন্য-ভাব-বিকারকে, কেমন করিয়া ও কোন্ প্রাণে, তাদৃশ অতি লোভনীয় পরম রমণীয় শোক শব্দের মহীয়সী আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি?

জগতে অনেক দীন হৃদয় মনুষ্য, ক্ষণিক ভাবাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিতান্ত উন্মত্তবৎ ও বিহ্বলের ন্যায়, শোকের নামে রোদন করিয়াছে; কিন্তু, সেই অশ্রু রাশিতে যদি স্বর্গীয়তার মধুর ও সুকুমারি সংস্পর্শের বিন্দুমাত্রও পরিলোকিত হইত, তাহা হইলে স্বার্থোৎসর্জ্জনের ভুবনোজ্জ্বল মহোচ্চ দৃশ্যে মানব হৃদয় আশা ও আশ্বাসের প্রাণমোহন সুখদ ও সুচারু ভাবে পরিপ্লুত হইত! কিন্তু, মনুষ্য অনেকদিন হইতে অথবা ইতিহাসেরও চিরাতীত কাল হইতে, ভোগ বিমূঢ়তায় অধঃপাতেরই পাশবী উপাসনায়, শোকের নামে, নৈরাশ্য-সঙ্কুল ভীষণ মোহের অর্চ্চনা করিয়াছে। শোক প্রেমের প্রাণময়ী ধ্যানময়ী উপাসনা। উপাসনায় মহত্বের অতি মধুর বিলসন; কেন না, উপাসনায় তন্ময়তারূপ মহাভাবের বিলোল বিলাস আছে; জঘন্য আত্মাদরের সর্ব্বাঙ্গীণ অভাব আছে; উন্নতির জীবনময়ী গতি আছে; এবং চরমে অযাচিত অথচ অনিবার্য্য মঙ্গল্য-ফল-স্বরূপ প্রাণের ঐকান্তিক বিশ্রাম আছে। শোকে নৈরাশ্যের অন্ধকারময়ী ভীতি নাই; হৃদয়িক বিষাদের গভীর নিরাশশাসন নাই; চিত্তবিকৃতির অধঃপাত নাই; এবং জঘন্য আত্মপরায়ণতার তাদৃশ বিকট আকর্ষণ নাই। এই অবনীতে কয়জন শোকের উপাসনায়, প্রাণাবেগে প্রেমের জগদ্বন্দ্য বিশ্বপ্রাণতোষণ স্বর্গীয় প্রেমের অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এই নৈরাশ্য-ব্যাকুল-সংসারে প্রেমের প্রসন্নমধুর বিলাস-বিচিত্র মহাভাবাবেশের সঞ্জীবনী লীলা অনুভব করিয়া, কয় জন আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছেন? পৃথিবীতে কয় জন স্বার্থার্চ্চনার বিরূপ ও বিকৃত বিগ্রহের সমুৎসাদনে, মহত্বের পরিসেবায়, শোকের নামে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইয়াছেন?

শোকস্মৃতির গতি-বহুলা মহিমময়ী পূজা। অদর্শনে উহার স্বাভাবিকী প্রেরণা বা দুর্নিগ্রহ প্রণোদনা। যে স্থানে নৈরাশ্যের অন্ধকার রেখা, সেই অতিতর অসার বিষাদবহুল লোক-নয়ন-শূল স্বরূপ ভীষণ স্থানে কদাপি শোকের পুণ্যপ্রবাহ সঞ্চরণ করিতে পারে না। আশাই শোকের প্রাণ প্রস্রবণী; অদর্শন মানস-সম্মিলনের অতএব তজ্জনিত অতি প্রগাঢ় আশার কদাপি অন্তরায় নহে; কেন না, প্রত্যক্ষ-স্তরের ক্রমোন্নত পর্য্যায়ে মানস-অনুভব বড় অধিক উচ্চস্থানীয়, এবং প্রাণযোগে সর্ব্বপ্রকারেই অভিলষণীয়।

আজ এই গভীর রজনীতে পুত্রশোকবিধুরা জননী উচ্ছ্বসিত আবেগে মর্ম্মস্পর্শী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে স্বকীয় হৃদয়স্থিত দারুণ যন্ত্রণা পরিব্যক্ত করিতেছেন, তাঁহার হৃদয়রত্ন অপরাজের কালের কুক্ষিগত হইয়াছে; একদিন যাহার পরমমধুর বদনসুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া, আশায় সন্দীপিত ও উৎসাহে বিস্ফারিত হইয়া, এই নরনিবাস ভূমণ্ডলকে শোকদুঃখের লেশমাত্রও পরিশূন্য জ্ঞান করিয়া, সানন্দ বিচরণ করিয়াছেন, আজ সেই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কালমুখে সমর্পণ করিয়া নৈরাশ্যে আকুল; এবং যারপর-নাই হতাশ। কিন্তু তিনি যদি মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিতে পারিতেন যে, প্রেমের অবিনাশিতা মনুষ্যজাতির দেবাকাঙ্ক্ষিত পরমবৈভব এবং সর্ব্বোদ্দিষ্ট অপার্থিব মহত্তম গৌরব, তাহা হইলে, আজ সেই ধূলিধূসরা জননীর ভাগ্য পরিচিন্তনে আমরা আশায় ও আশ্বাসে হৃদয় পরিতর্পণ করিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু সেই হতভাগা জননী মুহূর্ত্তের তরেও কি প্রেমের নিত্যতায় শোকের সার্থকতার গূঢ় রহস্যোদ্ভেদে আপনাকে কৃতার্থা করিতে পারিয়াছেন? অহো! কি অভাবনীয় শোকাবহ দুর্গতি! আর আজ এই সুতবিয়োগ-বিবশা রমণীর কি দারুণ দুর্গতি! উদ্বেল হৃদয়াভিঘাতে বিলোড়িত হইয়া, আজ তিনি অশ্রুসম্পাতে অতি ভীষণ দুঃখের উপশম করিতেছেন, সমন্নাতিপাতে সেই নয়নজলধারা স্বার্থার্চ্চনারই অপরাজিত কলুষিত দাহে কোথায় বিলীন হইবে! আজ যে স্থানে বিষাদের উত্তপ্ত নয়ন জল, কাল-প্রবাহে সেই স্থানেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের অট্টহাস্য। যে স্থানে হাহাকারের দুর্দ্দম মর্ম্মন্তুদচ্ছবি, সেই স্থানে সমন্নাতিপাতে বিলাসমোহের উচ্ছৃঙ্খল লীলা! তাই, কেমন করিয়া কহিব, এবম্বিধ আত্মার্থজনিত বিকৃত শোক ও শোচনীয় অধঃপাত দুই বিরুদ্ধ ও বিভিন্ন বস্তু এবং কিরূপেই বা কহিব, শোকের লোকপাবন আকর্ষণ যথার্থই মহত্ত্বেরই অলঙ্ঘ্য মধুর আহ্বান?

রাম-শোকাকুল দশরথ একদিন অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। এতাদৃশ নয়নবারির প্রতিবিন্দু অবনীর পরম-পুণ্য-সুরধুনী-প্রবাহ; কেন না, সেই নেত্র-জল-রাশি স্বার্থাহুতিরই বাহ্য মঙ্গল্য নিদর্শন। সেই পবিত্র শোকপ্রবাহে আত্মপরতার ক্ষীণতম চিহ্নও পরিলোকিত হয় না, দশরথ রামময়-জীবিত; রামার্থে দশরথের সর্ব্বতোমুখী আত্মাহুতি। যে আত্ম-বিস্মৃতি যথার্থ শোকের প্রাণপ্রস্রবিণী দশরথের সেই অনন্তকাল-স্থায়ি মহাশোকে তাহা যে ভাবে দেদীপ্যমান, এইরূপ মানব জাতির ইতিহাসে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দশরথের সেই রামার্থ বিলাপে আত্মপরায়ণতার সর্ব্বতোমুখ বিলয়ন; আত্মোৎসর্জ্জনের ভুবন-দুর্ল্লভ বিকাশ; আত্মবিস্মৃতির প্রীতিদায়িনী লীলা; এবং স্মৃতির প্রাণানুরঞ্জিনী আন্তরিকী মহতীপূজা! সেই রামাভিমুখ অসংখ্য-আবর্ত্তবিলসিত মহাশোকসাগরে সংসারসুলভ যাবতীয় বন্ধনসূত্র কোথায় কোন্ অদৃশ্যপথে ভাসিয়া

গিয়াছে। সেই পুণ্যশোক-সম্ভার ভরত-জননীর প্রতিহত হয় নাই; পার্থিব ভোগ-সুখের দুরতিক্রম আকর্ষণে ছিন্ন হয় নাই; এবং প্রাণের ভীষণ আশঙ্কায় কদাপি ব্যাহত বা বিচলিত হয় নাই।

স্বার্থপরতার বা ইন্দ্রিয়-মোহের যে নিরর্থক ও নিষ্ফল আবেগ উন্মত্ত-কল্পিত শোকের বিকৃত কারণ, দশরথের সেই চিরস্মরণীয় দুরবগাহ রামার্থ প্রেম এবং সেই জগদ্দুর্লভ প্রেমোদ্ভূত সুদুর্দ্দর্শ শোকের অনন্ত বিস্তারে, তাদৃশ বিকট বিকারের ক্ষীণতম চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না। যে শোক জীবনের চরম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সর্ব্বদাহী অনলের ন্যায় ভীষণরূপে জ্বলিতেছিল, যে শোক আত্ম-সুখের ক্লেশসংস্পর্শশূন্য বলিয়া জগতে অত্যুচ্চ ও পরমমহিমময়, যে শোক স্বার্থপরিচিন্তনের পৈশাচভাবে কদাপি বিদূষিত হয় নাই, যাহা প্রাকৃত ও পার্থিব ভোগবিলাসের আকস্মিক প্রতিঘাতে বিজৃম্ভিত হয় নাই? যাহা অজস্র অনুধ্যান ও পরিচিন্তনে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট ও অক্ষুণ্ণ, তুমি তাদৃশ পরমার্থ প্রতিপাদক মহাভাবকেই শোকের মহত্তম অভিধানে বিনির্দ্দিষ্ট করিতে পার। শোকে আত্মসুখ পরায়ণতার সর্ব্বতোমুখী নিবৃত্তি—দূরব্যবহিত অপ্রত্যক্ষ প্রিয়তমের জীবনময়ী মূর্ত্তির আবেগময়ী পরিকল্পনা—আত্মার্থের পূর্ণোৎসাদনে বা পরার্থে পরার্থানুস্মৃতির পুণ্যার্চ্চনা—দশরথের সেই বিশ্বমঙ্গল্য শোকে এই সকল হৃদয়ারাধ্য ভাবাবলীর সুখদ ও প্রাণদ স্ফূরণ। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, দশরথের অতিগভীর পুণ্যময় মহাশোকের গরীয়সী গাথা অবনীর স্বর্গীয় পীযূষ প্রবাহ; এবং যে অচিন্ত্য অবোধ্য অতনস্পর্শ মহাভাবোচ্ছ্বসিত অবনী-অর্চ্চনীয় আদিকবি ভগবান্ বাল্মীকির মহনীয় হৃদয়, তাদৃশ লোক-পাবন আলেখ্যপ্রদান করিয়া পৃথিবীকে সহস্ররূপে কৃতার্থ করিয়াছে, সেই মহোচ্চ হৃদয়ের পরম পবিত্র নামে অনন্তকাল ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি সমর্পিত হউক। এবং শোকের পুণ্যস্মরণে মহত্ত্বের আদর্শ চিরকাল প্রাণ সংযোগে সম্পূজিত থাকুক।

গুণ-ধ্যানে প্রেমের আবির্ভাব—প্রেমাবেগে শোকের সঞ্চার—আত্মোৎসর্গের বিচিত্র লীলায় শোকের মাঙ্গলিকী অবতারণা। গুণধ্যানে বা গুণানুচিন্তনে প্রেমের স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োজনীয়তা; সে স্থানে প্রেমের আনন্দলীলার অভাব, সেই অতি নীরস কঠোর ভূমিতে কেমন করিয়া গুণের আনন্দময়ী পরিকল্পনা কোনক্রমে সম্ভবপর? প্রেমের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে বস্তুতত্ত্বার্থদর্শন—বস্তুতত্ত্বের পূর্ণাধিগম হইতেই গুণগ্রাহিণী শক্তি। বিচ্ছেদের মহাকর্ষণে বা অলঙ্ঘ্য অভিঘাতে অনন্তোর্ম্মিময়ী গুণ-স্মৃতি শোক-সঞ্চারিত করিয়া মনুষ্যকে মহত্ত্বের ঊর্দ্ধরাজ্যে আহ্বান করে। সত্যের আদর্শ গ্রামে রূপ ও গুণের কোনরূপে মৌলিক পার্থক্য নাই। কিন্তু পার্থিব জগতে রূপ ও গুণের অভেদ কল্পনা যার-পর-নাই অস্বাভাবিক। সেইজন্যই বসুন্ধরায় প্রকৃত শোক অতি বিরল, প্রকৃত মহত্ত্ব সুদুর্লভ, এবং

রূপ ও গুণের অভেদ চিন্তা সর্ব্বতোভাবে অলীক।

রূপ-চিন্তাও শোকের প্রাণ-প্রস্রবণ। ইন্দ্রিয়-রূপ-মোহ ভৌতিক বিকারেরই নিকৃষ্ট দ্বিতীয় অভিধান। জগতে কয়জন রূপের পরিচিন্তনে বা মাঙ্গলিক ধ্যানে, আপনাকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছেন? যে রূপের পরিকল্পনায় হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের অভ্যুন্নতি এবং জীবনের মৌলিক লক্ষ্যের চরিতার্থতা, সংসারে কয়জন তাহা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে ধন্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন? প্রাকৃত-জগতে রূপ-চিন্তা ইন্দ্রিয়জ বিকারের অনিবার্য্য কদর্য্য ফল। বিরহে আত্ম-গত ইন্দ্রিয়-সুখমোহের প্রবল ব্যাঘাত; তজ্জন্যই উন্মত্ত আর্ত্তনাদ এবং ক্ষণিক ব্যাকুলতা। রূপ-কল্পনায় প্রেমের প্রকৃত-সংযোগে আত্মনীন সুখের সমূল উৎপাটন, কিন্তু, ইন্দ্রিয়রূপোত্থ আবিল আবেগে স্বার্থার্চ্চনারই বিকৃত ও বিকট লীলা-ভঙ্গী। ফলতঃ, প্রেম-বিলসিত আবেগ বহুল নিঃস্বার্থরূপানুধ্যান শোকের পারমার্থিক অভিধান এবং মহত্ত্বের অক্ষয় অখণ্ড নিদান। মনুষ্য যেন কদাপি এতদুভয়ের অদ্বয়তা কল্পনা করিয়া অপ্রতিবিধেয় কলঙ্কে বিদূষিত না হয়। যে স্থানে আত্মাহুতির পরিবর্ত্তে উন্মত্ততার উদ্‌ভ্রান্ত প্রমোদ-লীলা, সেই স্থানেই শোকের নামে আসুর অভিনয়ের ভয়াবহ দৃশ্য। অনেকে বুদ্ধির শোচনীয় বিভ্রমে অপ্রতিবিধেয় রূপে নিপতিত হইয়া, শোককে শিশুর অনিয়ত অর্থ-শূন্য প্রলাপ বা বিলাপ বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট করিতেও অণুমাত্র লজ্জিত হয়েন নাই। শোক তাঁহাদের নিকট অসার ক্রীড়ার বস্তু; প্রেম হৃদয়ের নিষ্ফল বিকার; এবং স্মৃতির উপাসনা কল্পনার প্রমোদ-কথা। আমি জীবনে অনেকবার এতাদৃশী দুরক্ষরা কথা শ্রবণ করিয়া, যার পর-নাই হতাশ হইয়াছি। এমন অসার প্রমত্ত কথার শ্রবণে আমি সত্য সত্যই অধীর ও ব্যাকুল। শোকের নিরর্থকতার অসত্য-প্রলাপ-বচনে মনুষ্যের আস্থা সংস্থাপন যথার্থই অধঃপাতের নিম্নতম স্তর। রূপ অসামান্য মহিমান্বিত আরাধ্য পরম বস্তু। যে রূপের ধ্যানে সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মবিস্মৃতি, যে রূপের মধুর নীরব আহ্বানে প্রাণের কি এক অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় ভাবাবেশ; যে রূপের মহীয়সী পরমার্থা লীলায় হৃদয়ের মঙ্গলময়ী অভ্যুন্নতি এবং যে রূপের প্রাণময় প্রেম সংকৃত পরিচিন্তন জগতের একমাত্র আশা ও আশ্বাস; তাদৃক্ সারাৎসার রূপের মহত্তম নামে ভাববিমিশ্র হৃদয়াবেগকে মানস-বিকারের কদর্য্য ও অনভিলষণীয় আহ্বানে অভিহিত করিলে সত্যের মর্ম্মন্তুদ অপলাপ হইবে; এবং মনুষ্যও দানবী সেবার উদ্‌ভ্রান্ত ও বিকৃত অভিনয়ে প্রমত্ত রহিয়া মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের পুরাতন বিভেদ-সূত্র সহস্র অংশে ছিন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বিচরণ করিবে, সন্দেহ নাই।

আমি বিরহজনিত মর্ম্মোচ্ছ্বাসে অনেককেই রূপের কথায় শোক করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু, কাল-প্রবাহে সেইরূপের ক্ষীণতম চিহ্নটিও কোন্ অলক্ষ্যপথে বিলুপ্ত

ও অদৃশ্য হইয়াছে! সেইরূপ কথার প্রতিবর্ণে ভোগমোহেরই যেন নিরবচ্ছিন্ন প্রবলপ্রবাহ! উহার আদি, মধ্য ও অন্ত, সর্ব্বত্রই আত্মপরতার প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ। উহাতে প্রলাপ আছে, ধৈর্য্য নাই; ভয় আছে, আশা নাই; জ্বালা আছে, শান্তি নাই; দুঃখ আছে, স্মৃতি নাই; এবং বিলয় আছে, পরিণতি নাই। হায়! ইহার ন্যায় হৃদয়-দৈন্য কল্পনার অনন্ত শক্তিও চিন্তা করিতে একেবারেই বিমুখ! রূপজমোহের বিকৃত-আবেগে ইহার সঞ্চার; কালাতিপাতে ইহার অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বতোমুখ নিরর্থ বিলোপ। ইঁহারা যদি মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে সমর্থ হইতেন যে, প্রেম নিত্য—প্রেমের নিত্যতায় রূপ-কল্পনার সার্থকতা আছে, —রূপ-চিন্তায় শোকের মনুষ্যহৃদয়, ইতিহাসের অক্ষয় অনন্ত গৌরব—তাহা হইলে তাঁহারা কদাপি নৈরাশ্যে ব্যাকুল ও দুঃখে বিবশ হইয়া, নিতান্ত অসহায়ের ন্যায়, শূন্য-হৃদয়ে বিচরণ করিতেন না; এবং শোকের নিষ্ফলতারূপ পাপ-চিন্তায় কদাচ অবসন্ন হইতেন না। প্রেম নিত্য—রূপ অক্ষয়—শোক অনন্ত মহত্ত্ব; শোক-শূন্য মানব জীবনহীন প্রস্তরখণ্ড অথবা সারবিহীন নির্ম্মম দানব। প্রেমের পূজায় রূপের অর্চ্চনায় প্রাণসংযোগে যিনি কাঁদিতে পারিয়াছেন, জগতে তাঁহার হৃদয়-মহত্ত্বের তুলনা নাই; স্মৃতির প্রসন্ন পুণ্যার্চ্চনায় যাঁহার জীবনসার্থক হইয়াছে, নর-নিবাসে তিনি প্রকৃত দেবতা; এবং আত্মবিস্মৃতির সর্ব্বার্থ সংবিধায়িনী মহীয়সী গরীয়সী লীলায় যাঁহার পরমোন্নত জীবন সর্ব্বপ্রকারে সমুদ্ভাসিত ও বিচিত্রভাবে চিত্রিত, তাঁহার মহত্ত্ব দেবতারও স্পৃহণীয়। কিন্তু, বিরহের অলস-বিষাদে যাহার অসার হৃদয় খিন্ন ও ক্ষুণ্ণ; যাহার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়াবেগ নয়ন-অপ্রত্যক্ষ প্রিয়জনের চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ভৌতিকরূপেরই অসার উন্মত্ত কল্পনায় পর্য্যবসিত; যাঁহার রূপচিন্তা হৃদয়ের অনন্ত অশান্তি, তাদৃশ শোচনীয় দশাগ্রস্ত অধন্য-জীবন ব্যক্তি রূপের যথার্থরূপাবধারণে প্রেমের জীবনময়ী অর্চ্চনায় শোকের নিগূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই; সেইজন্যই তাঁহার দুঃখ অনন্ত, নৈরাশ্য অসীম এবং এবং অধঃপাত অনুপম। দেবতার হিরণ্ময় বিগ্রহের পুণ্যস্থানে দানবের ভীষণ চিত্র মনুষ্যকে কেমন করিয়া প্রীত ও আশ্বস্ত করিতে পারে?

ভাবের অগাধপ্রবাহ স্বরূপ মহাপ্রাণ বাল্মীকি যে ভাবে শোকের শোভন চিত্র চিত্রণে মনুষ্যকে মহত্ত্বের উর্দ্ধরাজ্যে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, জগতে আর সেইরূপ পরিলক্ষিত হয় না। রামায়ণ-নায়ক লোকাদর্শ রাম-চরিত্রে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ মহামনা বাল্মীকি শোকের পরম মধুর অত্যুন্নত আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন, রাম প্রেমের অক্ষুণ্ণ অখণ্ড উৎস, বৈদেহীশোকে দাশরথি ধ্যানপরায়ণ নির্ব্বিকার যোগী; বিরহে ব্যাকুল হইলেও হতাশ নহেন, যে প্রেম হৃদয়ের পরম অভ্যুন্নতি, যাহা নরজগতের অজস্র সুখদ অমৃত, রাম সেই সর্ব্বার্থসাধক মহা

প্রেমেরই চিরন্তন উপাসক। সীতাবিচ্ছেদে রামের হৃদয়-দুঃখ স্বার্থপরায়ণতার শুষ্ক ফল নহে; উহা প্রেমে সঞ্চারিত; স্মরণে পরিপুষ্ট এবং আত্মোৎসর্গে অনন্ত পথে সম্প্রসারিত। উহাতে ভোগ-বিমূঢ় প্রাকৃতজন-সুলভ বিকট আর্ত্তনাদ নাই; প্রেমের অসারতায় নৈরাশ্যের তাণ্ডব শাসন নাই; অদর্শনে উহা কদাপি ক্ষীণ ও ম্লান হয় নাই। সেই উচ্চার্থ-পরিবোধক অতি-গভীর-শোক স্মৃতির উপাসনায় প্রাদুর্ভূত; গুণ-চিন্তনে দ্রবীভূত; এবং প্রেমের পুণ্য-সলিলে অভিষিক্ত। এই পরম শোকে প্রবাহ আছে, পরিচ্ছেদ নাই; শান্তি আছে, জ্বালা নাই; আশা আছে, ভয় নাই; এবং উন্নতি আছে, পতন নাই। উহা সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় একরূপ ও অবিকৃত; ব্যবধানে উহা প্রদীপ্ত; অদর্শনে সমুজ্জ্বল; প্রাণ-চক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে তেজোময়। এই শোকে আর্ত্তনাদ নাই, স্থিতি আছে; স্বার্থপরতা নাই, আনন্দ আছে। ইহাতে গতি আছে, সমাপ্তি নাই; এবং প্রাণ আছে, মৃত্যু নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের লোক-ভয়ঙ্কর কোলাহলেও উহা অবিকৃত; রাক্ষসবিনাশের নিদারুণ ও সুদুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞায় উহা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট, এবং ক্ষাত্রশক্তির অজিত ও অজেয় বিলাসে উহা সর্ব্বতোভাবে প্রকট। এই নিখিলার্থ শোক কর্ত্তব্যবুদ্ধির অন্তরায় হইবে কি? এবম্বিধ শোকোপাসনায়ই কর্ত্তব্যজ্ঞানের মনোহর প্রাণদ বিলাস।

সীতানির্ব্বাসন কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিত্যকাল স্থায়ী অমোঘ মহাফল! সীতাশোক রামের হৃদয়-নিহিত অপরিমিত ও অপরিমেয় প্রেমের অশ্রুতপূর্ব্ব নিদর্শন, সীতা-বিরহ অবনী-অর্চ্চনীয়া রামায়ণী কথার অমৃত স্বরূপ। রাজকার্য্যে অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত, শোকে নির্ব্বিকার, বিরহে অব্যাকুল, ব্যবধানে আশাপ্রদীপ্ত;—এবম্বিধ মহাপ্রাণ রাম-শোকের জীবনময় আলেখ্য কবিমহত্ত্বের সারাৎসার এবং অনন্তকালব্যাপিনী সাধনার শেষ ফল। নীরব অশ্রু-সম্পাত, নির্ব্বিকার প্রেমপূজা, অচ্ছিন্ন স্মৃতির আবেগময়ী ঐকান্তিকী অর্চ্চনা, কাব্যচিত্রের পরম-প্রকর্ষ। ভোগ বিমুগ্ধ প্রাকৃত ব্যক্তি বিরহের উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনায় সন্তাড়িত হইয়া, প্রিয়জনের শেষ স্মৃতি চিহ্নটিও অনায়াসে প্রক্ষালিত করিয়া শান্তিলাভের জন্য সতত ও সর্ব্বপ্রকারে লালায়িত হয়; কিন্তু, দাশরথির সেই মহাশোক সীতার পুণ্যস্মৃতির গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রযত্নে লোলুপ,—অশ্বমেধ-যজ্ঞে হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি সেই নিখিল পুণ্যপ্রবাহ পরমার্থ শোকের মহত্তম আদর্শ। স্মৃতির এতাদৃশী মহিমময়ী উপাসনা কাব্য-জগতে দ্বিতীয়বার উদাহৃত হয় নাই।

আমি প্রকৃতির মর্ম্মার্থদ্রষ্টা মহাকবি শেক্ষপীয়রের প্রেম-পূজায় শোক-চিত্র অবলোকন করিয়াছি; ভাবের অমৃত-নির্ঝর মিল্‌টনেরও গভীর কথা শ্রবণ করিয়াছি; শেলি ও বায়রণেরও অনেক শোককাহিনীর আলোচনা করিয়াছি, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস্‌দেশের অক্ষয় অলঙ্কার স্বরূপ সফোক্লিস্ ও ইউরিপাইডিসেরও বিষাদবাণী

হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এমন কি, প্রাচীন পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু মহাপ্রাণ হোমার ও হিসিয়ড্‌কে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি; ভার্জ্জিল্‌ও দান্তেরও মর্ম্মোদ্ভেদে প্রযত্নপর হইয়াছি; কোন স্থানেই শোকের তাদৃক্‌ ভুবন-প্রাণ-বিমোহন উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত চিত্র সন্দর্শন করি নাই। ইঁহারা ভাবরাজ্যের অনেক উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শোকের বিষাদকাহিনী কহিয়াছেন সত্য, প্রেমের উপাসনায় ইঁহারাও মহত্ত্বের পূজা করিয়াছেন যথার্থ; কিন্তু, তাঁহারা সাধনার সুখশক্তির সমাশ্রয়ে বহু উর্দ্ধে সমুত্থিত হইতে হইতে অকস্মাৎ অনিবার্য্য বেগে আদর্শ গ্রাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বাল্মীকির অগাধ প্রেম মহার্ণবের ইয়ত্তা নাই, রামশোকেরও পরিচ্ছেদ নাই, এবং দাশরথির হৃদয় মহত্ত্বেরও পরিসংখ্যা ও পরিশেষ নাই। তাই বলিতেছিলাম, জগতে রামশোকের উপমা নাই।

আবার ভুবনবিজয়িনী রামায়ণী কাহিনীর কেন্দ্রস্বরূপিণী বৈদেহীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। অহো! কি অলৌকিক দুরবগাহ, সুপবিত্র শোকসম্ভার! আহা! কি অচিন্ত্য ও অচিন্তিত মহাভাব-পরিবোধক অনুপম মহত্ত্ব! কি লোকবরেণ্যা মৈথিলী-চরিত্রের পরমচিত্রণে ভগবান্‌ বাল্মীকি আপনার অনন্ত ও অগাধ হৃদয়-গৌরবের পরিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। লঙ্কেশ্বর দশাননের বিশ্বদাহী ক্রোধানল কর্কশ-হৃদয়া রাক্ষসী সমাকীর্ণা অশোক-কানন যেন ভস্মীভূত করিতেছে—কিন্তু, রাম-হৃদয়-নিবাসিনী রামসংস্থা মহাদেবী জানকী মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিদায়িনী তপস্যার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার-বিকার-বিক্ষোভ-পরিশূন্যা! ক্রোধে সেই দেবারাধ্য বৈদেহীর মহাশোক-প্রবাহ অটল ও অপ্রতিহত; লোভের দুরাসদ সমাকর্ষণে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকার, ব্যবধানে স্থির-প্রতিষ্ঠ, কালদূরত্বে সর্ব্বাংশে অক্ষুণ্ণ! পাপিষ্ঠ রাবণের সর্ব্ববিধ অনর্থকরী চেষ্টা মৈথিলীর অনুপম শোকমহার্ণবে কোথায় ভাসিয়া গেল! বিচ্ছেদের অতিকঠোর তাণ্ডব-তাড়নে শত শত রমণী উচ্ছ্বসিত আবেগে নৈরাশ্যে আকুল ও বিবশ হইয়া জগতে অনেকবার কাঁদিয়াছেন; কিন্তু, প্রেমের যে অতল-স্পর্শ স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্যে শোকের ভুবনোজ্জ্বল প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, এই সকল সাময়িক উদ্বেল আবেগে তাহা অতি অল্পই দর্শন করিয়াছি। সেই জন্যই তাঁহাদের মোহ-কাহিনী বিকৃত কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া, ভূমণ্ডলে অতীব অসার ও বিফল কাব্যের অবতারণা করিয়াছে। অনেকে বিবিধ উপায়ে অধঃপাতের পাপ-বিগ্রহকে পূজা করিয়া তাদৃশী অসার-কথায়, অপবিত্র সঙ্গীতে আপনাদিগকে অনন্ত প্রকারে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন! জগতে তাদৃশ অধন্য-জন্মা হীন-মতি মনুষ্য বিরল হইলে, বোধ হয়, কাব্যের মধুর-বিষাদ-সঙ্গীতে, মহত্ত্বের ঐকান্তিকী পূজায়, শোক-কাহিনীর অমৃত-গীতি শ্রবণ করিয়া, অশেষ ভাবে ধন্য হইতে পারিতাম। বৈদেহীর রামার্থ-প্রেম শোকের মহীয়ান্‌ ভাবে অতুল-

নীয়রূপে স্ফুরিত ও প্রকট, আত্মোৎসর্জ্জন—আত্মাহুতি সেই মহাশোকের অনন্ত হবিঃ! সেইজন্যই বলিতেছিলাম, ভূমণ্ডলে সীতা-শোকের উপমা নাই—মৈথিলীর সেই অনন্ত-হৃদয়-মহত্ত্বের পরিসংখ্যা নাই। কিন্তু, এই সুদুর্দ্দর্শ আদর্শ-শোকের কঠোর পরীক্ষার এখনও অবসান হয় নাই। নিষ্কারণ পরী-বাদে বৈদেহীর নির্ব্বাসন—সীতাগত-জীবন রাম হৃদয়ের গভীরতম স্থানে মহাদেবীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি জ্ঞানে কত ভাবে পূজা করিয়াছেন—কিন্তু, কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘ্য শাসন—রাজধর্ম্মের দুরতিক্রম আ-হ্বানে—বৈদেহীর নির্ব্বাসন সমাহিত হইল! এতাদৃশী কঠোর ও দুস্তর পরিক্ষায় সীতার অপূর্ব্ব শোকপ্রবাহের পরমোৎকর্ষ ও তাঁহার অলোক-সামান্য হৃদয়-মহত্ত্বের পরকাষ্ঠা অ-সংখ্য প্রকারে চিত্রিত হইয়াছে! এই শোকে বিকার নাই, লীলা আছে; ধ্বংস নাই গতি আছে; ভয় নাই, আশা আছে। উহা সতত জীবিত, উজ্জ্বল এবং আবর্ত্ত-বিশিষ্ট। মানব-ইতিহাসে উহার দ্বিতীয় উদাহরণ কদাপি পরিকল্পিত হয় নাই। আমি জীবনে অনেকবার পশু-সুলভ স্বার্থপরতার নিষ্ফল-তরল-চপল কথায়, শোকের নামে, মোহের গীতি শ্রবণ করিয়া, যার-পর-নাই হতাশ হইয়াছি; কিন্তু বৈদেহীর সেই জগৎ-পাবনী [illegible]াক্ষরা মহাবাণী যতবার শুনি-য়াছি, ততবারই মহত্বের গভীর ও পুণ্যনামে আপনাকে অনন্তভাবে চরিতার্থ মনে করি-য়াছি; এবং সংসারকে দেবত্বের লীলাভূমি জ্ঞান করিয়া অশেষপ্রকারে আত্মানন্দে ও প্রাণানন্দে পরিপ্লুত হইয়াছি।

তুমি কি তপস্বিনী শকুন্তলার শোক-সঙ্গীতে বিমোহিত হইতে পারিয়াছ! শকু-ন্তলা প্রেমের নির্ঝরিণী—পবিত্র শোকের পরম আধার—মহত্ত্বের মধুর উৎস। তাঁহা-রও সুদুস্তর পরীক্ষা আছে—নিগ্রহের ভীষণ শাসন আছে—আত্মোৎসর্গের বিচিত্র লীলা-ভিনয় আছে। তিনিও কাঁদিয়াছেন; প্রেমের পূজায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন! নানাভাবে শোকের উপাসনা করিয়াছেন। কিন্তু, যে অগাধ অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য, যে লোকাতীত ভোগ-সুখ-স্পৃহাশূন্যতা—যে এক-প্রতিষ্ঠ হৃদয়াবেগ—বৈদেহী-প্রেমের প্রাণ ও প্রস্রবণ, শকুন্ত-লার তরল-শোকে তাহার অনেক অভাব। শকুন্তলা-শোকে ইন্দ্রিয়াবেগের সর্ব্বাঙ্গীণ অভাব নাই;—ভোগ-চাঞ্চল্যের অভিনয় আছে;—স্বার্থপরতার সমূল উৎসাদন হয় নাই;—আত্ম-সুখ-চিন্তার লীলা আছে;—সেই জন্যই শকুন্তলা বিরহে বিকল ও হতাশ। আর এক কথা। বিচ্ছেদের প্রথমাভিঘাতে শকুন্তলা বাহ্যজগতে একেবারে উদাসীন; এতাদৃক্ ঔদাসীন্য শোকের নিসর্গ সিদ্ধ ধর্ম্ম, কিন্তু, যে উদাসীনতা মনুষ্যকে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অত্যুচ্চ ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য মহাগ্রাম হইতে দুর্ব্বারবেগে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে, তাহা অনেক বিষয়ে, বহু অবস্থায়, বিবিধভাবে অভিলষণীয় হইলেও, শোকেরই পারমার্থিক নামে সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। রূপজ মোহ—ইন্দ্রিয় আকর্ষণ—শকুন্তলা শোকের

মূলসূত্র; পরিণক্তি ভোগ-লালসার সম্পর্ক-শূন্য- হইলেও প্রারম্ভ রূপ-তৃষ্ণার বিলোল ভাবে বিকৃত ও বিদূষিত। শোকের আলেখ্যাঙ্কনে মহাকবি কালিদাস জগদ্বন্দ্য লোক-গুরু কবি-গুরু বাল্মীকির অনেক পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। শোকের সরলতা ও পবিত্রতায়—মহত্ত্বের সর্ব্বাতিশায়ি গৌরবে,—আত্মসুখ পরায়ণতার সর্ব্বাঙ্গীণ তিরোধানে,—লোক ললাম-ভূতা সীতার সহিত ভোগবিলাসবতী চপল-তরল-রসময়ী শকুন্তলার কোন রূপেই তুলনা হয় না। এই অংশে মহত্ত্বের পবিত্র অখণ্ড উৎস স্বরূপ প্রকৃতির মর্ম্মার্থদর্শী মহাকবি ভবভূতিও স্বভাবের চিরন্তন উপাসক কালিদাসকে অনিবার্য্য বেগে বহু পশ্চাতে রাখিয়া স্বকীয় গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম, শোকের নামে অধঃপাতের পাপ-বিগ্রহের পূজা করিও না; মহত্ত্বের সুবর্ণময়ী দেবপ্রতিমা উৎপাটিত করিয়া বিকৃত মোহের উপাসনা করিও না, এবং কবিতার বিশ্ববিমোহিনী সাধীয়সী গীতি বিস্মৃত হইয়া, ইন্দ্রিয়বিকারের অর্চ্চনা করিও না। প্রেম নিত্য অনাদিসিদ্ধ মহা বস্তু;—শোক প্রেমোত্থ স্বর্গীয় মহিমময় সারার্থ;—মহত্ত্ব মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি। প্রেমে শোক-প্রতিষ্ঠা;—শোকে তন্ময়ী আত্মবিস্মৃতি;—আত্মাহুতিই জীবের চরম-লক্ষ্য মহত্ব;—কেন না, আত্মোৎসর্গে অনন্তের অসীম বিস্তারে মানবের অনন্ত বিবৃদ্ধি।

শ্রীশশিমোহন বসাক।

অভিশাপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপ্রত্যাশিত বিপদ।

সত্যেন্দ্রনাথ কমলচকে পৌঁছিয়া শুনিলেন, যে ইতিমধ্যে প্রজাদিগের সহিত একটি সামান্য ভাবের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ভীষণ মারামারির সূচনা বুঝিয়া নায়েব রসিকলাল, প্রেরিত সংবাদের কোন উত্তর অথবা সত্যেন্দ্রনাথের আগমন-প্রতীক্ষায় সহসা কোন কার্য্য করেন নাই। সত্যেন্দ্রনাথ নিশ্চয় আসিবেন না, তাঁহার মনে ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিয়াছেন প্রভুর অন্য আদেশ না হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে, তাহাই করিবেন। সত্যেনের আগমনে রসিকলাল [illegible]া হইতে যেন কতকটা বিমুক্ত হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে সত্যেন অবগত হইলেন, যে দেবীগড়ের দত্তদের নিকট দুর্দ্দমনীয় প্রজারা

প্রাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহারা ভরসা প্রদান করিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিসকলকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়াছেন।

দেবীগড়ের দত্ত মহাশয়েরাও প্রাচীন ও প্রতাপশালী জমীদার। রায়েদের মহলের পার্শ্বেই ইঁহাদের জমীদারী। অনেক দিন হইতেই উভয় জমীদারদিগের মধ্যে মনোবিবাদ চলিতেছিল। এক্ষণে পুনরায় নূতন বিবাদের সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সত্যেন্দ্র নাথ তেজস্বী পুরুষ, যৌবনসুলভ উত্তেজনা বশতঃ দত্তদের নাম শুনিয়া তিনি উপযুক্ত পাইক ও নগ্দিদিগকে,সেই সকল প্রজাদিগকে যে কোন প্রকারে হউক ধরিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পলিতকেশ বৃদ্ধ রসিকের একবারে এরূপ হুকুম দেওয়া মনোমত কার্য্য হইল না, তিনি বেস বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাঠিন্য অবলম্বন করিলে ফল বিপরীত হইবে। সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইল না।

পাইক লাঠিয়ালগণ যথাকালে কতিপয় প্রজাকে বন্ধন করিয়া ধরিয়া আনিল। সত্যেন ও কাছারির সমুদায় আমলাবর্গ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, অদ্য দত্তদিগের লোকজন ও প্রজাগণের সহিত মহাযুদ্ধ ঘটিবে। তাহার কিছুই হইল না; অথচ কএকজনকে ধরিয়া আনিল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাহাদিগকে কাছারিতে আনিতে সত্যেনের প্রেরিত লোকেরা বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল, এক আধ ঘা আঘাতও কেহ কেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার প্রতিশোধে তাহারা যেরূপ প্রহার করিয়াছিল তাহা ভয়ানক। দুষ্ট প্রজাগণকে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া এরূপ ভীষণরূপে প্রহার করিল যে, তাহাদের মধ্যে দুইজন নিতান্ত যখম হইয়া পড়িল। এবং একজন হতচৈতন্য হইয়া মৃতবৎ হইল। সত্যেন্দ্রনাথ ইহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং সকলকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। যে ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার নড়িবার সামর্থ্য ছিল না এবং ভালরূপ জ্ঞানসঞ্চার একবারও হয় নাই, এরূপ অবস্থায় তাহা-ভালমন্দ না দেখিয়া সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া নায়েব কোন মতেই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সুতরাং কাহাকেও মুক্তি প্রদান করা হইল না, বরং নিতান্ত প্রহৃত প্রজাত্রয়কে ঔষধাদি দেওয়া হইল। পরদিন প্রাতে দুইজনকে অনেক সুস্থ দেখা গেল, কিন্তু যে ব্যক্তির চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছিল, তাহার দেহে বিষমজ্বর প্রকাশ পাইল। সমস্তদিন যাতনা ভোগের পর রাত্রিতে তাহার জীবলীলা শেষ হইয়া গেল।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে একবার এইরূপ খুন হইয়াছিল,তখন পুলিসের প্রতাপ এত অধিক ছিল না, তাহারা বড় বড় জমীদারদিগের আয়ত্তের মধ্যে থাকিত। দুই একটা খুন হইলে, কখন কখন, তাহার কোন প্রকার একটা তদন্তও হইত না। সুতরাং, সে সময়ে খুন হওয়াতে তেমন কোন

গোলযোগ হয় নাই। এক্ষণেও পুলিস অনেক ধনবান্ জমীদারের বশীভূত থাকে; কিন্তু ইংরেজ রাজের সুশাসনের গুণে এখন তাঁহারা পূর্ব্বের মত তত স্বল্পে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। নবীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত জমীদারতনয় সত্যেন্দ্র নাথ এই প্রথম ও আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি ও রসিকলাল পরামর্শ করিয়া রাত্রিতেই গোপনে সেই লাস কোন গুপ্তস্থানে প্রোথিত করাইলেন; এবং অবশিষ্ট অবরুদ্ধ প্রজাগণকে কথা প্রকাশ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া, এবং অনেক ভয় দেখাইয়া, পরদিন ছাড়িয়া দিলেন।

খুনের কথা কিন্তু শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ধনী লোকের বাড়ীতে এরূপ ঘটনা ঘটিলে, একশ্রেণীর লোকের নিকট ইহা একটা সুযোগ বলিয়া বিবেচিত হয়। হত ব্যক্তির কোন আত্মীয় ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমে জমীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে ভরসা করিল না, তথাপি পুলিসের ইন্‌নেস্পক্টার, দারোগা প্রভৃতি একটা সুযোগ বুঝিয়া তদন্তের নিমিত্ত কমলচকের কাছারিতে উপস্থিত হইল। তাহারা খুনের তদারক করিতে আসিলেও মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা নহে, অর্থসংগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা সে উদ্দেশ্যসাধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে চিরশত্রু দত্তদের উৎসাহ ও প্ররোচনায় মৃত প্রজার কোন আত্মীয় ফরিয়াদী হইয়া রায়দের সহিত মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইল। দিনাজপুরের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। দত্তেরা প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোপনে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, নিজ প্রজাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত সাক্ষীব্যবসায়িদিগকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে লাগিল। সত্যেন্দ্রনাথ অকাতরে জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিয়া অনেক বিপক্ষ সাক্ষীকে বশ করিলেন বটে, কিন্তু বিচারককে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। তিনি সাক্ষ্য দ্বারা মোকদ্দমার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া মোকদ্দমা সেশনে সোপরদ্দ করিলেন। যথাসময়ে বিচার হইল, সত্যেন্দ্রনাথের তিন মাস কারাবাস ও পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইল। সত্যেন অনেক অর্থব্যয় করিয়া সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করাইয়াছিলেন যে, হতব্যক্তির হৃদ্‌রোগ ছিল, আর ঐ ব্যক্তি যে দিবস আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর দিন জ্বরে মৃত্যু হয়। এক ডাক্তার তাঁহার পক্ষে এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেন যে, হতব্যক্তির মৃত্যুর কারণ প্রহার নহে, উহা একটা উপলক্ষ মাত্র, জ্বর ও হৃদ্‌রোগেই তাহার প্রাণ ত্যাগ ঘটিয়াছে। এই চিকিৎসক যদি গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কোন বড় ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে হয়ত সামান্য অর্থদণ্ড দিয়াই সত্যেন নিষ্কৃতি পাইতেন। যাহা হইবার হইল, সত্যেন্দ্রনাথ অনেক টাকার জামিনে অব্যাহতি পাইলেন। তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমার আপিল করিলেন।

বিপদ বা দুঃখের সময় প্রিয়জনকে দেখি-

বার বাসনা স্বভাবতই মানবের মনে প্রবল হইয়া থাকে। সত্যেন্দ্র নানা দুর্ভাবনায় ও অপমানে বড়ই ম্রিয়মাণ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রাণের হিরণ্ময়ীকে একবার দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুলিত হইল। সত্যেন দিনাজপুরে আসিয়া হিরণকে অধিক পত্র লিখিতে পারেন নাই, সবে মাত্র তিন খানি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে একখানিও পান নাই। যে হিরণ পাঁচ দিবস অদর্শন ঘটিলে, পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে, এত বিপদের সময়, একখানিও পত্র না পাইবার অন্য কোন কারণ না দেখিয়া, সত্যেন মনে মনে স্থির করিলেন,—নিশ্চয়ই হিরণ্ময়ীর কোন ব্যাধি হইয়াছে, পাছে তিনি বিশেষ চিন্তিত হন, এই কারণে হিরণের আদেশ বা ইচ্ছামত অপরেও এ সংবাদ লিখেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ একে মানসিক কষ্টে ও পত্নীর বিরহে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহার উপর এই কল্পিত দুশ্চিন্তায় তাঁহাকে অধিকতর কাতর করিতে লাগিল। তিনি হাইকোর্টের মোকদ্দমার তদ্বির করিতে কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে কএকদিন বাটীতে থাকিয়া যাইবেন, এইরূপ মনস্থ করিলেন। সম্প্রতি তিনি হিরণকে তাঁহার সন্দেহের কথা লিখিয়া একখানি পত্র পাঠাইলেন, উত্তরে কোন পত্রাদি না পাইলে সকল কার্য্য ফেলিয়া বাটী যাইতে হইবে তাহাও লিখিয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আরম্ভ।

কেবল মাত্র ইচ্ছা থাকিলেই সকল সময় কার্য্য করা যায় না, সুযোগ ও সুবিধা থাকা একান্ত আবশ্যক। সতীশচন্দ্র হিরণ্ময়ীর নিকট উপেক্ষিত হইয়া প্রতিশোধ বাসনা পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, সত্যেন ও হিরণ উভয়ের অবিশ্বাস ও উভয়ের চরিত্রে উভয়ের সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে না পারিলে তাঁহার যাতনার উপযুক্ত প্রতিশোধ হইবে না। আর যদ্যপি হিরণ্ময়ীর মনে স্বামীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে হয় ত একদিন তাঁহার বিমল প্রেম, প্রকাশ্যে না হউক গোপনেও উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটিতে, পারে। তিনি বেস বুঝিয়াছেন, যেমন পাত্রপূর্ণ থাকিলে তাহাতে আর জল ধরে না, সেইরূপ একের ভালবাসায় হৃদয়পূর্ণ থাকিতে, অপরের ভালবাসার স্থান হওয়া অসম্ভব।

সত্যেনের মাণিকনগরে অনুপস্থিতিতে সতীশ ভাবিলেন, এই সময়। তিনি তদবধি সত্যেন্দ্র নাথের নামে যে কোন পত্র মাণিকনগরের ডাকঘর হইয়া যায়, তাহার সকল গুলিই উন্মোচন করিয়া দেখেন। হিরণ্ময়ীর লিখিতগুলি সত্যেনকে প্রেরণের পরিবর্ত্তে নিজের নিকটে রাখিয়া দেন এবং সেই প্রকার হিরণের নামের পত্রগুলিও তাঁহার কাছে রাখেন। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে কেহ কাহারও পত্র পান না।

সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়া যাওয়ার পর, প্রায় দেড়মাস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অভাবে শান্তিকাননের বিশালপুরী যেন নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। মোকদ্দমার বিচারফল শুনিয়া আত্মীয়, সুহৃৎ কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত। হিরণ্ময়ী এই সল্প সময়ের মধ্যে পতির চিন্তায় ম্লান হইয়াছেন। পনর দিবসের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, আর-আজি দেড় মাস হইয়া গেল, তাঁহার একখানিও পত্র পর্য্যন্ত না পাইয়া হিরণ মনে মনে মোকদ্দমা সংক্রান্ত কত বিপদের কল্পনা করেন। তিনি মাধবের নিকট হইতে স্বামীর শারীরিক কুশল বার্ত্তা জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান বিপদের সীমা কিরূপ, তাহা স্পষ্টরূপে কাহারও নিকট হইতে জানিতে পারেন না। বিপদ, ব্যাধি অপ্রত্যক্ষ দূর হইতে যত অধিক বোধ হয়, অধিকাংশ সময়, বাস্তবিক তত অধিক হয় না। সত্যেন নিকটে থাকিলে হিরণের মনে এত চিন্তা ও কষ্ট হইত কি না, সন্দেহ। তাঁহার অদর্শনে বিশেষতঃ এতাবৎ এতগুলি পত্র লিখিয়া, একখানিরও উত্তর না পাওয়াতে, তাঁহার মন দিনে দিনে অশান্তিময় হইতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ক্রমে অধীরা হইয়া উঠিলেন। অমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি প্রাণনাথের সবিশেষ সংবাদ জানিতে পারেন, এই ভাবিয়া তিনি একবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সত্যেন্দ্র নাথের ইচ্ছানুসারে হিরণ আপন অনিচ্ছাসত্বেও অমরের সহিত কথা কহিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। সত্যেন চলিয়া যাওয়ার পর অমর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন আর শান্তি-আবাসে আসেন না, মাঝে মাঝে আসিয়া হিরণ্ময়ীর শারীরিক কুশল সংবাদ লইয়া যান। অদ্য হিরণ্ময়ী ডাকিয়াছেন শুনিয়া অমর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সত্যেনের বাটীতে অবর্ত্তমানে অমর ইতিপূর্ব্বে কখনও হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তিনি আসিয়া সদরের দিকের একটি ঘরে বসিলেন। হিরণ সংবাদ লইয়া সেই প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, —"বৌদিদি, এত রোগা হয়ে গেছ, অসুখ হয়েছিল কি?"

"না, অসুখ হয় নি, ঠাকুরপো তুমি আর আমাদের বাড়ি আসনা কেন, খোকা, বৌ সব ভাল আছে?"

"সব ভাল আছে। আমিত প্রায়ই আসি, তোমাদের খবর নিয়ে যাই, আজ আমায় ডেকেছ? বৌদিদি, তোমার অসুখ হয় নি তবে কি সত্যেন দার জন্য ভেবে ভেবে এত রোগা হয়ে গেছ?"

"ঠাকুরপো সেই জন্যই তোমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলুম, তুমি কোন চিঠি পেয়েছ কি? আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁর একখানিও চিঠি পাই নাই।"

"দিনাজপুর যাবার দশ বার দিন পরে একখানি চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে লেখাছিল সত্যেনদা তোমার কোন চিঠি পায় নি। তারপর আর কোন পত্র পাই নাই। তুমি

কি এপর্য্যন্ত একখানাও চিঠি পাও নাই, তুমি লিখেছিলে ত ?

"আমি সাতখানি চিঠি লেখেছি; তিনি একখানিও লিখলেন না, এমন ত আর কখনও হয় নাই। ঠাকুরপো! আমার বড় ভাবনা হয়। তাঁর কোন অসুখ হলো, কি মকদ্দমা কিছু খারাপ হলো, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমায় কেহ কিছু বলে না, তুমি কিছু জান কি ?"

এই কথা বলিতে বলিতে হিরণ্ময়ীর চক্ষে জল দেখা দিল, তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। অমর বলিলেন,—আমি কাল শুনেছি সত্যেনদা ত এখন জামিনে খালাস হয়েছেন, হয়ত কলিকাতার হাইকোর্টে আপিল করবে। বৌদিদি তুমি কিছু ভেবো না, বোধ হয় মকদ্দমায় ব্যস্ত থাকাতে তোমায় লিখতে পারে নি। অসুখ করে নি নিশ্চয়, তা হলে কি আর সেখানে থাকৃত ?"

"ঠাকুরপো, এতদিনের মধ্যে তিনি একখানিও চিঠি লেখবার সময় পেলেন না, এ-কথা যে আমি কিছুতেই মনে আনতে পারি না। জামিনে খালাস বল্চ, মকদ্দমা কি শেষ হ'য়ে গেছে ?"

এই সময় গোলাপি নাম্নী এক দাসী উপরে আসিয়া হিরণকে বলিল,—"বৌদিদি তোমার বাপের বাড়ী থেকে একজন মানুষ একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে, বল্‌চে তোমার মায়ের কি ব্যারাম হ'য়েছে।"

অমর নিম্নতলে চলিয়া গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে একখানি পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"চিঠি দাদার নামে।"

"লোক কি বললে ?"

"তোমার মায়ের অসুখ হয়েছে, কি অসুখ, কতদিন হ'য়েছে, তা ঠিক্ বলতে পার্‌লে না; তোমার যাবার জন্য বলতে এসেছে। সে লোক বেসী ক্ষণ থাক্‌তে পার্‌বে না, এখনই চলে যাবে, কামদেবপুরের রামচরণ ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।"

হিরণ্ময়ী মাতার পীড়ার কথা আদৌ শোনেন নাই। এ অবস্থায় এই নূতন হৃদয়-বিদারক কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি ক্ষণেকের জন্য যেন জ্ঞানহারা হইলেন। তৎপরে অমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ খোল্‌তে কোন দোষ আছে কি ?"

অমর বলিলেন,—"এ অবস্থায় খোলায় কোন দোষ দেখি না।"

পত্র পাঠ করিয়া হিরণ একেবারে সেই কঠিন হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ লেখা ছিল।

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ,"—

"বাবাজী আজি ১২ দিবস হইল শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর গর্ভধারিণীর জ্বর। এক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার দাঁড়াইয়াছে। অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইতেছে। চিকিৎসকেরা জীবনের আশার কথা কিছু বলিতে পারেন না। কি হইবে, ভগবান্‌ই জানেন। তোমার মাতার হিরণ্ময়ীকে ও তোমাকে একবার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আর হিরণ্ময়ীও এ সময় একবার না দেখিতে পাইলে বড় আপশোষ

থাকিয়া যাইবে। অতএব বাবাজীউ তুমি কন্যাকে এ সময় একবার পাঠাইতে কোন মতে অন্যথা করিও না। তুমিও যদি পার একবার আসিলে বড় ভাল হয়। উপস্থিত আনিতে যাইবার উপযুক্ত দাস দাসী আমার কেহ নাই, তুমি তোমার লোকজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিও। এ বাটীর আর আর সব মঙ্গল, তোমাদের কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। হিরণ্ময়ী মাতা ও শ্রীমতী ধুরী দিদিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি"—

"সদা শুভাকাঙ্খ্যায়ী শ্রীবীরেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ।"

জননীর প্রতি কন্যার টান যতটা, বুঝি আর কাহারও প্রতি কাহারও এত অধিক টান নাই। হিরণ এই আকস্মিক দুঃসংবাদে মাতার জন্য অতিশয় কাতর হইলেন। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন। সত্যেনের অনুমতি লইয়া যাইতে হইলে, এ জনমে মাতার সহিত হয়ত আর দেখা হইবে না, এই মনে করিয়া হিরণ্ময়ী ঠাকুরমাকে বলিয়া নিজ ইচ্ছায় পর দিবস দ্বারবান, দাসী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে গমন করিলেন। বলিয়া গেলেন, সত্যেন যদ্যপি ইতিমধ্যে আসেন, তাহা হইলে যেন একদিনের জন্যও মাতাকে দেখিতে যান।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিরাশা ও দুশ্চিন্তা।

সত্যেন্দ্রনাথ পত্নীর নিকট হইতে পত্রের আসার উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করিয়া যখন হতাশ হইলেন, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বেই বাটী ফিরিলেন। হিরণ্ময়ী যে দিন পিত্রালয়ে যান, সেই দিন ঠিক্ সন্ধ্যার সময়, সত্যেন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। অপরের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি একবারে আপন কক্ষে হিরণকে দেখিতে চলিলেন। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরমার সহিত সাক্ষাৎকার হইল, তিনি শরীর ও মোকদ্দমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হিরণ এখানে নাই, অদ্য প্রাতে কুসুমহাটিতে মাতাকে দেখিতে গিয়াছেন, ইহাও ঠাকুরমার মুখে প্রথম শুনিলেন। ইহা শ্রবণে তাঁহার মনোমধ্যে যে ভাব উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া এবং তজ্জন্য হিরণ্ময়ীর মনের কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে, তিনি সত্যেনের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া নিজ মনে চলিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। তিনি ভাবিলেন,—'যাহাকে দেখিবার জন্য এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমি বাটীতে আসিলাম, যে হিরণ আমার আশায় পথ চাহিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে, সেই প্রাণাধিক হিরণ আমার আসিবার সংবাদ পাইয়া আর একদিনও অপেক্ষা করিতে পারিল না। যে অদর্শনের ফলে আমার এত ভাবনা, সেই অদর্শনে ও আমার এই বিপদে হিরণ কি বিপদ বোধ করে না? রমণীর ভালবাসা কি তবে এইরূপ? আমার এই

বিপদের সময় দেখিয়া সেও আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! হিরণ! প্রাণাধিক তুমিত কখন এমন নও। তোমার প্রেমের যে আমি কখনও সীমা করিতে পারি নাই, তোমার মত স্ত্রী পাইয়া, আমি যে আপনাকে কতদিন সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছি। না, না, তোমার ভালবাসায় সন্দেহ করাও পাপ। এ দোষ তোমার নয়, আমারই অদৃষ্ট মন্দ; নচেৎ অকস্মাৎ আমার এ সুখের সাগরে দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে কেন? আমাদের বংশে যাহা কখনও ঘটে নাই, তাহা ঘটিবার উদ্যোগ হইবে কেন? এখনও ভাগ্যে কি আছে, কে জানে? বড় কষ্টে এখন আমার দিন গুলি যাইতেছে, এ মন্দ সময়ের অবসান কতদিনে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? হিরণ, বড় আশা করিয়াছিলাম যে, এই দুঃখের সময়ে দুইদিনের জন্য তোমায় দেখিয়া তৃষিত,—তাপিত-প্রাণ শীতল করিব, তাহা হইল না। কমলচকের উন্নতি সাধনের জন্যই তোমাকে ছাড়িয়া দিনাজপুরে যাইলাম, কিন্তু হইল কি; আবার তোমার ব্যবহার যাহা দেখিতেছি, তাহাও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পীড়ার সন্দেহ করিয়া পত্র না লেখার যা হয় একটা কারণ ঠিক্ করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতেছি তাহাও নয়। এই সকল ভাবিয়া বড়ই আশঙ্কা হয়, মনে হয়—বুঝি এতদিনে আমার কঠিন পাপের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। হিরণ! তোমার শারীরিক কুশলের কথা শুনিয়া, যদিও আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক গোলমালে পতিত হইতে হইয়াছে, তথাপি একটি দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। যেখানে থাক ঈশ্বর তোমায় কুশলে রাখুন। কিন্তু দেখো হিরণ, যেন তোমার এ দুর্ভাগা সত্যেনের প্রতি সে অমল ভালবাসার লাঘব না হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন না, রাত্রিতে একাকী শূন্যগৃহে বসিয়া কতই ভাবিলেন। ঠাকুরমা ভিন্ন অপর সকলে মনে করিলেন, মোকদ্দমার চিন্তায় তিনি এতাদৃশ কাতর হইয়াছেন। পরদিন প্রাতে কাছারি বাটীতে যাইলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। সমস্ত দিনের মধ্যে অমর একবারও আসিলেন না দেখিয়া, বৈকালে তাহার কাছে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল তিনি কার্য্য বশতঃ আহারাদির পর অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

কলিকাতায় যাইবার বিশেষ আবশ্যক থাকাতে, শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে দেখিতে যাইতে পারিলেন না, তিনি কেমন আছেন সংবাদ লিখিতে লিখিয়া পর দিবস এক পত্র কুসুমহাটিতে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে মানবের দশা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে এক্ষণে সত্যেনের সুখের দশা চলিয়া গিয়া দুঃখের দশা পড়িয়াছে। তিনি যে কলিকাতা মহানগরীকে এককালে পৃথি-

বীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের স্থান দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কলিকাতা তাঁহার পক্ষে বিষবৎ অনুমিত হইতে লাগিল। এ রহস্যময় জগতে কোন্‌টি সুখের আর কোন্‌টি দুঃখের, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আজি যাহা সুখের, কালি তাহা দুঃখের; অথবা যাহা আমার সুখের, তাহা তোমার দুঃখের, যাহা তোমার সুখের, তাহা আমার দুঃখের। প্রকৃত পক্ষে সুখ দুঃখ ভিন্ন নহে, উহা একই বৃক্ষের দুইটি ফল মাত্র। সেই তরুকে আমরা অদৃষ্ট বলিয়া থাকি। যেমন অনুপান ভেদে এক স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি আরোগ্য করে, সেইরূপ অবস্থাভেদে একই মন কখন সুখময় কখন দুঃখময় অনুমিত হইয়া থাকে। সত্যেন্দ্র নাথের কলিকাতায় থাকা বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। নিত্য বহু অর্থপাত ও দারুণ দুশ্চিন্তা এবং তাহার উপর পত্নীর চিন্তায় তাঁহার দিন গুলি বড় অসুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ ও গোলাপ।

পল্লীগ্রামের একটা খেড়োঘর, চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের দেওয়াল। পথের দিকে একটি কবাট ও ছোট কাটা জানালা এবং একটি রোয়াক। জানালা ও কবাটের মধ্যের দেওয়ালে একখানি তক্তায় স্থানে স্থানে আল্‌কাতরা বিচ্যুত, কএকখানি ছাপা ও হস্ত লিখিত অর্দ্ধছিন্ন কাগজ আঁটা, তক্তা পেরেক দ্বারা সংবদ্ধ। আর কবাটের মাথায় বড় বড় সাদা অক্ষরে 'ভিতরে প্রবেশ নিষেধ' লেখাঙ্কিত একখানি ছোট কৃষ্ণবর্ণ টিন ঝুলান থাকিলেও, অনেকের উহার ভিতর তামাকু সেবনের আড্ডা। ঘরের ভিতরে একটি সিন্দুক, একটা মসি ও তৈল-চিহ্নপূর্ণ আম্রকাষ্ঠের পুরাতন টেবিল, তাহার উপরে একটি মসিধান, একটি লেখনী, ছাপার মোহর, কালী, প্যাড্‌, কতকগুলা চিঠি প্রভৃতি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। ঘরের অন্য আসবাবের মধ্যে একখানি কাষ্ঠের বেঞ্চি ও একখানি ভগ্নপ্রায় জীর্ণ চেয়ারই উল্লেখযোগ্য। এই আসনের উপর একটি অর্দ্ধমলিন জামামাত্র পরিহিত বাবু একতাড়া পত্র হস্তে লইয়া এক এক খানি দেখিতেছেন আর—যদুনাথ রায়—মহেশতলা, তারিণী পলশাঁই—হেলাপুকুর, গণেশপাস,—আমদাবাজ, সেক করিম—ধাড়োপাড়া, রামধন চক্রবর্ত্তী—রায়পাড়া, কানুবেহারা হারাণ কুণ্ডুর বাড়ী সিটে, প্রভৃতি বলিয়া মেজেয় ফেলিয়া দিতেছেন, আর দুইটি কৃষ্ণকায়, কৃশ, উড়ানিমাত্র দ্বিবস্ত্রপরিহিত সামান্য লোক বিনা বাক্যব্যয়ে সেইগুলি গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। এমন সময় একটি শ্যামাঙ্গী অবগুণ্ঠনহীনা নারী, বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চত্রিংশ, হস্তে দুইগাছি রৌপ্য নির্ম্মিত চুড়ি, পরিধানে একখানি রেলপেড়ে বিলাতী সাটি—জানালার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বাবু শশব্যস্তে বলিলেন,—"গোলাপ! কবে এলে?"

"এই আজ এসে নেয়ে খেয়ে একটু শুয়েই আস্‌চি।"

তখন ঐ বাবু বাহিরে আসিয়া ঘরের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন, স্ত্রীলোকটিও তাঁহার সঙ্গে আসিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বৌদিদি এসেছে ?"

"বৌদিদি না এলে বুঝি আমি একলা এলুম।"

"তোমাদের দেখে তাঁরা সব কি বল্‌লেন্ ?"

"সেখানে আমাদের দেখে সব অবাক হয়ে গেল, বৌদিদির মায়ের অসুখের কথা শুনে সব হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে কেউ শত্রুতে এমন চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল। আমার তখন যে হাঁসি পেলে, তা আপনাকে আর কি বল্‌ব বাবু। আমি অমনি বল্‌লুম,—মা, আমরা ওসব শুনে অবধি আর ভেবে বাঁচিনে, বৌদিদি কাঁদ্‌তে লাগল। তা মিছেই হোগ মা।"

"তুমি না হলে কি গোলাপ এ সব হয় ?"

"না বাবু, বড় মানুষের বাড়ী বড় ভয় হয়, যদি জান্‌তে পারে, তা হলে আমার মাথা থাক্‌বে না।"

"জান্‌বে কি করে, তুমি ত আর কিছু করচ না; আমায় কেবল একএকবার সব খবর দিয়ে গেলেই হবে। তারপর এখানে এসে কি হলো ?"

এখানে খুব মজা হয়েচে, আমরা যে দিন যাই, সেই দিনই বাবু এসেছিলেন। শুন্‌লুম বৌদিদি বাপের বাড়ী গেছে শুনে বাবু খুব রাগ করেছেন। কারও সঙ্গে ভাল করে কতা পর্য্যন্ত কন্‌নি, পর দিন আবার কলকাতায় চলে গেছেন্।"

গোলাপ, তোমার কাপড়ের ভিতর ওখানা কি, কার চিঠি ?"

"বাবু, ও আমি বল্‌ব না, বৌদিদি কা কেও দেখাতে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করে দিয়েচে।"

"বৌদিদি বুঝি বাবুকে চিঠি লিখ্‌চেন, ডাকের বাক্সে ফেল্‌বে ত, তা আমায় দাও না।"

গোলাপ দাসী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—"না বাবু, কাকেও দিতে বারণ করেচে, আমি আপনি ফেল্‌ব।"

"আচ্ছা তুমিই ফেলো, আজ অমর যায় নি ?"

"না ; আচ্ছা ওর কি ভরসা, বাবু থাকলে যা হোগ ; সে দিন কি ব'লে দুজনে একলা ঘরে ব'সে অতক্ষণ ধরে কথা কইতে লাগ্‌ল।"

"দাঁড়াও না, ওর দফা শেষ কর্‌চি, জান না কি ওর মতলব্ ?"

আমরা বাবু গরীব মানুষ, অত জানি নে। তবে ওর যে স্বভাব ভাল নয়, তা আমি জানি।

"গোলাপ, তুমি যখন যা হয় আমায় এসে বলে যেও।"

"সব সময় ত বাবু আস্‌তে পারিনে। একবার ঘরে মাসীর সঙ্গে দেখা করে যাব, আর দাঁড়াব না—চল্‌লুম।"

"এখন যাও, কিন্তু অমর যদি আর এসে কথা কয়, আমায় এসে বলে যেও। এবার

যে দিন আস্‌বে, কিছু দোবো। গোলাপ হাসিতে হাসিতে কাপড়ের ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া চিঠির বাক্সের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।"

এই বাবু মাণিকনগর ডাকঘরের ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার সতীশচন্দ্র। তিনি হিরণ্ময়ীর এই গোলাপ নাম্নী দাসীর দ্বারা অনেক সন্ধান লইয়া থাকেন। গোলাপ মধ্যে মধ্যে দুই দশ আনা সতীশের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। গোলাপ চলিয়া গেল, সতীশ অবিলম্বে বাক্স খুলিয়া পত্রখানি বাহির করিলেন। দেখিলেন সে পত্র হিরণ সত্যেনকে লিখিয়াছেন। পাঠে অবগত হইলেন যে, হিরণ তাঁহার কুসুমহাটীতে যাইবার প্রকৃত কারণ বিবৃত করিয়া নিজ অপরাধের জন্য নিতান্ত কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; আর একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য একান্ত আকুল বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পত্রগুলির যে দশা করিয়াছিলেন, সতীশ এখানিরও সেই দশা করিলেন। কিন্তু অদ্য এই লিপি পাঠে হিরণের মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন এবং আপনার চরিত্রের প্রতি ঘৃণাবোধ করিলেন। আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন,—"দয়া, মমতা, দুঃখ প্রভৃতি কোমলবৃত্তি সব দূরে চলিয়া যাউক, এ ভয়ানক কার্য্যের জন্য ভয়ানক বৃত্তি আসিয়া সহায়তা করুক।"

সতীশচন্দ্র অদ্য গোলাপের কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার ষড়যন্ত্র বৃথা হয় নাই; ভাবিলেন,—এত দিনে যে বীজ অঙ্কুরিত হইল, কালে ইহাই পল্লবিত, কুসুমিত হইয়া ফলোৎপাদনে সমর্থ হইবে, এখন কেবল দুষ্টকীট ও তৃণভোজী পশুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। তিনি একখণ্ড কাগজ লইয়া অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে নিম্নলিখিত প্রকার লিখিলেন;—

"আপনি অন্নদাতা, আপনার অমঙ্গল দেখিয়া থাকিতে পারি না। রায় পরিবার চিরপবিত্র, ইহাতে পাপ প্রবেশ করিলে সব ছারেখারে যাইবে। বুঝিতে পারিতেছি আপনার এ পত্র পাঠে নিরতিশয় কষ্ট ও দুঃখ হইবে, কিন্তু চখের উপর প্রতিদিন দেখিয়া আর না জানাইয়া কি করিয়া থাকি? তদ্ভিন্ন ইহা না জানান আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আপনি যাহাকে পরম সুহৃদ্ বলিয়া জানেন, তিনিই আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছেন। জানিবেন আপনার স্ত্রীর কুসুমহাটী যাওয়ার একটি গুপ্ত কারণ ছিল। আর অধিক লিখিয়া আপনার মনে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না, আপনি বুদ্ধিমান্, বোধ হয়, ইহাতেই সব বুঝিতে পারিবেন। অদ্য আপনার মনে ভয়ানক ব্যথা দিলাম, আমার অপরাধ লইবেন না। কর্ত্তব্য বিবেচনায় লিখিলাম।"

আপনার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য।

লেখা শেষ হইলে, ইহা একখানি খামে পুরিয়া সত্যেনের নাম ঠিকানা লিখিয়া যথাসময়ে পাঠাইয়া দিলেন। এ দিকে গোলাপ মাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। হিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চিঠি ডাকে ফেলে দিয়ে এলে গোলাপ ?"

গোলাপ বলিল,—"অনেকক্ষণ ফেলে দিয়ে এসেচি, এতক্ষণ কলকাতায় চলে গেল।"

হিরণ্ময়ী স্বামীর ক্ষমাপূর্ণ পত্রের আশায় পথ চাহিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আগুন জ্বলিল।

যেমন পথহারা ভ্রান্ত পথিক, গভীর নিশীথে জনশূন্য প্রদেশে, বহুদূরস্থিত আলেয়ার অলীক ক্ষীণালোক অনুসরণ পূর্ব্বক কল্পনা প্রভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে অগ্রগামী হয়, কলিকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ সেইরূপ বন্ধুহীন, হৃদয়হীন হইয়া একটি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর সামান্য বিষয়কে যখন কল্পনা সহায়তায় অতি বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন সতীশের লিখিত নামহীন পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইল। যে সন্দেহ-বহ্নি সত্যেনের হৃদয়ে সময়ে সময়ে প্রধূমিত হইতেছিল, জ্বলিয়াও জ্বলিতে পারিতেছিল না, বা সত্যেন জ্বলিতে দিতেছিলেন না, এক্ষণে তাহাতে এই নূতন বিশুষ্ক ইন্ধন সহযোগে ধূমরাশি একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর কোনপ্রকারে তাহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না।

যাহা অসম্ভব, তাহার অনুকূলে শতপ্রমাণ স্বতঃপ্রস্তুত ভাবে তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়া, তাহা সম্ভব করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিলেন,—এতদিন হিরণ্ময়ীর পীড়ার সন্দেহে আত্মপ্রতারণা সাধিত হইয়াছে মাত্র। সত্যেন্দ্রনাথ বহুক্ষণ একাকী করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিলেন। সংসার এক অসীম মরুভূমি সম বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল ইহাই পাপীদিগের কঠোর যন্ত্রণা স্থান। এই দগ্ধক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় পাপী আর একজনও নাই। ভাবিলেন সংসার প্রকৃতই বিষবৃক্ষ; শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, আশ্রয়, অবলম্বন এখানে কিছুই নাই। নীচতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতাই জগতের নিত্যদৃশ্য সামগ্রী। স্বার্থ ভিন্ন সংসারে কেহই কাহারও নহে, বন্ধুতা কপটচারিতার নামমাত্র, আর প্রণয়, ভালবাসা এগুলি জীবনের এক একটি অলীক স্বপ্ন।

দিবারাত্রব্যাপি মোকদ্দমার অশ্রান্ত চিন্তা ও ভাবনার সহিত অজস্র অর্থব্যয়, তাহার উপর এই নবীন চিন্তা তাঁহাকে দিনে দিনে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনা দিতে লাগিল। সন্দেহ-বহ্নিতে চিন্তার অনল মিলিয়া শত শিখা বিস্তার করিয়া সত্যেনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। যে চিন্তা মনে আসিলে মাথা ঘুরিতে থাকে, চক্ষে জগৎ অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কর্ণে নিষ্ঠুরতা,—কঠোরতার বিকট হাস্য প্রতিধ্বনিত হয়, সত্যেন আর সে চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিলেন না। তাহার সত্যতাপ্রমাণ করিবার বল হৃদয়ে আর নাই। তিনি সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

আর হিরণ্ময়ী কি করিলেন? হিরণ পিত্রালয় হইতে আসিয়া যখন সত্যেনকে

পত্র লেখেন, তখন মনে করিয়াছিলেন এই-বার নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন পাইবেন, কিন্তু দর্শন পাওয়া দূরের কথা, একখানি সামান্য লিপি হইতেও বঞ্চিত হইলেন। তাহার পর যখন স্বামীর পানদোষের কথা শুনিলেন, তখন হইতেই বুঝিলেন দৈববিড়ম্বনায় তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে—পতির সে অসীম ভালবাসা এক্ষণে হারাইয়াছেন। অভাগিনী নারীকুলের কি আছে? এই অপার সংসার-সাগরে একমাত্র ভালবাসা লক্ষ্য করিয়া রমণী অগ্রসর হইতে থাকে, ইহা হারাইলেই সংসারের আশা, ভরসা, অবলম্বশূন্য হইয়া, মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারায়। পত্রের দ্বারা আর যে কোন সুফল লাভ হইবে, হিরণ্ময়ী মনে এ আশার স্থান দিতে পারিলেন না। সাক্ষাৎকারে, তাঁহার নিকট, যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করা ভিন্ন রোষ অপনোদনের আর কোন উপায় দেখিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অমরকে নিজ মনের কথা জানাইলেন; এবং অনুরোধ করিয়া একবার কলিকাতায় সত্যেনের নিকট পাঠাইলেন।

অমরনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের অন্যায় ক্রোধ ও পত্নীর সহিত অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া অন্তরে ব্যথিত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কোন ভ্রান্তির দ্বারা চালিত হইয়া সত্যেন এরূপ করিতেছেন। তিনি সেই প্রমাদ-অপনোদনার্থ সত্যেনের নিকট গমন করিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়, কলিকাতা রাজধানী রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রাজপথ পার্শ্বস্থ গ্যাসগুলি একে একে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অসংখ্য পথিক, দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া, কেহ বা লাভালাভের চিন্তা করিতে করিতে, কেহ বা বাসায় গিয়া উত্তম রূপে জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার চিন্তা করিতে করিতে, কেহ বা প্রভুর সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে, কেহবা খরচের হিসাব মিলাইতে মিলাইতে, কেহবা নিশাগমে বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিবার কথা ভাবিতে ভাবিতে আপন আপন গন্তব্য-স্থানে চলিয়াছেন। কেরাণি বাবুরা অনেকেই বাজার হইতে আবশ্যকীয় শাকসব্জী বা অন্য আহার্য্য লইয়া চলিয়াছেন, মুটিয়ারা দলে দলে শূন্য ঝাঁকা লইয়া জাতীয় ভাষায় গোলমাল করিতে করিতে চলিয়াছে; কলেজের যুবক-গণ দুই পাঁচজনে মিলিয়া সিগারেটের ধুম উড়াইয়া, কোন সম্পাদক, প্রফেসার, মাসিক বা সংবাদপত্র, অভিনয় বা অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর অযাচিত সার্টিফিকেট দিতে দিতে ফুট পাথের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে; সান্ধ্য ফেরিওয়ালাগণ বিক্রেয় দ্রব্য সমূহ লইয়া আপনাপন নিজস্ব বিভিন্ন বিশেষণ বাহুল্যে চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে; বিলাসী ধনিগণের সুদৃশ্য অশ্বযানগুলি মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া যাইতেছে, আর সর্ব্বোপরি ঐ সকল যানের সহিসগণ গগনস্পর্শী চীৎকার-দ্বারা আরোহীর ধন-গর্ব্ব ঘোষণা করিতে করিতে দৌড়িয়াছে।

এই সময়ে অমরনাথ অনেক অন্বেষণে সত্যেনের বাসার সন্ধান করিয়া এবং তাঁহাকে তথায় না দেখিয়া, তাঁহার ভৃত্যের সহিত বিডন উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানের মধ্যে যে সকল খেলা হইতেছিল, এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু জন-সমাগম কমে নাই। এখানে ওখানে কোথাও দুইজন, কোথাও চারিজন বসিয়া নানাগল্প করিতেছে, একপার্শ্বে ঘাসের উপর একাকী বসিয়া এক যুবক কি ভাবিতেছেন। অমর ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট নীত হইলেন, ভৃত্য বাসায় ফিরিয়া গেল। এই ব্যক্তি সত্যেন্দ্রনাথ, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই উদ্যানে দিবারাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে উদ্যান সমাচ্ছন্ন করিয়াছে, সত্যেন অমরকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন না, অমরনাথ দেখিয়াই চিনিলেন। তিনি বিস্মিতের ন্যায় স্বরে বলিলেন,—"সত্যেন দা!"

"কে অমর!"

"তোমার একি হয়েছে?"

"অমর এখানে এসেছ, আর কেন ভাই?

"সত্যেন দাদা! তুমি যে এত ছেলে মানুষ তা আমি জানতুম্ না, এখানে অমন করে ব'সে কেন? বাসায় এস।"

"চল।"

সত্যেন অমরকে দেখিয়া দুঃখে, ক্রোধে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, তিনি বাসায় পৌঁচিয়া একপাত্র সুরাপান করিলেন। অমর বাসায় গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের মনের ও দেহের এরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"সত্যেন দা, তুমি কি পাগল হয়েচ, বৌদিদি কি এমন অপরাধ করেচে যে, তুমি এত রাগ করেচ? মোকদ্দমার দিন কবে?"

"অমর, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, কিন্তু তোমায় মিনতি ক'রে বল্‌চি হিরণ্ময়ীর সম্বন্ধে কোন কথা আমায় আর বোলো না বা জিজ্ঞাসাও কোরো না।"

"কেন বোল্‌ব না? তুমি কি নিষ্ঠুর! যে তোমার জন্য দিবানিশি কাঁদ্‌চে, তার কথা তুমি শুন্‌বে না! মনে কোরে দেখ দেখি এই কয় মাসের মধ্যে তুমি কি তোমার হিরণকে একখানাও চিঠি লিখেচ?"

"তোমায় পুনরায় আমার কাছে ও নাম কর্‌তে নিষেধ কর্‌চি, অমর! ইচ্ছা হয় অন্য কথা কও।"

"কাল যদি একবার বাড়ী যাও, তা হলে, আর এখন কোন কথা বল্‌ব না, তা না হলে, কি হয়েছে তা তোমায় বল্‌তেই হবে।"

"কেন আমার যাতনা বাড়াও, কি হয়েছে তা আর বল্‌তে হবে? আমার জন্য দিন রাত যে কাঁদে, সে কখনও আমার বাড়ীতে আস্‌বার সংবাদ পেয়ে নিজ ইচ্ছায় অকারণ বাপের বাড়ী বেড়াতে যায়? ভাই! আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, যদি কোন দিন কেহ তার চখে জল দেখে থাকে, তবে তা লোক দেখান, আমি জানি সে বড়

সুখে আছে। আমাকে ভাব্‌বার সময় আর তার নাই।"

"সত্যেন দা, তুমি কি ভয়ানক ভুল বুঝেছ। বৌ দিদি বড় বিপদের খবর পেয়েই কুসুমহাটি গিয়েছিল। তুমি কি বাড়ী গিয়ে সব শোন নি? আর, তোমার বাড়ী আস্‌বার কথা কখনই শোনে নি, তা'হলে আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি যেত না।"

"সব বুঝেছি, সব জানি, অমর! কেন আর তুমি বেসী বুঝাতে এখানে কষ্ট ক'রে এসেছ? এখনও এ হতভাগার সব বুঝ্‌বার ক্ষমতা পূর্ব্বের মতই আছে,—এখনও তত অধঃপতন হয় নাই। যা কখনও বুঝিনি, এইদূরে থেকে তাও বুঝেছি,—জগৎ চিনেছি। কেন আর ভাই কথা বাড়াও?"

"ওঃ—কি মহা ভুল! তোমার মনে এ সন্দেহ কোথা থেকে এলো? তুমি কিছুই বোঝনি, বোঝ্‌বার ক্ষমতাও অতি অল্প। কোন দুষ্ট লোক শ্বশুরের নাম দিয়া শাশুড়ীর মরণাপন্ন অসুখের কথা লিখে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দেয়, সেই জন্যই বৌ দিদি একবার মাকে দেখ্‌তে গিয়েছিল। আমি নিজে সে চিঠি দেখেছি। মায়ের অত বিপদের কথা শুনে কোন্ সন্তান না দেখ্‌তে যেয়ে থাক্‌তে পারে বল ত? আর এতে দোষই বা কি হয়েছে?"

ইহা শুনিয়া সত্যেন মনে মনে বলিলেন, "দেখেছি কেন, লিখেছি বল না?" প্রকাশ্যে সক্রোধে বলিলেন,—"অমর,আর পারি না; যদি ভাল চাও, ত তুমি আমার সম্মুখ থেকে এখনই চ'লে যাও। তোমার সাহস ধন্য! তুমি এখনও আমায় ভুলাতে চাও! এতদিন যে সন্দেহেরও সন্দেহ ছিল, আজ তাহা মিটিল! নরাধম,কপট বন্ধুর বেশে আমারই বুকে ছুরি দিয়ে, আমায় ভুলাতে যাও। তুমি জান না, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করেচ। এখনই আমার কাছ থেকে যাও, আর তোমার মুখ দেখে সে কুলটার কথা ভাব্‌তে পারি না।"

সত্যেন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়া আর একবার মদ্য পান করিলেন। অমর ইহা শুনিয়া একবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; মুহূর্ত্তের জন্য যেন জগৎ শূন্যময় দেখিলেন। তিনি বাক্‌শক্তিহীন হইয়া আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। যেমন জলপূর্ণ ঘটমধ্যে গুরুভার ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড নিক্ষেপ করিলে, উহা তলদেশে পৌঁচিয়া আঘাত প্রদান করে, সত্যেনের এই ভয়ানক বাক্যগুলি সেইরূপ অমরের হৃদয়ের তলদেশে আঘাত করিল। তিনি পরে ভাবিলেন, এক্ষণে আর কোন কথা কহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে বরং ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভব। তিনি বন্ধুর এই মহাপ্রমাদ দর্শনে অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। সম্মুখে থাকিলে তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইবে বুঝিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রাত্রি অতিশয় মানসিক ক্লেশে অতিবাহিত হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীর সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন, অদ্য অমরের কথায় তাহা অধিকতর দৃঢ়

হইল। তিনি ভাবিলেন, অমর তাঁহাকে ভুলাইতে আসিয়াছেন। বিডন উদ্যানে অমরের সহিত যখন প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, সত্যেন তখন অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার করিবার বাসনা ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় তাহাই ঘটিল। তাঁহাকে বড় অধিকক্ষণ যাতনা পাইতে হইল না, সুরা শীঘ্রই আপন কার্য্য করিল। সত্যেন মদিরার নেশায় নিমগ্ন হইলেন।

অমরনাথ পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিফল প্রয়াস।

শান্তিকাননের বৃহৎ অট্টালিকা, রম্য উদ্যান, সকলই আজি এক সত্যেন্দ্র বিহনে অন্ধকার! নারায়ণের অভাবে, লক্ষ্মী থাকিতেও আজি বৈকুণ্ঠ শ্রীহীন। পূর্ব্বের ন্যায় অন্তঃপুরে হিরণ্ময়ী থাকেন, উদ্যানে মালিরা বাস করে, কাছারি বাটীতে আমলাবর্গ প্রতিদিন দপ্তর খুলিয়া বসে, ঠাকুরমা তেমনই হাসিয়া হাসিয়া কাজকর্ম্ম করেন, দ্বারবান্‌গণ তেমনই সাঁজের বেলা "সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুনাথ রঘুরাই-ই" বলিয়া সুর ধরিয়া গান করে, মাধুরী তেমনই নাচিয়া হাসিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করে; কিন্তু সংসারের আর সে শ্রী নাই। বাটীতে দাসদাসী খানসামা আছে, কিন্তু সপ্তাহান্তেও একবার সম্মার্জ্জনী সংস্পর্শ হয় না। ক্রমান্বয়ে জানালা বন্ধ থাকাতে আসবাব পত্রের উপর ছাতা পড়িয়াছে। কৌচ, কেদারা, ঝাড়, ছবি সকলই ধূলিপূর্ণ। কার্ণিসে কার্ণিসে চামচিকার বাসা, ঘরের কোণে মাকড়সার জাল, ছবির গায়ে ঝুল, সাসির ভিতর আলমারির পাশে ইঁদুরের বাসা। বাগানে মালি আছে, তথাপি স্থানে স্থানে বড় বড় ঘাস, উলুগাছ, শিয়ালকাঁটা, কাঁটানটের গাছ জন্মিয়াছে; রাশীকৃত শুষ্কপাতা বাতাসের তাড়নায় গড়াইয়া গড়াইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; পুকুরে পাতা পড়িয়া জল অপরিষ্কার হইতেছে; মনোরম পথগুলির স্থানে স্থানে ঘাস হইয়াছে; টবের গাছগুলি জীর্ণপ্রায় হইয়াছে; লতামণ্ডপে লতাগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে; জলাভাবে অনেক নবীন তরু শুকাইতেছে। ফোয়ারায় আর জল উঠে না, অনেক লাল মাছ বিড়াল কুকুরে মারিয়াছে, আহারের অভাবে বাপীজলে হাঁসগুলি আর তেমন প্রফুল্লভাবে সাঁতার দিয়া বেড়ায় না। গাছে গাছে ফুলগুলি এখনও তেমনই ফুটে বটে, কিন্তু গাছেই ঝরিয়া যায়, সে সৌরভ কাননের নির্জ্জনতার মধ্যেই বিলীন হয়। কাছারি বাটীতে আমলা মুহুরিরা খাতাপত্র লইয়া বসে বটে, কিন্তু প্রতিদিন তাহা খুলিবার অবসর হয় না; [illegible]ক্ষণে গল্প, তাস, তামাকু আর নিদ্রাতেই তাহাদের দিবসের অধিকাংশ কাল কাটিয়া যায়। কেবল বৃদ্ধ মাধব ইহাদের অন্তর্গত নহে। হিরণ্ময়ীর অসীম হৃদয়যন্ত্রণা কেবল সে বুঝিতে পারে; প্রভুর অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মনই অহরহ কাতর থাকে; জগৎ পিতার নিকট সর্ব্বদা

তাঁহার মঙ্গল কামনা করে। এক্ষণে এই বৃদ্ধই হিরণের একমাত্র ভরসা। সংসার-পরিত্যক্ত শচীকান্ত রায়কে বাটীর কুশলা-কুশল জানাইতেও সে ভিন্ন আর কেহ নাই। এক্ষণে অমর আর শান্তিকাননের দিকে দৃষ্টি-পাত পর্য্যন্ত করেন না। অমর কলিকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের দুরাচরণে ও তাঁহার প্রতি অমূলক ভয়ানক সন্দেহের কথা বুঝিয়া অন্তরে ব্যথা পাইয়াছেন। প্রত্যুত্তরে তিনি আত্ম-সমর্থনের কোন কথাই বলেন নাই, বলিলে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই, এই ভাবিয়াই বলেন নাই। তিনি জানেন, এক দিন না একদিন বন্ধুর ভ্রান্তি-অপনোদন হই-বেই হইবে, তখন তিনি ইহার জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবেন। হিরণ্ময়ীর সহিত দেখা সাক্ষাৎকার করিলে পাছে কোন সূত্রে তাহা সত্যেনের কর্ণগোচর হইয়া, সন্দেহ অধিকতর দৃঢ়মূল হয়, এই ভাবিয়া তিনি আর বাটীতে প্রবেশ করেন না। শৈলজাও এক্ষণে কখন এক আধ দিন হিরণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসেন।

স্বামী কর্ত্তৃক অমরনাথের অপমান ও লাঞ্ছনার কথা কিঞ্চিৎ রঞ্জিত ভাবে হিরণ্ময়ীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি তদবধি দুঃখে ও লজ্জায় অমরকে আর ডাকিতেও পাঠান নাই। নির্দ্দোষী অমরনাথ তাঁহারই জন্য অকারণ অবমানিত হইয়া মানসিক কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন ভাবিয়া, স্নেহ-শীলা হিরণ যাতনার উপর যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। শৈলজার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার দ্বারা অমরের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী অনেক ভাবি-য়াছেন, অনেক সময় নিরাশাকে যত্নের সহিত বিতাড়িত করিয়া অন্তরে নূতন আশার স্থান দিয়াছেন, কিন্তু সে আর কতদিন হইতে পারে? ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, এক একটি করিয়া হিরণ সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। পতিব্রতা হিরণ্ময়ী বক্ষে হুতাশন ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করেন, আবশ্যকীয় নিত্যকর্ম্ম প্রতিদিন পূর্ব্বের মত নিজ হস্তে সম্পাদন করেন। যখন হৃদয়ের অ-নল সময়ে সময়ে জ্বলিয়া উঠে, তখন একা-কিনী বিরলে বসিয়া রোদন করেন, মনে মনে চিন্তা করেন, কোন্ পাপে তাঁহার এরূপ হইল। যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্যময় শ্বেত মর্ম্মর-মণ্ডিত পরম রমণীয় তাজমহল দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত অলোকসামান্যা নুরজাহানের কঙ্কালস্তূপের কোন অনুভূতিই হয় না, ইহা যে ভুবনমোহিনী দুর্ল্লভরমণীর বিষাদস্মৃতি, তাহার কথা যেমন কদাচিৎ কোন দর্শকের মানসে ক্ষণেকের জন্য উদিত হয় মাত্র, সেই-রূপ দেবী হিরণ্ময়ীর সুন্দর অনুপম দেহকান্তি দেখিয়া তাঁহার দগ্ধহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কদাচিৎ কেহ তাঁহার বিষাদ-ক্লেশ-বিদলিত অন্তরের একটি দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শুনিতে পান। তিনি মনের দুঃখ সর্ব্বদা গোপনে রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার মনের কথা জানাইবার লোক বাটীতে কেহ নাই। যেমন বিজন বিস্তীর্ণ তৃণশষ্পসমা-চ্ছন্ন মাঠে সহায়হীন সঙ্গীহীন পাদপ একাকী

প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ হিরণ্ময়ী শান্তিকাননের বিশাল ভবনে একাকিনী দারুণ ঝঞ্ঝাবাত সহিতে লাগিলেন।

মাধবের মনে বিশেষ ভরসা ছিল, মোকদ্দমা মিটিলে অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথ বাটী আসিবেন। যথাকালে হাইকোর্টের বিচার শেষ হইল; সত্যেন অজস্র অর্থব্যয়ে কেবল মাত্র অর্থদণ্ড দিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিলেন, কিন্তু তিনি বাটী আসিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে মাধবের ধারণা অন্যরূপ, সে মনে করিয়াছে, সত্যেনের যৌবন সুলভ চরিত্র দোষ ঘটাতে এইরূপ হইতেছে। সেই কারণে মনে মনে স্থির করিলেন, হিরণ নিকটে থাকিলে এ দোষ সারিয়া যাওয়া সম্ভবপর। একদিন অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বৌমা, সত্যেন বাবুত আজও এলেন না; তা আমি বল্‌ছিলুম, আপনি না হয়, একবার কলকাতায় চলুন, আমি সঙ্গে করে রেখে আসি। কি বলেন?"

হিরণ মাধব ঘোষের সহিত পূর্ব্বে কখনও কথা কন নাই। মানব দুঃখের সাগরে পতিত হইলে সকল সময় লজ্জা শরম রক্ষা করিতে পারে না। আজি বৃদ্ধ সরকারের কথায় তিনি আড়াল হইতে ধীর অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"যদি তিনি রাগ করেন।"

মাধব বলিল,—"এতে রাগ করবেন বলে আমার বোধ হয় না।"

হিরণ্ময়ী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি আগে একখানি চিঠি লিখে দি, আপনি বরং নিয়ে যান, যদি তিনি অনুমতি করেন, তাহ'লে যাব।"

তাহাই স্থির হইল। হিরণ্ময়ী শূন্যকক্ষে বসিয়া কম্পিত হস্তে নিম্নলিখিত প্রকার লিখিলেন:—

"জীবিতেশ! আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন।—এ হতভাগিনী আর কতদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত থাকিবে? আমি অবোধ সামান্যা নারী, কি করিলে আপনার মনের মত হইতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি নিশ্চয় কোন দোষ করিয়া থাকিব, নচেৎ আপনি আমায় ত্যাগ করিবেন কেন? নাথ! আজি আপনার চরণে আমার এই ভিক্ষা যে, আপনি এ মন্দভাগিনীর প্রতি অন্য-শাস্তির ব্যবস্থা করুন। দাসীর আর একটি নিবেদন এই, অমর ঠাকুরপোর কোন দোষ নাই; যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার। আমি পাঠাইয়াছিলাম, তাই তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। আপনি অকারণ তাঁহাকে মনঃকষ্ট দিবেন না, সেজন্য আমিই দণ্ড পাইবার যোগ্য। প্রাণনাথ! আপনার মন, আপনার দয়া, আপনার ভালবাসা আমি জানি; আমার অপরাধে,—আমার অদৃষ্ট দোষে এই অশেষ যন্ত্রণা পাইতেছি। আর অধিক লিখিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া বাড়ী আসুন, আপনার অভাবে সংসার অন্ধকারপ্রায় হইয়াছে। যদি একান্ত না আসেন, অনুমতি দিন্, আমি কলিকাতায় যাইয়া আপনার চরণ সেবা

করি। সংসার আমার ভাল লাগে না, আমি একাকী আর থাকিতে পারি না। শ্রীচরণে নিবেদন।”

“আপনার হতভাগিনী দাসী—হিরণ।”

হিরণ্ময়ী পত্র লেখা সমাপ্ত করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে মনে মনে বলিলেন,—“জগদীশ! এ হতভাগিনীর দুঃখের অবসান কর, আর সহিতে পারি না। হে অনাথনাথ! স্বামীর মন ফিরাইয়া দাও, এই পত্রের ফল যেন শুভ হয়। দয়াময়, আমায় ত সকলই দিয়াছ,—দেবতুল্য স্বামী, অতুল বৈভব, স্নেহপুত্তলী কন্যা, রোগশোকহীন দেহ—রমণীর যাহা কিছু প্রার্থনা তাহা সকলই দিয়াছ, তবে আবার কোন্ পাপে তাহা কাড়িয়া লইতেছ? সাগরে ডুবিয়া পিপাসা মিটাইতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা আর কি যন্ত্রণা আছে? প্রভো! যাহা দিয়াছ, তাহা আর লইও না, যাহার অভাবে সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য—এমন কি, এ জীবন পর্য্যন্ত অতি তুচ্ছ, যাহা নারীজাতির সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য সেই পতিপ্রেম-রত্নে বঞ্চিত করিও না। দীননাথ, এ ক্ষুদ্র রমণীর আর কোন সম্বল নাই।”

পরদিন মাধব ঘোষ পত্রখানি লইয়া সত্যেন্দ্র নাথের বাসায় পৌঁচিল। মাধব সত্যেনের অবস্থা অবলোকন করিয়া দুঃখিত ও ব্যথিত হইল। ততোধিক দুঃখিত ও ব্যথিত হইল তাঁহার কথা শুনিয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিয়া। সে সত্যেনের এরূপ অবনতির কথা আদৌ ভাবে নাই। সত্যেন এক্ষণে নানাবিধ পাপের উত্তেজনায় তাঁহার যাতনা ডুবাইতে চাহেন। হিরণ্ময়ীর দুঃখ অত্যন্ত অধিক হইলেও, সত্যেনের দুঃখেরও সীমা অল্প নহে। সহধর্ম্মিণীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া কোন্ পুরুষ সুখে থাকিতে পারেন? তাঁহার অন্তঃকরণ কোন কালেই কঠিন নহে, তাহা হইলে হয়ত তিনি জন্মভূমি ও বাটী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আত্মীয়-বন্ধুহীন বাসায় থাকিয়া এত যাতনা ভোগ করিতেন না। সত্যেন বুদ্ধিমান্, এ দুঃখের সময় পানাভ্যাস করিলেন কেন? যে সকল কার্য্য আশৈশব তাঁহার রুচির বিরুদ্ধ ছিল,—ঘৃণার বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহার প্রশ্রয়দাতা হইলেন কেন? হিরণের চরিত্রের প্রতি সন্দেহ এখন তাঁহার নিকট সত্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়-শোণিত-সদৃশ প্রিয়তমা-পত্নীর কথা আর ভাবিতে পারেন না, মনে আসিলে বুক ফাটিয়া যায়, জগতের কঠোর অত্যাচারের কথা ভাবিয়া মস্তিষ্ক চূর্ণপ্রায় হইয়া যায়, সে তুলনাহীন যাতনার বেগ সহ্য করিতে পারেন না, এই জন্য তিনি এই হলাহলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ক্রোধ যাহাকে বলে, ঠিক্ তাহা একদিনও সত্যেনের মনে উপস্থিত হয় নাই, হিরণকে ত্যাগ করিবার কথা কখনও মনে হয় না, সাধের শান্তিকাননে থাকিয়া অশান্তির বহ্নিতে পুড়িতে পারিবেন না বলিয়াই মাণিকনগরে যান না। যাহাকে হৃদয়ের ধন বলিয়া জানিতেন, তাহাকে দেখিলে পাছে কোন বিষম ভাব মনে হয়, অথবা দুর্জ্জয় ক্রোধ আসিয়া

আক্রমণ করে, এই মনে করিয়া বাটী যান না। তাঁহার অন্তর পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কোমল। সত্যেন আজি মাধবকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি পত্রখানি হাতে লইয়া রাখিয়া দিলেন—পড়িলেন না। মাধব অধিক কথা বলিতে পারিল না—সংক্ষেপে তাহার মনের কথা বলিল,—তাঁহার অদর্শনে বাটীর যে অবস্থা হইয়াছে, কর্ম্মচারিবর্গ যেরূপ আলস্যের সহিত কার্য্য করিতেছে, তাহাও কিছু কিছু বলিল। সত্যেন সে সকল কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—মাধব! এখনও আমার বিবেক একবারে লোপ পায় নাই, আমি সব বুঝ্‌তে পারচি। আমি বর্ত্তমান দেখচি ভবিষ্যৎও কতকটা অনুভব কর্‌তে পারচি। আমার কোন কথা বোলো না, সংসার আমার পক্ষে বিষধর তুল্য। তোমরা পার বিষয় রক্ষা কোরো, আমার দ্বারা কোন আশা কোরো না। আমি এখন আর মাণিকনগরে যেতে পার্‌ব না, হিরণকে বোলো, আমি বেস আছি, সে যেন এখানে না আসে।”

মাধব অগত্যা বিমর্ষচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিল। হিরণ্ময়ীর আশা স্বপ্নে পরিণত হইল, তিনি দুঃখের আর এক সোপান নিম্নে নামিলেন। মাধব কলিকাতা হইতে আসিতে আসিতেই মর্ম্মে করিয়াছিল, এখন বিনোদ বাবুর একবার চেষ্টা করা বাকি আছে। সে হিরণকে কথাপ্রসঙ্গে বলিল,—“মা! সবই ত বিফল হ’ল, একবার বিনোদ বাবু চেষ্টা কর্‌লে কি হয় বলা যায় না।”

হিরণ্ময়ী কোন কথা বলিলেন না। মাধব অমরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া, বিনোদলালকে সবিশেষ অবগত করানই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অপরের দ্বারা এই সকল গুহ্য কথা বলিয়া পাঠান সুবিধা নয় বিবেচনা করিয়া, অমরনাথ স্বয়ং বিনোদ বাবুর বাটীতে যাইবার মানসে বাটী হইতে যাত্রা করিলেন।

মানবের সুখ দুঃখ আপনার মনে। অমর এতদিন বন্ধুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাতর ছিলেন, এক্ষণে আপনাকেই সকল দুঃখের মূল জানিয়া, একটি প্রাচীন প্রবল জমিদার বংশের অধঃপতনের কারণ কল্পনা করিয়া ক্রমে ক্রমে মনের শান্তি হারাইতে লাগিলেন। হত্যাকারী, বিচারপতির নিকট নিষ্কৃতি লাভ করিয়াও যেমন হত্যাজন্য একপ্রকার অন্তর্দ্দাহে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, অমর তেমনই, বাহিরে কাহারও অনুশাসনে নিপীড়িত না হইলেও, অন্তরে চিন্তার দহনে সঙ্কুচিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদের চেষ্টা সফল হইল।

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের লীলা বুঝা মানব-বুদ্ধির অতীত। পার্থিব সামগ্রীর মধ্যে যাহা মানবের প্রার্থনীয়, তাহার সকলই প্রায় বর্ত্তমান থাকিতেও, সত্যেন্দ্রনাথের মত অসুখী কে আছেন? তিনি নবজীবনে প্রবেশ করিয়া কত সুখের কল্পনাই করিয়া-

ছিলেন; হায়! এখন তাহা ক্রমে আকাশ-কুসুমে পরিণত হইতে চলিয়াছে, শিশু-নির্ম্মিত তাসের গৃহ সম বুঝি এক ফুৎকারেই সব ভূমিসাৎ হইয়া যায়! সত্যেন মনে করিয়াছিলেন সংসার-সাগরের শত শত ভীষণ তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া জীবনতরী ধীরে ধীরে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। মনে করা সহজ বটে, কিন্তু মনোমত সাধনা ত মানবের ক্ষমতাধীন নহে। জীবনতরী ভাসাইয়াছিলেন ভাল, কিন্তু তাঁহার অলক্ষ্যে কোথা হইতে একখানি কাল মেঘ সুনীল অম্বরের একপার্শ্বে দেখা দিল; সেই অপূর্ণবিকসিত প্রসূনে কীট প্রবেশ করিল, সেই সুরবাঁধা বীণার একটি তার ছিঁড়িয়া গেল, সেই ভরা-নদীতে ভাঁটা পড়িল, সেই অমৃতের স্রোতে গরল মিশিল—সত্যেন দিনে দিনে উৎসন্নের পথে,—অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে ভ্রান্তিতে সেক্ষপীয়রের ওথেলো, লিয়ন্টিস ও পষ্টিউমাশ, বঙ্কিমচন্দ্রের হেমচন্দ্র, কালিদাসের দুষ্মন্ত, দামোদরবাবুর যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পতিত হইয়া ছিলেন, সেই ভ্রান্তিই সত্যেনকে কেশাকর্ষণে টানিতে লাগিল এই অনন্ত অনর্থকারী ভ্রম যে কত নরনারীর সুখশান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অবশেষে অকালে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। যেমন ক্ষুদ্রকীট মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া মহান্ তরুকে নষ্ট করিতে থাকে, সেইরূপ এক একটি সামান্য প্রমাদ মনুষ্যহৃদয়, মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করে। আবার আকাশমার্গ-উড্ডীন ঘুড়ির সূত্র নিম্নে আকর্ষণ সময়ে যেমন উচ্চ উঠিয়া থাকে, সেইরূপ ভ্রান্ত জন তাহার ভুলের বিরুদ্ধে ভাবিতে অনেক সময় তাহাই দৃঢ়মূল করিয়া ফেলেন!

মাধব চলিয়া গেল। কএকদিন পরে কি মনে হইল—সত্যেন হিরণের পত্রখানি পাঠ করিলেন। বহুদিনের পর অদ্য হিরণ্ময়ীর পত্রপাঠে আহ্লাদের পরিবর্ত্তে এক অব্যক্ত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইলেন। সময়ের গুণে এক কথার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে। হিরণ্ময়ীকে অমরের সাপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিতে দেখিয়া সন্দেহের যে টুকু বাকী ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এই কি আমার সেই হিরণ, নিজ লেখনী মুখে মনের কথা আর গুপ্ত রাখিতে পারিল না। তিনি অমরকে নর-পিশাচ জ্ঞানে ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। সুবর্ণের পরীক্ষা কষ্টি পাথরে বা অগ্নিতেই হইয়া থাকে। সত্যেন উভয় পদার্থের মধ্যে কাহারও সহিত তুল্য নহেন, সুতরাং বন্ধুবৎসল মহৎহৃদয় অমরকে নর-পিশাচ ভাবিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? মহতের মহত্ত্ব মহতেই বুঝিয়া থাকেন, দেবাদিদেব শশিভূষণ যে শশীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শশীকে আবার রাহু গ্রাস করিয়া থাকে। সত্যেন্দ্র নাথের সে মহত্ব এখন ঘুচিয়াছে; মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্ব আসিয়া ক্রমে হৃদয় অধিকার করিতেছে; কিন্তু তাহাতে সত্যেনের দোষ দেওয়া যায় না,

তাহা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য। এই প্রবল শত্রু ভ্রান্তির নিকট সকল মনুষ্যকেই পরাজিত হইতে হয়। ইহার প্রভাবে সাধুকে অসাধু করে, ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক করে।

দুঃখ ও ক্রোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী। সত্যেন পত্রপাঠে হিরণের জন্য দুঃখিত হইলেন, আর অমরের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি অনেক দিনের পর পত্নীর হস্তলিপি দেখিয়া, প্রথমে তাঁহার সন্দেহের বিপরীত চিন্তা করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চিন্তা বৃথা। যত চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভ্রমবিশ্বাস ততই প্রবল হইতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথের প্রতি ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বাসনা জাগরিত হইতে লাগিল। তিনি আর অধিকক্ষণ ভাবিতে পারিলেন না, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তখন শোক-তাপ-দুঃখ-বিনাশিনী সুরায় সর্ব্বজ্বালা জুড়াইলেন।

পাঁচ সাত দিবস পরে, একদিন বৈকালে, বিনোদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। বিনোদলাল সবিস্ময়ে বলিলেন,—"দাদা, একি? তোমার নিজের শরীর এমনি ক'রে নষ্ট কর্‌তে বসেচ? তোমাকে আজই আমার সঙ্গে বাড়ী যেতে হবে।"

সত্যেন বলিলেন,—"বিনোদ! ভাই, বাড়ী যাব! এ জীবনে নয়। তুমিও আমায় নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেচ?"

বিনোদলাল বলিলেন,—"নিশ্চয়ই, ও-কথা দাদা ভুলে যাও। তোমার বিষয় সম্পত্তি দেখে কে? বৌদিদি দোষ করে থাকে, তার কি ক্ষমা নাই? তোমার ভগিনীও অনেক ক'রে বলে দিয়েচে।"

সত্যেন বলিলেন,—"লীলা, দেবেন, অনিলা সব ভাল আছে?"

বিনোদ ওকথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—"ওসব কথা পরে হবে, তোমার বাড়ী যাবার কথা আগে বল।"

* * * *

অনেকক্ষণ শ্যালক ও ভগিনীপতিতে এই মত কথা হইল। সত্যেন অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, বিনোদ কোন কথাই শুনিলেন না। কএক ঘণ্টা পরে আহারের সময় হইল, বাসার বামুন ঠাকুর ডাকিয়া গেল, সত্যেনও আহার করিবার জন্য বলিলেন। বিনোদলাল এই সুযোগ বুঝিয়া ধরিয়া বসিলেন, বাটী যাইতে স্বীকার না হইলে কোন মতেই আহার করিবেন না। সত্যেন্দ্রনাথ, অনেক কথার পর, বাষ্পপূর্ণ লোচনে বলিলেন,—"বিনোদ, ভাই বাটী যাইব; তোমারই কথায় বাটী যাইব। কিন্তু এক দিনের জন্য,তারপর যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইব, তখন তোমাদের কোন অনুরোধ রাখিব না। বিষয় আশয়ে আমার আর সাধ নাই।"

বিনোদ বাবু সহাস্যে বলিলেন,—"কি দুঃখে বাড়ী যাবে না দাদা"—

সত্যেন্দ্রনাথ কি বলিতে যাইতেছিলেন বিনোদ বাধা দিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, তাই হবে, এখন বাড়ী চল।"

সত্যেন্দ্রনাথ কথাটা বলিয়া মনে স্থির করিলেন, একবার বাটী যাইবেন। প্রাণের দুহিতার অমল মুখখানি একবার দেখিবেন, হিরণ্ময়ীর নূতন সুখে তাঁহার সাধের শান্তি-কানন কিরূপ সৌন্দর্য্যময় ভাব ধারণ করিয়াছে একবার দেখিয়া আসিবেন, আর করিবেন কি ?—প্রতারক নরাধম অমরের মাণিকনগরের মধ্যে বাস করার পথ চির-অবরুদ্ধ করিয়া আসিবেন।

দুই দিবস পরে সত্যেন্দ্রনাথ বাটী আসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রবল আঘাত।

রজনী ঘোর অন্ধকারময়ী। মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছে; সন্ সন্ করিয়া শীতল বাতাস, গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে, এবং সেই সঙ্গে বায়ুর প্রবল আঘাতে ও মেঘের ভীম গর্জ্জনে জানালা, কপাট, সাসি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার তীক্ষ্ণজ্যোতিতে ঘর, দ্বার, পথ ও বৃক্ষ আলোকিত হইয়া আবার ঘনান্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন যামিনীতে পুরাতন জীর্ণ কুটীরাশ্রিত অধিবাসিবৃন্দ সতর্কতার সহিত বিনিদ্র থাকিয়া নিশা যাপন করিতেছে; শিশুগণ কুলিশ-নিনাদে আতঙ্কিত হইয়া জড়সড় ভাবে মাতৃ-ক্রোড়ে সরিয়া যাইতেছে; আর বৃক্ষকোটরে পক্ষিগণ নিজ শাবকগুলিকে যতনে রক্ষা করিতেছে। প্রকৃতির এই ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলেই ভীত।

মাণিকনগরের সেই বিশাল ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে এক কুন্দকুসুমাঙ্গী ক্ষীণা যুবতী বিনিদ্র হইয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্না, প্রকৃতির পৈশাচিক রূপ দেখিবার সময় তাঁহার নাই। এই সুন্দরী আমাদের হতভাগিনী হিরণ্ময়ী। পতিবিরহিণী হিরণের চক্ষে নিদ্রা নাই; নিশা জাগরণজন্য আলস্য বা ক্লান্তি অনুভব নাই, কেবলমাত্র চিন্তা—হৃদয়বিদারক চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্বামীর আগমনে সতী মনে কত আশাই স্থাপন করিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, এত দিনে তিনি সদয় হইয়াছেন, এত দিনে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন, তাঁহার তাপিত প্রাণ এইবার সুশীতল হইবে। কিন্তু হায়! তাঁহার কপাল চির-দিনের জন্য পুড়িয়াছে,তাঁহার সুখ-রবি চির-অস্তমিত হইয়াছে। সত্যেন বাটী আসিয়া হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না,সত্যেনের জন্য আজি সুকোমল পরিস্কার শয্যা-রচনা করা হইয়াছে, ঠাকুরমার অনুরোধে হিরণ আজি তাঁহার যত্নহীন, তৈল-সম্পর্ক-শূন্য কেশে কবরী বন্ধন করিয়াছেন, আর হিরণ্ময়ী স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার শিশু কন্যার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া চখে কজ্জল দিয়া একটি টিপ্ পরাইয়া দিয়াছেন। সকলই বৃথা হইল; যে সত্যেন কোথাও হইতে বাটীতে আসিলে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া, কি দিবায় কি রাত্রিতে, প্রথমেই হিরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত

হইতেন, হিরণ বলিয়া ডাকিতে অজ্ঞান হইতেন, আর সেই সত্যেন একবার সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিলেন না। একাকিনী বসিয়া হিরণ কত কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। তিনি ভাবিলেন,—"আমি অপরাধ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু কি অপরাধ এবং তাহা আমার জ্ঞানে কি অজ্ঞানে হইয়াছে, তাহা একবার তিনি দেখিলেন না; আর এই শিশু—অভাগিনীর হৃদয়ের ধন, এ ত কোন অপরাধ করে নাই! ইহার মুখখানি দেখিতেও কি একবার ইচ্ছা হইল না।" তাহার পর স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বাহিরের যে প্রকোষ্ঠে সত্যেন রহিয়াছেন, সাসির মধ্য দিয়া তাহার আলোক প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"তোমার মন ত এত কঠিন নয়; কোন্ ডাকিনী—পিশাচী তোমাকে মন্দ করিল? নাথ! আমার অন্তরের প্রবল আঘাত কি তোমার অন্তরে প্রতিঘাত করিতেছে না? তুমি সুখে আছ, এ কথা যে মন মানে না। তাহা মানিলে হয় ত এত কষ্ট হইত না। এ দাসী কি আর তোমার চরণ সেবার যোগ্যা নহে। এই সময় একবার বিদ্যুত চমকাইল। শ্বেত দেওয়ালের মধ্যে জানালা ও সাসি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। হিরণ্ময়ী আবার ভাবিলেন,—"তিনি না আসেন, আমার একবার যাইতে দোষ কি? আমার অভিমান নাই, অপমান নাই, জ্ঞানকৃত কোন পাপ অন্তরে নাই, তবে একবার তাঁহাকে দেখিয়া জীবন জুড়াইব না কেন? তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে কি কৃপা হইবে না, তাহাতে কি তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইবে না? কিন্তু কি জানি, তাহাতে যদি তিনি অধিক বিরক্ত হন! আমারও আর অদৃষ্টের সে বল নাই। যে কপালের জোরে একদিন অন্যায় ন্যায় হইত, দোষকে গুণ বলিয়া লইতেন, এখন ত আর কপালের সে জোর নাই। তাঁহার অন্তরে এখন সে দেখিবার লালসা নাই। আমার কি দোষ তাহা বুঝিলাম না, কেমন করিয়া নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিব! না হয় তাহারও প্রয়োজন নাই, চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, কিন্তু যদি তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া কথা না কহেন, তাহা কেমন করিয়া সহিব? হিরণ্ময়ী আবার ভাবিলেন,—"আমি স্ত্রী, তিনি স্বামী; কেন তিনি বিরক্ত হইবেন, কেন তিনি ক্ষমা করিবেন না? তাঁহার অন্তঃকরণ দয়া মমতাপূর্ণ, আমাকে দেখিলে অবশ্যই সব ক্রোধ দূর হইবে। যদি তাহাতেও বিমুখ দেখি, নির্ম্মল ক্ষুদ্র মল্লিকাসম মাধুরী কি অপরাধ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিব!"

হিরণ্ময়ী আর থাকিতে পারিলেন না, ধীরে উঠিলেন—ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। কোন আলোক লইলেন না, অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সাবধানে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেন। একবার বিদ্যুৎ হাসিল, মুহূর্ত্তের জন্য প্রাঙ্গণ বারেন্দা হাসিয়া উঠিল, আবার পরক্ষণেই মহা অন্ধকারে ডুবিল। হিরণ মনে করিলেন ইহা প্রকৃতির বিকট অট্টহাস্য। তিনি একবার থামিলেন। হিরণ্ময়ী নীচে দিয়া

কখনও বৈঠকখানায় যাইতেন না; যখন প্রয়োজন হইত, উপরের খোলা ছাদ দিয়া যাইতেন। সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়া যাওয়ার পর হইতে উপরের দ্বার বন্ধই থাকিত, সেই কারণে তিনি অদ্য নীচে দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

হিরণ্ময়ী পার্শ্বের দেওয়াল ধরিয়া উপরে উঠিলেন; গভীর আঁধারে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সামান্য দূর যাইতে না যাইতেই, কি একটি কঠিন পদার্থ পায়ে ঠেকিল, অনুভবে বুঝিলেন উহা একখানি কাষ্ঠখণ্ড। উহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার মানসে হিরণ যেমনই পদক্ষেপ করিলেন, অমনি আর একখানি কাঠের ধারে পা পড়িয়া উহা উল্টাইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে হিরণ পড়িয়া গেলেন। মস্তকে ও হস্তে গুরুতর আঘাত পাইয়া হিরণ্ময়ী কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলেন। তৎপরে পুনরায় উঠিয়া দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। এই সময় আবার একবার ভয়ানক নিনাদে মেঘগর্জ্জন হইয়া সৌদামিনী চমকাইল; হিরণ্ময়ী সেই আলোকে দেখিলেন, সম্মুখেই স্বামীর কক্ষের রুদ্ধ দ্বার। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সহসা কবাট স্পর্শ করিতে পারিলেন না,—কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে কত অশুভ চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—"আজি আমি অদৃষ্টের সন্ধিস্থানে উপস্থিত, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ আজি নির্ণয় করিতে পারিব। হয় আজি স্বামীর ক্রোধ বা দুঃখের অবসান হইবে, না হয় তাঁহার রোষ চরমসীমায় উপনীত হইবে। ভগবান্ পতিতপাবন হরি! যাহা তোমার মনে আছে তাহাই হইবে, আজি এই সামান্য অবলাহৃদয়ে বল দাও, আর অধিক কিছু বলি না, যেন মুখ ফুটিয়া একবার ক্ষমা চাহিতে পারি। আমি বেশ জানি তাঁহার হৃদয় কত সরল, তিনি আমায় মার্জ্জনা করিবেন।" এই বলিয়া তিনি আর এক পদ অগ্রসর হইয়া দ্বার স্পর্শ করিলেন।

দাঁড়াও হিরণ্ময়ি,—দাঁড়াও! আর যাইও না, ওকক্ষে আর প্রবেশ করিও না। ঐ দেখ দেবতার অশনি ভীমরবে তোমাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছে,—বিদ্যুৎ চমকাইয়া তোমায় তোমার ঘুমন্ত শিশুর কথা স্মরণ করিয়া দিতেছে—ঐ দেখ তোমার মস্তকে রুধির ধারা প্রবাহিত হইয়া অমঙ্গল বিঘোষিত করিতেছে। যাও মা হিরণ! আপন কক্ষে ফিরিয়া যাও, অপরাধী তস্করের মত সঙ্কুচিতভাবে গৃহে প্রবেশ করিও না! আর অধিক দিন এ যাতনার ভার বহিতে হইবে না; দেবতা অচিরেই তোমার দুঃখের অবসান করিবেন।

হিরণ দেবতার নাম স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে কবাট ঠেলিলেন, সামান্য জোর দেওয়াতেই উহা উন্মোচিত হইল। সত্যেন্দ্রনাথ নিদ্রার জন্য শয়ন করেন নাই; একখানি সোফায় বসিয়া করতলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া কত অতীত সুখ-স্মৃতির কথা ভাবিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন। দ্বারোদ্ঘা-

টনের শব্দ শুনিয়া সত্যেন চাহিয়া দেখিলেন। গৃহের প্রখর আলোকে দেখিবামাত্র তিনি চিন্তামলিনা হিরণকে চিনিতে পারিলেন। তখনই মুখ ফিরাইয়া লইলেন, বিবিধ যন্ত্রণায় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তিনি মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর হিরণ্ময়ী, তিনিও দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; প্রবলবেগে হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল, এখন এই উভয় ব্যক্তির মনে যে ভাব হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হিরণ্ময়ী অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। কতবার মনে করিলেন প্রাণবল্লভের চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবেন, তাহাও পারিলেন না। এ দিকে দুষ্ট স্মৃতি হিরণের সীমাহীন অলীক অপরাধ একে একে সত্যেনের মানসচক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিতে লাগিল, তাঁহার মানসিক বৃত্তি ক্রমে বাসনার বিরুদ্ধভাব ধারণ করিতে লাগিল। তিনি আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না, ত্বরিত পদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভাবিলেন—"হিরণ কখনই দোষহীন নহে, তাহা হইলে তাঁহার এভাব দেখিব কেন? আমার সন্দেহ মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু সে কথা কহিতে পারিল না কেন?"

সত্যেন্দ্রনাথ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী উপেক্ষা ও হতাশার দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিতা হইয়া হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ এইভাবে রহিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যখন জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন দেখিলেন একাকিনী শূন্যপ্রকোষ্ঠমধ্যে শায়িতা রহিয়াছেন। ভাবিলেন—"আর কেন? সব আশা ত ফুরাইল, জীবন কিসের জন্য? যাহার জন্য এ রমণী-জন্ম, তিনি যদি ফিরিয়া চাহিলেন না, তবে আর জীবনে প্রয়োজন কি? স্বামীর হৃদয়ে যাহার স্থান নাই, তাহার মরণই ভাল। স্বামীর ভালবাসা হারাইলে নারী যেন আর এক দণ্ড না বাঁচে। পতি প্রেমই রমণীর বল; সে বল শূন্য হইলে আর বাঁচিয়া কি ফল! এখন মরণ কিসে হয়? হে মৃত্যু! তুমি ভিন্ন এ যন্ত্রণা ঘুচাইতে আর কে পারিবে? হে যম! এ দুঃসময়ে তোমার করুণা ভিন্ন এ দুর্ব্বলা রমণীর আর কি প্রার্থনা আছে?" তার পর হিরণ অখিলের পতিকে সম্বোধন করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"অগতির গতি মধুসূদন! যাহা অদৃষ্টে ছিল হইল, এখন কৃপা করিয়া এই কর, যেন এ জ্বালা আর সহিতে না হয়, এ জীব-লীলা যেন অচিরেই সাঙ্গ হয়। আমার নিজ কর্ম্মফল আমি ভুগিতেছি, দোষ কাহারও নয়। দয়াময়! এ জনমে যে সাধ পুরিল না, পরজন্মে যেন তাহা পূর্ণ হয়। আর এক প্রার্থনা —হে মঙ্গলময়! আমার সহিত তাঁহার সকল দুঃখের যেন অবসান হয়। ভগবন্! এ দুঃখিনীর পাপ নাম যাহাতে শীঘ্র এই বিপুল ধরণী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার উপায় করিয়া দাও।"

হিরণ্ময়ী কতক্ষণ এইমত চিন্তা করি-

লেন। অপত্য-স্নেহ কি অদ্ভুত সামগ্রী! কোন অবস্থাতেই মাতৃঅন্তর হইতে ইহা প্রায় বিচ্যুত হয় না। অকস্মাৎ হিরণের মাধুরীর কথা মনে পড়িল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। এখন প্রবলবাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইয়াছে, মেঘের মধ্যদিয়া পাণ্ডুবর্ণের চাঁদের অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যাইতেছে, মৃদুসমীরণে শৈত্য অনুভূত হইতেছে। এখন প্রকৃতি নির্জ্জীব—নিস্তব্ধ। কদাচিৎ কোন বিহগ মধুর কূজনে ঊষাসমাগম বিঘোষিত করিতেছে, আর কখন দুই একটা সারমেয় সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আপাত-বিশ্রামক্লান্ত গ্রাম্য চৌকিদারের তাড়নায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। সত্যেনকে দেখিবার পূর্ব্বে হিরণের হৃদয়ে যে ঝটিকা বহিতেছিল, তাহাও এখন মন্দীভূত হইয়াছে, বুঝি বা বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাও ইহা স্থির ও নির্জ্জীব।

হিরণ্ময়ী পূর্ব্ববৎ প্রাঙ্গণ পার হইয়া, আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দেখিলেন শিশু কন্যা তেমনই নিদ্রা যাইতেছে, তাঁহার মুখপানে চাহিতে চক্ষে একবিন্দু জল আসিল। তখন তিনি গৃহের উজ্জ্বল দীপালোকের চঞ্চল রশ্মিতে দেওয়াল-বিলম্বিত সত্যেনের চিত্রখানির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, যে সত্যেন তাঁহার ছবি আঁকাইবার জন্য কত বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা করিতে দেন নাই বলিয়া সত্যেন দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই বিদায়ের দিনের শেষ কথোপকথন মনে পড়িল। সেই সত্যেন্দ্রনাথের গান গাওয়াইবার ব্যর্থ শত চেষ্টা মনে পড়িল। কবে একদিন সত্যেন স্বহস্তে আল্‌তা পরাইতে চাহিয়াছিলেন; একদিন ভয় দেখাইবার জন্য অধিক জলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; একদিন একখানি সোফায় বসিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া সত্যেনের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে একটি বন্ধু গৃহে প্রবেশ করাতে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন; একদিন স্বহস্তে লুচি ভাজিয়া দিয়াছিলেন, আর সত্যেন তাহার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন; একদিন মুখের চর্ব্বিত পান না দেওয়ায় সত্যেন অভিমান করিয়াছিলেন; একদিন স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে আসিলে, অশুদ্ধবস্ত্রে স্পর্শ করিবার ভাণ করিয়া সত্যেন পথ আগুলাইয়াছিলেন; একদিন বোটে চড়িয়া তাঁহার সাক্ষাতে একটি গীতের এক চরণ বলিয়াছিলেন; একে একে শত কথা নদীজলের হিল্লোলের ন্যায় হিরণের মনে হইতে লাগিল। একে একে সকল কথা স্মরণ হয়, আর নয়ন হইতে এক বিন্দু জল গড়াইয়া পড়ে, আবার একটি কথা মনে হয় আবার এক বিন্দু জল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার চিন্তারও শেষ নাই, অশ্রুবর্ষণেরও শেষ নাই।

ক্রমে সেই শান্তিকাননে ঊষার প্রকাশ

পাইল। সেই তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া সম্মোহন বালারুণছ্যুতি দৃষ্টিগোচর হইল। পাদপাশ্রিত বিহগকুল প্রভাতি গীতে উষা সংঘোষিত করিল। উদ্যানের একধার হইতে মরালগণ রব করিতে লাগিল। আবার জগৎ হাসিল, নিদ্রোত্থিত নরনারী গত যামিনীর ভীষণ দৃশ্য ভুলিয়া প্রকৃতির নব্য নবীন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। হিরণের হাসি নাই, এ জীবনে তাহা আর ফিরিবারও সম্ভাবনা নাই। তিনি এখনও গণ্ডস্থলে হাত দিয়া একাকিনী গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছেন।

হায়! এই কি একদিন? একে একে কতদিন গিয়াছে, আর কতদিন যাইবে কে বলিতে পারে? প্রহরে প্রহরে, দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, হিরণ্ময়ী সেই গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া শান্তিসূত্রবিচ্ছিন্ন অন্তরে এই মত চিন্তা করিতেন। যে কানন একদিন শতসুখপূর্ণ নন্দনকাননসম আনন্দধাম বলিয়া মনে হইত, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ং কালে, এমন কি গভীর রজনীতেও, দুঃখসন্তপ্তা যুবতী সেই কাননের দিকে চাহিয়া অজস্র রোদন করেন। যে বিলাসগৃহ একদিন বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া অনুমিত হইত, তাহা এখন ভীষণ কারাগার অপেক্ষাও ভীষণতর বলিয়া মনে হয়। ঐ যে কাক-চক্ষুবিনিন্দিত স্থির অম্বুরাশিচুম্বিত প্রস্তরমণ্ডিত সরসীসোপান, ঐ স্থানে বসিয়া প্রাণবল্লভের সহিত হিরণ মৎস ধরিয়াছেন; ঐ যে তৃণাচ্ছাদনবিহীন বৃক্ষবাটিকা, ঐ যে জীর্ণপ্রায় লতাকুঞ্জ, নিদাঘের কত প্রখর মধ্যাহ্ন ঐ স্থানে অতিবাহিত হইয়াছে। প্রকৃতই এমন দিন অনেক ছিল, যখন এই শান্তিকাননে অশান্তির বায়ু কখনও প্রবাহিত হইত না; প্রকৃতই এক সময়ে ইহা পবিত্র শান্তিনিকেতন ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনই কাটিতে লাগিল। প্রকৃতি বঙ্গদেশকে শ্যামল-শস্যপূর্ণ করিল, বৃক্ষলতা নবপল্লবিত হইয়া নূতন শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। কৃষকগণ আনন্দিত মনে আবার গান গাইল, পক্ষিগণ মাঠে মাঠে শস্য লোভে আবার বিচরণ করিতে লাগিল। ভূস্বামী শস্য দেখিয়া ভাবিলেন, এবার আদায় হইবে ভাল; আর কৃষকগণ জমিদারের খাজানা আদায় দিতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দিত হইল। সকলেই আনন্দপূর্ণ। হিরণ্ময়ীর আনন্দের দিন কি আর ইহ জন্মে আসিবে?

হিরণ্ময়ীর দেহে উৎকট ব্যাধির পূর্ব্ব লক্ষণসকল দেখা দিল। যেমন বালকের ক্রীড়ার সামগ্রী গগণবিহারি ঘুড়ি ছিন্নসূত্র হইলে ধীরে ধীরে নামিতে থাকে, তেমনই ধীরে ধীরে হিরণের দেহ ও মনের পতন হইতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মালতীর বিদায় গ্রহণ।

"বৎসে! সে জন্য তুমি শঙ্কা করিও না।" তন্ত্র বলিতেছেন,—

"দেহস্থা সর্ব্ববিদ্যাশ্চ, দেহস্থা সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থ-সর্ব্বতীর্থানি লভ্যন্তে গুরুবাক্যতঃ॥"

অর্থাৎ, এই দেহের মধ্যেই সর্ব্ববিদ্যার স্থান, সর্ব্ব দেবতার স্থান, সকল তীর্থস্থান বর্ত্তমান আছে। উহা গুরুর উপদেশে লব্ধ হইয়া থাকে।"

"আপনার সঙ্গভিন্ন গুরুদেব! সে উপদেশ লভিব কি প্রকারে?"

"সকল বিষয়েরই মধ্যে পরীক্ষা প্রয়োজন, কয়বৎসরে যাহা শিখিয়াছ, যাহা জানিয়াছ, তাহার পরীক্ষার সময় এইবার উপস্থিত হইয়াছে। স্বাধীনতা ভিন্ন উৎকৃষ্ট পরীক্ষা আর কিসে হইতে পারে? যাও বৎসে! তুমি নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যাও, দেখিয়া শুনিয়া এখন কিছুদিন জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা কর।"

"আমি অজ্ঞান অবলা, আপনার উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভের অন্য কোন পথই আমার নিকট সরল বোধ হয় না।"

"বৎসে! দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, উপদেশে তাহা হয় না। উপদেশে শিক্ষা হয়, জ্ঞানও হয়, কিন্তু অনেক সময় জ্ঞানহীন অভ্যাসও হইয়া থাকে। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, জ্ঞান হইতেই পরিণামে শান্তি লাভ হয়। ইহা শান্তিধামে পৌঁছিবার প্রথম সোপান স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥"

অর্থাৎ, জ্ঞানহীন অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ অধিক শ্রেষ্ঠ এবং ত্যাগ হইতেই শান্তিলাভ হয়। ধ্যান হইতেই কর্ম্মফল ত্যাগ আপনি সাধিত হয়। উপাসনাই ধ্যান, পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষয়ই যখন শান্তির কারণ, তখন কি ভোগী কি মুমুক্ষু সকলের পক্ষেই উপাসনা আবশ্যক। উপাসনা বলে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মযোগে মানব পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।"

"গুরুদেব, সে উপাসনা কঠিন। এ পুণ্যময় দেবস্থানে আমার মত সামান্যা নারীর পক্ষে একদিন তাহা সম্ভবিতে পারে, কিন্তু সেখানে—সেই দেবতা ও ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত প্রদেশে দুর্ব্বল চিত্ত স্থির থাকিবে কি প্রকারে?"

"বৎসে! তোমার মহাভ্রম, পূর্ব্বকথা স্মরণে বোধ হয় এ কথা বলিয়া থাকিবে। পুনর্ব্বার অবিশ্বাস অন্তরে স্থান দিও না। কোন্ স্থানে, কোন্ ক্ষুদ্র পদার্থ সেই ত্রিগুণাতীত মহাগুরু মহাদেব ছাড়া আছে? আর তদ্ভিন্ন যে কার্য্যের জন্য তুমি যাইতেছ, তাহাও ভোলানাথের কার্য্য। এই ত্রিশূল গ্রহণ কর, ইহাকেই পূজা করিও। শূলপাণি তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন।"

সেই জটাকেশী, গৈরিকবসনপরিহিতা রুদ্রাক্ষশোভিতা ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি, জটাজুটধারী প্রশান্তগম্ভীরমূর্ত্তি শৈবের হস্ত হইতে ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া, অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী পুনরায় বলিলেন,—

"বৎসে! অদ্যই যাত্রা কর, যে কার্য্যের জন্য যাইতেছ, তাহার সমাধান হইলেই অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।"

"সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কতদিন পরে কোথায় আপনার দেখা পাইব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"আগামী শীত ঋতুর প্রথমেই এই মঠে ফিরিয়া আসিবে তৎপরে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে বিল্বদল প্রদান করিয়া, তোমাদিগকে লইয়া হরিদ্বারে কুম্ভের মহামেলায় গমন করিব। মনে এই-রূপ বাসনা আছে, শূলপাণি কি করিবেন জানিনা।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"গতবারেই আমার এই মেলায় যাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল, এবার আপনার অনুগ্রহে দেখিতে পাইব শুনিয়া বড় আনন্দ হইতেছে।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"বৎসে! প্রকৃতই কুম্ভের মেলা বড় আনন্দের মিলন উৎসব। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সাধু, সন্ন্যাসিগণ প্রতি তিন বৎসর অন্তর ভারতের চারি ধামে শুভাগমন করিয়া একত্র মিলিত হইয়া থাকেন। এত অধিক সাধু সন্ন্যাসীর একত্র সমাবেশ আর কোন তীর্থের কোন পর্ব্ব উপলক্ষেই পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্গের অম্বিকাপূজা দেখিয়াই তুমি ফিরিয়া আসিও, আমার অন্যান্য অনুপস্থিত শিষ্যবর্গও সেই সময় আসিবে। তুমি শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা কর।"

সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারীর চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ঈশ্বর তোমার কামনা সিদ্ধ করুন।"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে নবীন ব্রহ্মচারী-বেশীকে গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে জনকোলাহলশূন্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে একাকী উপাসনা করিতে দেখিয়াছিলেন, এই সন্ন্যাসিনীই সেই শতানন্দ বা যোগেশ্বর। আর এই প্রশান্ত-কায় পবিত্র পুরুষ ব্রহ্মানন্দ স্বামী। ব্রহ্মানন্দ স্বামী পঞ্চকোট্ পাহাড় ও কল্যাণেশ্বরীর মন্দির হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বহুদেশ পর্য্যটন ও বহু তীর্থে বাস করিয়া, পাঁচ বৎসরের পর, কএক মাস হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন। মালতী বা শতানন্দ এই কয় বৎসর বরাবর তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন।

কোন গুপ্তসাধনার উদ্দেশ্যে মহাযোগী শিবভক্ত ব্রহ্মানন্দ কিছু দিবস অজ্ঞাতভাবে বাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেই কারণ, তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে এই সময় স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। শতানন্দের এক্ষণে আর সে বেশ নাই। প্রভুর অনুমতি গ্রহণান্তর পুরুষের বেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি বহুদেশ পর্য্যটনের পর বারাণসীতে ফিরিয়া আসিয়া শচীকান্তের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের ভয়ানক পরিবর্ত্তন ও অবনতির কথা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলেন। পত্নীর সহিত মনোমালিন্যই তাঁহার এতাদৃশ

দুরবস্থার কারণ শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন। রমণী রমণীর দুঃখ যত সহজে বুঝিতে পারেন, অন্ত আর কে বুঝিতে পারেন? বিনা অপরাধে নারী পুরুষ-কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতেছেন, এ দৃশ্য জগতে বিরল নহে। মালতীর কোমল প্রাণ হিরণ্ময়ী ও সত্যেন্দ্রনাথের জন্য কাঁদিল। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা এখনও তাঁহার হৃদয় হইতে লোপ পায় নাই—এ জনমে কখন পাইবেও না। মালতী এখনও তাঁহাকে ভালবাসেন—এখন তাহা নিষ্কাম নিস্বার্থ। এখন তিনি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভালবাসাই তাহার কার্য্য। যিনি জগতের সমস্ত জীবকে এইরূপ ভালবাসিতে পারেন, তিনি দেব-পদ-বাচ্য।

মালতী মনে করিলেন, যদি সত্যেনের কোন ভ্রান্তি হইয়া থাকে, আর যদি তাঁহার সাহায্যে সে ভ্রান্তির অপনোদন হয়, একবার তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তিনি স্থির করিলেন, গুরুদেবের অনুমতি লইয়া একবার মাণিকনগর যাইবেন। অদ্য ব্রহ্মানন্দের নিকট সেই অনুমতি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশের দুঃসাহস।

লীলাময়ের অনন্ত লীলা কে বুঝিবে? যে কারণে কএক ব্যক্তি মর্ম্ম যাতনায় দগ্ধীভূত হইতেছে, ঠিক সেই কারণে অপর এক ব্যক্তির হৃদয়, অশেষ পাপময় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পথ সরল হইতে দেখিয়া, আনন্দে পুরিত হইতেছে। একজন যে কারণে অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া জগদীশ্বরের নিকট অহরহঃ মৃত্যুকামনা করিতেছে, আর একজন এই অবস্থা দেখিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে; কেহ কাঁদিতেছে, কেহ কাঁদাইতেছে; কেহ পুড়িতেছে, কেহ পোড়াইতেছে; কেহ মরিতেছে, কেহ মারিতেছে; ইহাই জগতের নিয়ম। প্রতিনিয়তই এই দৃশ্য পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সংসারবিরত মালতী যে কারণে কাঁদিলেন, অমরনাথ যে কারণে উন্মাদপ্রায় হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছেন, সতীশচন্দ্র সেই কারণে কত আশান্বিত। এত দিনে তাঁহার রোপিত বিষবৃক্ষের ফলোদয়ের সময় হইয়াছে।

সতীশচন্দ্র ভাবিলেন,—"এই ত সময়, আর কোন বাধা নাই, কোন ভয়ের কারণ নাই; যাহা অদৃষ্টবৈগুণ্যে হয় নাই, যাহা কথায় হয় নাই, কৌশলে হয় নাই, তাহা জোরে সম্পন্ন করিব।" পাপাত্মা সতীশ হিরণ্ময়ী ও সত্যেনের সকল সংবাদই রাখিয়া থাকেন। ছয় সাত মাস পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রনাথ দিনাজপুর যাইবার পর, যখন হিরণ্ময়ীর সহিত দেখা করিতে চাহিয়া উপেক্ষিত হন, তখন তাঁহার মনে যে প্রতিহিংসা বাসনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যথেষ্টরূপে

সাধিত হইলেও, বাসনার নিবৃত্তি নাই, অবস্থা ও সময়ভেদে তাহা অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। এই পাপবাসনা, একবার মনোমধ্যে উদিত হইলে, তাহা সহজে দমিত হয় না। সতীশ গোলাপের নিকট শুনিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া আদৌ হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎকার করেন নাই। তাঁহার আগমনের সংবাদে তিনি ভাবিয়াছিলেন, বুঝি এত দিনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল এইবার ব্যর্থ হইয়া যায়। অধিকন্তু তাঁহার মনে কিঞ্চিত ভয়ও উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন,—'সত্যেন যখন হিরণের সহিত কথা কহিয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতার কথা তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইবেন, যখন শুনিবেন হিরণ অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্র একখানিও পান নাই, তখন তিনি নিশ্চয়ই ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। আর কে বলিতে পারে, সেই অনুসন্ধানের পরিণামে তাঁহার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া না পড়িবে? সত্যেন হিরণের সহিত দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই এবং না বলিয়া পুনরায় বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া বিষাদের পরিবর্ত্তে সতীশ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। প্রবল লালসায় হৃদয় মথিত হইতে থাকিলে, অথবা মন্মথের অতি তীক্ষ্ণ কুসুমায়ুধে বিদ্ধ হইলে, মানব অনেক প্রকৃত কথা বুঝিতে পারে না, পাপকে পাপ বলিয়া মনে করে না; যেন বুদ্ধি, বিবেচনা, জ্ঞান প্রভৃতির উপর একটা আবরণ পতিত হয়। সতীশ লালসার মন্দিরে মনুষ্যত্বকে বলি দিয়া ক্রমে পশুত্বের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি মনে করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার সহায়তা করিতেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মাণিকনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর হইতে, অমর সতীশের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন। হিরণ্ময়ীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া, অনুনয়ে হউক আর বলপ্রয়োগেই হউক, বাসনানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য অনেক বার সতীশের মন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, কেবল অমরনাথের জন্য তাহা করিতে সাহস করেন নাই। হিরণের সহিত তাঁহার নাম কোন সূত্রে একত্র হইয়া অমরের কর্ণগোচর হইলে, সহজেই তাঁহার চক্রান্ত বাহির হইয়া পড়িবে ভাবিয়া, তিনি এতাবৎ কাল হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া মনের কথা—অন্তরের অসীম যন্ত্রণা জানাইতে ভরসা করেন নাই। এক্ষণে অমর নাই, আর কাহাকে ভয়? এখনও শান্তিকাননে দ্বারবান্ প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্ববৎ আছে সত্য, শিক্ষকশূন্য পাঠশালার বালকবৃন্দের ন্যায় কেহ কাহাকেও মান্য করে না। যাহার যাহা কার্য্য, সে তাহা করে না। আছে কেবল এক জন, সে ব্যক্তি মাধব। তাহাকে সতীশের কোন ভয় নাই। অমরের কর্ণে 'সতীশ' এই নামটি প্রবেশ করিলে যে অনিষ্টের সম্ভাবনা, মাধব তাঁহাকে গভীর নিশীথে শান্তিকাননের সীমার মধ্যে দেখিলেও, সে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, ইহা তিনি বেস্ জানেন। অমরনাথ মাণিকনগরে না থাকিলে যদি ক্রমে ক্রমে সত্যেনের

সন্দেহ লাঘব হয়, এই মনে করিয়া তিনি বিনোদলালের সহিত দেখা করিয়া আর বাটীতে আসেন নাই। দোষে হউক আর বিনা দোষেই হউক, তাঁহারই কারণে একটা প্রাচীন ধনাঢ্য জমিদার বংশ ছারখার যাইতেছে দেখিয়া, দুঃখে কষ্টে বন্ধুবৎসল অমর নাথ উন্মত্তবৎ হইয়া অন্যত্র কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্র বাসনা স্থির করিলেন। যাহা মিটিবার নহে, যাহা অজেয় তাহা জয় করিবার প্রয়াস বৃথা। পাপ হউক, অপকর্ম্ম হউক, অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়, তাহাও ভাল। ইহজীবনে নরকের ভীষণ অগ্নিতে আর দগ্ধ হইতে পারি না, যে প্রকারেই হউক, অনেক দিনের লালিত বাসনা মিটাইব।—এই মনে করিয়া সতীশ রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃসাহসের পরিণাম ও দুঃখীর আশ্রয়।

রজনী এখনও দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয় নাই, বিশালপুরী ইতিমধ্যেই নিস্তব্ধ হইয়াছে। সকলেই শান্তিময়ী নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে শায়িত। বিদেশী গৃহরক্ষক নারাণ সিং খট্টায় নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে প্রিয় পত্নীপুত্রের সুখময় স্বপ্নে নিমগ্ন। সৌরভদাসী স্বপ্নে, নিজের সাড়ে তের গণ্ডা টাকা ছিল আর হরির মাতার নিকট হইতে পাঁচ গণ্ডা টাকা কর্জ্জ লইয়া, সোনার দানা গড়াইতে দিতেছেন। ঠাকুরমা ছাদে বড়ি শুকাইতে দিয়া, কাঠবিড়ালি ও পারাবত আড়ানের সুখানুভব করিতেছেন। আর মাধুরী কি একটা শিশুসুলভ মধুর স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছে। আর হিরণ্ময়ী?—হিরণ্ময়ী ব্যাধিজর্জ্জরিত রুগ্নদেহে, এই প্রকাণ্ডপুরীর মধ্যে একাকিনী জাগরিতা থাকিয়া অলীক স্বপ্নসমষ্টিপূর্ণ মানবজীবনের আলোচনা করিতেছেন, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিতেছেন। তাহার জন্য কাঁদিবার কে আছে?

জগতে কাহার জন্য কে কাঁদে? অনাথা বিধবা একমাত্র পুত্রের বিয়োগে ধূলিশয্যায় শুইয়া উন্মত্তবৎ হৃদয়বিদারক চীৎকারে দিগন্ত কম্পিত করিতেছে, আর প্রতিবেশিগণ স্বস্ব সুখনিদ্রার বিঘ্ন ঘটাতে, অন্তরে বিরক্ত হইতেছে। দরিদ্র ভিক্ষুক জঠরানলে দগ্ধ হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে উদরান্নের জন্য কাতরভাবে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, আর গৃহস্বামী বিরক্ত হইয়া তাড়াইয়া দিতেছে। কাহার জন্য কে কাঁদে? কন্যাদায়গ্রস্ত উপায়হীন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ যষ্টির সাহায্যে অতিক্লেশে বহুদূর হইতে ধনীর প্রাসাদে ভিক্ষার্থ আগমন করিতেছে, আর গৃহস্বামীর ইঙ্গিতে বাটীর কোন ভৃত্য কোন ওজরে তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছে। তাহার হৃদয়ের কথা আর কে বুঝিবে? তাহার দুঃখের পরিমাণ করিয়া আর কে অশ্রুপাত করিবে? কেহই কাহারও জন্য

কাঁদে না। হিরণ্ময়ী একাকিনী শুইয়া রোদন করিতেছেন।

যখন পল্লীভূমি গভীর নিশার নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হইল, তখন সতীশচন্দ্র বাহির হইয়া গন্তব্যাভিমুখে চলিলেন এবং গোলাপের সাহায্যে, কোন গুপ্ত স্থান দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, শান্তিকাননে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে সতর্কতার সহিত খিড়কীর পথ দিয়া বাটীর ভিতরে গমন করিলেন। গোলাপ পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল, এবং হিরণ্ময়ীর শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিয়া একস্থানে লুক্কাইত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সতীশচন্দ্র নবীন চোরের ন্যায় সন্তর্পণে গৃহ সমীপে যাইয়া, অগ্রে কবাটের পার্শ্ব হইতে একবার ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রদীপের আলোকে দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, পার্শ্বে একটি শিশু নিদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। তিনি এই স্ত্রীলোককে চিনিতে না পারিলেও, অনুমানে ঠিক করিলেন, তিনি হিরণ্ময়ী, আর ঐ শিশু তাঁহার কন্যা।

সতীশ ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া হিরণের শয্যার নিকট যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হিরণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকায়, প্রথমে তাঁহার আগমন আদৌ জানিতে পারিলেন না। যখন সতীশ ভাবিতেছেন, এইবার কিপ্রকারে কথা কহিবেন, তখন হিরণ অকস্মাৎ নিকটে পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রস্ত ও ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কে গা!" তিনি সতীশকে চিনিতে পারিলেন না, অকস্মাৎ নিজ দেহোপরে বিষধর সর্প দেখিয়া লোকে যেরূপ চমকিত হইয়া উঠে, এ স্থানে এমন সময়ে অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া হিরণ ততোধিক শিহরিয়া উঠিলেন।

সতীশচন্দ্র বলিলেন,—"হিরণ! চিনিতে পারিতেছ না?"

হিরণ্ময়ী সতীশের স্বর চিনিতে পারিয়াও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া, অধিকতর বিস্মিতা ও ভীতা হইয়া বলিলেন,—"সতীশদাদা, তুমি এমন সময় হঠাৎ এখানে কেন এলে?"

"হিরণ্ময়ি, কেন আসিলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহা বুঝাবার নয়, দেখাবার নয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

"দাদা, এখন আমার কাছে কোন দরকার আছে কি?"

"হিরণ! দরকার—আমার যে দরকার তাহা তুমি ভিন্ন আর কেহ মিটাতে পারবে না। তুমি যেমন আমার এখানে আসার কারণ কি—কি প্রয়োজন ভাবিতেছ, আমিও সেইরূপ ভাবিতেছি, এ প্রশ্ন মীমাংসার্থে তোমাকে আমায় জিজ্ঞাসা করতে হল, হায়! অদৃষ্ট!"

"সতীশ দাদা, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারচি না, তোমার প্রয়োজন কি শীঘ্র বল?"

"হিরণ! তোমার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে কি? সেই একত্রে খেলা করা, এক সঙ্গে বসিয়া গল্প করা, সেই এক সঙ্গে কত দিন আহার করা—মনে পড়ে কি? সেই বিবাহের কথা মনে পড়ে কি? তারপর

তোমার বিবাহ হইয়া গেল, তুমি আর এ হতভাগার দিকে চাহিয়াও দেখিলে না—অনায়াসেই ভুলিলে। একবার ভাবিয়া দেখিলে না যে, তোমার পক্ষে আমাকে ভুলিয়া যাওয়া যত সহজ, আমার পক্ষে তত নয়। তারপর তোমার চিন্তা ভুলিতে অনেক যত্ন—অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু যাহা হৃদয়ের সঙ্গে জড়িত, তাহা কি ভুলা যায়? ভুলিতে পারিলাম না, অন্তরে তোমার মূর্ত্তি দিবারাত্র ধ্যান করিতে লাগিলাম। তারপর তোমাকে মধ্যে মধ্যে গোপনে দেখ্‌তে পাব, এই আশায়, আর বলিতে কি, প্রকাশ্যে না হউক, গোপনে আমি তোমার প্রেমসুধা পান করিব মনে করিয়া, অনেক চেষ্টা ক'রে মাণিক নগরে এলাম। হিরণ, তুমি কত নিষ্ঠুর! আমি তোমার সহিত একবার দেখা করিতে চাহিলাম, তাহা তুমি করিতে দিলে না। সেই দিন হ'তে আমার চিন্তা ও বাসনা কালসর্পের ন্যায় আমায় দংশন করতে লাগ্‌ল। আমি পাপ উপায়ে তোমাকে পা'বার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বর অনেক দিনের পর আজি সে সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছেন। হিরণ্ময়ি! আর এ ভয়ানক বিষধরকে হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে পারি না,—আমার প্রাণ যায়! তোমার চরণে ধরি, আমায় রক্ষা কর।

হিরণ্ময়ী অতিশয় ভীতা হইয়া বলিলেন—"দাদা! তোমার এ মূর্ত্তি, এ ভয়ানক মনোভাব কখনও কল্পনাতেও আসে নাই। তোমার সহসা এ কুমতি কেন হইল? তুমি আমার বড়দাদার সমান, আমি তোমার ছোট বোন, এখন তুমি সে সকল চিন্তা ভুলে যাও। যাও দাদা, তুমি এখন এখান হ'তে চলে যাও।'

"হিরণ! সাত বৎসরে যাহা ভুল্‌তে পারি নাই, তোমার এক দিনের কথায় তাহা ভুল্‌ব? এ কি বসন ভূষণ যে ইচ্ছা হয় পরিব না হয় ত্যাগ করিব? এ নিষ্ঠুর অনুরোধ আর করিও না। একথা বল্‌তে তোমার প্রাণে একটু বাজ্‌ল না? সাত বৎসরের চেষ্টায় আজি যে সুযোগ পাইয়াছি, কোন মতেই তাহা পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। হিরণ! প্রাণের হিরণ, আমায় কৃপা কর—আর যন্ত্রণা সহিতে পারি না।"

"সতীশ দাদা! তুমি এখনই চলিয়া যাও। আমার হৃদয় ভয়ে কাঁপিতেছে, দেহ অবসন্ন হইতেছে। নির্জ্জনে এরূপ কথা কহা তোমার বিশেষ অনুচিত, তোমার দুটি পায়ে ধরি, আর এখানে থাকিও না, যাও, এখনই চলিয়া যাও! আর যদি তুমি না যাও, আমিই চলে যাই।

"হিরণ! আবার ঐ কথা? আমার এই কাতর ভিক্ষায় তোমার দয়া হলো না? আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়িব না। যদি প্রফুল্লমনে আমার বাসনা মিটাইতে অসম্মত হও, তাহা হইলে বলপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইব না। এখনও বলিতেছি হিরণ, আমায় কর।"

"তুমি পশু নামেরও অযোগ্য, কিন্তু এখনও তবু তোমায় দাদা বলিতেছি। নরাধম! যদি

মঙ্গল চাও, তবে এখনও চলিয়া যাও! যদি স্বামীপদে আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আমায় স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না। জগদীশ্বর আমার রক্ষা করিবেন। আমি চলিলাম।"—এই বলিয়া হিরণ্ময়ী যেমন দ্রুতবেগে দ্বারাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, অমনি সতীশ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হিরণ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন সহসা এক অপার্থিব রূপলাবণ্যসম্পন্না ত্রিশূলধারিণী সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভৈরবী মূর্ত্তিতে নিজ ত্রিশূল উত্তোলিত করিয়া বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ নরপিশাচ! সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

সতীশচন্দ্র এই ভৈরবীকে হঠাৎ গৃহ মধ্যে দেখিয়া চমকিত হইয়া গেলেন, মনে করিলেন,—"বুঝি স্বর্গ হইতে কোন দেবী সতী হিরণ্ময়ীকে রক্ষা করিতে এবং আমাকে শাস্তি দিতে এ সময় এই ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন।" তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না, ভয়ে স্থির ও নিষ্পন্দভাবে জড়-প্রায় একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভৈরবী তালবৃন্তের দ্বারা হিরণ্ময়ীর মস্তকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর, অল্পে অল্পে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। হিরণ চক্ষুরুন্মীলন করিবা মাত্র দেখিলেন,—পার্শ্বে বসিয়া যেন এক তেজোময়ী দেবী তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া তাঁহার মনে হইল একি স্বপ্ন! আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন, অল্পক্ষণের পর চক্ষু মেলিয়া সেই দেবীকে পুনরায় দেখিলেন; সতীশকেও এইবার দেখিতে পাইলেন। সকল কথা ক্রমে মনে পড়িল। হিরণ্ময়ী ভাবিলেন,—"নিশ্চয়ই জগজ্জননী দুঃখিনীর ক্রন্দন শুনিয়াছেন, এই দেবী আমাকে দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি প্রণাম করিবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিলেন, সন্ন্যাসিনী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বাধা দিয়া বলিলেন,—"ভগিনি, আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, তাড়াতাড়ি উঠিবার প্রয়োজন নাই, শরীর এখনও নিতান্ত অবসন্ন আছে।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"আপনি কে কৃপা করিয়া অভাগিনীর চখের জল মুছাইতে আসিয়াছেন? আমার সকল কষ্ট গিয়াছে, বাতাস করিতে হইবে না।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"আমি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, এখন আমার সম্বন্ধে আর অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিও না, শঙ্কর যদি কখনও দিন দেন, তবে আমার সব পরিচয় পাইবে।

"আমার পাপ মন আপনার কথায় প্রত্যয় মানিতেছে না, আপনি স্বর্গের দেবী আপনার চরণে প্রণাম।"

."ভগ্নি, আমায় প্রণাম করিতে নাই; আমি সামান্যা মানবী মাত্র, শিবদুর্গার কার্য্যে নিযুক্তা আছি।

হিরণ্ময়ী তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন,—"দেবি! আর ছলনা করিবেন না, বলুন আপনি কে? আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

ব্রহ্মচারিণী তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"কি কর ভগিনি, সত্যই বলিতেছি আমি সামান্যা নারী, আমার পদস্পর্শ করিও না, আমার শরীরে শক্তির যে অংশ আছে, তোমাতেও সেই শক্তির অংশ আছে। এখন ওসব কথার আবশ্যক নাই, এই মনুষ্যচর্ম্মাবৃত দানবকে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই নিরূপণ কর।"

যেমন শরৎসোহাগিনী সরোজিনী সমল সলিলে সমুৎপন্ন হইলেও, তাহা পবিত্র ও নির্ম্মল থাকে; যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব প্রশান্ত অতল বারিধির পবিত্র সলিলোপরি যেরূপ দেখায়, ক্ষুদ্র সরোবরের পঙ্কিল দুর্গন্ধময় কৃষ্ণ সলিলেও তদ্রূপ প্রতিফলিত হয়; যেমন স্বুবর্ণ অস্পৃশ্য অপবিত্র আধারে রক্ষিত হইলেও, তাহার স্বর্ণত্ব ঠিক্ই থাকে, হিরণ্ময়ী দুঃখের কঠোর চক্রে নিষ্পেষিত হইলেও, তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্র তেমনই নির্ম্মল ও পবিত্র রহিয়াছে। সতীশের ভীত-কম্পিত কলেবর ও তাঁহার কাতর দৃষ্টি দেখিয়া, তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন,—"দোষ তাঁহার নহে, আমারই অদৃষ্টের দোষে এ সব ঘটিতেছে। আমি উহাকে দণ্ড দিবার কর্ত্তা নহি, অখিলের কর্ত্তা উপরে আছেন।" তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আপনি যেই হউন, আমি জানিব আপনি এই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ছবি। আমি বলহীনা নারী কি বলিব, যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন। আমি উহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতাম, আমার দুরদৃষ্টের ফলে উহার এরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছে।"

ভৈরবী কিছুকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, অব্যাহতি দেওয়াই ভাল, নচেৎ হিরণের এখন যে অদৃষ্ট, হয় ত ইহাতে মহৎ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তিনি বলিলেন,—"ভগ্নি! তোমার মহান্ মনোভাব বুঝিয়াছি; পাপিষ্ঠ যখন পরিচিত, তখন আর চিন্তা করি না।"

তৎপরে তিনি সতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ওরে দুরাত্মন্! বিশ্বনাথের ইচ্ছায় এত শীঘ্রই এ জটিল রহস্যোদ্ভেদ হইয়া গেল। বুঝিলাম তোমা হ'তেই এই দেবীর এই দশা ঘটিয়াছে। হায়! বুঝি তোর নরকেও স্থান নাই। যা—এখন চলিয়া যা, আর এ পবিত্রধামের বায়ু কলঙ্কিত করিস্ না; তোর মহাপাপের অবসানের আর বিলম্ব নাই।"

এই অনুমতি পাইয়া, বন্ধনমুক্ত দুষ্ট মার্জ্জারবৎ, সতীশচন্দ্র গৃহ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল! হিরণ্ময়ী এতদিন ধরিয়া যাহা মনে রাখিয়াছিলেন, সন্ন্যাসিনীর সহানুভূতিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে একে একে সকল কথা বলিলেন। সন্ন্যাসিনী রাত্রি শেষ না হইতেই চলিয়া গেলেন। তাঁহার সান্ত্বনা বাক্যে হিরণ্ময়ী অনেক দিনের পর আজি কিঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন। যেন তিনি মহাসমুদ্রে একটি আশ্রয় পাইলেন।

এই ব্রহ্মচারিণী মালতী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

মালতী নগরের প্রান্তভাগে এক জন-সমাগমশূন্য স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। কি সূত্র অবলম্বন করিলে সত্যেন্দ্রনাথ ও হিরন্ময়ীর পুনর্ম্মিলন হয়,মালতী সর্ব্বদা তাহা-রই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দিবাভাগে গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া বেড়ান, ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণোপযোগি আহারীয়ের সংগ্রহ করেন, আর একমনে মহাদেবের অর্চ্চনা করেন। রাত্রিকালে হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। মালতী পূর্ব্বে কখনও হিরন্ময়ীকে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার কঙ্কালসার, লাবণ্যহীন হৃতসৌন্দর্য্য অবয়বের বিষাদভরা মুখমণ্ডল ও কোটরগত চক্ষু দেখিয়া, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। হিরণ অকপটে তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া থাকেন। সত্যেনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বাটীতে আনিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, মালতী তাহা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, সে তাহা যথাপথে করা হয় নাই; তাহাতেই ইষ্টের পরিবর্ত্তে অধিকতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

উপযুক্ত প্রণালীতে দোহন না করিয়া গাভীর পালানে অস্ত্রাঘাতে যেমন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রুধিরধারা নির্গত হয়, প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ উপযুক্ত প্রণালীতে চেষ্টা না হওয়াতেই, সত্যেন্দ্রনাথের এ অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহাতে দোষ কাহারও নাই, সকলই দুরদৃষ্টের ফল। মালতীর পক্ষে ইহা বুঝিতে পারা যত সহজ হইল, কাহারও পক্ষে—এমন কি হিরণেরও ইহা বুঝিবার তত সুযোগ হয় নাই। মালতী হিরণের নিকট সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে আমূল সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং সেদিনকার ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, সতীশচন্দ্রই এই নিষ্ঠুর চক্রান্তের ভিত্তি। তিনি পোষ্ট অফিসে কর্ম্ম করেন শুনিয়া, সত্যেনের হিরন্ময়ীর লিখিত পত্রপ্রাপ্তি বিষয়েও সন্দেহ করিলেন। তিনি হিরণকে সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সতীশচন্দ্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। মনে স্থির করিলেন,—সত্যেন্দ্র-নাথের এ ভয়ানক সন্দেহ, স্বয়ং সতীশের মুখে না শুনিলে, অপরের দ্বারা এক্ষণে দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। মালতী, একদিন সন্ধ্যার পর, শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করিয়া মাণিকনগর ডাকঘরে সতীশের নিকট গমন করিলেন।

মানব ষড়রিপুর মধ্যে যে কোন একটির বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হইলে, ধর্ম্ম, ক্ষমা, দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সব ভুলিয়া যায়। কিন্তু কখন কখন একটি ঘটনাতে, একটি দৃশ্য, একটি সঙ্গীতে—এমন কি একটি কথাতে হৃদয়ের পাপ যবনিকা একে-বারে সরিয়া যায়। জ্ঞানও বিবেক ফিরিয়া আইসে, পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য মহা অনু-তাপে অন্তর জ্বলিতে থাকে। পাপকার্য্যের

গুরুত্ব অনুসারে, যদি প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা করিতে প্রাণ লালায়িত হইয়া উঠে, জীবন দিয়াও অনুতাপের জ্বালা-ময় অনল নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছা করে। সতীশচন্দ্রের এখন কতকটা এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

যাহা অচিন্তনীয়, যাহা কল্পনার অতীত, এরূপ ঘটনা ঘটিলে, তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহের কারণ, এরূপ অনুমান করা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। গভীর নিশীথিনীতে অন্ধকার অট্টালিকার নিভৃত কক্ষে ত্রিশূলধারিণী তেজোময়ী ভৈরবী মূর্ত্তিকে অবলোকন করিয়া অবধি সতীশের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। দেবানুগৃহীতা হিরণ্ময়ীর এ অবস্থার কারণ আপনাকেই বুঝিয়া, হৃদয়ে ভীতি ও অনুতাপের উদয় হইয়াছে। আশা পূর্ণ হইবার পক্ষে একেবারে অসম্ভব দেখিলে, স্বল্পেই মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়,—হয় ক্রোধ না হয় দুঃখ বা অনুতাপ উপস্থিত হয়; কিন্তু পরিণামে প্রায় অনুতাপই মনে আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন সতীশ বুঝিলেন, হিরণের প্রেমোপভোগের আর আশা নাই, দেবতা যখন সতীর সহায়, তখন তাঁহার লালসা ও ক্রোধের উপশম হইয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত হইল। স্বপ্নঘোর কাটিলে, জাগরিত হইয়া তিনি দেখিলেন, মাণিকনগরের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ তাহা হইতেই ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে, দুইটি পবিত্র জীবন তাহাহইতেই দুঃখের অকূল সাগরে ভাসিতেছে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যেমনটি ছিল, তেমনটি যাহাতে হয়, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

ব্রহ্মচারিণী ডাকঘরে আসিয়া একেবারে সতীশচন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। সতীশ এখনও শয়নের উদ্যোগ করেন নাই; বসিয়া কি একটা কাগজ দেখিতেছিলেন। সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন। তিনি শঙ্কিত হইয়া শশব্যস্তে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী ভয়চকিত মুখমণ্ডল দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন। ধীরভাবে তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন, সতীশচন্দ্র তাঁহাকে কোন দেবী জ্ঞানে সকল কথা সত্য বলিলেন, কিছুই লুকাইতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—

"আমি সামান্যা মানবী—দুর্গার দাসী, ক্ষমা করিবার অধিকার আমার নাই। প্রায়শ্চিত্ত কর, শিবানী তোমায় ক্ষমা করিবেন।"

সতীশ বলিলেন, "আজ্ঞা করুন আমার কি প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত, আমি সকলই করিতে প্রস্তুত।"

মালতী বলিলেন,—"পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুণ্যকার্য্যে—কেবলমাত্র অনুতাপে নহে। আপাততঃ অবিলম্বে সত্যেনের নিকট যাইয়া, আজি আমার নিকট যেরূপ বলিলে, ঐরূপ সকল পাপ চক্রান্ত ও হিরণ্ময়ীর পবিত্রতার কথা নিজ মুখে বল। দম্পতির পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়া দিতে না পারিলে বিশ্বেশ্বর তোমার

ক্ষমা করিবেন না; অনন্তকালের জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে।"

সতীশ তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে পর, মালতী চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন ফুরাইতে লাগিল।

যখন সংসার প্রথম পাতা যায়, তখন লোকে মনে কত আশার স্থাপন করে, তার-পর হয়ত সে আশা, সে সুখ-স্বপ্ন সব ভাসিয়া যায়; ক্রমে জীবন অতিবাহিত করা একটা ভার বলিয়া মনে হয়; তথাপি সংসার এক-রকমে চলিয়া যায়। দিন কাহারও জন্য কখ-নও বসিয়া থাকে না, কোনপ্রকারে কাটিয়া যায়-ই। ঘন ঘোর ঝটিকার অবিরত বর্ষণ ও অশনি সম্পাতে মেদিনী কাঁপিতেছে, দরিদ্রা সহায়হীনা রমা শিশু সন্তান লইয়া একটি জীর্ণ কুটীরে থাকিয়া করকাভিঘাতে ক্ষণে ক্ষণে নিপীড়িত হইয়া উর্দ্ধনয়নে ভগ-বান্‌কে ডাকিতেছে, প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া চরাচর সকলেই স্তম্ভিত-ভীত, কিন্তু এ দিন থাকিবে না। এ ভয়ানক দিন যাইবে, আবার প্রকৃতি হাসিবে। পুত্রহারা মানব নিজ তনয়কে, স্বামীহারা যুবতী নিজভর্ত্তাকে শ্ম-শানে চিরদিনের জন্য চিতার আগুনে সঁপিয়া গৃহে ফিরিয়া মাটিতে পড়িয়া রোদন করি-তেছে, কিন্তু এদিনও যাইবে। আবার ধন-গর্ব্বিত মদমত্ত যুবক বিনাপরাধে বা অল্পাপ-রাধে দুর্ব্বলকে পদাঘাত করিয়া ক্রোধানল নিবাইতেছে, সামান্য অর্থের কারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্নের সংস্থান সামান্য সম্পত্তিটুকু বিক্রয় করাইয়া লইতেছে, আর সেই দুঃখী করযোড়ে করুণা ভিক্ষা করিতেছে, অহঙ্কারী যুবক তাহার কাতর ক্রন্দনে উপেক্ষা করিয়া নিজকার্য্য করিয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিনও তাহার থাকিবে না, ইহাও যাইবে।

কাহার দিন যায় না? সতীশের দিন যাইতেছে, সত্যেনের দিন যাইতেছে, অম-রের দিন যাইতেছে, মালতীর দিন যাইতেছে আর হিরণেরও দিন একটি একটি করিয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে মরণের দিনও ক্রমে নিকটে আসিতেছে। হিরণ্ময়ীর এ দিনও বুঝি চলিয়া যায়।

এত দিন হিরণ্ময়ী যে রোগ গোপনে রাখিয়াছিলেন, বিনা চিকিৎসায় ও দেহের প্রতি উপেক্ষা এবং অত্যাচারে এখন তাহার আধিক্যের উর্দ্ধসীমায় উপনীত হই-য়াছে, এতদ্ভিন্ন বিবিধ আনুষঙ্গিক ব্যাধিতে তাঁহাকে এককালে আক্রমণ করিয়াছে। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে, দিনে দিনে জীবনীশক্তির লাঘব হইয়া শরীর অবসন্ন হইতেছে। মাধব ও মালতী প্রাণ-পণে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, চিকিৎসাও রীতি মত হইতেছে। কিন্তু পীড়ার উপশম নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। চিকিৎসকগণও ক্রমে জীবনের প্রতি সন্দি-হান হইতেছেন।

এই সময় লীলাবতী বৌ-দিদির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া একবার দেখিতে আসিলেন। তিনি তাঁহার এতাদৃক্ অবস্থার

কথা কল্পনাও করেন নাই। তিনি আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন—সে স্বর্গীয় প্রতিমা কালীমাময় চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে, সে শান্তশীতল অপরূপ লাবণ্যপূর্ণ দেহকান্তি চিন্তা-পিশাচীর দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে। দেখিলেন, তাহার সোনার বৌ-দিদি দাদার সোনার সংসার শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। লীলাকে দেখিয়া হিরণের অপাঙ্গ বহিয়া একবিন্দু জল পড়িল। পরক্ষণেই সে ভাব সংবরণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—

"ঠাকুরজি এসেচ? এস; রোজ রোজই তোমায় মনে পড়ে; যা'হোগ শেষ সময় একবার দেখা হলো।" লীলাবতী এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হিরণ পুনরায় বলিলেন,—

"ঠাকুরজি, কাঁদ কেন? আমি ত জিতিলাম, এমন মরণ ক'জনের হয় ভাই? আমার কাছে এস।" ইহা শ্রবণ করিয়া লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"বৌ-দিদি, অমন অলক্ষণে কথা বলো না, ভাল হবে বৈ কি, অসুখ কি হয় না?"

"না ঠাকুরজি আর না, এ অসুখ সার্‌বার নয়, বাঁচবার সাধ আর আমার নাই। মৃত্যুকে আর ভয় করি না। তোমরা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যেন বেসী দিন আর যন্ত্রণা সহিতে না হয়।"

লীলা নিকটে যাইয়া অঞ্চল দ্বারা চখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বৌদিদি, তুমি মরিলে এ সংসারের কি হবে, দাদার দশাই বা কি হবে? ওকথা তুমি আর মুখে এনো না।"

"ভাই, সংসারের কথা বলচ? আমি বেঁচে থাকতেই বা কি করিলাম। আর তোমার দাদার দশা,—তাঁর দুর্দ্দশারই বা কি বাকি আছে? আমি মরিলে হয় ত দশা ফিরিতেও পারে।"

"মধ্যে যখন দাদা এসেছিলেন, তখন আবার কবে আস্‌বার কথা বলে গেছিলেন? এ অসুখের কথা তিনি শুনেছেন কি?"

হিরণ্ময়ী আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি যে এ অসুখের কথা শুনিয়াছেন বা যখন তিনি বাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন আদৌ সাক্ষাৎ করেন নাই, এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। কেবল নীরবে চক্ষু হইতে কএক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মধ্যে যখন হিরণ্ময়ীর কঠিন পীড়ার সংবাদ লইয়া একজন কর্ম্মচারী কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করেন নাই। সেই অবধি তিনি আর কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে দেন নাই। হিরণের একবার তাঁহাকে অন্তিমে দেখিয়া মরিবার সাধ হয়; কিন্তু যাহার উপায় নাই, তাহার জন্য রোদন ভিন্ন আর কি আছে। ব্যাধির যন্ত্রণা যখন কিঞ্চিৎ কম থাকে, তখনই হিরণ মনে মনে স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করেন, আর চক্ষুর জলে উপাধান সিক্ত হইয়া যায়।

যখন মাধুরী আধ আধ স্বরে কথা কয়, অসংলগ্ন ভাষায় তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করে, যখন হিরণের মুখপানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তখন তাঁহার দুঃখবেগ একেবারে উথলিয়া উঠে। কন্যাকে ধীরে ধীরে বক্ষে ধরিয়া কতই রোদন করেন। শিশু যেমন পারে, তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করে। হিরণ আর কি উত্তর দিবেন। এইরূপে হিরণ্ময়ী শুকাইতে লাগিল, ফুল শুকাইতে শুকাইতে আর কয়দিন থাকে! ঝরিয়া পড়িলেই হয়।

হিরণ্ময়ীর অবস্থা দেখিয়া, লীলা আর একবার দাদাকে সংবাদ দিবার কথা হিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যেনের বিরক্তি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া, ইচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। মাধব, মালতী ও লীলা পরামর্শ করিয়া হিরণ্ময়ীর অজ্ঞাতে সত্যেন্দ্রনাথকে আর একবার সংবাদ পাঠানই যুক্তি বোধ করিলেন। মাধব সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। আর মালতী পুনরায় সতীশের অন্বেষণে গমন করিলেন। কিন্তু মাণিকনগরের ডাকঘরে যাইয়া শুনিলেন, যে অদ্য প্রত্যুষ হইতে তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

আলোক।

রামচন্দ্র গিয়াছেন, অযোধ্যা আছে; কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা রহিয়াছে, রমুলাস গিয়াছেন, রোমনগর আজিও ইউরোপের মানচিত্রে রহিয়াছে; নিউটন, আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও প্রভৃতি সকলেই গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য সকল জনপদে পরিগৃহীত হইতেছে; বুদ্ধদেব, লুথার, মাহাম্মদ প্রভৃতি প্রচারকগণ গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মসকল আজিও লুপ্ত হয় নাই। স্রষ্টা চলিয়া যায়, কিন্তু সৃষ্টি সহজে লুপ্ত হয় না। লোক যায়, নাম থাকে; ক্ষত শুকায়, দাগ থাকে; সুখ যায়, স্মৃতি থাকে।

আমরা বলিতেছিলাম সত্যেনের কথা। তাঁহার কি ছিল, এখন কি গিয়াছে? যাহা ছিল, তাহা সবই আছে; আবার কিছুই নাই। আহারীয় আছে, ক্ষুধা নাই; বৈভব আছে, ভোগ-লিপ্সা নাই; প্রেম আছে, আকুলতা নাই; বাসনা আছে, প্রবৃত্তি নাই; স্মৃতি আছে, সুখ নাই। যাহার সুখ নাই, তার কি আছে? সেই জন্যই বলিতেছিলাম তাঁহার সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। তাঁহারও দিন যাইতেছে। উচ্চ মনোবৃত্তিগুলি হারাইয়া কোন দুষ্কার্য্য করিলে মানব যেমন করিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দেয়, সত্যেন্দ্রনাথ তেমনই করিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। যখন আর প্রবোধ মানে না, তখন সন্তাপহারি সুরাপান করেন। এমনই করিয়া তাঁহার দিন চলিয়া যাইতেছে। এমন সময় তাঁহার নামে একখানি পত্র ও একটি পুলিন্দা পৌঁছিল। ইদানীং তাঁহার আর পত্রাদি আসিত না, সুতরাং তিনি কিছু বিস্ময়ের

সহিত অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রথমে লিপি উন্মোচন করিয়া নিম্নলিখিত রূপ পাঠ করিলেন,—

"মহাত্মন্! আপনার চরণে আমার কোটি নমস্কার। ক্ষমা ও সহনগুণে যাঁহার হৃদয় পূরিত, সন্দেহ ও ভ্রান্তির বশে ক্রোধ-পরায়ণ হইবার পূর্ব্বে যে মানব আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, তিনি দেবত্বের অধিকারী হইয়াছেন, এইরূপ এ নরাধমের মনের বিশ্বাস। এখন বুঝিয়াছি আপনাতে আর আমাতে কি প্রভেদ। আপনি স্বর্গের দেবতা, আমি নরকের কীট। আমার গ্রহবৈগুণ্যে, এ হতভাগার দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা ও অদম্য স্বার্থলালসার ফলেই আপনারা এ ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অনন্তকাল নরকে বাস করিয়া এ পাপের ফল আমিই ভোগ করিব। আমি এক্ষণে মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইয়াছি। আপনি যদি কখনও ক্ষমা করেন, ধর্ম্ম কখনও ক্ষমা করিবেন না। এই কএক বৎসর ধরিয়া যে পাপ চক্রান্তের জন্য অনবরত ঘুড়িয়া বেড়াইতেছি, তাহা সব মনে পড়িতেছে! আমারই জন্য হিরণ্ময়ী মরিতে বসিয়াছেন, উঃ! এ ভয়ানক চিন্তা আর মনে আনিতে পারি না। আমারই কারণে বন্ধু-বৎসল অমরনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়া দেশ-ত্যাগী হইয়াছেন; আমা হইতেই আপনার এ সোনার সংসার মহাশ্মশানসম হইবার উপক্রম হইয়াছে; এ কথা ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

"হিরণ্ময়ী দেবী, আমার সাধ্য কি উঁহার বিমল পবিত্রদেহ কলঙ্কিত করি। তাঁহার জীবনের দিন ফুরাইয়াছে, আমিও মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, তথাপি পাছে 'হিরণ অসতী' এ কথা আপনার মনে থাকিয়া যায়, আর নির্দ্দোষী অমরের প্রতিও সন্দেহ চির-দিনের জন্য আপনার অন্তরে গ্রথিত হইয়া থাকিবে, কেবল এই জন্য আজি এ পত্রখানি লিখিতেছি। জানিবেন অমর নির্দ্দোষ—, আপনার প্রকৃত বন্ধু। আমার পাপ বাসনা ও ষড়যন্ত্রের কথা বিস্তারিত করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। আপনি দিনাজপুর যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি মাণিকনগর পোষ্ট আফিসে আসি। আপনি হিরণ্ময়ীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, জানিবেন তিনি তাহার একখানিও পান নাই এবং যদিও আপনি জানেন তিনি আপনাকে একখানিও পত্র দেন নাই, কিন্তু তাহা নহে। তিনি একে একে অনেকগুলি পত্রলিখিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে পাঠাই নাই; আর আপনার লিখিত পত্রগুলিও তাঁহাকে দিতে দিই নাই। এই পত্রের সঙ্গে যে পার্শ্বেলটি পাঠাইলাম, ইহা খুলিলেই সেই লিপিগুলি দেখিতে পাইবেন। ভরসা করি ইহাতেই আপনার সকল সন্দেহের ভঞ্জন হইবে।"

"এক্ষণে একটি ভিক্ষা, কৃপা করিয়া এই পত্রপাঠান্তে অবিলম্বে আপনার হিরণ্ময়ীকে একবার দেখা দিবেন, একবার বলিবেন,— 'হিরণ, তুমি দেবী, তোমার কোন দোষ নাই, রাক্ষসের ষড়যন্ত্রে আমার মহৎ ভ্রান্তি ঘটিয়া-

ছিল। সে রাক্ষস—সতীশ ; তাহার নিপাত সাধন হইয়াছে।" আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, হিরণ্ময়ী যেন আপনার মুখে তাঁহার নির্দ্দোষিতার কথা শুনিয়া মরিতে পারেন।"

"নরাধম—সতীশ চন্দ্র—।"

চিঠি পড়িয়া সত্যেন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তীব্র মদিরার বিকট নেশাও সেই সঙ্গে ছুটিয়া গেল। কিয়ৎকাল সেই পত্র-হস্তে নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—ভগবন্! স্বার্থের জন্য মানব এতই করিতে পারে?" তৎপরে আবার মনে হইল—"কে বলিতে পারে ইহাও কোন ষড়যন্ত্র নহে, স্বচক্ষে যে প্রমাণ সকল দেখিয়াছি, তাহাও কি মিথ্যা।"

সত্যেন ধীরে ধীরে পার্শ্বেলটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এক এক খানি করিয়া তাঁহার ও হিরণ্ময়ীর সকল পত্র গুলি পাঠ করিলেন। আর কোন সন্দেহই রহিল না। হিরণ্ময়ীর কাতরতাপূর্ণ লিপি পাঠ করিয়া, একেবারে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিবাহের দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত হিরণের সম্বন্ধে কত কথা মনে পড়িল। তাঁহারই তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষায় প্রাণের হিরণ দেহ বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছেন ভাবিয়া এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যখন সত্যেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে বৃদ্ধ মাধব ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যেন তাঁহাকে দেখিবামাত্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মাধব! আবার এ হতভাগার কাছে কেন এসেছ? বল আমার হিরণ এখনও বেঁচে আছে কি?"

মাধব বলিল,—"বাবু, আপনি কাঁদ্‌বেন না, চিকিৎসা বেশ হচ্চে, তিনি ভাল হবেন। আপনাকে দেখ্‌লেই তাঁর ব্যারাম অনেক ক'মে যাবে। এখনই চলুন।"

সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি যাবার জন্যই বেরিয়েছি, কিন্তু এ মুখ হিরণকে কেমন করে দেখাব ঘোষজা? আমার কেন মরণ হয় না। বিনাপরাধে আমি তাকে কত কষ্ট দিয়েছি, উঃ! মনে হলে যে বুক ফেটে যায়! সেদিন যখন আমার ঘরে এলো, তখন যে আমি কথা না কয়ে চলে এসেছি, কোন্ মুখে আমি আবার তাকে হিরণ বলে ডাকব। বল মাধব, আমার হিরণ এখনও প্রাণ রেখেছে?"

মাধব সত্যেনের অবস্থা দেখিয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—"আমি কি আপনাকে মিথ্যা বল্‌চি, যা হয়ে গেছে, সে কথা আর মনে কর্‌বেন না। আপনি এত উতলা হ'লে চলবে না। ডাক্তারেরা এখনও ভাল হবার আশা করেন, চলুন গিয়ে যা'তে তিনি শীঘ্র আরাম হন, তার চেষ্টা করা যাগ্। আপনি গেলেই আমরা আবার দ্বিগুন উৎসাহে পরিশ্রম কর্‌তে পার্‌ব।"

সত্যেন উন্মত্ত আবেগে বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, মাধব! তুমি আমার যে উপকার করেচ, তার ঋণ কি আমি শুধ্‌তে পারব। হায়! এই হতভাগার জন্যই প্রাণের বন্ধু অমর আজি দেশত্যাগী। অমর! ভাইরে, আজ তুমি কোথায় রয়েছ? আর তুমি এ পাপিষ্ঠ সত্যেনের মুখ দেখ্‌বে কি? তোমার ভালবাসার তুলনা নাই, আমি তোমার অযোগ্য অধম বন্ধু।"

মাধব বলিল,—"সত্যেন বাবু! কাহারও দোষ নাই, গ্রহেতে ওরকম করাচ্ছিল। আপনি অত ভাব্‌বেন না, অমর যাবে কোথা? আবার আসবে, আবার সব সেই রকম হবে।"

সত্যেন বাধা দিয়া বলিল,—"আবার কি হবে মাধব, আবার কি হিরণকে পাবো? ভগবান্ তা যদি করেন, তবে আবার একদিন সব হ'তে পারে। কিন্তু তা হলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না ত। আমি যদি আবার তাই পাব, তা হলে ত জগদীশ্বরের রাজ্যে অবিচার হবে।"

মাধব বলিল,—"মধুসূদন অবশ্যই মুখ তুলে চাইবেন, তিনি রক্ষা না কর্‌লে আর কে কর্‌বেন? বিলম্বের দরকার নাই, এখনই যাই, চলুন।"

মাধব ও সত্যেন্দ্রনাথ আর বিলম্ব করিলেন না, তৎক্ষণাৎ বাটী আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় মাণিকনগরে আসিয়া পৌচিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দৈববাণী সফল হইল।

হিরণ্ময়ীর পীড়া আর চিকিৎসা মানিল না, আত্মীয় জনের শুশ্রূষার আর কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমে সেই কঠিন শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয় প্রতিবেশী ও স্বজন সকলেই অন্তিমের দেখা দেখিতে আসিলেন। সকলেই কাঁদিল। হিরণ বুঝিলেন, আজ দিন শেষ হইল। সন্ধ্যা অতীত হইল, চির রজনী যে চাঁদ উঠিয়া থাকে, সেই চাঁদ আজিও আকাশের গায় ফুটিয়া উঠিল। বাতায়ন মধ্যদিয়া হর্ম্মতলে জ্যোৎস্নার আলোক নিপতিত হইল। ফুর্ ফুর্ করিয়া মন্দবায়ু সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তখন হিরণ লীলাবতীকে বলিলেন,—"ঠাকুরঝি, রাত্রিও হইল, আর আশা কি? মনে বড় দুঃখ রহিল, যে একবার দেখ্‌তে পেলাম না।"

লীলাবতী বলিলেন,—"বৌদিদি! এখনও দাদার আস্‌বার সময় আছে, ঘোষজা এখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

হিরণ্ময়ী কোন উত্তর দিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনরায় সত্যেন্দ্রনাথের আগমনের আশা করিতে লাগিলেন। আশা, তুমি ধন্য, তোমার ক্ষমতা ধন্য! তুমি না থাকিলে মানবজীবন কি ভাবে গঠিত হইত, তাহা বলা দুরূহ। যে অতুল ধনের অধিকারী, সে আবার ধনের আশা করে; যাহার কোন অভাব নাই, সেও যাহাতে চিরদিন এইরূপে কাটে, তাহার আশা করে; আবার যাহার

সর্ব্বস্ব গিয়াছে, সেও পুনরায় কত আশা করে; মানুষ ডুবিয়া মরিতেছে, তথাপি বাঁচিবার আশায়, একগাছি তৃণ পাইলে, তাহাই ধরিতে যায়। আশা! তোমায় ছাড়িয়া মানব এক দণ্ড বাঁচিতে পারে না। পলে পলে পরমায়ু ফুরায়—আশা ফুরায় না; মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে বুঝিয়াও, মানব আশা ছাড়িতে পারে না। হিরণ আবার বলিলেন,——

"যদি তাঁহাকে দেখা আমার অদৃষ্টে না থাকে, আমি মরিলে, যখন তিনি আসিবেন, হয়ত এমনও এক দিন আস্‌বে, যখন তিনি এ দুর্ভাগিনীর নাম ক'রে একটি নিশ্বাস ত্যাগ কর্‌বেন; তখন একবার তাঁকে বোলো যে, আমি জীবন মরণে তাঁরই দাসী। এ দুস্তর অমৃতসাগর পার হওয়া আমার কপালে নাই, তাই মরিলাম; কিন্তু তিনি যে কোন ভ্রমের বশে আমায় ত্যাগ করেছেন, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমি একদিনের জন্যও মনে স্থান দিতে পারি নাই।"

লীলা অন্য কথা বলিতে যাইতেছিলেন, হিরণ পুনরায় বলিলেন,—

"ঠাকুরঝি! একটি বড় দুঃখ মনে রহিল যে, একবার তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাহিতে পারিলাম না। তিনি যদি এসময় কাছে এসে একবার হিরণ বলে ডাক্‌তেন, তা হ'লে আমার কোন কষ্ট থাকে না। আর আমি ত মরিব, আমার জন্য আমার দুঃখের বাছা মাধুরীর সকল সুখের পথে কাঁটা পড়্‌ল। তোমরা ভাই আমার বুকের ধনকে দেখো।"

লীলাবতী নিজ চক্ষের জল মুছিয়া বসনাঞ্চল দ্বারা হিরণের চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—

"বৌ দিদি! কেন ভাই এসব কথা মনে কর্‌চ? এ রকম অসুখ থে'কে কেহ কি কখন ভাল হয় না? মাধুরীর কিসের ভাবনা বৌদিদি?"

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর আবার পীড়ার যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। লীলা বাতাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সত্যেন বাটী আসিয়া পৌঁচিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিতে যাইতেছেন, প্রথমেই ঠাকুরমা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। সত্যেন কোন কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে, আপন শয্যাগৃহে যেখানে হিরণ্ময়ী আছেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এতদিনের পর তিনি তাঁহার সাধের শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া কি দেখিলেন! দেখিলেন,—তাঁহার প্রাণের হিরণের সহিত সুখ-শান্তি, আশা উন্নতি চিরসমাধিস্থ হইতেছে।

লীলাবতী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রীহীন অবয়ব, দুঃখ ও ব্যথাপ্রপীড়িত বদন মণ্ডল দেখিয়া এবং যুগপৎ ভ্রাতৃজায়ার কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। "দাদা! আর কি দেখ্‌তে এলে?"—এই কথা বলিতে বলিতে

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৃহের মধ্যে আর দুই এক জন যাহারা ছিল, তাহারাও অশ্রু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল।

হিরণ্ময়ীর এখনও জ্ঞান সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে হৃদয়বল্লভ স্থির দৃষ্টিতে তাহারই প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। আকস্মিক অতিমাত্রায় দুঃখে ও আহ্লাদে হিরণ হতচৈতন্য হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ভীত-কম্পিত কণ্ঠে মুদ্রিতনয়না পত্নীর প্রতি চাহিয়া ডাকিলেন,—'হিরণ!'

সত্যেন! দেখ, ভাল করিয়া দেখ; তেমনই কোমল স্বরে আর একবার হিরণ বলিয়া ডাক। তোমার সাধের সম্বোধনের এই শেষ! তোমার সংসারে তৃপ্তি, সুখ ও শান্তিরও বুঝি এই শেষ!

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর হিরণ্ময়ীর একবার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন তিনি সত্যেন্দ্র নাথকে আরও নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি কাছে সরিয়া গিয়া হাতে মুখ চাঁপিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইতেছে যে, একবার তাঁহার সকল অপরাধের জন্য প্রাণ ভরিয়া ক্ষমা চাহেন; কিন্তু কে যেন তাঁহার মুখ চাঁপিয়া ধরিতে লাগিল, তিনি বাক্‌শক্তি-রহিত-প্রায় হইয়া রহিলেন। হিরণ অতি কষ্টে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—'আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকি, তুমি কেঁদনা, তোমার চক্ষে জল দেখে আমার বড় কষ্ট হয়।"

কিছুক্ষণ হিরণ নীরব রহিলেন। তারপর তিনি বলিলেন,—"আমার মত মরণ কার হয়, আর আমার কিসের কষ্ট, বল? তবে এই বড় দুঃখ রইল, যে সংসার আপন হাতে পাতিলাম, তাহা ভাল ক'রে ভোগ করতে পারলেম না। আমার সাধ আহ্লাদ মিট্‌ল না, আমার সবই রইল, কেবল আমিই চল্‌লাম।"

সত্যেন এইবার বলিলেন,—"এ স্ত্রী-হন্তার দশা কি হবে হিরণ? আমায় কার কাছে রেখে চল্‌লে।"

হিরণ্ময়ী অল্পক্ষণ পরেই বলিলেন,—"ছি ও কথা বলো না, আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তোমাকে পেয়েও মনের সাধে দু-দিন ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেলাম না। আমায় তোমার পায়ের ধুলো দাও, আর একবার মুখ ফু'টে বল যে, আমায় ক্ষমা কর্‌লে।"

এই কথা বলিয়া হিরণ স্বামীর পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছায় হাত বাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা তুলিতে তুলিতেই পড়িয়া গেল। সত্যেন নিজ হস্তে তাঁহার হস্ত ধরিলেন। হিরণ আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহ শীতল হইল, কপালে স্বেদ বিন্দু দেখা দিল। সাধ্বী পতির পার্শ্বে পতির হাতে হাত রাখিয়া, তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, মহাসুপ্তিতে অভিভূতা হইলেন। দিবা দ্বিপ্রহরের ভরা হাটে হিরণ তাঁহার জীবনবিপণি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর ঝটিকায় তৈলপূর্ণ অলন্ত প্রদীপ চিরনির্ব্বাপিত হইল। হিরণ্ময়ী মরিলেন।

রাত্রিতেই হিরণের মৃতদেহ নদীতীরে শ্মশানে নীত হইল। এখন গগনে সুধাংশু নাই, যামিনী ভয়ঙ্কর তমসাময়ী, এরূপ অন্ধকার প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল আয়োজন সমাধা হইলে পর চিতা রচিত হইল। শবদেহ তদুপরি শায়িত করা হইল। সত্যেনের চক্ষে এখন আর জল নাই, দৃষ্টি অনেকটা অর্থশূন্য। এক ব্যক্তি তাঁহাকে চিতাপার্শ্বে লইয়া গেলেন। ঐ দেখ সত্যেন ধীরে ধীরে নিকটে গেলেন, ঐ দেখ চিতায় অগ্নি সংযোজিত করিলেন। চিতা জ্বলিল,—ধূ ধূ করিয়া জ্বলিল। শ্মশানে নদীবক্ষে চিতাগ্নির আলোক পড়িল। নিকটস্থ লোক সমূহের দীর্ঘ ছায়া ভয়ানক দেখাইতে লাগিল। শ্মশান-শিবা ও সারমেয়গণ দূরে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। সর্ব্বরূপগ্রাসী ভয়ঙ্কর রূপ-বহ্নিতে হিরণ্ময়ীর অসীম রূপ মিশিয়া গেল। অনন্তকাল ধরিয়া অগণিত রূপকে গ্রাস করিয়াই বুঝি বহ্নির এ অপরূপ রূপ! অসংখ্য মানবের অসীম জ্বালা বক্ষে ধরে বলিয়াই বুঝি অগ্নি এত জ্বালাময়? ফট্‌ফট্, পট্‌পট্ করিয়া ক্রমে সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের শান্তি, সুখ, সাধ, বাসনা, আশা, উন্নতি—সব ঐ চিতার আগুনে পুড়িয়া গেল। এক ফুৎকারে তাসের অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল।

যতক্ষণ সেই সোনার লতিকা চিতাশয়নে থাকিয়া ধীরে ভস্মীভূত হইতেছিল, সত্যেন একদৃষ্টিতে ততক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়াছিলেন। চিতা নিবিল। সত্যেনের সুখের প্রদীপও চিরদিনের জন্য নিবিল। শ্মশানভূমি পুনরায় শেষ রজনীর গভীর আঁধারে ডুবিল। নিশা অবসানপ্রায় বুঝিয়া, রজনীতে স্নান না করিয়া সকলেই প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সত্যেন দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে আর একটি চিতা জ্বলিতেছে। পরম্পরায় শুনিলেন এক আত্মহত্যার লাশ দাহ করিতে আনিয়াছে। উৎসুক হইয়া কেহ কেহ নিকটে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আমাদের পোষ্ট মাষ্টার বিষ খাইয়া মরিয়াছেন।" সত্যেন্দ্রনাথ পোষ্ট মাষ্টারের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, তিনি নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ইহার নাম কি ছিল?" একজন উত্তর দিল,—"সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

সত্যেন সেই অর্দ্ধ-বিকৃত কলেবর সতীশচন্দ্রের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। যাহাকে জীবিত কখনও দেখেন নাই, তাঁহাকে মৃত দেখিলেন। একদিনে এক শ্মশানে সতীশের দেহ হিরণের সহিত চিরলুপ্ত হইয়া গেল। সত্যেন ফিরিয়া গিয়া সেই অগ্নির দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, কে বলিতে পারে।

ভোর হইতে না হইতেই সকলে স্নান করিলেন, সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

প্রতিদিন সূর্য্যদেব যেমন উদিত হইয়া থাকেন, আজিও তেমনই উঠিলেন। পাখিগণ তেমনই কূজন করিতে লাগিল। কিন্তু তপন-

দেব কালি শান্তিকাননে কি দেখিয়া অস্ত গিয়াছিলেন, আর আজি উঠিয়া কি দেখিলেন? এক বৎসরের পর সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ভানুর উদয় দেখিলেন। সত্যেনের চক্ষে জলধারা নাই, মুখে কথা নাই; তিনি ধীরে ধীরে শয়নগৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মেজের একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর মা আসিয়া কতবার ডাকিলেন, সত্যেন কথা কহিলেন না। একজন আত্মীয় মাধুরীকে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন, তিনি একবার চাহিয়া দেখিলেন। ক্রোড়ে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন না বা কন্যাও তাঁহার নিকটে যাইল না। তাঁহার চক্ষে এক ফোঁটা মাত্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া সত্যেন্দ্রনাথ উঠিলেন; ধীরে ধীরে তাঁহার সেই বড় সাধের কাননে প্রবেশ করিলেন, এবং এক নিভৃত কুঞ্জের ভিতর যাইয়া উপবেশন করিলেন। এখন সূর্য্যের প্রখর কিরণে জগৎ আলোকিত। সত্যেন কতদিন হিরণের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়া এই লতাবিতানের নিম্নে বসিয়া কত সুখের কথা কহিয়াছিলেন। একদিন এই শান্তিকানন কত সুখের স্থান ছিল! যে দিকে চান, সত্যেনের হিরণ্ময়ীর প্রেম-বিজড়িত স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই মনে জাগে না। চারিদিকেই তাঁহার হস্তচিহ্ন বিরাজিত। দেখিলেন সরোবরে ঘাটের পার্শ্বে বোট্ খানি অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে। মনে পড়িল, কত সুখের সময় ঐ ক্ষুদ্র বোটের বক্ষে অতিবাহিত হইয়াছে; মনে পড়িল, কত সাধ্য সাধনায় কবে একদিন হিরণ একটি গান গাইয়াছিলেন। ঐ যে প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী, ঐ সোপানে কতদিন উভয়ে জলক্রীড়া করিয়াছেন। কত সায়ং সন্ধ্যা দূরস্থিত ঠাকুরবাড়ীর নহবতের মিলন গান শুনিতে শুনিতে কাটিয়াছিল। তারপর অদূরে ভগ্নপ্রায় ফোয়ারার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সত্যেন হিরণ্ময়ীর আদরের মাছগুলি দেখিতে অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন তাহাতে জলের লেশমাত্র নাই, চৌবাচ্ছা শুষ্ক পত্রে পরিপূর্ণ। তৎপরে একটি অর্দ্ধ উলঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে পড়িল, হিরণ তাঁহার পদ-নিম্নের সমতল প্রস্তর খণ্ডের একপার্শ্বে কি লিখিয়াছিলেন। কাছে গিয়া দেখিলেন, অস্পষ্টভাবে সেই হস্তাক্ষর আজিও দেখা যাইতেছে; পড়িলেন,—'মরণ আর কি, ছুঁড়ীর লজ্জা নেই।'

সত্যেন সেই লেখার প্রতি চাহিয়া বারংবার তাহা পড়িতে লাগিলেন। শীর্ণদেহে সমস্ত রাত্রি জাগরণে এবং অসীম দুঃখ ও শোকে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রৌদ্রের প্রখরতায় মাথা ঘুরিয়া গেল, সত্যেন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তথায় পড়িয়া গেলেন। চৈতন্যশূন্য হইয়া কতক্ষণ পড়িয়া রহিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন না। যখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল, দেখিলেন মাধব ও এক অপরিচিত ব্রহ্মচারিণী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। সত্যেন উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন তিনি বৃক্ষমূলে ছায়া

তলে রহিয়াছেন। কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, কেমন করিয়া এস্থানে আসিলেন, ক্ষণকালের জন্য কিছুই মনে পড়িল না। সম্মুখে ভৈরবীবেশিনী সতীকে দেখিয়াও কোনরূপ বিস্ময় বোধ করিলেন না। বৃদ্ধ মাধব প্রভুর এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন। মাধব বার বার তাঁহাকে বাটীতে আসিবার জন্য বলিলেন। সত্যেন উঠিলেন না, বা কোন কথাও কহিলেন না। মালতী আজি আর চখের জল রাখিতে পারিলেন না। তিনি সত্যেনের সম্পদের ও সুখের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহার পর বহু দিন আর তাহাকে দেখেন নাই; আজিকার দুর্দ্দশার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সত্যেন! অধৈর্য্য হইও না। তোমার হিরণের পবিত্র আত্মা স্বর্গে গিয়াছে।"

সত্যেন স্বর শুনিয়া কিছু চমকিত হইলেন, তখন তিনি প্রথম কথা কহিলেন,—বলিলেন,—"কে আপনি এই স্ত্রীহন্তা—নারী হন্তা বন্ধুদ্রোহীর কাছে আসিয়াছেন?"

মালতী বলিলেন,—"আমি মালতী, তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আসিয়াছি।"

তখন সত্যেন ভাল করিয়া মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া চিনিলেন। তখন তিনিও কাঁদিলেন, কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"মালতি! তোমার যে দুর্দ্দশা করেছি, তাহারই এই ফল। আবার এ হতভাগার কাছে কেন এসেছ? আমার জন্য কেন কাঁদিতেছ, কেহ আমায় আর দেখিও না! আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হউক।"

মালতী বলিলেন,—"সত্যেন! সকলই ললাট-লিখন, কাঁদিও না। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় এখন আমি অপার সুখের অধিকারিণী। প্রেমের অপেক্ষা যাহা উচ্চ এবং মহান্, তাহা পাইতে চেষ্টা কর, আবার তোমার হিরণ্ময়ীর সহিত মিলন হইবে। সে মিলন অনন্ত কালের জন্য।"

সত্যেন বলিলেন,—"আবার আমার হিরণকে পাব? কেহ যাহা কখনও পায় নাই, আমি তাহা পাব?—অসম্ভব!"

মালতী বলিলেন,—"অসম্ভব কিছুই নাই, সাধনায় কি না মিলে? নিদ্রা ক্ষণিক, মৃত্যু অনন্ত নিদ্রা মাত্র! মৃত্যু আর কিছুই নহে, আত্মা মলিন দেহ ত্যাগ করিয়া নবীন দেহ গ্রহণ করে, সেই ত্যাগের নামই মৃত্যু। নিগূঢ় উপাসনায় হিরণ্ময়ীর পার্থিব প্রেমও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে, তখন হিরণকেও চাহিবে না।"

সত্যেন বলিলেন,—"মালতি, আজ আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই কি এ সকল অসম্ভব কথা বলিতেছ? হিরণের অপেক্ষা প্রিয়, তাঁহার প্রেমের অপেক্ষা পবিত্র ও সুমহৎ, এ অশান্তিময় জগতে, কিছু থাকিতে পারে, এ কথা ভাবিতেও পারি না। তুমি তাহা পাইয়াছ কি?"

মালতী বলিলেন,—"হা সত্যেন, তোমায় পাইয়া যে সুখলাভ করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও আমি এখন অধিক সুখী। স্বার্থ-

ত্যাগ যে প্রেমের ভিত্তি, তাহাই প্রকৃত প্রেম। এই কামনাহীন প্রেমের অধিকারী হইতে পারিলে, পৃথিবীর সকলই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।"

সত্যেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরে বললেন,—"মালতি, তোমার কথা সত্য, কিন্তু সে নিষ্কাম ভালবাসা লাভ করা অতি কঠিন। কি করিলে তাহা পাওয়া যায়? আর এই মহাপাপের ফল কোথা যাইবে?"

মালতী বলিলেন,—"চিত্ত সংযত করিয়া উপাসনা কর। একমাত্র দেবোপাসনাই অনন্ত শান্তির মূল। মায়াময় সংসারে থাকিয়া সে উপাসনা শিক্ষা করা যায় না। পুণ্য কর্ম্মে ও মহাসাধনায় পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে।"

সত্যেন বলিলেন,—"সংসার ত ছাড়িয়াছিলাম, তারপর চক্রীর চক্রে পড়িয়া বড় আশায় আবার আসিয়াছিলাম, সব আশা শেষ হইল, আমার সংসারেরও শেষ হইল জানিও।"

*   *   *   *

মালতীর আশা ও প্রবোধপূর্ণ কথাতে যথার্থই সত্যেন্দ্রনাথের শোকের প্রথম বেগ কিঞ্চিৎ বাধা পাইল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, তিনি মালতীর সহিত রাত্রিতেই চলিয়া গেলেন। পর দিন তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

উপসংহার।

পঞ্চদশ বৎসরের পর।

হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পর পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। জগতে নিত্যই কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে মাণিকনগরের বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রায়দের অতুল বিষয় সম্পত্তি, দেখার অভাবে, একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জমিদারির কতক দেনার দায়ে, কতক খাজানার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন রায় পরিবারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়াছেন। সত্যেনের চলিয়া যাওয়ার পর মাধুরী কুসুমহাটিতে মাতুলালয়ে ছিল। মাতামহের চেষ্টায় নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছে।

এক সাহেব মাণিকনগর ও নিকটবর্ত্তি স্থানসমূহে এখন নীলের চাষ করিয়াছেন। তিনি এখন 'শান্তিকাননে' বাস করিয়া থাকেন। তিনি কোন বাঙ্গালী বন্ধুর নিকট সত্যেন ও হিরণের বিষাদময় প্রণয়কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাহেব উদ্যান বা ভবনের বিশেষ আবশ্যকীয় অংশ ভিন্ন কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই, বরং তাহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরিবর্ত্তনের মধ্যে 'শান্তিকানন' নামাঙ্কিত প্রস্তরখানি খোলাইয়া, তাহার স্থানে ইংরাজিতে 'গ্রাম্য আবাস' লেখাখোদিত আর একখানি প্রস্তর বসাইয়াছেন।

রায়দের ঠাকুর বাটীর নিত্য উৎসব, সত্যেন্দ্রনাথপ্রতিষ্ঠিত সুব্যবস্থাকৃত অতিথি-শালার দরিদ্রভোজন এখন সব লোপ পাইয়াছে। দেবালয়নাকলের বিগ্রহগুলি এখনও আছে, সেবা নামমাত্র হইয়া থাকে। রায়েদের সুবিশাল তিন মহল পুরাতন বাটী মেরামত ও বসবাস অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন রায় পরিবারের সম্পদ, ধন, সম্ভ্রমের কথা, উৎসব ও আনন্দের কথা এখন লোকের গল্প হইয়াছে। কেহ কেহ বলে রায়েদের ব্রহ্মশাপ ছিল। বৃদ্ধ মাধব ঘোষ সত্যেনের অনুসন্ধান করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল। তাঁহার যাইবার কএক বৎসর পরে, সে কালগ্রাসে পতিত হয়। শচীকান্তও তাঁহার পত্নী উভয়েই কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর বেশে এই পঞ্চদশ বৎসর পরে, একদিন মাণিকনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহির্দ্দেশ হইতে তাঁহার সাধের কাননের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। অমরনাথের বাটীর দ্বারে যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইয়া জানিলেন, তিনি উন্মাদ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে কেহ আর চিনিতে পারিল না।

সত্যেন চলিয়া গেলেন। আর কখনও মাণিকনগরে পদার্পণ করেন নাই।

সমাপ্ত।

বীরমাতা

১। জনা।

জিনিতে পার্থের অশ্বমেধীর প্রধান
প্রতিজ্ঞ প্রবীর, শেষ-বিদায়ের মত,
মুহুর্মুহুঃ নিরখিয়া মদন মঞ্জরী
হ'তেছিল আত্মহারা বিহ্বল যখন,
কর্ত্তব্য-কঠিনা বীরা বীরমাতা জনা
বলিলা কর্কশ-কণ্ঠে—'রে মূর্খ, বর্ব্বর,
আপন কর্ত্তব্য ভুলি, রমণী-অঞ্চলে
এখনো রহিবি বদ্ধ, ক্ষত্রকুলজাত
পুত্র তুই নীলধ্বজ-নৃপতি-বীরের!
বাজে অই রণ-ভেরী, উঠিছে নিনাদ,
ব্যাপি' শূন্য, ব্যাপি' ব্যোম, পাণ্ডব জয়ের;
ছাড়, বৎস, ফুল-খেলা, ধর কালান্তক
অসি এই বদ্ধ করে, কর দাম্ভিকের
চূর্ণ দন্ত; নাহি পার লভিতে বিজয়
যদি, ক্ষত্রতেজ নাহি হ'তে নির্ব্বাপিত,
ক্ষত্রিয়ের মত রণে হওগে নিপাত।'
লভি শিরে মাতৃ-আজ্ঞা চলিল সত্বরে
অর্জ্জুন-সমরে বীর জনার তনয়।

শুনি ভগ্নদূত মুখে পুত্রের মরণ,
আপনি সাজিলা রণে বীরবর-বধূ;
সমর-প্রান্তর-প্রান্তে চাহিয়া বারেক

দেখিলা বিচ্ছিন্ন-শির প্রবীরের মুখ;
পুত্র-শোক গেলা ভুলি'; দীপ্তচোকে তাঁর
ঝরিল আনন্দ-অশ্রু; করিয়া চুম্বন
গত-প্রাণ তনয়ের শির, কহিলা সগর্ব্বে
জনা—"এ মরণ অতি উপযুক্ত তোর!
রেখেছিস্ ক্ষত্র-গর্ব্ব চির অব্যাহত,
রেখেছিস্ প্রজ্জ্বলিত শূরত্ব বীরের
মরণের কালে তোর—ধন্য পুত্র মোর!"
হায়! আজি ভারতের কোথা সেইদিন!
পুন কি জন্মিবে হেথা জনার মতন
মাতৃকুল, প্রবীরের সম পুত্র বীর!

২। সুভদ্রা।

কৌরব সমরে যবে পার্থের কুমার
যুঝিতে চাহিলা আজ্ঞা মাতা সুভদ্রার,
হাসিয়া আদরে মাতা করিলা আদেশ,—
'যাও, বৎস, কুরুক্ষেত্রে, করগে সংগ্রাম;
ক্ষত্রিয় কুমার তুই, বীর অর্জ্জুনের
যোগ্যতম বংশধর, পাণ্ডব-রতন,
গোবিন্দ মাতুল তোর—করিবি সংগ্রাম,—
এতো ইচ্ছা উপযুক্ত তোর। আয় তোরে
দি সাজায়ে বর্ম্মে, শস্ত্রে, উষ্ণীষভূষণে,
দেখাগে ক্ষত্রিয়-তেজ অপূর্ব্ব বিক্রম!
কল্যাণী ভবানী তোরে করুন্ রক্ষণ!'
স্নেহ-স্নিগ্ধ মাতৃ হস্তে দিলা সাজাইয়া
আপনি জননী বলি অভিমন্যু বীরে—
যথারূপে দিলা শিরে স্বর্ণ শিরস্ত্রাণ,
আঁটিলা কবচ গায়ে, দিলা খরশাণ
কালিকা-কৃপাণ করে; অবশেষে ভালে
কাটিয়া মাঙ্গল্য ফোটা করিলা আশীষ—
'যা রণে, কল্যাণী তোরে করুন্ রক্ষণ!'
মাতৃ আশীর্ব্বাদ বলে উঠিল নাচিয়া
বীরের ধমনী, শিরা; চলিলা সমরে।
পাপ অত্যাচারে, আর অন্যায় সমরে
সপ্তরথীকরে কূট ব্যূহচক্রমাঝে
হারাল জীবন বাল অভিমন্যু বীর।
ঘোর আর্ত্তনাদসহ বীরের মরণ
হ'ল যবে প্রচারিত পাণ্ডব-শিবিরে,
শুনিলা সে শোক-কথা সুভদ্রা জননী;
উর্দ্ধ করে, শান্ত, ধীর প্রার্থনার মত
কহিলা সুভদ্রা দেবী—"নিয়তি বাছার
মৃত্যু, আমি কেন হ'ব তবে অশান্ত, আকুল?
দেখায়েছে পুত্র মোর ক্ষত্রিয়ের মত
পিতৃতেজ, পিতৃশিক্ষা বীরের সমরে,
কুলগর্ব্বে লভিয়াছে সুন্দর মরণ!
হে অভয়ে! বাছা তোর গেছে তোর কাছে,
ডেকে নে ডেকে নে কোলে তায়!"
হায়! হায়!
কোথা সেই বিশ্বাসীর "সুন্দর মরণ",
আদেশে সুভদ্রা মা'র পারিব লভিতে
কবে মোরা—জননীর অভিমন্যু বীর!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

কালের প্রভাব।

বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা মহাত্মা কণাদ সপ্ত পদার্থের * নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অভাব একটি ও ছয়টি ভাব-পদার্থ। জগৎ-সৃষ্টির উপাদান পঞ্চভূত; তাহাও দ্রব্যপদার্থের ‡ অন্তর্গত। পাশ্চাত্য মতে ভূতের সংখ্যা পঁয়ষট্টি, কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রানুসারে জগৎ পঞ্চভূতাত্মক। এইরূপ মতদ্বৈধ সত্ত্বেও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মনে করুন, উদ্যানে অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। ইহার শ্রেণী বিভাগ করিতে গিয়া কেহ বলিল যে, বাগানে দশ রকম ফুল ফুটিয়াছে—গোলাপ, মল্লিকা, অপরাজিতা, জাঁতি, যূথি, রজনীগন্ধা ইত্যাদি। কেহ বলিল, উদ্যানের পুষ্পসমূহ তিন জাতীয়; সাদা, লাল ও নীল। এস্থলে শেষোক্ত ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বলা মূর্খতা নয় কি? বরং তাঁহাকেই সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া সম্মানিত করা কর্ত্তব্য। আর্য্যঋষিগণ সেরূপ পঞ্চভূতের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহা মূলভূত না হইলেও, উল্লিখিত শ্রেণী-বিভাগ অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। স্থূলেন্দ্রিয় পাঁচটি! অপিচ, পঞ্চভূতগুলি এরূপ উপাদানে গঠিত যে, এক একটি ভূতের গুণ এক একটি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয়। আকাশের শব্দগুণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ। বায়ুর স্পর্শগুণ স্পর্শেন্দ্রিয়ের ও তেজের গুণ রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। জলের গুণ রস ও ক্ষিতির গুণ গন্ধ, যথাক্রমে রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিমূলক। সুতরাং শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। অথবা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতিমূলক যাহা, তাহার মূল উপাদান বা আধার পঞ্চভূত নামে অভিহিত; এরূপ বলিলেও ভাষার গুরুতর দোষ ঘটে না। ফল কথা, বহুভূত-বাদি পাশ্চাত্য মত অপেক্ষা হিন্দুদর্শনের পঞ্চভৌতিক মত কতদূর গভীর গবেষণাপ্রসূত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সাঙ্খ্য-শাস্ত্র অনুসারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ুর বিকারে তেজ, তেজের বিকারে অপ্ ও অপের বিকারে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে,এবং উল্লিখিত পঞ্চভূতের গুণ,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পঞ্চতন্মাত্র নামে অভিহিত। আধার ও আধেয়ভাবে গুণ দ্রব্যপদার্থে নিহিত থাকে। শর্করায় মিষ্টত্ব, নিম্বে তিক্ততা, জলে শীতলত্ব ও অগ্নিতে উষ্ণতা অন্তর্লীন

* দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত।   ভাষা পরিচ্ছেদ।

‡ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং কাল, দিক্, দেহি, মন দ্রব্য পদার্থ এই নয়টি।   ভাষা পরিচ্ছেদ।

রহিয়াছে। বস্তুতঃ রূপ, রস, গন্ধাদি গুণ এই রূপ পঞ্চভূতে নিয়ত অবস্থান করে। কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান * দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সৃষ্টিরহস্য মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। কোন্ কালে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা কল্পনায়ও আনা যায় না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহা কল্পনা করা যায় কি? অথবা উল্লিখিত গুণসমূহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও পঞ্চভূতের অভাবে, ইহাও কল্পনার ব্যভিচার মাত্র। সুতরাং রূপ, রস, গন্ধাদির সত্তা অথবা পঞ্চভূত ও কালাদির অভাব কিংবা উৎপত্তির কল্পনাও তথাবিধ ভ্রান্তিকলুষিত সন্দেহ নাই। কাল না থাকিলে ঋতু মাস, বর্ষ ও দিবারাত্রির প্রভেদ থাকিত না। সুতরাং দিবা নাই, রাত্রি নাই, প্রভাত ও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি সময়-জ্ঞাপক কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই, এরূপ কালবিহীন কালকে কল্পনায় আনিতে গেলে, মন আপনা হইতেই স্তম্ভিত হইয়া আইসে। ফলকথা, সৃষ্টিকর্ত্তার স্রষ্টা নিরূপণের ন্যায়, অনাদি কালের আদি অনুসন্ধান জন্য বুদ্ধি বিলোড়ন করা বৃথা।

দূর্ব্বাদলবিলম্বি নীহারকণা অথবা প্রভাত-কুমুদের বৃন্তলগ্ন বাষ্পবিন্দুর পরিণাম যে উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ ও বীচিবিক্ষেপ-চঞ্চল অপার জলধি, ইহা অনেকের কল্পনার আয়ত্ত হয় না। সেইরূপ মুহূর্ত্তমাত্র সময়—সেকেণ্ড অথবা মিনিটের পরিণাম যে অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল অনাদি ও অনন্তকাল-ব্যাপী মহাকালরূপে বিরাজমান, ইহাও অনেকের মনে সহসা স্থান পায় না। কাল অনাদি, অনন্ত ও অসীম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালসাগরে জল বুদ্বুদ্ মাত্র। জলবুদ্বুদ্ যেমন মুহূর্ত্তেই উদিত হইয়া মুহূর্ত্তেই বিলীন হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্যও উল্লিখিত নিয়মাধীন। কিন্তু কালের বিনাশ নাই। কাল অবিনশ্বর—নিত্য পদার্থ। মরুভূমির বালুকাকণা অথবা আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের গণনায় সমর্থ হইলেও, কালের আবর্ত্তগণনা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মহাকালের অংশবিশেষের নাম শতাব্দী,—যুগ, মন্বন্তর ও কল্প প্রভৃতি। "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে দেবপরিমাণের এক যুগ। ইহার একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর হয়। মন্বন্তর, মনুর কাল! এক এক মনু যতকাল অবস্থান করেন, তাহার পরিমাণ এক মন্বন্তর। সপ্ত মন্বন্তরে এক কল্প। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার অহোরাত্রি বা দুই কল্প হয়। উল্লিখিত কল্পান্তে মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির ধ্বংস এবং প্রলয়ান্তে সংসার কারণজলে নিমগ্ন থাকিয়া পুনরায় নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়।"§ এইরূপ পৌনঃপুনিক ভাবে সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হইতেছে। মার্কণ্ডের সপ্তদিবস পরিমিত আয়ুকাল সপ্ত কল্পে পরিণত হইলেও, কালের বিশাল শরীরে কত মার্কণ্ডের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে, কে তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে? বস্তুতঃ কালের বিশালতা উপলব্ধি করিতে গিয়া মানব বুদ্ধি

* চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, রাসন।

§ বিষ্ণুপুরাণ হইতে অনুবাদিত।

প্রতিহত হয়; হৃদয় ইহা কল্পনা করিতেও ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

কাল সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী। ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মহান্ মহীরুহ আকাশপটে আপনার বিশাল মস্তক উন্নত করিয়া, চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া, আতপ-তাপ-দগ্ধ পথিকের শ্রান্তি দূর করে এবং পত্রপল্লব মুকুল ও ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। আবার কালে উহা ধূলিসাৎ হয়,—চিহ্নমাত্রও থাকে না। রাজ্যের উত্থান-পতনও এইরূপ। কোথায় অযোধ্যা! কোথায় হস্তিনা বা ইন্দ্রপ্রস্থ! কোথায় রোমরাজ্য, কোথায় বা মোগল সাম্রাজ্য! জলে জলবিম্ববৎ উদিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই অদৃশ্য হইয়াছে। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়-দানব-নির্ম্মিত স্ফটিক সভা, মোগলের ময়ূরসিংহাসন, সৌধকিরিটিনী কনক-লঙ্কার স্বর্ণসৌধরাজি কালের করাল চর্ব্বণে এইক্ষণ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কালের প্রভাব অপরিসীমা। উদ্ভিজ্জ জগতে তাহার সুচারু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। প্রাবৃটে ধান্য রোপণ করিলে হেমন্তে উহা শস্যময় হয়। শরদারম্ভে মাষ ও হেমন্তে সর্ষপ বপন করিলে, উহা যথাক্রমে হেমন্তে ও বসন্তে ফল প্রদান করে। কিন্তু হেমন্তে ধান্য, বর্ষারম্ভে মাষ অথবা নিদাঘে সর্ষপ বপন করিলে তাহাতে কখনও শস্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না। নিদাঘের প্রারম্ভে কুষ্মাণ্ড ও শরতে অলাবু-বীজ রোপণ করিলে যথাক্রমে প্রাবৃট ও হেমন্তে ফলপ্রসূ হয়। অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অথবা শীত ও বাতাতপের ন্যূনাতিরেকে কুত্রাপি কালবিপর্য্যয় ঘটে না। কিন্তু অযথাসময়ে ঐ সমস্ত বীজ বপন করিলে সুফল লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা।

শুধু ওষধিরাজ্যেই যে এরূপ নিয়মতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়, তাহাই নহে, পুষ্পরাজ্যেও এইরূপ। ঋতুরাজ বসন্তসমাগমে অশোক, কিংশুক, চম্পক, মল্লিকা, মাধবীলতা ও গন্ধরাজ প্রভৃতি পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া ধরণীর মনোহর পুষ্পশয্যা সাজাইয়া দেয়, এবং বর্ষারম্ভে কদম্ব, কেতকী, কুটজ এবং জাঁতি, যূঁথি, মালতী, বেলা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি আরণ্য ও উদ্যানজ বিবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া বসুন্ধরাকে পুষ্প-সম্ভারে অভ্যর্থনা করে। আবার শরদারম্ভে কুমুদ কহ্লার, ইন্দীবর, শেফালিকা ও ভূমিচম্পক প্রভৃতি কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করে। এ নিয়মের কালবিপর্য্যয়রূপ ব্যভিচার কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

বৃক্ষবল্লী সম্বন্ধেও এইরূপ। আম, জাম, লিচু, ও করঞ্জ প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষের বসন্তে মুকুলোদ্গম এবং প্রাবৃটে অথবা নিদাঘের অবসানে ঐ সমস্তের ফল পরিপক্ক হয়। কিন্তু নারিকেল, গুবাক ও তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ বসন্তে মুকুলিত হইয়া সম্বৎসরব্যাপী দীর্ঘকালে, হেমন্ত বা শিশিরের অবসানে, সুপক্ক ফল প্রদান করে। লেবু, আতা, পেয়ারা নারঙ্গী ও আমলা প্রভৃতি বৃক্ষ বসন্তকালে মুকুলিত হইয়া হেমন্ত বা শিশিরের অবসানে ফলপ্রসূ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের বিভিন্ন সময়ে মুকুলোদ্গম হয়,

এবং ভিন্ন ভিন্ন কালে উহারা ফল প্রদান করে। সুতরাং প্রখর সূর্য্যকিরণ,দুরন্ত হিমানী এবং বাত-বৃষ্টি ও আলোকের আধিক্য অথবা অল্পতা কিংবা অভাব ইহার প্রকৃত কারণ নহে। গ্রীষ্মমণ্ডলস্থিত উষ্ণপ্রধান আফ্রিকা মহাদেশ, শীতপ্রধান ইংলণ্ড এবং সূর্য্যালোকবিরল ও চির-নীহারাবৃত ল্যাপ্‌লাণ্ড প্রদেশ, অথবা বৃষ্টিবিন্দুপরিশূন্য মিশর দেশ, সর্ব্বত্রই কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিদ ফুল-ফল ও শস্য সম্ভারে পরিশোভিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কালের সহিত উদ্ভিজ্জ জগতের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা বিজ্ঞানবিদ্ অথবা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের পক্ষেও সম্পূর্ণ অসাধ্য। বস্তুতঃ কালের মহীয়সী ক্ষমতা অপ্রতিহত।

কাল সর্ব্বসংহারি বেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতেছে। জীবজগতে মানব হইতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীমাত্রেই কালের ভক্ষ্য। কালের বিশাল স্থণ্ডিলে অবিরত চিতাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—রাবণের চিতার ন্যায় অহোরাত্র প্রজ্জ্বলিত! যে গৃহে এ অনলশিখা নাই, তেমন গৃহ নাই। ধনীর বিলাস-নিকেতনে, দরিদ্রের কুটীরে, সর্ব্বত্রই এ হোমাগ্নি সমভাবে সংরক্ষিত। ইহার বিশালতার তুলনায় মরুত রাজার যজ্ঞ ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। এ মহাযজ্ঞের অগ্নিশিখা উচ্চতায় গগণ স্পর্শ করিয়াছে। ইহার স্থণ্ডিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি। বসুন্ধরার ভার নিবারণ জন্য এ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। কাল ইহার হোতা! সমিধ্—প্রাণীজগৎ! আহুতি—জীবন! এ যজ্ঞে ব্রহ্মার মন্দাগ্নি জন্মে না। সুতরাং খাণ্ডববন দাহনেরও প্রয়োজন হয় না। কত যুগ যুগান্তর হইতে এ যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। কোন্ কালে যে পূর্ণাহুতি হইবে,তাহাই বা কে জানে? এ যজ্ঞের ধূমপটলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল আচ্ছন্ন করিয়া যেদিন আঁধারে আলোক মিশিয়া যাইবে—আলোক ও অন্ধকার একাকার হইবে, সে দিন যদি এ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়! মহাকাল! তুমিই ইহার একমাত্র সাক্ষী।

তরঙ্গ ভঙ্গ-বিহ্বলা তরঙ্গিনী যেমন অবিরত প্রবহমানা—দিবা নাই,—রাত্রি নাই,—প্রভাত অথবা মধ্যাহ্ন নাই,—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় সমভাবে বহিয়া যাইতেছে, কালের স্রোতঃও সেইরূপ অবিরামবাহি। নদীর স্রোত বর্ষায় ভীষণ আবর্ত্তে ও হেমন্তে মৃদুধারায় প্রবাহিত হয়, ঝটিকায় উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করে, এবং নির্ব্বাত তড়াগের ন্যায়, কখন বা প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে;—কিন্তু শেষ গতি সাগরের বক্ষ। কালের স্রোতে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও আলোড়ন না থাকিলেও, স্রোতস্বিনীর ন্যায়, অবিরাম ধারায় প্রবাহিত হয়,—জানে না কোথায় যায়। উভয়ের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে অভিন্নভাবাপন্ন হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক বিচিত্র পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। স্রোতোজলে তৃণগুচ্ছ ভাসাইয়া দিলে, স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার গতি হয়। কিন্তু উহা বহুদূরগামি হইলেও,স্বেচ্ছাক্রমে সন্তরণ করিয়া অনায়াসেই ফিরাইয়া আনা যায়। কিন্তু কালের ভীষণ-

আবর্ত্তে যে শৈশব অথবা যৌবন ভাসিয়া গিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও সেই অপুনঃসম্ভাবী কাল কখনও প্রত্যাগত হয় কি ?

জীবন ও কালের গতি অভিন্নভাবাপন্ন সন্দেহ নাই। জীবনের স্রোতঃ কালের স্রোতে মিশিয়া একীভূত ধারায় প্রবাহিত হয়। কাল অনাদি, অনন্ত, অসীম; জীবনও আদিহীন, সীমাশূন্য। জীবন কালসাগরে জলবিম্ববৎ। জলবুদ্বুদ্ যেমন জলে উদিত হইয়া জলেই বিলীন হয়, জীবনেরও সেইরূপ উদয়, বিলয় ও ও পুনরভ্যুদয় ঘটে। অপিচ, কালের স্রোতঃ নিরুদ্ধ হইয়া সংসারের গতিচক্র থামিয়া যাইবে,—পঞ্চভূত শূন্যে মিশাইবে, এরূপ অসম্ভব কল্পনাকে কেহ মনে স্থান দিতেও সাহসী হ'ন না। মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহাতেও পঞ্চভূত ও কালাদির বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। কাল জগৎ-প্রসবিত্রী মহাশক্তি ও বিশ্বসংহারক রুদ্র তেজের প্রতিরূপ সন্দেহ নাই। বৈদিক ঋষিগণ, ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে, এই বিরাট মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই কালকে মহাকাল নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কালের প্রভাব বিস্ময়জনক !

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

নাস্তিকের প্রেম।

ক্রমান্বয়ে দুইবার বি এ ফেল করিয়া শশাঙ্কশেখরের দেশ-হিতৈষণা প্রবৃত্তি বিশেষ-রূপে জাগিয়া উঠিল। সে গ্রামে ডিবেটীং ক্লাব খুলিয়া, সভা জমাইয়া, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, জাতিবিচারের অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া, গ্রামের যুবকদলকে মোহিত করিয়া দিত। গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যদি কেহ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিত, তাহা হইলে শশাঙ্কশেখর দুরূহ ইংরাজী ভাষায় হারবার্ট স্পেন্সার, মিল, হক্সেলি প্রভৃতি মহাপণ্ডিত-দের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে তৎ-ক্ষণাৎ নিরস্ত করিত।

শশাঙ্কশেখর কলেজে পড়া অবধি ধর্ম্মের ও কবিত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধে ছিল। পরীক্ষার সময় গোপনে দুই একবার ঈশ্বরের নাম করিত, এবং ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে, একটু রাত্রি হইলে, কালীবাড়ী গিয়া মার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া পরীক্ষার সুফল প্রার্থনা করিত বটে, কিন্তু এবার ফেল হইয়া সে একবারে নাস্তিক হইয়া পড়িল। তাহার মতে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, অজ্ঞ ও দুর্ব্বল লোকে-রাই ধর্ম্মবিশ্বাসী হয় এবং পিত্তপ্রধান হইলে ও যকৃতের ক্রিয়ার দোষ ঘটিলেই মানব-হৃদয়ে প্রেমরোগের আবির্ভাব হয় এবং যন্ত্রণায় হা-হুতাশ করে। এইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তি-

দিগকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিলেই মনের বিকার অবস্থা সারিয়া যায়।

শশাঙ্কশেখর কোনও দুঃখ প্রকাশের সময় হঠাৎ 'হা ঈশ্বর!' বলিয়া ফেলিলে যদি কেহ তাহাকে কপট নাস্তিক বলিয়া উপহাস করিত, তখন সে বুঝাইয়া দিত যে, উহা মাত্র অভ্যাসদোষ এবং 'হা ঈশ্বর!' কথাটি— সম্পূর্ণ অর্থবিহীন খেদপ্রকাশ মাত্র। শশাঙ্ক-শেখর গ্রামে সকলের নিকটই বলিত চা-করী করাটা নিতান্তই গোলামী; উহাতে মনুষ্যত্ব লোপ পায়, নৈতিক তেজ থাকে না; সদসৎ-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইতে হয় ইত্যাদি। শশাঙ্কশেখরের জ্যেষ্ঠ ভাই হেম বাবু বারাশতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। তিনি শশাঙ্ক-শেখরের জন্য অনেকবার চাকরী যোগার করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক, মনুষ্যত্ব-লোপ ও নৈতিক অবনতির ভয়ে, চাকরী করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না; অথচ তাহার বাক্সে খরচের জন্য জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নিকট হইতে প্রতিমাসে ৬৲।৭৲টাকা আদায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচও বোধ করিত না। অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভাই বিরক্ত হইয়া শশাঙ্ক-শেখরের পকেট খরচা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। শশাঙ্ক ইহাতে বড় মর্ম্মাহত হইল। এডুকেশন গেজেট দেখিয়া ৩০৲ টাকা মাহি-নায়, ঢাকা অঞ্চলে হরিপুর গ্রামে, একটি এণ্ট্রান্স স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারী পদের জন্য শশাঙ্ক আবেদন করিল এবং ঐ পদ প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার সময় শশাঙ্ক-শেখরের বৃদ্ধা মাতা কত কাঁদিলেন! শশাঙ্ক-শেখর সংক্ষেপে মাকে বুঝাইল যে, বাঙ্গালীরা দূর দেশে যাইতে ভীত হয় বলিয়াই, বাঙ্গা-লীর এ দুর্দ্দশা। মাকে প্রবোধ দিয়া শশাঙ্ক-শেখর কার্য্যস্থানে যাত্রা করিল। শশাঙ্ক-শেখর, যদি বিবাহ করে, তবে কিরূপ বিবাহ করিবে, এবিষয়ে কল্পনায় তাহার ভবিষ্যৎ পত্নী সম্বন্ধে একটা আদর্শ স্থির করিয়াছিল। তাহার পত্নীটি রূপসী হউক বা না হউক, বিদুষী (বিশেষতঃ লজিকে) এবং নাস্তিক ভাবাপন্ন অবশ্য হওয়া চাই।

সাধারণ কুসংস্কারাপন্ন অল্পবয়স্কা মূর্খ গ্রাম্য বালিকা বিবাহ করিবার ভয়েই, বৃদ্ধা মাকে, বিবাহ করিবে না বলিয়া, সে অনেকবার শাসাইয়াছিল। মাতা মনে করিলেন, ছেলেরা প্রথম ঐরূপ করিবেই, কোনও সুন্দরী মেয়ের সহিত ভাল করিয়া প্রস্তাব করিলেই ছেলে সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহ করিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া, বৃদ্ধা মাতা নিজেই অনেকটা উদ্যোগী হইয়া ন-পাড়ার হরিনাথ বসুর ক-ন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং শশাঙ্ক-শেখরকে শীঘ্র বাড়ী আসিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিতে, মাথার দিব্য দিয়া পত্র লিখি-লেন। পত্র পাইয়াই শশাঙ্কশেখরের হৃদয়ে পূর্ব্বের ভীতিপ্রদ বিবাহকল্পনা বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। শশাঙ্ক মাতার নিকট অকাট্য যুক্তিযুক্ত পত্র লিখিল; যুক্তির কিয়দংশ এইরূপ:—"বিবাহ সাধারণতঃ দারিদ্র্য আনয়ন করে, পারিবারিক অশান্তি ঘটায় এবং বিবাহের পর পুত্র মাতার প্রতি

বীতশ্রদ্ধ হয়। দারিদ্র্যই যত দোষের আকর। উহাতে নীচাশয় করে, নৈতিক সাহস হ্রাস পায়, উচ্চ চিন্তা মনে স্থান পায় না; সুতরাং বিবাহ আমার পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। পত্র পাইয়া বৃদ্ধা, পুত্রের বিবাহে অরুচি দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন এবং পুত্রের মাতৃভক্তির কথা মনে করিয়া একটু আনন্দিতও হইলেন।

বৃদ্ধা জীবনের বাকি কএকটা দিন কাশীবাস করিবেন, মনস্থ করিলেন। মাতা যাইবার সময়, জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, মাতার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। মাতা অশ্রুসিক্তনয়নে বলিলেন,—"বাবা হেম, তোর পিতার মৃত্যুর পর অতি কষ্টে আমি তোদেরে মানুষ করিয়াছি। আজ তুই বড় হইয়াছিস্, আমার শশাঙ্কশেখরের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিতেছি, দেখিও বাবা, আমার শশাঙ্কশেখরের যেন কোনও কষ্ট না হয়। ও যখন ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতে চাহিবে, তখনই করাইও।" হেমচন্দ্র গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা মা, আমি উহাকে দেখিব, উহার কোনও কষ্ট হইবে না। আমাদের জন্য কোনও চিন্তা করিও না।" মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, পবিত্র কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

শশাঙ্কশেখর একদিন প্রত্যূষে দেখিতে পাইল, একটি অতি সুশ্রী পঞ্চদশবর্ষীয়া নববিকসিতযৌবনা বালা সাজি ভরিয়া সম্মুখস্থ উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছে; দেখিয়াই শশাঙ্কশেখরের মনে একটা গুরুতর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতদিন পর যুক্তির কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবের স্রোত ছুটিল। শশাঙ্কশেখরের মাথা ঘুরিয়া গেল। ধমনীতে বেগে রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল। বালিকা ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা শশাঙ্কশেখরের দিকে চাহিল। অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইল। বালিকা লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া বেগে শশাঙ্কশেখরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শশাঙ্কশেখর মুগ্ধনেত্রে নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া একভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শশাঙ্কশেখরের জীবনে এইবার প্রথম সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবরাজ্যে পদার্পণ হইল। শশাঙ্কশেখর অনেক বার অনেক বালিকা দেখিয়াছে, কিন্তু এবার এরূপ হইল কেন?

শশাঙ্কশেখরের প্রত্যেক বিষয়েই যুক্তি করা একটা অভ্যাস ছিল। তাহার হঠাৎ এই ভাবান্তর হইবার কারণ কি; এ বিষয়ে অনেক যুক্তি উদ্ঘাটন করিয়াও, কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

সে একটা হৃদয়ব্যাপি গভীর আকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। শশাঙ্কশেখর ভাবিতে লাগিল "হে আমার হৃদয়ের দেবতা! আমার জীবনের আলো, আমার সর্ব্বস্ব, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। শুদ্ধ তোমায় আর একটি বার দেখিবার বাসনা। হৃদয়ের অদম্য আবেগে প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাসে তো-

মার পদতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া শান্তি লাভ করিব। তুমি সুখী হও, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।" যে ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই ভালবাসা সে কার্য্যে কিরূপে প্রকাশ করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। উচ্চ দেবদারুবৃক্ষে কোকিল করুণস্বরে গাইতে আরম্ভ করিল। দূরে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট ভাবে শ্রুত হইতে লাগিল; শশাঙ্কশেখরের হৃদয়েও একটা কোমল অব্যক্ত বেদনা জাগরিত হইয়া উঠিল।

শশাঙ্কশেখরের আজ রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না। সে তন্দ্রায় কেবলই ঐ মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিল। প্রত্যূষে উঠিয়া শশাঙ্কশেখর এক খণ্ড কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিল—"তুমি আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তুমি আমার সুখ-শান্তি, আশা-তৃষ্ণা। তুমি সুন্দর, তুমি উত্তম; তুমি মহান্, তুমি পবিত্র; তুমি আমার বিদ্যা—আমার ঈশ্বর। আমি অন্য ঈশ্বর জানি না!

শশাঙ্কশেখরের মনে অন্য চিন্তা নাই। আজি সে উদ্ভ্রান্ত—উন্মত্ত। বিদেশে অনন্যোপায় হইয়া নিজেরই রন্ধন করিতে হইত। আজ তাহার কিছুই মনে নাই, কেবলই সেই চিন্তা। স্কুলে যাইতে হইবে, বারটার সময় হঠাৎ এ কথা মনে পড়িল। অমনি অভুক্ত অবস্থায় সে স্কুলে চলিয়া গেল। হুতাশে,উদ্বেগে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

রমণী পরশমণি। প্রথম দর্শনেই শশাঙ্কশেখর আত্মহারা হইল—তাহার শুষ্কহৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন হইল। প্রেম অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করে, কঠিনকে দ্রবীভূত করে, নীরসকে মধুর করে। বালিকাকে দেখিয়া অবধি শশাঙ্কশেখরের অন্তরে একটা আনন্দ, একটা বেদনা; একটা বিস্ময়, একটা ব্যাকুলতা, যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। বালিকাকে দেখিলেই শশাঙ্কশেখরের উন্নত মস্তক ভক্তি-ভরে তাহার নিকট অবনত হইত। শশাঙ্কশেখরের প্রেমে, তীব্র লালসা নাই, গভীর ভক্তি আছে; আকাঙ্ক্ষা নাই, শ্রদ্ধা আছে; তাঁহাকে কেবল দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হয়।

একদিন শশাঙ্কশেখর মনে করিল "কাল সাহস করিয়া বালিকাকে আমার মনের কথা জানাইব; শুদ্ধ বলিব যে, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। ইহাতে ত আমি নৈতিক দোষে দোষী নই?" বালিকা নিত্য যেরূপ প্রত্যূষে পুষ্পচয়ন করিতে আইসে, আজও সেইরূপ আসিল। বালিকা একটি গোলাপ তুলিবার জন্য উচ্চে হাত বাড়াইয়াছে, এমন সময় সহসা শশাঙ্কশেখরকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালিকা অপ্রতিভভাবে বৃন্তচ্যুত গোলাপ সমেত হাতটা তাড়াতাড়ি টানিয়া লইল। অমনি তাহা একটি তীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত গোলাপশাখায় লাগিয়া রক্তাক্ত হইয়া গেল। শশাঙ্কশেখর আসিয়াই বালিকার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল; কাতরস্বরে গভীর আকুলতার সহিত বলিতে লাগিল,—"সরলে, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, তুমি বড় সুন্দর।" শশাঙ্কশেখর আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। বালিকার হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল; কম্পমান হস্ত হইতে ফুলের সাজি পড়িয়া গেল। শশাঙ্কশেখর ক্ষিপ্র হস্তে সে ফুলগুলি তুলিয়া দিয়া "সরলা, আমাকে মাপ করিও" বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল। বালিকা আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল। দিদিমাকে কাঁটা ফুটায় আর ফুল তুলিতে পারিল না বলিয়া বুঝাইল। ঠাকুর মা "আহা কি করে ফুট্‌লো!" বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

শশাঙ্কশেখরের সেই কাতর প্রার্থনা মনে পড়িয়া, দুঃখে ও লজ্জায়, সরলার অধর ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল এবং বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সেই দিন হইতে সরলার প্রেম বর্ষাবারি-স্ফীত স্রোতস্বতীর মত প্রবল হইয়া উঠিল। শশাঙ্কশেখর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ মুহূর্ত্তের তরে ঢালিয়া অত্যন্ত শান্তি অনুভব করিল।

পৃথিবীতে একপ্রকার ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বার্থ-বিজড়িত, আর এক প্রকার ভালবাসা আছে তাহা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। মনুষ্য এই স্বার্থশূন্য ভালবাসার জন্য প্রিয়পাত্রের পদতলে অকপটে কেবল ভালবাসার উপহার দিয়াই সুখী হয়। প্রেমিক প্রেমপাত্রের জন্য যত অধিক আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, ততই সুখী হয়।

কুলীনের ঘরে পাত্র জোটান বড় মুস্কিল। সরলার জন্য দুই চারিটা সম্বন্ধ আসিয়াছিল, কিন্তু পাত্রগুলি হয় গণ্ডমূর্খ না হয় একবারে নিঃস্ব। কাজেই উপযুক্ত পাত্রাভাবে সরলার বিবাহ হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

স্বপাকভোজী আত্মীয়পরিজনহীন প্রবাসী শিক্ষকের দুঃখ ও অসুবিধার কথা মনে করিয়া, সরলা শশাঙ্কশেখরের জন্য বড় ব্যথিত হইত। সরলার ইচ্ছা হইত এই বিদেশী যুবকটিকে, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, দুবেলা পরিতৃপ্তির সহিত আহার করায়—তাহার সমস্ত অসুবিধা নিজ হাতে দূর করিয়া আত্মাকে সুখী করে।

শশাঙ্কশেখর একদিন অপরাহ্নে শুনিতে পাইল, সরলার ওলাউঠা হইয়াছে। শুনিয়াই শশাঙ্কশেখরের সমস্ত হৃদয় এক জ্বালাময় তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সরলার বেদনাক্লিষ্ট বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানি এবং জ্যোতিহীন ম্লান চক্ষুদুটি তাহার কল্পনাচক্ষে উদিত হইল। নিজের শারীরিক মানসিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াও, সরলার পরিচর্য্যার জন্য শশাঙ্কশেখর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। দুঃখে শশাঙ্কশেখরের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিল! শশাঙ্কশেখর উন্মত্তের ন্যায় সরলাদের বাড়ীর দিকে ছুটিল! কিছুক্ষণ বাড়ীর চারিদিকে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া, প্রবেশাধিকারের কোনরূপ সঙ্গত কারণ না পাইয়া, অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে স্বগৃহে আসিয়া বসিল। তখন শশাঙ্কশেখরের ইচ্ছাশক্তির (Willforce) কথা মনে পড়িল। সে ধ্যান-

মগ্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নিকট সরলার আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও অনুরোধ বা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহার কঠোর নির্ম্মম নিয়মচক্র, অন্ধবেগে, আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ, অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া, নিয়মিত রূপে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। যে তাহার গতির পথে দুর্ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়ে, সেই নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যাহা হইবার, তাহাই হইল। আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, শশাঙ্কশেখরের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, রাত্রিতেই সরলা ইহলোক পরিত্যাগ করিল। দূর হইতে সরলাদের বাড়ীর রোদনধ্বনি শশাঙ্কশেখরের কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। গভীর শোকপূর্ণ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া নৈশ সমীরণের স্বন্ স্বন্ শব্দে সরলার বিদায় প্রার্থনা শ্রুত হইল। শশাঙ্কশেখর যন্ত্রণায় অর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার চারিদিকে পরিদৃশ্যমান জগৎ ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ঘন ঘন হরিধ্বনি শুনিয়া, তাহার মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল। কিছুক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"সরলা ত চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, কেহ বলিতে পার কি? আহা! তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানিতে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া জানি কিরূপ হইয়াছে? সে এখন কোথায়? কি অবস্থায় আছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন্ স্থানে তাহার অবস্থিতি? কোন্ এক অজ্ঞাত রাজ্যে সে চিরকালের তরে চলিয়া গেল? আর কোন কালেও ফিরিয়া আসিবে না, কত দিন আসিবে,—যাইবে, প্রকৃতি তেমনই অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিবে। সবই আছে, কেবল সরলা নাই—আর আসিবে না। প্রেমাস্পদের বিয়োগে, সকলের যেরূপ হয়, শশাঙ্কশেখরেরও তাহাই হইল। সরলার মৃত্যুতে সে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই হইতে শশাঙ্কশেখর নিরামিষভোজী।

বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতরূপে চলিয়া গেল। শশাঙ্কশেখর এখন স্কুলের কার্য্য সমাধা করিয়া, বাকি সময়, প্রতিদিন নিয়মিত রূপে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, বেদ-বেদান্ত ভাগবত প্রভৃতি পড়িত। আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিশ্বাস করিয়া, মানবজীবন ভ্রান্তিময় বুঝিতে পারিয়া অন্তরে বড় শান্তি পাইল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, শান্ত ও উদার কবিতা পড়িয়া তাহার মনোমোহন ভাবে বিমুগ্ধ হইত। শশাঙ্কশেখর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, চন্দ্রের আলোকে, বিহঙ্গের কাকলীতে, সমীরণের প্রবাহে, স্রোতস্বতীর কলনাদে, ফুলের গন্ধে, সরলার অশরীরি অস্তিত্ব অনুভব করিত। শশাঙ্ক, প্রতিদিন প্রাতে, গভীর ভক্তিভরে বিনীতভাবে ভগবানের নিকট হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, সমস্ত আবেগ ঢালিয়া গদগদস্বরে বিগলিতঅশ্রু হইয়া, সরলার আত্মার মঙ্গল কামনা করিত।

সরলার একটি ছোট ভাই শশাঙ্কশেখরের ছাত্র ছিল। তাহাকে শশাঙ্কশেখর বিশেষ স্নেহ করিত ও যত্ন সহকা[illegible] শিক্ষা দিত। তাহার অর্দ্ধ উপার্জ্জন দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত হইত।

শশাঙ্কশেখর মধ্যে মধ্যে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিত,—

"Alas for love! if thou wert all,
And naught beyond on earth."

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালার একটি গীতিলহরী।

"হরি নিরদয়,
তোমায় দয়াময় বলে সবে কোন্ গুণে ?"

বহুদিন হয় বলিয়াছি গীতিকবিতার জগদ্দুর্লভ সম্পদে এ জগতে বাঙ্গালা ভাষার তুলনাস্থল নাই। বাঙ্গালা ভাষা আর যে অংশে দরিদ্রা হউক না কেন, গীতির ভাব, ভাষা, রস, রাগ, মহিমা ও মাধুর্য্য এবং শক্তি ও সুখ-সৌন্দর্য্যে, উহা পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। কেন না, উহার গীতিকবিতায় যেমন আছে শঙ্করাচার্য্যের বেদ-বেদান্তবিশ্রুত গভীর কথা, তেমন আছে শেক্ষপীর-চিত্রিত জুলিয়া ও কালিদাস-চিত্রিত শকুন্তলার তাপ-দগ্ধ পবিত্র প্রাণের গভীরতর ব্যথা। বস্তুতঃ, প্রীতি ও যত্নের সহিত খুঁজিলে, এ রত্নাকরে সকল প্রকার রত্নই পাওয়া যাইতে পারে। আজি পাঠককে বঙ্গের পুরাতন-সম্প্রদায়ী সুপ্রসিদ্ধ-গীতিকবি গোবিন্দ অধিকারীর ভক্তিসঞ্চিত রত্নমালার একটি অপূর্ব্ব ভাব-রত্ন উপহার দিব।

কবি, ভক্তের মুখে ভগবান্‌কে সম্ভাষণ করিয়া, অন্তর্ব্বেল হৃদয়ের আবেগময়ী ভাষায় কহিতেছেন,—

"হরি নিরদয়,
তোমায় দয়াময় বলে সবে কোন্ গুণে ?"

গীতের এই একটি কথায়, এই একটি পংক্তিনিবিষ্ট পদাবলীর একটি মাত্র প্রশ্নে, পুরাতন ও অধুনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত সহস্র কথা নিহিত রহিয়াছে, তাহা পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ? একদিকে বিজ্ঞান, আর এক দিকে সমবেত মানবজাতির একীভূত প্রাণ;—একদিকে চক্ষুকর্ণের * সাক্ষ্যনির্ভরে নীরস-বুদ্ধি-সংগৃহীত নিষ্ঠুর প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত, আর একদিকে জ্ঞানাভিমানশূন্য সরল-সুকোমল মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। এই দুইকে

* মনস্, যশস্ ও চক্ষুস্ প্রভৃতি কএকটি শব্দ, 'স'-কারান্ত হইলেও, বাঙ্গালায় সাধারণতঃ স্বরান্তবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যশস্ শব্দ, 'যশোধ্বনি' ও 'যশোমান' প্রভৃতি সমাসে আপনার 'স'-কারান্ত মূর্ত্তি প্রায় সর্ব্বত্র পুনরায় প্রাপ্ত হইলেও, মনস্ ও চক্ষুস্ শব্দের অনেক স্থলে তাহা ঘটে না। এই হেতু লোকে 'মনঃসাধে' না লিখিয়া 'মনসাধে,' 'মনোন্তর' না লিখিয়া 'মনান্তর', এবং 'চক্ষুঃকর্ণ' না লিখিয়া 'চক্ষুকর্ণ' লেখে;—অথচ 'মনোবাদ এবং 'চক্ষুরাদি' পদে সংস্কৃত রীতিই অনুসৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাভাষার শব্দপ্রয়োগে এ সকল বৈচিত্র্য পরিলক্ষণীয়।

কিরূপে মিলাইব? কিরূপে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ বিষম তত্ত্বের সামঞ্জস্য ঘটাইব?

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির মত ব্যক্তিরা, * বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কুঠার হস্তে লইয়া, বিশ্বজনীন বিশ্বাসের উপর আঘাতের পর আঘাত করিয়াছেন; এবং প্রশ্নের উত্তর করিতে যাইয়া, উহাকে সহস্রগুণ কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাদ-বিতর্ক বিস্তারিত ধাঁধায় পড়িয়া আজও কত লোক পথভ্রষ্ট পথিকের মত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, এবং একই মণ্ডলীর মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া নৈরাশ্যে অবসন্ন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বাঙ্গালার গীতি-কবি, সে সকল অমূলক বাদ-বিতর্কের কিছুই না জানিয়া, সরলমতি শিশুর ন্যায়, স্বয়ং ভগবানেরই পদ-প্রান্তে লুঠাইয়া পড়িতেছে, এবং যেন সে পা দুখানি বুকে ধরিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে,——

"হরি নিরদয়,
তোমায় দয়াময় বলে সবে কোন্ গুণে ?"

গীতিকবিতার প্রশ্নকর্তা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞান; অথচ বিজ্ঞান প্রথমতঃ প্রশ্নস্থলেই আপনার সংশয়-সংকুলা দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিতেছে। বিজ্ঞান আপনার মনঃকল্পিত তামসী দৃঢ়তার উপর দাঁড়াইয়া উন্মাদ-গন্ধি গর্ব্বসহকারে বলিতেছে,—

"ভগবন্, তুমি নিশ্চয়ই নিতান্ত 'নিঠুর'-'নিরদয়,' তোমায় আমি কেমন করিয়া দয়াময় বলিব? তোমার উপর নির্ভর করিয়া ঋষিতাপস-প্রতিম সাধু সজ্জনেরা, মন্দিরে কিংবা মস্-জিদে, যুক্তকরে ও স্তিমিতনেত্রে প্রার্থনা করিতেছে, অথবা তোমার করুণাচিন্তনে নয়নজলে ভাসিতেছে; অথচ দেখিতেছি তোমার দয়া-লেশ-শূন্য দারুণ বজ্র, ঠিক্ সেই সময়েই, তাহাদিগের মস্তকে নিপতিত হইয়া, তাহাদিগের আজন্মপুষ্ট আশা ও আকাঙ্ক্ষার সকল তন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে §। হা নাথ! ইহা

---

* (John Stuart Mill) জন ষ্টুয়ার্ট মিলের Posthumas অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রকাশিত "Thiesm নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং তৎ-প্রতিবাদে (Miss Cobbe) মিস্ কব্ প্রণীত Hopes of the Human Race নামক পুস্তক। যাঁহারা মহামতি মিলের অনুগামী, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা ব্যক্তি, এবং নব্যদর্শন ও বিজ্ঞানে নিপুণ। তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, অথচ ঈশ্বরের অনন্ত দয়া ও অনন্তশক্তিমত্তার সামঞ্জস্য করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যকে ভক্তির পথ হইতে দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সৌভাগ্য বশতঃ এ বিষয়ে মিস্ কবের অনুবর্ত্তিসংখ্যা অনেক বেসী।

§ আজি ১৭।১৮ বৎসর হয় ঢাকায় এরূপ একটি ঘটনা হইয়াছিল। সাতটি ভক্ত মুসলমান, আরমাণীটোলার একটি পুরাতন মস্‌জিদে, উপাসনার সময়ে, একই সঙ্গে, বজ্রাঘাতে তনু-ত্যাগ করিয়াছিল। পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং অতি মূর্খ ও অতি সূক্ষ্মদর্শি উভয়শ্রেণির লোকের মনেই ভক্তির উপর অবিশ্বাস জন্মাইয়াছে।

দেখিয়াও কি, প্রভু, তোমায় 'নিরদয়' বলিতে কুণ্ঠিত হইব ?

"তোমার পৃথ্বীব্যাপী সমুদ্র প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, তরঙ্গগ্রাসে শত শত যুবক ও যুবতীকে জীবনসুখের প্রথম উন্মেষ-সময়েই গ্রাস করিয়া নিঃশেষ করিতেছে; এবং যেন তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া, সময়ে সময়ে, প্রলয়মূর্ত্তির আকস্মিক বিকাশে, একই নিঃশ্বাসে, শত সহস্র গ্রাম ও নগর ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। চক্ষে এই সকল ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কি, প্রভু, তোমায় 'দয়াময়' বলিয়া ডাকিব ?

"স্ফুরদ্‌যৌবনা বালা, পুষ্পশয্যার প্রথম সম্মিলনে, প্রেম-পিপাসু সলজ্জনয়নে, হৃদয়-সহচর প্রার্থিতদুর্ল্লভ প্রাণ-প্রিয় বরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; বর, সুখ-প্রীতির তাদৃশ সময়েও মনোবুদ্ধির অগোচর, সন্ন্যাসরোগে চিরজীবনের তরে, কৃতান্তের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পিতা, জীবনের একমাত্র অবলম্বন দূর-প্রবাসী পুত্রের স্নেহসিক্ত মুখখানি দেখিবার জন্য, দীর্ঘকালের পর, তৃষিতনেত্রে পথের দিকে তাকাইতেছে; পুত্র ঘরে ফিরিতে না ফিরিতে, সর্পদংশনে সংসার ও পিতার নিকট বিদায় লইতেছে! হায়! যে জগতে এ সকল অথবা ইহা হইতেও অধিকতর দুঃসহ দুঃখজনক-ঘটনা অহরহঃ হাহাকারে পরিণত হইতেছে, যে জগতে এক দিকে প্লেগ আর একদিকে পাষাণ-কঠোর দুর্ভিক্ষ, তৃতীয় দিকে মহামারীর নানাবিধ বিকট মূর্ত্তি, চতুর্থদিকে অবিচার, অত্যাচার এবং লাঞ্ছনা ও দুর্গতির অনন্তসূত্রিত আতঙ্কজনক প্রকার মনুষ্যের অস্থিপঞ্জর ও কলিজার মাংস লইয়া বুভুক্ষু ব্যাঘ্র-কুক্কুরের ন্যায়, দিবারাত্রি টানাটানি করিতেছে, সেই জগতে দণ্ডায়মান হইয়া, হে প্রভু! হে পরাৎপর! হে অনন্ত সম্পদ্‌, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত-বিশ্ববৈভবের অধীশ্বর! তোমায় কোন্‌ সাহসে 'দয়াময়' বলিয়া সম্বোধন করিব ?

"মাতৃহীন অথচ মনুষ্যের আশ্রয়বিরহিত শিশু যখন গাছের তলায়, ধূলিশয্যায়, একাকী পড়িয়া রহিয়া, ক্ষুৎপিপাসার আকুলতায় ফুকুরিয়া ফুকুরিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন সে ক্রন্দন কি, প্রভু, তুমি শুনিতে পাও ? আর এইযে মনুষ্যজাতির অর্ব্বুদ কোটি হৃদয়, নগরে ও গ্রামে, শৈল-শিখরে ও শৈল-গহ্বরে, বনে ও প্রান্তরে, অথবা নদ, নদী ও সমুদ্রের দুর্নিরীক্ষ্য বিস্তারে, যেন তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ং সময়ে ও সুগভীর নিশীথে, অসংখ্য ভাষায়, অসংখ্য নামে, উচ্চৈঃস্বরে তোমায় ডাকিতেছে, তুমি কি ইহাদিগের কাহারও আর্ত্তনাদে কর্ণপাত কর ? তাই বলিয়াছি তুমি 'নিরদয়', তোমায় আর দয়াময় বলিয়া ডাকিব না। তোমার দিকে চাহিয়া আর কাঁদিব না। তোমার দয়ার ভিখারী হইয়া আপনাকে আপনি বৃথা আর বঞ্চিত করিব না।"

কিন্তু, গীতিকবির মতে বিজ্ঞান, আপনার দুঃখে আপনি দগ্ধকঙ্করের মত হইয়া থাকিলেও, প্রকৃত বৃত্তান্তসংগ্রহে পরাঙ্মুখ নহে। বিজ্ঞানের এতটুকু জ্ঞান আছে যে, ভগবানের দয়াসংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্ব, তাহার সংকীর্ণসংগ্রহের অনধিগম্য হইলেও, এ জগতের যেখানে হৃদয় ফুটিয়াছে, সেখানেই মনুষ্যহৃদয় জগন্নিধান ভগবান্‌কে

'দয়াময়' বলিয়া অথবা তদনুরূপ অন্য কোন নামের আশ্রয় হইয়া সম্ভাষণ করিয়াছে। ইহার অর্থ কি ?

এ ভক্ত বিজ্ঞান ইহাও বিশিষ্টরূপে জানে যে মনুষ্য বুঝুক আর না বুঝুক,—মনুষ্য এই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তত্ত্বকে তার সামান্য বুদ্ধির অতি সামান্য টোপার মধ্যে ভরিয়া সারসত্য উদ্ধার করিতে পারুক আর না পারুক, সে জগতের অপ্রত্যক্ষ অধীশ্বরকে প্রত্যক্ষবৎ মনে করিয়া, তাঁহার কাছে কাঁদিতে শিখিয়াছে। অগণিত অথবা গণনার অতীত মানব-হৃদয়ের এই মহাভাবমূলক চির প্ররূঢ় বিশ্বাস কি প্রকৃতির প্রতারণ মাত্র ? এমন ভয়ঙ্কর কথা মনে করিতেও ভক্তি-সিক্ত বিজ্ঞান ভীত ও কুণ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান, এই হেতু, আগে প্রশ্নচ্ছলে আপনার কথা কহিয়া, প্রশ্নচ্ছলেই আবার জগতের কথা জানাইতেছে,—

"হরি নিরদয় !

তোমার দয়াময় বলে সবে কোন্ গুণে ?"

যেন বিজ্ঞান মনুষ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁদিতেছে আর কাতরকণ্ঠে কহিতেছে,—"প্রভু, আমি জ্ঞানানল-দগ্ধ পার্ব্বত্য প্রস্তর-রেণু, আমি ত কিছুই বুঝিলাম না; এবং বুঝিলাম না বলিয়াই তোমায় 'নিরদয়' বলিয়া আসিতেছি, আজিও তোমায় 'দয়াময়' বলিতে সাহস পাইলাম না। কিন্তু দেখিতেছি জগতের সকলেই তোমায় 'দয়াময়' বলিয়া ডাকে,—তোমার দয়াসমুদ্রের বিন্দুমাত্র লাভের জন্য করুণ-স্নিগ্ধস্বরে ক্রন্দন করে—দেখিতেছি জগতের সকল হৃদয়ে—সকলেরই প্রাণে তোমার ঐ 'দয়াময়' নাম স্তরে স্তরে লিখিত রহিয়াছে। বিশ্বব্যাপিনী প্রকৃতির এ বিশেষ সাক্ষ্য কখনও ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে না। আমি এই নিমিত্ত, ভয়ে ভয়ে, তোমারই পদ-প্রান্তে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"জীব তোমার কোন্ অচিন্তনীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমায় 'দয়াময়' বলিয়া সম্ভাষণ করে, হে 'নিরদয়' দয়াময়, তুমি আমায় তোমার, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।" যদি তোমায় না বুঝিলাম, তবে বুঝিলাম কি ? যদি তোমায় না চিনিলাম, তবে চিনিলাম কি ? আর যদি তোমার ঐ 'দয়াময়' নামমাহাত্ম্য কানে মাত্র শুনিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহিলাম, অথচ মুহূর্ত্তের তরেও প্রাণে অনুভব করিতে না পারিলাম, তবে করিলাম কি ? তুমি গুরুদেব, তুমি জ্ঞানদেব। যেমন সূর্য্যের রশ্মি-কণিকায় আলোক, তেমন তোমার কৃপারশ্মির অণুপ্রমাণ কণিকায় জ্ঞান। আমি তোমাকেই ডাকিতেছি। তোমার প্রসাদ-বিন্দু-স্বরূপ প্রকৃত জ্ঞানের যে মূর্ত্তি দর্শনে মনুষ্যের শত পাপসন্তাপিত ভস্মরাশি সদৃশ প্রাণ শীতল হয়, তুমি আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, এবং আমাকে জগন্মোহন দয়াময় নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া চিরকালের তরে কৃতার্থ কর। তোমার কৃপায় বিজ্ঞানের সজল-জলদ-গম্ভীর ভাষায় জগতের সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হউক,——

জয়-দয়াময়-জগদীশ্বরঃ

জয়-দয়াময়-জগদীশ্বরঃ

জয়-শিব-শঙ্কর—শ্রীহরিঃ সত্য-সুন্দরঃ

জয়-পূর্ণব্রহ্ম-পরাৎপরঃ।

কণিকা।

বসন্ত-অন্তে।

দু'দিনে কি ঋতুরাণি ফুরায়েছে সব
আপন হরষ-দীপ্ত যৌবনের তৃষা,
হৃদয়প্লাবিনী শক্তি সৌন্দর্য্য-গৌরব ?
ভাঙ্গিয়াছে শরতের মদিরার নেশা ?
গায় না কোকিল আর অধীর হরষে,
বহে না কুসুমবাস মৃদু সমীরণে ;
যুবক যুবতী আর আঁকে না মানসে
শিথিল বিলাস-চিত্র পুর-উপবনে।
ধরার সৌন্দর্য্যস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চূরিয়া,
বিকট রাক্ষসী মূর্ত্তি করেছ গঠন,
অলস মলয় মৃদু, কোকিল কাকলী।
আকুল করে না আর রমণীর মন।
চলেছে নন্দনে রাণি হাসিয়া হাসিয়া
দীর্ঘশ্বাস-অশ্রু-জ্বালা রহিল পড়িয়া।

শ্রীঃ ——

বর্ষশেষে।

আবার আসিল বর্ষ গেল চলে হায়।
সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখ অতীত ভীষণ,
হাসি অশ্রু মিশে গেছে বিস্মৃতির স্রোতে,
ভেসে গেছে বহুদূর আঁধারের পাছে।
প্রদীপ্ত উৎসাহ আশা আকাঙ্ক্ষার গীতে
জাগাও হে সৌন্দর্য্যের অধীর পিয়াসা,
তন্দ্রালু হিয়ারে মোর নবীনের তরে।
এস নববর্ষ তুমি নবীন ভূষণে ;
অর্ঘিয়া তোমারে বর্ষ করিব গ্রহণ।
কি ফল লভিব জানে ভবিষ্য-দেবতা।
বর্ষ সঙ্গে যেয়ো না গো তুমি মায়াবিনী,
অয়ি মোর মানস-সেবিতা। অয়ি দেবি,
তব কণ্ঠে তু'লো মৃদু মুরলীর তান
শুনিবে আকুল হিয়া সঙ্গীত মহান্।

শ্রীঃ——

পিপাসু।

১

আজি এ হৃদয় কেন আঁধারে মগন!
প্রদোষ-প্রভাত বেলা,
কণক-কিরণ-মালা,
দে'খেছি প্রকৃতি-অঙ্কে উজলি ভুবন,—
সায়াহ্ন গগন-কোলে,
নবীন নীরদ-জালে,
চাঁদের নবীন আলো—নব আয়োজন,
বিশ্বপতি-সাধনায়,
অসীম অনন্ত গায়,
বিশ্বদেব মহাপ্রাণে ঢালিয়া জীবন,
গাইছে সকলে—আমি আঁধারে মগন!

২

আমারি হৃদয় কেন আঁধারে মগন?

তাঁহারি আশীষ-বলে,
অনন্ত নীলিম-তলে,
ফুটিয়া নীরবে সুখে উজল আনন,
অনন্ত নক্ষত্র রাশি,
মুখে মেখে প্রীতি-হাসি—
গাইছে তাঁহারি জয়—শমন-শাসন—
নাহি জানে শোক, রোগ,
পাপের অনন্ত-ভোগ,
জীবনে জড়ান শুধু প্রেম আভরণ ;—
জলধি-বেলায় কত,
উর্ম্মিমালা শত শত,
সান্ধ্য রবি-করে রঞ্জি কত আস্ফালন,
বুকভরা প্রীতি, ভক্তি,
বিশ্বের অনন্ত শক্তি,
উজ্জ্বল রতন বক্ষে করিয়া ধারণ—
মধুর ললিত তানে,
গাইছে করুণ প্রাণে
তাঁরি জয়—করি তাঁকে আত্ম-বিসর্জ্জন,
আমি কেন শুধু আজি আঁধারে মগন ?

৩

আমারি হৃদয় কেন আঁধারে মগন ?
চলেছে আপন মনে,
উদার প্রবাহ সনে,
কুল কুল তানে গঙ্গা—পবিত্র জীবন—
কোথায় পর্ব্বত-শৃঙ্গে,—
কোথায় সাগর-সঙ্গে—
কোথায় সুদীর্ঘ-মঠে, প্রান্তর, কানন—
সহস্র জনতা-ভেদি,
চলিতেছে নিরবধি,
তাঁহারি মহিমা শত করিয়া কীর্ত্তন,
মলয় অনিল সনে,
কতই আকুল প্রাণে;
তাঁহারি উদ্দেশে কত করিছে নর্ত্তন ;—
কুসুমিত উপবনে,
বিরলে বিরহী-প্রাণে,
কোকিল কোমল-কণ্ঠে করিছে বর্ষণ,
তাঁহারি মহিমা-ধারা সুধা-প্রস্রবণ।

৪

আমি কেন আঁখি-জলে ভাসিয়ে বেড়াই ?
অগ্নিময় শরজালে,
হৃদয়-অনন্ত মূলে,
পুড়িয়া অনন্ত আশা হ'য়ে গেছে ছাই,
সে অনন্ত স্নেহ, প্রীতি,
জীবনের সুখ-স্মৃতি,
দয়া, ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য কিছুই তো নাই,
বুকভরা শত দুখ,
অনলে জড়িত বুক,
অমরতা, মোক্ষলাভ— কোথা কিসে পাই,
তুমি তো করুণা-সিন্ধু,
কর দয়া এক বিন্দু,
দিগন্ত উছলি তানে জগত জাগাই,
গাইব পরাণ পু'রে,
সে অনন্ত প্রেম-ভরে,
অনন্ত আনন্দ যেন লভিবারে পাই,
আঁধার হৃদয় তলে,
তোমার প্রতিভা-বলে,
হয় যেন প্রতিভাত পোড়া ভস্ম ছাই,
আমি যেন তব প্রেমে ভাসিয়ে বেড়াই,

শ্রীনীরদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন মিশর।

রাজা ও রাজকীয় বিধিব্যবস্থা।

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে, কিরূপে রাজার অভ্যুত্থান ও রাজপদের সৃষ্টি হইল, কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহা প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। এতৎসম্বন্ধে লোকতত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল বিজ্ঞজনেরা যুক্তি ও অনুমান বলে, এক এক সময়ে এক এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে সেই সকল অনুমানই প্রামাণিক সিদ্ধান্তের স্থলবর্ত্তি।

রাজপদ কাহারও যদৃচ্ছালব্ধ সখের সামগ্রী নহে। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা হইয়াছে, আর তিনি অমনি পাঁচ জনের প্রভু হইয়া বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, বস্তুতঃ পৃথিবীতে এই প্রণালীতে রাজপদের সৃষ্টি হয় নাই। মানবজাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের প্রয়োজনে, আপনি উহা উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব। সে ধীরে ধীরে পশুজীবন পরিহার ও প্রাকৃত জগৎকে কর্ম্মভূমিতে পরিণত করিয়া, সমাজের গ্রন্থিবন্ধন করিয়াছে, আর সেই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মীদিগের কল্যাণ-কামনায়,—সমাজ অক্ষুন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে, কর্ত্তা বা প্রভুর আসন আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিধাতা কোন্ ভাগ্যবানের ললাটপটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, লোকে আকৃতি দেখিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্যক্তিনিষ্ঠ গুণগ্রাম ও শক্তিসামর্থ্যে ক্রমে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কোন বিশেষ গুণ বা শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া একবাড়ীর পাঁচ জনে মিলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব পদে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই কর্ত্তাদিগের কেহ যখন আবার অন্য পাঁচ পরিবারের কর্ত্তা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালীরূপে পরিচিত হইয়াছেন, তখন সেই পাঁচ পরিবারের কর্ত্তাই তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলা আবশ্যক মনে করিয়াছেন, এইরূপে দলপতি বা পল্লীপতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এই প্রণালীতে কালক্রমে পল্লীপতি জনপদের কর্ত্তা এবং জনপদের নায়ক একবারে রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়া বসিয়াছেন।

মানবসমাজের আদিম অবস্থায়, এইরূপ উচ্চপদলাভ, বোধ হয়, তেমন কোন মানসিক বা হৃদয়িক শক্তিসাপেক্ষ ছিল না। তখন বাহুবল, বা শারীর-শক্তিই প্রধানতঃ ঈদৃশ উচ্চপদের নিয়ামক বা নিয়ন্তৃরূপে পরিগণিত হইত। বানরের পাল যেমন

পালের প্রধান হনুমানের ভ্রূকুটিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়, গজযূথ যেমন অগ্রগামী গজরাজের শুণ্ড আস্ফালনে সংযত রহে, মানব সমাজও, শৈশব-সময়ে, নেতৃপুরুষের বাহুবল ও বাহ্বাস্ফোটনেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত থাকিত। কিন্তু মানবপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ ও উন্নতির অনুপাতে কালে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ;—বাহুবল মানসিকশক্তি ও প্রাণবলের নিকট মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ মানিয়াছে। মনঃশক্তি কর্ত্তার আসনে অধিরূঢ় হইয়া, জগৎ-যন্ত্রের পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; আর বাহুবল উহার আজ্ঞাধীন ভৃত্যরূপে উহার সেবাব্রতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ, এই প্রণালীতেই প্রথমে জগতে রাজার অভ্যুদয় ও রাজপদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

রাজার অভ্যুত্থান ও রাজপদ সৃষ্টির মূল হেতু এইরূপ হইলেও, দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে উহার বিকাশে বিস্তর পার্থক্য ঘটিয়াছে। কোন স্থানে ফুটিয়াছে রাজতন্ত্র, কোন স্থানে প্রজাতন্ত্র বা পঞ্চায়তী ব্যবস্থা এবং কোথাও বা এই উভয়ের মিশ্রণ। এই রাজতন্ত্রও আবার কোন স্থানে স্বার্থলুব্ধ ও স্বেচ্ছাপরায়ণরূপে ভয়াস্পদ এবং কোথাও বা নীতিসংযত ও ন্যায়নিষ্ঠরূপে বরাভয়প্রদ। পুরাতন সভ্য রাজ্যসমূহের মধ্যে গ্রীস ও রোম রাজ্যে অতি প্রাচীন সময়েই প্রজাতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতে ও মিশরে প্রথম হইতেই রাজতন্ত্রের বিভূতি বা বৈভব-লীলা পরিলক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

ভারতীয় প্রাচীন রাজতন্ত্রের ছায়ায়, স্বার্থপরতন্ত্র স্বেচ্ছাচার পরহিতব্রত ঋষিদিগের মঙ্গলময় পুণ্যপ্রভাবে প্রায়শঃ প্রশ্রয় পাইতে পারে নাই। প্রজারঞ্জনই ভারতীয় নৃপতিনিবহের একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। এই হেতুই ভারতীয় ভাষায় ভূপতির নাম নরপাল বা প্রজারঞ্জনধর্ম্মী রাজা। যে দেশের সাগরস্রষ্টা মহারাজা সগর, সামান্য প্রজাপীড়ন অপরাধে বংশের অবলম্ব ও কুলতিলক পুত্র অসমঞ্জকে, একগাছি তৃণের ন্যায়, ত্যাগ করিতে পারেন, যে দেশের সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র প্রজার মুখের দিকে তাকাইয়া, মা জানকীর ন্যায়, দেবারাধ্যা সতী, প্রাণাধিকা দয়িতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া, রাজ-ধর্ম্ম-রক্ষার্থ রাজকীয় বৈভবের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, অনায়াসে মুনি-ব্রত-অবলম্বনে সমর্থ, সে দেশের রাজতন্ত্র কিরূপ পদার্থ, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝান নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্র-বিপ্লববিধৌত, শোণিত-রঞ্জিত প্রজাপ্রতিনিধিত্ব অথবা স্বাধীনতার কলকূজনে মুখরিত, শত সুখ-সম্পদ্-বিলসিত প্রজাতন্ত্রের উন্মুক্ত অঙ্গনে যদৃচ্ছা বিহার অপেক্ষাও যে অবস্থাবিশেষে রাজতন্ত্রশাসনাধীন প্রশান্ত রামরাজ্যের সংযত জীবন সহস্রগুণে অধিকতর শ্লাঘ্য ও বরণীয়, বোধ হয়, কেহই এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মিশরে অতি প্রাচীনকালে, প্রায় এই শ্রেণীরই রাজতন্ত্র বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভারতের ন্যায় মিশরেও পুরাতন রাজ-পদ বংশপরম্পরাগত ও পুরুষানুক্রমিক ছিল। রাজপদ যেমন পুরুষানুক্রমিক ও বংশগত, রাজধর্ম্ম ও রাজকীয় কর্ত্তব্যনিচয়ও তেমন পুরুষানুক্রমেই একবিধ ও প্রায় একই ভাবে অনুপ্রাণিত। ভারত ও মিশর, উভয় দেশেই রাজার একমাত্র ধর্ম্ম ও প্রধান কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জন ও প্রজাপালন। সুতরাং নৃপ-বালক ও রাজকুমারদিগের শিক্ষাপ্রণালী চিরদিনই ইহার উপযোগি ছিল। তাঁহারা প্রজাপালন ও প্রজাসংরক্ষণ উদ্দেশ্যে এক-দিকে শিক্ষা করিতেন অস্ত্রবিদ্যা ও রণ-কৌশল, আর একদিকে অভ্যাস করিতেন সংযত জীবন। দিগ্‌বিজয় ও সার্ব্বভৌমত্বের গৌরব লাভ রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম নহে, ব্যক্তিবিশেষের বীরকীর্ত্তি প্রকটন ও আত্ম-প্রাধান্য অর্জ্জনার্থ অসংযত আকাঙ্ক্ষার অনুচিত বিকাশমাত্র। বস্তুতঃ তৎকালে দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়নিষ্ঠা, এবং চরিত্রগত মহত্ত্ব ও উদারতাই রাজকুলের প্রধান উপলক্ষণ বা আভরণস্বরূপ ছিল।

প্রাচীন ভারত ও মিশরে রাজধর্ম্ম ও রাজকীয় কর্ত্তব্যের মূলসূত্র এক হইলেও, শিক্ষাপ্রণালী ও দেশ-প্রচলিত সামাজিক অবস্থা ও আচারগত পার্থক্য হেতু, ফল এক হইতে পারে নাই। ভারতে, একই সময়ে, এক অঙ্গে আত্মত্যাগের মহাযজ্ঞে আহুতি প্রদানার্থ রামের সাম্রাজ্য স্ফুটনোন্মুখ হই-য়াছে, অন্য অঙ্গে, রাবণের অধিকারে রাক্ষসী নীতি লালসার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিয়া ভোগের ভাণ্ডার শুষিয়া লইয়াছে। একদিকে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য দয়াধর্ম্মের বিজয়সঙ্গীতে তান ধরিয়া দেবলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্যদিকে জরাসন্ধের ভীষণ কারাগারে আতঙ্কের বিকট চীৎকারে দয়াধর্ম্ম 'ত্রাহি মধুসূদন' রবে পলা-ইয়া গিয়াছে। ভারতীয় বিভিন্ন রাজবংশে একই প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রীয় অনুশাসন রাজ-বংশীয়দিগের ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীন-প্রবৃত্তির উপর বলপ্রয়োগের পদ্ধতি অবলম্বন করে নাই। রাজা, দেবধর্ম্মের পরিবর্ত্তে লোভে বা দুরাকাঙ্ক্ষার অনুরোধে দানব-ধর্ম্মের অনু-সরণ করিতে যাইয়াও গতিপথে, কদাচিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হেতুই, একই ভারতবর্ষে, ব্যক্তিভেদে রাজকীয় অনুষ্ঠানে নানারূপ পার্থক্য সংঘটিত হইতে পারি-য়াছে। কিন্তু মিশরের রীতি অন্যরূপ। মিশর দেশ-প্রচলিত বিধিব্যবস্থার শৃঙ্খলে স্বভাবতই এরূপ শৃঙ্খলিত থাকিত যে, কি রাজা কি প্রজা, কাহারও ঘুণাক্ষরে, তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য ছিল না। ভারতের রাজা ঋষির অনুশাসন ও বিধিব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত মস্তক অবনত রাখিয়াও স্বাধীন-জীব, আর মিশরের নৃপবংশ অকাট্য নিয়ম-শৃঙ্খলে নিরুদ্ধ, সিংহাসনারূঢ় সজীব যন্ত্র-বিশেষ। মিশরের রাজগণ, চিরদিনই প্রচ-লিত নিয়মের অনুশাসনে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতে বাধ্য থাকিতেন। এই হেতু মিশরীয় সমস্ত নৃপতিই যেন এক ছাঁচে ঢালা, একই

বিগ্রহবৎ কর্ম্মক্ষেত্রে পরিগণিত হইয়াছেন। মিশরে প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামান্য প্রজা যেমন সমাজে অপাংক্তেয় ও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত, তেমন রাজাও রাজকুলের কণ্টকরূপে রাজনির্ঘণ্ট হইতে অপসারিত হইতেন। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইতে পারিত না। কিন্তু ভারতে সে কথা নহে। ভারতে অনেক সময়, রাজপদের স্বাভাবিক প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি ও গৌরবের প্রভাবে নিয়মলঙ্ঘনরূপ সামান্য ব্যভিচার, অনেক সময়, উপেক্ষিত হইত; কখন কখন বা রাজার অনুষ্ঠিত অনিয়মও, নিয়মের স্থলবর্ত্তী হইয়া ব্যবস্থাকর্ত্তা ঋষিদিগের অনুমোদিত হইয়া যাইত। প্রায়শ্চিত্তের বিধানও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং অধিকারীভেদে প্রায়শ্চিত্ত লঘু ও গুরু হইতে পারিত। কিন্তু, মিশরের কথা অন্যরূপ। সেখানে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিভাগেরই প্রচলিত নিয়ম চির অমোঘ, অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যপ্রতিপাল্য ছিল। ঈদৃশ নিয়মতন্ত্রতা বা পুরাতন ব্যবস্থাপ্রিয়তা একাংশে মানবীয় বিকাশ ও উন্নতির পরিপন্থী হইলেও উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অপ্রতিহত প্রতিরোধকরূপে অন্যাংশে মিশরে বস্তুতই সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। পাঠকদিগের অবগতির জন্য মিশরীয় রাজাদিগের নিত্য কর্ম্ম ও নিত্য অনুষ্ঠেয় কতিপয় আচার-পদ্ধতি এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

যথার্থ রাজ-ধর্ম্ম ও শাসন-নীতির মূলমন্ত্র অতি প্রাচীন সময়ে, একদিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল ভারতের আর্য্যজাতি, অন্য দিকে বুঝিয়াছিল প্রাচীন মিশর। মিশরের শাসনপ্রণালী সর্ব্বাংশে রাজতন্ত্র হইলেও, নৃপতিবর্গ স্বাধীন ইচ্ছার অনুসরণ বা স্বেচ্ছাচারিতার অনুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবেই অনধিকারী ছিলেন। শুধু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কথা নহে, সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা সংযত ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য থাকিতেন। বলিতে কি, মিশরের রাজা, সাধারণ প্রজা অপেক্ষাও সহস্রগুণে অধিকতর কঠোর নিয়মের আয়ত্ত ছিলেন। মিশরে কতকগুলি ব্যবস্থাগ্রন্থ ছিল। এই সকল গ্রন্থ পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক বা বেদবাক্যের ন্যায় সম্মানিত হইত। এই গ্রন্থনিবহে পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত আচার-পদ্ধতি, রীতিনীতি ও শাসনপ্রণালী লিপিবদ্ধ ছিল। মিশরীয় নৃপতিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের অবলম্বিত গতি পথ হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না।

প্রথম কথা রাজাদিগের অনুচর, সহচর, পার্শ্বচর ও পারিষদবর্গ। বলিতে কি, ইহারাই, অধিকাংশ স্থলে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, পরোক্ষভাবে, সাম্রাজ্যের প্রকৃত নিয়ামক ও পরিচালক। সুতরাং সুদূরদর্শী মিশরীয় ব্যবস্থাপকগণ, রাজাদিগের অনুচর ও পার্শ্বচর নির্ব্বাচনেই সমধিক সতর্ক, সাবধান ও সাবহিত ছিলেন। কোন ক্রীতদাস বা অজ্ঞাত-কুল-শীল বিদেশী কোনক্রমেই মিশরী নৃপতির সন্নিহিত পার্শ্বচর বা নিয়তসঙ্গীরূপে মনোনীত হইতে পারিত না। জোজেফ ক্রীতদাসরূপে মিশরে আনীত হইয়া পরি-

শেষে মিশরের সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজসান্নিধ্যে উপস্থিত হইবার অধিকার লাভের পূর্ব্বেই, তাঁহার অন্তর্নিহিত অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাবে, তাঁহার দাসত্ব-লাঞ্ছন সর্ব্বতোভাবে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছিল।

ফলতঃ, যাহারা অতি সম্ভ্রান্ত, উচ্চবংশ-সম্ভূত, নানা বিষয়ে অধীতী, সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও চরিত্রবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, মিশরে তাদৃশ লোকই রাজ-পার্শ্বচররূপে নির্ব্বাচিত হইতেন, এবং তাঁহারাই অহোরাত্র নৃপতি-সন্নিধানে যাতায়াত ও অবস্থানের অধিকার লাভ করিতেন। মিশরীয় রাজা ও রাজকুমারগণ প্রতিনিয়ত এরূপ উন্নতচরিত্র বিজ্ঞলোকে পরিবেষ্টিত থাকিতেন যে, রাজপদ ও রাজকীয় সম্ভ্রমের অনুপযোগী সামান্য একটি ভাবও তাঁহাদিগের মনে উদিত হইবার অবকাশ পাইত না, একটা অসৎ উক্তি বা অযোগ্য কথাও তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচরে উচ্চারিত হইতে পারিত না। যাহাতে মহত্ত্বের সন্ধুক্ষণ, উন্নত উদার ভাবের উদ্দীপন, এবং দেবতার প্রতি ভক্তি ও মানুষের প্রতি দয়াবৃত্তির উদ্বোধন হয়, তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে অষ্টপ্রহর তাদৃশ বিষয়েই আলাপ, আলোচনা ও আন্দোলন হইত। রাজা ও রাজকুমারগণ, পারিপার্শ্বিকদিগের নিকট আত্মকৃত দুষ্কৃতির জন্য উৎসাহপ্রাপ্ত, অথবা তাহাদিগকর্ত্তৃক মন্দ অনুষ্ঠানে প্রকারান্তরে প্ররোচিত বা প্রবর্ত্তিত না হইলে, প্রায়শঃ আপনা হইতে যথেচ্ছাচারী হইয়া বিপথে গমন করেন না। তাঁহাদিগের স্বপদনিষ্ঠ স্বাভাবিক সম্ভ্রমই, অনেক সময়, নীচ ব্যবহারের পক্ষে গুরুতর অন্তরায়স্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু পার্শ্বচরদিগের নিকট উৎসাহ পাইলে, এই অন্তরায় তেমন কার্য্যকর হইতে পারে না। প্রাচীন মিশরের রাজপারিপার্শ্বিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ সতর্কতার ব্যবস্থা যে বস্তুতই যার-পর-নাই সুষ্ঠু, সমীচীন ও সুসঙ্গত অনুষ্ঠান, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

মিশরের লোক স্বভাবতঃই মিতাচারী। কিন্তু মিশরীয় রাজপরিবার সেই স্বভাবসিদ্ধ মিতাচারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। কারণ, রাজ-ভাণ্ডারে অর্থের অভাব নাই, বিলাস-দ্রব্যের অপ্রতুল বা অনটন নাই, ইঙ্গিতজ্ঞ আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের অসদ্ভাবও অসম্ভব কথা। ইচ্ছার উদ্রেক মাত্রই ঈপ্সিত বিষয়ের সম্পূরণ সর্ব্বদা সম্ভবপর। এ অবস্থায়, সংযতজীবন যাপন, বা মিতাচার-ব্রত-পালন বস্তুতই বড় দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা পাছে বুদ্ধির বিপাকে প্রলোভনে পড়িয়া বিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় আহারবিহারেও, প্রতিনিয়ত বিধিব্যবস্থার অধীন হইয়া চলিতে ভালবাসিতেন। রাজকীয় ভোজ্যের প্রকার, এমন কি, পরিমাণ পর্য্যন্তও নির্দ্দিষ্ট আইনের বিধান অনুসারে নির্দ্ধারিত হইত। তাঁহারা কখনও সে নির্দ্ধারণের ব্যতিক্রম করিয়া চলিতেন না, অথবা চলিতে পারিতেন না। তাঁহারা দিবসে কোন্ সময় কি করিবেন,

তাহাও বিধিবদ্ধ নীতিসূত্র দ্বারা নিয়মিত ছিল।

নিন্দা, তিরস্কার বা ভয়প্রদর্শন দ্বারা বিপথগামী একটা নগণ্য লোককেও সুপথে ফিরাইয়া আনা যায় না, ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি বা সিংহাসনারূঢ় রাজরাজেশ্বরের সম্বন্ধে আর কথা কি? এই উপায়ে তাদৃশ ব্যক্তিকে সুপথে ফিরাইয়া আনা বস্তুতই অসাধ্য ও অসম্ভব। রাজকীয় ব্যবস্থা বা রাজচরিত্রের প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা বা নিন্দাবাদদ্বারা উহার সংশোধন হইয়াছে, ইহা কোন দেশে,কোন কালে, কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। কিন্তু যশোগীতির ভুবনমোহন মধুর মুরলীধ্বনি শ্রবণলালসায় এবং অনাগত অপবাদের ভাবী আশঙ্কায় অনেক সময়, স্বভাবতঃ দুর্দ্দম নৃপচরিতও সংযত রহিয়াছে, অমোঘ শাসনব্যবস্থাও কঠোরতার কঙ্কর আপনা হইতে অপসারিত করিয়া সুখদ অঙ্গরাগ ও অঙ্গসংস্কারে প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন মিশর, পৃথিবীর সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও মানবপ্রকৃতির এই গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া, এতৎসম্বন্ধে যার-পর নাই সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

তখন সংবাদ-পত্র ছিল না। সর্ব্বসাধারণের প্রজাহিতৈষিণী বা রাজতোষিণী সভাসমিতিতেও রাজকীয় বা রাজচরিত্রের সমালোচনা বা উহার দোষগুণ বিচার হইত না। তখনকার লোকে এরূপ অনুষ্ঠানের কোনই আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। ভারতের প্রজারঞ্জনধর্ম্মী প্রাতঃস্মরণীয় নৃপতিগণ, পরীক্ষিত, সত্যবাদী ও সর্ব্বথা বিশ্বস্ত দুর্ম্মুখনামক গুপ্তচরের মুখে প্রজার মনোগতভাব অবগত হইয়া, তদনুসারে আত্মজীবন নিয়মিত ও বিধিব্যবস্থায় অঙ্গসংস্কার করিয়া লইতেন। চিরনির্লিপ্ত ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সত্যৈকশরণ মুনিঋষিরা এই কর্ম্মে তাঁহাদিগের সহায় ও অবলম্ব ছিলেন। মিশরে এ সকল ছিল না; সেখানে স্তুতিচ্ছলে, সাধারণভাবে রাজকীয় দোষাবলীর নিন্দাবাদ দ্বারা, রাজাদিগকে অসদ্বিষয়ে বীতস্পৃহ ও সদ্বিষয়ে অনুরাগী করা হইত। ইহা রাজধানীর একটা নিত্য অনুষ্ঠের কর্ম্ম ছিল। মুনিঋষিদিগের ন্যায়, পূজনীয়, সম্মানার্হ ও নানাতত্ত্বাভিজ্ঞ, দেবমন্দিরের প্রধান পাণ্ডাগণ ইহা করিতেন। মিশরীর প্রাচীন রাজবর্গের দৈনন্দিন রোটিন্ বা নিত্যকর্ম্মের নির্ঘণ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এ স্থলে সেই নির্ঘণ্টের একটা প্রধান অংশ প্রাচীন ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত হইল।

রাজাকে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতে হইত। অবশ্যকরণীয় প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হইলে, প্রকৃতির সেই প্রশান্ত মুহূর্ত্তে, হৃদয় ও মন পরিষ্কৃত, অনাবিল ও প্রশান্ত থাকিতে থাকিতে, তিনি, নানাদিক্ ও নানাবিভাগ হইতে প্রাপ্ত চিঠিপত্রগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। এইরূপে ঐ

দিন তাঁহাকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, সেগুলি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম ও চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া যাইত। পত্রাদি পাঠের পর, নৃপতি রাজবেশে সুসজ্জিত এবং সমস্ত পার্শ্বচর, পারিষদ ও অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবমন্দিরে উপস্থিত হইতেন। এই সময় দেবালয়ে দৈনিক বলিপ্রদান করা হইত। দেবালয়ের প্রধান পুরোহিত বেদী বা স্তম্ভনিবদ্ধ বলিদানের পশুকে দেবতার সন্তোষার্থ উৎসর্গ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতেন। রাজাকেও সেই প্রার্থনায় যোগদান করিতে হইত। ইহার পরে প্রধান পুরোহিত জানুপাত করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ও করযোড়ে দেবতাদিগের নিকট রাজার স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলকামনা করিতেন। রাজা দেশপ্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও আইন-কাননের নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে, আত্মজীবন সংযত ও নিয়মিত রাখিয়া, দয়া, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুশাসনে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন। দেবগণ এই ধর্ম্মপরায়ণ লোকপালক ভূপালকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন, তাঁহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিহিত হউক; পুরোহিতকৃত প্রার্থনার ইহাই মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র। এই প্রার্থনা উপলক্ষে পূজনীয় পুরোহিত অতি গভীরকণ্ঠে, বিশদ অক্ষরে রাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেন। তিনি বলিতেন,—রাজা দেবতায় ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, লোকসমাজে সদালাপী, ব্যবহারে মিতাচারী, ন্যায়পর এবং সহৃদারপ্রকৃতি ও মহান্। তিনি চিরবদান্য, প্রবৃত্তিনিবহ তাঁহার বশীভূত। তিনি সত্যের প্রিয় সুহৃদ্ ও অসত্যের মর্ম্মঘাতী রিপু, রাজা গুণের পুরস্কারে মুক্তহস্ত এবং দোষের শাসনে বা শাস্তিদানে, চির-কৃপাপরবশ ও সদয়। এইরূপে প্রথমতঃ রাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া, পুরোহিত মহোদয়, রাজা যে সকল দোষে দোষী ও যেরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে পারেন, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিতেন এবং ইহাও বলিতেন, ভাগ্যক্রমে রাজা ইহার কোন দোষেই কলঙ্কিত নহেন, তিনি নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ। যদি তাঁহাদ্বারা কখনও কোনরূপ মন্দ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহা অজ্ঞতা হেতু বা ভ্রমবশতঃ হইয়াছে। রাজার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ প্রয়োগের পরে, যে সকল অমাত্য বা মন্ত্রী রাজাকে কুপরামর্শ প্রদান কিংবা তাঁহার নিকট সত্যের অপলাপ বা গোপন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আবার তেমনি কঠোর ভাষায় অভিসম্পাত বর্ষিত হইত।

এইরূপে পবিত্র দেবমন্দিরে দেবতাদিগকে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান মনে করিয়া, মন্ত্রের ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্দীপক গভীর অক্ষরে প্রশংসার মাধুরী মাখাইয়া, প্রতিদিন রাজাদিগকে, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হইত। ঈদৃশ উপদেশ একবারে নিষ্ফল হইবার বস্তু নহে। এইরূপে প্রার্থনা ও বলিদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল; পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অতীত কালের বড় বড় লোকদিগের কার্য্যাবলী ও উপদেশমালার কিয়-

অংশ পাঠ করিয়া পারিষদবর্গসহ রাজাকে শ্রবণ করান হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ প্রকৃতি-পুঞ্জ সহ যে নীতিসূত্র ও কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠানে অমন সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান নৃপতিও যেন, লোকশাসন-বিষয়ে সেই পথের অনুসরণে তাঁহাদিগেরই মত কৃতী, কৃতার্থ ও সুখী হইতে পারেন, ইহাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল।

রাজা ইহার পরে আহারাদি, দৈনিক শারীর-কার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্রাম-অন্তে রাজকীয় কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিতেন। মিশরীয় রাজভোগে বিলাসিতার নামগন্ধও ছিল না। অতি সামান্য ভোজ্য দ্রব্যে রাজার ভোজনপাত্র সজ্জিত হইত। ভোজ্য নির্ব্বাচনে রসনার তৃপ্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত না, শুধু শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রাজকীয় ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করা হইত। বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে আহারীয় প্রস্তুত হইয়া আসিত এবং নৃপতি প্রতিদিন সেই চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট পথ্য গ্রহণ করিয়াই পূর্ণতৃপ্তিলাভ করিতেন।

ন্যায় বিচার দ্বারা প্রজারক্ষা রাজকীয় কর্ত্তব্যের এক প্রধান অনুষ্ঠান। ক্ষমতাপন্ন, সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তি অপরাধজনক কর্ম্ম, করিয়া যদি তাহাদিগের ধন, মান ও বাহাদুরির প্রসাদে বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং দীন দরিদ্র ও দুর্ব্বলের ধন প্রাণ ও মান যদি অরক্ষিত রহিয়া যায়, তাহাহইলে সে রাজ্য আর রাজ্য থাকে না, সর্ব্বতোভাবেই দস্যুর দুর্জ্জয় দুর্গ বা রাক্ষসের রঙ্গভূমি হইয়া উঠে। প্রাচীন মিশরের নৃপতিগণ এই হেতু প্রজার প্রতি যথার্থ ন্যায়বিচার বিধানই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা, সাম্রাজ্যের সুখশান্তি প্রধানতঃ ইহারই উপর্ নির্ভর করে, ইহাও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর হইতে ত্রিশ জন বিচারপতি নির্ব্বাচিত হইতেন। এই ত্রিশ জনের দ্বারা একটি বিচার-সমিতি গঠিত হইত। একজন থাকিতেন এই সমিতির অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্ট। সমগ্র রাজ্যের বিচারকার্য্য সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। রাজা বিচারক নির্ব্বাচনে ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না, কোন শক্তিমান্ ব্যক্তির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেন না; তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত চারিত্র বল ও সাধুতার জন্য যিনি জনসমাজে প্রসিদ্ধ, বাছিয়া বাছিয়া তাদৃশ লোককেই বিচারকের পদে বরণ করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার বহুদর্শিতা, বিজ্ঞতা, ও ন্যায়পরতা প্রভৃতির জন্য যিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ, দেশের সমস্ত লোক যাঁহাকে সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তিনিই বিচারকদিগের অধ্যক্ষপদে স্থাপিত হইতেন। পরিশ্রমের পারিতোষিকস্বরূপ বিচারকদিগকে এই পরিমাণ আয়ের সম্পত্তি দেওয়া হইত যে, তাঁহাদিগকে আত্মসংসারের জন্য কোনই চিন্তা করিতে হইত না।

তাঁহারা নিরুদ্বেগচিত্তে ও অনন্যমনে বিচারকার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। বিচারকার্য্য ব্যয়সাপেক্ষ ছিল না। বিচারালয় ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান অধিগম্য ছিল। বিচারকার্য্য বিচারকদিগের সমিতিতে লিখিত নথী দ্বারা সম্পন্ন হইত। সত্যই ন্যায় বিচারের মূলসূত্র। সত্য শাধা, সিধা ও সরল উক্তিতে যেমন পরিস্ফুট হয়, বাক্যালঙ্কার ও বক্তৃতায় উচ্ছ্বসিত হিল্লোলে তেমন স্পষ্টীকৃত হইতে পারে না। এই হেতু মিশরীয় বিচারকগণ, যে বাগ্মিতায় হৃদয়বৃত্তি উদ্বেলিত হয় ও মনোবৃত্তি ক্ষণকালের তরেও অন্ধীভূত হইয়া পড়ে, বিচারকার্য্যে তাদৃশ বাগ্মিতাকে ভয় করিতেন। সুতরাং বক্তৃতার পরিবর্ত্তে লিখিত উক্তি দ্বারা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। উকীলের সওয়াল জবাবের চতুর চাল সর্ব্বতোভাবেই অনাবশ্যক ছিল। বিচারসমিতির অধ্যক্ষ গলদেশে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণগলবন্ধনী ধারণ করিতেন। ঐ বন্ধনীর নিম্নদেশে সত্যের প্রতিকৃতি স্বরূপ একটা অন্ধমূর্ত্তি লম্বিত থাকিত। সত্য কাহারও মুখ চাহিয়া বিচলিত হয় না; বোধ হয়, এই কারণেই সত্যকে অন্ধ কল্পনা করা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ এই বন্ধনী গলদেশে ধারণ করিলেই সকলে বুঝিয়া লইত যে, এইক্ষণ বিচারকার্য্য আরব্ধ হইবে। বিচার শেষ হইয়া গেলে, যে পক্ষের অনুকূলে বিচার নিষ্পত্তি হইত, অধ্যক্ষ মহোদয় ঐ বন্ধনী দ্বারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতেন। এই সাঙ্কেতিক উপায়েই রায় প্রকাশের নিয়ম ছিল।

প্রাচীন মিশরে ধর্ম্ম, সমাজ ও শাসনব্যবস্থা একই আইন বা বিধানের অধীন ছিল। মন্ত্রীসভা বা ব্যবস্থাপক সমাজে বিধিব্যবস্থা বা আইনকানুনের নিত্যপরিবর্ত্তন বা অঙ্গসংস্কার হইত না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মিশরীয়দিগের ন্যায় পুরাতনপ্রিয় জাতি, পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একটি বিকসিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। মিশরে নূতন রীতি, নীতি বা বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন একটা যার-পর-নাই বিস্ময়কর অদ্ভুত ঘটনারূপে গণ্য হইত। মিশরের সমাজ, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী সমস্তই পুরাতন খাতে প্রবাহিত হইত। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সমস্ত কর্ম্মই বংশপরম্পরাগত পুরাতন রীতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাতন রীতির তিল পরিমাণ ব্যতিক্রমও অসাধ্য ও অসম্ভব ছিল। মিশরবাসী আপামর সাধারণ সকলেই, শৈশবাবধি অক্ষরে অক্ষরে সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া চলিতে বাধ্য থাকা হেতু, দেশপ্রচলিত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিত। দেশে আইনে অনভিজ্ঞ লোক একটিও ছিল না। শাসন-নীতি পরিচালন পক্ষে ইহা বস্তুতই বড় একটা সুবিধাজনক অবস্থা, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি উচ্চ ও নিম্ন বর্ণভেদে দণ্ডের তারতম্য ছিল। এখনও জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সভ্য দেশে অপরাধীর উন্নত পদবী বা অবস্থা, সময় সময়, দণ্ডের প্রখরতাকে, একটু মোলায়েম করিয়া দিতে সমর্থ হয়, কখন কখন বা

একবারের মুক্তির পথও পরিষ্কার করিয়া দেয়। কিন্তু প্রাচীন মিশরে অপরাধীর অবস্থা বিবেচনায় দণ্ডের তারতম্য হইতে পারিত না। নরহত্যাকারী ক্রীত দাসই হউক, অথবা স্বাধীন প্রভুবংশের সম্ভ্রান্ত সন্তানই হউন, হত্যা যদি ইচ্ছাকৃত হইত, তাহা হইলে প্রাণদণ্ডই তাঁহার অবশ্যম্ভাবি শাস্তি। মানবীয় ধর্ম্ম ও ন্যায়নিষ্ঠতার মহনীয় সম্পদে প্রাচীন মিশর প্রাচীন রোম অপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চতর পদবীরূঢ় ছিল। রোমে প্রভু ক্রীতদাসের প্রাণহত্যা করিয়া দণ্ডনীয় হইতেন না; মিশরে দাসহত্যাপরাধেও প্রভু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন।

মিশরে মিথ্যাসাক্ষ্যদানের শাস্তিও ছিল প্রাণদণ্ড। সাক্ষ্যদানে দেবতার নাম করিয়া শপথ করা হইত। সুতরাং সাক্ষ্য মিথ্যা হইলে, একদিকে হইত দেবতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, অন্যদিকে করা হইত মানবপ্রকৃতির দুর্লভ সম্পদ্,—সারল্য ও সাধুতার মস্তকে পদাঘাত। মিশরীয় রাজব্যবস্থায় এই হেতু মিথ্যাসাক্ষ্যদানের প্রতি এইরূপ কঠোর দণ্ডের বিধান করা হইয়াছিল। ভারতে, প্রাচীন সময়ে, এই অপরাধে রাজকীয় দণ্ড অপেক্ষাও ধর্ম্মের শাসন প্রবলতর ছিল। ভারতীয় ঋষি মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার প্রতি পরলোকে ঘোর তমিস্র নরক এবং তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নিরয়-গমনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মিথ্যা অভিযোগে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, অপরাধীকে যে দণ্ড ভোগ করিতে হইত, মিথ্যা অভিযোগকারীর প্রতি, মিশরীয় শাসন বিধানে, সেই দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যে ব্যক্তি শক্তিসত্বে প্রাণবধার্থ আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিত, অথবা ঔদাস্য বা অমনোযোগ হেতু, তাদৃশ বিপন্ন ব্যক্তির সহায়তায় অগ্রসর না হইত, সেও হত্যাকারীর ন্যায়, কঠোর দণ্ডে দণ্ডার্হ ছিল। আক্রান্ত বিপন্নকে সহায়তা করার সময় বা সুবিধা নাই বলিয়াও যদি কেহ তদর্থ চেষ্টায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তথাপি তাহার নিষ্কৃতি ছিল না। এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার কোন দণ্ড হইত না সত্য, কিন্তু তাহাকে লোকসমাজে ভীরু কাপুরুষরূপে চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত।

মিশরে কেহই অলস বা অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিয়া সমাজ বা দেশের গলগ্রহরূপে থাকিতে পারিত না। মাজিষ্ট্রেটের নিকট রেজেষ্টরী বহি থাকিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই বহিতে নাম ধাম লেখাইয়া রাখিতে হইত। ইহাতে সে কি ব্যবসায় বা কি উপায়বলে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহারও প্রকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করাইতে হইত। এ অংশে কেহ মিথ্যা উক্তি করিলে, অমনি তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রী——সু

ছায়াদর্শন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

উপক্রম।

রমণী, মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক বিকাশে, সময়-বিশেষে, দেবতার মত সুন্দর প্রকৃতি লাভ করে; এবং সেই মাতৃস্নেহেরই অস্বাভাবিক বিকারে, সময়ান্তরে, রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সংসারে ঘোরতর বিপদ ঘটাইয়া থাকে। স্নেহমমতাময় পীযুষ-রাশির এইরূপ পরিণাম কি পরিতাপজনক! কিন্তু প্রকৃতির গতি কে রোধ করিবে?

আমরা আজি পাঠককে উল্লিখিতরূপ লোক-ভয়ঙ্কর মাতৃস্নেহের একটি কাহিনী উপহার দিব। কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে আমেরিকার দুইখানি ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্র * এবং ইংলণ্ডের প্রথিতনামা লেখক, তত্ত্বপ্রিয় (Stead) ষ্টেড্ সমাজের নিকট দায়ী। সুবিজ্ঞ পাঠক কাহিনীটির আদ্যোপান্ত মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, কোন কোন মাতা, পরপারে যাইয়াও, মমতার বাঁধ ছিঁড়িতে না পারিয়া, সতত সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীধামে ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং কেহ সেই সন্তানের সম্পর্কে কোনরূপ মন্দ ব্যবহার করিলে, তাহার উপর, অসুর কিংবা অপদেবতার মত আক্রমণ করিয়া, অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত করে। এ পৃথিবীতে কাহারও হৃদয়েই আঘাত করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে যাহারা পরপারে চলিয়া গিয়াছে, কোনরূপ বাক কিংবা কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ে আঘাত করা যেমন অকর্ত্তব্য, তেমন আপজ্জনক। পরপারবর্ত্তি পাপাত্মা না করিতে পারে এমন কর্ম নাই, না ঘটাইতে পারে এমন বিপত্তি নাই. যাহারা পৃথিবীতে থাকা কালেই পাপাত্মা বলিয়া পরিচিত হয়, তাহাদিগের ক্ষমতা অসীম নহে, পরপারবর্ত্তির ক্ষমতা তুলনায় অসীম।

আত্মিক কাহিনী।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত বিখ্যাত বোষ্টন নগরের আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রুক্ফার্ম নামে ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লীতে, কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাসভবনের অদূরে, কএক ঘর শ্রমজীবী গৃহস্থ বাস করে। সেই গৃহস্থদিগের একটির নাম (Benjamin Bow) বেঞ্জামিন বো। বেঞ্জামিন বয়সে নবীন যুবা, এবং শ্রমশীল কর্ম্মপুরুষ। সে কতক কাঠুরিয়া, কতক করাতী, কিয়দংশে কারুকার্য্যনিপুণ মিস্ত্রী;—আপনি জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনে, সেই কাঠ দিয়া আপনিই তক্তা বানায়, এবং তার পর, তক্তাগুলি লইয়া, টেবল্ চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি নানারূপ সুন্দর ও সুখ-ব্যব-

* The Christian Age and The Lady's Home Journal of Philedelphia

হার্য্য কাঠের জিনিষ প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে।

আমেরিকায় স্বাধীনজীবী ব্যক্তিমাত্রই সমাজে সাধারণশ্রেণির একটি ভদ্রলোক। সে হাঁড়ি হউক, ডোম হউক, চণ্ডাল হউক, তাহার যদি অর্থোপার্জ্জনের শক্তি থাকে, এবং ঘরে কিছু অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে তাহার গৃহে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলারাও কর্ম্মসূত্রে নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত করিতে পারেন। বেঞ্জামিনের গৃহেও গ্রামস্থ দুইটি সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত যুবতীর মাঝে মাঝে যাতায়াত ছিল।

চারিটি জনপ্রাণী লইয়া বেঞ্জামিনের ক্ষুদ্র সংসার। প্রথম স্বয়ং বেঞ্জামিন, দ্বিতীয় তাহার স্ত্রী (Sara) সারা; তৃতীয় তাহার একটি চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্র, চতুর্থ (Margaret Cone) মারগারেট কোন্ নাম্নী একটি যুবতী ধাত্রী। এই ধাত্রীকে ধাই বলিলে কথাটা সঙ্গত হইবে না। কেন না, সারা ও মার্গারেট প্রায় সমান-শিক্ষিতা, এবং সমাজে সমান শ্রেণীর কুলবালা। কিন্তু চরিত্র বিষয়ে উভয়েরই একটুকু বিশেষ নিন্দা ছিল। উভয়েই অতিমাত্র কোপনা, ক্রূর-চরিত্রা,—কর্কশ মুখরা, এবং বাহিরে ঈর্ষ্যার তেমন কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও, একে অন্যের প্রতি, সপত্নীর ন্যায়, ঈর্ষ্যার কাল-কূট-বিষে ভরা।

এই ঈর্ষ্যা কেন? সারা ঘরের গৃহিণী, মারগারেট নিয়মিত বেতন-পালিতা শ্রম-সঙ্গিনী। কিন্তু সারার মনে আগে সংশয়, তার পর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহার শ্রম-সঙ্গিনী মারগারেট অচিরে তাহার স্বল্পাভিষিক্তা সপত্নী হইবে। সারার সৌন্দর্য্যে একটুকু খুঁত ছিল। খুঁত —দক্ষিণ হস্তে মধ্যম অঙ্গুলিটির আমূল অভাব। সারা, তাহার বাল্যকালে দাহিন হাতে জাঁতার কলে বড় গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। আঘাতে তাহার সমস্ত হাতখানি বিনষ্ট হইবার মত হইয়াছিল। কিন্তু সুযোগ্য অস্ত্রচিকিৎসক, একটি মাত্র আঙুল মূলপর্য্যন্ত কাটিয়া, সারার হস্তখানি রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, সারা তাহার পুত্রপ্রসবের সময় হইতে, প্রায়শই, কোন না কোন রোগে, কাতর থাকিত; অথচ তাহার শ্রম-সঙ্গিনী অথবা ভাবীসপত্নী মারগারেট, নীরোগ শরীর ও নবযৌবনের স্ফূর্ত্তিতে, হৃষ্ট-পুষ্ট বড়বার মত লাফাইয়া বেড়াইত, এবং সারার চক্ষে বড়ই যেন সুন্দর দেখাইত। ইহা কিছুই কুপিত ভুজঙ্গীর মত অন্তর্দ্দাহজর্জ্জরিতা সারার প্রাণে সহিত না, এবং নির্দ্দয়-নিঠুরা মারগারেটও মুহূর্ত্তের তরে তাহার মনের আনন্দ গোপন করিতে চাহিত না।

সম্প্রতি সারার মৃত্যুকাল উপস্থিত। দিনের পর দিন যাইতেছে, সারা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অবস্থায় একদিন সারা, শরীরে একটুকু বেসী অবসন্নতার ভাব অনুভব করিয়া, ব্রুক্ফারম্ পল্লীর সদাশয়া গণ্যমহিলা, (Miss Marry Needham) মিস্ মেরী নিড্‌হ্যাম এবং পল্লীর চিকিৎসক (Dr. Fifield) ডক্টর ফাইফিল্ডের ভগিনীকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়েই সংবাদ পাইয়া, ডক্টর ফাইফিল্ড্‌কে সঙ্গে লইয়া, মুমূর্ষু সারাকে দেখিবার জন্য চলিয়া আসিলেন; কিন্তু

সেখানে আসিয়া গৃহস্বামী বেঞ্জামিনকে ঘরে না দেখিয়া বড় বেশী বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন ঘরের একপ্রান্তে রোগ-শয্যায় নানারোগজীর্ণা সারা একা ছট্‌ফট্ করিতেছে; ধাত্রী মারগারেট ঘরের আর এক-প্রান্তে বড়ই ঠমকের সহিত বসিয়া গৃহস্থালীর বিবিধ কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে। সারার শিশুটি এক একবার আসিয়া মাকে একটুকু দেখিয়া যাইতেছে, আবার দূরে যাইয়া আপনার পুতুল খেলায় মনোযোগ দিতেছে।

গৃহস্বামী বেঞ্জামিন কোথায়? সে, এক-বারে নিরক্ষর না হইলেও, ভিতরে বাহিরে সমান কাঠুরিয়া। প্রত্যুষেই সে অতি দ্রুত-হস্তে তাহার (Breakfast) প্রাতরাশ পরি-সমাপ্ত করিয়া, নিকটবর্ত্তি বনে কিংবা কোন কাঠের কারখানায় চলিয়া যায়, এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিন্মাত্রপূর্ব্বে বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। তা-হার স্ত্রী বাঁচুক কি মরুক, অথবা তাহার সংসার উলট পালট হইয়া ধ্বসিয়া যাউক, কিছুতেই তাহার দৃক্‌পাত নাই। সে কায়মনঃ-প্রাণে অর্থের উপাসক; সুতরাং যাহাতে অর্থ হয় তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য।

ডক্টর ফাইফিল্ড্ বেঞ্জামিনের অপেক্ষা করিলেন না। তিনি তাঁহার ভগিনী এবং মেরী নিড্‌হ্যামের কথা অনুসারে রোগিণীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং কি করিয়া তাহার তদানীন্তন জ্বালাযন্ত্রণার কিঞ্চিৎ প্রশমন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়াই বুঝিলেন যে, তাহার আর অধিক সময় বাকী নাই।

ডক্টর ফাইফিল্ড্ সারার দিকে চাহিয়া আছেন, এবং তাঁহার ভগিনী ও মেরী নিড্‌হ্যাম শিয়রে ও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কখনও গায়ে এক-টুকু হাত বুলাইয়া, কখনও বা দুটি প্রিয় কথা কহিয়া, ধীরে ধীরে তাহার সন্তর্পণ করিতেছেন, ঠিক্ এমনই সময়ে, গৃহের একপ্রান্তে সারার শিশুটি "মাগো! মাগো!" বলিয়া কান্দিয়া উঠিল; এবং সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রুতিমাত্রই মুমূর্ষু সারা, যেন কেমন এক মত্ততার বেগে উঠিয়া বসিয়া, অতি বিকৃত কণ্ঠে এবং ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তিতে মারগারেটকে ডাকিতে লাগিল। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, মারগারেট কাছে আসিল। তখন সারা, উন্মাদিনীর মত চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, মারগারেটের দিকে চাহিয়া, আপনার সেই ছিন্নাঙ্গুল দক্ষিণহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল,—"মারগারেট! মার-গারেট! আমার কথাগুলি ভাল করিয়া শোন,—শুনিয়া হাড়ে হাড়ে লিখিয়া রাখ। আমার ঐ শিশুটিরে কখনও কটু কথা কহিও না, কোনরূপে কষ্ট দিও না। উহাকে যে কটু কহিবে অথবা কোনপ্রকার কষ্ট দিবে, আমি তাহার যম। যদি পরলোকের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার এই দক্ষিণ হস্ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে। সাবধান! আমার একথা ভুলিও না। সাবধান! মার-গারেট, সাবধান!"

দক্ষিণ হস্তে তাদৃক্ খুঁত ছিল বলিয়া সারা উহা সাধারণতঃ দস্তানায় ঢাকিয়া রাখিত। কিন্তু আজি ঐ সময়ে সেই দক্ষিণ হস্ত অনাবৃত প্রসারণ করিয়া, সে এমনই ভয়ঙ্কর ভাবে

গর্জ্জিতে লাগিল যে, ডক্টর ফাইফিল্ডের মনেও যার-পর-নাই বিরক্তি জন্মিল। তাঁহার ভগিনী ও মেরী নিড্‌হ্যাম ভয়ে ও বিরক্তিতে একটুকু দূরে যাইয়া দাঁড়াইলেন। মারগারেট তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া কহিল,"—আপনারা দেখিলেন ও শুনিলেন, ইহা ভালই হইল।" মিস্ নিড্‌হ্যাম্ বলিলেন,—"বাছা, তোমরা দুইই সমান। যা-হাই দেখিয়া থাকি, তুমি এমন বাঘিনীকে কখনও উত্তেজিত করিও না। তুমি উহাকে এমন সময়েও এক ফোঁটা জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ না, এবং উহার শিশুটিকেও একটি প্রিয় কথা বলিতেছ না, তোমার এ ব্যবহার ভাল নহে। তোমরা কেহই মনুষ্য নও।"

সারা মেরী নিড্‌হ্যামের এই কথাগুলি শুনিয়া ক্রমে একটুকু শান্ত হইল, এবং খানিক কাল মৃদু মৃদু কবিতা আওড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পুত্রবৎসলা কোপনার এ ঘুম পৃথিবীতে আর ভাঙ্গিল না।

মৃত্যু সময় হইতে সংবৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সময়ের মধ্যে, মারগারেট সারার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেঞ্জামিনের ঘরে গৃহস্বামিনীর আসনে বসিয়াছে। বেঞ্জামিন সর্ব্বাংশেই বিচিত্র লোক। তাহার সুখও নাই, দুঃখও নাই, ভালও নাই, মন্দও নাই। একটি স্ত্রী না হইলে সংসার চলে না, অতএব একটি স্ত্রী চাই। সেই স্ত্রী সারা হউক, কিংবা সারার মর্ম্মশল্যরূপিণী মারগারেটই হউক, তাহার সবই সমান। সে আগেও সমস্ত দিন কাঠের কাজে বাহিরে থাকিত, এখনও সমস্ত দিন কাঠের কাজে বাহিরে থাকে, এবং দিনান্তে সান্ধ্যভোজনের পর, একখানি 'সাধারণ লোকের পাঠ্য, সংবাদ পত্র হাতে লইয়া কিছুক্ষণ সময় যাপন করে।

এই ভাবে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পর, একদিন, বেঞ্জামিনের একটি প্রতিবেশী কৃষিজীবী গৃহস্থ ডক্টর ফাইফিল্ডের ভগিনীর নিকট যাইয়া উপস্থিত। গৃহস্থ পল্লীর সকলের কাছেই পরিচিত; সুতরাং ডক্টর ফাইফিল্ডের ভগিনীর কাছেও পরিচিত ছিল। ফাইফিল্ডের ভগিনী গৃহস্থকে প্রফুল্ল বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছ? আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হইতে পারে?"

সে বলিল,—"আজ্ঞে, আমার আত্মসম্পর্কে কিছু নহে, কিন্তু একটি স্বর্গগত আত্মীয়ার প্রীত্যর্থে আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনার দ্বারা তাহার পুত্রটির উপকার হইতে পারে। আপনি আমার প্রতিবেশী বেঞ্জামিনের পূর্ব্বস্ত্রী সারাকে জানিতেন। সারার সহিত আমার স্ত্রীর বড় সৌহার্দ্দ ছিল। আমার স্ত্রীর মুখে আমি শুনিয়াছি যে, আপনি আর মিস্ মেরী নিড্‌হ্যাম সারার মৃত্যুকালে বেঞ্জামিনের গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাহাকে তখন দয়া করিয়া এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, আপনারা, সময়ে সময়ে, তাহার শিশুটির সংবাদ লইবেন। আপনাকে আমি আজি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সারার বালকটি ইদানীং বড় কষ্টে দিনপাত করিতেছে;—বড় বেসী কষ্টে। তাহাকে তাহার মাতা মারগারেট, কথায় কথায়, ঠোনা ও লাথি মারে, সম্মুখে দেখিলেই

ঝাম্‌টা দেয়, এবং বিনা কারণেও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া গালি দিতে থাকে। এ ব্যবহারের পরিবর্ত্ত না হইলে বালক কখনও প্রাণে বাঁচিবে না।"

ফাইফিল্ডের ভগিনী কথাগুলি শুনিয়া বড়ই ক্লিষ্টা হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরেই, মিস্‌ মেরী নিড্‌হ্যামকে সঙ্গে লইয়া, দুইজনে এক গাড়ীতে, পল্লীর উপান্তে, বেঞ্জামিনের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া থাকিলেও, বেলা খুব আছে; এবং সূর্য্যের রশ্মি গ্রামের গাছপালা, পাতালতা, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রপুঞ্জ এবং ক্ষেত্রস্বামিদিগের গৃহ-নিচয়ের উপর ঝল-মল করিতেছে। তাঁহারা বেঞ্জামিনের দ্বারদেশে পৌঁচিয়াই যথাস্থানে গাড়ী রাখিলেন, এবং দুই জনেই অতি দ্রুত ঘরের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। ইহা না বলিলেও বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা উভয়েই তখন, ক্রোধ ও দয়ার অপূর্ব্ব মিশ্রণে, চিত্তে একটুকু বিচলিত।

বেঞ্জামিনের গৃহিণী সেই সময় কি যেন করিতেছিল। সে-ও তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটুকু বিচলিত এবং ততোধিক বিরক্ত হইল; এবং বিরক্তির সহিত বসিবার আসন যোগাইয়া তাঁহাদিগের কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন,—"কেমন আছ গো? আমরা সারার বালকটিকে দেখিতে আসিয়াছি।"

'সারার বালক' এই দুইটি শব্দের শ্রুতিমাত্রই মারগারেটের মতিভ্রম ঘটিল। ডক্টরের ভগিনী এবং মেরী নিড্‌হ্যাম উভয়েই যে সমাজে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা, এ কথাও তখন মারগারেট ভুলিয়া গেল। মারগারেট বলিল—"মরি, মরি! আপনারা কি হিতৈষিণী! আপনাদের বোধ হয় আর কোন কাজ নাই? তাহা না হইলে, পরের বালকের খবর লওয়া উপলক্ষে, অকাজে পরের ঘরে আসিয়া, আপনার ও পরের সময় নষ্ট করিবেন কেন? ভাল, আপনারা সারার বালককে দেখিতে আসিয়াছেন; বালক এখন আমার না সেই মড়াটার? বালক যারই হউক, এমন হা-হুতাশে হতশ্রী দুষ্ট বালক এ দেশে দুটি আর নাই। আমি এখনই আপনাদিগকে বালক দেখাচ্চি। এই বালককে মানুষ বানাইতে হইলে আমার মত মুগুরের কাজ—অন্যের কাজ নয়।"

কিছুক্ষণ এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মারগারেট বালকটিকে ডাকিল। বালক ভয়ে ভয়ে কাছে আসিল; তখন মারগারেট গলা বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বল্‌, তোর মার নাম কি?" বালক বলিল,—"তা ত তুমি জান? সে কথা আর বারে বারে কি বলিব? আমার মার নাম সারা।" তখন মারগারেট আগন্তুক মহিলাদিগের দিকে চাহিয়া আবার গর্জ্জিয়া বলিল,—"আপনারা এমন ধৃষ্টতা এবং বালকের পক্ষে এমন দুর্ব্বুদ্ধিদৃঢ়তা আর কুত্রাপি দেখিয়াছেন কি? ও এখনও সেই মড়াটারেই ওর মা বলে; কিন্তু সে মৃত হতভাগিনী এখন কোথায়? তাহার রোগ-জর্জ্জরিত বিকৃত তনু এই পল্লীর অদূরবর্ত্তি পাহাড়ে-ঢিপীর পাদ-পীঠে প্রোত রহিয়াছে। বেঞ্জামিনের বাড়ীতে যত দিন আমার কথায় কাজকর্ম্ম চলিবে, ততদিন সারার কবরের উপর একটুকু পাথরের

টুকরাও কেহ দিতে পারিবে না।”—এইরূপ কহিয়াই মারগারেট বালকটিকে একটি ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল,—“যা,—বাদুরে ছা। আমি তোর মা নই। তুই যারে মা ডাকিস্, তার কাছে যা—তার কাছে যা।”

মারগারেটের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঘরের একটা দৃঢ়রুদ্ধ বড় দ্বারের উপর সবলে আঘাত হইল। সে আঘাতের অস্বাভাবিক ধ্বনিতে আগন্তুকাদিগের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মারগারেট তখনও চমকিল না। মারগারেট বলিল,—“আপনারা এ শব্দ শুনিয়া চমকিত হইবেন না। সারার মৃত্যু অবধি এ বাড়ীতে—বিশেষতঃ পাশের ঐ কুঠরীর বদ্ধ দ্বারে, এইরূপ শব্দ অহরহঃই শুনিতে পাওয়া যায়। আপনারা যখন সারার পুত্র দেখিতে আসিয়াছেন, তখন সারার স্বর্গীয় (!) চরিত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন।”

এ সময়ে আবার দুই তিন বার শব্দ হইল। মারগারেট বলিল,—“আজ যে একটুকু বাড়াবাড়ি; বেঞ্জামিন ত ও দরোজাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়াছে। ঐ দরোজার উপর এত আঘাত কেন?”—এই কথা কহিয়াই মারগারেট একটা জানালার পরদা সরাইয়া, কুঠরীর দিকে ও তাহার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল; তার পর বলিল,—“কই, কেহই ত এখানে নাই! আপনারা এত ভয় পাইতেছেন কেন?”

জানালার নিকটে একটা (Rocking chair) দোলন-চেয়ার ছিল। মারগারেট, উন্মাদগ্রস্তের মত সেই চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, ঝুল দিয়া দুলিতে লাগিল, এবং বলিল,—“আপনারা মনে করিয়াছেন, সারা মরিয়াছে। অমন পাপ মরেও না, তরেও না। জীবিত ও মৃত সকল অবস্থায়ই মনুষ্যকে যন্ত্রনা দিয়া অস্থির রাখে। আপনারা যখন এ হেন সারার বালককে দেখিতে আসিয়াছেন, তখন আজি আগে সারারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব এবং বালকের সব কথাই খুলিয়া বলিব।”

কিন্তু সব কথা আর খুলিয়া বলা হইল না। কারণ, সেই সময়ে, সেই দরোজার উপরে ও ঘরের আরও নানাস্থানে, উপর্য্যুপরি অতি প্রবল আঘাতের শব্দ হইতে লাগিল, এবং ঘরের এক কোণ হইতে অসহ্যশীতল অসম্ভাবিত বায়ু ঝটিকার মত বহিল। আগন্তুক ভদ্রমহিলারা, ভীত-ত্রস্ত হইয়া, একে অন্যের দিকে ঘেঁসিয়া বসিলেন। মারগারেটও, ভয়ের আবেগে পাগলের মত, ইতি-উতি চাহিতে লাগিল। বালকের তখন আর আত্মপর বোধ নাই। সে দৌড়িয়া যাইয়া মারগারেটকেই ধরিল, এবং তাহার কোলের মধ্যে মাথা লুকাইল।

মারগারেট এবার প্রকৃতিস্থকণ্ঠে বালককে বলিল,—“কেন, আমার কাছে কেন? তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও। তুমি এই না এই ভদ্রমহিলাদিগের কাছে বলিলে যে, তোমার মার নাম সারা? সারাই যদি তোমার মা, তবে তুমি তাহার যাইয়া আশ্রয় লও।”

এখন ঘরের চারিদিকের সমস্ত দ্বারের উপর এবং ঘরের মেজে ও ছাদের উপরও মড়-মড়, কড়-কড় এবং ধুপ্-ধাপ্ শব্দ হইতে

লাগিল। কাঠুরিয়ার ঘর স্বভাবতই দারুময় অথবা দারুবহুল। ঘরখানি যেমন নানারূপ বিকট শব্দে শব্দিত, তেমনই তরঙ্গপ্রহৃত তরণীর মত, দক্ষিণে ও বামে দুলিত হইতে আরম্ভ করিল। আগন্তুকারা ভয়ে, বিস্ময়ে এবং অনিবার্য্য ঔৎসুক্যে নিস্তব্ধবৎ। কেন না, তখন বাহিরে ঝড় নাই, বাতাস নাই, এবং গাছের একটি পাতাও তখন নড়িতেছে না।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি মারগারেট ক্ষিপ্তের মত হইয়াছে। এ ক্ষিপ্ততা ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ক্রোধ ও ভয়ের আকস্মিক উচ্ছ্বাস-জনিত মাস্তিষ্কবিকার, না কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্য কোনরূপ অলক্ষিত-কারণ-সম্ভূত, তাহা আগন্তুকারা বুঝিতে পারিতেছেন না। তবে ক্ষিপ্ততার লক্ষণ যে ক্রমেই বাড়িতেছে, ইহা তাঁহারা বুঝিতেছেন। ক্ষিপ্ত মারগারেট দরোজার দিকে চাহিয়া শ্লেষের কণ্ঠে কহিল,—“কি সারা, কি চাস্? তোর এ বাদুরের বাচ্চা নিয়া যা ; এমন দুষ্ট বালকে আমার কিছুই দরকার নাই।” এই বলিয়াই মারগারেট বালককে আবার এক ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিয়া দিল, এবং বিনা প্রয়োজনে দৌড়িয়া যাইয়া গৃহের উল্লিখিত রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য তালায় চাবি দিল।

আগন্তুকারা সকলই দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। মারগারেট দৌড়িয়া দরোজা খুলিতে গেল, ইহা তাঁহারা দেখিলেন, দরোজার উন্মোচন শব্দও কানে শুনিলেন ; তার পর হঠাৎ কিসে কি হইল, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন না। দরোজাটা ঝনৎকার শব্দের সহিত খুলিয়া গেল। দরোজার পরবর্ত্তি কুঠরী হইতে একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ ও তৎসহ গুরুতর পতন-ধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণে পশিল। তাঁহারাও দৌড়িয়া গেলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন মারগারেট মুমূর্ষুর অবস্থায় মেজেয় পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দে ঘোঙ্রাইতেছে ; তাহার মুখচ্ছবি একবারে পরিবর্ত্তিত কিংবা বিকৃত হইয়াছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি মারগারেট, তুমি এমন ভয় পাইয়াছ কেন?” সে বলিল,—

“আর ভয় নাই ; ভয়ের শেষ হইয়াছে, আমার জীবনেরও শেষ হইয়াছে। আমি দরোজা খুলিয়াই পাপিষ্ঠা সারার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চক্ষে দেখিয়াছি। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি। সে তাহার সেই মধ্যমাঙ্গুলিশূন্য বিকট হস্তে আমার ললাটে আঘাত করিয়াছে। তার সেই হাত—সেই ভয়ঙ্কর হাত! উহা আগেও দেখিয়াছি, আজি শেষ দেখিলাম। উহ্—হু—হু! আমার এখন আর ভয়ের কথা কি? তোমরা বেঞ্জামিনের জন্য লোক পাঠাও।”

ইহা কহিয়াই মারগারেট চক্ষু বুজিল, এবং নিঃশব্দ ও নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

ভদ্র মহিলারা তখন ঠিক যেন সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। তাঁহারা কি জন্য, কুক্ষণে, পরের বাড়ী আসিয়া, পরের আপদে বিপন্ন হইলেন ; অথবা তাঁহাদিগের আগমনের দ্বারাই এই অচিন্তিত বিপদ ঘটাইলেন। তাঁহারা মারগারেটকে পুনরপি অতি বড় স্নেহসিক্ত মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ওগো, বাছা, তোমার স্বামী কোথায়? আমরা এ সময়ে কোথায় যাইয়া তাকে খুঁজিব।”

মারগারেটের মুখে আর শব্দস্ফূর্ত্তি নাই আগন্তুকারা অগত্যা বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাছা, তুই বলিতে পারিস্ তোর বা এখন কোথায়?" বালক বলিল,— "নিশ্চয় কোন স্থানে কাঠ কাটিতেছে; কিন্তু কোথায় তাহা জানি না।"

মিস্ মেরী নিড্‌হ্যাম্ তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন,—"বোন, আজি আমরা নিয়তির শাসনে, যেন দৈব-প্রেরিত হইয়া,এখানে আসিয়াছিলাম। এ অভাগিনীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। ইহাকে এ সময়ে কোন কারণেও ত্যাগ করা যায় না। আমি এখানে থাকিয়া ইহার এবং এই বালকের প্রত্যবেক্ষণ করিব; তুমি যাইয়া তোমার ভ্রাতা ডক্টর ফাইফিল্ডকে সত্বর লইয়া আইস।"

ডক্টর ফাইফিল্ডের ভগিনী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন, এবং ভ্রাতার সহিত ফিরিয়া আসিবার সময়, সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্বে, পল্লীর পথে বেঞ্জামিনকে দেখিতে পাইলেন। বেঞ্জামিন তখন, দিবসের পরিশ্রম সমাপন করিয়া, নিত্য-নিয়মিত প্রণালীতে ধীরে ধীরে বাড়ীতে ফিরিতেছে। ডক্টর ও তাঁহার ভগিনী বেঞ্জামিনকে তাহার বাড়ীর দুর্ঘটনাসংক্রান্ত সকল কথা না বলিয়া কতক কতক জানিতে দিলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ডক্টর ফাইফিল্ড গৃহ-তল-শয়ানা শব্দস্পন্দশূন্যা মারগারেটকে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন,—"আমার কিছু করিবার নাই।—মুমূর্ষুর তনুত্যাগ হইয়াছে।"

তাঁহার ভগিনী ও মেরী নিড্‌হ্যাম্ একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রোগে অকস্মাৎ ইহার তনুত্যাগ হইল?" ডক্টর কহিলেন,—"রোগের নাম পক্ষাঘাত।"

বেঞ্জামিন তখন মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"পক্ষাঘাত নহে—পক্ষাঘাত নহে!" মেরী নিড্‌হ্যাম্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পক্ষাঘাত নহে ত কি?"

বেঞ্জামিন কহিল,—"আজ্ঞে, পক্ষাঘাত নহে,—ইহার নাম মর্ম্মাঘাত অথবা পাপ-ভারাক্রান্ত বিবেকের আকস্মিক মুদ্গরাঘাত। এ অভাগীকে আপনারা জানেন না, আমি জানি। ইহার আত্মা ঈর্ষ্যার একটি হাঁড়ী ছিল। সেই ঈর্ষ্যার আকর্ষণে ইহার লোকান্তরিতা সপত্নীর অমুক্ত আত্মা, মাঝে মাঝে ইহাকে দেখা দিত; এবং তদুপলক্ষে এই ঘরে, অনেক সময়েই, অলক্ষিত শক্তির নানারূপ অত্যাচার হইত। অভাগিনীর শেষ হইয়াছে, দয়াময় জগদীশ্বর ইহাকে ক্ষমা করুন।"

মেরী নিড্‌হ্যাম বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক। মারগারেট নিশ্চয়ই সারাকে দেখিয়াছে, এবং সারার সেই বিকট হস্তে ললাটে অতি কঠিন আঘাত পাইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিনী সারাকে শয্যায় তুলিলেন, এবং শয়নীয় বস্ত্রে যত্নের সহিত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন। সারার মাথায় রাশি চুল ছিল; তাঁহারা সেই আলুথালু ও উদ্দাম কেশরাশি একদিকে সরাইয়া রাখিবার সময় স্পষ্ট দেখিলেন, ললাটদেশ কেমন একটা বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

দুই তিন দিন পরে, মারগারেটের মৃতদেহ

সমাধির জন্য গ্রামের একপ্রান্তে—তৎকথিত "পাহাড়ে টিপীর" সান্নিধ্যে—সমাধিক্ষেত্রে নীত হইল। গ্রামের অনেক লোকই শিষ্টাচারের প্রচলিত পদ্ধতিতে সেখানে যাইয়া দাঁড়াইল। ডক্টর ফাইফিল্ড, তাঁহার ভগিনী এবং মিস্ মেরী নিড্হ্যাম, একই গাড়ীতে, সেখানে উপস্থিত হইলেন; এবং শেষোক্ত মহিলাদ্বয় চরমকার্য্যের উপযোগি বিবিধ অনুষ্ঠানের ভার লইলেন।

চরম কার্য্যের উপলক্ষে বারে বারেই কফিন (Coffin) অর্থাৎ মৃতদেহরক্ষণী কৃষ্ণবসনাবৃতা কাষ্ঠপেটিকাটি খুলিতে হয়। ফাইফিল্ডের ভগিনী এবং মেরী নিড্হ্যাম কাষ্ঠপেটিকাটি খুলিয়াই, মৃতার শরীরে কি যেন দেখিয়া, ভয়ে শিহরিয়া, ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। এ সময় বেলা একটা বাজিয়াছে, এবং অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ সেখানে একত্র হইয়াছে। কবরখনক অর্থাৎ সেক্স্টন (Sexton) সেখানে আসিয়া কার্য্য দেখিতেছিল, এবং মণ্ডলীর বৃদ্ধ উপাচার্য্য অর্থাৎ ডিকন (Deacon) লাঠির উপর ভর করিয়া সমাগত হইয়াছেন। কবরখনক কফিনের উপরিভাগের কাষ্ঠময় আবরণ উন্মোচন করিয়া, দৃষ্টিমাত্রই চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বলিল,—"এ কি! এ কি! মৃতার দেহে এ কি দেখিতেছি?"

ইহার পর একটি বৃদ্ধা রমণী যাইয়া ব্যগ্রতার সহিত মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছাপন্নের মত একটুকু দূরে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন,—"হা এ কি হইয়াছে? ইহা ত প্রাকৃত ঘটনা নহে!"

ভয় আর ঔৎসুক্যে বড় নিকট সম্বন্ধ। মানুষ যখন ভয় পায়, তখন তার ভয়ের সঙ্গে ঔৎসুক্যও কেমন এক আশ্চর্য্যভাবে সংবর্দ্ধিত হয়। সমাগত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে সকলেই তখন ভীত; অথচ ঔৎসুক্যের সঞ্চালনায়, কি হইয়াছে তাহা পরখ করিয়া দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাঁহারা একে একে সকলেই যাইয়া মৃতদেহ দেখিলেন; এবং দর্শনের পর সকলেই একে অন্যের দিকে চাহিয়া নিস্পন্দবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের চক্ষে চক্ষে ভয় ও বিস্ময়ের অব্যক্ত ভাষায় নানাপ্রকার প্রশ্ন হইতেছে, কিন্তু কাহারও মুখে প্রত্যুত্তরবোধক কোন কথা সরিতেছে না।

এ সময়ে মৃতার স্বামী বেঞ্জামিন স্বয়ং, শেষ বিদায় গ্রহণের জন্য, তাহার বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া, সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল, এবং দৃষ্টিপাতমাত্রই আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"হা—এ কি দেখিতেছি! ইহার বর্ণ পলকে পলকে এমন পরিবর্ত্তিত হইতেছে কেন?" সে ওখানে আর না দাঁড়াইয়া সেক্সটনের নিকট দৌড়িয়া গেল, এবং তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"ভাই, এ মূর্ত্তি দেখিতে নাই। তুমি শীঘ্র কফিনের ঢাকুনিটি বন্ধ কর।"

পাঠকের মনে আছে, গ্রামের চিকিৎসক ডক্টর ফাইফিল্ড সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেক্সটন তাহার কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই, তিনি অতি দ্রুত পাদ-চারে কফিনের কাছে যাইয়া, মৃতার মুখখানি বিশেষ মনোনিবেশের সহিত তাকাইয়া দেখিলেন; দেখিয়া যাহা বুঝিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ও মন তখন কিরূপ

একটা ভাবে আবিষ্ট হইল, তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি জানিতেন যে, মারগারেটের বর্ণ বড় ফর্‌শা ছিল। তাহার মুখচ্ছবির সকল দিকেই সেই পুরাতন শুভ্র কান্তি সজীব অবস্থার মত স্ফুট রহিয়াছে; অথচ তিনি দেখিতেছেন যে, ললাটের ঠিক মধ্যস্থলে একখানি হাতের চপেট অতি বড় গাঢ় মসীবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই চপেটকারি হস্তের চারিটি মাত্র আঙুল মুদ্রিত দৃষ্ট হইতেছে, অথচ মধ্যমাঙ্গুলির কিছু মাত্র চিহ্ন নাই।

এ কার হাত? বেঞ্জামিনের বাড়ীতে যাঁহাদিগের যাতায়াত ছিল, সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"এ সপত্নী সারার হাত।"

মেরী নিড্‌হ্যাম এবং ডক্টর ফাইফিল্ডের ভগিনী তখন অনেককেই অস্ফুটস্বরে বুঝাইয়া কহিলেন যে, কোপন-স্বভাবা মারগারেট, অধিকতর কোপনা লোকান্তর-বাসিনীর মর্ম্মপীড়া জন্মাইয়া, আপনার কর্ম্মদোষে, অকালে কালগ্রাসে গড়াইয়া পড়িয়াছে; সে, এক প্রকারে তাঁহাদিগের চক্ষের উপরই ক্রোধোন্মত্তা সারার ছায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং তাহারই দক্ষিণ হস্তে ললাটে আহত হইয়া, এই শোচনীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন

১। "খোকার দপ্তর, শ্রীমনোমোহন সেন প্রণীত।"—বঙ্গীয় শিশুদিগের বর্ণশিক্ষার অনুকূলতায় যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'খোকার দপ্তর' নিশ্চয়ই আদরের আসন কাড়িয়া লইবে। বাবু মনোমোহন সেন ইতঃপূর্ব্বে বর্ণপাঠ বিষয়ে 'শিশুতোষ' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া সাহিত্যিকমাত্রেরই সন্তোষ জন্মাইয়াছেন। আমরা 'খোকার দপ্তর' পড়িয়া বুঝিয়াছি, তিনি অচিরেই বঙ্গের শত সহস্র খুকুমণির হৃদয়েও আনন্দ দান করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন। আমরা 'শিশুতোষের' মত অতি সামান্য শিশুপাঠ্য পুস্তক পাঠ সময়েও তাঁহাকে কবি বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। তাঁহার এই 'খোকার দপ্তরেও' ঐরূপ একটুকু কবিত্বের পরিচয় আছে। কবিতা অথবা ছড়াগুলি মধুর। একটি কবিতায় 'অজ' স্থলে 'অজা' আছে। যথা,—

"তবলা বাজায় অজা নাই তাল মান।"

এখানে 'অজ' বলিলেও যখন কবিতার তাল কাটে না, মানের ঘরে কানে বাজে না, তখন 'অজা' বলিতে যাইতেছি কেন? 'অজ'কে 'অজা' বলা আপাততঃ বিঘ্নজনক বোধ না হইতে পারে, কিন্তু ইহা পরিণামে বিঘ্নজনক। কেন না, শিশুকালের সংস্কার সহজে অপনীত হয় না। বাঙ্গালির ছেলে 'শরীর' অর্থে 'কায়' না লিখিয়া সাধারণতঃ 'কায়া' লিখে; বাঙ্গালার বৃদ্ধ গ্রন্থকারেরাও, শৈশবের সেই সংস্কারের শাসনে, 'কায়' না লিখিয়া 'কায়া' লিখিয়া থাকেন। যাহারা 'খোকার দপ্তর' পড়িয়া 'অজ'কে 'অজা' বলিতে শিখিবে, তাহারাও চিরকাল 'অজ' না লিখিয়া 'অজা' লিখিবে, এবং অজা গজার গল্প বলিবে। আমাদিগের এই কথা ক'টি মনোমোহন বাবু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। তাঁহার

এই পুস্তকের মুদ্রণপদ্ধতি ও চিত্রশোভা শিশু ও শিশুজননীদিগের নিশ্চয়ই একান্ত চিত্তহারিণী হইবে।

২। "মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলাম ধর্ম্ম, অর্থাৎ মহাপুরুষ মোহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কোরাণ, হদিস ও কতিপয় প্রামাণিক ধর্ম্মেতিহাস গ্রন্থ হইতে সংকলিত, তদীয় ধর্ম্মের সারসংগ্রহ এবং সমালোচনা।"—গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু আমরা পড়িয়াই বুঝিয়াছি. ইহা সর্ব্বজন-শ্রদ্ধাস্পদ সুকৃতিপণ্ডিত, প্রচারক-প্রবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরিশ্রমের ধন। আমাদিগের শৈশব সময়ে, এ দেশে পারশ্য ও আরব্য ভাষার বড় বেশী আদর ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই তখন পারশ্য ও আরব্য ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া দেশে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ফারশী ও আরবীর কাব্যসাহিত্য লইয়াই কালাতিপাত করিতেন; জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্ম্মসাহিত্যের কোন সংবাদ রাখিতেন না। সেন মহাশয়ের ইহা বিশেষ সৌভাগ্য যে, ভগবানের কৃপায়, তাঁহার পরিশ্রম ও যত্নের প্রসাদাৎ মহাপুরুষ মোহম্মদের বিচিত্র জীবন-বৃত্তান্ত, এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলাম ধর্ম্মের প্রায় সকল কথাই এইক্ষণ বাঙ্গালি ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সুখ-সেব্য সম্পদ্ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা প্রীতি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি। তাঁহার এই পুস্তক আমাদিগের হস্তে শিক্ষাগ্রন্থস্বরূপ। আমরা ইহার গুণ-গৌরব বিষয়ে ইতোধিক আর কি বলিব? তিনি আরব্য ও পারশ্য ভাষা হইতে যে সকল দুর্ল্লভ পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার সমষ্টি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা প্রধান ভাগ। সুতরাং তিনি, পণ্ডিত ও ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়া যেরূপ সম্মানার্হ, সৎসাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়াও সেইরূপ কিংবা ততোধিক সম্মানলাভের অধিকারী। তাঁহার এই সমালোচ্য পুস্তকখানির মূল্য ৮০ বার আনা। ইহার ফুটনোটগুলিমাত্র মনোযোগ সহকারে পড়িলেও, একজন লোক পাণ্ডিত্যের উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিবার পথ পাইতে পারে। এই পুস্তকখানি কলিকাতা, ৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, মিশন প্রেসে পাওয়া যাইতে পারে।

৩। "সঙ্গীত প্রেমাঞ্জলি, শ্রীমহেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য চারি আনা।"——নিধু বাবুর প্রেমসঙ্গীত, বাঙ্গালাসাহিত্যের পুরাতন স্তরে, প্রীতিকর পুরাতন বস্তুর মত, বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত রহিয়াছে বটে; কিন্তু বঙ্গে, এখন যাঁহারা গীতিকবি বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে, কিবা প্রধান, কিবা অপ্রধান কেহই আর অনুকরণ দ্বারা নিধুর পুনরুজ্জীবন বিষয়ে যত্ন প্রদর্শন করেন না। নিধুর দুই চারিটি পংক্তি, সময়ে সময়ে, দুর্ল্লভ বস্তুর মত, সাহিত্যিক প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়া থাকে; অথচ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কেহই,ষোল আনা নিধু লইয়া, সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে ভালবাসেন না। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন নিধুর উদার ও উচ্চ আদর্শের ভাব-নিবহে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিলেও, তিনি তাঁহার এই সঙ্গীত-প্রেমাঞ্জলিতে, সাধারণতঃ, টপ্পানবীশ নিধু এবং তদনুগামিদিগেরই অনুকরণ করিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই সাহসিকতার কার্য্য। কিন্তু তাঁহার ঈদৃক্ সাহসিকতা, আজি-কালিকার দিনে, সাহিত্যিকদিগের হৃদয়হারি হইবে কি? আমরা নিম্নে তাঁহার প্রথম গীতটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"মিছে সই প্রেমের আশা
অলির প্রেমে মন্ সরে না;
ফুরালে কমলের মধু,
অলি বন্ধু তাহে পশে না।
দেখে নব ফুল্ল কলি,
মধু লোভে ভ্রমে অলি,
নিত্য নব নব ফুলে,
নূতন বই আশা মিটে না।"

এই গীতটি পড়িবার সময়ে মহাকবি কালিদাসের একটি বিখ্যাত গীতিকবিতা আমাদিগের মনে পড়িল। কালিদাস, রাজা দুষ্মন্তের সকৃৎ-কৃত-প্রণয়া প্রেম-সখী হংসপদিকার মুখে গাইতেছেন,——

"অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিদো সি ণং কহং॥

কালিদাস, ভবিষ্যমান বাঙ্গালি কবিদিগের ভাবোচ্ছ্বাসের কথা না ভাবিয়া, অতি কুক্ষণে, কুদিনে, অলিফুলের প্রেমের কথা গীতিবদ্ধ করিয়া থাকিলেও, তাঁহার এ গীতে বিচিত্র বিষয়-সঙ্গতি আছে। যাঁহারা অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা সে সঙ্গতির মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া মোহিত হইবেন। হংসপদিকা, মনুষ্যশ্রুতির অগোচরে, নিভৃত সংগীত-শালার অভ্যন্তরে, আপনার ভাবে আপনার দুঃখ গাইতেছে, অথচ রাজা দুষ্মন্ত হংসপদিকার সে দুঃখগীতির সামান্য কথায়ই অপার ও অতল ভাবসমুদ্রে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়া, ধীরে ধীরে কহিতেছেন, ———

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোপি জন্তুঃ,
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

যেখানে অলিফুলের প্রেম-বিরহ ও অভিমানের কথায় এমন অচিন্তিত-পূর্ব্ব তত্ত্বকথা অত সহজে ফোটে, সেখানে অলিও সার্থক, ফুলও সার্থক। তা ছাড়া, কালিদাসের এ গীত তখন লোকের কাছে বড় নূতন লাগিয়াছিল। তাই উহা ভারতের সমস্ত ভাষায় অনূদিত এবং বাঙ্গালায়ও সহস্রাধিক গীতে উন্মীলিত হইয়াছে; এবং সেই সকল গীতে অভিনব-মধুলুব্ধ বহুবল্লভ অলিকে বিনোদ নায়ক বানাইয়া, অসংখ্য কুসুম-কলিই, নিজ নিজ হৃদয়ের দুঃখ জানাইয়াছে। কিন্তু এইরূপ দুঃখের কথায় এখনও কাহারও মন আর্দ্র হয় কি?

মহেশ বাবু গদ্যপ্রবন্ধরচনায় প্রশংসা পাইয়াছেন। সমাজ ও সাহিত্য সমালোচনায় তাঁহার কতকটা নৈপুণ্য আছে। তাঁহার সঙ্গীত-প্রেমাঞ্জলি পড়িয়া দেখিলাম, পদ্যরচনায়ও তাঁহার পটুতা উপেক্ষণীয় নহে। এমন অবস্থায় তিনি উচ্চতর ভাবের আশ্রয় লইয়া সং-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যত্নপর হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইত। তাহা না করিয়া বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, সময় ও শক্তির এরূপ অপব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? আমরা আমাদের অভিপ্রেত বুঝাইবার জন্য এখানে তাঁহার আর একটি গীত উদ্ধৃত করিব, এবং উদ্ধৃতির পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিব যে, এ গীতের নায়িকা কে? সে রসিক ও অরসিকের তারতম্যজ্ঞানে এত পটুতা লাভ করিল কি প্রকারে?—

"দুঃখ বলব কি সজনি!
কাণ্ডারী বিহনে আমার কে রাখে সাধের তরণী
পেলে রসিক কর্ণধার,
বিচ্ছেদ-পাথার হই গো পার,
অরসিকে হা'ল ধরিলে
ডুবে যায় লো প্রেম-তরণী।"